॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৩১ বর্ষ

(২৭শ সংখ্যা হইতে ৩৯শ সংখ্যা পর্যন্ত)

সূচীপত্র

গর্ব করবার মতন
চুল ওঁর, এঁকেই
জিজ্ঞেস
করুন
উনিই বলে দেবেন যে টাটার হেয়ার অয়েল
যথেষ্ট ওঁর অমন ঘন সুন্দর চুল হয়েছে!
টাটার হেয়ার অয়েল • মাথার ত্বক শীতল ও পুষ্ট রাখে • চুল সুস্থ ও সবল রাখে • চুলের
রাশ সুবিন্যস্ত রাখে • চুল বাড়তে সাহায্য করে • এর গন্ধও অতি মনোরম।
• টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েল — ৪টি বিভিন্ন সুগন্ধযুক্ত। টাটার ক্যাষ্টর হেয়ার অয়েল—
গোলাপের সুরভিযুক্ত।• ৩ রকমের সাইজে পাওয়া যায়।
টাটার হেয়ার অয়েল
Tatas Perfumed HAIR OIL COCONUT
LAVENDER
Tatas Perfumed HAIR OIL CASTOR
THOY-48 BEN

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীমদন সরকার

দেশ

DESH 40 Naye Paise
SATURDAY, 16TH MAY 1964

৩১ বর্ষ ॥ ২৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

খাদ্য সঙ্কট

চালের সঙ্কট বা সমস্যা কিংবা হাহাকার যাই বলা হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীর কাছে কোনো কথাটাই অপরিচিত নয়। ঘুরে ফিরে প্রতি বছরই এমন একটি সময় আসে যখন এ-রাজ্যে চালের অভাব তীব্র হয়ে দেখা দেয়। তখন হয় বাজারে চাল থাকে না, না হয় মাত্রাতিরিক্ত চড়া দামে চাল বিকোয়। সাধারণত, নতুন চাল বাজারে আসার যথেষ্ট আগে থেকেই ক্রমে ক্রমে একটি অভাবের আবহাওয়া তৈরী করা হয় এবং পরে সর্বত্রই তার তীব্র প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রতি বৎসর এই যে অভাব সৃষ্টি হয়ে আসছে এর কতটা স্বাভাবিক কতটা কৃত্রিম তার কথা নতুন করে আলোচনা করা বাহুল্য হবে। তবু কিঞ্চিৎ আলোচনা না করেও পারা যায় না।

অন্যান্য বৎসরের মতন এবারও যখন আউস ও আমন ফসলের নতুন চাল বাজারে এসে পৌঁছবার বেশ বিলম্ব আছে তখন পশ্চিমবঙ্গে চালের সংকট দেখা দিয়েছে। কেন দেখা দিয়েছে তার সংগত কোনো কারণ অবশ্য আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।

বর্তমান মরশুমে পশ্চিমবঙ্গে চালের উৎপাদন মোটামুটি ভাল: কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের চালের চাহিদার কিছুটা মেটাবেন বলেও কথা ছিল: উপরন্তু উড়িষ্যা থেকে আমাদের ৩ লক্ষ টন চাল পাবার কথা। এমন অবস্থায় চালের সংকট রীতিমত উদ্বেগজনক হয়ে ওঠার যথার্থ কোনো কারণ নেই। তবু যথা-রীতি সমস্যা দেখা দিয়েছে।

এই সমস্যা সৃষ্টির আপাতত কারণ এই, সরকার নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত-মূল্যে ধান ও চালের কারবারীরা ধান ও চাল বিক্রী করবে না। তারা বেশী মুনাফা চায়। অর্থাৎ হয় মুনাফা দাও, না হয় চালের বাজার আমাদের হাতে ছেড়ে দাও এই পণ করে তারা বসে আছে।

সরকারী হিসাবমতে এ-বছরে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন চালের পরিমাণ ৪৮ লক্ষ টন। তার মধ্যে গত চার মাসে মাত্র ১৩।১৪ লক্ষ টন চাল বাজারে এসেছে এবং খরচ হয়েছে: বাকি ৩৪।৩৫ লক্ষ টন চাল বাজারেই আসে নি। অর্থাৎ সহজ হিসেবে, উৎপন্ন ফসলের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বাজারে এসেছে: বাকিটা সম্পন্ন চাষী, জোতদার প্রভৃতির কাছে থেকে গেছে। থেকে যাবার একমাত্র কারণ, চাষী ও জোতদারদের মধ্যে সুযোগ অনুসন্ধানের দুর্বুদ্ধি এবং উচ্চ মুনাফার লোভ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ-রাজ্যে ধান ও বিভিন্ন শ্রেণীর চালের দাম বেঁধে দেবার পর থেকেই সম্পন্ন চাষী, জোতদার, চালকলঅলা কিংবা বড় বড় ব্যাপারীরা কেউই সন্তুষ্ট নয়। চাল কলের মালিকরা তো ধানের অভাবে কল বন্ধ করে দিচ্ছেন বলে শোনা যায়। বড় চাষী ও জোতদাররা সরকারী বাঁধা দরে ধান বিক্রী করতে নারাজ, কল চলবে কি করে? চালের ব্যাপারীরা আরও নিস্পৃহ, তারা চালের আমদানির অবস্থাটা দেখিয়ে দিয়ে গা সরিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ চালের অভাবটা নানাবিধ উপায়ে প্রত্যক্ষ ও সত্য করে তোলা হয়েছে।

সংবাদপত্রে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গে যখন চালের সমস্যা তীব্র তখন এখানের লোককে অনাহারে রেখে এই রাজ্য থেকেই মুনাফাখোররা বিহারে প্রত্যহ হাজার হাজার মণ চাল পাচার করে যাচ্ছে, কারণ বিহারে এ-বছর চালের দর বেশ চড়া। এমন মনে করা অসংগত হবে না, যে ৩৪।৩৫ লক্ষ টন চাল বর্তমান মরশুমে বাজারে না ছেড়ে ধরে রাখা হয়েছিল মুনাফার জন্যে, তারই মোটা অংশ বিহারে পাচার হতে শুরু হয়েছে।

খুবই আশার কথা সংকট সৃষ্টির মুখে মুখেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। ব্যবস্থাটি হল এই যে, সরকার চাষী ও জোতদারদের উদ্বৃত্ত ধান আটক করতে শুরু করেছেন সম্প্রতি। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা জেলায় উদ্বৃত্ত ধান আটক করার সিদ্ধান্তের পর পরই কিছুটা সুফল দেখা গিয়েছে; বর্ধমান জেলা থেকে মাত্র দু তিন দিনেই প্রায় ৫০ হাজার মণ ধান আটক করা হয়েছে, বাঁকুড়ার কোনো কোনো জায়গায় ধানের দাম মণ-করা ১ টাকা নেমে গেছে। আশা করা যায়, সরকার যদি অতি দ্রুত এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন যাতে মুনাফালোভীরা সরকারী প্রচেষ্টা বানচাল করার সুযোগ না পায় তবে বর্তমানের কৃত্রিম চাল সংকটের সমাধান হবে। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অবশ্য আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, চাল নিয়ে সবরকম মুনাফাবাজীই দৃঢ় হস্তে দমন করা হবে।

সরকারী ভূমিকার প্রতি আমাদের আস্থা স্বভাবতই কম। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, সরকারী শুভ প্রচেষ্টা-গুলির অধিকাংশই শেষাবধি ধোপে টেকে না। এবং ক্রমে ক্রমে সরকারী শক্ত হাত আলগা হয়ে যায়। চালের কালোবাজারী ও মুনাফাশিকার রোধ করার প্রতিশ্রুতি সরকার বহুবার দিয়েছেন, কিন্তু তা অদ্যাবধি রোধ হয় নি। কলকাতার বাজারে দফায় দফায় মাছ, তেল ও অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যের ওপর মুনাফা বন্ধ করার আশ্বাস পেয়েছি আমরা, কিন্তু ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন সরকারী চেষ্টা কিভাবে বানচাল করা হয়েছে, এবং এখনও হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ চাল ব্যবসায়ীদের সাম্প্রতিক এক কৌশলের কথা উল্লেখ করা যায়। সরকারী বাঁধা দরে চাল বিক্রী করার মুনাফা পোষাচ্ছে না দেখে আপাতত বিক্রেতারা মোটা, মাঝারি, মিহি—সব শ্রেণীর চাল একত্রে মিশিয়ে চড়া দরে বিকোচ্ছে। এমন কি মিহি চালেরও সরকারী দর যা বাঁধা আছে বাজারে তার চেয়ে বেশী দাম নেওয়া হচ্ছে এই চালের জন্যে।

মোট কথা, সরকার শুধুমাত্র যদি খাতায়পত্রে সমস্যা সমাধান করতে চান তবে কোনো সমস্যারই সমাধান হবে না। কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন ভিন্ন অন্য পথ নেই। স্থায়ী এবং প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাই একমাত্র কার্যকর ব্যবস্থা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে সরকারের যে নৈতিক ও উচিত যুদ্ধ শুরু হবে তার পরিণাম দেখেই বোঝা যাবে, সরকারী দৃঢ়তা বাস্তবিকই কতটা আন্তরিক।

নির্বাসন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমি ও নিখিলেশ, অর্থাৎ নিখিলেশ ও আমি, অর্থাৎ আমরা চারজন
একসঙ্গে সন্ধ্যেবেলা কোনোদিন কার্জন
পার্কের মধ্য দিয়ে, চতুর্দিকে রাজকুমারীর মতো আলো—
হেঁটে যাই, ইনসিওরেন্স কম্পানির ঘড়ি ভয় দেখালো
উল্টো দিকে কাঁটা ঘুরে, আমাদের ঘাড় হেঁট
করা মূর্তি, আমরা চারজন হেঁটে যাই, মুখে সিগারেট
বদল হয়, আমরা কথা বলি না, রেড রোডের দু' পাশের
রঙীন ফুলবাগান থেকে নানা রঙের হাওয়া আসে, তাশের
ম্যাজিকের মতো গাড়িগুলো আসে ও যায়, এর সঙ্গে মানায়
মুমূর্ষু নদীর নিঃশ্বাস, আমরা হেঁটে যাই, আমরা এক ভাঙা কারখানায়
শিকল কিনতে গিয়েছিলাম, ফিরে যাচ্ছি, আমি বাকি তিনজনকে
চেয়ে দেখলুম, ওরাও আমাকে আড়চোখে—
ছোট-বড়ো আলোয় বড় ও ছোটো ছায়া সমান দূরত্বে
আমাদের, চাঁদ ও জ্যোৎস্নার মাঠে ইঁদুর বা কেঁচোর গর্তে
পা মুচকে আমি পিছিয়ে পড়ি, ওরা দেখে না এগিয়ে যায়
কখনো ওরা আলোয়, কখনো ওরা গাছের নিচে ছায়ায়
ওরা পিছনে ফেরে না, থামে না, ওরা যায়—

আমি নাস্তিকের গলায় নিজের ছায়াকে ডাকি, এক শো [illegible] চিৎকার
মেমোরিয়ালের পাশ থেকে হাঁস সমেত তিনবার
জেগে ওঠে, আড়াল করে, এবার আমি নিজের নাম
চেঁচাই খুব জোরে, কেউ সাড়া দেবার আগেই একটা নিলাম-
ওয়ালা 'কানাকড়ি', 'কানাকড়ি' হাতুড়ি ঠোকে, একটা ঢিল
তুলে ছুঁড়তে যেতেই কে যেন বললো, 'সুনীল,
এখানে কি করছিস?' আমি হাঁটু ও কপালের
রক্ত ঘাসে মুছে তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে সবুজ ও লালের
শিহরণ দেখি, দু' হাত উপরে তুলে বিচারক সপ্তর্ষিমণ্ডল
আড়াল করতে ইচ্ছে হয়, 'ওঠ্, বাড়ি চল্', কিংবা বল্
কোথায় লুকিয়েছিস নীরাকে?' গলার স্বর শুনে মানুষকে
চেনা যায় না, একটি অন্ধ মেয়ে আমাকে বলেছিল, দু' চোখ উস্কে
আমি লোকটাকে তদন্ত করি; পাপ নেই, দুঃখ নেই এমন
পায়ে চলা পথ ধরে কারা আসে? যেন গহন বন
পেরিয়ে শিকারী এলো, জীবনের জটিলতম প্রশ্ন মুখে তুলে
দাঁড়িয়ে রইলো, যেন ছুঁয়ে দিল বেদান্তের মন্দিরচূড়ার মতো আঙুলে
নীলিমার মতো নিঃস্বতা,—যেন কত চেনা, অথচ মুখ চিনি না, চোখ
চিনি না, ছায়া নেই লোকটার এমন নির্মম, এক জীবনের শোক
বুকে এলো, 'কোথায় লুকিয়েছিস?' 'জানি না', এ কথা
কপালে রক্তের মতো, তবু বোঝে না রক্তের ভাষা, তৃষ্ণা ও ব্যর্থতা
বারবার প্রশ্ন করে, আবার একা হাঁটিতে লাগলুম, বহুক্ষণ
কেউ এলো না সঙ্গে, না প্রশ্ন, না ছায়া, না নিখিলেশ, না ভালোবাসা,
শুধু নির্বাসন।

বৈদেশিকী

সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে বর্তমানের মতো বিহ্বলকর সময় ক্বচিৎ এসেছে। কী হচ্ছে, কী হল, দেশ কোন দিকে চলেছে সে বিষয়ে মনে কোনো দৃঢ় প্রত্যয় দূরে থাক, একটা অস্পষ্ট ধারণাও বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে। আজ যদি কোনো একটা ধারণা ব্যাপকভাবে বহুজনের মনকে পীড়ার মতো অধিকার করে থাকে তবে সেটা হচ্ছে এই যে, সরকারের নৌকো যেন হাল-ছাড়া হয়ে ভেসে চলেছে; নৌকোর যিনি মাঝি তাঁর কব্জিতে আর জোর নেই। হালের সঙ্গে পালের, পালের সঙ্গে গুণের কোনো সঙ্গতি নেই। দৃশ্যটা বাইরের লোকের চক্ষে কৌতুককর হতে পারে কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে যেমন লজ্জাকর তেমনি বিপজ্জনক।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুললে এ নৌকোর উপমাটার একটা রূপান্তর করে প্রয়োগ করতে হয়। সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভারত সরকারের প্রতিনিধির বক্তৃতা আর ভারতে নেহরু-শেখ আলোচনার ধরন দেখলে যে ছবিটি মনে আসে সেটি হচ্ছে—দু নৌকোয় পা দিয়ে কেবল দাঁড়ানোর ছবি নয়, দু নৌকোয় পা দিয়ে দু পা দিয়ে দু নৌকোকে দু দিকে ঠেলার ছবি—যথা ফলম্ হয় "দেহটাম্ ছত্রম্" অথবা জলে পতিতম্। একদিকে নিরন্তরে বলা হচ্ছে—কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্বন্ধে আর প্রশ্ন উঠতে পারে না। অপর দিকে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে পণ্ডিতজির যে আলোচনা চলছে সে আবদুল্লা সাহেবের প্রকাশ্য গোড়ার কথা হচ্ছে যে, কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চূড়ান্তত্ব স্বীকার্য নয়, কাশ্মীরীরা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কীভাবে প্রয়োগ করবে অর্থাৎ তারা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে, অথবা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে অথবা অন্য কোন ব্যবস্থার অনুকূলে মত দেবে তার নির্ণয় এখনো বাকী আছে।

রাজাজী শেখ আবদুল্লাকে কী মন্ত্রণা দিয়েছেন এবং শেখ আবদুল্লার সঙ্গে পণ্ডিত নেহরু কী কথা আলোচনা করছেন তা জানা না গেলেও পণ্ডিতজী কার্যের দ্বারা সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভারত সরকারের প্রতিনিধির বক্তৃতা সম্পূর্ণ নাকচ না করে নিলেও তার রদবদল করে নিয়েছেন সন্দেহ নেই। শেখ আবদুল্লা প্রকাশ্যে এবং পুনঃ পুনঃ কাশ্মীরের ভারতভুক্তির কথা অস্বীকার করার পরে পণ্ডিত নেহরু তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সুতরাং শেখ আবদুল্লা বলতে পারেন যে, তাঁর কথা পণ্ডিতজী মেনে নিয়েছেন। পরে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে আবার বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কথা খেলাপের অভিযোগ আনতে পারবেন। শেখ আবদুল্লার মুখ বন্ধ করা হচ্ছে না; কিন্তু তিনি তথাকথিত "আত্মনিয়ন্ত্রণ"-এর কথা যেভাবে প্রকাশ্যে বলেন এবং যে কথা তাঁর সমস্ত বক্তব্যের ভিত্তি বলে উপস্থিত করেন তার পরে যদি সোজাসুজি তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আলোচনায় বা নেগোসিয়েশনে প্রবৃত্ত হন তা হলে ভারত সরকারের দিক থেকে "একসেশনের" কথাটার নৈতিক জোর বিশেষ কিছু থাকে না।

শেখ আবদুল্লাকে মুক্তি দেওয়া অনুচিত হয়েছে, অথবা উপেক্ষা তাঁকে করা যেত অথবা তাঁর মতামত জানা অনাবশ্যক এরূপ কথা কেউ বলছে না; কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যখন আবদুল্লার সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে তাঁকে আহ্বানলিপি পাঠান তখন এটা পরিষ্কার করে জানানো উচিত ছিল (জানানো হয়েছিল কিনা আমরা বলতে পারি না, কারণ পণ্ডিতজীর চিঠি সরকার প্রকাশ করতে রাজী হন নি) যে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পূর্বে শেখ আবদুল্লা এমন কোনো কথা প্রকাশ্যে বলবেন না যেটা ভারত সরকারের ঘোষিত নীতির বিপরীত। এমন কি, চিঠি লেখার সময়ে সতর্ক করে না দিয়ে থাকলেও শেখ আবদুল্লা যখন প্রথম বক্তৃতা করতে শুরু করলেন তার পরেও তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল যে, শেখ আবদুল্লা যদি ভারত সরকারের ঘোষিত নীতির বিপরীত কথা বলতে থাকেন তা হলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব হবে না। তা সত্ত্বেও যদি শেখ সাহেব সংযত না হতেন তা হলেও বেসরকারী সূত্রে তাঁর মতামত জানা এবং তার জন্যে কোনো "বেসরকারী" মধ্যবর্তীকে কাজে লাগানো যেতে পারত; কিন্তু শেখ আবদুল্লার বক্তৃতাদির পরে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার এবং আলোচনা কখনই উচিত হয়নি। তাতে ভারত সরকার হাস্যাস্পদ মাত্র হয়েছেন। গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু নিজে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবহারে যে কৌশল, সংযম ও আদব রক্ষা

করতেন তার কথা কি আমরা বিস্মৃত হয়েছি?

তাও যদি "আত্মনিয়ন্ত্রণের" কথাটা ফাঁকি না হত। কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের বুলি যখন মুখে আওড়ানো হয় তখন আসলে কি তার মধ্যে এই কথাটাই উহ্য থাকে না যে, আমি যা বলছি সেইটাই কাশ্মীরীদের মত, আমি যা স্থির করব সেটাকেই কাশ্মীরীরা নিজেদের মত বলে মেনে নেবে? অর্থাৎ শেখ আবদুল্লাকেই কাশ্মীরের একমাত্র মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি বলে মেনে নেওয়া হোক শেখ আবদুল্লা এবং তাঁর বন্ধুরা এই ধারণা সৃষ্টি করার এবং ভারত সরকারকে দিয়ে সেটা স্বীকার করিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু এরূপ স্বীকৃতি ভারত সরকারের পক্ষে কাপুরুষোচিত আত্মাবমাননার প্রমাণ ছাড়া আর কিছু হবে না।

ব্যাপারটা আরো উদ্ভটরূপে দেখা দেয় যখন শেখ আবদুল্লা দাবি করেন যে, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্কের তিক্ততা দূর করা। আন্তরিকভাবে সে চেষ্টা তিনি অথবা আর যিনিই করুন তাতে আপত্তির কারণ নেই কিন্তু পাকিস্তানের মিত্রতা লাভ শেখ আবদুল্লা-এর মারফত ছাড়া হবে না এ অবস্থা স্বীকার করতে হলে ভারত সরকারকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করতে হয়। কাশ্মীর রাজ্যের কোনো আভ্যন্তর সমস্যা সমাধানের জন্যে শেখ আবদুল্লার সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার একটা "ডীল্" করছেন এপর্যন্ত কল্পনা করা যায় কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতার জন্যে ভারত সরকার শেখ আবদুল্লাকে কাণ্ডারী পাকড়াবেন এর চেয়ে অশ্রদ্ধেয় কিছু হতে পারে না।

শেখ আবদুল্লা নিজেই বলেছেন যে, পাকিস্তানকে অখুশি করে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হতে পারে না। তাই যদি হয় তবে পাকিস্তান কিসে খুশি হবে তা সরাসরি পাকিস্তানের সঙ্গে নিগোসিয়েশন করে দেখলেই তো হয়, তার জন্যে শেখ আবদুল্লার মধ্যবর্তিতার আবশ্যকতা কী? অথবা যদি এমন হত যে, ভারত এবং পাকিস্তান সরকার কোনো একটা সমাধানের সন্ধান পেয়েছেন কিন্তু সেটা কার্যকর করতে হলে কাশ্মীরী জনমতের সহযোগিতা আবশ্যক এবং সেই সম্পর্কে শেখ আবদুল্লার আনুকূল্য কাজে লাগবে, তাহলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু শেখ আবদুল্লার জন্যে এরূপ একটা ইণ্টারন্যাশনাল ভূমিকা সৃষ্টির কাজে ভারত সরকার সহায়তা করছেন কেন?

*

শ্রীখ্রুশ্চেফ মিশরে (ইউনাইটেড আরব রিপাব্লিক) বেড়াতে গেছেন এবং সেখানে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হচ্ছেন। প্রেসিডেণ্ট নাসের কোনো বিদেশী অতিথিকে ইতিপূর্বে এতো সম্মান দেখান নি। কম্যুনিস্ট চীনা প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন-লাই কিছুকাল পূর্বে যখন মিশরে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে যেরূপ সম্বর্ধনা করা হয় সেটা "যথারীতির" পর্যায়ে মান পড়ে, তাতে কিছুমাত্র আতিশয্য ছিল না, বরঞ্চ একটু কমের দিকেই ছিল, বোধ হয় সোভিয়েট রাশিয়া কী মনে করে সেই ভেবে। সোভিয়েট রাশিয়ার বন্ধুতা প্রেসিডেণ্ট নাসেরের পক্ষে অতীতে যেমন প্রয়োজনীয় ছিল, এখনও আছে। সামরিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়ে। চীনের সঙ্গে ঝগড়ায় অ্যাফ্রো-এশিয়ান কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সমর্থন প্রত্যাশা করে। চীনাদের উগ্র কূটনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ প্রেসিডেণ্ট নাসের নিজেও বিশেষ পছন্দ বোধ হয় করেন না। আফ্রিকা অথবা মধ্যপ্রাচ্যে চীনাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা প্রেসিডেণ্ট নাসের খুব ভালো চক্ষে নিশ্চয়ই দেখেন না; কারণ সেটা তাঁর নিজের স্বার্থের পরিপন্থী। এমন কি পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্য লাভ আবশ্যক এবং অপরিহার্য হলেও প্রেসিডেণ্ট নাসের সোভিয়েট তথা কম্যুনিস্ট প্রভাবের অগ্রগতিতে বাধা দিয়েছেন, যার জন্যে এক সময়ে শ্রীখ্রুশ্চেফ প্রকাশ্যে প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট নাসেরের কম্যুনিজম্-বিরোধী ব্যবহার সত্ত্বেও যেখানে পশ্চিমাদের সঙ্গে বিরোধ সেখানে প্রেসিডেণ্ট নাসের সোভিয়েট ইউনিয়নের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা কখনো করেন নি। এক সময়ে মনকষাকষি কিছুদিন এমন মাত্রায় পৌঁছেছিল যে, আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের পরবর্তী পর্যায়ে সোভিয়েট সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে কারো কারো মনে সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু সে সন্দেহ অমূলক প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া এক কোল্ড্ ওয়ার-এর বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলেও যখন আর এক কোল্ড্ ওয়ার শুরু হয়েছে তখন পাকা খেলোয়াড়ের ভয় কী?

১১-৫-৬৪

বিবর্তন

ভোজবাজি

আমার সেই কল্লোল যুগের নিমন্ত্রণপত্র মনে পড়ছে : 'অনুগ্রহপূর্বক রেশন কার্ডটি অগ্রেই পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।'

কথাটা তখন আইন বাঁচানোর জন্যেই লেখা হত এবং আমরা কেউই কখনো রেশন কার্ড অগ্রে পাঠিয়ে দিয়ে নিমন্ত্রণ-কর্তাকে বাধিত করি নি। তা সত্ত্বেও ভোজের আয়োজনে এবং ভোক্তার সংখ্যায় বিন্দুমাত্রও ঘাটতি পড়ত না, খোদ সরকারী কর্তারাই কেউ কেউ মহাভোজের ভোজবাজি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতেন। বড় জোর অবিমিশ্র লুচির বদলে কখনো কখনো ডালমিশ্রিত রাধাবল্লভীর ব্যবস্থা করা হত, তাতে ময়দার যে কতখানি সাশ্রয় ঘটত, একমাত্র পরম-কারুণিক জগদীশ্বরই তা বলতে পারতেন।

এতদিন পরে আজ আবার গেস্ট্ কন্ট্রোল। নিমন্ত্রণ-নিয়ন্ত্রণ। কথাটা শুনতে চমৎকার —বেশ মনোরম অনুপ্রাস আছে।

এই 'অনুপ্রাসিত' প্রাশন-শাসনে (দেখছেন, আমারও ভাষা কিরকম খুলে যাচ্ছে!) নিমন্ত্রণকর্তারা কী ভাবছেন জানি না, কিন্তু তাঁদের যে নিমন্ত্রিত সত্তা রয়েছে, সে খুব আর্তনাদ করে উঠছে কি? আত্মাকে দুভাগে আলাদা করে নিয়ে বিষয়টা বিচার করুন। যদিচ শাস্ত্রমতে আত্মা অচ্ছেদ্য, তা হলেও সে যে একেবারেই অবিভাজ্য, এমন কথাও ঋষিরা বলেন নি। এইবার এই দ্বিধাভক্ত আত্মাকে মুখোমুখি বসিয়ে দিন এবং তাদের সংলাপ শ্রবণ করুন।

পয়লা নম্বর : ইস্, গেস্ট্ কন্ট্রোল।

দোসরা নম্বর : আঃ—গেস্ট্ কন্ট্রোল।

পয়লা : মাত্র পঞ্চাশজন।

দোসরা : অনেকগুলো দায় থেকে বেঁচে যাব—ওফ্।

পয়লা : স্ক্যাণ্ডালাস।

দোসরা : ভগবান আছেন—হাড় জুড়োল।
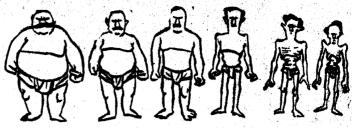
অবশ্য, কৃতিত্বটা শ্রীভগবানের পাওনা নয়, সাধুবাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারই দাবি করবেন। কিন্তু কেন এই স্বস্তির উল্লাস? তা-ও কি ব্যাখ্যা করতে হবে? তা হলে চেস্টারটনের সেই বহুল পরিচিত গল্পটা আবার স্মরণ করতে হল। বিদগ্ধ পাঠকেরা পুনরাবৃত্তি মার্জনা করবেন।

স্থান কোনো গভীর অরণ্য। কাল রাত্রি। একটি ক্ষুধিত সিংহের সঙ্গে জনৈক হরিণের সাক্ষাৎ হল। যদিও সিংহের হাতে ঘড়ি ছিল না, কারণ তার হাতই নেই, তবু পেটের তাগাদাতেই সে বুঝতে পারল সেটি তার ডিনার টাইম। অতএব সে সাদরে হরিণকে তার উদরে প্রবেশ করবার জন্যে আহ্বান জানালো।

হরিণ বললে, অতি সাধু প্রস্তাব। কিন্তু হে মহাপশু, ভোজোত্তর ভাষণ—অর্থাৎ কিনা শিষ্ট ভাষায় যাকে বলে 'আফটার-ডিনার স্পীচ্'—সেটি আপনার প্রস্তুত আছে কি?

সিংহের ক্ষিদেতেষ্টা চমকে গেল। উপায় থাকলে মাথাটা বারকয়েক চুলকে নিত, কিন্তু তার তো হাতই নেই। হরিণ আবার বললে, সেই বক্তৃতাটি যদি আপনার কণ্ঠস্থ থাকে,

ভাববেন না বেয়াই, খাবার সঙ্গে নিয়ে এসেছি

তা হলে আপনি আসুন, আমি আপনার রাজকীয় বদনে—

আর বলতে হল না। তার আগেই একটি বিরাট লাফ এবং তীরবেগে সিংহের তিরোধান।

স্বল্পভাষী জাত ইংরেজের পক্ষে বক্তৃতা হয়তো বিভীষিকা—কিন্তু আমরা বাঙালীরা ও ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও বিচলিত নই। বক্তৃতা দিতে আমরা ভালোবাসি, বক্তৃতা শোনবার অনুরাগ আমাদের আরো প্রবল। আমরা কি অশন, কি ভাষণ—সমস্ত মৌখিক ব্যাপারেই অত্যন্ত উৎসাহী, জানি—মুখ থাকলেই মুখরিত হওয়া আমাদের একটা ঐশ্বরিক কর্তব্য।

অতএব, বক্তৃতায় আমরা বিচলিত নই। কিন্তু সেই পোলাও—সেই লুচি!

ডাক্তারেরা নাকি বলেন, বেশি নেমন্তন্ন খেলে থ্রম্বসিস্ হয়। আমার ধারণা না খেলেও হয়। ট্রামে চাপলে থ্রম্বসিস হয়, ট্রামে না চাপলেও হয়; রাস্তায় বেরুলে থ্রম্বসিস হয়, না বেরিয়ে ঘরে শুয়ে থাকলেও হয়। হাসতে হাসতে থ্রম্বসিস হয়, কাঁদতে

কাঁদতে হলেও বাধা নেই। মোট কথা থ্রম্বসিস কিসে হয় না, সেই তত্ত্বটাই আমি এখনো বুঝতে পারি নি। মিথ্যে নেমন্তন্নকে বদনাম দিয়ে লাভ নেই।

কিন্তু সেই লুচি—সেই পোলাও। সেই ছাঁচড়া, সেই মাছের কালিয়া, সেই মাংসের কারী।

খাওয়া-দাওয়ার পর, নিজের জুতোটি পায়ে দেবার স্বস্তিতে শেষ বাসে চেপে কিংবা ট্যাক্সি করে গৃহে প্রত্যাবর্তন। বিছানায় শুয়ে কেমন একটা অস্বস্তি, গায়ের ভেতরে একটা জ্বালা, দুঃস্বপ্নে ভরা খানিকটা ঘুম—তারপর রাত দুটোয় চক্ষু উন্মোধন। তখন গলা জ্বলছে, বুক জ্বলছে, অম্বলের ঢেঁকুর উঠছে। পান খেতে গিয়ে জিভটা যে পুড়ে গিয়েছিল, সে তথ্যটিও আর অজানা নেই।

বলবেন, না খেলেই হত গণ্ডেপিণ্ডে। মশাই, কুপথ্যের লোভ যদি অত সহজেই সামলানো যেত, তা হলে মানুষের আর দেবতা হতে বাধা ছিল কিসের? দু-দুবার চারতলা পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠে শুনেছি 'জায়গা নেই'—প্রায় তাড়া খেয়েই নেমে এসেছি। তৃতীয়বারের সাফল্যে আর কিছু খেয়াল থাকে? তিনদফা পরিশ্রমে খিদের অবস্থাটাও ভাবুন।

আরো কথা আছে। উপহার? সম্পর্ক আর পরিচয় বুঝে দু টাকা থেকে বত্রিশ টাকা পর্যন্ত সেই দক্ষিণান্ত? কিছুই উশুল হবে না?

তার চাইতে এই ভালো। এই গেস্ট কন্ট্রোল। অনুপ্রাণিত প্রাণন-শাসন। অম্বলের হাত থেকে বাঁচা গেল, অপব্যয়ের হাত থেকেও।

কিন্তু সত্যিই কি ভালো হল? একদিন নেমন্তন্ন খেয়ে তিনদিন বাধ্যতামূলক অনাহার, কিংবা কেউ কেউ যেমন বলেন— করোনারী থ্রম্বসিসে লোকান্তর লাভ, তাতে কি অন্নশালার আরো বেশি সমৃদ্ধি হত না? ব্যাপারটা অনুধাবন করুন।

আর কিছু জানবার নেই, একমাত্র প্রশ্ন : ক্যানটেঙ্কেরাস কে?

'ডিস্ট্রিক্ট টাউন যখন তখন মোটামুটি সবই আছে ধরে নিচ্ছি—বাজার, ইস্কুল, হাসপাতাল—' প্রশ্নের সাফাইয়ে ব্যাখ্যা জুড়ল অলকেশ : 'কিন্তু উকিলদের মধ্যে ক্যানটেঙ্কেরাস কে এ আগে থেকে জানা না থাকলে অসুবিধে হতে পারে।'

সিনিয়র সাবজজ দুর্গানাথ হাসতে লাগলেন। বললেন, 'ওদের আবার জিজ্ঞাস্য, কোন হাকিমটা গ্যারুলাস? কোনটা ডেফ-য়্যান্ড-ডাম্ব? কোনটা ব্লকহেড?'

'তা ওরা জানুক। স্টেশনে হাকিম আর কটা? আর উকিল? এক মাঠ পঙ্গপাল, গুনে শেষ করা যাবে না।' অলকেশ ব্যস্ততার ভাব দেখাল : 'আপনি তো অনেক দিন ধরে আছেন, সবাইকে চেনেন, দিন না নাম কটা, টুকে রাখি। ফোরওয়ার্নড ইজ ফোরআর্মড—'

'নতুন এসেছ, মন ওপেন রাখো। প্রিজাজ করা ঠিক নয়।' অভিজ্ঞতার নিটোল গলায় বললেন দুর্গানাথ : 'ব্যবহার করতে করতেই জানতে পারবে।'

'ব্যবহার করতে-করতে!' হাসল অলকেশ : 'তারই জন্যে বুঝি উকিলদের ব্যবহারজীবী বলে।'

হ্যাঁ, আদালত দু পক্ষেরই শিক্ষালয়।

কোর্টের টানা বারান্দা দিয়ে দুর্গানাথ নেজারতের দিকে যাচ্ছিলেন, তাকিয়ে দেখলেন অলকেশের কোর্টে তুমুল কোলাহল।

কী ব্যাপার?

উকিলের সঙ্গে অলকেশের বিতণ্ডা চলেছে। কী নিয়ে বিতণ্ডা? কান সূক্ষ্ম করলেন দুর্গানাথ। তর্ক স্বাভাবিক আইন প্রসঙ্গ নিয়েই। কেউ কারু ব্যাখ্যা মানতে চাইছে না। এই নিয়ে কাটাকাটি।

'তা কী করে হয়?'

'কেন হবে না? এই দেখুন না লাহোর কী বলছে।'

'দুত্তোর লাহোর।' ভূভারতে আর আপনি জায়গা পেলেন না?'

'জায়গা যাই হোক, আইনের ইন্টারপ্রিটেশানটা দেখতে দোষ কী?'

'অত দূরে কে যায়। যে অর্থটা সহজ, স্পষ্ট—'

'সহজ আর স্পষ্ট কথাই তো অনেকের মাথায় ঢোকে না।'

'তাতে আর সন্দেহ কী। নইলে—'

'তা তো বটেই। নইলে—'

দুর্গানাথ চলে গেলেন নিজের কাজে।

টিফিনের সময় ডেকে পাঠালেন অলকেশকে।

'উকিলের সঙ্গে ঝগড়া করছিলে দেখছিলাম—' সানুকম্প দৃষ্টি ফেললেন দুর্গানাথ : 'তুমি পারবে নাকি ওদের সঙ্গে?'

'দেখুন না কী ইমপসিবল কাণ্ড। লাহোর-রেঙ্গুন দেখায়!'

'তা যা খুশি দেখাক, তুমি চোখ বুজে দেখে যাও। কথা বলো কেন?'

'যা-নয়-তাই ব্লাফ দিয়ে যাবে আর তাই মুখ বুজে সহ্য করব? অসম্ভব।'

'চোপায় পারবে তুমি? তর্কে পরাস্ত হবার জন্যে মক্কেল ওকে পয়সা দিয়েছে?' দুর্গানাথ গম্ভীর হলেন : 'তা ছাড়া ওর কত সুবিধে। ও দাঁড়িয়ে আছে, আর তুমি বসে। দাঁড়ানোর সঙ্গে বসা পারে? দাঁড়িয়ে ও হাত-পা ছুঁড়তে পারে, টেবিলে ঘুষি মারতে পারে, ইচ্ছে হলে একটা বই ছুঁড়তে পারে—বসে-বসে তুমি কিছুই করতে পারো না।'

'একটা পেপারওয়েট ছুঁড়তে পারি। চাপরাসীকে বলতে পারি বার করে দিতে।'

'না, না, তুমি ওসব করবে কেন?' দুর্গা-

মাথ গভীরে গেলেনঃ 'তুমি শুধু কলমে মারবে।'

অলকেশকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। কদিন পরে ফের হিমাংশু মুখুজ্জের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে।

হিমাংশু তো কাঁচা জুনিয়র। বছর খানেক বেরুচ্ছে। তার সঙ্গে এমন কী সংঘর্ষের সম্ভাবনা!

সরেজমিন তদন্ত করে কমিশনার রিপোর্ট দিয়েছে। তার বিরুদ্ধে অবজেকশান পড়েছে। সেই অবজেকশানের শুনানীর দিন আজ। বার তিনেক মুলতুবি নিয়েছে হিমাংশুর মক্কেল। আজ আর মুলতুবি নয়। ডাকো উকিলদের।

হিমাংশু বললে, 'মাই সিনিয়র ইজ অন হিজ লেগস ইন য়্যানাদার কোর্ট—'

দাঁতে দাঁত দিয়ে রাগ দমন করল অলকেশ: 'তার আমি কী করব?'

'একটা শর্ট য়্যাডজোর্নমেণ্ট দিতে হয়।'

'কই কোনো পিটিশান তো দেখছি না?'

খস খস করে একটা সোয়া বারো আনার পিটিশান লিখে ফেলল হিমাংশু।

পত্রপাঠ রিজেক্টেড। ঢের মুলতুবি দেওয়া হয়েছে, আর নয়।

হিমাংশু তো থ।

'সিনিয়র না থাকে, আপনিই তো আছেন।' অমলেশ আমীরী চালে বললে, 'আপনিই আর্গু করুন।'

'সিনিয়রই সমস্ত বিষয়ে পোস্টেড, আমি কী জানি।'

'জানেন না তো ওকালতনামা সই করেছেন কেন?'

'আমি তৈরি নই, স্যার—' জজের তলা থেকে হিমাংশু বললে।

'তৈরি নন কেন? তৈরি নন তো মরুন। আপনার অবজেকশান ওভাররুল্ড হবে। মরতে তো আর তৈরি হতে লাগে না।'

'তবে, বেশ, রিপোর্টটা একবার পড়েনি। অন্তত ওইটুকু সময় তো দেবেন—'

'তা দিতে পারি।'

'তবে কাইন্ডলি রেকর্ডটা দিন—' কোর্টের দিকে হাত বাড়াল হিমাংশু।

'রেকর্ড দেব মানে? আপনারা কপি নেন নি?'

হিমাংশু মক্কেলের দিকে তাকাল। মক্কেল বললে, কপি নেবার টাকা সিনিয়রকে দেওয়া হয়েছে। তা তিনি নিয়েছেন কিনা বলতে পারি না।

'যাই হোক, কপি নেই। সুতরাং আদালতের নথিটাই দরকার।'

'আদালতের নথি আপনাকে দিলে আমি দেখি কী, আমি কী ফলো করি?' অলকেশ দৃঢ় হল: 'আই ক্যানট পার্ট উইথ মাই রেকর্ডস।'

'এ হাইহ্যাণ্ডেডনেস অসহ্য।' হিমাংশু ফেটে পড়ল।

'হোয়াট ডু ইউ মিন? কথাটা উইথড্র করুন বলছি।' অলকেশও ততোধিক ফাটল।

'আমি বলতে চাচ্ছি—আমাকে আগে শুনুন—'

'কোনো কথা শুনব না। কথাটা উইথড্র করুন। নচেৎ নিজেই উইথড্রন হোন।'

'বেশ, আমিই চলে যাচ্ছি।' কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেল হিমাংশু। বলতে-বলতে গেল: 'উকিলের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে না।' বারান্দায় এসে হুংকার ছাড়ল: 'আমি এর শোধ নেব।'

এর পর যে জায়গায় বদলি হয়ে এল অলকেশ, সেটা একটা সুদূর শহর—এত দূরে, যেখানে এখনো ইলেকট্রিসিটি পৌঁছয়নি। যেখানে কয়লা নেই, কাঠে রান্না হয়। খবরের কাগজ দেড় দিন পরে আসে। বেশির ভাগ রাস্তাই কাঁচা, বৃষ্টি হলেই খাল-প্যা। আর যত্রতত্র সাপ, আনাচে-কানাচে, শিকে-রেলিঙে, মশারির দড়িতে।

অলকেশ তখন অনেক শান্ত হয়েছে। ফিলজফিক্যাল ভিউ নিতে শিখেছে। কথা কম কইছে আর হাসছে মৃদু মৃদু।

কিন্তু পাশের কোর্টেই এ কী তুমুল তাণ্ডব!

হাকিম চেঁচিয়ে উঠেছে: ওয়াক আউট অফ মাই কোর্ট।

কী ব্যাপার?

ব্যাপারটা লঙ্কাদহন।

পুরানো একটা মামলার আর্গুমেণ্ট করছিল উকিল। নিশাপতি বাগচী। হাতে-ধরা কতগুলো টাইপ-করা কাগজ, তার থেকে সাক্ষীদের জবানবন্দী পড়ছে আর টিপ্পনী ঝাড়ছে।

আপনি বেরিয়ে যান আমার কোর্ট থেকে

'কিসের থেকে পড়ছেন?'

'টাইপস্ক্রিপট থেকে।'

'এ পেলেন কোথায়?'

'যেখান থেকেই পাই না কেন, কোর্ট হ্যাজ নো বিজিনেস টু এনকোয়ার—'

'এ তো সার্টিফায়েড কপি নয়। এ সারেপটিসাস কপি।'

'তা নিয়ে আপনার কী দরকার?'

'একশোবার দরকার। কোন টাইপিস্ট আপনাকে এ চোরাই কপি সাপ্লাই করল, তা জানতে হবে। দয়া করে কাগজগুলো আমাকে দিন।'

'আপনি আমাকে চোর বলছেন?' নিশাপতি ফোঁস করে উঠল।

'আপনাকে কিছু বলছি না। বলছি মালটা চোরাই। দিন দেখি—' হাত লম্বা করল হাকিম।

'আমার হাতের কাগজ চেয়ে নেবার আপনার কোন রাইট নেই। এই কাগজ আমি পকেটে পুরলাম। পারুন তো পকেট থেকে নিন—'

'বা, আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পিউরিটির জন্যে কোর্টের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না?'

'বললাম তো পকেট থেকে নিন—'

সঙ্গে-সঙ্গেই হাকিম গর্জে উঠল: 'আপনি বেরিয়ে যান আমার কোর্ট থেকে।'

হইহই রইরই কাণ্ড।

'কোন কোর্ট?' সন্ত্রস্ত চোখে পেস্কারকে জিজ্ঞেস করল অলকেশ।

'সেকেণ্ড মুন্সেফ স্যার, হিমাংশু মুখুজ্জে।'

'হিমাংশু? ও তো ডিরেক্ট রিক্রুট নয়, ও তো বার থেকে এসেছে।'

একটা কুকুর স্টেশনের হাতায় ঘুরছে

'তারই জন্যে বুঝি কান্নাপাহাড়।'

হিমাংশুকে ডাকাল অলকেশ।

'তুমি এটি কী করলে? কাক হয়ে কাকের মাংস খেলে?'

'নইলে কী করতে বলেন?'

'আহা, উইংক-অ্যাট করবে। দেখেও দেখবে না। চোখ অন্য চিন্তায় মগ্ন, নাকের ডগায় কী হচ্ছে দেখতেও পাবে না।'

'রাখুন।'

'শত হলেও তুমি উকিল ছিলে, তুমি যদি এদিক-ওদিক ওদের একটু না দেখ—'

'এখন শীল্ডের আরেক দিক দেখছি। উপরে বসে যেটা দেখা যায়, নীচে দাঁড়িয়ে সেটা দেখা যায় না।'

'কিন্তু লাভ কী! পপুলারিটির সার্টি-ফিকেট পাবে না। এযুগের সবচেয়ে দামী সার্টিফিকেট হচ্ছে পপুলারিটি। আহা, অফিসর-পপুলার কিনা। এফিসিয়েণ্ট কিনা নয়, পপুলার কিনা।'

'যে ডেফিসিয়েণ্ট, সেই পপুলার।'

ও-পক্ষের তোড়জোড় কী রকম?

সভা-সমিতি করছে, শোভাযাত্রা করছে, বয়কট করছে, হিল্লি-দিল্লি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে।

'কী না জানি হবে!' শোকাকুল মুখ করল অলকেশ। সে এখানকার সিনিয়র মুন্সেফ, কোর্টেও প্রথম মুন্সেফ, তারই এখন এনকোয়ারি করতে হবে, রিপোর্টিং করতে হবে। তারই যত কর্মবৃদ্ধি।

'আপনার কাজ কিছুই বাড়েনি দাদা।' একটা খাম হাতে নিয়ে হাসতে-হাসতে হিমাংশু এসে হাজির।

'কী ব্যাপার?'

'বদলির অর্ডার এসে গিয়েছে।'

'আসতে-না-আসতেই বদলি?'

'হ্যাঁ, কথাই আছে, যদি বদলি চাও, উকিলদের সঙ্গে ঝগড়া বাধাও। কথাটা ফলল। বাবাঃ, বাঁচলাম।' হিমাংশু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল: 'এ একটা জায়গা নাকি? ইলেকট্রিক নেই, কয়লা নেই, খবরের কাগজ নেই—'

বোকার মতন তাকিয়ে রইল অলকেশ। কত দিন ধরে সে এই জায়গায় আছে, তার একটা বদলির অর্ডার নেই।

হিমাংশুকে স্টেশনে তুলে দিতে এল অলকেশ।

দেখল রাস্তার একটা কুকুর স্টেশনের হাতায় ঘুরছে। তার গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা প্ল্যাকার্ড ঝোলানো। তাতে লেখা: 'সেকেন্ড মুন্সেফ।'

'দাদা, চোখ অন্য চিন্তায় মগ্ন, নাকের ডগায় কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছে না।'

হাসতে-হাসতে ট্রেনের জানলা থেকে হাত নাড়তে লাগল হিমাংশু।

হিমাংশুকে তুলে দিয়ে শহরে ঢুকতেই রাস্তায় অলকেশ একটা গাধা দেখতে পেল। চমকে উঠল সর্বাঙ্গে। ওর গলায় প্ল্যাকার্ড ঝুলছে নাকি?

না, ঝোলে নি। ঝোলবার সময় হয় নি এখনো।

শ্রীমতী

নিউ ইয়র্ক বিশ্বমেলার উদ্বোধনের পর যেদিন সকালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এসে পৌঁছলেন, সেদিনই দুপুরে এলেন শেখ আবদুল্লা ও তাঁর সঙ্গী-সাথী সব। তাঁদের মত অতিথি ঘরে, আর এতদিন বিদেশে থাকার জমা কাজ, এর মধ্যে মেলার কথা জিজ্ঞাসা করতে যাওয়া উচিত হবে কি না ভাবছিলাম। এদিকে উৎসুক হয়ে আছি, এত বড় বিশ্বমেলায়, বলতে গেলে সারা জগতের সভায় ভারতের অংশ গ্রহণের সাক্ষাৎ-খবরের জন্য। শ্রীমতী গান্ধীই একমাত্র পারেন সে খবর দিতে। ভরসা এল অপ্রত্যাশিতভাবে, যখন জিজ্ঞাসা করলাম, "সময় হবে কি?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়" শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বমেলায় ভারতীয় মণ্ডপ, ভারতের প্রদর্শনীর, আমাদের মেয়ে প্রদর্শনকারিণী বা গাইড, পণ্য প্রদর্শনকারিণী সবের সাফল্যে ভরপুর। গত বছর জুন মাসে ভারতের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হয়, শ্রীমতী গান্ধী তার প্রেসিডেণ্ট। কাজেই সমস্ত ব্যবস্থার সাফল্যের সঙ্গে যে তাঁর গভীর যোগ।

২২শে এপ্রিল সকাল ১০টায় বিশ্বমেলার উদ্বোধন করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট জনসন। তিনি ছাড়া বক্তৃতামঞ্চে ছিলেন মাত্র মেলার অধিনায়ক শ্রীযুক্ত মোজেজ, নিউ ইয়র্কের গভর্নর নেলসন রকফেলার, মেয়র রবার্ট ওয়াগনার ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। একমাত্র অ-মার্কিন ও একমাত্র মহিলা। তিনি ভারতের বিশিষ্ট দূত—Special envoy! সমস্ত বিদেশী প্রদর্শনীকারদের তরফ থেকে মোজেজ সাহেব তাঁকে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী।

শ্রীমতী গান্ধী বলছিলেন, সকলের মনে আশঙ্কা হয়েছিল, ভারতের মণ্ডপ বুঝি বা এই লক্ষ কোটি মুদ্রার বিরাট আয়োজনে আশে পাশে কোটি কোটি মুদ্রাব্যয়ের সব চমকপ্রদ বাহারের অভিনবত্বের মধ্যে হারিয়েই যাবে। অথচ আশ্চর্য, ভারতের প্যাভিলিয়ন তার স্বাতন্ত্র্যে সকলের চেয়ে আলাদা বলেই তার সৌন্দর্য দলে দলে লোক আকর্ষণ করছে। ভারতীয় পথপ্রদর্শনকারিণীদের সৌজন্যে সবাই মুগ্ধ! সৌজন্যের অভাব তো কোথাও নেই, তবু ভারতবাসিনীর কোথাও হয়তো একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা আমাদের চোখে পড়ে না। মণ্ডপ ও তার পরিবেশ যেন ভারতবর্ষের একটি প্রতিচ্ছায়া। সারা জগতের সামনে তার ঐতিহ্য, আবহমান কালের অলিখিত রীতি আর শিল্পপ্রয়াস, নূতন যুগের ক্রমবিকাশ একত্র করে ছোট একটি পেটিকায় পরিবেশন করা হয়েছে। মণ্ডপগৃহটি পর্যন্ত "Is an ancient theme interpreted in the modern way" প্রাচীন রচনা-শৈলীর আধুনিক ব্যঞ্জনা! মূল মণ্ডপ সংলগ্ন ভোজনালয়টি পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় রূপসজ্জার প্রকাশ। ভোজনালয় বা রেস্টুরেণ্টের ছাদটি মাউণ্ট আবুর দিলওয়ারা জৈন মন্দিরের বিরাট ফোটোগ্রাফ। রাত্রে জ্বল্ জ্বল্ করে, মনে হয়, যেন একটি গম্বুজ! মেলায় ৬৮টি রেস্টুরেণ্ট আছে। কোথাও বা সাড়ে তিন ডলার দিলে যতক্ষণ ইচ্ছা বসে, যত ইচ্ছা খাওয়া চলে, কোথাও বা ৯৯ সেণ্ট দিলে সাত কোর্স চীনে খাবার মেলে, তবু ভারতীয় ভোজনালয়ের জনপ্রিয়তা পাচক-পরিবেশকরা একেবারেই সামলাতে পারছে না। শ্রীমতী গান্ধী বলছিলেন, সেখানে আরও লোকের, আরও সাহায্যের হাতের বিশেষ দরকার। সোনালী কার্পেট দিল্লিতে বোনা, আলোর রং যেন আরও মোহময় মনে হচ্ছে, পরিবেশকের

আয়না বসানো মাটির দেওয়াল আর দুটি গাইড মেয়ে
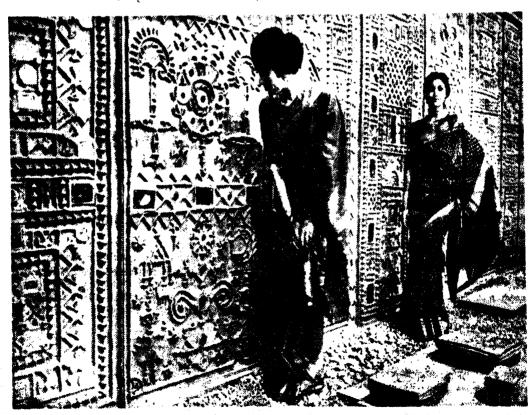
মাথায় সোনালী শিরস্ত্রাণ আর কোট একেবারে সোনায় মোড়া, তার উপর তন্দুরী মুরগী আর মাছ, পোলাও আর কারি, ফুলকি আর চাপাটি পশ্চিমের কাছে তো প্রাচ্য-জগতের স্বপ্ন বললেই হয়। কাঁটা-চামচের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তন্দুরে মুরগীর রসাস্বাদে হাত না লাগিয়ে কি চলবে?

মণ্ডপটি দোতলা। নীচে কাঁচে ঘেরা বলে প্রদর্শনীর সব জিনিস আর আলোর রং যেন একাকার। বর্ণাঢ্যতাই যেন বিশেষত্ব। অদূরে মার্কিন প্যাভিলিয়নের সবুজ আর হলদে ছায়া পড়েছে ভারতের মণ্ডপসংলগ্ন কৃত্রিম জলাশয়ে, তার উপর চোখে ভাসে আমাদের মণ্ডপের তিনটি প্রধান রং বালুকাধবল, সোনালী আর গভীর গাঢ় নীল। নীচের তলার কিছু অংশে বিক্রয়ের জন্য ভারতের হস্তশিল্পজাত পণ্য সাজানো, বাকী সবটাই ভারতের ঐতিহ্য আর কৃষ্টির রূপক, ভারতের অতীত আর বর্তমান আর ভবিষ্যতের আশা একসূত্রে গাঁথা। ২১শে এপ্রিল সাংবাদিকদের ভারতের মণ্ডপ দেখাবার সময় শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন—This is the biggest attempt to project the image of modern India abroad."

ভারত-সভ্যতার ইতিহাস রচনায় কেউ বাদ যায়নি। মিউজিয়মের মূল্যবান মূর্তিও আছে, আবার গ্রামের মেয়ের হাতের অপূর্ব লোকশিল্পের নিদর্শনও আছে। যেখানে উপরে যাবার চলমান সিঁড়ি বা Escalader আছে, তাকে আড়াল করেছে একটি অপূর্ব লোকশিল্পের নিদর্শন—গুজরাটের গ্রামের দুটি মেয়ের রচনা। কাঁচ-বসানো দেওয়াল—মাটির গড়া। আজকাল কাথিওয়াড়ী কাজের প্রচলন সর্বত্র, বটুয়াতে, জামাতে, এমনকি, টেবিল-ঢাকা, কুশন-ঢাকা প্রভৃতিতেও ছোট্ট ছোট্ট আয়না বসানো নক্শা সমাদৃত হয়েছে। এই ছোট্ট আয়না বসানো নক্শা যদি মাটির দেওয়ালে হয়, তবে কেমন হয়, কল্পনা করুন তো! গুজরাটের কোন কোন গ্রামে এটি একান্ত-ভাবে পল্লীর মেয়ের লোকশিল্প, যেমন আমাদের কাঁথা আর আল্পনা। কুটীরের মাটির দেওয়ালে নকশা কেটে, ছোট আয়না বসিয়ে কুটীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়াস; দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও শিল্পের সমন্বয়। পাশ্চাত্য দর্শক দাঁড়িয়ে দেখে অবাক হয়ে যায়। এই আমাদের ভারতবর্ষ, আমাদের অর্থ নেই, কিন্তু রূপ-রস গ্রহণ করবার শক্তি আছে, সময় একটু আছে। দুদণ্ড অপেক্ষা করে জীবনের স্পর্শ অনুভূতির অবসর আছে, এখনও পরিপূর্ণভাবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ হয়নি, অন্তত সর্বত্র নয়। এভাবেই ভারতের লোকশিল্প দর্শককে আকর্ষণ করছে অদ্ভুতভাবে। শ্রীমতী গান্ধী বললেন, নেহাত মণ্ডপ-

সাজার অংশ হিসাবে রাখা হয়েছিল দু-গণ্ডাটি আঁকিয়ার রং-করা মাটির ঘোড়া, পশ্চিম ভারতের লোকশিল্প। কেউ-বা এসে কিনে নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে, কেউ-বা রঙীন ঘোড়ার সওয়ার হয়ে ফটোগ্রাফ তুলতে গিয়ে ঘোড়া ভেঙে ফেলছে! এমনি করে গুটি দু-তিন ঘোড়া গেছে। এখন যদি এই মাটির ঘোড়া পাঠানো সম্ভব হয় আর বিক্রি করা যায়, তবে হয়তো তাদের কৌতূহল কমবে। কিন্তু এতদূরের পথ আর এই ভঙ্গুর বিরাট ঘোড়া যাবে কি করে।

বিক্রয়ের জন্য আছে মাত্র দশমাংশ স্থান! সেখানে বিক্রয়ের আয়োজন যথেষ্ট হওয়া সম্ভব নয়, তবু ভালভাবে কাজ চলেছে। ছোট জিনিসের চাহিদা খুব। নিউ ইয়র্ক-বাসীরা প্রদর্শনী উদ্বোধনের প্রথম ভিড়ে বিদেশীদের জন্য পথ ছেড়ে দিয়েছেন। দু' বছর ধরে প্রদর্শনী হবে, কাজেই তাঁরা দেখবেন ধীরেসুস্থে, অবকাশমত। আশা করা যায়, তখন বড় এবং মহার্ঘ সামগ্রীর বেচাকেনা হবে। প্যাভিলিয়নের অংশ ছাড়া যে-সব ভারতীয় পণ্য বিপণি আছে, তাদেরও বেচাকেনা ভালই হচ্ছে। শাড়ি সম্বন্ধে অপার কৌতূহল। যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় দূতের পত্নী শ্রীমতী বি কে নেহরু শ্রীমতী গান্ধীকে বলেছেন, "How to drape a Saree" বলে ছোট্ট একটি সচিত্র পুস্তিকা স্তূপাকারে রেখেও সামলানো যাচ্ছে না। যে আসছে, সেই একখানা তুলে নিচ্ছে! পশ্চিমের মহিলাসমাজ এতদিন দূর থেকে শাড়ির সৌন্দর্য সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতেন, এবার হয়তো একান্ত নিজস্বভাবেও মাঝে মাঝে পেতে চাইবেন।

নিউইয়র্ক মেলায় প্রদর্শিত বাঞ্জারা পুতুল

বাংলাদেশের শিল্পের মধ্যে ঢোকরা পুতুল ও মূর্তি বিশেষ সমাদর পাচ্ছে। বহু মূর্তি পাঠানো হয়েছে, হয়তো আরও যাবে। ঢোকরা আদিবাসী ভারতবর্ষে বহু জায়গায় ছড়ানো। তার মধ্যে বর্ধমান জেলায় একটি অঞ্চলে কিছু ঢোকরা বাস করে। চারদিকের সমাজ থেকে আলাদা হয়ে বেদের মত জীবন কাটায় এরা, তার অন্যতম কারণ, এতদিন তাদের অস্পৃশ্য জ্ঞান করা হতো। তাদের তৈরী অভিনব পিতলের মূর্তি ও খেলনা আজ তথাকথিত সভ্যজগতের বিস্ময়।

মণ্ডপের দোতলাটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও আমাদের যন্ত্রশিল্পের উন্নতির প্রতীক হিসাবে সাজানো হয়েছে। স্থানাভাবে মণ্ডপের পাশে শামিয়ানায় ফ্যাশান শো বা প্রামাণিক চিত্রপ্রদর্শন ইত্যাদি চলেছে। সুন্দরী, কর্মতৎপর গাইড মেয়েদের বিন্দুমাত্র অবসর নেই। হাজার হাজার দর্শক উদ্বোধনের দিন ভারতের প্যাভিলিয়নে এসেছিলেন। সেদিন বৃষ্টির জন্য সহজে দর্শক দল মণ্ডপ ত্যাগ করতে পারেন নি, তবু আমাদের পথ-প্রদর্শনকারিণী-দল নিপুণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের রেশমী শাড়ির বাহারে আর চটপটে ব্যবহারে সর্বজন মুগ্ধ। তাঁদের নীল ময়ূর আঁকা গোল ব্যাজটি পর্যন্ত হস্তশিল্পজাত। দিল্লির এক অখ্যাত গলি, নাম নাকি "পার্ভাল গলি", সেই পার্ভাল গলির এক অজানা কারিগর হাতে করে তৈরী করেছে একশত পঞ্চাশটি ব্যাজ। ভারতের জাতীয় পক্ষী ময়ূর, কাজেই ব্যাজে এ-প্রতীক সুপরিকল্পিত।

সমস্ত ভারতবর্ষ ছেঁকে ২০টি গাইড মেয়ে নেওয়া হয়েছে। দরখাস্ত আহ্বান করার পর হাজার হাজার দরখাস্ত আসে ও ১১৮টি মেয়েকে নির্বাচক কমিটির সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই বিশজন সৌভাগ্যবতীকে সেই ১১৮ জনের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া। সম্প্রতি রাজ্যসভায় এদের যোগ্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছিল। এঁরা অনেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ থেকে এসেছেন ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কাজ করেছেন। দুঃখের বিষয়, একটিও বাঙালী মেয়ের নাম চোখে পড়লো না।

হ্যান্ডলুম ও হ্যান্ডিক্রাফটসের নির্বাচন আলাদা হয়েছিল। তাতে কলকাতা থেকে শ্রীমতী সোনা অধিকারী ও সুমিতা বোস
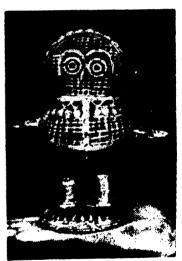
ঢোকরা শিল্প লক্ষ্মী প্যাঁচা
এও নিউইয়র্ক মেলার যাত্রী

নিউ ইয়র্ক মেলায় কাজ করছেন। এঁরা অবশ্য প্রদর্শনী সজ্জা সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা আগেই পেয়েছেন। তবে মেলা শুরু হবার কিছুদিন পূর্বে নূতন দিল্লিতে নির্বাচিত মেয়েদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ display-র কাজ করেছেন আর্টিস্ট শ্রীযুক্ত বড়ুয়া এবং শ্রীমতী রত্না মাথুর ফাব্রি। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে প্রদর্শনীর দৃশ্য-সজ্জার কাজ করতে দেখেছি এঁদের বহুদিন থেকে। সার্থক হয়েছে, সব পরিশ্রম! বহু গুণীজনের প্রশংসা লাভ করেছে ভারতীয় প্যাভিলিয়ন।

চিত্রপ্রদর্শনী

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিতা যদি লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী হন তাহলে সন্তানের প্রতিভা সহজে স্বীকৃতি লাভ করে না। রথীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সম্প্রতি রবীন্দ্র ভারতী কর্তৃক আয়োজিত তাঁর ছবি ও কারু-শিল্পের একটি প্রদর্শনী দেখতে দেখতে সেই কথাটাই আর একবার মনে হল।

প্রদর্শনীতে রথীন্দ্রনাথের ৫৬টি ছবি এবং অনেকগুলি কারুশিল্পের নিদর্শন (সব কাঠ এবং চামড়ার কাজ) ছিল। এগুলি দিয়ে প্রদর্শনীকে সাফল্যমণ্ডিত হতে সাহায্য করেছিলেন শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর এবং শ্রীনিকেতনের কর্তৃপক্ষ। ছবিগুলি সব জল রঙে আঁকা এবং হয় নিসর্গ চিত্র নয় ফুলের ছবি। এগুলিতে তিনি তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং নিখুঁত ড্রইং জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত কাছ থেকে এবং বেশী খুঁটিয়ে দেখার ফলে ছবিগুলি, বিশেষ করে ফুলের ছবিগুলি, কেমন যেন বোটানিক্যাল ড্রইংয়ে পরিণত হয়েছে। হতে পারে তাঁর কৃষি-বিদ্যায় শিক্ষা এর জন্য দায়ী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর ছবির বর্ণবৈচিত্র্য এবং প্রাণ প্রাচুর্য সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করে। তাঁর দু-একটি কাজ তো বেশ উঁচুদরের (যেমন ৪৬)। এগুলিতে কিছুটা চীনা ও জাপানী প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর ফুলের ছবিতে অনেক দেশী ও বিদেশী ফুল স্থান পেয়েছে। দেশী ফুলের মধ্যে এমন অনেক অখ্যাত অজ্ঞাত ফুল আছে যার নামই হয়ত কলকাতাবাসীরা শোনেন নি।

কিন্তু তাঁর প্রতিভার প্রকৃত স্ফুরণ ঘটেছে কারুশিল্পে। এগুলির মধ্যে তিনি এমন সৃজনী ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন যার তুলনা মেলা ভার। নিত্যব্যবহার্য প্রায় প্রতিটি জিনিস তিনি তৈরি করেছেন নিজে হাতে—নুন লঙ্কার গুঁড়ো রাখার সছিদ্র ছোট্ট কাঠের কৌটো থেকে শুরু করে কলমদানি, পাউডারের বাক্স, সিগারেট কেস, ফোটোগ্রাফ কেস, কাস্কেট, জুয়েল বক্স, চায়ের ট্রে, হাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এমন দাবার ছক ঘুঁটি সমেত, বড় টাইপরাইটারের কেস, ইলেকট্রিক ল্যাম্প, কী নয় এবং প্রতিটি জিনিস তাঁর বিচিত্র উদ্ভাবন শক্তি এবং অসাধারণ কারিগরি ক্ষমতার পরিচয় দেয়। কোথাও কোথাও কাঠের ওপর গর্ত করে-ছোট ছোট কাঠের টুকরো সাজিয়ে (inlay) মানুষ, পশুপাখি অথবা নিসর্গ চিত্র এঁকেছেন, এগুলির রূপ বৈচিত্র্য

কাঠের কাজ (inlay) শিল্পী : রথীন্দ্রনাথ
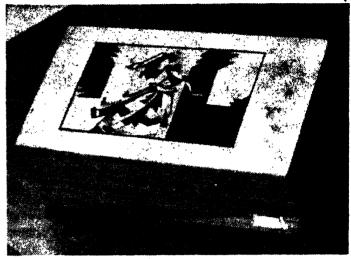
লক্ষণীয়। আবার কখনও কাঠের ওপর রঙ প্রয়োগে নানা ডিজাইন চিত্রিত করেছেন। দু-একটি ক্ষেত্রে কাঠের স্বাভাবিক grainকে এমন সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন যে বোঝাই যায় না এগুলিতে তিনি কোন রঙ লাগাননি। তাঁর কাঠের কাজের মত তাঁর চামড়ার কাজগুলিও (বুক কভার, অ্যালবাম কভার, লেখার প্যাড ইত্যাদি) তাঁর শিল্প প্রতিভা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। কত যত্নে এবং নিষ্ঠায় তিনি এগুলিকে সম্পন্ন করেছিলেন তা দেখলেই বোঝা যায়।

প্রদর্শনীটির আয়োজন করে রবীন্দ্র-

একটি নিসর্গ চিত্র   শিল্পী : রথীন্দ্রনাথ

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

জৈন শিল্প

সম্প্রতি ভগবান মহাবীরের ২৫৬৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত-জৈন মহামণ্ডল কর্তৃক জৈন শিল্পের একটি প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ। গত দু-হাজার বছরের ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা কিভাবে জৈনধর্ম কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিল সাধারণ দর্শককে সে সম্বন্ধে অবহিত করাই ছিল এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলার নিদর্শন (যা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে) প্রধানত উপস্থাপিত করা হয়েছিল আলোকচিত্র মারফৎ। প্রতিটি আলোকচিত্রের সঙ্গে সাধারণ দর্শকের সুবিধার জন্য পরিচয় লিপি সংযোজিত ছিল। ভারতবর্ষের একটি মানচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন জৈন শিল্প কেন্দ্রগুলির অবস্থান নির্দেশ করা হয়েছিল। জৈন শিল্পের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যাতে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মায় সে সম্বন্ধে চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি।

চিত্রকলা বিভাগে প্রচুর পুঁথি-চিত্রের সমাবেশ হয়েছিল। এই পুঁথিগুলি সবই জৈনধর্ম-বিষয়ক (শেষের দিকে হিন্দু ও বৈষ্ণব ধর্মের কথা-কাহিনী নিয়েও পুঁথি রচিত হত)। পুঁথিগুলি সাধারণতঃ রক্ষিত থাকত জৈন জ্ঞানভাণ্ডারে এবং এগুলি লিখিত ও চিত্রিত হত মঠাধ্যক্ষ অথবা ভক্তিমান শ্রেষ্ঠীদের আদেশ অনুসারে। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এইসব পুঁথি চিত্রিত করার রেওয়াজ হয়। প্রথম প্রথম তালপাতার উপরেই লেখা ও ছবি আঁকা হত। তারপর কাগজের প্রচলন হলে (চতুর্দশ শতকের শেষে) তালপাতার স্থান নিল কাগজ; কিন্তু পুঁথির আকার একই রইল অর্থাৎ কিনা খাড়াই-এর দিকে কম এবং পাশের দিকে বেশী। এইভাবে যে এক নতুন চিত্র শৈলী গড়ে উঠল তার নাম গুজরাটি অথবা পশ্চিম ভারতীয় শৈলী। এই গুজরাটি চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল তীক্ষ্ম তীর্যক রেখা, উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার, প্রচুর সোনার কাজ এবং মানুষের মুখাকৃতি আঁকার ব্যাপারে কতকগুলি ফর্মুলার প্রয়োগ, যেমন—লম্বা নাক, দু ভাঁজ করা চিবুক এবং মুখের সীমা থেকে বেরিয়ে আসা একটি চোখ (যেটি দর্শক থেকে দূরে)। অনেকেই মনে করেন এবং এরকম মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, এই চিত্রকলার উদ্ভব হয়েছিল ক্ল্যাসিকাল অজন্তা এবং বিশেষ করে ইলোরার চিত্রকলা থেকে। প্রায় পাঁচশ বছর ধরে এই চিত্রশৈলী সারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ছিল, তারপর রাজপুত শৈলীর আবির্ভাবের সঙ্গে (যার মূলে এর অবদান অল্প নয়) এর প্রভাব দ্রুত কমে আসে। এর পরে যেসব জৈন পুঁথি চিত্রিত হত সেগুলি রাজপুত শৈলীতেই চিত্রিত হত। বর্তমান প্রদর্শনীতে সবরকমের নিদর্শনই স্থান পেয়েছিল

এই প্রদর্শনীটির আয়োজন করে ভারত-জৈন-মহামণ্ডল ভারত শিল্পের এক অবহেলিত শাখাকে তুলে ধরেছেন জনসাধারণের সামনে।

সলিল ভট্টাচার্য

গত ২৭শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে আকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ শিল্পী সলিল ভট্টাচার্যের ছবির একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। সব সমেত ১৫টি ছবি স্থান পেয়েছিল প্রদর্শনীতে, সবগুলিই তেলরঙে আঁকা এবং সবগুলিই উৎকট রকমের 'আধুনিক'।

এই 'আধুনিক' চিত্র-কলা সম্বন্ধে আমাদের মতামত আমরা আগেই ব্যক্ত করেছি, কাজেই এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, 'আধুনিকতা' হচ্ছে এক ধরনের ব্যাধি এবং আজকের দিনের বেশীর ভাগ শিল্পীই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। একটা নতুন কিছু করার আকাঙ্ক্ষা থেকে এ ব্যাধির জন্ম কিন্তু দুঃখের বিষয় নতুন কিছু করার ক্ষমতা সবার থাকে না, ফলে আধুনিকতা ও উৎকেন্দ্রিকতা এখন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অদ্ভুত, কিম্ভুত যা-হয়-একটা-কিছু এঁকে তার গালভরা একটা নাম (aspiration, ecstacy, life infinite বা ঐ জাতীয় একটা কিছু) দিয়ে ছেড়ে দিতে পারলেই সে ছবি আধুনিক হয়ে গেল এ রকম একটা ধারনা সবার মধ্যে হয়েছে। আধুনিকতার মাপকাঠি এখন দুর্বোধ্যতা—যে শিল্পী দর্শকদের যত বেশী বোকা বানাতে পারেন তিনি তত বেশী আধুনিক। কিন্তু দর্শক ও সমালোচকরাও আজকাল সেয়ানা হয়ে গেছেন, তাঁরাও আর বোকা প্রতিপন্ন হতে চান না, ছবি দেখার আগেই তাঁরা সেজন্য প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। এইভাবে আধুনিক চিত্রকলার নামে এক বিরাট প্রহসন চলছে এবং আমরা সবাই সে প্রহসন চোখ বুজে উপভোগ করছি।

সলিলবাবুর ছবিতে আধুনিকতার সব কটি লক্ষণ বর্তমান। তাঁর ছবি দেখে বোঝা যায় না কি দেখছি। ছবির ক্যাটালগের সাহায্য নিতে গিয়ে বিড়ম্বনা বেড়েছে বই কমেনি। তাঁর Harmony ছবির সামনে দাঁড়িয়েও আমাদের মনের যে অবস্থা হয়েছে, তাঁর Quest for Life-এর সামনে দাঁড়িয়েও আমাদের মনের ঠিক একই অবস্থা হয়েছে। চোখের সামনে দেখছি বিরাট ক্যানভাস, প্রচুর রঙ ও বিস্তর হিজিবিজি। এইসব হিজিবিজির মধ্যে মনুষ্যরূপের কিছুটা ইঙ্গিত আছে হয়ত কিন্তু সে সব মনে হয়েছে যেন বিকারগ্রস্ত রোগীর কল্পনা। প্রদর্শনী কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে আমরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

ভারতের অর্থনীতি

সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধি

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে আমাদের দেশে দ্রব্যের সাধারণ মূল্য-সূচক যে উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করে তা এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে অব্যাহত ছিল। পাইকারী মূল্যের সাধারণ সূচক (আরম্ভ সাল ১৯৫২-৫৩=১০০) যা আগের দু মাসে শতকরা ২·৫ বেড়েছিল, ফেব্রুয়ারীতে তা শতকরা ১·৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে মাসের শেষে ১৩৮·৮-এ পৌঁছেছে। এক বছর আগে যেখানে ছিল, মূল্য-সূচক তার চাইতে এখন শতকরা ৯·৮ ভাগ উপরে।

ফেব্রুয়ারীতে যার দাম সবচেয়ে বেশী (শতকরা ২·৭ ভাগ) বেড়েছে তা হচ্ছে খাদ্যসামগ্রী; খাদ্যবস্তুর মধ্যে চাল শতকরা ০·২ ভাগ, গম ৮·৮ ভাগ এবং দুধ, ঘি ও খাবার তেল প্রত্যেকটি শতকরা প্রায় ৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের পর শিল্পসামগ্রীর উৎপাদনে লাগে এ রকম কাঁচা মালের মূল্য শতকরা ১·৫ ভাগ, শিল্পদ্রব্যের দাম ০·২ ভাগ এবং জ্বালানি, বিদ্যুৎ-শক্তি ইত্যাদির হার ০·১ ভাগ বেড়েছে। যা কমেছে তা হচ্ছে কেবল মদ ও তামাকের দাম (শতকরা ০·৮ ভাগ)।

শ্রমিক শ্রেণীর ভোগদ্রব্যের সর্বভারতীয় মূল্য-সূচক (আরম্ভ : ১৯৪৯=১০০) এ বছরের জানুয়ারী মাসে ১৪০-এ পৌঁছেছে। এক বছর আগে যে স্তরে ছিল, ঐ সূচক তার চাইতে এখন আছে শতকরা ৭·৭ ভাগ ঊর্ধ্বে। সত্যকার যে দামে ক্রেতারা জিনিস-পত্র কিনে থাকে, সরকারী মূল্য-সূচকে তা পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় না বলে শ্রমিক সংঘগুলি সম্প্রতি মূল্য-সূচকের সংশোধন ও সেই অনুসারে মহার্ঘ ভাতার বৃদ্ধি দাবি করেছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত জিনিসের একযোগে মূল্যবৃদ্ধির ফলে শ্রমিক শ্রেণী ছাড়াও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা কি রকম দুঃসাধ্য হয়েছে তা বোঝা যাবে শেষোক্ত শ্রেণীর আয়ের স্বল্পতা থেকে (দৃষ্টান্তস্বরূপ কলকাতার গৃহস্থদের শতকরা ৮৪ ভাগের মাসিক আয় ২০০ টাকা বা তার কম এবং শতকরা ৬৬ ভাগ গৃহীদের প্রতি মাসের আয় ১০০ টাকারও নীচে)।

আর্থিক উদ্যোগে উত্তরোত্তর অধিক অর্থ-ব্যয়, অন্তত শতকরা ২·৫ বার্ষিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ১৯৬১-৬২ সাল থেকে পর পর তিন বছর খাদ্যশস্য ও অন্য কয়েকটি কৃষিদ্রব্যের উৎপাদনে নৈরাশ্যজনক

অবস্থা বর্তমান মূল্যাধিক্যের জন্য প্রধানত দায়ী। মূল্য পরিস্থিতি জটিল হয়েছে আরো দু-একটি কারণে। প্রথমত, এ দেশের অধিবাসীদের একটা বড় অংশ দারিদ্র্যের দরুন পূর্ণ আহার করতে পায় না, তাই আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্যের জন্য চাহিদা খুব বেড়ে যায় (বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসাব অনুসারে ভারতের কৃষক পরিবারের আয় যখন শতকরা ১ ভাগ বৃদ্ধি পায়, তখন নিজেদের উৎপন্ন খাদ্যের ভোগ বেড়ে যায় শতকরা ·৯৯ ভাগ)। দ্বিতীয়ত, বেশ কিছুকাল ধরে আয়ের সম্প্রসারণ হলে লোকের চাহিদার গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরু থেকে আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট খাদ্য-শস্য, সম্পূরক খাদ্যদ্রব্য, চিনি, দামী কাপড়-চোপড় প্রভৃতির জন্য চাহিদা যে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে তা লক্ষ করা যায়।

খাদ্যের দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি রোধ করবার জন্য সরকার যে কার্যসূচী ঘোষণা করেছে তা হচ্ছে (১) খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ; (২) আগের বছর ফসল ওঠার সময় খাদ্যশস্যের যে দাম ছিল তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংগ্রহ-মূল্যের পরিবর্তন সাধন; (৩) পাইকারী ব্যবসায়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ; (৪) সরকার কর্তৃক ক্রমশ চাল-কলগুলির পরিচালন-ভার গ্রহণ; (৫) ১০ লক্ষ টনের বেশী চাল সংগ্রহ এবং চাল ও গম উভয়েরই আরো আমদানির ব্যবস্থা সম্পাদন; এবং (৬) যাতে ব্যাংক থেকে আগাম নিয়ে অতিরিক্ত লাভের আশায় লোকে শস্য মজুত না করতে পারে সেই রকম নীতি অবলম্বন। অন্য কথায়, সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হবে খাদ্যশস্যের যোগান সংরক্ষণ এবং অবস্থার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে তার নিবারণ।

খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এই রাজ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু ছাড়া, অন্যান্য রাজ্য থেকে ৫৫ লক্ষের বেশী লোক এসেছে। এদের সকলের খাওয়ার জন্য প্রতি বছর ১৪ লক্ষ টনের বেশী চাল ও অন্য প্রধান শস্য লাগে। তা ছাড়া, ধানের জমির বেশ কিছু অংশ পাট উৎপাদনে নিয়োজিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের ধান উৎপাদন প্রতি বছর ৩ লক্ষ টন কমে গেছে। এই রাজ্যে চাল সরবরাহের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের তাই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রায় দু বছর আগে নিযুক্ত মূল্য তদন্ত কমিটি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য যেসব সুপারিশ করেছে সেগুলি এই দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। খাদ্যশস্যের ব্যবসায় রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসা, চালের কলগুলির জাতীয়করণ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ধান ও চাল বাইরে পাঠানো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কমিটি প্রস্তাব করেছে।

বণ্টনব্যবস্থা হাতে নেবার আগে সরকারের দিক থেকে যে যথোপযুক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে তাতে সন্দেহ নেই। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে পরিবর্তিত রাশন-ব্যবস্থা আছে তা উৎপাদন বা যোগানের সংকটের সময় ভেঙে পড়তে পারে। সুতরাং যখনই বাজারে মাঝামাঝি রকমের চালের খুচরো দাম মন প্রতি ২৫ টাকা ছাড়িয়ে যায় তখন ঐ রাজ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্ধিত র‍্যাশন-ব্যবস্থা চালু করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণের চাল পাওয়া দরকার। পরিবর্তিত র‍্যাশন-ব্যবস্থার অধীন সমস্ত শহর অঞ্চলে এবং গ্রামে যেসব পরিবার ধান উৎপাদন করে না বা যাদের ভেতর অভাব দেখা দেয়, তাদের মধ্যে সরকার রাজ্যের অভ্যন্তর থেকে সংগৃহীত (আট লক্ষ টন) চাল এবং আমদানিজাত চাল দুই-ই বণ্টন করবে। তার জন্য (১) উড়িষ্যায় উৎপন্ন উদ্বৃত্ত চাল ও ধান (৩ লক্ষ টন) যাতে পশ্চিম বাঙলায় যোগান দেওয়া হয় এবং (২) কেন্দ্রীয় সরকার আপাতত আরো ৪ লক্ষ টন চাল যাতে ঐ রাজ্যে সরবরাহ করে তার বন্দোবস্ত করা দরকার। তা ছাড়া, রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রের সংগ্রহ থেকে প্রতি বছর ১০ লক্ষ টন গম পেতে হবে। পরিবর্তিত র‍্যাশন-ব্যবস্থার মাধ্যমে গম ও গমজাত খাদ্যের বণ্টন সরকারের নিজের হাতে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সেই সঙ্গে কাপড়, মাছ, তেল ও চিনির মূল্যস্থিতির জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন সমান জরুরী।

বণ্টনব্যবস্থার সাফল্য শেষ পর্যন্ত দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর অনেকটা নির্ভরশীল। উৎপাদন বাড়াবার জন্য শুধু জলসেচ, বিদ্যুৎশক্তিজনন প্রভৃতি বড় বড় দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের উপর গুরুত্ব দিলে চলবে না, উপযুক্তসংখ্যক স্বল্পকালীন উন্নয়ন কার্যক্রম (যেগুলি থেকে অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অপেক্ষাকৃত কম সময়ে তৈরী হতে পারবে) পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কৃষির উৎপাদন-ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক সার, জলসেচনের জন্য ছোট ও মাঝারি পরিকল্পনা, উপযোগী যন্ত্রপাতি—এ সবই অনতিবিলম্বে ভালো ফল দেবে। (ভারতের ৮০টি নির্বাচিত জেলায় কৃষির উৎপাদন দ্রুত বাড়াবার জন্য সম্প্রতি যে বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে তার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।) সেই সঙ্গে কৃষকদের অধিক ফসল ফলাবার জন্য উৎসাহ দিতে পারে এমন কয়েকটি সুচিন্তিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। তাদের উৎপন্ন শস্যের সঙ্গত ও মোটামুটি অপরিবর্তনীয় মূল্যরক্ষণ, জলসেচ, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, জল-নিষ্কাশন ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে কৃষিকার্যের আনুষঙ্গিক ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কমিয়ে আনা উচিত। চাষীদের মধ্যে কারখানাজাত দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারলে এবং তাদের জন্য সুলভে সেইসব জিনিস সরবরাহের ব্যবস্থা করে দিলে কৃষকরা উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপন্ন ফসলের আগের চাইতে বেশী অংশ শহর অঞ্চলে বিক্রি করতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

শান্তিকুমার ঘোষ

কিম্ববিচিত্রা

মাঝে মাঝে উপোস দেওয়া ভাল

মাঝে মাঝে এবং একটা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে উপবাস করা আর আহার নিয়ন্ত্রণ করা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো, সে কথা ভারতের জনসাধারণ সকলেই জানেন। নিয়ন্ত্রিত-উপবাসের রোগনিরাময়কারী গুণ সম্পর্কে অতি প্রাচীন কালেই ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বেশ কিছুকাল ধরে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের একদল চিকিৎসাবিজ্ঞানী এ সম্পর্কে আধুনিক প্রয়োগ-পদ্ধতির দিক থেকে গবেষণার কাজে রত আছেন। সেই গবেষণালব্ধ ফলাফল সম্পর্কে এখানে আলোচনা করেছেন ডাঃ গালিনা বেরোদিনা।

সম্প্রতি তরুণ সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী ভ্লাদিমির লেশকোভ্ৎসেফ-এর পঁয়তাল্লিশ দিনব্যাপী অনশনের খবর অনেকেই শুনেছেন। এক কঠিন অসুখে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন : শরীরের তাপাঙ্ক একটানা খুব বেশি চলতে থাকে এবং তাঁর রক্ত কণিকার আনুপাতিক হার হয়ে দাঁড়ায় অস্বাভাবিক। এই অবস্থায়, ডাক্তারদের পরামর্শ, পরীক্ষামূলকভাবে দিন কয়েক অনশনে থেকে তাঁর শারীরিক উন্নতির উল্লেখযোগ্য লক্ষণ দেখা দেয়। পঁয়তাল্লিশ দিনব্যাপী অনশনে থেকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

উপবাসের ফলে লেশকোভ্ৎসফের এই রোগ নিরাময়ের ব্যাপারটি নিয়ে সোভিয়েত চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে রীতিমত সাড়া পড়ে গিয়েছে। তাঁরা বেশ কিছুকাল থেকেই উপবাসের রোগ নিরাময়কারী গুণ সম্পর্কে নানাভাবে পরীক্ষা-অনুশীলন চালাচ্ছেন। লেশকোভ্ৎসফের এই ঘটনাটি হল সেই পরীক্ষাগুলির অন্যতম।

বাত, উচ্চ রক্তচাপ, থ্রম্বোসিস ইত্যাদি রোগে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে উপবাস, অল্পাহার ও নিয়ন্ত্রিত আহার যে ফলপ্রদ, সে কথা সকলেই জানেন। বাড়ির পোষা কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি পশু অসুস্থ হয়ে পড়লে খাবার দিলেও খায় না— এটাও সকলেই জানেন। তিন হাজার বছর আগে গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রিটাস স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে মাঝে মাঝে উপবাস দেওয়া ভালো বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারও আগে ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রীরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত গবেষণা-আলোচনা করে গিয়েছেন। ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্রেও কোনকোন রোগে উপবাসের নির্দেশ আছে। রোগ নিরাময়ে উপবাসের কার্যকারিতা সম্পর্কে ১৯১১ সনে মার্কিন ঔপন্যাসিক আপটন সিনক্লেয়ার একটি বই লেখেন। তাতে তিনি ঠিকই লিখেছিলেন যে, ভুল ও অনুপযোগী আহার্য জনিত খাদ্যাবিষে এবং শ্রমশিল্পের দূষিত পরিবেশে মানুষের সমস্ত দেহক্রিয়ায় এক বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়—এবং সাময়িক উপবাসের দ্বারা তার কুফলগুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারা যায়। আপটন সিনক্লেয়ার সাতেরটি "কেস"এর কথা লিখেছেন, যার মধ্যে একশটি ক্ষেত্রেই উপবাস খুব সুফলপ্রসূ হয়েছে।

তবে কি অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে, ওষুধ না খেয়ে শুধু উপোস করলেই সেরে ওঠা যাবে? মোটেই তা নয়। উপবাসটা চলবে চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে—

মানুষের যা ধারণা শিম্পাঞ্জীর মুখ ব্যাদানের অর্থ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিম্পাঞ্জী যখন হাসে, তখন সাধারণত সে ওইভাবে তার মহাক্রোধই ব্যক্ত করে

ডাক্তারের নির্দেশে ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, দরকার হলে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে অন্যান্য খাদ্যপানীয়ের সঙ্গে।

এই ধরনের উপবাস-চিকিৎসা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি ক্লিনিকে ইদানিং চালু করা হয়েছে। যেমন, মস্কোর ২নং হাসপাতালের সার্জিক্যাল ক্লিনিকে ডাঃ এ এন বাকুলেফ এবং রুশ ফেডারেশনের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রির ডাঃ ওয়াই নিকোলায়েফ অনেকগুলি গুরুতর রোগাক্রান্ত লোককে এই পদ্ধতিতে সুস্থ করে তুলেছেন। সব ক্ষেত্রেই উপবাস আর আহারের মাত্রা কড়াকড়ি ভাবে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

দীর্ঘস্থায়ী অনশনের ফলে দেহের ভিতরে কতকগুলি খুব জটিল জৈবরাসায়নিক ও জৈবভৌতিক বিক্রিয়া হয়। বিপাক বা মেটাবেলিজম্‌-এর কাজটা সম্পূর্ণ নতুন ভাবে পুনঃসংগঠিত হয়—যার ফলে পাক-ক্রিয়ায় কোনো অস্বাভাবিকতা থাকলে সেটা সেরে যায় ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়ায় যেসব ক্ষতিকর জিনিস জমে ওঠে, সেগুলি বেরিয়ে যায়। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পাকস্থলী, বৃহৎ অন্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কও বিশ্রাম পায়।

সব রোগেই যে সংক্রামক জীবাণুকে প্রতিহত করা সম্ভব বা প্রয়োজন, তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেহের আক্রান্ত অঙ্গটিরই অবস্থার বদল ঘটানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ঘটানো সহজেই সম্ভব হয় অনশনের দ্বারা আর সেই সঙ্গে কতকগুলি চিকিৎসাব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা।

বলা বাহুল্য, উপবাস মানে নির্জলা উপবাস নয়। জল ছাড়া বেশি দিন অনশনে থাকা অসম্ভব, কারণ নিরুদন বা "ডিহাইড্রেশন"এর ফলে দেহের ভিতরে বিপাকজনিত জমে ওঠা বিষক্রিয়ায় অচিরে মৃত্যু ঘটে। সেই জন্যে, নির্দিষ্ট মাত্রায় জল, লেবুজাতীয় ফলের রস, কয়েকটি খনিজ ও লবণ খেতেই হবে। বিশেষত, "বোরজোমি" শ্রেণীর খনিজ জল উপবাসী রোগীর ক্ষেত্রে খুব কার্যকর।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: বিশেষজ্ঞের যথোপযুক্ত পরিচালনায় এই রোগ-নিরাময়কারী উপবাস মোটেই কষ্টকর নয়। হাসপাতালে এই ধরনের উপোসী রোগীরা সকলেই একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। অনশনের সময়ে প্রথম প্রথম কয়েক দিন তলপেটে এক ধরণের তীব্র যন্ত্রণা হয়। এই যন্ত্রণাটা ক্ষুধাজনিত। কিন্তু তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই সেই যন্ত্রণা সম্পূর্ণ লোপ পায় এবং তখন থেকে বেশ আরাম বোধ হয়। তখন বেশ একটা মানসিক ও দৈহিক প্রশান্তি আসে এবং ঘুম হয় গভীর ও আরামদায়ক।

বানর সমাজে মোড়লী

আপনারা যারা বেনারস গিয়েছেন, লক্ষ করেছেন বোধ হয় যে, আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যেমন একজন গাঁও বুড়ো বা মোড়ল থাকে, বানরদের মধ্যেও তেমনি একজন মোড়ল বা সর্দার থাকে। দলের অন্য সব বানরদের সর্দারের নির্দেশে চলতে হয়। এই সর্দারি ছিনিয়ে নেবার জন্যে দলের মধ্যে এক এক সময় বিরাট লড়াই বেধে যায়। দলের মধ্যে হঠাৎ কোন বানর যদি মনে করে যে, সর্দার অক্ষম হয়ে পড়েছে, তখনই এই ঘটনা ঘটে। এই বানরদের মধ্যে মানুষও যদি সর্দার হতে চায়, তাকেও প্রমাণ করতে হয় যে, সে তাদের অপেক্ষা শক্তিমান। কথাটা যে মিথ্যে নয় তার অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে চিড়িয়াখানায় বানরদের খাঁচায় যে মানুষ তদারকি করে তাকে নাস্তানাবুদ করে কিন্তু যখন বোঝে যে বুদ্ধিতে এবং ক্ষমতায় সে তাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের জীব, তখনই তারা নিরস্ত হয় এবং তার বাধ্য হয়। পুরোনো তত্ত্বাবধায়কের স্থানে নতুন মানুষ এলে বানররা কিছুতেই তাকে আমল দিতে চায় না, যতক্ষণ না সে প্রমাণ করে যে; তার হাতের লাঠি তাদের ঠান্ডা করতে পারে।

অবিবাহিত বানরদের মধ্যে যদি বানর ললনাদের আবির্ভাব হয় তাহলেও প্রলয়ঙ্কর কান্ড ঘটে যায়। একবার লন্ডনের চিড়িয়খানায় একশটি মদ্দা বেবুনের খাঁচায় চল্লিশটি বেবুন তরুণীকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে লংকাকান্ড ঘটে যায়, তার বিবরণ রামায়ণেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। চল্লিশটি বেবুন সুন্দরীদের সর্দার হবার যুদ্ধে প্রাণ হারায় বেয়াল্লিশজন মর্দা বেবুন এবং চল্লিশজন মদ্দা বেবুন।

আলোচনা

'লণ্ডনের চিঠি' প্রসঙ্গে

মহাশয়—

'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'লণ্ডনের চিঠি'র জন্যে তারাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অসংখ্য সাধুবাদ জানাই। এ পর্যন্ত যে কয়েকটি 'লণ্ডনের চিঠি' প্রকাশিত হয়েছে, প্রত্যেকটি অভিনবত্বে উজ্জ্বল। প্রত্যেকটি চিঠির স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষ করা যায়; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সব চিঠিগুলি একটি ঐক্যসূত্রে বিধৃত। এই ঐক্যসূত্রটি হলো লেখকের বাঙালী-জাতি-প্রীতি।

জাতি-প্রীতি বলতে জাতি সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস বা তরল আবেগ এমন কিছু বোঝায় না। জাতিকে ভালবাসি বলে জাতির সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেব, দোষত্রুটিকে চাপা দিয়ে জাতির মাহাত্ম্য খ্যাপন করবো—একে জাতি-প্রীতি বলে না। জাতি-প্রীতি স্বতন্ত্র জিনিস। এর পেছনে আন্তরিকতা এবং যুক্তি দুটোই বলবৎ থাকা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, তারাপদবাবুর চিঠিগুলির মধ্যে আন্তরিকতা এবং যুক্তি কোনটিরই অভাব নেই।

লেখক চিঠিগুলির মধ্যে ইংরাজ জাতির তুলনায় কোথায় বাঙালীর বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্য তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রত্যেকটি চিঠির মধ্যেই লেখকের এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান। জাতি হিসেবে ইংরাজ নিঃসন্দেহে উন্নত। কিন্তু ইংরাজ হলেই যে যাবতীয় সংকীর্ণতা এবং দীনতার ঊর্ধ্বে—এ ধারণাকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। অথচ ইংরাজ সম্বন্ধে এরকম একটা ধারণা আমাদের সমাজের উচ্চ কোটির মধ্যেও বলবৎ দেখা যায়। যেহেতু বাঙালী, অতএব তার আচার-আচরণ তথা সংস্কৃতি ইংরাজের তুলনায় দীনহীন হবেই—এরকম মানসিক পীড়া অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। তারাপদবাবুর চিঠিগুলি এ ধরনের পীড়ার একটি মহৌষধ। লন্ডনে বসে একজন বাঙালী তাঁর দেশ ও দেশবাসীদের কি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে অনুধ্যান করছেন এই চিঠিগুলি না পড়লে সম্যক উপলব্ধি হবে না। চিঠিগুলির আস্বাদ স্বতন্ত্র: আনন্দও ভিন্নপ্রকৃতির।

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
আরামবাগ, হুগলী

পাঠ্য পুস্তকের জালিয়াতি

মহাশয়,

১৮ই এপ্রিল তারিখের "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত "পাঠ্যপুস্তকের জালিয়াতি" পশ্চিমবঙ্গ-শিক্ষা অধিকারের 'অদ্ভুত কর্মনৈপুণ্য' এবং 'অত্যাশ্চর্য দূরদর্শিতার' একটি চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছে। এই জন্য আপনাকে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এতদিন 'কিশলয়,' 'প্রকৃতিপরিচয়,' 'পিকক-রীডার' ইত্যাদি বইগুলি যোগাড় করতে হিমসিম খেয়ে গেছি। কলকাতার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সব ক'টি প্রান্তে ছুটোছুটি করতে হয়েছে এই সব বই কেনবার জন্যে। দিনের পর দিন শুনেছি বই শেষ হয়ে গেছে, পুনরায় বাজারে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এখন জানতে পারলাম বই-এর দুষ্প্রাপ্যতাই একমাত্র সমস্যা নয়— বইগুলো জাল করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে এবং শিক্ষার পীঠস্থান কলেজস্ট্রীট হয়েছে সেই জালিয়াতির কেন্দ্র। আমাদের দেশে খাঁটি জিনিস খুব কমই পাওয়া যায়—সর্বত্রই জাল জুয়াচুরি চলেছে বহুকাল ধরে। কিন্তু 'কি বিচিত্র এই দেশ!' এখানে অবোধ শিশুদের পাঠ্যপুস্তকগুলিও জালিয়াতির কবল থেকে রেহাই পেল না? সরকারের ইচ্ছা আছে বহুবিধ—স্বল্পমূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা সেই বহুবিধ সদিচ্ছার একটি। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে কি হবে—ক্ষমতা নেই। সরকার প্রচুর বই একত্রে ছাপাতে অক্ষম, অক্ষম সেগুলো নির্ভুলভাবে ছাপাতে এবং অক্ষম সেসব বই সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হচ্ছে কিনা ও বালকবালিকারা পাচ্ছে কিনা সেটা দেখতে। ফলে বাজার ছেয়ে গেল জাল পাঠ্যপুস্তকে এবং না জানি আমার মত কত হতভাগ্য অভিভাবক সেই নকল বই ছেলে-মেয়েদের কিনে দিয়েছি!

মাধুরী চৌধুরী
হুগলী।

চিত্র সমালোচনা

॥ ১ ॥

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীপ্রকাশ কর্মকারের প্রদর্শিত ছবি সম্পর্কে দেশের পাতায় আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু মন্তব্য করা হয়েছিল। শিল্পীমাত্রেই সেই মন্তব্যকে ভাল মনে মেনে নেবেন, এমন আশা করাটা যদিও অযৌক্তিক, তবুও ১৮ই এপ্রিলের দেশে শ্রীকর্মকারের প্রকাশিত পত্রটি পড়ে বিস্মিত হয়েছি। যদিও, পত্রটির

[illegible] উপর অনুরূপ মন্তব্য নিজেই [illegible] কিন্তু আমরা পাঠকেরা [illegible] পড়ে কি বুঝতে [illegible]?

ঐ প্রথম মন্তব্যের অবশ্য প্রতিবাদ করে [illegible] করেছেন। (যেমনা আধুনিক শিল্পকলার একমাত্র(!) ভাষ্যকার হার্বার্ট রীড The Meaning of Art গ্রন্থে বলেন—

..."I do not want to claim any special privilege for such utterances, because an artist may and indeed generaly does, talk worse nonsense than the critic. He is not usualy detached enough to describe his own psychological processes. But the modern artist has cultivated his powers of self-observation; he has been compelled to do so in self-defence."

কিন্তু সেই প্রতিবাদের সময় যে কথাগুলো তিনি বলেছেন, সেগুলো কি তাঁর মত খ্যাতিমান এবং কর্মক্ষম শিল্পীর পক্ষে শোভনীয় হয়েছে? স্বকৃত কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন শিল্পী হয়ে তিনি কি করে সোচ্চারে প্রচার করলেন যে, তিনি মাত্র ক্রীড় রসের রসিক!

এবং তিনি যখন ভারতীয়, তখন তিনি কি সত্যম শিবম্ সুন্দরমের সাধক নন? তিনি কি অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের উত্তরসূরী নন? শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর পরবর্তী কালের শিল্পীরাও আমাদের ভারতীয় চিত্রশৈলীর পুরাতন ধারাকে নতুন যুগের নতুন রূপে যে চিত্রকলা সৃষ্টি করেছেন, সে সব ছবি দেখতে গিয়ে কি আমরা ভয় পাই? শ্রীকর্মকার অবশ্য নিজেই বলেছেন—তিনি ভারতীয় চিত্রকলার দু' হাজার বছরের ধারাবাহিকতার ধারক নন, তিনি তাঁর কালের যুগের শিল্পধারার পরিচয় বাহক। কিন্তু, শ্রীকর্মকার কথিত "প্যালিওলিথিক" যুগের চিত্রকলার উদ্দেশ্য কি শুধু মানুষকে ভয় দেখান ছিল। অথচ Paul G Konody বলেন—

"In the modern and more restricted sense the term art applies only to those human activities which tend towards and aestheticism afterwards, the Fine arts."

(এই aestheticism কথাটির পূর্ণতর ব্যাখ্যা এখানে অপ্রাসঙ্গিক)। শিল্পী শ্রীকর্মকারের প্রতি বিনীত প্রশ্ন—তিনি চিত্রকর না আবিষ্কারক? ইতি

ব্রজগোপাল মান্না
জানকুলি।

॥ ২ ॥

মহাশয়,

আমার বাসস্থান কলকাতা হতে দূরে হওয়ায় প্রকাশবাবুর ছবি দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি, কিন্তু প্রকাশবাবুর ছবির সমালোচনায় মাননীয় সমালোচক মহাশয় লিখেছেন যে, "দু' হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে প্রকাশবাবুর ছবির দূরতম কোন আত্মীয়তার বন্ধন নাই" (২৮শে মার্চ)। আবার "আমরা যখন ভারতীয় এবং প্রকাশবাবু যখন নিজেকে ভারতীয় শিল্পী বলে দাবি করেন তখন আমরা ভারতীয় মাপকাঠি প্রয়োগ করব" (১৮ই এপ্রিল)। আমার এখানে একটি নিবেদন আছে।

প্রকাশবাবুর ছবির সঙ্গে দু' হাজার বছরের ভারতীয় ছবির আত্মীয়তার বন্ধন যদি নাই থাকে তবে সেটা কি ভারতীয় হবে না? সেটা কি প্রকাশবাবুর অপরাধ। না কি ভারতীয় শিল্পের অগৌরব? ভারতীয় শিল্পীর আঁকা হলেই তার সঙ্গে ভারতীয় ছবির ধারাবন্ধনে মিলতে হবে, এমন কি কথা আছে? ভারতীয় মাপকাঠি কি এতই সংকীর্ণ যে গতানুগতিকতার ঐতিহ্যমণ্ডিত না হলেই শিল্পকলাকে বর্জন করবে?

গগনেন্দ্রনাথের কিছু কিছু ছবি ('কিউবিক' আশ্রিত) দু' হাজার বছরের পুরানো ভারতীয় রীতির আত্মীয়তা বন্ধনের দাবি করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ছবিকে না প্রাচীন, না আধুনিক ভারতীয় কোন গোত্রের সঙ্গে মেলান যায় না, রবীন্দ্রনাথের ছবিকে তবে কি অভারতীয় বলব, না কি ভারতীয় ছবির পক্ষে সেটা অগৌরব? চিত্র (তথা সমগ্র শিল্প) কলা কি বিশুদ্ধ হিন্দু মতে বিবাহরীতি, যে জাত কুল (এখানে আত্মীয়তার বন্ধন) না মিললে তা অসিদ্ধ? চিত্রজগতে কি 'evolution' এবং mutation সম্ভব নয়?

দ্বিতীয় নিবেদন॥ সমালোচক মহাশয় লিখেছেন—"কিন্তু চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে, বিশেষ করে আমাদের দেশে দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে এমন কোন উদাহরণ সমালোচকের জানা নাই।" (১৮ই এপ্রিল)।

রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবিতেই দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতকে অস্বীকার করা হয়েছে। ইদানীং কালে রামকিংকরের "রবীন্দ্রনাথ, অ্যাবস্ট্রাক্ট" মূর্তিটিতে সরাসরি দৃশ্যগ্রাহ্য জগতকে অস্বীকার করা হয়েছে। প্রাচীন অজন্তা শিল্প-রীতিতে অনেক জায়গায় Pictorial anatomyকে (যাহা দৃশ্যমান জগতের প্রতিচ্ছ) অগ্রাহ্য করে "exaggeration" করা হয়েছে "abstraction" এর খাতিরে। অজন্তা শিল্পরীতি নিশ্চয়ই Crude Folk art নয়। অভারতীয়-ও নয়।

তৃতীয় নিবেদন॥ আজকের আধুনিক শিল্পীরা যদি একেই আর্টের চরম বলে মনে করেন তাহলে আমাদের কিছু বলার নাই।" (১৮ই এপ্রিল)

আমার মনে হয় এটা অভিমানগত কথা। কারণ শিল্পীরা জানে যে আর্টের চরম বলে কি বা থাকতে পারে? আর্ট কি 'deductive logic' বা 'mathematical reasoning' যে PV=RT এমন একটা চরমতায় আসতেই হবে? প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আর্ট তো সচল। আর্টের চরমতায় পৌঁছলে তো আর্টের শেষ।

শ্যামল বসাক
ভোলাগঞ্জ, বালুরঘাট।

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

বাল্মীকি প্রতিভার স্বরলিপি

গত আলোচনায় একটি সংবাদ নির্দেশ করতে ভুল হয়েছে। গীতবিতানের বর্তমান সংস্করণে বাল্মীকি প্রতিভার গান-গুলির সুর দেওয়া হয়নি একথা আমরা জানিয়েছি, কিন্তু জগদানন্দ রায় কর্তৃক প্রকাশিত গীতবিতানের প্রথম সংস্করণে প্রত্যেকটি গানের উপরে সুরের উল্লেখ ছিল একথা বলা হয়নি। ইতিপূর্বে এই উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সংস্করণে উল্লেখ-বর্জনে স্বতই মনে প্রশ্ন জাগে এই অনুল্লেখের কারণ কি? অনবধানবশত এই ভ্রম হয়েছে এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, বিশেষ করে যখন দেখি বাল্মীকি প্রতিভার নবতর স্বরলিপিগ্রন্থে (স্বরবিতান ৪৯. ১৩৬৯) পূর্বতন দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি-গুলির (১৩৩৫) কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়াই পরিবর্তন করা হয়েছে। টীকা-টিপ্পনী সম্বন্ধে বিশ্বভারতীর নিষ্ঠা সর্বজনবিদিত। কিন্তু এই ব্যাপারে কোনোরূপ ব্যাখ্যা কেন যে সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে তা বোঝা দুঃসাধ্য।

দিনেন্দ্রনাথের লিখিত স্বরলিপি বিশ্ব-ভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয়—১৩৩৫ সালে। বলা বাহুল্য, এই স্বরলিপি কবিগুরুর বিশেষ অনুমোদনযুক্ত। দিনেন্দ্র-নাথ যদি প্রাচীন সুরের কিছু ইতরবিশেষ করে থাকেন তাহলে তা কবিগুরুর সম্মতি নিয়েই করা হয়েছে এবং এই পরিবর্তনে প্রবীণ অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রয়েছে। দিনেন্দ্র-নাথের স্বরলিপি প্রাঞ্জল এবং সহজেই তোলা যায়। এই স্বরলিপিগ্রন্থ পুনঃপ্রকাশিত হল ১৩৬৯ সালে। গ্রন্থে বলা হয়েছে দিনেন্দ্র-নাথ কৃত স্বরলিপি, সম্পাদনা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপির বহুল পরিবর্তন করা হয়েছে এবং তার কোন কারণ নির্দেশ করা হয়নি। এই ধরনের গ্রন্থের সম্পাদনায় মূল বিষয় বস্তুর পরিবর্তন করা হয় না; যদি মতানৈক্যের কারণ ঘটে তাহলে তা আলাদাভাবে সংযোজিত হয়। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি অর্থাৎ অ্যামেন্ডমেন্ট না করে সুপারসিড করা হয়েছে। কিন্তু চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে অ্যামেন্ডমেন্ট বা সুপারসেশন যাই হোক না কেন, মূল বস্তুর উল্লেখ থাকতেই হবে, কেননা সংশোধনের পূর্ব অবস্থা কী ছিল তা পাঠকের জানা অবশ্য কর্তব্য। নব সংস্করণে দেখছি এ বিষয়ে কোন উল্লেখই নেই। নতুন পাঠকের কাছে মনে হবে এটা রিপ্রিন্ট ছাড়া আর

বিস্তারিত। কোন্ কোন্ স্বরলিপিতে কোথায় কোথায় উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা হয়েছে তার কি উল্লেখ থাকা উচিত ছিল না? আমরা যতদূর জানি ইন্দিরা দেবী এইসব পরিবর্তনের ব্যাপারে বিশেষ সচেতন ছিলেন অথচ তিনি কোনো ব্যাখ্যা দেননি এটা বিশ্বাস করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। আমাদের নিশ্চিত ধারণা ইন্দিরা দেবীর নিজস্ব বক্তব্য এ বিষয়ে ছিল কিন্তু কোনো কারণে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ তা আমাদের অগোচরে রেখেছেন।

ইন্দিরা দেবী বাল্মীকি প্রতিভার প্রথম অভিনয়কালে যুক্ত ছিলেন। তখনকার সুর তিনি নোট করে রেখেছিলেন। সেই সময়কার সুরগুলির যাথার্থ্য যেমন অস্বীকার করা যায় না তেমনি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যদি কিছু সংশোধন করে থাকেন তারও সম্পূর্ণ স্বীকৃতি থাকা উচিত। বরঞ্চ পরবর্তীকালের অনুমোদিত সুরটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অতএব দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপির একটা বিশেষ মূল্য আছে। এই সযত্নপ্রস্তুত স্বরলিপিকে অবহেলিত রেখে বিশ্বভারতী নিষ্ঠার পরিচয় দেননি।

নতুন সংস্করণে বহুক্ষেত্রে স্পর্শ স্বর প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে স্বরলিপির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। "আঃ বেঁচেছি এখন শর্মা ওদিকে আর নন"—এই গানটির "গোলেমালে ফাঁকতালে" অংশটি যেভাবে স্বরলিপি করা হয়েছে তা যে সহজে গাওয়া যাবে বা তার যে একটা বিশেষ আবেদন আছে এমন মনে হয় না। এই কারণেই দিনেন্দ্রনাথ এই অংশটি খুব সহজ এবং সরল রেখেছিলেন। "এখন করব কী বল" গানটির ঢং বজায় রেখে ইন্দিরা দেবী স্বরের পরিবর্তন করেছেন। এর কারণ বোঝা শক্ত নয়। মূল সুর হিসাবে পিলুর উল্লেখ আছে। ইন্দিরা দেবী সেই সুরটি বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দিনেন্দ্রনাথ যে সুরটি দিয়েছেন তা অধিকতর জোরালো। এইভাবে দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপির উচ্ছেদ না করে দুটি ভিন্ন স্বরলিপি দেওয়া যেতে পারত। এইটাই সাধুসম্পাদনার নিয়ম। "কালী কালী বলো রে আজ" গানটির মূল সুর যদি ইন্দিরা দেবীর স্বরলিপিতেই বজায় থাকে তাহলে সেটা দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি উঠিয়ে দেওয়া হল কেন? সম্পাদনার কি এই নিয়ম? তাহলে সম্পাদকভেদে মূলের পরিবর্তনই হতে থাকবে এবং তার কোনো কারণও খুঁজে পাওয়া যাবে না। "রাঙা পদ পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা" গানটির ক্ষেত্রেও বহুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে অথচ দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি মুদ্রিত হয়নি। দুটি স্বরলিপিই ভাল করে গাওয়া যায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়েছে—"হায় কী দশা হল আমার"—এই গানটিতে। এই পরিবর্তনের কারণ বুঝতেও কষ্ট হয় না। এই গানের সুর ছিল গারা ভৈরবী। ইন্দিরা দেবী সেই কারণেই এর ঠাটটি ভৈরবীতে রেখেছেন। কিন্তু দিনেন্দ্রনাথ কেন ভৈরবী সুর অনুসরণ করেননি তারও নিশ্চয়ই কারণ ছিল এবং এই স্বরলিপিটি গাইলেও খুব ভালই শোনায়। অতএব এক্ষেত্রেও দুটি স্বরলিপিই পাশাপাশি থাকা উচিত ছিল। মূল সুরের প্রতি লক্ষ্য রেখে "আয় মা আমার সাথে" গানটিও ইন্দিরা দেবী ভৈরবীতে স্বরলিপি করেছেন কিন্তু দিনেন্দ্রনাথ ভৈরবী অনুসরণ করেননি। আরও একটি গানে ইন্দিরা দেবী বেশ কিছু পরিবর্তন করেছেন; সেটি হচ্ছে—"বাণী বীণাপাণি করুণাময়ী" গানটি। এতে উভয়েই ভৈরো-রাগের কাঠামো বজায় রেখেছেন কিন্তু দিনেন্দ্রনাথ যেখানে খাদে স্বরলিপি করেছেন ইন্দিরা দেবী সেখানে চড়া স্বর ব্যবহার করেছেন। বড় পরিবর্তন ছাড়া ছোটখাটো পরিবর্তন প্রায় প্রতি গানেই করা হয়েছে। বাল্মীকি প্রতিভার গানের মত এত পরিবর্তন বোধ হয় অপর কোনো স্বরলিপি গ্রন্থে করা হয়নি, অথচ এ নিয়ে কোনো আলোচনাও প্রয়োজন মনে করা হয়নি। দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি এ পর্যন্ত তাঁকে বিশ্বভারতীর আত্মীয় করে রেখেছিল। এতকাল পরে বিশ্বভারতী তাঁর স্বরলিপিগুলিকে বিলুপ্তির কবলে নিক্ষেপ করে তাঁর স্মৃতিকেও অস্বীকার করতে উদ্যত, একথা ভাবলেও কষ্ট হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমানে কোন্ স্বরলিপি বিশ্বভারতীর অনুমোদিত? দিনেন্দ্রনাথের মূল স্বরলিপি অক্ষুণ্ণ রেখে বাল্মীকি প্রতিভার প্রচার হলে তাঁরা কি আপত্তি করবেন? করা উচিত নয়। যে ধরণে বাল্মীকি প্রতিভা এতদিন গাওয়া হয়ে এসেছে আজ তার সহসা পরিবর্তন অধিকাংশ ব্যক্তির অভিপ্রেত নাও হতে পারে। অতএব আশা করি বিশ্বভারতী পূর্বতন স্বরলিপির অনুসরণে বাধা দেবেন না। আমরা আশা করি বিশ্বভারতী এই সম্পাদনার ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে সকলের গোচর করবেন। এ সম্বন্ধে তাঁদের যে দায়িত্ব আছে তাকে স্বীকার করাই ভাল। স্বরলিপির অযথা পরিবর্তন বিশেষ বিভ্রান্তি এবং বিরক্তির সৃষ্টি করেছে।

বাঁকুড়ার মন্দির

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১৮ ॥

মন্দির-পরিচয়

রাঢ় অঞ্চলের এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেরও মন্দির-নির্মাতারা সেকালে 'সূত্রধর' এই সম্মানজনক পদবীতে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা শুধু যে মন্দির-নির্মাণেই দক্ষ ছিলেন এমন নয়, চারটি বিভিন্ন মাধ্যমে—কাষ্ঠ, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্র—তাঁদের পারদর্শিতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। কালক্রমে, নানাবিধ প্রতিকূলতার ফলে, পাষাণ ও মৃত্তিকার স্থাপত্য-ভাস্কর্য এবং পটচিত্র অংকন প্রভৃতি কারুকলা অপরাপরের বিসর্জন দিয়ে তাঁদের বংশধরদের এখন কেবলমাত্র কাঠের কারিগরিতে মনোনিবেশ করতে হয়েছে। গোষ্ঠী পদবীতেও সম্মানিত 'সূত্রধর' থেকে কিছুটা অবজ্ঞাসূচক 'ছুতোর'-এ এসে দাঁড়িয়েছে। আজকের উপেক্ষিত 'ছুতোর'দের পূর্বপুরুষেরাই যে একদা রাঢ় তথা বাংলাদেশের অন্যত্র যাবতীয় মন্দিরাদি নির্মাণ করেছেন এ-কথা কিন্তু বর্তমানে সর্বজনবিদিত বলে মনে হয় না।

দেউল-দেবালয়গুলির আলোচনার সময়ে আমরা দেখেছি, সেগুলির স্থাপত্য-প্রকরণে উড়িষ্যা-শিল্পীর প্রভাব স্পষ্ট হলেও সর্বত্রই যে বাহিরগত কোন-না-কোন বিশিষ্ট রীতিকে হুবহু অনুকরণ করা হয়েছে এমন নয়। বাংলা দেশে ব্যবহারের সময় আমলকের আকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে, লম্ফমান সিংহও সর্বত্র সন্নিবিষ্ট হয়নি, 'বরণ্ড' ও 'রথ-পগে'র সংখ্যার তারতম্য ঘটেছে এবং, সর্বোপরি, মন্দিরের আয়তনের হ্রাস পেয়েছে প্রচুর। এ সকলই উড়িষ্যার স্থাপত্য-রীতিনীতির সঙ্গে বাঙালী 'সূত্রধর'দের নিজস্ব মনীষার মিশ্রণের ফল। অবিকল অনুকৃতির বদলে এই সূক্ষ্ম বিভিন্নতা থেকে এ-কথা প্রমাণ হয় যে, বাংলাদেশের 'সূত্রধর'-স্থপতিরা অন্ধ অনুকরণ না করে মৌলিক অবদানেও সমর্থ ছিলেন। এ-অবদান অবশ্য সর্বাধিক বিকশিত হয়েছিল বাঙালীর নিজস্ব চালা স্থাপত্যের ক্ষেত্রে। এক-বাংলা, জোড়-বাংলা, চার-চালা, আট-চালা ও বিভিন্ন সংখ্যক শিখর-সমন্বিত রত্নমন্দির প্রভৃতি নির্মাণের বেলায় বাংলাদেশের 'সূত্রধর'-স্থপতিরা যে-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা ভারতবর্ষে অতুলনীয়। শুধু তাই নয়, তাঁদের মনীষার ফলশ্রুতি ভারতের দিকে দিগন্তরে—দিল্লি, লাহোর, ডিগ, ভরতপুর, বুন্দি, কোটা, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে—শ্রদ্ধায়, সমাদরে অনুসৃত হয়েছে। শ্রীগুরুসদয় দত্ত রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গায় বাংলার চালা-স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ করেছেন। শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত "দি ট্রাইবস্ অ্যান্ড কাস্টস্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল" গ্রন্থে শ্রীযুত সুধাংশুকুমার রায় তাঁর লিখিত পৃথক নিবন্ধে বলেছেন, তাঁর অনুসন্ধান অনুসারে, বুন্দি, কোটা, জয়পুর প্রভৃতি স্থানের নৃপতিকুল-আশ্রিত রাজমিস্ত্রিরা এখনও নিজেদের 'গৌড়ীয়' বলে অভিহিত করেন। পাঠান আমলে

বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ জোড়-বাংলা মন্দির

হিন্দুর দেবালয় যে-পরিমাণে ধ্বংস হয়েছে মুঘল আমলে ততটা হয় নি। সেজন্য মুঘল রাজত্বকালে বিনষ্ট হিন্দু মন্দিরাদি পুনর্নির্মাণের জন্য ভারতের সর্বত্র, বিশেষত রাজপুতনায়, ব্যাপকভাবে স্থাপত্যকীর্তি প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে। এই কর্ম-তৎপরতার সময়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে "গৌড়ীয়" মন্দির-স্থপতিদের প্রচুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে। শ্রীযুত রায় উল্লেখ করেছেন শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদদের অনুগমন করে বাংলাদেশের বহু 'সূত্রধর' একদা মথুরায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁদের বংশধরেরা এখনও সেখানে একাদিক্রমে বাস করে আসছেন। বাঙালী স্থপতিদের এই বহির্গমনের ফলে বাংলার নিজস্ব চালা-স্থাপত্যশৈলী উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র অল্পাধিক পরিমাণে সমাদৃত হবার অবকাশ পেয়েছে। ভারতীয় স্থাপত্য ও ললিতকলার ক্ষেত্রে পণ্ডিত মিঃ ই বি হ্যাভেলও বলেছেন—"বাঁশের সাহায্যে গৃহ-নির্মাণের যে পদ্ধতিটি বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, বাঁকানো ছাদ ও বক্রাকৃতি কার্নিসের গৌড়ীয়-স্থাপত্যরীতিটি তা থেকেই উদ্ভূত। মুঘলদের বহু ইমারতে ও আধুনিক রাজপুতানার স্থাপত্যশৈলীতে এই রীতিটির যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়।" (ইণ্ডিয়ান আর্কিটেক্চার : পৃঃ ১২৬)

কূর্মপৃষ্ঠের মত বাঁকানো ছাদ ও সেই রেখা-অনুসারী বাঁকানো কার্নিসযুক্ত স্থাপত্যরীতিটির সন্ধান বাঙালী সূত্রধরেরা কিভাবে কোথা থেকে পেলেন? একথা সংশয়াতীত যে, তাঁদের প্রাচীন পূর্ব-পুরুষেরা একদা বাঁশ-কাঠ-খড়ের সাহায্যে বাংলাদেশের উপযোগী গৃহ-নির্মাণেই ব্যাপৃত ছিলেন। কাল-ক্রমে, তাঁরা অন্যান্য মাধ্যমেও দক্ষতা অর্জন করেন। অবশেষে, ইঁটের মত শক্ত উপাদানে ইমারত নির্মাণের দায়িত্ব যখন তাঁদের উপর বর্তায়, তখন বহুকালব্যাপী বংশানুক্রমিক অভ্যাস ও ঐতিহ্যকে তাঁরা সহসা বিস্মৃত হতে পারেন নি। নমনীয় বাঁশের বহুল ব্যবহারে চালাঘরের যে আকৃতি সহজেই রূপ পেত, ইঁট বা পাথরের উপাদানে তার রূপায়ণ বহুগুণে বেশি কষ্টসাধ্য হলেও বাঙালী স্থপতিরা নিরুৎসাহ হয় নি। একথা সহজেই অনুমেয় যে, নূতনতর এই উপাদানের সফল ব্যবহারের পূর্বে তাঁদের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়েছে। সেই দীর্ঘস্থায়ী অধ্যবসায় ও অভিনিবেশের ফলশ্রুতি বাংলার অতুলনীয় চালা-স্থাপত্য।

আবহমানকাল বাংলাদেশে বাঁশ-কাঠ-খড়ের যে-সকল কুটির নির্মিত হয়েছে তাদের কূর্মপৃষ্ঠের মত বাঁকানো-চাল ও সমান্তরাল-চাল এই দুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ
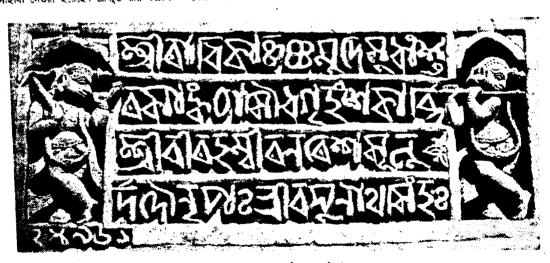
বিষ্ণুপুরে জোড়-বাংলা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক

করা যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের বেদেরা এখনও যে-আকৃতির কুঁড়েঘর ("টঙ্") নির্মাণ করে থাকে সেগুলির চালের উপরিভাগ বক্রাকৃতি। ইঁটের মন্দির নির্মাণের প্রথম স্তরে বাঙালী সূত্রধরেরা এই "টঙ্"-জাতীয় প্রাচীন কুটিরেরই অনুসরণ করেছেন মনে হয়। বিশেষত, মুর্শিদাবাদ বীরভূম বর্ধমান বাঁকুড়া উত্তর-মেদিনীপুর ও হুগলী জেলায় যে-স্থপতিরা কাজ করেছেন, চালা-স্থাপত্যের এই নির্দিষ্ট রূপটি তাঁদের যে যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। মিঃ হ্যাভেল কিন্তু অনুমান করেছেন, বাংলা-স্থাপত্যের এই বিশিষ্ট রূপটি নৌকার ছই-এর বাঁকানো আকৃতি থেকে সংগৃহীত। সে যাই হোক, বাংলাদেশের সূত্রধরেরা ইঁটের ইমারত নির্মাণের সময় পুরাতন বাঁকানো-মটকা বা বাঁকানো-চাল-সমন্বিত কুটির অথবা নৌকার "ছই"কেই যে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সে কথা সংশয়াতীত। রূপায়ণের এ সিদ্ধান্তের পিছনে আরও একটি জোরাল যুক্তি ছিল কিন্তু সে কথা আজ বিস্মৃতপ্রায়।

বাংলাদেশের দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামগুলিতে অধুনা যে সকল কুটির দেখা যায় সেগুলি শ্রীহীন ও যাবতীয় বাহুল্যবর্জিত। কিন্তু, দুতিন শতাব্দী পূর্বেও বাংলার গ্রামে এমন কুঁড়েঘরের অভাব ছিল না যেগুলিতে সুন্দর কারুকার্যখচিত কাঠের খুঁটি দরজা ও বরগা প্রভৃতি ব্যবহৃত হত এবং সেগুলির চালের ভিতরদিক বহু রঙের বেতের চিকাতে ও বাঁশের চটাড়ি দিয়ে অলংকৃত করা হত সম্পূর্ণরূপে। বহুক্ষেত্রে এ কুটিরগুলির বাইরের দেওয়াল [illegible] চিত্র শোভিত হত। কিছুকাল পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'হুগলীর চণ্ডীমণ্ডপ' ও 'আটচালী' [illegible] সেকালের শিল্পের সচিত্র প্রবন্ধ দুটির কথা পাঠকের হয়ত স্মরণ থাকতে পারে। সেগুলিতে কুটির অলংকরণে কারুকার্য-মণ্ডিত কাঠের খুঁটি, বরগা, ব্র্যাকেট প্রভৃতির ব্যবহার ও রঙীন দেওয়ালচিত্রের আলোচনা করা হয়েছিল। কাঠ-খড় মাটির মত অতি সাধারণ উপাদানে নির্মিত হলেও বাংলাদেশের কুঁড়ে ঘরের এই সৌন্দর্যবিধানপদ্ধতি বহুকালের প্রাচীন। এ হেন অভিনিবেশসাধ্য ও নয়নাভিরাম বাঁকানো-চালের কুটিরের আদর্শ যে সূত্রধর-স্থপতিদের পরবর্তী কালের স্থাপত্য-রীতিকে প্রভাবিত করবে তা খুবই স্বাভাবিক। অতি সামান্য উপকরণে নির্মিত হলেও, বাংলাদেশের সেকালের কুটিরগুলি অনেকক্ষেত্রেই স্থায়িত্ব বা মনোহারিত্বে হীন ছিল না। আধুনিক গ্রাম-বাংলার সৌন্দর্যবর্জিত জীর্ণ কুঁড়েঘরগুলি দেখলে অতীতের সরস ঐশ্বর্যমণ্ডিত সে সব কুটিরের ধারণাও করা যায় না। বাঁশ কাঠ-খড়-মাটির উপাদান ছেড়ে, মন্দিরাদি
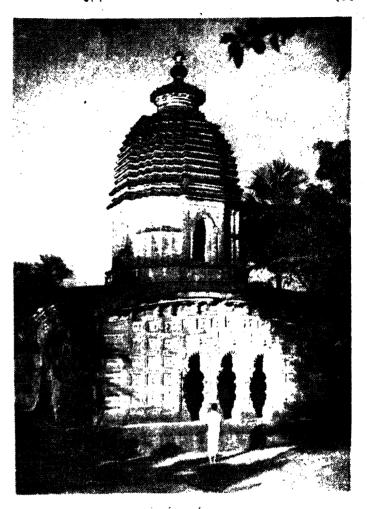
মদনগোপাল মন্দির : বিষ্ণুপুর

নির্মাণের ক্ষেত্রে যখন পোড়ামাটির ইঁটের প্রচলন হল, সূত্রধর-স্থপতিদের তখন পূর্বের এই অনাড়ম্বর ঐশ্বর্যের ঐতিহ্যকে একেবারে পরিত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। নির্মাণ-উপাদানের পরিবর্তন হলেও সাবেক রীতিটি পরিত্যক্ত না হয়ে পরিবর্ধিত হয়েছে মাত্র।

বাংলা চালা-স্থাপত্যের আদিমতম রূপটি যে দো-চালা বা এক-বাংলা ইমারত তাতে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের যাবতীয় খড়ে-ছাওয়া কুটির এখনও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, দো-চালা অথবা চার-চালা হিসাবেই নির্মিত হয়ে থাকে। ইউরোপীয় কর্তৃত্বের প্রথম যুগে, গৃহ-নির্মাণের এ হেন পদ্ধতি বিদেশীদের চোখে এতই অভিনব লেগে থাকবে যে, খড়ে-ছাওয়া কুটিরের প্রতিশব্দ "বাংলো" কথাটি ইংরেজী ভাষার শামিল হয়ে পড়ে। দো-চালা কুটিরকে এক-বাংলা অথবা পাশাপাশি সংলগ্ন দুটি দো-চালাকে আমরা যে জোড়-বাংলা বলি, তার পিছনে হয়ত 'বাংলো' এই অদ্ভুত ইংরেজী শব্দটির দ্যোতনা আছে। সে যাই হোক, নির্মাণ-প্রকরণের দিক থেকে দো-চালা বা এক-বাংলা মন্দিরই যে সব চেয়ে সহজসাধ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। অনায়াসলভ্য গঠনের জন্য বাংলা-রীতির মন্দিরগুলির মধ্যে এই বিশেষ আকৃতির দেব-সৌধই যে সর্বপ্রাচীন ছিল এমনই মনে হয়। প্রধানত, এই প্রাচীনতার জন্য ও স্থাপত্যের দিক থেকে কম মজবুত হওয়ার কারণে, বাঁকুড়া জেলায় এ জাতীয় দেবালয় এখন একটিও অবশিষ্ট আছে কিনা সন্দেহ; আমার ব্যাপক পরিভ্রমণের কালে আমি অন্তত একটিও দেখিনি। অথচ, বাঁকুড়া জেলার অদূরে দো-চালা মন্দির যে ১১৪৬ বঙ্গাব্দে নির্মিত হয়েছে তার প্রমাণ চন্দননগরের নন্দদুলালের এক-বাংলা মন্দিরটি। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়নগরে রাণী ভবানীর প্রযত্নে নির্মিত এরকম আর

মন্দির-সংলগ্ন বাকৃতি "রথ"

একটি দো-চালা বা এক-বাংলা মন্দির এখনও অক্ষত আছে। বাঁকুড়া জেলায় অধুনা লুপ্ত দো-চালা দেবালয়গুলির একদা [illegible] অস্তিত্বের আর একটি প্রমাণ এই যে, এগুলিরই পরিবর্তিত রূপ জোড়-বাংলা ইমারতের দৃষ্টান্ত এ জেলায় বিরল নয়।

বাংলা দেশের চালা-স্থাপত্যশৈলীর বিবর্তন-প্রসঙ্গে অন্যত্র ইতিপূর্বেই এ কথা বলেছি যে, আদিতে এক-বাংলা রূপটি থেকেই, ইমারতের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য, পরবর্তীকালে যথাক্রমে চূড়াবিহীন জোড়-বাংলা ও চূড়াযুক্ত জোড়-বাংলা মন্দিরের প্রবর্তন হয়েছিল। [illegible] জোড়-বাংলা, মন্দিরকে একটি মাত্র চূড়াসমন্বিত করেই ক্ষান্ত হয়নি; [illegible] হুগলী জেলার [illegible] [illegible] থানার প্রান্তবর্তী বালী-দেওয়ানগঞ্জ গ্রামে এহেন এক অভিনব দেবসৌধ আছে যেখানে একটি জোড়-বাংলা ইমারতের উপরে, শুধুমাত্র চূড়া নয়, সম্পূর্ণ একটি নবরত্ন মন্দির স্থাপিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এজাতীয় পল্লবিত-স্থাপত্যের জোড়-বাংলা মন্দির সমগ্র রাঢ় দেশে অতিশয় বিরল। এ আকৃতির একটি মন্দিরও বাঁকুড়া জেলায় আছে কিনা সন্দেহ। সে জেলার অধুনা-বিদ্যমান দৃষ্টান্তগুলি থেকে মনে হয়, এক-চূড়াবিশিষ্ট জোড়-বাংলা রীতিটিই সেখানে বিশেষভাবে অনুসৃত হয়েছিল। শুধু বাঁকুড়া জেলাতেই নয়, সম্ভবত সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে এই বিশিষ্ট মন্দির-স্থাপত্য-শৈলীর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত জোড়-বাংলা মন্দিরটি। এটির অদূরে আর একটি জোড়-বাংলা মন্দির একদা নির্মিত হয়েছিল। আমার শেষ পরিদর্শনের সময়, প্রায় দু বছর আগে, সেটিকে অতিশয় জীর্ণ অবস্থায় দেখে-ছিলাম। একটি দো-চালা ভূমিসাৎ হয়েছে; উপরটি ও শীর্ষদেশের চূড়াটি [illegible] [illegible] ও পতনোন্মুখ। শুনেছিলাম, এটিকে একেবারে ভেঙে ফেলে নির্মাণ-উপকরণ অন্যত্র অপসারিত করা হবে। হয়ত সে কাজ এতদিনে সম্পূর্ণ হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে, বহুজনপরিচিত প্রথম জোড়-বাংলা মন্দিরটি অনুরূপ পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়েছে।

বিষ্ণুপুরের জোড়-বাংলা মন্দিরটি বীর হাম্বিরের পুত্র রঘুনাথ সিংহের প্রযত্নে ৯৬১ মল্লাব্দে নির্মিত হয়েছিল। দক্ষিণমুখী এ দেবালয়ের প্রধান প্রবেশ-দ্বারের ঠিক উপরে পাথরের যে প্রতিষ্ঠা ফলকটি নিবদ্ধ আছে, বিষ্ণুপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শাখার [illegible] তার নিম্নলিখিতরূপ পাঠোদ্ধার করে দিয়েছেন :—

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ মুদে সুধাংশু
লোকেন্দ্র সৌধগৃহং শাকদে।
শ্রী বীর হম্বীর নরেশ সূনু
দদৌ নৃপঃ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ ॥

(শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণের আনন্দের জন্য নরেশ শ্রীবীর হম্বীরের পুত্র নৃপ শ্রীরঘুনাথ সিংহ ৯৬১ মল্লশকে সৌধগৃহ দান করিলেন।) প্রতিষ্ঠাফলকটির নীচে, বাম কোণে, (ও লোকচিত্র দ্রষ্টব্য) প্রতিষ্ঠা বৎসরটি সংখ্যাতেও উৎকীর্ণ আছে। ৯৬১ মল্ল-শক ১০৬১ বঙ্গাব্দের সমার্থক। অর্থাৎ, আজ (১৩৭১ বঙ্গাব্দ) থেকে প্রায় ৩১০ বৎসর পূর্বে এ সৌধটি নির্মিত হয়েছিল। আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের পূর্ব-বিভাগের এককালীন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডক্টর ব্লক-এর নির্ণয় অনুসারে এ মন্দিরটি ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ও বিষ্ণুপুরের প্রতিষ্ঠা ফলকযুক্ত মন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীনত্বে তৃতীয়। মল্লেশ্বর ও শ্যামরায়ের মন্দির দুটি যথাক্রমে ১৬২২ ও ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে

হয়েছে। কিন্তু জোড়-বাংলা মন্দিরে ত্রি-খিলান এবং মন্দিরমধ্যস্থ খোলা দালান কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকেই অবস্থিত। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য দ্বিতীয় দো-চালাটির পূর্ব দেওয়ালে যে নীচু খিলানের পৃথক একটি দরজা আছে তাও এ মন্দিরের বিশেষত্ব। শীর্ষের চতুষ্কোণ চূড়াটি দুটি দো-চালার সংযোগকারী এক বেদীর উপর স্থাপিত। এ কথা আগেই বলেছি যে, জোড়-বাংলা মন্দিরে চূড়া সন্নিবিষ্ট হত দো-চালা দুটির অধিকতর দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্য। বিষ্ণুপুরের জোড়-বাংলা মন্দিরের চূড়ার গঠন-প্রকরণ দেখলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। চূড়ার শীর্ষে চার-চালা আকৃতির যে ছাদটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাও অভিনব। সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় চার-চালা শৈলীর পূর্ণাঙ্গ দেবালয় এখন আর নেই বললেই চলে। তবুও স্থানীয় স্থপতিরা যে এ জাতীয় স্থাপত্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন না অধুনা-বিরল এরকম নিদর্শন থেকে সে কথা প্রমাণিত হয়।

বিষ্ণুপুরের জোড়-বাংলা মন্দিরটির অভিনবত্ব কিন্তু গঠন-প্রকরণে ততটা নয় যতটা পোড়ামাটি-ভাস্কর্যের উৎকর্ষ ও বিপুলতায়। রাঢ় অঞ্চলে অধিকাংশ "টেরা-কোটা" মন্দিরেই পোড়ামাটির অলংকরণগুলি শুধু সম্মুখের দেওয়ালেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে; দেবালয়ের একাধিক দেওয়াল এভাবে সজ্জিত করবার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। জোড়-বাংলা মন্দিরটিতে কিন্তু এই কারুকৃতিগুলি স্থান পেয়েছে খিলানে, স্তম্ভগাত্রে এবং চারদিকের দেওয়ালের সর্বত্র। শুধু বাহিরের দিকেই নয়, ঢাকা বারান্দাটির ভিতরের দেওয়াল-গুলিও পোড়ামাটির ভাস্কর্যে আবৃত। বস্তুত, সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় একমাত্র বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়-এর মন্দিরটি ছাড়া আর কোথাও "টেরাকোটা"-অলংকরণের এমন বিপুল প্রয়োগ হয়েছে বলে মনে হয় না।

শুধু সংখ্যায় নয়, এগুলির চমৎকারিত্বেও বিষ্ণুপুরের জোড়-বাংলা মন্দিরটি বাঁকুড়া তথা তাবৎ রাঢ়দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবালয়। মন্দিরটি একদা যে "কৃষ্ণ-রাধিকার আনন্দের জন্য" নির্মিত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠা-ফলকেই সে কথা প্রকাশ। অতএব, সহজবোধ্য কারণেই, কৃষ্ণলীলাবিষয়ক 'মোটিফ'গুলিই ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছে। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, পৌরাণিক উপাখ্যান, হিন্দু-দেবলোকের অজস্র চিত্রকল্প প্রভৃতি কিছুমাত্র অবহেলিত হয়নি। এ ছাড়া শিকার এবং স্থল ও নৌযুদ্ধচিত্র এত অধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে যে একটিমাত্র মন্দিরে তার তুলনা সমগ্র রাঢ়দেশে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। পোড়ামাটির ভাস্কর্য-নৈপুণ্যে জোড়-বাংলার জুড়ি মেলা ভার। প্রসঙ্গত, এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, ১৬৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলে, এটি বঙ্গের প্রাচীনতম "টেরাকোটা" মন্দিরগুলির

খৃষ্টাব্দ অবধি প্রায় একশো বছর ধরে প্রধানত ল্যাটেরাইট নির্মিত এই চার-চালা-একচূড় শৈলীটি বিশেষ করে বিষ্ণুপুরে অবাধ সমাদর লাভ করেছিল বলে মনে হয়, কেননা, এই সময়ের মধ্যে এ জাতীয় বহু সংখ্যক দেবালয়ের তুলনায় মাত্র একটি ভিন্ন শৈলীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল মল্ল-রাজধানীতে। সে ব্যতিক্রমটি রঘুনাথ সিংহের মহিষী রাণী শিরোমণি (নামান্তরে, চূড়ামণি) কর্তৃক ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল-এর পঞ্চরত্ন মন্দির। বিষ্ণুপুরে এতাদৃশ মর্যাদালাভ করলেও, আশ্চর্যের কথা, বাঁকুড়া জেলার অন্যত্র এই নির্মাণরীতির ইমারত বেশি প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

বিষ্ণুপুরের চার-চালা-একচূড় দেব-সৌধগুলিকে, অবস্থান অনুসারে মোটামুটি চার দলে ভাগ করা যেতে পারে। লালবাঁধ দীঘির অব্যবহিত দক্ষিণে কালাচাঁদ, রাধা-মাধব, রাধাগোবিন্দ ও আর একটি প্রতিষ্ঠা-ফলকবিহীন জীর্ণ মন্দির পরস্পরের কাছা-কাছি অবস্থিত। এই "গ্রুপ" থেকে কিছু পশ্চিমে তিনটি অনুরূপ মন্দির আছে; সেগুলি যৌথভাবে "জোড়-মন্দির" নামে পরিচিত। বিষ্ণুপুরের এককালীন দুর্গ-এলাকায় অবস্থিত চারচালা-একচূড় দেবালয়গুলির নাম—লালজী ও রাধাশ্যাম। আর, শহরের মধ্যের অনুরূপ দেবগৃহগুলি মদনমোহন, রাধাবিনোদ ও মুরলীমোহনের। এ ছাড়াও, শহরতলিতে, শ্যামবাঁধ ও কৃষ্ণবাঁধের মধ্যবর্তী জায়গায়, একই শৈলীর আর একটি মন্দির আছে, প্রতিষ্ঠাফলক ও বিগ্রহের অভাবে যেটির নামোদ্ধার কষ্টকর। এতগুলি ইমারতের মধ্যে শুধু মদনমোহন ও রাধাবিনোদ-এর মন্দির দুটিই পোড়া-মাটির ইঁটে তৈরি; বাকি সবকটির নির্মাণ-উপকরণ ল্যাটেরাইট বা মাকড়া পাথর।

লালবাঁধ-তীরবর্তী চারটি সৌধের মধ্যে কালাচাঁদ-এর মন্দিরটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। দক্ষিণমুখী এ মন্দিরটি এক ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত। তিন-খিলানের ব্যবহার শুধু সামনের দেওয়ালে না হয়ে যে চতুর্দিকে চারটি দেওয়ালেই হয়েছে এটি একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কারিগরিতে উৎকৃষ্ট না হলেও, দক্ষিণের দেওয়ালে প্রথাগতভাবে কিছু ল্যাটেরাইট-ভাস্কর্যের "প্যানেল" নিবদ্ধ আছে। চূড়ার বিন্যাসও বিশেষত্ববর্জিত নয়। খাড়া অংশটি, প্রতি দিকে, সাতটি "রথ-পগের" সমবায়ে নির্মিত এবং শিখরদেশ "স্টেপ্-পিরামিড" আকৃতির। শীর্ষের আমলক-শিলাটি ও সমগ্র মন্দিরের তুলনায় চূড়াটি বৃহদায়তন।

এই "দলের" রাধামাধব মন্দিরটি গঠন-প্রকরণে কোন অভিনবত্বের দাবি করতে না
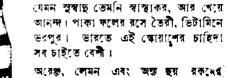
পারলেও, সেটির বর্ণনায় সংলগ্ন এক ভগ্ন "ভোগমণ্ডপ" ও পাকা-গাথনির একটি বৃহদাকার তুলসীমঞ্চের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। "ভোগমণ্ডপ"টি একদা এক-বাংলা বা দো-চালা শৈলীতে নির্মিত হয়েছিল। বাঁকুড়া জেলায় অধুনা এই রীতির কোনো দেবালয় বিদ্যমান না থাকলেও, ইতস্তত-অবস্থিত এরকম কয়েকটি দো-চালা "ভোগ-মণ্ডপ" থেকে অনুমান করা সংগত যে, স্থানীয় স্থপতিরা এ-জাতীয় নির্মাণ-পদ্ধতিতেও পারদর্শী ছিলেন। বৈষ্ণব মন্দিরের প্রাঙ্গণে তুলসীমঞ্চ-স্থাপনা সেকালে দেবগৃহ নির্মাণের অঙ্গ বলেই বিবেচিত হত। বাঁকুড়া জেলায় এ-রীতিটি প্রায় সর্বত্রই অনুসৃত হয়েছে। দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত অর্ঘ অনেক সময় এই তুলসীমূলে সমর্পিত হত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর বিষ্ণুপুর শাখার বহুসংখ্যক প্রাচীন মুদ্রার যে-সংগ্রহটি আছে, তার বেশ কিছু অংশ বিভিন্ন মন্দিরের তুলসীমঞ্চের মাটি খুঁড়ে পাওয়া বলে শুনেছি।

রাধাগোবিন্দ মন্দিরটি রাধামাধব মন্দিরের অব্যবহিত পশ্চিমে অবস্থিত। স্থাপত্য-ভাস্কর্যে এটি আর পাঁচটা চারচালা-একচূড় ল্যাটেরাইট দেবসৌধেরই অনুরূপ। কিন্তু মন্দির-প্রাঙ্গণে মাকড়া পাথরে নির্মিত, স্তূপাকৃতি একটি রথ আছে; সেটিই এ-দেবালয়ের বৈশিষ্ট্য। জগন্নাথের কাঠের রথের মত এটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু অনুমান হয়, বিশেষ বিশেষ তিথিতে মন্দির-বিগ্রহ বা তাঁর ক্ষুদ্রায়তন বিকল্প-মূর্তি আনুষ্ঠানিকভাবে এই পাথরের রথে স্থাপন করা হত। বাঙালী জনসাধারণের কাছে জগন্নাথকেই রথযাত্রার অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা হিসাবে কল্পিত। কিন্তু হিন্দু ধর্মচিন্তায় যিনি জগন্নাথ, তিনিই বিষ্ণু, আবার তিনিই কৃষ্ণ। অতএব, রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের কৃষ্ণ বিগ্রহের রথারূঢ় হওয়াটা তাঁর অধিকারভুক্ত বলেই বিবেচিত হত। বাঁকুড়া জেলার কৃষ্ণমন্দিরগুলিতে কিন্তু এ-জাতীয় রথের উপস্থিতি খুবই বিরল।

পূর্বোল্লিখিত দেবালয়গুলির কিছু পশ্চিমে "জোড়-মন্দির" 'গ্রুপের' তিনটি দেবসৌধ একত্র অবস্থিত। সমস্ত অঞ্চলটিই এখন লোকালয়ের বাইরে। কিন্তু মল্লরাজাদের আমলে এখানে যে লোক-বসতি ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। দক্ষিণ দিকের সর্ববৃহৎ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায়, সম্ভবত এ-তিনটি মন্দিরই একই সময়ে, ১০৩২ মল্লাব্দ, অর্থাৎ ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে, রাজা গোপাল সিংহ প্রতিষ্ঠা করেন। স্থাপত্যের দিক থেকে অভিনবত্ব বিশেষ নেই, তবে মধ্যবর্তী ছোট মন্দিরটিতে কিছু উৎকৃষ্ট ল্যাটেরাইট-ভাস্কর্য আছে।

বিষ্ণুপুরের এককালীন দুর্গ-এলাকার

দিকেই উল্লেখযোগ্য। লালজী মন্দিরটি চারচালা-একচূড় মন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম। ভিত্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৪ ফুট এবং দক্ষিণমুখী এ-মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রস্থ প্রায় ৪১ ফুট। পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তিনটি করে খিলান ও সংলগ্ন দালান আছে। দক্ষিণের দালানের দেওয়ালে একদা বহুবর্ণ "ফ্রেসকো" অঙ্কিত ছিল। বাঁকুড়ার দেবালয়গুলিতে "ফ্রেসকো-" অলংকরণ প্রায় নেই বললেই চলে। চূড়ার গঠন প্রথাগত। নীচের খাড়া অংশের চারদিকে চারটি খিলানযুক্ত অলিন্দ ও সাতটি করে "রথ-পগ" আছে; উপরের অংশ "স্টেপ পিরামিড" আকৃতির। এ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলকটি নিম্নরূপঃ

> শ্রীরাধিকাকৃষ্ণমুদে শকেহব্দে
> রসাঙ্কযুক্তে নবরত্নমেতৎ।
> মল্লাধিপঃ শ্রীরঘুনাথ সূনুর্দদৌ
> নৃপঃ শ্রীযুত বীরসিংহ॥

(শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণের আনন্দের জন্য মল্লাধিপ শ্রীরঘুনাথ সিংহের পুত্র নৃপ শ্রীযুত বীরসিংহ ৯৬৪ মল্লাব্দে এই নবরত্ন দান করিলেন।) ৯৬৪ মল্লাব্দ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সমার্থক। অতএব, এ-দেবালয়টি এ-জাতীয় প্রাচীনতম লালজীর মন্দিরের মাত্র দু' বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঠিক একশো বছর পরে, ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, রাজা চৈতন্য সিংহের প্রযত্নে মদনমোহন মন্দিরটি নির্মিত হয়। বিষ্ণুপুরের প্রতিষ্ঠাফলকযুক্ত দেবালয়গুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে অর্বাচীন। এ-মন্দিরের

প্রতিষ্ঠালিপিতে বিগ্রহের স্বরূপ ও উৎসর্গকারী নৃপতির নামোল্লেখ ছাড়াও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে এই যে, প্রতিষ্ঠার বৎসর ১০৬৪ মল্লাব্দ ১৬৮০ শকাব্দের সমার্থবাচক। বাঁকুড়া জেলার সন-চিহ্নিত যাবতীয় মন্দিরে কেবলমাত্র মল্লাব্দেরই উল্লেখ করা হয়েছে; এই ব্যতিক্রমটি ছাড়া শকাব্দ বা বঙ্গাব্দ আর কোথাও উল্লিখিত হয়নি। রাধাশ্যাম মন্দিরে উৎকীর্ণ অনুপাত থেকে দেখা যায়, কোন অজ্ঞেয় কারণে, বঙ্গাব্দকে ঠিক একশো বছর কমিয়ে মল্লাব্দ গণনা প্রচলিত হয়েছিল। এবিষয়ে আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের ডঃ ব্লক মন্তব্য করেছেন—"একশো বছরের তারতম্য ব্যতীত আর সব দিক থেকে বঙ্গাব্দ ও মল্লাব্দের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই।" অতএব, মনে হয়, মল্লাব্দের প্রচলন নিছক আত্মাভিমানপ্রসূত; মল্লরাজারা তাঁদের রাজত্বকালকে গৌরবান্বিত করবার জন্যই

এই পৃথক অব্দ-গণনার সূত্রপাত করেছিলেন।”

ল্যাটেরাইট-ভাস্কর্যের বহুলতার জন্যেও রাধাশ্যাম মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, এত নিপুণ ও এত অধিকসংখ্যক প্রস্তর-অলংকরণ বাঁকুড়া জেলার আর কোন মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সন্দেহ। আর এক কারণে এ-দেবালয়টি বিশেষভাবে স্মরণীয়। সে-কারণ পাঠকের মনে হয়ত বিষাদের উদ্রেক করবে। বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ দেবগৃহই এখন বিগ্রহশূন্য। মল্লরাজবংশের বর্তমান “রাজা”র এমন সামর্থ্য নেই যে, এতগুলি মন্দিরে পৃথকভাবে সেবা-পূজার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করতে পারেন। সেজন্য বিষ্ণুপুরের প্রায় যাবতীয় দেবালয়ের বিগ্রহ একত্র করে এ-মন্দিরে রক্ষিত আছে; তাঁদের ভোগ পূজা প্রভৃতি একত্রেই সম্পাদিত হয়ে থাকে।

পরবর্তী নিবন্ধে বিষ্ণুপুর শহরের বাইরে ও বাঁকুড়া জেলার অন্যত্র অবস্থিত চারচালা-একচূড় মন্দিরগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

(ক্রমশ)

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

বেগম মেরী বিশ্বাস

বিমল মিত্র

॥ ১৯ ॥

বশির মিয়া অবাক হয়ে গেল। বললে—তুই বলছিস্ কী? তুই কি মস্তানা হয়ে গেছিস? দেখছিস শহর এখন মীর বক্সীর তাবে। ওদিক থেকে নবাবের ভাইরা এসে কোন্‌দিন মসনদ্ লুঠে নেবার তাল করছে। এখন চেহেল-সুতুনে কড়া পাহারা বসে গেছে। খবরদার ও-আবদার করিস্‌নি। তুই ও কাউকে বলিসনি আমাকেও কাউকে বোলোনি—ও-সব আবদার ছাড় তুই

কান্ত বললে—তুই একটু চেষ্টা করে দেখ না—

—ওরে বাবা, কেউ যদি জানতে পারে তো আমার জান নিকলে যাবে—

বলে বশির মিয়া বাইরে চলতে আরম্ভ করলো। বললে—সে জামানা আর নেই রে, নইলে তোকে ঢুকিয়ে দিতুম, এখন নানী-বেগম খুব হুঁশিয়ার হয়ে গেছে। পীরালি খাঁ, নজর-মহম্মদ, বরকত আলিরা এখন নিজেদের জান নিয়ে পাগল।

—কিন্তু ভেতরে কোনও রকমেই যাওয়ার উপায় নেই? আমি একবার শুধু যাবো, রানীবিবির সঙ্গে শুধু একটা কথা বলে চলে আসবো—শুধু একবার!

—কেন, রানীবিবির সঙ্গে তোর কিসের কারবার?

কান্ত বললে—শুধু একটা কথা বলে আসবো রানীবিবিকে—

—কী কথা?

কান্ত বললে—কাটোয়ার সরাইখানায় আমাকে রানীবিবি একটা খবর জানাতে বলেছিল, সেটা বলা হয়নি আর। কোতোয়াল আর কথা বলতে দেয়নি—

—কী কথা?

—বলেছিল একটা পাগলের নাম জেনে আসবে। পাগলটা গান গাইছিল সরাইখানার সামনে।

বশির বললে—উদ্ধব দাস? উদ্ধব দাসের কথা বলছিস?

—তুই চিনিস উদ্ধব দাসকে?

—খুব চিনি। আরে, লোকটা বে-কাম লোক। আমি ওকে কাম দিতে চেয়েছিলুম। ও তো দুনিয়া টহল দিয়ে বেড়ায়, বলেছিলুম জাসুসী কাম করতে। তামাম বাঙলা-মুলুককে এখন আমাদের জাসুস দরকার, মেসিটি বেগমসাহেবাকে তো পাকড়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু দুষমনের তো কমতি নেই—

কান্তর ও-সব কথা শুনতে ভালো লাগছিল না। ছোটবেলা থেকে কান্ত দেখে এসেছে ও-সব দুষমন সকলেরই আছে। টাকা পয়সা প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি থাকলেই দুষমন থাকবে। যত বেশি টাকা থাকবে, তত বেশি দুষমন থাকবে। বড়-চাতরার নায়েব-নাজিমবাবুদের মালখানা পাহারা দিত পাহারাদাররা বন্দুক নিয়ে।

কান্ত হঠাৎ কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—তা হলে দেখা করা হবে না, রানী-বিবির সঙ্গে?

—না না, ও-কথা বলিস নি এখন, আর কথা বলা... তোকে একটা অন্য একটা কাজ দেব—

—কী কাজ?

—একটা চিঠি দেব, সেটা মহারাজ কিস্টোচন্দরকে গিয়ে দিয়ে আসতে হবে—

—কার চিঠি?

—ও-সব পুছিস্ নি। তোকে যা কাম দেব তাই করবি—তা তার দেরী আছে, বখত্ হলেই বলবো—

বলে বশির মিয়া চলে গেল। কান্ত অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেও কী করবে তার কূল-কিনারা করতে পারলে না। আবার ফিরে এল শারাফাত আলির খুশবু তেলের দোকানে। ক'দিন থেকেই এই দোকানের পেছনে থেকে থেকে কান্ত একটা জিনিস বুঝে নিয়েছিল যে শারাফাত আলির কাছে মুর্শিদাবাদের নানান ধরনের লোক নানান কাজে আসে। শারাফাতকে সবাই যেন একটু মান্য-গণ্য করে। মিয়াসাহেবের টাকাও আছে বেশ। আসলে টাকা উপায় করবার জন্যে কারবার করলেও শারাফাত আলির যেন অন্য আর একটা দিকও আছে। সেটা যে কী তা কান্ত এতদিন মিশেও বুঝতে পারেনি। মাঝে-মাঝে বুড়ো কান্তকে ডাকে। জিজ্ঞেস করে—কান্তর সংসারে কে-কে আছে। কেন মুর্শিদাবাদে চাকরি করতে এসেছে। দিনের বেলা যখন নেশা থাকে না মিয়াসাহেবের তখন ভালো-ভালো উপদেশ দেয়। বলে—এ বড় আজব শহর, এখান থেকে ভাগ্ তুই কান্তবাবু। নবাব একদিন ডুববেই, মুর্শিদাবাদও একদিন ডুববে, তখন তুইও ডুববি—

কান্ত বসে-বসে বুড়োর কথাগুলো শুনতো। দুপুরবেলা যখন খদ্দের থাকতো না দোকানে, চক্-বাজারের রাস্তাটা যখন খাঁ খাঁ করতো, তখন বুড়ো নেশা করতো না। ওই শুধু গড়গড়াটা টানতো ভুড়ুক-ভুড়ুক করে। কান্ত থাকবার জন্যে ঘরখানার ভাড়া দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বুড়ো নেয়নি। কান্ত জোর করে বুড়োর হাতে কড়ি গুঁজে দিতে

চেয়েছিল। বুড়ো সে কড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল চক্-বাজারের রাস্তায়। বলেছিল—তোর কাছ থেকে আমি কেরায়া নেব? তুই কি ভেবেছিস আমি রুপিয়ার কাঙাল?

তারপর থেকে আর কেরায়ার কথাও ওঠেনি, কান্তও কেরায়া দেয়নি। কিন্তু মনে হতো কী যেন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে সারাফাত আলির জীবনের পেছনে। নইলে নিজামতকে অত গালাগালি দেয় কেন দিনরাত। কেন উঠতে বসতে নবাবকে গালমন্দ করে?

কান্ত জিজ্ঞেস করতো—চাকরি না-করলে আমি খাবো কী? বাঁচবো কী করে?

সারাফাত আলি বলতো—যারা চাকরি করে না তারা খেতে পায় না? তারা বেঁচে নেই?

—কিন্তু আমার যে কেউ নেই, কিছু নেই মিয়াসায়েব!

বুড়ো বলতো—আমার কে আছে? আমাকে কে খিলাচ্ছে? খিলানের মালিক যদি খিলায় তো নবাবের চৌদ্দ-পুরুষের সাধ্যি আছে তোকে মারে?

তারপর কান্ত বুঝি আর কৌতূহলটা চেপে রাখতে পারতো না। জিজ্ঞেস করতো—মিয়াসায়েব আপনি কেন বুড়ো বয়েসে এত খাটছেন? এত কারবার করে পরেশান হচ্ছেন? কার জন্যে? আপনার এত টাকা খাবে কে?

এ কথার উত্তর দিতে বুড়ো বুঝি একটু থতমত খেয়ে থমকে যেত। উত্তর দিতে গিয়েও থেমে যেত। তারপর গড়গড়ার নলটা নিয়ে ভুড়-ভুড় করে টানতে সুরু করতো। আর কোনও কথার জবাব দিত না। অন্য কথা বলতো।

সেদিন দোকানের ভেতরে চুপি চুপি কার সংগে বুড়োর কথা হচ্ছিল। কান্ত পেছনের ঘর থেকে সব শুনেছিল।

মিয়া সাহেব জিজ্ঞেস করলে—কী রে নজর মহম্মদ, বিবিজানের দিমাগ্ কিস্তরহ্ হ্যায়?

লোকটা বললে—ওইসাহি হ্যায়, বহোত্ রো রাহি হ্যায়—খুব কাঁদছে মিয়াসাহেব—ইলাজ করাচ্ছি, তবু কিছু আরাম হচ্ছে না—

মিয়াসাহেব বললে—আরাম হবে না—

নজর মহম্মদ বললে—ক্যা মিয়াসাহেব?

সারাফাত আলি সাহেব চিৎকার করে উঠলো—মালেখ্‌লিয়া দিমাগী কভি অচ্ছা নেহি হোনেওয়ালী, আরাম ভি নেহি হোগা, উস্ ইলাজ ভি কোই নেহি বানানে সেকেগা, তুম্‌হারা হারেম ভি জাহান্নমমে [illegible] যাও, আরক নেহি মিলেগা [illegible], যাও নিকল্ যাও ইঁহাসে—

বুড়ো সারাফাত আলি যখন রেগে যায় তখন কাউকেই আর পরোয়া করে না। তখন যাকে তাকে যা-তা বলতে সুরু করে। নজর মহম্মদ [illegible] কিছু বললে না। [illegible] চলে গেল [illegible] হয়ে।

কথাটা মনে ছিল কান্তর। সেদিন যখন সারাফাত আলির দেখা পেয়ে [illegible], তখন [illegible] কান্ত কাছে যেতেই বুড়ো জিজ্ঞেস করলে—[illegible] তুই [illegible]? [illegible]?

[illegible] বুড়ো আবার জিজ্ঞেস করলে [illegible] নিয়ে এলি? [illegible] আমার কাছে লুকোস্ নি। আমি [illegible] বলবো না—

[illegible] বললে—[illegible]!

[illegible] উঠলো—উল্লু-[illegible]—

[illegible] মিয়াসাহেব রেগে [illegible] মিয়াসাহেব [illegible] টান দিতে [illegible] তারপর অনেকক্ষণ পরে বললে—[illegible]?

[illegible] আমি শুধু হুকুম তামিল [illegible], আমার কোনও দোষ নেই—

দোষ নেই? তোরই তো দোষ! কেন তুই হিন্দুর বিবিকে মুসলমানের হারেমে [illegible] ইজ্জৎ [illegible]! তুই তো জাহান্নমে যাবি, তোদের [illegible] তো নরক আছে, সেখানে যাবি তুই দেখবি—

কান্ত চুপ করে রইল। বুড়োও খানিকক্ষণ গড়গড়া টানতে লাগলো একমনে।

কান্ত একবার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—অচ্ছা মিয়াসায়েব, ওই যে কাল আপনার

কাছে এসেছিস, নজর মহম্মদ নাম, ও কে? ও কি চেহেল-সুতুনের লোক?

—হ্যাঁ, খোজা নজর মহম্মদ!

—আচ্ছা, ওকে বললে আমাকে একবার চেহেল-সুতুনে ঢুকিয়ে দিতে পারে না? হাতিয়াগড়ের রানীবিবির সঙ্গে মুলাকাত্ করিয়ে দিতে পারে না?

—কেন? মুলাকাত করবি কেন? কী কাম তোর রানীবিবির সঙ্গে?

কান্ত বললে—রানীবিবি পালিয়ে যেতে চেয়েছিল রাস্তায়। তখন আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, কাটোয়ার ডিহিদারের লোক আসাতে আর পালানো হয়নি। এবার দেখা করে ভাবছি কথাটা তুলবো—

—বিবিকে নিয়ে পালিয়ে যাবি চেহেল-সুতুন থেকে?

কান্ত বললে—হ্যাঁ মিয়াসায়েব, আমি বুঝতে পেরেছি আমি পাপ করেছি, আমি সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই মিয়াসায়েব, আমার রাত্তিরে ঘুম হচ্ছে না ক'দিন থেকে—

সারাফাত আলি এবার মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে কান্তকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে দেখলে। যেন মনে হলো কান্তকে পরখ করছে একদৃষ্টে।

তারপর বললে—পারবি তুই কান্তবাবু? তোর কলিজার জোর আছে?

কান্ত বললে—পারবো মিয়াসায়েব। রানীবিবি যদি রাজি থাকে তো আমার সাহসের অভাব হবে না। আমি বলছি, আমি পারবো—

—ঠিক পারবি?

সারাফাত আলির যেন সন্দেহ হলো। পারবি তো ঠিক? ভয় করবে না তো তোর?

—হ্যাঁ, বলছি তো পারবো মিয়াসায়েব। নিশ্চয় পারবো!

—চেহেল-সুতুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দিতে পারবি? ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে একেবারে গোরস্থান বানিয়ে দিতে পারবি? যেন হাজি আহম্মদের বংশের হাড্ডি পর্যন্ত কবরের ভেতরে ভয়ে কেঁপে ওঠে, এমন করে নবাব-হারেমের প্রত্যেকটা ইট গুঁড়িয়ে পিষে ফেলতে পারবি? সত্যি বল্ ছিস, তুই পারবি?

বুড়োর গলাটা যেন কেমন করুণ শোনালো খুব।

কান্ত বললে—হ্যাঁ পারবো মিয়াসায়েব! আপনি যদি একটু মদৎ দেন তো নিশ্চয় পারবো—

বুড়ো এবার কান্তকে একহাত দিয়ে একেবারে জড়িয়ে ধরলে। এ-রকম কখনও করে না সারফাত আলি। বুড়োর চোখ দিয়ে এর আগে কখনও জল পড়তেও দেখেনি কান্ত। এ কী হলো বুড়োর!

—আমি পারিনি রে কান্তবাবু! আমি কোশিস্ করেছিলুম, কিন্তু পারিনি। আমার কলিজা ভেঙে দিয়েছে ওরা, আমাকে নেশা ধরিয়েছে ওরা, আমাকে দিওয়ানা করেছে ওরা, তাই আজ আমি আফিং মিশিয়ে তাম্বাকুর ধোঁয়া টানি, আফিং খাই, চরস খাই, ওদের পোড়াতে গিয়ে আমি নিজেই পুড়ে আজ খাক হয়ে যাই কান্তবাবু........

বলতে বলতে সারাফাত আলি সাহেব হঠাৎ মাঝপথে থেমে গেল। হয়ত বুঝতে পেরেছে এত কথা বলা কান্তর সামনে উচিত হয়নি। কিন্তু না, সেই লোকটা আবার এসে দাঁড়িয়ে। সেই নজর মহম্মদ! নজর মহম্মদকে দেখেই সারাফাত আলি সামলে নিয়েছে নিজেকে। নজর মহম্মদও একজন অচেনা লোককে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে।

সারাফাত আলি কান্তর দিকে চেয়ে বললে—তুই এখন যা কান্তবাবু, আমার খদ্দের এসেছে—

কান্ত চলে যেতেই সারাফাত নজর মহম্মদকে খাতির করে দোকানের গদিতে বসালে। তাকিয়া এগিয়ে দিলে। বললে—ইলাজ হলো নজর মিয়া?

নজর মহম্মদ সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—ও কে মিয়াসাহেব? কাফের আদমী মালুম হচ্ছে?

সারাফাত আলি বললে—তোমার সঙ্গে একটা বাত আছে নজর মিয়া, একটা কাম করতে পারবে আমার? একটা উপকার?

—বলুন মিয়াসায়েব!

—তোমাদের চেহেল-সুতুনে হাতিয়াগড়ের রানীবিবি এসেছে না?

নজর মহম্মদ কথাটা শুনেই শিউরে উঠলো। সর্বনাশ! তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—হাতিয়াগড়ের রানী-বিবি! কই, না তো মিয়াসাহেব! নই-বেগম যে এসেছে সে তো লস্করপুরের তালুক-দারের লেড়কী মরিয়ম বেগম—

—আমার কাছে ঝুটা বোল না নজর মিয়া, আমার সব মালুম আছে—

নজর মহম্মদ একটু বিরত হয়ে পড়লো। সারফাত আলি আবার বলতে লাগলো—আর যার কাছে যা বলো তুমি, আমার সঙ্গে
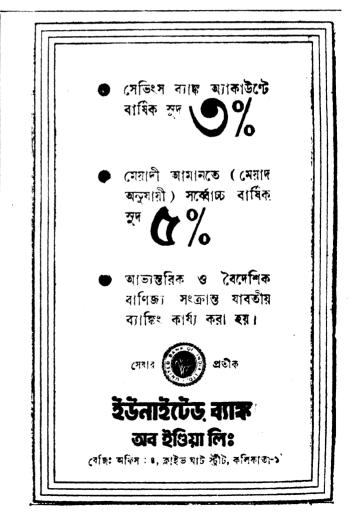
দিল্লাগি করতে যেও না। হাতিয়াগড়ের রানীবিবিকে যে-আদমী এনেছে সে আমার খুলিতে আছে, আমি সব জানি—

নজর মহম্মদ আর কোনও কথা বলতে পারলে না।

সারাফাত আলি বললে—আমার একটা কাম করতে হবে তোমাকে নজর—

—কী কাম?

—আমার আদমীকে চেহেল-সতুনের হারেমের অন্দরে নিয়ে যেতে হবে একদফে, রানীবিবির সংগে তার মুলাকাত্ করিয়ে দিতে হবে—

নজর মহম্মদ ভয় পেয়ে গেল। চারদিকে চেয়ে গলা নিচু করে বললে—এ আপনি কী বলছেন মিয়াসায়েব, আমি কি হারেমের মালিক। মালিক তো নানীবেগম—

সারাফাত আলি বললে—ও-কথা তুমি দুসরা কাউকে বলো নজর, আমাকে বলতে এসো না—আস্‌লি মালিক কে তা আমি জানি—

—আসলি মালিক তো পীরালি মিয়াসায়েব!

—তাহলে এতক্ষণ ঝুট্-মুট্ কথা বাড়াচ্ছিলে কেন? আমার এ-কাজটা করতেই

হবে। পীরালিই মালিক হোক আর যে-ই মালিক হোক, তুমিই তো সব। নজরানা কত লাগবে বলো?

—কীসের নজরানা?

সারাফাত আলি হেসে উঠলো। বললে—হুম, রিশ্‌ওয়াত্! বেগর-নজরানাতে তো হারেমের খোজারা কিছু করে না তাই জিজ্ঞেস করছি! কত নেবে তুমি?

নজর লজ্জায় পড়লো। বললে—আপনার কাছে কী নেব মিয়াসায়েব?

—না, তোমাকে নিতে হবে। তোমার যা মামুলি পাওনা আছে, তা আমি আমার নিজের তবিল থেকে দেব। এক মোহর?

নজর বললে—সে আপনার যা খুশী দেবেন—

কথাটা শুনেই সারাফাত আলি চিৎকার করে ডাকলে—কান্তবাবু, ইধর্ আ—

এতক্ষণ পেছনের ঘরে দাঁড়িয়ে কান্ত সবই শুনেছিল। এবার সামনে এসে দাঁড়াতেই সারাফাত আলি তাকে দেখিয়ে নজর মহম্মদকে বললে—এই আমার আদ্‌মী, এ যাবে—

নজর মহম্মদ ভালো করে দেখে নিলে কান্তকে। তারপর বললে—ঠিক আছে মিয়াসায়েব, আপনি যখন বলছেন, তখন ঠিক আছে, লেকেন্ কেউ যেন জানতে না পারে—

সারাফাত বললে—কেউ জানবেনা, কোয়া-চিঁড়িয়া ভি জানবে না—

নজর মহম্মদ বললে—তাহলে আমি সমঝে বখ্‌ত্ আসবো মিয়াসায়েব, বাবুজীকে মেরে সাথ লিয়ে চলবো—বলে সেলাম করে নজর মহম্মদ চলে গেল।

নজর মহম্মদ চলে যেতেই সারাফাত আলি কান্তর দিকে ফিরলো। বললে—তাহলে তৈয়ার থাকবি কান্তবাবু। কিন্তু যা বললুম তা পারবি তো? চেহেল-সতুন ভেঙে গুঁড়িয়ে পিষে গোরস্থান বানাতে পারবি তো? আমি যা পারিনি তুই তা পারবি তো?

মনে আছে কান্ত সেদিন বুড়োর এই কথাগুলো শুনে বড় অবাক হয়ে গিয়েছিল। চেহেল-সতুনের ওপর বুড়ো সারাফাত আলির কীসের এত রাগ? কেন এত অভিযোগ! কী করেছে বুড়োর চেহেল-সতুন? কী এমন অপরাধ করেছে যার জন্যে নিজের গাঁটের মোহর খরচ করে কান্তকে হারেমের ভেতরে যাবার ব্যবস্থা করে দিলে?

হাতিয়াগড়ের রাজবাড়িতে জনার্দন আসার পর থেকেই জগাখাজাঞ্চি মশাই বলে দিয়েছিল—দেখ বাপু, তুমি নতুন লোক, তোমাকে বলে রাখাই ভালো, ছোটমশাইএর মেজাজ বড় কড়া। ভালো কাজ করা চাই কিন্তুক্, নইলে অন্য লোক দেখবো—

কিন্তু জনার্দনের কাজ-কর্ম দেখে সবাই অবাক। বরাবর শোভারামই এ-কাজ করে এসেছে। সেই গদাই নস্করের চালে আসতো। তারপর গোকুল তেল এনে দেবে, গামছা এনে দেবে, শোভারাম তখন ছোটমশাইকে তেল মাখাতে শুরু করবে। তারপর সোহাগের মেয়ে মরালী। মেয়ের খেদমত্ করবে না ছোটমশাই-এর খেদমত করবে! মেয়ের জন্যে কাজে মনই ছিল না শোভারামের। তারপর শোভারামের নিজের কোর্ফা জমি ছিল। তাতে জন-খাটিয়ে বেগুনটা উচ্ছেটা চাষ করতো। তারপর আছে কান্নাকাটি। জগাখাজাঞ্চিবাবুর কাছে এসে প্রায়ই হাত পাততো। বলতো—খাজাঞ্চিবাবু দুটো টাকা, হাওলাত দ্যান্, আর পারিনে—

এই রকম হাওলাত নিয়ে-নিয়ে যে কত টাকা বাকি পড়েছিল তার আর হিসেব ছিল না। একদিন জগাখাজাঞ্চিবাবু আর পারলে না। সোজা গিয়ে ছোটমশাইকে বললে—শোভারামের কাছে কাছারির ছ টাকা তের গণ্ডা দামড়ি বকেয়া পাওনা, তাগাদা দিয়ে দিয়েও আর পাচ্ছি না, কী করবো তাই হুকুম দেন—

ছোটমশাইও তেমন। আদর দিয়ে দিয়ে একেবারে মাথায় তুলেছিলেন। বললেন—ওর কি আর দেবার ক্ষমতা আছে খাজাঞ্চিমশাই, ওটা আমার নামেই খরচাত দেখিয়ে দাও খাতায়—

কিন্তু এবার জনার্দন আসতেই জগা-খাজাঞ্চিবাবু আগে-ভাগে কথা বলে নিয়েছিল—দেখ বাপু, তোমার আবার শোভারামের মত সোহাগের মেয়ে-টেয়ে নেই তো?

জনার্দন হাতজোড় করে বলেছিল না—

—আগে কোথাও কাজ-কাম করেছ?

—আজ্ঞে না, হুজুর।

—দেশ কোথায়?

—ছিদামপুর।

শুধু ছিদামপুর বললে আমি কী বুঝবো। কোন্ ছিদামপুর? নদের ছিদামপুর না ঝিনেদে'র ছিদামপুর?

—আজ্ঞে ঝিনেদে'র ছিদামপুর।

জগাখাজাঞ্চিবাবু জনার্দনের নাম ধাম কুলজী লিখে নিলে খাতায়। যদি তেমন মন দিয়ে কাজ করতে পারো তো তোমাকেও কোর্ফা প্রজা করে দেব। ছোটমশাইকে তেল মালিশ করে চান করিয়ে দিতে হবে রোজ। তারপর ফাইটা-ফরমাশটাও খাটতে হবে। ছোটমশাইএর সংগে দরকার পড়লে মহালে যেতে হবে।
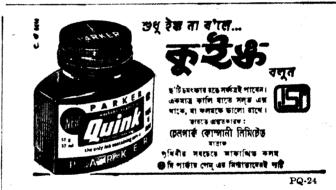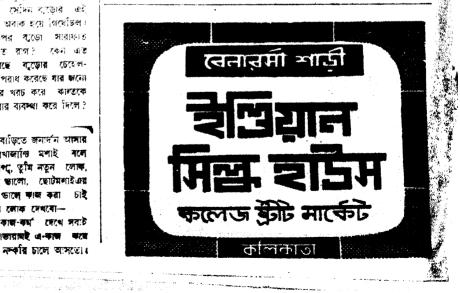
সব তাতেই জনার্দন রাজি। যে-কোনও মাইনে, যে-কোনও কাজ, কিছুতেই না বলেনি জনার্দন। ছোটমশাই তখন নিজের মহালে বেরোয়ই না। শরীরটা খারাপ। নিচে নামাও তাঁর বারণ। কবিরাজ মশাই আসেন, ভেতরে গিয়ে তাঁকে দেখে আসেন, তারপর চলে যান ওষুধ দিয়ে।

একদিন জনার্দন গোকুলকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গো, কী ব্যামো ছোটমশাই-এর?

গোকুল বললে—বড় ভারি ব্যামো গো, বড় ভারি ব্যামো—

—তা কবিরাজ মশাই কী বলছেন? কদ্দিন লাগবে সারতে?

—তা লাগবে অনেকদিন। এ তো তোর আমার মত গরীবের ব্যামো নয়,—

জনার্দন তবু যেন খুশী হলো না। জিজ্ঞেস করলে—ব্যামোটা হলো কেন হঠাৎ?

গোকুল রেগে উঠলো।—তা মানুষের ব্যামো হবে না? রোগ-ব্যামো না হলে
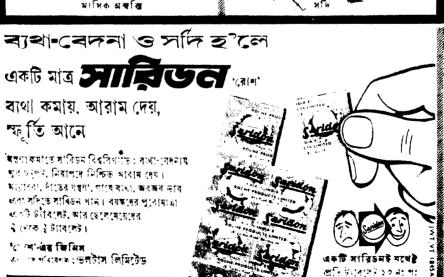
কবিরাজ-বদ্যি-হাকিম কী করতে আছে? তারা কী খাবে?

তা বটে। কথাটা বোধ হয় বুঝলো জনার্দন। কিন্তু বুঝেও সময় পেলেই অকারণ প্রশ্ন করা স্বভাব জনার্দনের।

গোকুল রেগে যায়। বলে—তোর অত কথা জানবার ইচ্ছে কেন বল তো জনার্দন? তোর খেতে পাওয়া নিয়ে কথা। দু'বেলা অতিথশালায় খাবি আর কাজ করবি। আর কাজ না থাকে তো পায়ের ওপর পা দিয়ে আয়েস করে বসে থাকবি। তোর সব কথায় থাকার দরকারটা কী?

জনার্দন বললে—তা যা বলেছ গোকুল, আমার কীসের মাথা-ব্যথা। দু-বেলা দু-টো খাবো আর কাজ না থাকে পায়ের ওপর পা তুলে আয়েস করে বসে থাকবো। কী বলো?

কিন্তু তবু চুপ করে থাকতে পারে না জনার্দন। দরকার না থাকলেও কানুনগো-কাছারিতে গিয়ে বসে। এটা ওটা জানতে চায়। জগাখাজাঞ্চির ওপর অগাধ ভক্তি আবার। দেখলেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মাথায় হাত ঠেকায়।

জগাখাজাঞ্চিবাবু বলে—লোকটার দেব-দ্বিজে ভক্তি-টক্তি আছে দেখছি, শোভারামের মত নয়—

জনার্দন বলে—শুধু বসে-বসে ভাত গিলছি খাজাঞ্চিমশাই, একটা কিছু কাজ-কাম দেন, আর ভাল্লাগছে না—

—কী কাজ করবি তুই? কী কাজ জানিস?

—আজ্ঞে হুজুরের সব কাজ জানি। জল তুলতে জানি, বাটনা বাটতে জানি। ঘর ঝাড় দিতে জানি, পা টিপে দিতে জানি। জানি সব কাজই খাজাঞ্চিবাবু, ছোটমশাই যদ্দিন ব্যামোতে আছেন, তদ্দিন না-হয় অন্য কাজ করি। কাজ না-করে করে যে গায়ে গতরে ব্যথা হয়ে গেল আমার—

এমন উৎসাহী লোক জগাখাজাঞ্চিবাবু জীবনে দেখেনি আগে। একটু অবাক হয়ে গেল। তারপর বললে—আচ্ছা ঠিক আছে, আমার পা দুটো একটু টিপে দে দিকিনি, দেখি তোর কেমন কেরামতি—

তা সেদিন থেকে সেই কাজই করতে লাগলো জনার্দন। যতদিন ছোটমশাই না নিচেয় নামেন ততদিন জনার্দনকে দিয়ে নিজের পা টিপিয়ে নিতে লাগলো জগাখাজাঞ্চিবাবু। তারপর সময় পেলেই অতিথশালায় গিয়ে ঢোকে। গোকুলের সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়। গোকুলের সঙ্গে বার বাড়ি পেরিয়ে ভেতর বাড়ি পর্যন্ত যাবার চেষ্টা করে। ভেতর-বাড়িতে একলা গিয়ে গোকুলের নাম করে এদিক-ওদিক উঁকি মেরে দেখে।

কেউ দেখলে জিজ্ঞেস করে—কে গো তুমি?

—আজ্ঞে আমি জনার্দন।

—তা ভেতর-বাড়িতে কেন?

—আজ্ঞে গোকুলকে ডাকতে যাচ্ছি—

তারপর আর কেউ তেমন আপত্তি করে না। শোভারামও এমনি মাঝে মাঝে ভেতরে যেত। দু-একদিন ভেতরে গিয়ে-গিয়ে রাস্তা-ঘাটও চিনে নিলে। বাড়ির ভেতর বিরাট মহল। এক মহল পেরিয়ে আর এক মহলের সামনে গিয়ে এদিক-ওদিক উঁকি মারে। তারপর পাছে কারো সন্দেহ হয় তাই ডাকে—গোকুল, অ গোকুল—

—কে গা?

তরঙ্গিনী একদিন দেখতে পেয়েছে। নতুন মুখ দেখে ঘোমটা দিয়ে দিয়েছে মাথায়।

—আমি জনার্দন মা, গোকুল আছে ইদিকে?

—না বাবা, গোকুল এ-মহলে তো থাকে না, ও-মহলের ভেতর-দরজায় গিয়ে ডাকো—

এমনি করে ক'দিনের মধ্যেই জনার্দনের বেশ চেনা-শোনা হয়ে গেল সব। অন্ধকারে চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও বেশ অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারে। দুপুরবেলা যখন সবাই খাওয়া-দাওয়ার পর গা আলগা দিয়েছে, জনার্দন তখনও চুপচাপ থাকে না। রেজা আলির কাছেও মাইনে নিচ্ছে, ছোটমশাই-এর কাছেও মাইনে নিচ্ছে। কিন্তু কাজ না দেখাতে পারলে রেজা আলি আর কতদিন চাকরিতে রাখবে!

গোকুলকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গা, তা তোমাদের শোভারাম পাগল হয়ে গেল কেন গা?

গোকুল বলে—মেয়ের শোকে—আর কীসে?

—তা মেয়ে গেল কোথায়?

—মেয়েছেলের চরিত্তিরের কথা কে বলতে পারে বল্! ভগমানও বলতে পারে না, আমি তো কোন্ ছার—

তারপরেই হঠাৎ জনার্দন জিজ্ঞেস করে বসে—ছোটমশাইএর বুঝি দুটো বিয়ে গো গোকুল?

গোকুল চাইলে জনার্দনের দিকে। সন্দেহ করলে নাকি!

জনার্দন বলে—কিছু মনে করলে না তো ভাই! শুনিছি কি না যে ছোটমশাইএর দুটো বিয়ে, তাই জিজ্ঞেস করলুম—

তারপর নিজেই আবার বলে—তা দুটো বিয়েই হোক আর তিনটে বিয়েই হোক, আর ছ'টা বিয়েই হোক, আমরা চাকর-বাকর, আমাদের ও-সব খোঁজ নিয়ে কী দরকার, বলো না! খেতে পাচ্ছি পেট ভরে, তাই বলে বাপের ভাগ্যি—

তারপর রাত যখন গভীর হয়, যখন সব নিশুতি, তখনও জনার্দন জেগে থাকে। জেগে বসে কানটা খাড়া করে রাখে। কোথায় যেন একটা শব্দ হলো না? কে যেন ফিস্-ফিস্ করে কোথায় কথা বলছে না? কোথায় যেন ঝন্ ঝন্ শব্দে শেকল খুলে গেল! আস্তে আস্তে অতিথশালাটা পেরিয়ে ভেতর বাড়ির খিলেনের তলা দিয়ে টিপি টিপি পায়ে এগিয়ে গেল। মনে হলো ওদিকের বারান্দায় যেন একটা কার পায়ের শব্দ হচ্ছে। শব্দটা আরো কাছের দিকে আসছে। ভূতের বাড়ি নাকি?

—কে র‍্যা?

একেবারে দুর্গার মুখোমুখি পড়ে গেছে গোকুল। অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। দূরে এককোণে একটা আলো জ্বলছিল। তার আলোটা মুখে এসে পড়তেই একেবারে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেছে। দুর্গা এসেই একেবারে জনার্দনের হাতটা চেপে ধরেছে।

—কে র‍্যা তুই মুখপোড়া?

জনার্দন বলে উঠলো—আমি মা, আমি—

দুর্গা তবু ছাড়বার পাত্রী নয়। আমি কে? আমির নাম নেই রে মুখপোড়া? একেবারে ভেতরে এসে ঢুকে পড়েছে? ডাকাবো মাধব ঢালীকে—অ মাধব, মাধব—

দুর্গার চিৎকারে সবাই জেগে উঠেছে। ঝি-চাকর সবাই এসে হাজির। গোকুলও এসে হাজির। দুর্গা তখন চিৎকার করে উঠেছে—ডাক তো গোকুল মাধব ঢালীকে—ডাকতো—

জনার্দনের মুখখানা দেখে গোকুল অবাক। আরে, তুই জনার্দন? তুই এত রাত্তিরে ভেতর-বাড়িতে কী করতে?

জনার্দন তখন কেঁদে ফেলেছে একেবারে। কাঁদতে কাঁদতে বললে—আমি অন্ধকারে ঠাওর করতে পারিনি মা, আমাকে ছেড়ে দেন—

গোকুল বললে—ও দুগ্গা, এ যে আমাদের জনার্দন গো—

—তা জনার্দন হোক আর গোবর্ধন হোক, ভেতর-বাড়িতে মেয়ে-মহলে কী করতে আসে হারামজাদা! বড় বউরানীকে ডাকবো?

গোকুল বললে—ছেড়ে দাও দুগ্গা ওকে, ও নতুন লোক, মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে বাইরে গিয়েছিল, আর ফিরে এসে পথ চিনতে পারেনি, ভেতরে ঢুকে পড়েছে—ছেড়ে দাও—

দুর্গা জনার্দনের হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে—যা এখেন থেকে, আর যদি কখনও ভেতর-মহলে ঢুকবি তো তোকে খুন করে ফেলবো হারামজাদা, আমার কাছে ছেলেমিপনা করতে এসেছ?

গোকুল বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার জনার্দনকে বাইরে নিয়ে গেল। ঝি-চাকর আবার যে-যার জায়গায় শুতে চলে গেল। দুর্গা আস্তে আস্তে সিঁড়ির তলায় ঘরখানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। আবার সব নিঃঝুম হয়ে গেছে। সিঁড়ির তলায় ঘরখানার কুলুপ খুলে ভেতরে ঢুকতেই ছোটবউরানী কথা বলতে যাচ্ছিল।

দুর্গা ফিস্ ফিস্ করে বললে—চুপ করো বউরানী, চুপ করো—

ছোটবউরানী গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলে—অত চেঁচামেচি কেন রে? কী হয়েছিল?

—শয়তান ঢুকেছে গো বাড়ির মধ্যে!

—শয়তান? কী বলছিস্ তুই?

—হ্যাঁ ছোটবউরানী, পীরের কাছে মামদোবাজী করতে এসেছে। মর মুখপোড়া। দুগ্গাকে এখনও চেনেনি হারামজাদা মিন্‌সে।

ছোটবউরানী বুঝতে পারছিল না কিছু। বললে—কার কথা বলছিস্ তুই? কে?

দুর্গা বললে—আমি ক'দিন থেকে দেখছি মিন্‌সেকে, শোভারামের বদ্‌লা কাজ করতে এসেছে, কেবল ভেতর-বাড়ির দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারে। আজ রাত্তিরে একেবারে খালি পেয়ে এ-মহলের ভেতরে ঢুকে পড়েছে—

ছোটবউরানী জিজ্ঞেস করলে—কেন রে? ঢুকে পড়েছে কেন?

—ও নির্ঘাৎ চর, ডিহিদারের চর। আমার চোখকে ভোলাবে মিনসে তেমন বাপের জন্মিত নই আমি। আমি মিনসের চোদ্দপুরুষের মুন্ডু ঘুরিয়ে দেব না।

ছোটবউরানী হঠাৎ বললে—ও-কথা থাক্, আর কিছু খবর পেলি তুই? মরালী গিয়ে মুর্শিদাবাদে পৌঁছেছে?

দুর্গা বললে—হ্যাঁ, ভালোয় ভালোয় পৌঁছে গেছে, কেউ টের পায়নি—

—তাহলে আর কদ্দিন এ-রকম ভাবে থাকবো এখানে?

দুর্গা বললে—আর ক'টা দিন, নবাব তো কলকাতায় ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে গেছে, যদি বেটা সেখানেই ফিরিঙ্গিদের গোলা লেগে মরে যায় তো বুড়ো শিবের মন্দিরে পুজো দেব সোনার, মানত করে রেখেছি; তখন আবার তোমাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে ছোটমশাই-এর পাশে শুইয়ে দিয়ে আসবো, আর ক'টা দিন সবুর করো না—

ছোটমশাই আমার কথা বলে না আর?

দুর্গা বললে—বলেন না আবার? তোমার জন্যে দাঁতে একটা কুটো পর্যন্ত কাটছেন না এ ক'দিন। নিচেয় পর্যন্ত নামছেন না। শুনেছেন যে তোমাকে খুন করে ফেলা হয়েছে, সেই কথা শোনার পর থেকেই শয্যাশায়ী—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—এদিকে এই নতুন ঝঞ্ঝাটে আবার মাথাটা গরম হয়ে গেছে আমার। ঐ মিনসেকে না শায়েস্তা করলে আর চলছে না। দাঁড়াও না, এ-বেটাকে এবার উচাটন করবোই—তুমি দেখে নিও, ঠিক করবো, তেমন বাপের জন্মিত আমি নই, না-যদি করি তো আমার নাম দুর্গাই নয়—

১৭৫৬ সালের ২০শে জুন তারিখে নবাবের সেপাইরা হুড়-হুড় করে কেল্লার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। একদিন জেনারেল ড্রেককে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে নতুন এম্পায়ার গড়বার স্বপ্ন দেখেছিল, সেই জেনারেল তখন গঙ্গার জাহাজ ভাসিয়ে ভাগীরথীর বুক বেয়ে অনেক দূর চলে গেছে। শুধু ড্রেক নয়, মিস্টার মার্কেট, মিস্টার ম্যাকেট, মিস্টার বিভারিজ মিন্চিন, ক্যাপ্টেন গ্রান্ট সবাই। কেল্লার মধ্যের ফিরিঙ্গিরা, যারা পালাতে পারেনি তারা কান্না জুড়ে দিয়েছে হাউ-হাউ করে। হলওয়েল সাহেব দৌড়ে গিয়ে হাজির হলো আমিচাঁদের কাছে। হলওয়েল থর থর করে কাঁপছে। গলায় আওয়াজ বেরোচ্ছে না। এখন কী হবে আমিচাঁদজী?

আমিচাঁদ বললে—দাঁড়াও সাহেব, আমি উপায় করছি—

বলে সেখানে বসেই একটা চিঠি লিখলে নবাবের জেনারেল রাজা মানিকচাঁদের নামে। লিখলে—ফিরিঙ্গিরা আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত। আপনি যা শাস্তি তাদের দেবেন, তাই-ই তারা মাথা পেতে নেবে। এখনি যুদ্ধ বন্ধ করুন। নইলে আমরা সবাই সদলবলে ধ্বংস হবে যাবো।'

চিঠিটা কেল্লার পাঁচিলের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হলো। অনেকক্ষণ ধরে সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। এইবার হয়ত চিঠির উত্তর আসবে। হয়ত এইবার। শেষ পর্যন্ত সে-উত্তর এল সশরীরে। ভোরবেলা সশরীরে হাজির হলো রাজা মানিকচাঁদ, মীরজাফর মোহনলাল, আর সকলের শেষে সশরীরে এসে হাজির হলেন নবাব। নবাব মনসুর-উল-মুলক্ শা কুলি খান্ মির্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা হেবাং জং আলমগীর...

কান্নার রোল পড়ে গেল চারদিকে।

নবাব ফিরিঙ্গিকেল্লার ভেতরে ঢুকে অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এত বড় কেল্লা বানিয়েছে ফিরিঙ্গি বাচ্ছারা। এত তাদের ষড়যন্ত্র!

বললেন—আমিচাঁদ কোথায়? রাজা রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভ!

ভয়ে ভয়ে দুজনে এসে হাজির হলো সামনে। ফিরিঙ্গদের কেল্লায় তারা বন্দী

হয়ে ছিল এ ক'দিন। এবার বোধহয় মুর্শিদাবাদের কেল্লায় তাদের বন্দী করা হবে।

—আর হল্‌ওয়েল? মিস্টার হল্‌ওয়েল্‌ কোথায়?

কান্নায় তখন ভারি হয়ে এসেছে কলকাতার বাতাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর এক অস্বস্তিকর বিচারশালায় আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাবের অনুগ্রহের আশায় মাথা নিচু করে নিঃশব্দে ক্ষমা চাইতে লাগলো। আমাদের ক্ষমা করুন জাঁহাপনা। আমরা অপরাধী। এবার থেকে আপনার আশ্রয়ে থেকে আপনার হুকুম তামিল করে আপনার মসনদের মর্যাদা রাখবো কথা দিলাম।

আর ওদিকে সেইদিন সন্ধেবেলাই সারাফাত আলির খুশবু তেলের দোকানে ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছে খোজা নজর মহম্মদ। নজর মহম্মদ তার কথা রেখেছে। মোহরের মর্যাদা সে লংঘন করতে পারেনি।

কান্তও তৈরি ছিল।

কান্তকে দেখে নজর মহম্মদ বললে—চলিয়ে জনাব—চলিয়ে—

(ক্রমশ)

(তৃষ্ণা), Kvinnors Vaentan (নারীর বিরহ), Det Sjunde Inseglet (সপ্তম মোহর), Smultronstaellet (বুনো স্ট্রবেরী), Ansikte (মুখ), Jungfrukaellan (কুমারী উৎসধারা), Sasomien Spegel (যেন আর্শির ভেতরে), Das Licht im Winter (শীতের আলো) আর Tystnade (নিস্তব্ধতা) ছবিগুলির কোন তুলনা নেই—যার প্রতিটি ছবি এক-একটা ভিন্ন জগত, এক-একটা বিস্ময়—কেবল ছায়াছবির আলোছায়া নয়, মহৎ শিল্পের ভাষা আর স্তব্ধতায় বলিষ্ঠ। তাই ইংলণ্ডের Observer-এর মত পত্রিকা পর্যন্ত Tystnade-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আজকের দিনে ছায়াছবির আর্টের কোন্ পর্যায়ে গিয়ে সে পৌঁছুতে পারে, তার বিরল দৃষ্টান্ত বেয়ার্গমানের ছবিগুলি। দিনে-দিনেই এই মানুষটি এক অসামান্য পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছেন—যেখানে এককভাবে কাহিনী, অভিনয়, ক্যামেরা, আবহসংগীত বা পরিচালনা বিচার্য নয়, যেখানে সবকিছুর সমন্বয়ে এক মহৎ শিল্পের জগত রচিত এবং আঙ্গিক সম্ভাবে যা পরিপূর্ণ, যেখানে রয়েছে রক্ত আর মাংসের গভীরে জীবনের মূল প্রশ্ন, অতি স্থূল

একটি বিশেষ দৃশ্যে ছবির দুই প্রধান চরিত্র—এস্টার ও আনা, যাদের পরস্পরের মধ্যে আছে যৌন ব্যভিচারের গোপন সম্পর্ক

বস্তুজগতের পাপ-পুণ্যে, হিংসা-ঘৃণা-ক্রোধ, আর পশুত্বের কারাগারে ঈশ্বরের জন্যে আর্তি। বাস্তবকে এত নিষ্ঠুর আর নির্বিকারভাবে এমন কে আর রূপ দিতে পেরেছেন? তাঁর ছবিতে এমন কোন মুহূর্ত নেই যেখানে তিনি দর্শক, সমাজ, সমালোচক আর সেন্সর বোর্ডকে সন্তুষ্ট করবার সুযোগ গ্রহণ করেছেন যা সব শিল্পী-সাহিত্যিকরাই সচেতনভাবে করে থাকেন। একমাত্র শিল্প, অত্যন্ত খাঁটি শিল্পই তাঁর লক্ষ্য, যাকে তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, যে শিল্প নির্বিকার নির্মমভাবে মানুষ আর মানুষের সমাজকে আঘাত করে, শোধন করে। ইংলণ্ডের চিত্র-পরিচালকরা যখন তাই দাবি করেন—বেয়ার্গমানকে The Silence বইতে যে স্বাধীনতা দেওয়া হ'ল, আমাদের কেন তা দেওয়া হবে না, তখন তার উত্তরে স্পষ্ট-ভাবে বলা হচ্ছে—এই স্বাধীনতার উপযুক্ত একমাত্র বেয়ার্গমান। কেবল বেয়ার্গমানের ছবিকেই শুধু এই অধিকার দেওয়া যায়। তার এই অধিকার তো তাঁর শিল্প আর সংযমেরই উপযুক্ত সম্মান। বেয়ার্গমানের জন্যে এই বিশেষ অধিকার তো সেন্সর বোর্ডের নিয়মেরই ব্যতিক্রম। সত্যি কথা, বলতে কি—বেয়ার্গমানকে আজ যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সেই স্বাধীনতা যদি ঢালাও চিত্র-পরিচালকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সারা পৃথিবী জুড়ে যে অরাজকতার সৃষ্টি হবে, তা ভাবতেও ভয় লাগে।

কেন আজ ইন্‌গমার বেয়ার্গমানকে এই বিশেষ অধিকার দেওয়া হল? কেবল তাঁর খ্যাতি, তাঁর চিত্র-পরিচালনা, তাঁর শিল্প, তাঁর সংযমের জন্য? না, তারও বাইরে আরো কিছু তাঁর পরিচয় আছে। একটা কথা, তিনি কেবল চিত্র-পরিচালক আর কাহিনীকার নন। তিনি ধূমকেতুর মত হঠাৎ করে ফিল্ম-জগতে আবির্ভূত হন নি। এর চাইতে তাঁর বড় পরিচয় রয়ে গেছে—তিনি নাট্যকার, নাট্য-পরিচালক এবং সুইডিশ্ সাহিত্য-জগতের একজন দিক্‌পাল। তিনি আজ সুইডেনের রয়েল থিয়েটার আকাডেমীর অধিকর্তা। তাঁর নাটক আর সাহিত্যের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে সুবৃহৎ "A History of Swedish Literature" বইতে Alrik Gustafson লিখছেন—

"Swedish theatregoers have not often been so startled as they were in the 1930's and 1940's when the two talented and brash young men Lars Levi Laestadius (b. 1909) and Ingmar Bergman (b. 1918) burst in upon the Swedish theatre with ambitions to reshape it more or less radically."

এই বইতে আলোচনাক্রমে লেখক বলেছেন—নাটক আর ফিল্ম-সাহিত্যে তাঁর বহুমুখী অসাধারণ প্রতিভা প্রমাণ করছে, সুইডিশ্ সাহিত্যে আজ ইন্‌গমার বেয়ার্গমানের নাম অপরিহার্য। তবে কৌতূহলের বিষয়—"Though Bergman insists that he has no literary ambitions, that "film has nothing to do with lite-

ভালবাসা নেই, অথচ আনা ধরা দিয়েছে পথের কোন এক রেস্তোরাঁর বয়ের বাহু-বন্ধনে—প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা বর্জিত এক ঈশ্বরবিহীন নরকের ছবি এঁকেছেন ইন্‌গমার বেয়ার্গমান তাঁর ছবিতে

দুই দস্যু-ভাই যখন তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করে শেষে মেরে ফেলল, সেখানে খোলাখুলি যে-রকমভাবে ধর্ষণের দৃশ্য রয়েছে, তাতে শিউরে উঠতে হয়। কিংবা অসহায় ছোটভাইটিকে যখন আছড়ে মেরে ফেলা হল! ছবিটাতে সমস্ত খুন-খারাপির পর যখন বাওয়ার বলছে আত্ম-অনুশোচনায় —"হে ঈশ্বর, তুমি সব দেখতে পাচ্ছো!... আমার ফুলের মত মেয়েকে ওরা মেরেছে, আমি ওদের খুন করেছি এই হাত দুটো দিয়ে—অথচ এই হাত দুটো ছাড়া আমার আর কিছু নেই...কথা দিচ্ছি, আমার নিজের এই দুই হাত দিয়ে গির্জা গড়ে তুলবো।" যেখানে কারিনকে ধর্ষণ করে ফেলে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে যখন ওকে তুলে ধরা হল, তখন মাটি ফেটে সেখান থেকে তরতর করে স্বচ্ছসলিল কুমারী উৎস বেরিয়ে এল —যেন এই পৃথিবীর পাপ-মুখকে ধুয়ে দেবার জন্যে। আপনা থেকেই তখন ঈশ্বরের নাম মুখে এসে যায়। ১৩ শতাব্দীতে লেখা এই কাহিনীর বীভৎস দৃশ্যগুলির এখানেই

সার্থকতা। আর সেই শিল্পের—যে শিল্প এমন জগৎকে সৃষ্টি করে।

সুতরাং শিল্পমণ্ডিত এই দৃশ্যগুলির বিরুদ্ধে যখন সমালোচনা শুরু হয়, তখন "Die Zeit" পত্রিকা প্রশ্ন না তুলে পারে না—নগ্ন ছবির বিরুদ্ধেই যদি কথা ওঠে, তবে তো সর্বপ্রথম মুক্ত জলাশয়ে আমাদের স্নানের বালুকাবেলাগুলোকে তুলে দিতে হয়। ওখানে যখন নর-নারীরা প্রায় নগ্ন অবস্থায় পোশাক পরিবর্তন করে বা স্নান করে, তার বিরুদ্ধে তো কেউ কথা বলে না। তা হলে তুলে দিতে হয় "নুড কলোনী" আর নাইট ক্লাবগুলি — যেখানে স্ট্রীপটিজ-এর ব্যবসা চলে, বন্ধ করে দিতে হয় ফাসিং-এর উৎসব—যেখানে ব্যভিচারের প্রচণ্ড ঢেউ বয়ে যায়। অশ্লীল যদি কিছু থাকে, তবে সে-সব স্থানে আছে। বেয়ার্গম্যানের The Silence বইতে নেই। বেয়ার্গম্যানের ছবি নগ্ন নয়, নগ্ন আজকের পৃথিবী। সেই নগ্ন নরক থেকে যাত্রা করেছেন বেয়ার্গম্যান ঈশ্বরের সন্ধানে। সমাজকে, মানুষকে প্রচণ্ড-ভাবে আঘাত হেনেছেন বেয়ার্গম্যান। রবীন্দ্র-নাথের ভাষায়—"বাঁচাও তাহারে মারিয়া।" যাকে বলে, শক্ থেরাপি। মানুষকে এভাবে আঘাত দেওয়া হোক, যাতে মানুষ আবার ভাবতে শুরু করতে পারে, আবার জেগে উঠতে পারে—এই নগ্নতা, এই শূন্যতা আর ঈশ্বরের এই নিস্তব্ধতা থেকে। যে পৃথিবীতে ঈশ্বর নেই, তা নরক। বেয়ার্গম্যান সেই নরক আমাদের দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সেই নরকের সামনে আমাদের চোখে ঠুলি পরে থাকার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই।

ডেনমার্কের একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন—"এ কি সেই, একটা কার্নিভাল দিয়ে আর একটা কার্নিভালকে জাগানো? অর্থাৎ একটা ঢেউ দিয়ে আর একটা ঢেউ তোলা?"

"ঠিক তাই! সব চাইতে প্রয়োজন, মানুষের নিজেরই তার নিজের আবেদনকে বুঝতে পারা—তার আত্মার উপর দিয়েই এক নতুন আলোকে বহন করে আনা"—উত্তর দিলেন বেয়ার্গম্যান... "...এবং আমি মনে করি, মানুষের মনের গভীরে তার চিন্তা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, আত্মসমালোচনা, আর নতুনভাবে জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ার যে শক্তি, তাকে উজ্জীবিত করার দায়িত্ব নাটক আর ছায়া-ছবি সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রহণ করতে পারে।"

এই ছবির যিনি আগুন-ধরানো নায়িকা, যিনি সমগ্র দর্শকমণ্ডলীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে মৈথুন দৃশ্যের অভিনয়ে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, নরকে রেখে গেছেন এক চিৎকার যা মানুষকে বহুকাল ভাবাবে, সেই আনার ভূমিকায় Gunnel Lindblom বলছেন—"প্রথমটায় আমি খুবই মুষড়ে পড়েছিলাম। পরে বুঝেছিলাম, এই অংশটুকু তো সমগ্র

মা চলে গেছে বাইরে বেড়াতে—একা হোটেলে ঘরে বেড়াতে বেড়াতে ইয়োহান এসে এই বিশাল ছবিটার সামনে দাঁড়ায়—ছবির অর্থ খোঁজে

ছবিটির একটি মানার অবিচ্ছেদ্য অংশের মতই। এবং যখন আমি অভিনয় করতে লাগলাম, তখন হঠাৎ আমি অনুভব করলাম —সমগ্র জিনিসটাই অত্যন্ত খাঁটি এবং সঠিক। আমি জানি না, একে আমি কীভাবে প্রকাশ করতে পারি, তবে সে ছিল কোন এক বাঁধন দুঃখের নিবিড় এক ছন্দোময় দেহভঙ্গিমারই প্রকাশের মত।"

এত আলোড়ন পড়েছে, শেষ পর্যন্ত যা রইল, তা খাঁটি সোনা তো! প্রশ্ন উঠেছে—The Silence শিল্প তো? তার উত্তরে দেশ কয়েকজন বিদগ্ধ শিল্প-সমালোচক গ্রীসের সাহিত্য আর ভাস্কর্য, গেটের "IPHIGENIE", সোফোক্লিসের Oedipus, কিংবা জেমস্ জয়েসের "Ulysses"-এর প্রসঙ্গ টেনে দেখাচ্ছেন এই ছবিতে "ক্লাসিক্স"-এর সকল স্পর্শগুলি আছে। সবচাইতে মহৎ গুণ—অতি সামান্য, অতি সাধারণ—তবু কত অসাধারণ, আর প্রাণবন্ত। শিল্পীকে বিচার করতে গিয়ে একজন দেখাচ্ছেন—পিকাসোর প্রতিভা বেয়ার্গম্যানের প্রতিভা—দুই সমান্তরাল শিল্পের স্রোত। Tystnaden ছবির প্রতিটি দৃশ্যের অংশ, প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি আলো আর ছায়া—এক-একটি সীমিত—আমাদের জীবনের রূপক। সেই রূপকে ধরা দিয়েছে, যুদ্ধের ভয়াবহতা—স্টালিনগ্রাদ আর নাগাসাকির ধ্বংস। ধরা দিয়েছে নারী-পুরুষ-মানুষের রক্ত-মাংস দেহের গভীর অন্ধকার থেকে ডাক দিতে চাইছে ঈশ্বরের আলো। কয়টা কথা আছে সমগ্র ছবিটায়? প্রায় নিঃশব্দ ছবি। তবু জীবনের অনেক কথা ধরা পড়েছে "নিস্তব্ধতায়"।

"কাঁচের আরশির ভেতরে" আর "শীতের আলো" ত্রিলজি সিরিজের শেষ ছবি এই Tystnaden—যে তিনটি ছবির ভেতর দিয়ে বেয়ার্গম্যান কির্কেগার্ডের দর্শনকে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছেন। যদিও তিনি এক ধর্মযাজকের সন্তান—তবু তিনি কোনদিন গির্জায় যান নি। তাঁর ঈশ্বর গির্জায় নেই। তিনি নরক থেকে আরম্ভ করেছেন মানুষের জন্য ঈশ্বরের সন্ধান। সেই নরকে আনার কণ্ঠ দিয়ে রেখে গেছেন এমন এক চিৎকার সেই চিৎকারে মানুষের সঙ্গে ভগবানের ঘুম ভাঙুক। অথচ সেই চিৎকারের দৃশ্যটি আমরা ছবি থেকে কেটে দিতে চাইছি।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

আপনি কি চুল ওঠার পাল্লায় পড়েছেন?

বিপদের সঙ্কেত এইসব লক্ষণ থেকেই বুঝতে পারবেন

মাথায় খুস্কি হওয়া
প্রায়ই অনেকের মাথায় খুস্কি দেখা দেয়, কখনোই তা অবহেলা করা উচিৎ নয়।

চুল পাত্‌লা হওয়া
চুল ক্রমে ক্রমে উঠে যাচ্ছে তার গোড়ায় প্রাণশক্তি জোগাবার মূলতত্ত্বের অভাবে।

অকালে টাক পড়া
এমন দুরবস্থার কবল থেকে অনেক ক্ষেত্রেই রেহাই পাওয়া যেত ...

যদি চুল উঠ্‌তে বা পাত্‌লা হ'তে শুরু ক'রে থাকে তবে আজ থেকেই পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করতে আরম্ভ করুন। চুলের গঠনের জন্যে যে আঠারোটি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয় পিওর সিলভিক্রিনে আছে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস। মাথার তালুতে মালিশ ক'রে দিলেই পিওর সিলভিক্রিন চুলের গোড়ায় গিয়ে জোগায় চুলের জীবনদায়ী সেই স্বাভাবিক খাদ্য যার দরুন সে স্থায়ী স্বাস্থ্যের শক্তিতে পুনর্জীবীত হয়।

"অল্ অ্যাবাউট হেয়ার" (All About Hair) এই নামের বিনামূল্যে চিত্রিত এক পুস্তিকা যদি আপনি চান তো লিখুন ডিপার্টমেন্ট E-1, সিলভিক্রিন অ্যাডভাইসরি সার্ভিস, পোষ্ট ব্যাগ-১০০২২, বোম্বাই-১

পিওর সিলভিক্রিন
চুলের যেকোনো দুর্যোগে দুর্ভোগে চিকিৎসায় উপযুক্ত পরিচর্যার নির্যাস।

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং
সারাদিন চুল পরিষ্কার পরিপাটি ক'রে রাখে। চুলওঠা রোধ করার পক্ষে যথেষ্ট পিওর সিলভিক্রিন এতে থাকে।

Silvikrin

সিলভিক্রিন — সুস্থ চুলের সঠিক উপায়

SP/1/P/6/64

১১

মুকুন্দবাবুরা মেয়ে দেখে চলে যাওয়ার পর ঘরের মধ্যে শ্বশুরে জামাইতে ফের তত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ হল।

যোগরঞ্জন বললেন, 'আধুনিকতা আধুনিকতা করো সুরজিৎ, এই হল যথার্থ আধুনিকতা। বিয়ে করতে গিয়ে কে এমন বলতে পারে আমি রূপ চাইনে, পণযৌতুক চাইনে—'

ইন্দিরা সুরজিৎকে খোঁচা দিয়ে বলল, 'বাবা, ওঁরা যেন কত পণ নিয়েছিলেন তোমার কাছ থেকে? দেড় হাজার না?'

যোগরঞ্জন লজ্জিত হয়ে বললেন, 'সে যাকগে। সে কথা হচ্ছে না। সুরজিৎ এমন ছেলে ওকে আমি আরো বেশী দিতে পারতাম। টাকাকেও দেব। [illegible] তাতে নিশ্চয়ই মেয়ের বিয়ে দেব না। কিন্তু ওই যে মুখ ফুটে বলা আমাদের কোন দাবি দাওয়া নেই—এই বলাটাই অনেকখানি।'

সুরজিৎ হেসে বলল, 'মুকুন্দবাবু ত জানেন। তাঁর বিচক্ষণ মানুষ। কোথায় কোন কথা বলতে হয়, কোথায় কিছু চাইনে চাইনে চাইনে বললে বেশী পাওয়ার আশা থাকে তা ওঁর মত কেউ জানে না। মার্চেণ্ট অফিসের কেরানীগিরি করতে করতে উনি ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়েছেন, টালিগঞ্জে দোতলা বাড়ি করেছেন, আমরা তো ভাবতেই পারিনে, কী করে করলেন এসব। অবশ্য সাইড বিজনেস কিছু কিছু আছে। তবু সবাই ওঁর অ্যাচিভমেণ্ট দেখে অবাক হয়ে যায়।'

যোগরঞ্জন বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও উনি মানুষটি সৎ নন? খোলা বাজারের লোক নন?'

'ছিঃ তা বলব কেন। আপনি ভুলে যাচ্ছেন মুকুন্দবাবু আমার বন্ধুর বাবা। আর মিহির ছেলেটি সত্যিই ভালো। কিছু কিছু অদ্ভুত চালচলন ধরন ধারন থাকলেও সত্যিকারের ভালো ছেলে।'

যোগরঞ্জন বললেন, 'সেইটাই কি আসল কথা নয় সুরজিৎ?'

ইন্দিরা একটু হেসে বলল, 'বাবা, তোমাকে কে না ভালো বলে। ওঁরা ভালো বলেই তো উনি এ সম্বন্ধ এনেছেন।'

যোগরঞ্জন হেসে বললেন, 'আমার সত্য। মা, আমি কিন্তু তোর পতি নিন্দা করিনি।'

'কী যে করো বাবা।' ইন্দিরা লজ্জিত হয়ে মুখ নামালে।

যোগরঞ্জন জামাইর দিকে তাকিয়ে বললেন, মুকুন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ করে মনে হল ওঁদের হিন্দুয়ানী আমার চেয়েও কয়েক ডিগ্রী বেশী। পাঁজি-পুঁথির শাসন ওঁরা আমার চেয়ে আরো বেশি মানেন। দৈব টৈব, ঠিকুজী কোষ্ঠি অন্তগ্রহ নবগ্রহ আর ওইসব কবচ কুণ্ডল আমি এড়িয়ে যেতে চাই। ওসবের মাহাত্ম্য আমি স্বীকারও করিনে, অস্বীকারও করিনে। জামাই কোন প্রতিবাদ করে কিনা একটু দেখে নিয়ে তিনি ফের বলতে লাগলেন, আসলে ও সব নিয়ে আমি ভাবতে চাইনে। ভাবলে মন দুর্বল হয়। যেটুকু পুরুষকার আমার আছে সেটুকুও আর থাকে না এই আমার ধারণা। মুকুন্দবাবু দেখছি সব মানেন। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। ও সব বাইরের ব্যাপার। আসলে মানুষ সৎ কিনা হৃদয়বান কিনা তাই দেখতে হয়। পাঁচ বছর আগে হলে ওই কবচ কুণ্ডলে

শুক্লাল হেসে জবাব দিয়েছে, 'সেই-জন্যেই তো এসব ব্যবস্থা হচ্ছে দিদি। তুমি সুখে-শান্তিতে থাকবে বলেই তো—'

সবাইর মুখে ওই একই বুলি। মন্দিরার ইচ্ছা থাক আর না থাক, তার ঘাড়ে সুখ-শান্তির বোঝা চাপিয়ে দেওয়া চাই।

পালাতে আরও কয়েকবার চেষ্টা করেছে মন্দিরা। কিন্তু কয়েক পা বাড়িয়ে আর এগোতে পারেনি। বাধা তো শুধু বাইরেরই নয়, ভিতরের বাধা যে তার চেয়েও বড়। কেন পালাবে? কোথায় পালাবে? কিসের জন্যে? কার জন্যে? যার জন্যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নেবে মন্দিরা সে তো কই চিঠিখানার উত্তরও দিল না। ছন্দা তার কাছে মিথ্যে কথা বলবার মেয়ে নয়। সে চিঠি ঠিকই পোস্ট করেছে, যার চিঠি সে পেয়েওছে তাতে কোন সন্দেহ নেই মন্দিরার। কিন্তু জবাব দেয় নি। তার জবাব দেবার কিছু নেই বলেই দেয় নি। অবশ্য এমনও হতে পারে চিঠি সে দিয়েছিল, কিন্তু তা আর কারো হাতে পড়েছে। সে চিঠি মন্দিরার হাতে আর আসেনি। কিন্তু চিঠির জবাব তার তো শুধু চিঠির জবাবে চিঠি লেখার কথা নয়, তার যে চলে আসবার কথা, তার যে জোর করে নিয়ে যাবার কথা, জয় করে নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কই তেমন তো কিছু হয় নি। পারুক আর না পারুক সে যদি চেষ্টাটুকু অন্তত করত, তাদের গেটের সামনে হই-চই করে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে ফিরে যেত, তা হলেও যেন কিছুটা সান্ত্বনা থাকত মন্দিরার। একজন মানুষ তার জন্যে অশেষ কষ্ট পেয়েছে, সে কথা শুনতে শুনতে সে কষ্টের শরিক হয়েও আনন্দ। দুজনে মিলে যে দুঃখ ভোগ, সে-দুঃখ প্রায় সুখেরই সামিল। কিন্তু সব দুঃখ লজ্জা আর গ্লানি মন্দিরাকে একাই সইতে হবে। পালাবার কোন পথ নেই, কার সঙ্গে পালাবে মন্দিরা? একা একা কি পালানো যায়? একা একা এই পৃথিবী থেকে পালানো যায়। সে চেষ্টাও করে দেখেছে মন্দিরা। রাত্রিতে ছাদের কার্নিসের কাছে কয়েকদিন। আশে পাশে পিছনে ফিরে দেখেছে কেউ নেই। কিন্তু লাফিয়ে পড়বার মুহূর্তটিতে একের পর এক হাজার ভাবনা হয়ে গেছে। কেন? কিসের জন্যে? কার জন্যে? একা একাও মরা যায় কিন্তু সে কিসের জন্যে মরছে, তা না জেনে মরলে মরবার বলটুকু কোথায় পাবে মন্দিরা? যাবে যে, চলে যাওয়ার আগে কোন্ সম্বলটুকু নিয়ে যাবে?

দিনের পর দিন গেল। কেউ এল না, কোন চিঠি এল না, কোন ফোন এল না। দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত গেল। শ্রদ্ধা, প্রীতি, বিশ্বাস, ভালোবাসা পৃথিবী থেকে সব নিঃশেষে মুছে নিতে নিতে চলে গেল। কেউ এল না।

আর কেউ আসুক, তা মন্দিরা চায়ও না। সে এখন শুধু চুপচাপ একা থাকতে চায়। আত্মীয় হোক, পরই হোক, কারো স্পর্শ পর্যন্ত তার কাছে অসহ্য। পৃথিবীর কোন শব্দটুকু, গন্ধটুকু পর্যন্ত সহ্য হতে চায় না।

তবু অতর্কিতে একদিন মীনাক্ষী এসে হাজির হল। দোর ভেজিয়ে নিজের ঘরে দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়েছিল মন্দিরা, হঠাৎ এসে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল।

হেসে বলল, 'ঈস্, একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে। মন্দিরা, তোর চেড়ী এসেছে, এবার মুখ ফেরা।'

মন্দিরা বলল, 'কেন এলি। কেন ছুঁলি আমাকে। আমি তো তোর কাছে অস্পৃশ্যা।'

মীনাক্ষী ওকে জোর করে টেনে তুলল, 'বাব্বা, এখনো রাগ পড়েনি মেয়ের! সেই রকম টং হয়েই আছিস দেখছি।'

'তুই আমাকে সেদিন কি অকথ্য অপমান করেছিলি মনে আছে?'

মীনাক্ষী নরম হয়ে বলেছিল, 'সত্যি,

সেদিন আমার মাথার ঠিক ছিল না। মন-মেজাজ ভারি খারাপ ছিল। আমাকে ক্ষমা করিস ভাই। কিন্তু সেদিন যা বলেছি, তোর ভালোর জন্যেই বলেছি।'

মন্দিরা ফের চটে উঠল, 'তোরা বিশ্ব-সুদ্ধ লোক আমার ভালোর জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিস। তোদের পায়ে পড়ি, আমার অত ভালো করে তোদের দরকার নেই। নিজের ভালো আমি নিজেই বুঝতে পারব।'

মীনাক্ষী গম্ভীর গলায় দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, 'তা পারা যায় না রে মন্দিরা, সব সময় তা পারা যায় না। এই-জন্যেই কখনো কখনো Friend, Philosopher and Guide-এর দরকার হয়।

মন্দিরা বলল, 'আমার গাইড তা হলে আমাকে এখন কোন্ পথ দেখাচ্ছে?'

মীনাক্ষী তেমনি গম্ভীরভাবে বলল, 'বাসর ঘরের।'

ছন্দা আর নন্দা খাবার আর চা নিয়ে এল। মীনুদিকে কে হাতে করে দেবে, তাই নিয়ে দুজনের মধ্যে রেষারেষি। ইন্দ্রাণীও এসে দাঁড়ালেন একটু বাদে। 'তুমি এসেছ? বাঁচলুম মা। এবার তোমার বন্ধুকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলো। মেয়ে যে কী কাণ্ড শুরু করেছে।'

মীনাক্ষী হেসে বলল, 'আমার বন্ধু খুব বুদ্ধিমতী। ওকে বেশি বোঝাতে হবে না মাসীমা।'

তারপর নিরিবিলিতে দুজনে কথা বলবার জন্যে মীনুকে নিয়ে ছাতে গিয়ে বসেছিল মন্দিরা।

আস্তে আস্তে দিনের আলো শেষ হয়ে এল। চারদিকের গাছগুলি যেন জীবন্ত গাছ নয়, কালো তুলিতে আঁকা ছবি।

মীনাক্ষী বলেছিল, 'তোদের এদিকটায় কিন্তু বেশ ফাঁকা। খুব নিরিবিলি। যখনই আসি আমার ভালো লাগে। চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে।'

মন্দিরা বলল, 'তোর কি, তুই তো বর্ন ফিলসফার।'

মীনাক্ষী হেসে বলল, 'আর সেই সঙ্গে ফ্রেন্ড অ্যান্ড গাইড। সেকথা ভুলিস নে।'

মন্দিরা বলল, 'শুধু কি আমার? আমার বাবারও।'

মীনাক্ষী লজ্জিত হয়ে বলল, 'কী যে বলিস। মেসোমশাই আমার গুরুজন। আমি তাঁর গাইড হব কী করে? তবে রেলওয়ের টাইম টেবলও তো গাইড, ফোন গাইডও তো গাইড। সেই হিসেবে যদি ধরিস।'

একটু চুপ করে থেকে মন্দিরা বলেছিল, 'বাবা তোর কথা শোনেন। তোকে গার্গী মৈত্রেয়ীর স্বজাতীয়া বলে মনে করেন।'

'ঠাট্টা করছিস? সেদিন বকেছিলুম বলে বুঝি শোধ নেওয়া হচ্ছে?'

'না, ঠাট্টা নয়। তুই আমার হয়ে বাবার কাছে একটু উমেদারী কর না।'

'কিসের উমেদারি?'

'আমাকে তিনি আবার পড়তে দিন। আমি আর কিছু চাইনে। শুধু কলেজে যেমন পড়ছিলুম, তেমনি পড়তে দিন আমাকে। ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থেকে থেকে আমি একেবারে পাগল হয়ে গেলাম মীনু। আমি তাঁকে কথা দিতে রাজী আছি। আমি আর কোথাও যাব না। কারো সঙ্গে কথা বলব না, শুধু লিখব, পড়ব আর কিছু করব না।'

বল না বাবাকে।

মন্দিরা সেদিন বারো তের বছরের কিশোরী মেয়ের মতই আকুল হয়ে উঠেছিল।

মীনাক্ষী বলেছিল। তার আবেদন বাবার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। বাবা যা ভালো বুঝবেন, তাই-ই করবেন। তাঁর মত ঘন ঘন বদলায় না। ভালো হোক, মন্দ হোক, কারো সম্বন্ধে তিনি যা ধারণা করে রাখবেন, তা সহজে কেউ ভাঙতে পারবে না। তাঁর এই স্বভাবের কথা মন্দিরা জানে। জেনেও চেষ্টা করতে ছাড়ে নি। মাকে বলেছে, দিদি-জামাইবাবুকে বলেছে, বন্ধুকে বলেছে, কিন্তু হাজার বলাবলিতেও কোন ফল হয়নি। আর-এক কাজ করতে পারত মন্দিরা। নিজে গিয়ে বাবার পা জড়িয়ে ধরতে পারত। কিন্তু তাতে কি তিনি ক্ষমা করতেন? মন্দিরার ইচ্ছা পূর্ণ করতেন? মনে হয় না। তিনি অত সহজে নরম হবার মানুষ নন। তাছাড়া সেদিনের সেই কাণ্ড ঘটবার পর বাবা আর তাকে বিশ্বাসও করবেন না। তাঁর সেদিনের সেই দুটি চোখ দেখে মন্দিরা তা বুঝতে পেরেছে। মানুষ মানুষের দিকে ওভাবে তাকায় না। বাঘও কি তার সন্তানকে কখনো অমন হিংস্র ঘাতকের চোখে দেখে। তাঁর সেই চোখ দেখে মন্দিরা বুঝে নিয়েছে কোনদিন আর সে বাবার স্নেহ-ভালোবাসা পাবে না। এমন কি, মায়া-মমতাও তার ওপর থেকে বাবার চলে গেছে। এখন শুধু শুকনো কর্তব্য করে যাবেন। সবাইকে দেখবেন, যা উচিত তিনি তাই করে যাচ্ছেন। আসলে গোপনে গোপনে শাস্তি দেবেন মন্দিরাকে। শাস্তি ছাড়া আর কি? ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসহায় মেয়েকে এমন জোর করে কারো হাতে গছিয়ে দিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া আর কি বলে? মন্দিরা যদি ছেলে হত, তিনি কি পারতেন এমন জোর করে তার বিয়ে দিতে? মুখ বুজে সয়ে যাওয়া ছাড়া মন্দিরার আর কোন উপায় নেই। বাবার বিরুদ্ধে তীব্র এক বিদ্বেষ মনের মধ্যে জমে উঠতে থাকে মন্দিরার। অনেক সময় এই অন্ধ ক্রোধ আর বিদ্বেষের কোন কারণ খুঁজে পায় না, তাঁর ওপর মমতা সহানুভূতি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাও করে, কিন্তু কিসের এক অস্থিরতা সব ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।

পালাতে গিয়ে পালাতে পারল না মন্দিরা, মরতে গিয়ে মরতে পারল না। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই। আর পাঁচজনের ইচ্ছা তাকে জোর করে একটা ঘটনার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাণ পর্যন্ত পণ করলেও মন্দিরা তাকে বাধা দিতে পারবে না।

কখনো নিজেকে ভারি অসহায় মনে হয়
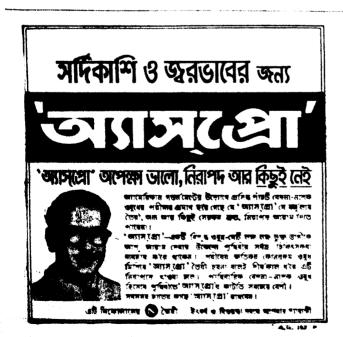
মন্দিরার, কখনো বা মরীয়া হয়ে ওঠে। ইচ্ছা হয়, সব ভেঙেচুরে ছারখার করে দেয়। এক নিমেষে এদের সব আয়োজন পন্ড করে দেয়। মনে পড়ে ছেলেবেলায় তাকে কোলে করে মা একদিন ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাদীপ দিতে যাচ্ছিলেন। 'দেখ মা, কেমন ঝড় উঠেছে' বলে দুষ্টুমি করে মন্দিরা ফু দিয়ে সেই মঙ্গলদীপ নিভিয়ে দিয়েছিল। মা অবশ্য ছেড়ে দেননি। ঠাস করে তার গালে এক চড় মেরে বসেছিলেন। এখনো ইচ্ছা করলে এক ফুঁয়ে এদের সব দীপ কি নিবিয়ে দিতে পারে না মন্দিরা? যাঁরা দেখতে আসছেন, তাঁদের কাছে তারস্বরে চিৎকার করে যদি বলে, 'এঁরা জোর করে আমার বিয়ে দিচ্ছেন। মোটেই আমার মত নেই বিয়েতে।' তা হলে কী হয়? তারপর যা-খা হতে পারে—সেই অঘটনপরম্পরা পরম নিপুণভাবে একের পর এক সাজিয়ে গেছে মন্দিরা। প্রথমবারের বিন্যাস পছন্দ হয়নি, দ্বিতীয়বার সাজিয়েছে। দ্বিতীয়-বারের সাজানো মনঃপূত না হলে তৃতীয়বার নতুন করে সাজাতে বসেছে। কিন্তু আশ্চর্য, ফু দেওয়া আর হয়নি। মায়ের হাতের সেই একটি মঙ্গলদীপ আজ তার বিয়ের রাতে শত দীপে জ্বলে উঠেছে: ফু দেওয়া আর হয়নি।

এঁদের এই মেয়ে দেখানো, ছেলে দেখা, পাকা দেখা কেনাকাটা, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণের প্রতিটি স্তরে মন্দিরার মনে হয়েছে, এইবার ফু দিলে হয়, তা হলেই সব নিবে যাবে। কিন্তু দিতে গিয়ে দিতে পারেনি মন্দিরা। সেই সুন্দর পবিত্র দীপশিখাটির কাছে বার বার মুখখানা এগিয়ে নিয়ে গেছে, তবু ফু দিয়ে নিভিয়ে দিতে পারেনি। সেই দীপ আজ লক্ষ শিখায় অনির্বাণ হয়ে উঠেছে। শুধু কি জাতনাশের ভয়? শুধু কি কলঙ্ক-কেলেঙ্কারির ভয়? তেমন কিছু একটা করে বসলে বাবা তাকে বেত পর্যন্ত মারতে পারেন, নবাব বাদশাহের মত হয়তো তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলতে পারেন, শুধু কি সেই ভয়ে পিছিয়ে এসেছে মন্দিরা? তা নয়, শুধু প্রাণের ভয়ই নয়। কেমন যেন একটা মমতাও এসেছে। বাবার কথা মনে হয়েছে মন্দিরার। তাঁর মান-সম্মানের কথা মনে হয়েছে। মার উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা মনে হয়েছে। ছন্দা-নন্দার উল্লাস আনন্দ ছুটোছুটি দেখে সেদিকে না তাকিয়ে পারেনি মন্দিরা। ওদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয়, যেন ওদেরই বিয়ে। জুয়েলারের দোকানে ওদেরও দু-একখানা করে গয়নার অর্ডার গেছে। নন্দা সেদিন এসে নাচতে নাচতে জানিয়েছে, 'দিদি, আমিও এবার শাড়ি পরব।' ছন্দা বলেছে, হ্যাঁ মেজদি, এবার থেকে বেনারসী পরবে। যদি ওকে আলাদা বেনারসী কিনে দেওয়া না হয়, তোর খানাই ও কেড়ে নিয়ে যাবে তুই দেখিস।'

মন্দিরা না হেসে পারেনি। বলেছে, 'শুধু বেনারসী কেন, সবই তোরা নিস।'

তার নিজের মন্দির অন্ধকার। কিন্তু সেই মন্দিরের চারদিকে এত যে আলো জ্বলে উঠেছে, এত আনন্দ, এত উৎসাহ, এত উল্লাস —সবই কি একটি ফুঁতে নিভিয়ে দেওয়া যায়? কিন্তু না দিয়েও তো উপায় নেই। বাসরঘরের নামে কোন্ এক অপরিচিত অন্ধকার গহ্বরের দিকে তাকে, কারা যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পরিণাম না-জানা সেই অনিশ্চিত অন্ধ ভবিষ্যতের দিকে যারা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারা তার পরম আপন জন। তাদের মুখের দিকে চেয়ে সুখ আর সন্তুষ্টির কথা ভেবে মন্দিরা কয়েক পা এগোচ্ছে, তারপর হঠাৎ পরিণাম ভয়ে থমকে দাঁড়াচ্ছে, চিৎকার করে বলছে, 'যাব না, যাব না, যাব না।'

কিন্তু সব চিৎকারই যেন তার আপন মনের, সবই যেন অবাস্তব এক স্বপ্নের, তাই কারোরই তা কানে যাচ্ছে না, কেউ তা কানে নিচ্ছে না।

নিজে যা বন্ধ করতে পারেনি মন্দিরা, সমস্ত আশা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে মনে মনে কামনা করেছে, শেষ মুহূর্তে একটি অলৌকিক কাণ্ডে তা বন্ধ হবে। শুধু তার মুখের একটি ফুৎকার নয়: সত্যিকারের ঝড় উঠবে, আষাঢ়ের আকাশ থেকে শুধু বৃষ্টিপাত নয়, বজ্রপাতও হবে। বিশ্ব-ব্যাপী সেই একটি অলৌকিক প্রলয়কাণ্ডে বেদিনাড়াভার এই অতি ক্ষুদ্র এক লৌকিক উৎসব নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু তেমন কিছুই হল না। বরং সন্ধ্যার আগে আগে একটা দমকা হাওয়া উঠে আকাশের সব মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল।

ইন্দ্রাণী বললেন, 'যাক বাবা। বিষ্টি-টিষ্টি হলে আর রক্ষে ছিল না। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।'

মন্দিরা ভাবল, 'ভগবান মায়ের মুখের দিকে তাকালেন, আমার মুখের দিকে তাকালেন না।'

সন্ধ্যার পর থেকে নিমন্ত্রিতেরা আসতে শুরু করলেন। বৃষ্টি বাদলের দিন। অনেকেই সকাল সকাল নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলে যেতে চান। বিশেষ করে যাঁরা দূরে থেকে এসেছেন, তাঁরা কোন ঝুঁকি নিতে চান না। যাঁরা কর্মকর্তা, তাঁরাও যত তাড়াতাড়ি পারেন অভ্যাগতদের খাইয়ে দিতে পারলেই রেহাই পান। কিন্তু শুধু কি খেয়ে গেলেই হয়। হয় খেতে বসবার আগে, নয়তো খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মেয়েকে আশীর্বাদ করেও তো যেতে হবে।

মন্দিরার দিদিমা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছেন, 'কী যে কাণ্ড তোমাদের। মেয়েকে এখনো তোমরা সাজাতেই পারলে না। লোকজন আসতে শুরু করেছে। কী যে করো তোমরা।'

ইন্দিরা বলল, 'দিদা, তুমিই একটু সাজিয়ে টাজিয়ে দাও না। টুকু বলছে, তুমি না সাজালে ও আজ আর সাজবে টাজবে না। তুমি না সাজালে দিদা সাজবে না নাতিনী।'

ছন্দা বলল, 'বড়দি, পরের লাইনটা বলো। পরের লাইনটা কী। মুশকিল, নাতিনীর সঙ্গে খাতিনী ছাড়া কিন্তু সহজে আর কিছু মেলাতে পারবে না বড়দি।'

নন্দা বলল, 'কেন, হাতীর স্ত্রীলিঙ্গে হাতিনী। তুই খ. হয়েছিস।'

মস্ত হস্তিনীর সামনে নন্দা কিন্তু এক সেকেণ্ডও দাঁড়াতে সাহস পেল না। তাড়াতাড়ি দিদিমার পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিল।'

দিদিমা বললেন, 'সাজাতে পারব না কেন, সাজাতে আমরাও জানি। আমাদের আমলে কি সাজসজ্জা কিছু ছিল না? সবই তোদের আমলে হয়েছে? তোরা কি ভাবিস আমি বুড়ি হয়েই মায়ের পেট থেকে পড়েছি। কোন কালে আমার আর বয়েস কাল ছিল না?'

সত্তর বছরের বৃদ্ধাকে ইন্দিরা তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিলে, 'ছি-ছি-ছি, তোমাকে কে বুড়ি বলে দিদা? তুমি এখনো ষোড়শী রূপসী। আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয়, বলো তোমার নাত-জামাইকে ডেকে আনি।'

মেয়ে সাজাবার ভার ইন্দিরা কিন্তু দিদিমার ওপর দিল না, তাঁর মেয়ের ওপরও নয়। নিজেরাই নিল সেই সুখের দায়িত্ব। ডাকল মীনাক্ষীকে। 'এসো ভাই, কলেজে-পড়া মেয়ে। একটু সাজিয়ে টাজিয়ে দাও বন্ধুকে।'

মীনাক্ষী হেসে বলল, 'কলেজে কিন্তু ও-সব পড়ায় না ইন্দুদি।'

জামাইবাবু সুরজিৎ কার্তিকবাবু সেজে ঘরের সামনে দিয়ে ঘুরঘুর করছিল, হেসে বলল, 'ও-সব আবার পড়াতে হয় নাকি? ও-বিদ্যা শেখে না কোন নারী।'

কিন্তু ইন্দিরা এখন নারী পুলিস। স্বামীকে চ্যালেঞ্জ করে বলল, 'তুমি এখানে কেন? যেখানে খাওয়ানো দাওয়ানো হচ্ছে, সেখানে যাও। পরিবেশন করো গিয়ে।'

সুরজিৎ বলল, 'আমি পরিবেশনই করছি।'

তারপর মন্দিরার দিকে চেয়ে বলল, 'বাব্বা!! কী শাড়ি গয়নার ঘটা। ভগবান, আর জন্মে যেন মন্দিরা হয় জন্মাই।'

মীনাক্ষী হেসে বলল, 'তা হলে আমাদের ইন্দিরাদির কী উপায় হবে? তিনি কী হয়ে জন্মাবেন?'

সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল। কারো মুখেই যেন জুতসই জবাবটা যোগাচ্ছে না।

মন্দিরা ভাবল, 'ঘুরে ফিরে প্রত্যেকেরই কি একটি নামই মনে পড়ছে যে-নাম আজ কিছুতেই মুখে আনা যায় না?'

মন্দিরা সাজতে খুব ভালোই জানে। প্রসাধন কলায় তার যে হাত আছে, সে কথা সবাই স্বীকারও করে। কিন্তু আজ তার সাজবার মন ছিল না। নিজের হাতে সাজবার তার দরকারও ছিল না। আজ সে দিদি বউদি বন্ধুদের হাতে পড়েছে।

খানিক বাদে ইন্দিরাই দিদিমাকে টেনে নিয়ে এল, 'দেখ তো দিদা, নাতনীকে চিনতে পারছ কি না।'

দিদিমা বাঁকা কোমরখানা আর-একটু সোজা করে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, তারপর স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বললেন, 'বাঃ, বেশ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। খুব গয়না দিয়েছে আমার যোগরঞ্জন। দেবে না কেন? ওরা আর কিপটে নয়। বাঃ বাঃ টোপরটা একেবারে লাল টুকটুকে দেখাচ্ছে আমার টুকুকে। কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল। গল্প শুনে শুনে আর আশ মিটত না মেয়ের। আজ তুমি সেই কুঁচবরণ রাজকন্যা। দেখি, ভালো করে দেখি। তোরা একটু সরে দাঁড়া তো।'

ইন্দিরা বলল, 'দেখ না দিদা, ঘরের মধ্যে এক.

একশ পাওয়ারের বালব জ্বলছে। তুমি ভালো করে দেখে নাও।'

দিদিমা আরো এগিয়ে এসে মন্দিরার চিবুকটি তুলে ধরলেন, 'আলো তো জ্বলছে। কিন্তু আমার দিদির মুখখানা তেমন ঝলমল ঝলমল করছে কই। কেবল বলত, বিয়ের গল্প বলো দিদা, আমার বিয়ের গল্প বলো। বিয়ের সময় আমাকে কী দেবে। আমি বলতাম, শাড়ি দেব, গয়না দেব, মণি-মুক্তো-মানিক্যে তোর অঙ্গ একেবারে ভরে দেব। আর তাই না দেখে তোর মুখখানা ঝলমল ঝলমল করবে। মেয়ের অঙ্গ তো আমার ভরেই দিয়েছে যোগরঞ্জন। কিন্তু মুখখানা ঝলমল ঝলমল করছে কই?'

আবার এক মুহূর্তের নীরব অস্বস্তি। কিন্তু দ্বিতীয় মুহূর্তে ইন্দিরা ধমক দিয়ে উঠল, 'করছে গো বুড়ি করছে। ভালো করে ঝলমলানি দেখতে হলে তোমাকে ছানি কাটিয়ে আসতে হবে। চোখে যে ছানি।'

দিদিমা বিড়বিড় করে বললেন, 'তাই হোক ভাই, তাই হোক। ভগবান করুন, আমার দেখাই যেন ভুল দেখা হয়।'

ইন্দিরা বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন টুকু। দিদাকে প্রণাম কর। উনিই তো সবচেয়ে বড়, ওঁকে দিয়েই শুরু করতে হবে।'

মন্দিরা নত হয়ে দিদিমার পায়ের ধুলো নিল।

দিদিমা বললেন, 'ধানদুর্বা কোথায়। ধানদুর্বার রেকাবিখানা আমাকে এনে দে তোরা। শতজনে শত জিনিস দেবে। আমি ধানদুর্বা দিয়েই আশীর্বাদ করব।'

তারপর থেকে প্রণামের পালা চলল আর প্রণম্যদের হাত থেকে আশীর্বাদী গ্রহণ। শাড়ি, গয়না, আংটি, হার। একটু দূরসম্পর্কীয়দের কাছ থেকে, কি অনাত্মীয় আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে আলোটি বাতি, জেলা লাম্প। ফুল একপাশে সাজানো থাকার আর উপহারগুলো নাম লিখতে লাগল। মন্দিরা এখন একেবারে কনের পুতুল হয়ে গেছে। আর কোন অসুবিধে নেই।

মীনাক্ষীর বাবা-মা এলেন। শাড়ি আর কনের ফুল দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। কাকীমাকে নিয়ে ছোটকাকা নিরঞ্জন চাটুজ্যে এলেন। বাবার জেঠতুতো ভাই। বেলেঘাটার বেশ বড় এক ট্যানারীর মালিক। বাবার মতই লম্বা চওড়া চেহারা। তবে আরো স্মার্ট আর উদারপন্থী।

নিরঞ্জনকাকা হেসে বললেন, 'জানিস তো বাইরে ছিলাম। ভালো চামড়া কীভাবে হওয়া যায়, দেখতে গিয়েছিলাম সাদা চামড়ার দেশে। প্লেন থেকে নেমেই শুনি বড়দা এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছেন। বিয়ে দিচ্ছেন তোর। তাই যে ঘড়িটা এনেছিলাম। এই নে।'

মন্দিরা একটু হেসে বলল, 'কাকীমার জন্যে আনা নয়তো ছোটকাকা?'

হঠাৎ উঠানে গেটের কাছে কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল। সবাই গিয়ে সেখানে ভিড় করেছে। ছোটকাকাও তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলেন।

একটু বাদে সে গোলমাল থেমেও গেল। বিয়ে বাড়িতে কত রকমের কত গোলমালই তো হয়। তবু আরো অনেক পুরো চেনা আধো চেনা আত্মীয়স্বজনের হাত থেকে আশীর্বাদী নিতে নিতে বাইরের দিকে কান খাড়া করে রইল মন্দিরা। কে এসেছিল? কে? কাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ?

একটু বাদে ঘরের ভিড় কমলে মন্দিরা দিদিকেই জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছিল রে? কিসের গোলমাল হচ্ছিল নিচে?'

ইন্দিরা বলল, 'ও কিছু না। তা দিয়ে কী করবি তুই?'

মন্দিরা বলল, 'দিদি, তোর পায়ে পড়ি। আমার একটা কথাও তোরা যদি না রাখিস, আমি কিন্তু এর পর কোন কথাই শুনব না।'

বোনের রুদ্রমূর্তি দেখে ইন্দিরা একটু নরম হল। তারপর ঘরের অন্য মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে, প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'শশাঙ্কবাবুর ভাইপো এসেছিল তাদের বড় গাড়িখানা নিয়ে। ওই যে সুন্দরপানা ছেলেটা। ফার্স্ট ইয়ার না সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। গাড়ি বোঝাই ইংরেজী বাংলা বই আর বই। গোটা একটা লাইব্রেরী সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর-একটি সেতার। তুই সেই কবে একটু টুং-টাং করেছিস, আর কবে ছেড়ে দিয়েছিস, তার ঠিক নেই। কী হবে ও ছাই দিয়ে?'

মন্দিরা বলল, 'তারপর?'

ইন্দিরা সংক্ষেপে সারতে চায় ব্যাপারটা। অবহেলার সুরে বলল, 'তারপর আর কি? বাবা বললেন, এদের নিমন্ত্রণ করেছে কে? ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে ছাপানো চিঠি তার বুক পকেট থেকে বার করল। কে দিয়েছে, কে জানে! যত সব ভুতুড়ে কাণ্ড। বাবা বললেন, তোমার কাকাকে বোলো ওসব নেবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা সাহিত্য বুঝিনে সঙ্গীতও বুঝিনে। তবে তুমি এসেছ খুশি হয়েছি। খেয়ে যাও। এই ব্যাচেই বসে যাও। দেখ গিয়ে জায়গা আছে। ছেলেটি অবশ্য খায়নি। কেউ কি খায়? সব ফিরিয়ে নিয়ে চলে গেছে। বাঁচাই গেছে। তুই ওসব নিয়ে কিছু ভাবিসনে। লক্ষ্মী বোনটি আমার।'

ইন্দিরার কথা শেষ হল না। তার আগেই চন্দনন্দার দল ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এল, 'দিদি, বর এসেছে। শাঁখটা কোথায়? শাঁখটা?'

একটু বাদেই হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মধ্যে বরের শুভাগমন আরও উচ্চ স্বরে ঘোষিত হল। (ক্রমশ)

"মিঃ সান্যাল, কলকাতা শহরে আমরা আছি দুশো বছরের ওপর, সেই জগৎশেঠের আমল থেকে। সব কিছুই আমাদের বাঙ্গালীর মতো: রুচি, পোশাক, ভাষাও চৌদ্দ আনা। যারা রাজস্থানী মেয়ে বিয়ে করে, অর্থাৎ যে রাজস্থানী মেয়ে বাংলা বলতে জানে না, তাদেরই ঘরে শুধু বাংলা বলা চলে না। আমরা পড়েছি বাংলা ইস্কুলে, কলেজে বাংলা ছিল ভার্নাকুলার, আমার ছোটো ভাই বাংলায় এম এ। তবু লোকে আমাদের মেড়ো বলে। আফসোস! পদবীটাই কাল হয়েছে। ইস্কুলেই আগরওয়ালা তুলে রাখা উচিত ছিল, শুধু সন্দীপকুমার। আর একটা ভুল হয়েছে, হুঁঃ হুঁঃ। বিয়ে করা উচিত ছিল বাঙ্গালী মেয়ে। তবে আমার স্ত্রী আমার চেয়েও বেশী বাঙ্গালী। জিয়াগঞ্জের মেয়ে, বাংলা ইস্কুলেই পড়াশুনো করেছেন, রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত। বাংলা রান্না সুক্তো থেকে অম্বল অবধি সব জানেন। আমার লাইব্রেরীতে বইয়ের সংগ্রহ ইংরেজীর পরই বাংলার। ব্যবসায় লোকসান হলে আমি দুঃখে রবি ঠাকুর আওড়াই : সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা, নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।' সুখের মুহূর্তে আমার স্ত্রী, রবীন্দ্র সংগীতই গান: 'অনেক দিয়েছো নাথ, আমার বাসনা তবু পূরিল না—ইত্যাদি। বন্ধুবান্ধব আমার সব বাঙ্গালী। শুধু ব্যবসায়ী বাঙ্গালী নয়। শিক্ষিত, মার্জিত, বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী। এতো সত্ত্বেও যখন লোকে আমাকে বিদেশী মনে করে তখন বড়ো আঘাত পাই। আমার চ্যারিটি সামান্যই হোক বা আমার ক্ষমতা, সবই বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানে, আমার প্রতিষ্ঠানে বেশীর ভাগই বাঙ্গালী। অফিসে শতকরা পঁচাত্তর জন, কারখানায় প্রায় পঞ্চাশ।

"আমি জানি, প্রদোষবাবু, বাঙ্গালী সাধারণত প্রাদেশিক নয়, তবে বাঙ্গালীর একটা কমপ্লেকস্ আছে। আমি সব খোলাখুলি আলোচনা করতে ভালোবাসি এবং আমার মনে হয় আমাদের এই বিচিত্র দেশে, দ্বিজু রায়ের ভাষায়, আমাদের পারস্পরিক দোষত্রুটি নিয়ে আমরা যতো বেশী আলোচনা করব তত আমাদের মঙ্গল হবে। বাঙ্গালী চরিত্রের প্রশংসা যখন শুনি তখন গর্বে আমার বুক ভরে ওঠে, নিন্দে শুনলে বড়ো দুঃখ পাই। আমি নিজে যখন নিন্দে করি, তখন এতো খারাপ লাগে আমার। আমি আবার বলছি, নিজেকে বাঙ্গালী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারি না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। বাঙ্গালীর যতো গুণ আছে তা সত্যি বলতে কি, অন্য কোনো অঞ্চলের লোকের নেই। কিন্তু দোষও আছে কয়েকটি মারাত্মক: তার মধ্যে বড়ো হল একটি—একটি নয়—দুটি কমপ্লেকস্। প্রথম হচ্ছে, তারা মনে করে সমস্ত দিক দিয়ে তারা আজও ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় হচ্ছে, তারা মনে করে তারা এক্সপ্লয়েটেড হচ্ছে। এই দুটি ধারণা, কিছু মনে করবেন না, প্রায় সব বাঙ্গালীর মতো বদ্ধমূল। আমার অবিশ্যি ভুল হতে পারে। কোনো বাঙ্গালীর মন থেকে যদি এই কমপ্লেকস্ দূর করতে পারেন তো ব্যস, ইট উইল ওঅর্ক ওয়ান্ডার্স। আমি নিজে দেখেছি আমার অফিসে, ফ্যাক্টরিতে।"

সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি—'

একটানা এতোগুলো কথা বলে থামলেন শ্রীসন্দীপকুমার আগরওয়ালা। শিল্পপতি। বয়স চল্লিশের কাছে। ফর্সা, লম্বা, দোহারা চেহারা। চোখে চশমা, পরনে দামী স্যুট। কথা হচ্ছিল তাঁর ব্রাবোর্ন রোডের অফিসে তাঁর নিজের কামরায় বসে। বিরাট সুদৃশ্য সাততলা বাড়ির সপ্তম তলায় তাঁর অফিস। বেঙ্গল স্টীল কোম্পানি (প্রাইভেট) লিমিটেড আর গোটা তিনেক ছোটোখাটো সংস্থা—কালাজুরি টি কোং, পশ্চিমবঙ্গ বাণিজ্য আর এস পি পাবলিসিটি, সব কটারই মালিক শ্রীসন্দীপকুমার আগরওয়ালা।

চমৎকার সাজানো গোছানো অফিস, দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই প্রথমে রিসেপশনিস্ট, চমৎকার স্মার্ট এক তরুণী; তার পাশে তরুণী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান টেলিফোন অপারেটর। সামনে সোফা সেটি, সেন্টর টেবল। তার ওপরে ফুল। পাশের র‍্যাকে দেশবিদেশের নানান ম্যাগাজিন থরে থরে সাজানো। ম্যাগাজিনগুলো শুধু ইস্পাত, ভারী শিল্প আর চা বাগান সংক্রান্ত নয়; সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রচার—সব বিষয়ের পত্রিকাই রয়েছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড কয়েকখানা বাংলা পত্র-পত্রিকাও রয়েছে। এবং শুধু আছে নয়, নাম-করা সাপ্তাহিক মাসিকের সঙ্গে দু তিন-খানা লিটল ম্যাগাজিনও আছে, যার এক-খানা আবার কবিতার। ভিতরে অফিসও ঝকঝকে-তকতকে, সাজানো-গুছোনো। দক্ষিণ ধারে একটানা কতগুলো চেম্বার, যার প্রথম ও বৃহত্তমখানাই শ্রীসন্দীপকুমার আগর-ওয়ালার। শ্রী আগরওয়ালার চেম্বারটি অতি আধুনিক কেতায় সাজানো। দেয়ালে ল্যান্ড-স্কেপ, বাঙালী শিল্পীর হাতে আঁকা, নামটা স্পষ্ট পড়া যায়। একখানা রবীন্দ্রনাথের ছবি, আর একখানা বোধ হয় আগরওয়ালার পিতৃ-দেবের। ধুতি পাঞ্জাবি পরা। সুদৃশ্য মেহ-গনির 'দ'-এর আকৃতি টেবিল, সামনে ভিজিটারদের জন্যে চারখানা চেয়ার। দূরে দেয়াল ঘেঁষে আলাদা করে আবার দু দুখানা চার খানা চেয়ার। তিনটে টেলিফোন, তার একটা সাদা। দেয়ালে সারা পৃথিবীর মানচিত্র, র‍্যাক ও আলমারি ভর্তি বই। পাশে একটা গোল টেবিলে ফুলদানিতে নানা রঙের মৌসুমী ফুল।

"আমি জানি প্রদোষবাবু, বাঙালীর উপর একশ্রেণীর মালিক খুবই চটা। তারা চটা এজন্যেই যে তারা বাঙালীকে চেনে না। এক কায়িক পরিশ্রম ছাড়া, তাও পূর্ব-বঙ্গের ছেলেরা দেখছি তাতেও পিছপা নয়। আর কোনো দিকে বাঙালী আজও কারো চেয়ে কম নয়। কাজ করে না, ফাঁকি দেয়, সাঁচ্চা কথা। কিন্তু কাজ করাতে জানতে হয়। তবে সেটা সহজ নয়।

"এই দেখুন, বড্ড সোজাসুজি কথা বলছি। আপনার হয়তো ভালো লাগছে না, কিন্তু আপনার সঙ্গে সামান্যক্ষণ কথা বলেই বুঝতে পেরেছি আপনি আলাদা জাতের মানুষ এবং এ ধরনের আলোচনায় আপনার আগ্রহ আছে। দেখুন, বাঙালী জাত সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো কথা কি জানেন? এরা হিউমারলেস নয়। নিজেদের নিয়ে এরা হাসতে জানে, নিজেদের ত্রুটি এরা স্বীকার করতে জানে। এ বিষয়ে এরা অনেকটা ইংরেজদের মতো।
This one thing has stood them and will stand them in good stead.
আসুন চা খান......"

ড্রাগন টি সেটে সোনালী চা পরিবেশিত হল। সুদৃশ্য ছোটো ছোটো নোনতা আর ক্রীম বিস্কিটের প্লেট এগিয়ে দিলেন আগর-ওয়ালা।

"আমি", আগরওয়ালা বলতে শুরু করলেন, "লাখনাউ ইউনিভার্সিটির ইক-নমিক্স্-এর এম এ। বি এ আর ল' কল-কাতার। লাখনাউ থাকতে রাধাকমলবাবু, ডি পি সাহাব—মানে ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে বাঙালী জাত নিয়ে আমাদের অনেক গবেষণা হয়েছে। আমরা ফ্র্যাংকলি সব

—ভালোবাসে এই সোনার বাংলাকেই—

আলোচনা করতাম। বাঙালীর আর একটি দোষ—সে নিজের সম্মান নিয়ে যত বেশী সচেতন অপরের আত্মসম্মানবোধে তার ঠিক সেই পরিমাণ অবজ্ঞা। এ যেন অনেকটা ইংরেজদের মতো: নিজের স্বাধীনতায় যতো বেশী সচেতন, অপরের স্বাধীনতাহরণে হয়তো বেশী পটু।

হ্যাঁ, বাংলা দেশের দুঃখে আহা উহু করেন অনেকেই কিন্তু আসলে বাঙালীর আর্থিক এবং মানসিক অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করেন না কেউই। আর্থিকের চেয়েও মানসিক। বাঙালীর আর্থিক অবস্থা বুঝতে গেলে তার স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং, তার ফুড হ্যাবিটস্ এ সব মনে রাখতে হবে। মানসিক অবস্থা বুঝতে গেলে শুধু যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগজনিত দুঃখকষ্ট বুঝলেই হবে না; বুঝতে হবে গত শতাব্দী ও এই শতাব্দীর গোড়ায় বাংলা দেশের পজিশন আর তার আজকের পজিশন। রাজনৈতিক জগতে বাঙালী নেতৃত্বহীন; ব্যবসার জগতে তার কোনো স্থানই নেই। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি—যা বলতে আমি পুরুষানুক্রমে স্থায়ী বসবাসকারী মারোয়াড়ীদের বোঝাচ্ছি—তাদের প্রবল বিতৃষ্ণা। জানি মারোয়াড়ী-জাতের অনেক ত্রুটি আছে, কিন্তু দু'চার-জনের কথা বাদ দিলে, বেশীর ভাগ মারোয়াড়ী রাজস্থানকে ভালোবাসে না, ভালোবাসে এই সোনার বাংলাকেই।

"এখন দরকার কি জানেন প্রদোষবাবু? দরকার বাংলাদেশে স্থায়ী বসবাসকারী বাঙালী ও মারোয়াড়ীদের কমন ফ্রন্ট-এর। তরুণ মারোয়াড়ীরা, আমি বলছি আপনাকে, খুব প্রগ্রেসিভ। বাপ ঠাকুর্দার বাস্তববুদ্ধি আর নিজেদের ইমাজিনেশন মিলিয়ে তারা আর পাঁচটা উন্নত দেশের মতো কমার্স-ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে চায়। বাঙালী বুদ্ধি-জীবীদের, কর্মযোগীদের, সেখানে সাহায্য করতে হবে। আমরা হচ্ছি ইংরেজের ছোটো তরফ। 'ও বেটা মেড়ো...' এ-সব চিন্তাধারা বড্ডো পুরোনো, বাঙালীর মত দ্রুত চিন্তাশীল প্রগতিবাদী লোকেদের তো এ সব সাজে না! সে বাংলা আর নেই সত্যি; কিন্তু যা আছে তার কাছেও কি কেউ দাঁড়াতে পারে? এতো বড়ো পোর্ট রয়েছে আমাদের। গোটা দেশের পঞ্চাশ ভাগ রপ্তানি আর প্রায় চল্লিশ ভাগ আমদানি এই বন্দর দিয়েই হয়। বেশীর ভাগ বড়ো বড়ো ব্যবসা, দেখুন না, এই পশ্চিমবঙ্গেই। চা, পাট, কয়লা, লোহা, স্টীল, ইঞ্জিনিয়ারিং আর মিসেলেনাস গ্রুপের প্রায় সব ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত ব্যবসার হাত বদল হচ্ছে। ব্যাংক, ইনস্যুরেন্স ইত্যাদি ক্রেডিট ইনস্টিটিউশন-গুলি খুব ডেভেলপ করেনি। কারণ বাণিজ্যে বাঙালীর ন্যাচারাল অ্যাপাথি—কী বলে যেন আধুনিক বাংলায়? অনিচ্ছা? না, আমার স্ত্রী বলেন, অনি......"

"অনীহা।" প্রদোষ অনেকক্ষণ পর মুখ খোলে।

"ঠিক বলেছেন, অনীহা। আমারি বাংলা ভাষা!......যা বলছিলাম, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি না হলে কিছুই সম্ভব নয়। এই যে গেল শতাব্দী বা এই শতাব্দীর গোড়ায় বাংলাদেশের এতো উন্নতি হয়েছিল এর মূলে ছিল বাংলার বাণিজ্যিক উন্নতি। ট্রেড ও কমার্স থেকেই আসে সাচ্ছল্য। ইউ নেভার হ্যাড ইট সো গুড তখনই বলা যায়, যখন দেশের থাকে ফেভারেবল ব্যালান্স অব ট্রেড। ব্যবসা-বাণিজ্য না বাড়লে এমপ্লয়-মেন্ট আসবে কোত্থেকে, ওয়েলথ আসবে কোত্থেকে? আর লোকে খেয়ে পরে না থাকতে পারলে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি হবে কী করে। জমিদারির যুগ চলে গেছে; শুধু অ্যাগ্রিকালচারে কাজ হবে না। অ্যাগ্রি-কালচারের উন্নতি অবশ্য নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন ইন্ডাস্ট্রি বাড়ানোর, ধনবৃদ্ধিই তো সমৃদ্ধির পথ। কবিগুরু যেন কী বলেছেন—সেই লক্ষ্মী আর কুবেরের অন্তরের কথা?"

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে চলেছে প্রদোষ।

"প্রদোষবাবু, যে ইজ্‌ম্‌ই করুন না কেন শিল্পোন্নতি ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না। আমি, জানেন, এককালে মার্কস-বাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, মার্কসীয় সমাজবাদ ছাড়া এ দেশে কিছু হবে না এ-কথা বিশ্বাসও করতাম। কিন্তু থিয়োরী ছেড়ে যেই প্র্যাকটিসে নাবলাম অমনি সে বিশ্বাস আমার দেউলে হয়ে গেল। ঐ মতবাদের বাস্তব প্রয়োগ শুধু অসম্ভবই নয়, ভয়াবহও। ওর তুলনায় আমার মনে হয়, ক্যাপিটালিজম্ ভালো। প্রগ্রেসিভ ক্যাপিটালিজম্। মার্কসের সময়ের ইউরোপীয় ক্যাপিটালিজম্, লেইসে ফেয়ার, আজ আর নেই। পশ্চিম ইউরোপের সমাজতন্ত্র তো চমৎকার জিনিস। সবচেয়ে খারাপ কি জানেন, সমাজতন্ত্রের নামে স্টেট ক্যাপিটালিজম্, যা আজকাল আমাদের দেশে চলছে, আমাদের দেশের মতো আমলাতন্ত্র আর কোনো দেশে আছে বলে জানি না। সেই ইংরেজ আমল থেকেই এখানকার আমলার অসম্ভব পাওয়ারফুল। সে ক্ষমতা তাদের এখন শতগুণে বেড়েছে। আগেকার দিনে তবু আমলারা ভয়ে ভয়ে থাকতো। শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কাছে জবাবদিহি করতে হত, ঘুষিটা লাথিটাও জুটত কপালে। জানেন তো, এই সেদিন, একজন প্রবীণ অফিসারকে কিল-চড়-ঘুষি-লাথি খেতে হয়েছিল মাউণ্টব্যাটেন সায়েবের। আমি পড়েছি 'মোজলে রিপোর্টে'। আর এখন? এখন ক্ষমতা বেড়েছে, ক্ষমতা প্রকাশের ক্ষেত্রও বেড়েছে, আর জবাবদিহি করবার লোক নেই, কী মজা! সরকার কতোগুলো বড় বড় ব্যবসা নিজের হাতে নিয়েছে, বড়ো বড়ো নতুন নতুন ব্যবসার পত্তন করেছে। সেগুলো চালানোর ভার কাদের উপর? না, আমলাদের। ঝানু আই সি এস, কোনো আমলাকে ব্যালান্সশীটের কারচুপি বুঝতে দেখি তো বলবোঃ বাহাদুর! সেখানে সব টু টু্স্! আচ্ছা, আপনিও তো একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী। বলুন দেখি, আগের ব্যক্তিগত মালিকানায় আপনি সুখী ছিলেন, না এখন? আগেই আপনাদের কাজকর্ম ভালো হতো, না এখন? আগে আপনাদের কর্তারা কেমন ছিলেন, আর এখন? আপনাকে যতোটুকু দেখলাম তাতেই বুঝেছি আপনি আমার কথায় সায় না দিয়ে পারবেন না।"

প্রদোষ সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

"তা হলে বলুন তো, আমলাতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কেমন জিনিস? আর দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্তমানে ঐ জিনিসটাই চলছে। আমলা প্রভুদের আবার অন্য দিক দিয়েও উন্নতি হয়েছে। আগে ইংরেজের শিক্ষায় তাদের আর যাই হোক ভারতীয় মন বলে একটি জিনিস ছিল। আর আজ? আজ আমলারা পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বোম্বাইয়া, বিহারী—এই টার্মস-এ ভাবছে, কাজ করছে।

—কিল-চড়-ঘুষি-লাথি খেতে হয়েছিল—

বাংলাদেশে বা কলকাতা অঞ্চলে ব্যবসা করা আজকাল কত অসুবিধা জানেন? কোনো নতুন ইণ্ডাস্ট্রি করা বা কোনো ইণ্ডাস্ট্রির এক্সপ্যানশন এখানে সম্ভবই নয়। দিল্লির কর্তারা, মানে আমলারা, যাদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা খুব কম আর মারোয়াড়ী তো নেই-ই, যে কত টালবাহানা করে, কত ঝামেলা করে! অনেকে তো প্রকাশ্যেই বলেঃ Why in Calcutta area? It's too much congested there.

তারা না জানে এমন নয় যে কলকাতা অঞ্চলে যতো সুবিধে পাওয়া যায়, এতো আর কোথাও নয়। পোর্ট, কম্যুনিকেশন্স পাইকারী বাজার, সস্তা লেবর—আজকাল একটু পাওয়ার ক্রাইসিস চলছে, তবে মনে হয় যে শীগগিরই চলে যাবে—একসঙ্গে এতো সুবিধে বম্বে এরিয়াতেও নেই, অন্য অঞ্চল ছেড়েই দিলাম। আবার, আমলাদের যদি কোন রকমে বোঝানো যায় তো চাপ এল ক্রেডিট ইনস্টিটিউশনগুলোর। ওগুলো সবই প্রায় বম্বে কেন্দ্রিক, তাই বম্বে অঞ্চলে ব্যবসা খুললে ওদের সাহায্য চট করে পাওয়া যায়। তার-পরেই মাদ্রাজ অঞ্চলে, কারণ এ-অঞ্চলের লোক প্রায় সব সংস্থার মাথায় আর ওদের জাতীয়তাবোধ, মানে, ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা বোধ, খুব প্রবল। গত দশ বছরের হিসেব নিয়ে দেখুন। ভারতবর্ষে যত বড়ো বড়ো কোম্পানি হয়েছে তার বেশির ভাগ হয়েছে বম্বেতে নয় মাদ্রাজে। কলকাতায় খুব কম। একশ্রেণীর ব্যবসায়ীদের মধ্যেও কলকাতার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মেছে, এ'রা কলকাতার অনেক ব্যবসা করেন। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলেও এ'রা প্রচুর ব্যবসা করায় সবকিছুই নাকি বিচার করেন এ'রা অন্য এক বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে, যেটা আমার বোঝার বাইরে।

"তা হলে বুঝুন কী অবস্থা। এখানে বড়ো ব্যাংক নেই, ইনস্যুরেন্স নেই। লাইফ ইনস্যুরেন্স সরকার দখল করেছে, তার হেড অফিস করেছে বম্বেতে। বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক বম্বেতে, স্টেট ব্যাংকের হেড অপিস বম্বেতে, রিজার্ভ ব্যাংকও সেখানে, আই সি আই সি আই বম্বেতে আই এফ সি বম্বে ঘেঁষা। সব বম্বে......সব বম্বে...... কলকাতা কিছু নয়। কেউ কিছু ভাবেও না ও নিয়ে, আমাদের প্রতিবাদ বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়।"

"যাক, অনেক বকলাম।" আগরওয়ালা উঠে দাঁড়ালেন। প্রদোষও। "আপনার উপরে আমি অনেকখানি নির্ভর করছি মিঃ সান্যাল। আপনাদের অর্গানিজেশনের হেল্‌প্ না পেলে আমার চলবেই না। আমার আর সব আছে, দরকার টাকার। সে টাকাও অন্য-ভাবে যোগাড় করা যায় কিন্তু তা আমি চাই না। রোববারে আসুন আমার বাড়িতে, প্লিজ, আমি আরো সব খুলে বলব। আমি আপনার কাছে অত্যন্ত ফ্র্যাংক। আপনার ফ্র্যাংকনেস এবং আপনার পরিষ্কার মন আমার বড় ভাল লাগল। আমার এই ব্যবসার একটা বড়ো উদ্দেশ্য হলঃ সার্ভিস টু দি কম্যুনিটি। স্থানীয় লোকেদের চাকরি, চালাক ছেলেদের শেখার, জানার, উন্নতির সুযোগ করা এবং নতুন আউটলুক নিয়ে ব্যবসা করে অন্যদের চোখ খুলে দেওয়া। ব্যক্তিগত স্বার্থ এখানে বেশী নেই। আপনি বিশ্বাস করুন আমি সামান্য টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে নেমেছিলাম। একখানা লেদ মেসিন নিয়ে শুরু করেছিলাম। কালাকার স্ট্রীটে থাকতাম, মেশিন ধর্মতলা স্ট্রীটে। তারপর হাওড়া ব্রীজের তলা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। আমার বড়ো ফ্যাক্টরি হয়েছে বেলুড়ে, বালিগঞ্জে বাড়ি করেছি, সম্প্রতি আলিপুর পার্ক রোডে নতুন বাড়ি কিনে সেখানে উঠে গেছি। বালিগঞ্জের বাড়ি আমার বড় অফিসারদের কোয়ার্টার হবে। আমার পরিবার ছোটো, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই। তিন-চারখানা গাড়ি আছে, দশ-বিশটা ঝি-চাকর আছে, বছরে দু-তিনবার বেড়াতে যাই, ইউরোপে গিয়েছি চারবার, একবার অ্যামেরিকা। স্ত্রী-পরিবারকেও ইউ-রোপ দেখিয়ে এনেছি। স্ত্রী তো তিনবার গেছেন। ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আছে, মোটামুটি

নামডাক আছে। আমার স্ত্রীর সোশ্যাল-সার্ভিসে নাম আছে। কাজেই ব্যক্তিগতভাবে আমার আর কোনো চাহিদা নেই, এখন ভারী শিল্প করতে চাইছি। এর উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন নয়; বলতে পারেন, সমাজসেবা। এখন তা করতে গেলে যে-পরিমাণ টাকার দরকার তা আমার নেই। অ্যামেরিকান একটা ফার্মের সাহায্য ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেছি। আই সি আই সি আই ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্যবস্থা করেছে, যে-কোনো বড়ো 'বিজনেস্ হাউসকে' বললে এক্ষুনি তারা ক্যাপিটাল দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহলে যে আর আমার বলে কিছু থাকবে না! আপনাদের কাছে টাকা নেবার সুবিধে, আপনারা কোম্পানি পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। ভালো নির্দিষ্ট ডিভিডেণ্ড আপনাদের কাম্য। কাজেই সমস্ত প্রেফারেন্স শেয়ার ক্যাপিটাল তিরিশ লাখ আর সত্তর লাখ ইকুইটি শেয়ারের বিশ লাখ যদি আপনারা নেন তো অর্ধেক ক্যাপিটাল আমার উঠে গেল। বাকি পঞ্চাশ লাখের মধ্যে বিশ লাখ আমি ও আত্মীয়স্বজনেরা নেব; তিরিশ লাখ বাজারে ছাড়ব। কাজেই ওয়ান ফিফথ্ শেয়ারের মালিক হয়েও কোম্পানির কনট্রোল আমারই থাকবে। আপনাকে এসব

—পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ যবে ভাবিনু মনে—

তার কি বোঝান। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত। রোববারে আসুন, কেমন। নমস্কার।" নিজে হাতে দরজা খুলে দিলেন আগরওয়ালা—প্রদোষ নমস্কার করে বেরিয়ে এল।

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে প্রদোষ ভাবতে লাগল সন্দীপকুমার আগরওয়ালার কথা। চিঠিখানা দুদিন আগেই এসেছিলঃ বেঙ্গল স্টীল কোম্পানির মালিক সন্দীপকুমার আগরওয়ালার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে হেড অপিসে পাঠাতে হবে। আগরওয়ালার অপর তিনজন সঙ্গীর একজন বিখ্যাত সলিসিটর, একজন বিখ্যাত শেয়ার ব্রোকার, আরেকজন নামকরা চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট। সঙ্গীদের সম্বন্ধে সকলেই জানে, ভালো করে জানতে হবে আগরওয়ালা সম্বন্ধে।...থ্যাটও সায়েন নেই; ম্যানেজার স্বয়ং ডেকে বললেন—"যা করবার আপনিই করুন। যদি প্রয়োজন মনে করেন you may see this Agarwala এবং তেমন হলে, আমার সঙ্গে তার দেখা করিয়েও দিতে পারেন।"

আগরওয়ালা চমৎকার লোক। প্রদোষ লোক চেনে। কেমন জাঁদরেল ভদ্রলোক, কতো সহজভাবে কথাগুলো বলে গেল। বাঙালী চরিত্রের কী নিখুঁত ব্যাখ্যা। ঠিক প্রদোষের সঙ্গে মিলে যায়। ওর প্রায় সব ধারণাই প্রদোষের সঙ্গে মেলে। শুধু ক্যাপিটালিজম্-এর ব্যাপারটা! বাঙালীদের সবাই ভালোবাসে লোকটি। ভালো না

কেমন হল! বোধ হয় বিশেষ কোনো প্রয়োজনেই আগরওয়ালাকে এমন করতে হয়েছে। থাকলে...এই তো প্রদোষের সংস্থা পুরো তিরিশ লাখ টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার আর বিশ লাখের ইকুইটি শেয়ার আন্ডার-রাইট করেছে। তার জন্যে কোনো বিশেষ শর্তও আরোপ করে নি। প্রদোষের পরিশ্রম সার্থক।

অপিসে গিয়েই টেলিফোন করল আগর-ওয়ালাকে। কিছুক্ষণ পর শুনতে পেল, মিঃ আগরওয়ালা বড়ো ব্যস্ত আছেন, দু একদিন পরে টেলিফোন করলে ভাল হয়। সবকিছু অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। পর মুহূর্তেই ভাবল: তাই তো, এতো বড়ো কোম্পানির ব্যাপার ,আগরওয়ালা বেচারি সবদিক সামলে উঠতে পারছে না। ঠিক আছে, পরেই যোগা-যোগ করা যাবে। দুদিন বাদে সকালে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আবার চমকে উঠল। বেঙ্গল স্টীলের বিভিন্ন বিভাগে এক্‌জিকিউটিভ পোস্টে লোক নেওয়া হবে—তার মধ্যে শেয়ার, সেক্রেটারিয়াল এবং ল ডিপার্ট-মেন্টের কথাও আছে। তলায় আর একটা বিজ্ঞাপন এস পি পাবলিসিটির। আগর-ওয়ালা বলেছিল, সন্দীপকুমার—প্রিয়া পাবলিসিটি। জন্য সেক্রেটারি , অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি চাই। অপিসে গিয়ে আগর-ওয়ালাকে টেলিফোন করে পেল না, করল বাড়িতে টেলিফোন। অনেক চেষ্টার পর পেল প্রিয়া আগরওয়ালাকে, "মিসিস আগর-ওয়ালা! মিস্টারের সঙ্গে তো কথাই হয় না, ভয়ানক ব্যস্ত। দেখলাম সব জায়গাতেই আপনাদের লোক নেওয়া হচ্ছে। দরখাস্ত দেবো নাকি একটা? আর আমাদের খাওয়া-দাওয়ার কী হল?" আবদারের সুরে বলে প্রদোষ। জবাব এল ইংরেজীতে—সান্যালবাবু, আমার স্বামীর ব্যবসায়িক ব্যাপারে আমি কথা বলি না। আমার মনে হয় আপনার ওঁর সঙ্গে কথা বলাই উচিত হবে। নমস্তে।"

ওদের হয়েছে কী? নিশ্চয়ই কিছু... প্রদোষ ভাবে নইলে প্রদোষের সঙ্গে ওদের যা সম্পর্ক! যাকগে, প্রদোষ নিজের জন্যে ভাবে না, তবে ওর জানা কিছু লোক যদি চাকরি পেত! ও যে অনেককে কথা দিয়ে রেখেছে। আগরওয়ালার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। আগ বাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করে না, আরো কদিন যাক্। ঝামেলা কাটলে আগরওয়ালা নিজেই ডাকবে।

দিন সাতেক বাদে আর অপেক্ষা করতে না পেয়ে প্রদোষ নিজেই গেল আগর-ওয়ালার অপিসে। স্লিপ দিয়ে এক ঘণ্টা বসে থেকেও আগরওয়ালার সঙ্গে দেখা হলো না। আগরওয়ালা ভীষণ ব্যস্ত, তার ঘর ভর্তি লোক। বিরক্ত হয়ে প্রদোষ নিচে নেমে দেখে বৃষ্টি হচ্ছে। ভীষণ খারাপ লাগল। হঠাৎ দেখে আগরওয়ালা আর

ট্রামে বাসে

শেখ আবদুল্লার সঙ্গে রাজাজীর মতের মিল হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; যদিও মতটা যে কী তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"অথচ আমরা জানতাম—

টু অব এ গ্রেড ক্যানট অ্যাগ্রি—এ ক্ষেত্রে একজন শের আর একজন শার্দুল: প্রথমটা 'জনগণের' দেওয়া খেতাব, দ্বিতীয়টা রাজাজী নিজেই নিজেকে দিয়েছিলেন, মনে করে দেখুন তাঁর উক্তি—'বৃদ্ধ হলেও আমি বাঘ'।"

মালদহ উপনির্বাচনে প্রায় তের হাজার ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থী কম্যুনিস্ট প্রার্থীকে পরাজিত করিয়াছেন। —"এ যে হতেই হবে, (দেশে) অন্য অজগর আসছে তেড়ের বেলায় কম্যুনিস্টদের পাত্তা

নেই, শুধু (মালদহের) আমটি আমি খাব পেড়ের বেলায় বায়নাক্কা"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

শেখ আবদুল্লা দিল্লিতে এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরের "আত্মনিয়ন্ত্রণের" দাবি তিনি আমরণ করিয়া যাইবেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আহা ষাট ষাট, মৃত্যুর কথা আবার কেন। তবে একথা বলতে চাই যে, সেই দুর্দিন যদি আসেই 'তবে ওয়ারিসন ক্রমে দাবি করিতে রহ' বলে যদি কোন উইল করে যান তাহলে যথাযোগ্য ওয়ারিসের অভাব হবে না!!"

সংবাদে প্রকাশ, শেখ আবদুল্লা নাকি দিল্লি আসার পর অনেক কবর পরিদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"কবর দর্শন সম্পূর্ণ করতে হলে মীর জাফরের কবরটা একটু ঘুরে দেখার জন্য সময় করে নেবেন!"

শেখজী পাকিস্তানে যাইবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন, এদিকে সংবাদে বলা হইয়াছে যে, নয়াদিল্লি কিছুতেই তাঁহাকে পাকিস্তান পরিদর্শনে যাইতে দিবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু আমাদের এক সহযাত্রী ছড়ার একটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"লাখো বার যায় যদি সে, যাওয়া তার ঠেকায় কিসে!

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারি নাকি রাজ্যসভায় বলিয়াছেন যে কাশ্মীরে আমাদের দাবি সম্পর্কে বিশ্বের যে কেহ প্রশ্ন করিলে বলিব,—ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া দেখুন। —"কিন্তু বিশ্বের দৃষ্টি যে শুধু ভূগোলের দিকেই নিবদ্ধ"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সংবাদে শুনিলাম নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি অনুযায়ী উদ্বাস্তুদের ফেলিয়া আসা স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।—"খুবই ভালো কথা। কিন্তু আমরা ভাবছি তথ্য সংগ্রহের আগে দাবিটা জোরদার করার জন্য নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তিটিকে কবর খুঁড়ে তোলার ব্যবস্থা করলে হয় না, আমরা তো শুনেছি বহুকাল আগেই এ চুক্তির ইন্তেকাল হয়েছে এবং তাকে যথারীতি কবরস্থও করা হয়েছে"—বলেন খুড়ো।

লোকসভায় কমিউনিস্ট দলের নেতা শ্রীগোপালন নাকি পি টি আই-এর প্রতিনিধিকে বলেন যে, তিনি লোকসভায় দলের নেতৃত্ব ত্যাগ করিতে রাজী নহেন। সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু আমরা যে শুনেছিলাম, গোপাল বড় ভাল ছেলে, তাহাকে যাহা বলা হয় তাহাই করে, যাহা দেওয়া যায় ...ইত্যাদি।"

অন্য এক সংবাদে জানা গেল মালদহের সীমান্তে নাকি পাকিস্তান বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"ধরে নিতে পারি এই সমাবেশ মালদহের আম কুড়োবার জন্যে নয়, হয়ত আমদরবারের জন্য।"

শ্রীকৃষ্ণমাচারি বলিয়াছেন যে, অর্থমন্ত্রীর অবস্থা অনেকটা গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের মত, তা-ও এক গরুর নয়, অনেক গরুর গাড়ি, কতকগুলি টানে সামনের দিকে, আর কতকগুলি টানে পিছনের দিকে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমরা গাড়োয়ানটিকে তো চিনতে পারলাম, কিন্তু গরুগুলি কোন গোয়ালের সেটাও বলে দিলে পারতেন!!"

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং তাঁর দেড় কাঠা জমিতে সাড়ে সাত মণ আলু ফলাইয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, এক বিঘা জমিতে এক শত মণ আলু ফলান সম্ভব। —"তাই বলুন,

আমরা অবাক হয়ে ভাবছিলাম আলুর ৮. এত চড়া হওয়ার কারণ কী। এবারে বোঝা গেল, এ-তো আর রামা-শ্যামার আলু নয়, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর ফলানো আলু, প্রাস্টিজ ভেল্যু দিতে হবে বই কি!!"

রাশিয়া ভারত হইতে দুই হাজার টন তামাক ক্রয় করিয়াছে। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"এই তামাকের বাবদ কোন মূল্য না নিয়ে আজারবাইজানে সম্প্রতি আবিষ্কৃত অত্যাশ্চর্য যে ওষুধের গুণে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, টাকে চুল গজায়, পাকাচুল কাঁচা হয়—তার সঙ্গে একটা বার্টার প্রথার চুক্তি হলে হয়ত উভয় দেশই উপকৃত হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক কথাটা ভেবে দেখবেন।"

এম সি সি-এর যে-টিম ভারত সফরে আসিয়াছিল উহার অধিনায়ক মাইক স্মিথ দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া এক বক্তৃতায় নাকি বলেন যে, ভারতে খেলার চাইতে টাকাটাকেই বড় করিয়া দেখা হয়।—"কিন্তু ওদিকে এম সি সিও যে সফরের চেয়ে টাকাটাকে বড় করে দেখেন তার নজীর সফরের আগে তাঁদের দাবি-দাওয়ার ফিরিস্তি দেখলেই পাওয়া যাবে; কথাটা মাইকে ঘোষণা করে দেওয়া উচিত, বলা উচিত ছেঁদো কথার 'বাম্পার' ক্রিকেট নয়!"

নিউদিল্লিতে হকি টেস্টে ভারত কেনিয়াকে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়াছে।—"নিউদিল্লিতে শুধু আবদুল্লা আশোজের (ছাই বলব?) দ্যা-হকী টেস্ট এখনো অমীমাংসিত!!"

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

সময় পাড়ির গল্প

অংকে তেমন মাথা থাকলে হয়ত তত্ত্বটা বোঝা যেত, কিংবা পদার্থবিদ্যায় তেমন কিছু পড়াশোনা থাকলে। তবু ভাবতে লজ্জা করে গল্পের বইয়ের অংকও মগজে ঢুকবে না। কাজেই আমি একটা সহজ অংক নিলাম উদাহরণ হিসাবে, জটিল অংকের চরিত্রটা বুঝব বলে। আমার অংকটা নিতান্ত সহজ। ধরুন, হাওড়া স্টেশন এমন জায়গা যেখান থেকে আমাদের রেল যাত্রা শুরু হবে, ওটা শূন্যের অংক অর্থাৎ হাওড়া স্টেশন যাত্রাবিন্দু হিসাবে জিরো: তারপর শ্রীরামপুর, সেটা হয়ত ১৫ কিলোমিটার, ব্যান্ডেল তিরিশ, বর্ধমান ষাট, আসানসোল একশো কুড়ি কিলোমিটার। এখন, কোনো রেল গাড়ি ছেড়ে গেলে ক-বাবু যদি হাওড়ায় থাকেন, তবে তিনি শূন্যতে আছেন, অর্থাৎ যাত্রা শুরু করেন নি। কিন্তু খ, গ, ঘ, প্রভৃতি বাবুরা যদি রেলে চড়ে যাত্রা শুরু করে থাকেন এবং যথাক্রমে খ-বাবু নামেন শ্রীরামপুরে, গ-বাবু ব্যান্ডেলে, ঘ-বাবু বর্ধমানে, ঙ-বাবু আসানসোলে তবে স্বভাবতই আমরা বলতে পারি ক, খ, গ, ঘ, ঙ-বাবুদের মধ্যে ক-বাবু যাত্রার গোড়ায় আছেন, কিন্তু খ, গ, ঘ এবং ঙ-বাবু যথাক্রমে ১৫, ৩০, ৬০ ও ১২০ কিলোমিটার এগিয়ে গেছেন। তার অর্থ, যাত্রাপথে এঁরা প্রত্যেকেই ক-বাবুর চেয়ে উপরের হিসাব মতন পথ অতিক্রম করে এসেছেন।

এখন কথা হল, যদি স্থানের দূরত্ব অতিক্রম করা জলজ্যান্ত সত্য হয়, তবে 'সময়' অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলে 'টাইম' সেই অনন্ত সময়ের পথে পাড়ি দিলে খ, গ, ঘ, ঙ-বাবুরা ক-বাবুর থেকে এগিয়ে যেতে পারবেন কি না? প্রশ্নটা, যা বলি ধাঁধাটা গুরুতর। না-পারার অবশ্য আপাতত কোনো হেতু নেই। ইতিহাসের হিসেব ধরেই দেখা যাবে এটা সম্ভব। আমরা যীশুখৃস্টের জন্মের পর প্রায় দু হাজার বছর তো এগিয়ে এলাম।

এখন গল্পের অংক বলছে, হে আধুনিক মানুষ, তোমরা এ-যাবৎ পিতৃপুরুষের জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে বংশ পরম্পরায় এই পথ অতিক্রম করেছ; যে-কোনো একটি ব্যক্তি দু হাজার বছরের পথ অতিক্রম করে আসে নি। কিন্তু, বর্তমান বিশ্ব যেসব রোমহর্ষক, অবিশ্বাস্য ও জটিল বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছে তাতে অচিরে চাঁদে মানুষ পাঠানোর মতন তোমাকেও সময়ের পথে দশ বিশ হাজার বছর পথ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে রেখে দিতে পারে। অর্থাৎ রেলগাড়িতে চেপে যেভাবে ঙ-বাবু ১২০ কিলোমিটার দূরে চলে গেলেন ক-বাবুর চেয়ে, তারপর টুপ করে আসানসোল স্টেশনে নেমে পড়লেন, সেই রকম প-বাবু নামক জনৈক ভদ্রলোককে অনায়াসেই সময়ের গাড়িতে চাপিয়ে দশ হাজার বছর পরের সময়-স্টেশনে আমরা নামিয়ে দিতে পারি।

বলা বাহুল্য, কথাটা শুনলেই পাঠক বলবেন গাঁজাখুরি। আমিও বলব গাঁজাখুরি। আমরা ঠিক এতটা গাঁজা বরদাস্ত করতে পারব না।

অপরপক্ষ অবশ্য তখন জবাব দেবেন, রাবণরাজার দশটা মাথায় তো বাপু তোমার এত আপত্তি দেখি না, এই নাক সিঁটকোনো ভাব তো হনুমানের সাগর-লম্ফে বা অর্জুনের খাণ্ডবদাহনের বেলায়ও দেখি না। যদি সেগুলো গল্প বলেই শুনতে আপত্তি না থাকে, তবে আমাদের এই পাঁচ দশ হাজার বছরের সময়ের দৌড়কে মানতে তোমাদের আপত্তি থাকবে কেন, এটাও তো গল্প! রাবণরাজার গল্পের চেয়েও এমন কিছু কম অবিশ্বাস্য নয়।।

হ্যাঁ, গল্প বলেই সময়-পাড়ি অর্থাৎ যাকে বলে 'টাইম-ট্রাভেল' সেটা মানা যায়। আমি জানি না, যে অংকটা এই টাইম-ট্রাভেল সম্পর্কে পড়লাম, সেটা ভুয়ো কিনা। সম্ভবত ভুয়ো।

তবু এই ভুয়োর কল্পনা নিয়েই আজ ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে রাশি রাশি কাহিনী লেখা হচ্ছে টাইম-ট্রাভেলের। এর পাঠকও লক্ষ লক্ষ। সবচেয়ে মজার কথা, গোয়েন্দা কাহিনীর পাঠক যেমন অসংখ্য, এবং শতকরা নিরানব্বইজনই খুব হালকা পাঠক, এই 'সাইন্স ফিকশ্যান' নামধেয় কাহিনীগুলির পাঠক কিন্তু তেমন হালকা নয়। দিব্য জ্ঞানগম্যিঅলা মানুষ, বিস্তর বিদ্বান লোক, পাকা সব লেখকটেখকও কী সহজেই সাইন্স ফিকশ্যান পড়েন।

শুনি সাইন্স ফিকশ্যানেরও আবার সেরা হচ্ছে দু জাতের কাহিনী—(ক) টাইম-ট্রাভেলের গল্প আর (খ) পারমাণবিক ভবিষ্যতের গল্প। এরা কেন যে সেরা, জানি না। তবে অনুমান হয় এই দুয়ের মধ্যেই কল্পনামূলক বিজ্ঞানচিন্তা যথেষ্ট আকর্ষণীয় করা যায়। হয়ত তারই মধ্যে
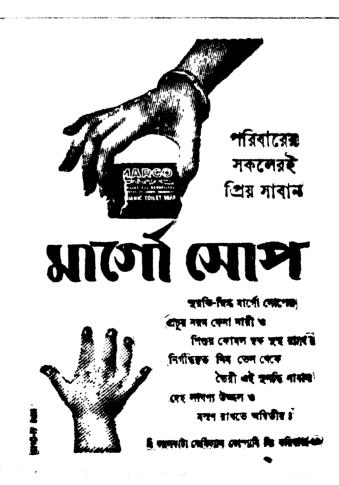
সাধারণ মানুষ ভবিষ্যতের আয়নায় নিজেদের সম্ভাব্য চেহারাও কিছু কিছু দেখতে পায়।

সম্প্রতি এই ধরনের দুটি গ্রন্থ যোগাড় করেছিলাম। একটি টুকরো টুকরো ছোট গল্পের, অন্যটি বড় গল্পের সংকলন। বড় গল্পের সংকলনের কথাই বলছিলাম এতক্ষণ। লেখক আমাদের 'টাইম-ট্রাভেলের' এমন কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী শুনিয়েছেন, যাকে বাহবা না দিলে নয়।

গল্পে কিছু যুবক যুবতীকে (যুবতী বোধ করি সংখ্যায় অল্প) টাইম-ট্রাভেলের শিক্ষা দিয়ে দীর্ঘ ১৭ হাজার বছরের পরের সময়-পথে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, সময়-পাড়ি তখন খুব পুরোনো আবিষ্কারও নয় বোধ করি। এই যে অল্প কিছু যুবকযুবতী, এদের সময়-পাড়ি দেবার মতন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা আছে কিনা, তার যে পরীক্ষা হয়েছে সেই ভয়াবহ পরীক্ষায় কোনো বর্তমান পাঠককে আমি যেতে বলি না, কেননা ধাতে সইবে না। তবে দেখলাম অন্তত একজন 'হিন্দু'ও এই পরীক্ষায় পাস করে ১৭ হাজার বছর সময় পাড়ি দিলেন।

ধরে নেওয়া গেল ১৭ হাজার বছর পরের সময়ে এরা কজন পাড়ি দিতে পারল; কিন্তু কেন এই পাড়ি জমানো, এতে কার লাভ, কি লাভ?

জবাবটা কিন্তু অত্যন্ত সুন্দর। সুদূর ভবিষ্যৎ থেকে এরা আসবে মানুষের অতীত ইতিহাসকে রক্ষা করতে। সময়-পাড়ির সবচেয়ে বড় প্রয়োজন মানুষের ইতিহাসকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা। প্রাঞ্জল করে বললে বলতে হয়, মানবসভ্যতা কোনো কোনো ঘটনায় এমন একটা সংকটের পথে চলে যায়, তার গতি এমন ভয়ংকর খাদে গড়িয়ে চলে যে সভ্যতার সমূহ বিপদ দেখা দেয়। যদি এমন হত এই বিপদকে মানুষ রুখতে পারত আগে থেকে তবে কি সভ্যতার পথ নিষ্কণ্টক হত না! স্বাভাবিক ভাবেই আমরা মনে করব, হ্যাঁ, তা হত; যদি হিটলার নামক মানুষটি সভ্যতার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করার সুযোগ না পেত, যদি মুসোলিনীকে কেউ মাথা তোলার আগেই কবরে দিয়ে আসত তবে আশা করা যায় ইতিহাসের একটা পর্ব অনেক স্বস্তির হত।...... ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করার এই বাসনা সময়-পাড়িঅলাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, যেন কোনো দায়িত্বহীন প্রাণী অতীতের ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ না করে। তা ছাড়া এও ধরে নিতে হবে, ভবিষ্যতের অন্ধকার থেকে কে যে কবে কোন ভুবন থেকে এসে এই পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হবার চেষ্টা করবে কেউ জানে না। তাদের হাত থেকেও নিরাপত্তা দরকার।

এখন অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে এইরকম : এই কলকাতা শহরে যেমন লালবাজার, যার কাজ হচ্ছে নগরবাসীর জীবন, ধন প্রাণ রক্ষা করা, চোর-ডাকাত-বদমায়েসের অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা করা ইত্যাদি, সেইরকম সময়-পাড়ির হেড অফিস হচ্ছে আর-এক ধরনের আন্তর্জাতিক লালবাজার। পুলিসে যেমন কলকাতার পথঘাট অলিগলি পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে লালবাজারের নির্দেশে তেমনি সময়-অফিসের নির্দেশে কিছু মানুষ সময়ের রাজপথ ও অলিগলি টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, এরাই হল 'টাইম পেট্রল'—সাদামাটা ভাষায় সময়ের পাহারাদার, অর্থাৎ আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের একমাত্র অভিভাবক।

সময়ের পাহারাদাররা আপাতত তাদের বর্তমান থেকে কাজ শুরু করেছে, তারা ইচ্ছে করলে অতীতে ফিরে যেতে পারে—কিন্তু যে-ঘটনা অতীতে ঘটে গেছে তাকে উল্টে দিতে পারে না। অর্থাৎ তারা লিনকোন হত্যা বন্ধ করতে পারে না, হিটলারের জন্ম ও হিটলারের সর্বনাশা যুদ্ধ বাধানোও বন্ধ করতে পারবে না : "Some time the patrol will accept damage as done, and work instead to set up counteracting in latter periods which will swing history back to the desired track."

অতীতকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে না, যে ঘটনা ঘটে গেছে তাতে হস্তক্ষেপ করবে না এই শর্তে সময়ের পাহারাদাররা চাকরিতে বহাল হল। ওদের মধ্যে দুই পাহারাদার একজন আমেরিকান অন্যজন ব্রিটিশ পাহারাদারীর কাজ করতে করতে এক বিপদ সৃষ্টি করল। ব্রিটিশ ছোকরার প্রেমিকা ১৯৪৪ সালে লণ্ডনে বোমা পড়ে মারা গিয়েছিল। প্রেম এই ছোকরাকে নিজের শর্ত ভোলাল দায়িত্ব ও শপথ থেকে চ্যুত করল, সে পরে কাজ থেকে পালিয়ে ১৯৪৪-এ ফিরে গেল মেরী নেলসন-এর সান্নিধ্য পেতে, তাকে অবধারিত মৃত্যু থেকে বাঁচাতে। কিন্তু সে মেরীর কাছে পৌঁছোবার আগেই আমেরিকান পাহারাদারটি সেখানে পৌঁছে গেছে, কেননা সময়ের লালবাজার ফেরারী চার্লস হুইট কম্বকে (বৃটিশ ছোকরা) ধরবার আগেই বন্ধুবৎসল আমেরিকানটি চায় অতীত ইতিহাসকে একটু পালটে ফেলতে। অর্থাৎ যে-ভাবে যে-ঘটনায় পড়ে মেরী নেলসন ১৯৪৪-এর বোমার আঘাতে মারা পড়েছিল তাকে একটু অদলবদল করে রাখতে। কারণ তার যাতে মেরী আর বোমার ঘায়ে মরবে না।

কিন্তু যা ঘটে গেছে ঘটনা হিসাবে যা সময়ের খাতায় লেখা হয়ে গেছে তার পরিবর্তন কি সম্ভব? সময়ের লালবাজার থেকে দুই নতুন পাহারাদার এসে হুইটকম্বদের ধরে ফেলল। এমন কোনো সময় কি পাওয়া যায় না, যেখানে পালিয়ে গিয়ে এই দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা ঘটে-যাওয়া-ঘটনাকে বদলাতে পারে?

Poul Anderson-এর লেখা Guardians of Time-এর প্রথম গল্পটির (Time Patrol) মূলটুকুই আমি শুধু বললাম। আরও তিনটি ছোট গল্প আছে। সাইন্স ফিকশ্যানের যাঁরা ভক্ত, যাঁরা কিঞ্চিৎ উৎসুক পাঠক তাঁরা বইটি পড়ে দেখতে পারেন। কিংসলে অ্যামিস নাকি বিশেষ করে সুপারিশ করেছেন গ্রন্থটি পড়তে। আমার মতে, সত্যিই পড়ে আনন্দ পাওয়া যায়। সাইন্স ফিকশ্যান হলেও নানা স্থানে এমন অনেক কথা আছে, মন্তব্য ও চিন্তা আছে, যা আধুনিক মানুষের মনের কথা।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী : শেক্সপীয়র প্রদর্শনী

কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে শেক্সপীয়র চতুর্শত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বলাবাহুল্য প্রদর্শনীটির যা মুখ্য উদ্দেশ্য—ভারতে শেক্সপীয়র চর্চার একটি সহজ ও সর্বাঙ্গীন পরিচয় প্রদান—তা পালন করতে উদ্যোক্তারা বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি। মূলত, প্রদর্শনীটি গ্রন্থ ও ছবির। এ-যাবৎ শেক্সপীয়রের গ্রন্থের যতগুলি অনুবাদ ভারতে হয়েছে বিভিন্ন ভাষায় তার একটি ধারাবাহিক পরিচয় এই প্রদর্শনীতে পাওয়া যাবে। উপরন্তু ভারতীয় ভাষায় শেক্সপীয়র সম্পর্কে এ-যাবৎ গ্রন্থাদি যা লেখা হয়েছে মোটামুটি তারও একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন এখানে দেখা যাবে।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

উদ্বোধনের অধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ জানাইতেছেন যে, স্বামীজীর বাণী ও রচনার ১ম সংস্করণ শেষ হইয়া গিয়াছে। এখনও অনেকেই উহা পাইবার আগ্রহ প্রকাশ করায় উহার দ্বিতীয় সংস্করণ ৫০০০ হাজার সেট প্রকাশ করা হইতেছে। আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে গ্রন্থাবলীর সমগ্র ১০ খণ্ড (রেক্সিনে বাঁধাই) বাহির করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

যাঁহারা আগামী ৭ই জুনের মধ্যে অগ্রিম এককালীন ৬০ টাকা জমা দিতে পারিবেন, তাঁহারা উক্ত মূল্যেই গ্রন্থাবলী পাইবেন। যাঁহারা অগ্রিম টাকা জমা দিতে না পারিবেন তাঁহাদের উক্ত গ্রন্থাবলী প্রকাশের পর এককালীন ৭০ টাকা জমা দিয়া উহা লইতে হইবে।

অগ্রিম মূল্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় নগদ, ড্রাফট বা কলিকাতার ব্যাংকের চেক বা পোস্টাল অর্ডারে গ্রহণ করা হইবে।

উদ্বোধন কার্যালয়, (১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩) : এইচ কে ঘোষ এণ্ড কোং, (২৫-এ, সোয়ালো লেন, রাধা-বাজার, কলিকাতা-১।)

গভীরভাবে আসক্ত হয়েছিল রমলার প্রতি। কিন্তু শান্তনুর মনে এই দুর্বলতা স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠবার চিহ্নটি উপন্যাসে কোথাও তেমনভাবে প্রস্ফুট নয়। যদিও শান্তনু এবং রমলার পরস্পরের প্রতি এই অপ্রকাশিত দুর্বলতাই চূড়ান্ত পর্যায়ে কাহিনীর নিয়ামক।

রমলার এক প্রেম থেকে আর-এক প্রেমের ভূমিতে বিচরণ, প্রেমে নতুন বঞ্চনা লাভ, জীবনে বিতৃষ্ণ হয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণ এবং শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে বারবনিতার বৃত্তি গ্রহণ, এ-সবকিছুর মধ্যে কৌতুকীয় দ্রুত ঘটনা লক্ষ করা যায়। সেই কারণেই সর্বত্র সুকৌশলী বিন্যাসের ভঙ্গিতে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। চরিত্র সৃষ্টি অথবা বিশ্লেষণের পথ পরিহার করে ঘটনার নাটকীয়তার ওপরেই লেখক বেশী নির্ভর করেছেন। ঘটনার আধিক্য কখনও কখনও অস্বস্তিকর। বর্ণনার স্বাচ্ছন্দ্যে উপন্যাসের গতি অব্যাহত। কাহিনীতে যাঁদের প্রাধান্য কম, তেমন দুটি-একটি চরিত্র বই শেষ করবার পর স্পষ্ট হয়ে মনে থাকে। এঁদের একটি সুশান্তের বাবা, রমলার পিতৃবন্ধু, আর-একটি সুশান্তের স্ত্রী সতী।

৮৫।৬৪

নাম নেই ঠিকানা নেই। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা-১২। দাম: তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবীণ এবং সুপরিচিত লেখক। তাঁর রচনারীতিতে বক্র বৈদগ্ধ্য এবং কারুকৃতির নৈপুণ্য খুব বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ না করলেও তিনি তাঁর চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও অকপট লিখন রীতির দ্বারা পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করেন। গল্প রচনায় তাঁর সরলতা ও স্নিগ্ধ মেজাজের পরিচয় তাঁর যে-কোনো লেখাতেই পাওয়া যায়।

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি উপন্যাস। কিন্তু সাধারণত উপন্যাসে সমসাময়িক কাল ও পরিবেশের যে পটভূমির ওপর কাহিনী বিস্তৃতি ও পরিণতি লাভ করে, আলোচ্য উপন্যাসটিতে তা পরিতাপজনকভাবে অনুপস্থিত। কাহিনী-মুখ্য এই উপন্যাসটি একটি অদ্ভুত নিশ্চেষ্ট এবং অলৌকিক বীরত্বসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে এক ভাগ্য-তাড়িত পলায়নপর ভ্রষ্টা নারীর আকস্মিক কারণে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতার ঘটনার ভিতর দিয়ে শুরু হয়েছে। এই আকস্মিক যোগাযোগ ক্রমশ আরো কয়েকটি আকস্মিকতার সৃষ্টি করে এবং পরিণতিও তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে নায়।

কাহিনীতে চটক আছে বলেই পাঠক উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষাবধি আগ্রহশীল থাকবেন। কিন্তু কাহিনীর ফলশ্রুতি পাঠকের মনকে কখনো নাড়া দেয় না, তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতর কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করে না। মাধব, উমা কিংবা অলক—কারো চরিত্রই প্রশ্নাতীত প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, গল্প বা কাহিনী কোনো একটা জায়গায় নিছক গল্পস্তরকে অতিক্রম করে জীবনের মূলে কয়েকটি প্রশ্নের সম্মুখীন না হলে পাঠক ও লেখকের ভিতর নিভৃত ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় না। দূরত্ব থেকে যায়। এ উপন্যাস সেই দূরত্বকে অতিক্রম করেনি।

প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত লেখকের কাছ থেকে আমরা তাঁদের বিরাট ও বিস্তৃত অভিজ্ঞতার যে রসনিবিড় প্রকাশ ও জীবন [illegible] প্রকাশ আশা করি, এ থেকে বঞ্চিত হতে ক্ষোভ থেকে যায়। [illegible] সুখপাঠ্য এবং [illegible] কিন্তু শেষ করবার পর আর কিছুই [illegible] থাকে না।

[illegible]

জীবনী

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। [illegible] গুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য দুই টাকা [illegible]।

আলোচ্য গ্রন্থখানি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী। [illegible] সত্যেন্দ্রনাথ অত্যন্ত মেধাবী বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১৫ সালে তিনি মিশ্র-গণিতে এম এস সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। [illegible] পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বেশ কিছু দিন অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার পূর্বে তিনি কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে Relativity সম্পর্কে গবেষণা করেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই বিজ্ঞানীদের সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। জীবনের মধ্যাহ্নে তিনি জার্মানীতে বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত এবং সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হন।

১৯৫৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৫৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন। বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক সম্মেলনী কর্তৃক আহূত হইয়া সত্যেন্দ্রনাথ পৃথিবীর বহু স্থানে গমন করেন। ইহার মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, টোকিও, ইজিপ্ট প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানবিদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশের বিদ্যার্থীরা তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের প্রেরণা আহরণ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আশা পোষণ করা যাইতে পারে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল। ৫৯৩।৬৩

ছোট গল্প

রোমান্স। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। [illegible] প্রকাশনী। ৭২-১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। [illegible] টাকা।

[illegible] সাহিত্যে, বিশেষ করে ছোট গল্পে, [illegible] রসের সৃষ্টি খুব বিরল। [illegible] জীবনের গভীর সমস্যা বাংলা ছোট গল্পকে [illegible] করেছে, কৌতুক রস ততটা [illegible] প্রতিষ্ঠিত লেখকের রচনায় কৌতুক রস বিশেষভাবে উপেক্ষিত। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে কথাটা যে সত্যি নয়, তার প্রমাণ এই ছোট গল্পের সংকলনটি।

এই সংকলনের সব ক'টি গল্পই কৌতুক রসাশ্রিত। গল্পগুলির নায়ক বৃদ্ধ দীনবন্ধু দাদামশাই এবং নায়িকা তাঁরই পরলোকগতা স্ত্রী বঙ্কতারা। যুবক লেখকের কাছে বৃদ্ধের যৌবনের স্মৃতিরোমন্থন। স্বাচ্ছন্দগতিতে কৌতুক রসের গল্পগুলি জমে উঠেছে। সমস্যাজর্জর কর্মক্লান্ত দিনের শেষে গল্পগুলি এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া নিয়ে আসবে। ১৩৯।৬৪

শিশু-সাহিত্য

বাঘের ভয়ে। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। কথাশিল্প প্রকাশ। ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

অবনীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর প্রভৃতি

কয়েকজনের দানে শিশুসাহিত্যের প্রথম যুগ খুব সমৃদ্ধ। পরবর্তীকালে রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনীতে, রহস্যময় আজগুবী ধরনের ভূতের গল্পে শিশুসাহিত্য একটি অস্বাস্থ্যকর পরিণাম পেয়েছিল। স্বাভাবিক কল্পনাশক্তি থাকায় শিশুর মনোরাজ্যে প্রতি মুহূর্তে যে অজস্র ভাঙাগড়া চলছে অস্বাস্থ্যকর খুন-খারাপির কাহিনীগুলি সেই কল্পনাশক্তিকে বাড়িয়ে তোলার পরিবর্তে অহেতুক নেশার মত ক্রমশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যে কজন তরুণ কথাশিল্পী এই আবহাওয়া থেকে শিশুসাহিত্যকে মুক্ত করতে চেয়েছেন, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। যতদূর জানা আছে "বাঘের ভয়ে" শিশুদের জন্যে লেখা তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ। খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে গভীর রাত্রে একটি বাঘ কলকাতা শহর ঘুরে দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছে। তার হাতে পুরনো কলকাতার একটি ম্যাপ। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে এই বাঘকে নিয়ে শহরের সমস্ত মানুষ, থানা-পুলিস, গোয়েন্দা, দোকানদার, কি রকম মজার মজার সব ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন তারই কৌতুকময় বিবরণ এই উপন্যাসে। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় সাধারণত কবিতা লেখেন; লেখেন বলেই বোধ করি তিনি এমন একটি সহজ অথচ অনায়াস মনোহর ভাষায় প্রতিটি ঘটনা লিখে গেছেন। চরণচিহ্ন, বৃষ্টিবিন্দু, রাজাকিঙ্কর প্রভৃতি নামকরণে তাঁর মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। শিশু এবং কিশোরদের সঙ্গে বয়স্ক পাঠকেরাও এই উপন্যাস-পাঠে মজা পাবেন। সুবোধ দাশগুপ্তের প্রচ্ছদ প্রশংসার দাবি করতে পারে।

(৩৪৩।৬৩

চম্পক লতা—চিত্তরঞ্জন দে। শোভনা প্রকাশনী, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য এক টাকা।

পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে যে-সব লোকগাথা ছড়াইয়া রহিয়াছে, চম্পক-লতা তাহারই একটি। মূল গাথা মোহনবংশী দাস কর্তৃক পয়ার ছন্দে রচিত হইয়াছিল। ফরিদপুর জেলা হইতে গ্রন্থকার ইহা সংগ্রহ করিয়া পদ্য ছন্দে রূপান্তরিত করেন। প্রথমে ইহা কোন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি সেই কাহিনীটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কিশোর-কিশোরীদের পাঠোপযোগী এই পুস্তকখানার ভাষা বেশ সহজ এবং সরল। কাহিনীর বিষয়বস্তু তেমন উপদেশাত্মক না হইলেও তরলমতি বালক-বালিকাদের পক্ষে ইহা আনন্দদায়ক। অনেকগুলি ছবির সন্নিবেশে বইখানি আকর্ষণীয়। মুদ্রণ পারিপাট্য উল্লেখযোগ্য।

(৬০৫।৬৩)

প্রাপ্তি-স্বীকার

সোনার হরিণ—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

মহাভারতের মহাজাগরণ—স্বপনবুড়ো।

স্বপনবুড়োর সাতরঙ—স্বপনবুড়ো।

মেবার পতন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সম্পাদক ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রফুল্ল—শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ। সম্পাদক ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী।

শিশু-পরিবেশ—সমীরণ চট্টোপাধ্যায়।

বার্ণার্ড-শ—ঋষি দাস।

মনীষী জীবন কথা—সুশীল রায়।

পুনশ্চের কবি রবীন্দ্রনাথ—সমীরণ চট্টোপাধ্যায়।

শেক্সপিয়রের গল্প — শিশিরকুমার নিয়োগী।

বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ (কিশোর নাটক) —প্রবোধ সরকার।

অলোক দৃষ্টি—সতীনাথ ভাদুড়ী।

কালো হরিণ চোখ—দলজিৎ বৈরাগী।

একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর—অশোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রাণ-পাথের—দেবব্রত রেজ।

বিবাহ-সাধনা—শচীন্দ্রনাথ মজুমদার।

রাজধানীর নেপথ্যে—নিমাই ভট্টাচার্য।

দৃশ্যান্তর—চিত্ত ভট্টাচার্য।

ইন্দিরা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শেক্সপীয়র—ঋষি দাস।

আমার জীবন (৫ম খণ্ড)—শ্রীভারতী দেবী।

ম্যাকবেথ, জুলিয়াস সিজর—শেক্সপীয়র। অনুবাদক—বসন্ত রায়।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় দেশে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর [illegible] পাদটীকায় একটি ভ্রম থাকিয়া গিয়াছে। জানকীনাথ ঘোষালের স্থলে জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল হইবে।

রঙ্গজগৎ

চলচ্চিত্র ও রাষ্ট্রদর্শন

প্রতি বছরেই চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ উৎসবে আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ চলচ্চিত্রের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সারগর্ভ বাণী প্রদান করে থাকেন। এবং বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রের আদর্শের কথাই এই প্রসঙ্গে তাঁরা বার বার শুনিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, চলচ্চিত্রে জাতীয় সংহতি ও ঐক্যবোধ, সমাজচেতনা ও অন্যান্য আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এবারেও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেছেন যে, অন্ধকার দূর করার কাজে চলচ্চিত্র বিরাট ভূমিকা নিতে পারে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী তাঁর ভাষণে সমাজের প্রতি চিত্রপ্রযোজকদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

কী ধরনের ছবি রাষ্ট্রের করুণা লাভের যোগ্য তা এতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করতে হলে ছবিতে মানবতা, সমাজকল্যাণ, জাতীয় ঐক্য প্রভৃতি আদর্শ থাকা আবশ্যক। যে বছর এ ধরনের উল্লেখযোগ্য আদর্শভিত্তিক ছবির অভাব ঘটেছে সে বছর সত্যিকারের শিল্পসমৃদ্ধ ছবির ভাগ্যে অবশ্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার জুটেছে। কিন্তু এমন ঘটনা খুব বেশী

এনারার প্রোডাকশন্স-এর 'লালপাথর' (পরিচালনা : সুশীল মজুমদার) ছবিতে সুপ্রিয়া চৌধুরী ফটো : দেশ

তাজমহলের পটভূমিতে চিত্রশিল্পীদের 'সন্ধ্যা-দীপের শিখা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণকালে নায়িকা

সুচিত্রা সেনকে নির্দেশ দিচ্ছেন চিত্রপরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য

ঘটেনি। ফিল্ম আর্টের পক্ষে সেটাই দুর্ভাগ্য। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার অর্জন করতে হলে যদি চলচ্চিত্রকে রাষ্ট্রদর্শনের ধারক ও বাহক হতে হয়, তবে আর্ট সৃষ্টির পথের প্রতিবন্ধকটিকেই লালন করা হবে। এই আশংকার কথা আমরা ইতিপূর্বেও বলেছি। প্রতিকারের আশায় বার বার বলব।

* ছবির পর ছবি *

অভিনন্দন

শ্রীজগন্নাথ পরিচালিত 'অভিনন্দন' ছবিটি এ মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্তি পাবে। ছবির প্রধান শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, মঞ্জু দে, রূপালী ঘোষ, আসিত বরণ, তরুণকুমার ও জহর রায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন গোপেন মল্লিক।

কষ্টিপাথর

'জ্যোতির্ময় রায় পিক্‌চার্স এবং কে কি প্রোডাকশন্সের 'কষ্টিপাথর' কথাচিত্রটি অনতিবিলম্বে মুক্তিলাভ করবে।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন সন্ধ্যা রায়, বসন্ত চৌধুরী, কমল মিত্র, অনুপকুমার, রবি ঘোষ, জহর রায়, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, প্রেমাংশু বসু, গঙ্গাপদ বসু, বীরেশ্বর সেন, জয়শ্রী সেন, বিজন ভট্টাচার্য, সাধনা রায়চৌধুরী, পারিজাত বসু প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ। সংগীত পরিচালনা করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অয়নান্ত

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু-র কাহিনী অবলম্বনে সন্ধানী নামক নবীন পরিচালকগোষ্ঠী তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টা 'অয়নান্ত' ছায়াছবিটির চিত্র গ্রহণ সম্প্রতি সমাপ্ত করেছেন। সলিল চৌধুরী ছবির সুরকার। বিশিষ্ট চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, এন বিশ্বনাথন, শ্যামল ঘোষাল, বিজন ভট্টাচার্য, ছায়া দেবী, শম্পা চক্রবর্তী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এ ছাড়া আছেন নবাগতা সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফাল্গুনী চিত্রমের "অশ্রু দিয়ে লেখা" (পরিচালনা : অমল দত্ত) ছবিতে
ফটো : দেশ

লালপাথর

সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় এসারবি প্রোডাকশন্স-এর 'লালপাথর' ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। ছবির তিনটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নবাগতা শ্রাবণী বসু। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন পরিচালক সুশীল মজুমদার, নির্মলকুমার, রবি ঘোষ, মলিনা দেবী, বাণী গাঙ্গুলী প্রভৃতি। সলিল চৌধুরী সুরকার।

অন্তরাল

পরশমণি দীপচাঁদের 'অন্তরাল' ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। অগ্রদূত ছবিটি পরিচালনা করছেন। বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিত সেন, দিলীপ রায়, দীপিকা দাস প্রভৃতি। সুধীন দাশগুপ্ত সংগীত-পরিচালক।

অশ্রু দিয়ে লেখা

সম্প্রতি ফাল্গুনী চিত্রম-এর প্রথম প্রয়াস "অশ্রু দিয়ে লেখা"র তিনখানি গান অভিজিৎ-এর সংগীত পরিচালনায় রেকর্ড করা হল।

অমল দত্তের পরিচালনায় ছবির নিয়মিত সুটিং এ সপ্তাহ থেকে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আরম্ভ হচ্ছে। শিল্পীদের মধ্যে আছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, অসিতবরণ, সুমিত্রা সান্যাল, নিরঞ্জন রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, মণ্টু মুখোপাধ্যায়, গীতালি রায়।

শিশু চলচ্চিত্র উৎসব

শিশু চলচ্চিত্র পর্ষদ জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকের শিশু চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করেছেন। ষোল দিনব্যাপী এই চলচ্চিত্র উৎসব ১০ই মে থেকে শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে গত সপ্তাহে শিশু চলচ্চিত্র পর্ষদ কর্তৃক আহূত এক সাংবাদিক বৈঠকে উৎসবের কার্যসূচী বিবৃত করা হয়। কলিকাতা ও মফস্বলে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে চিত্রগুলি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে।

জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক শিশু চলচ্চিত্র পর্ষদকে চিত্রগুলি বিনামূল্যে প্রদর্শনের জন্য দিয়েছেন। সকাল নটা হতে এগারটা পর্যন্ত স্কুলের ছেলেমেয়েদিগকে ছবিগুলি দেখানো হবে। কলকাতায় প্রদর্শিত হবে কুড়িটি ছবি, এবং মফস্বলের প্রেক্ষাগৃহে বারটি ছবি দেখানো হবে।

এ সপ্তাহে যে বাংলা ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে তার নাম কিনু গোয়ালার গলি (কে জি প্রোডাকশনস)। ছবিটি সন্তোষকুমার ঘোষের বহুপঠিত উপন্যাসের চিত্ররূপ। চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্রপরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন ও সি গাঙ্গুলী। ছবির তিনটি প্রধান চরিত্রের রূপ দিয়েছেন সুমিত্রা দেবী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর। অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায়, রুমা গুহঠাকুরতা, প্রশান্তকুমার, গীতা দে, জীবেন বসু প্রভৃতি। সলিল চৌধুরী সংগীত পরিচালক।

ছবির সংলাপ কাহিনীকার সন্তোষকুমার ঘোষ নিজেই রচনা করেছেন। আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ সম্পন্ন করেছেন বিমল মুখোপাধ্যায়। অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও রবি চট্টোপাধ্যায় যথাক্রমে সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশনার দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন। ছবির গানে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমল ঘোষ ছবিটির প্রযোজক।

শ্রীজয়দ্রথ পরিচালিত "অগ্নিবন্যা" ছবিতে বিশ্বজিৎ ও তরুণকুমার

চিত্র-সমালোচনা

বিবরণধর্মী জীবনালেখ্য

স্বামী বিবেকানন্দকে জানা আমাদের কোনোদিনই ফুরোবে না। অনন্তের যেমন অন্ত মেলে না। নিরাকার ও অনন্তের মধ্যে এই পুরুষের দেবত্বের পরিচয় আমাদের বুদ্ধি ও বোধের অতীত। কিন্তু পার্থিব মানবলীলার ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের উপলব্ধির সমীপবর্তী। এবং সেখানে তিনি আমাদের আদর্শ পুরুষ। এই দিব্যজীবনের স্মরণ ও মননের সার্থকতা বিগত যুগেও ছিল, আজকের দিনেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এই মহামানবের পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠান) ছবিটি তৈরী।

জন্ম ও শৈশব থেকে আরম্ভ করে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা যাওয়ার সিদ্ধান্ত-গ্রহণের সময় পর্যন্ত তাঁর জীবনের বহু ঘটনা ছবিটিতে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, তাঁর জীবনের যে-সব ঘটনা ছবিতে স্থান পেয়েছে তা দর্শকের অজানা নয়। যে একাধিক ঘটনা দর্শকের আগ্রহ—যেমন বন্ধুদের সঙ্গে বাগানবাড়িতে নর্তকীর গানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে নরেন্দ্রনাথের গান গাওয়া—তার প্রামাণিকতা সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। খেতড়ির রাজপ্রাসাদে নর্তকীর মুখে 'প্রভু মেরা অবগুণ চিত না ধরো, সমদরশী হ্যায় নাম তুমহারো' ভজনটি শোনার পর স্বামীজীর বিশেষ একটি শুভ-সংস্কারের বন্ধনমুক্তির যে কাহিনী পাওয়া যায় সে পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পূর্বজীবনের এই ঘটনার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে মনে সংশয় জাগা অস্বাভাবিক নয়। 'অস্পৃশ্যের হুঁকোতে তাঁর তামাক খাওয়ার ঘটনাটিও ছবিতে সরলীকৃত। স্বামীজী প্রথমে ওই ব্যক্তিকে অস্পৃশ্য জেনে দ্বিধাগ্রস্ত মনে চলেই যাচ্ছিলেন। পরক্ষণে স্বামীজীর মনের দ্বন্দ্ব ও তাঁর সংস্কারজয়ের পরম মুহূর্তটি ছবিতে অনুপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু-রূপে বরণ করার পূর্বে নরেন্দ্রনাথের জীবনে সত্যজিজ্ঞাসার যে ঝড় ওঠে এবং পরিণামে যুক্তিবাদী মনের সকল প্রশ্ন, সংশয় ও বিতর্ক অখণ্ড বিশ্বাসের স্পর্শে কেমন করে স্তব্ধ হয়, ছবিতে তার অসম্পূর্ণ বিবরণই শুধু আছে, ওই ঐতিহাসিক ঘটনার গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটি প্রকাশ পায়নি। যেমন অনিবার্য লীলামাধুর্যের ভিতর দিয়ে ছবিতে রূপ নেয়নি নরেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক, অহৈতুকী দিব্য-প্রেমের ব্যাকুলতা—যা পুরাণের কাহিনীর মতই ভক্তহৃদয়ে ভাবের বন্যা নিয়ে আসে। স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনের বহু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাও ছবিতে স্থান পেতে পারত। স্বামীজীর অতিমানবীয় জীবন-চরিতের চিত্ররূপে আমরা তথাকথিত নাট্য-রস হয়ত আশা করি না। কিন্তু এই বিরাট চরিত্রের মানবত্ব বিশ্লেষণে যে ঘটনারাজির উপস্থিতি অপরিহার্য সেগুলির অন্তর্নিহিত সত্য ও তার উদ্ঘাটনের মধ্যে এমন অনু-ভূতি ও সংবেদনের স্পন্দন মিলতে পারে যা আমাদের চৈতন্যকে, সত্তাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এই ধরনের আলোড়নের শক্তি ও প্রভাব সাধারণ নাট্যরসের চেয়ে অনেক বেশী। আলোচ্য ছবিতে যে তা অধরা, তার কারণ এর চিত্রনাট্য বিবরণধর্মী। ছবিতে স্বামীজীর জীবনের ঘটনাগুলি শুধু তালিকা পর্যায়ে সাজানো হয়েছে। একটি মহৎ জীবন বিকাশের অন্তরালের আত্মিক দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণা এবং অভীপ্সা ও আনন্দ অনুসন্ধান করার কাজে চিত্রপরিচালক-চিত্রনাট্যকার মধু বসু যত্নবান হননি।

সমাজের দিক থেকে স্বামীজীর সমাজ-চিন্তা ও মানবপ্রেমকেই ছবিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। স্বামীজী সাধারণ মানুষের কথা, মুচি-মেথর-চাষী-শ্রমিকের কথা কী গভীর দরদের সঙ্গে ভেবেছেন, ছবিতে তাই দর্শকদের জানানো হয়েছে। কিন্তু ছবিতে এই সত্যটি আরও পরিস্ফুট হতে পারত যে, স্বামীজীর এই সমাজচিন্তা ও মানবপ্রীতি তাঁর অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান থেকেই উৎসারিত। এবং তিনি ছিলেন ভারতের সনাতন ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ। 'বর্তমান ভারত'-এ স্বামীজীর সেই উদাত্ত আহ্বানের (হে ভারত ভুলিও না) যে অংশটি দর্শককে শোনানোর জন্য নির্বাচিত হয়েছে তার মধ্যেও স্বামীজীর সমাজদর্শনের কথাই ব্যক্ত করার প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু স্বামীজীর অন্য কথাটি অনুক্ত থেকে গেছে—তোমাদের সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র।

ছবির ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই থাক,

এমকেজির "কষ্টিপাথর" (পরিচালনা: অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে অনুপ-কুমার, কমল মিত্র ও জহর রায়

বঙ্গ সংস্কৃতি বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে শান্তিদেব ঘোষের পরিচালনায় শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন। (মাঝখানে) একটি বিশেষ চরিত্রের নৃত্যভঙ্গিমায় শান্তিদেব ঘোষ (উপরে বাঁয়ে) "চণ্ডালিকা"-র দুই শিল্পী মিনি হালদার ও তপতী ঘোষ (উপরে ডাইনে), নৃত্যনাট্যে কণ্ঠদান যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে বুলবুল বসু ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (মাঝখানে, বাঁয়ে ও ডাইনে), সম্মেলনে কণ্ঠসংগীতের আসরে অংশগ্রহণকারী দুই শিল্পী—সুচিত্রা মিত্র ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় (নীচে), 'চণ্ডালিকা'-র নৃত্যাংশে কৃষ্ণা সেন, ঝুমুর মজুমদার, সুগতা সেন, ভারতী মুখোপাধ্যায়, রত্নমঞ্জুলা ভড়াই

ফটো—দেশ

মত। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব সুন্দর-ভাবে পালন করেছেন শংকর-জয়কিষণ।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচুদরের।

হাঙ্গেরিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা ও হাঙ্গেরিয়ান রাষ্ট্রদূতাবাসের সহযোগিতায় ১২ই মে থেকে নিউ এম্পায়ারে সাত দিনব্যাপী হাঙ্গেরিয়ান চলচ্চিত্র-উৎসব আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দিন দেখানো হয়েছে "টু হাফ টাইম ইন হেল" (জোলটান ফাব্রি)। উৎসবের কর্মসূচী : ১৩ই মে "লিজেণ্ড অন দি ট্রেন" (টমাস রেনী); ১৪ই মে "ফিভার" (ভিক্টর গেটলার); ১৫ই মে "ডলার ড্যাডি" (ভিক্টর গেটলার); ১৬ই মে "ফ্যানাটিকস্" (কারোলি মাক); ১৭ই মে "মিলিটারি ব্যাণ্ড" (ই মার্টিন) এবং ১৮ই মে "টু হাফ টাইম ইন হেল"। শেষ দিন বাদে অন্যান্য দিন প্রতি ছবির তিনটি শো অনুষ্ঠিত হবে। শেষ দিন থাকবে দুটি শো।

যেতে চাইলেন। কিন্তু স্বামীর এই দয়া কেমন করে নীরা সহ্য করবে? এই মহত্ত্ব? তার চেয়ে অহরহ যন্ত্রণার দাহও ওর কাম্য মনে হয়েছে।

নীরা আসলে ভালবাসত নিজেকে। অহমিকাবোধ যেখানে ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা সেখানে তার জীবন অচল। তার উচ্চাশা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সেই অহমিকাবোধকে তৃপ্ত করবারই পথ। অপরের নিকট আত্ম-নিবেদনের ধর্মে সে দীক্ষিত হয়নি। এ ধর্মে তার আস্থা ছিল না। দারুণ দুঃখেও নীরার তাই নিঃসঙ্গ হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। নাটকের পরিণতি জীবনধর্মী এবং শিল্পসম্মত।

নাটকটি গঠনে আরও সুসংবদ্ধ হতে পারত। মুখ্যত এটি আত্মকেন্দ্রিক নীরার কাহিনী। প্রথম দিকে অধ্যাপকের দুঃখ-যন্ত্রণাকে যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেটুকু অনাবশ্যক। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে 'পুতুল-খেলা নয়' আধুনিক, কিন্তু এর বিন্যাসে পুরাতন আঙ্গিক অনুসৃত। ভৃত্য-চরিত্রের কল্পনা এবং নিয়োগ পুরাতন-ধারানুগ। সংলাপের ব্যবহার মাঝে মাঝে প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে মহিলা শিল্পী মহল নিবেদিত "আলিবাবা" নাটকে জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও মিতা চট্টোপাধ্যায় ফটো : দেশ

নীরার চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন ... । নীরার মানসিকতার একটি সম্পূর্ণ চিত্র তিনি কথা, আচরণ আর ... মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন সুন্দর এবং পরিশুদ্ধ তাঁর উচ্চারণ, ... তার দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণার প্রকাশ তেমনই ... । এক কথায়, শ্রীমতী ... প্রাণ সঞ্চার করেছেন। প্রকাশ ... বিশ্বপতি যথাযথ। নাটকের ... ভূপেন মিত্র ... । অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন ... বসুচৌধুরী, ধ্রুব মিত্র, ... প্রণয় ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের আবহসংগীত পরিবেশানুগ। ... সেনের আলোক-সম্পাত সুপরিকল্পিত। নাট্য-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন প্রকাশ পাল।

শৌখিন যাত্রাভিনয় প্রতিযোগিতা

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ এবারেই প্রথম শৌখিন যাত্রাভিনয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র শৌখিন দল-গুলিরই যোগদানের অধিকার থাকবে। বিশ্বরূপা থিয়েটারে আবেদনপত্র পাওয়া যাচ্ছে। আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ...

আর ডি বনসালের ভোজপুরী ছবি 'মোরে মন মিতুয়া'র শুভমহরত' অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক দিচ্ছেন সত্যজিৎ রায়, শিল্পী হিসাবে রয়েছেন ছায়া দেবী—গত সপ্তাহে টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়; গিরিশরঞ্জন ছবিটির পরিচালক

ফটো—দেশ

বহুরূপীর নাট্যোৎসব

বহুরূপী সম্প্রদায় ১৯৫০ সনে এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। তাঁদের দ্বিতীয় নাট্যোৎসব শুরু হচ্ছে জুন মাসে। নিউ এম্পায়ারে ১২ই জুন থেকে সপ্তাহব্যাপী উৎসবে সাতটি নাটক অভিনীত হবে। সাতটি নাটকের মধ্যে দুটি নতুন। একটি "রাজা ঈদিপাস" (সোফোক্লিসের মূল গ্রীক নাটকের বাংলা অনুবাদ), অপরটি রবীন্দ্রনাথের "রাজা"। বাকি পাঁচটি বহুরূপীর পুরনো নাটক—"চার অধ্যায়", "রক্তকরবী", "পুতুল খেলা", "কাঞ্চনরঙ্গ" ও "দশচক্র"।

গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই উৎসবের উদ্দেশ্য বর্ণনাকালে সম্প্রদায়ের মুখপাত্র শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, নাট্যাভিনয়ের বৈচিত্র্য উপস্থিত করাই এই উৎসবের অন্যতম লক্ষ্য। বৈঠকে শিল্পী-দম্পতি শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকগণের সঙ্গে আলোচনাকালে শ্রী মিত্র বলেন, নিছক আনন্দের নাটকের মাধ্যমে নাট্যান্দোলনের প্রগতির পথ প্রশস্ত হতে পারে না। যে নাটক দর্শকদের চেতনাকে আঘাত করে এবং তাঁদের মনের সমস্যা ও সংকটের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে, তারই প্রয়োজন আজকের দিনে খুব বেশী। "এই ধরনের মননশীল নাটকে কি রস থাকবে না?"—জনৈক সাংবাদিকের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী মিত্র বলেন, নাটক আনন্দ দেবে; আমোদই তার মহৎ লক্ষ্য নয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, বহুরূপীর নাটক কি রস-বর্জিত? বর্তমানের নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে সাংবাদিকগণের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং বহু বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন।

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন

গত ২৫শে বৈশাখ উত্তর কলকাতায় শ্যাম স্কোয়ারে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। দশদিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রীসুবোধ ঘোষ। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসংগীতে অংশ গ্রহণ করেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, গোরা সর্বাধিকারী প্রভৃতি। "জন্মদিনের গান" করেন রবীন্দ্রকলা কেন্দ্রের শিল্পিগোষ্ঠী। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন শম্ভু মিত্র। রবীন্দ্রনাথের চিঠি (মিস র‍্যাথবোনের চিঠির উত্তরে) পাঠ করেন হিরন্ময় বার্লেকার। অনুষ্ঠান প্রারম্ভে বেদগানে অংশ গ্রহণ করেন শুভ্রা মিত্র ও দিলীপকুমার রায়।

উৎসবের কর্মসূচী অনুযায়ী ১৪ই মে মলিনা দেবীর পরিচালনায় এম জি এন্টারপ্রাইজ "ছুটি" মঞ্চস্থ করবেন। সংগীতে অংশ নেবেন উষা সেনগুপ্ত, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও চিত্রলেখা চৌধুরী। আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। ১৫ই

মে মহিলা শিল্পী মহল "শেষরক্ষা" অভিনয় করবেন। শ্যামল মিত্র, মৃণাল চক্রবর্তী, আরতি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সংগীতে অংশ নেবেন। রচনা পাঠ করবেন গীতা দত্ত ও সবিতাব্রত দত্ত। আলোচনায় থাকবেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ১৬ই মে মঞ্জুলা গুহঠাকুরতা ও তাঁর সম্প্রদায় "ঋতুরঙ্গ" পরিবেশন করবেন। যন্ত্রসংগীত সহযোগে রচনাপাঠ করবেন কাজী সব্যসাচী ও শঙ্কর ঘোষ। সমবেত যন্ত্রসংগীত পরিবেশন

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে সম্প্রতি কুমারী চিত্রা বিশ্বনাথন ভরতনাট্যম পরিবেশন করে রসিকজনকে মুগ্ধ করেন ফটো : দেশ

করবেন কাজী অনিরুদ্ধ ও তাঁর সম্প্রদায়। ১৭ই মে মিত্রাচ-র প্রযোজনায় "তাসের দেশ" মঞ্চস্থ হবে। শ্যামল মিত্র, সুবীরময় ঘোষ, কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, পবিত্র মিত্র প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করবেন। বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও রচনা পাঠ করবেন। সংগীতের আসরে থাকবেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও সুমিত্রা সেন। "কর্ণকুন্তী সংবাদ" নিবেদন করবেন ইন্দিরা দেবী ও দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮ই মে সবিতাব্রত দত্তের পরিচালনায় রূপকার-গোষ্ঠী "ডিটেকটিভ" মঞ্চস্থ করবেন। সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশন করবেন বাণীচক্র শিল্পিগোষ্ঠী।

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র কাননে বারদিন-ব্যাপী রবীন্দ্রমেলার উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। রবীন্দ্রমেলা ও প্রদর্শনীতে এবার চলচ্চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। ১৪ই মে থেকে যথাক্রমে "দুই ভাই", "দাদাঠাকুর", "ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি", "সাহেব বিবি গোলাম", "বধূ", "তিন কন্যা" প্রভৃতি ছবিগুলি দেখানো হবে।

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের হলে সুরঙ্গমা নৃত্যগীত ও আবৃত্তি সহযোগে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের আয়োজন করেন। ওই দিনই প্রতিষ্ঠানের সমাবর্তন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

বোম্বাই সমাচার

সংগীতপরিচালক নৌশাদ চিত্রপ্রযোজক-রূপে আত্মপ্রকাশ করছেন। অজন্তার পটভূমিতে ছবিটি তোলা হবে। নৌশাদ নিজেই চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন।

গুরু দত্ত ফিল্মস-এর বাহারেঁ ফিরভি আয়েগী ছবির ষোল দিনব্যাপী ইনডোর শুটিং সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে। শুটিংয়ের সেট হল কলকাতার নিকটবর্তী একটি গ্রাম। অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন গুরু দত্ত, তনুজা ও অমৃত রায়। নিউ থিয়েটার্স-এর পুরনো ছবি "প্রেসিডেন্ট"-এর কাহিনী অবলম্বনেই "বাহারেঁ ফিরভি আয়েগী" তৈরী হচ্ছে। শহীদ লতিফ চিত্রপরিচালক। শচীন দেববর্মান সুরকার।

দেবআনন্দ ও সায়রাবানুকে নিয়ে প্রযোজক-পরিচালক শঙ্কর মুখার্জি সম্প্রতি প্যার মোহাব্বত ছবির একটি গানের দৃশ্য গ্রহণ করেন। ছবির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব শঙ্কর জয়কিষণের উপর ন্যস্ত।

টি প্রকাশ রাওয়ের পরিচালনায় নির্মীয়-মান সোহাগন ছবির সতেরোদিনব্যাপী ইনডোর শুটিং সম্প্রতি শেষ হয়। মালা সিংহ, জয় মুখার্জি, মেহমুদ, ধুমল ও মমতাজ শুটিংয়ে অংশ নেন। অশোককুমার ছবির এক বিশিষ্ট শিল্পী। রবি সংগীত পরিচালক।

পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় বোম্বাইয়ে যে হিন্দী ছবিটি পরিচালনা করবেন রূপতারা স্টুডিওতে তার শুভ মুহূর্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। সাময়িক-ভাবে ছবির নাম রাখা হয়েছে ঝঙ্কার। উত্তমকুমার ও আশা পারেখ ছবির দুটি মুখ্য চরিত্রের শিল্পী। রোশন সুরকার।

বিখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী সুব্রত মিত্র যে হিন্দী ছবিটিতে বর্তমানে কাজ করছেন তার নাম "তিসরি কসম"। বাসু ভট্টাচার্য ছবিটি পরিচালনা করছেন। রাজ কাপুর ও ওয়াহীদা রেহমান নায়ক-নায়িকা। গীতিকার শৈলেন্দ্র ছবিটির প্রযোজক। শঙ্কর-জয়কিষণ সুরকার।

ভ্রম সংশোধন

"দেশ"-এর ২রা মে তারিখের সংখ্যায় রঙ্গজগৎ-বিভাগে "চলচ্চিত্র-পত্রিকা" শীর্ষক আলোচনায় "চলচ্চিত্র"কে ভুলক্রমে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটির ত্রৈমাসিক মুখপত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

মুকুল

ফুটবলের আইন-কানুনের সংক্ষিপ্তসারে এবার লেখা হচ্ছে, কখন রেফারীকে খেলা একেবারেই বন্ধ করে দিতে হয়।

কখন খেলা একেবারেই বন্ধ করতে হয়

(১) দুই দলের খেলোয়াড়দের মারামারির ফলে পরিচালনার পক্ষে খেলা যখন রেফারীর আয়ত্তের বাইরে চলে যায়; (আইন—৫)

(২) দর্শকদের মাঠে প্রবেশ এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণের ফলে যখন শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ঘটে; (আইন—৫)

(৩) মেঘবৃষ্টি বা দুর্যোগের ফলে খেলায় যখন উপযুক্ত আলোর অভাব অনুভূত হয় কিংবা খেলার পক্ষে মাঠ অনুপযোগী হয়ে পড়ে; (আইন—৫)

(৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে খেলা চললে খেলোয়াড়ের যখন বিপদের আশঙ্কা থাকে; (আইন—৫)

(৫) একটি দলের খেলোয়াড়-সংখ্যা যখন ৭ জনের কম হয়ে পড়ে (যদি প্রতিযোগিতার নিয়ম থাকে); (আইন—৩)

(৬) ক্রস-বার বা গোল-পোস্ট ভেঙে গেলে যখন তা পরিবর্তনের সুযোগ না থাকে; (আইন—১ : আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত—৮)

(৭) বল বে-আইনী হয়ে পড়লে বা ফেটে গেলে যখন আইন-সম্মত বল পাওয়া না যায়; (আইন—২ ও ৫)

(৮) খেলোয়াড়কে মাঠ ত্যাগের আদেশ দিলে যখন খেলোয়াড় মাঠ ত্যাগ করতে অস্বীকার করে এবং অধিনায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও যখন কিছুতেই মাঠ ত্যাগ করে না; (আইন—৫ ও ১২)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : দৈবদুর্যোগ বা দর্শকদের মাঠে প্রবেশ, কিংবা অন্য কোন কারণে খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হলে, বন্ধের পর যেখানে সম্ভব সেখানে রেফারীকে পুরো সময় খেলাবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, সব ক্ষেত্রেই রেফারীর উচিত নিজের এবং প্রতিযোগিতার মর্যাদা বজায় রেখে খেলাটি শেষ করার চেষ্টা করা। যেখানে সেটা সম্ভব নয় সেখানেই খেলা বন্ধ করা উচিত। কোন দল যদি কোন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মাঠ থেকে বের হয়ে যায় তবে তাদের ফিরে আসার জন্য রেফারীর মাঠের মধ্যে অপেক্ষা করা উচিত নয়।

চিঠিপত্র

শ্রীসিদ্ধদেব, রিহাবাড়ী, গৌহাটি;

প্রশ্ন—সাদা দলের একজন খেলোয়াড় কালো দলের একজন খেলোয়াড়কে পেনাল্টি সীমার মধ্যে একটি বল আয়ত্তে আনবার জন্য ফাউল করেছেন। এ বিষয়ে রেফারীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। তিনি কোন ফাউলের নির্দেশ দিলেন না সাদা দলের খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু সাদা দলের অধিনায়ক কাছেই ছিলেন। তিনি প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে রেফারীর কাছে আবেদন করলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ফাউল কিকের নির্দেশ দেবার জন্য। এ ক্ষেত্রে রেফারীর করণীয় কি?
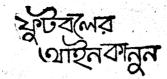
উত্তর—রেফারী তাঁর বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী যা ভাল মনে করবেন তাই করবেন। আপনি যে ব্যাপার রেফারীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে মনে করছেন সে ব্যাপার রেফারী কালো দলের খেলোয়াড়ের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ বলে মনে করতে পারেন, আবার অ্যাডভান্টেজও দিয়ে থাকতে পারেন। সাদা দলের অধিনায়কের ঐভাবের খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তিকে রেফারী 'জ্যাঠামো' বলেও মনে করতে পারেন। খেলার মধ্যে খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দেবার প্রচুর সুযোগ আছে। রেফারীর পরিচালনার ব্যাপারে বাহাদুরি দেখানোর চেষ্টা ঠিক খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে না। রেফারী ও লাইন্সম্যানকে নিজ নিজ কর্তব্য করতে দেওয়া, তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করাই প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয়।

শ্রীদিলীপকুমার সাহু, পোঃ কামারপুকুর, হুগলী;

প্রশ্ন—পেনাল্টি কিকের সময় রেফারী গোল-পোস্টের কাছে আছেন, কিক করা বল যদি রেফারীর গায়ে লেগে সরাসরি গোলে প্রবেশ করে তবে কি আইনসম্মত গোল হবে?

উত্তর—হাঁ, আইনসম্মত গোল হবে। কিন্তু পেনাল্টি কিকের সময় রেফারীর যেখানে দাঁড়াবার নিয়ম তাতে কিক করা বল সরাসরি রেফারীর গায়ে লেগে গোল হতে পারে না, গোল-পোস্টে বা ক্রস-বারে বল প্রতিহত হয়ে ফিরে এসে রেফারীর গায়ে লেগে গোলে ঢুকলেও ঢুকতে পারে। যাই হোক, রেফারীর গায়ে লেগে পেনাল্টি কিক গোলে ঢুকলে আইনসম্মত গোল হবে।

শ্রীহরিভজন বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ উখড়া, বর্ধমান।

প্রশ্ন—খেলা আরম্ভের ১৫ মিনিট পরে রেফারী এত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন যে, তাঁর পক্ষে আর খেলা পরিচালনা সম্ভব নয়। নিরপেক্ষ লাইন্সম্যানও মাঠে নেই। কিভাবে খেলাটি শেষ করা যাবে?

উত্তর—ক্লাব-লাইন্সম্যানের পরিচালনায় দুই পক্ষ যদি সম্মত হয় তবে ক্লাব-লাইন্সম্যান খেলা পরিচালনা করবেন। ক্লাব-লাইন্সম্যানের পরিচালনা সম্পর্কে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা গেলে খেলাটি পরিত্যক্ত হয়ে যাবে। অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক খেলা হলে।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী, খাণ্ডোয়া, জেলা ইস্ট নিমাড়, মধ্যপ্রদেশ।

প্রশ্ন—এখানে ভূপাল পুলিস ও আলীগড়ের একটি ফাইন্যাল খেলায় আলীগড়ের পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে যখন বল ছিল তখন খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে 'এক সংঘর্ষ' হওয়ায় মাঠের বাইরে থেকে একজন দর্শক খুব জোরে বাঁশী বাজান। ফলে আলীগড়ের একজন খেলোয়াড় হাত দিয়ে বল ধরেন। রেফারী তাঁর বিরুদ্ধে পেনাল্টির নির্দেশ দেন। ঐ পেনাল্টি-গোলের জয়ের সুবাদে ভূপাল পুলিস দল কাপ নিয়ে যায়। রেফারী পেনাল্টির নির্দেশ দিয়ে কি ভুল করেননি? আপনার কি মত?

উত্তর—আইন অনুযায়ী মাঠের বাইরের কোন কিছু খেলোয়াড়কে যদি বিভ্রান্ত করে তবে রেফারীর নিজ থেকেই খেলা থামান উচিত। কিন্তু বাইরের কোন কিছুতে খেলোয়াড় বিভ্রান্ত হয়েছেন কিনা তার বিচার-বিবেচনার অধিকারীও তো রেফারী। সুতরাং কি অবস্থায় আলীগড়ের খেলোয়াড় বল ধরেছেন, আমার পক্ষে বলা কি সম্ভব?

তবে সত্যি সত্যিই আলীগড়ের খেলোয়াড় যদি বিভ্রান্ত হয়ে হাত দিয়ে বল ধরে থাকেন এবং রেফারী সেই অপরাধে পেনাল্টির নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবে রেফারী আইনের আক্ষরিক অর্থ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুসরণ করেননি।

শ্রীসুজিতকুমার বসু, যোগসান, ভাগলপুর।

প্রশ্ন—কোন দলের একজন খেলোয়াড় বল নিয়ে বিপক্ষ গোলে ঢুকছেন, অবধারিত গোল। রক্ষণকারী দলের একজন খেলোয়াড় নিজের গোল-লাইনের উপর বলটি হাত দিয়ে থামালেন। কিসের নির্দেশ দিতে হবে?

উত্তর— গোলকিপার পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে হাত দিয়ে থামালে কিছুরই নির্দেশ দিতে হবে না। অপর খেলোয়াড় ইচ্ছে করে হাত দিয়ে থামালে পেনাল্টির নির্দেশ দিতে হবে। মনে রাখবেন, বল গোল-লাইন অতিক্রম না করলে কোন অবস্থাতেই গোল দেওয়া যায় না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩রা মে—ধানের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ চাউলের কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ ; অনেকে মনে করেন, আজো ধানের যে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পিছনে কিছু কল মালিকেরও হাত আছে। ধান চাউলের দর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহারাও এইভাবে সরকারের উপর চাপ দিতেছেন।

দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের চেয়ারম্যান শ্রীশৈবাল গুপ্ত ঠিক করিয়াছেন যে, সরকার তাহার শর্ত না মানিলে তিনি এক মাসের মধ্যে চাকরিতে ইস্তফা দিবেন। শ্রী গুপ্তের ঘনিষ্ঠ মহল হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৫ই মে—মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ডাঃ পি ভি রাজামান্নারের সভাপতিত্বে চতুর্থ অর্থ কমিশন গঠিত হইয়াছে। সংবিধান অনুযায়ী দুইটি বিচার্য বিষয় ছাড়া অতিরিক্ত আরও পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে কমিশনকে রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হইয়াছে।

উত্তরবঙ্গে মহানন্দার অপর পারে ভারতীয় জরিপকারীদের উপর পাকিস্তানীরা হামলা শুরু করিয়াছে। ফলে ভারতীয় অফিসারেরা সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন।

৬ই মে—পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও শহরতলি অঞ্চলে চাউলের বাজার ক্রমশ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। খুচরা ব্যবসায়ীদের মতে পাইকারগণ নাকি সরকার নির্দিষ্ট দরে চাউল বিক্রয়ে রাজী হইতেছে না।

দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইতে চলিয়াছে। নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, ঐ প্রকল্পের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রী এল জে জনসনকে অন্যত্র বদলী করিয়া তাঁহার স্থলে একজন বাঙালী আই এ এস অফিসারকে নিয়োগ করা হইতেছে।

৭ই মে—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা রাজ্যের উদ্বেগজনক খাদ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে পর্যালোচনার পর বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও ২৪ পরগনা জেলার চাষী ও জোতদারদের উদ্বৃত্ত ধান আটক করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আগামীকাল (শুক্রবার) হইতে রাজ্য সরকার মুনাফা নিরোধ আইন বলে রাজ্যের সর্বত্র সরিষার তেলের খুচরা দর তিন টাকা কে জি হারে বাঁধিয়া দিতেছেন। তিন টাকার অধিক দরে যিনি বিক্রয় করিবেন তিনি আইনত দণ্ডনীয় হইবেন।

৮ই মে—পশ্চিমবঙ্গে চালের সংকট দানা বাঁধিবার মুখে এই রাজ্য হইতে বিহারে দৈনিক হাজার হাজার মণ চাউল পাচারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বিহারে চালের দাম গত দুই সপ্তাহে বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সংসদ সদস্যদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জনৈক কংগ্রেস সদস্য আজ রাজ্যসভায় সংসদ সদস্যদের বেতন ও ভাতা (সংশোধন) বিলটি বিবেচনার জন্য উত্থাপন করিলে কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী দলের সদস্যগণ বিরোধিতা করেন।

৯ই মে—ভয়ঙ্কর তুষার, দুর্গম শিখর, প্রকৃতির দুরন্ততম বাধার সঙ্গে যুঝিয়া সিকিম-হিমালয় অভিযাত্রী দল ৩রা মে ২১,৬৫০ ফুট উঁচু কাব্রুডোম পর্বত শিখর জয় করিয়াছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠান এই অভিযানের উদ্যোক্তা।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এই বৎসরের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার উত্তরপত্রে নূতন করিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মেদিনীপুরে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদ্বয়ের একজন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পিয়ন বলিয়া জানা যায়।

১০ই মে—হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফট লিমিটেড-এর কারখানায় নির্মিত এই প্রথম সুপারসোনিক জঙ্গী বিমান গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর হস্তে অর্পণ করা হয়।

সরকারীভাবে যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৫১-৬১ সালে সমগ্র ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ২৫·৬২ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। *ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর অঞ্চলেই মুসলিম অধিবাসীদের ভিড় অপেক্ষাকৃত বেশী।*

বিদেশী সংবাদ

৪ঠা মে—খুলনা জেলার সাতক্ষিরা মহকুমায় ৭০ মাইল জুড়িয়া ভারতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য আগমনেচ্ছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পাক দুর্বৃত্ত ও পুলিসের অত্যাচার চরমে উঠিয়াছে। গত ৪।৫ দিনে পাক সীমান্ত এলাকায় প্রায় কুড়ি হাজার শরণার্থীকে আটক করা হইয়াছে।

রেঙ্গুনের কূটনীতিক মহলের অভিমত এই যে, ব্রহ্মবাসী ভারতীয়দের সম্বন্ধে ব্রহ্ম সরকারের বর্তমান মনোভাব যদি অব্যাহত থাকে, তবে তাহার ফলে ভারত ও ব্রহ্মের হৃদ্য সম্পর্ক ক্ষুন্ন হইতে পারে।

৫ই মে—কাশ্মীর বিতর্কে ভারতের পক্ষে সোভিয়েট ভিটো এড়াইবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টকে কাশ্মীর বিরোধের সহিত যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

আজার বাইজানের একজন বিজ্ঞানী তৈল জাতীয় এক ধরনের উদ্দীপক ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে দুইজন সোভিয়েট নাগরিকের উপর ঐ ঔষধ প্রয়োগের পর দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের উভয়েরই মানসিক শক্তি ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৬ই মে—'আমার সঙ্গে উপযুক্ত পরামর্শ ও চুক্তি ছাড়াই' কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আপনি মিটমাট করিয়া বসিবেন না। আয়ুব আবদুল্লাকে এক চিঠিতে এই জরুরী এত্তেলা পাঠাইয়াছেন।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী ভুট্টো ও নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে পুনরায় কাশ্ম বিতর্ক আরম্ভ করেন। নিরাপত্তা পরিষ কাশ্মীরের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য করি উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার বিবৃতি প্রসঙ্গে প্রত সংঘর্ষের "অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও পাকিস্তা মধ্যে যুদ্ধের হুমকি দেন।"

৭ই মে—রেঙ্গুনে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় জাল পাসপোর্ট লইয়া অথবা বেআইনীভাবে কয়েক বৎসর যাবৎ প্রায় ৩।৪ লক্ষ পাকিস্তা ব্রহ্মের আরাকান অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করিয়া ফেনী নদীর কয়েকটি দ্বীপ সম্পর্কেও অনুর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

শেখ আবদুল্লাকে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠ যোগদানের জন্য আহ্বান করিতে হইবে বলি পাকিস্তান যে প্রস্তাব করিয়াছে, আজ ভার বর্ষ সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে। ব হইয়াছে যে, একমাত্র ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থিত হইবার অধিক আছে।

৮ই মে—ঢাকার সরকারীসূত্রে জানা গিয়া যে, "মুজাহিদ পরিকল্পনা" (স্বেচ্ছা সেনাদ গঠন) অনুসারে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকার ২০ হাজার গ্রামবাসীর সামরিক শিক্ষ গ্রহণ সমাপ্ত হইয়াছে। এই স্বেচ্ছা সেনাদলকে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসাবে গণ্য করা হইবে।

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের ঘরোয়া বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাশ্মীর সম্পর্কে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে না, শেখ আবদুল্লাকে রাষ্ট্রপুঞ্জে আমন্ত্রণ জানানো হইবে না, সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টকে মধ্যস্থতার জন্য পাঠানো হইবে ন। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি আলোচনার দ্বারাই সমস্যাটির মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে।

৯ই মে—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চফ তাঁহার ১৬ দিনব্যাপী মিশর সফর আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রিবাহী জাহাজে আরোহণ করিয়া পতাকা-শোভিত আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সম্মানে ২১ বার তোপধ্বনি করা হয়।

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আজ সুতীবস্ত্র সম্পর্কে এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে আড়াই বৎসর কাল এই চুক্তি বলবৎ থাকিবে।

১০ই মে—গতকাল সরকারীভাবে জানা যায় যে, চীন-রুশ বিরোধ মীমাংসার জন্য রাশিয়ার বিশ্ব কম্যুনিস্ট সম্মেলনের প্রস্তাব চীন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির এক পত্রে বলা হইয়াছে যে, এই সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য ৪।৫ বৎসর সময়ের প্রয়োজন।

সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টি মনে করেন যে, চৈনিক নেতারা তাঁহাদের বিশ্ব নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা পূরণে, বিশেষ করিয়া ভারতের বিরুদ্ধে অভিযানে, রাশিয়া এবং অন্যান্য সমাজবাদী দেশসমূহের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হইয়া পশ্চিম ইউরোপীয় ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে জোট বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রী[illegible] ঘোষ

প্রতি সংখ্যা — ৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক — ২০, ষাণ্মাসিক — ১০, ও ত্রৈমাসিক — ৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক — ২২, ষাণ্মাসিক — ১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক — ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রী[illegible] [illegible] প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা — ১৩
টেলিফোন : ২৩—২২৮০ ও ২৩—৮৪৪১ স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ বহু শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পত্রের কয়েকখানি ॥

......আপনাদের প্রকাশিত বইগুলি সম্পর্কে আমাদের কোন কিছু লেখার প্রয়োজন কোনদিনই ছিল না, আজও আছে বলে মনে করি না।......আপনাদের এমন কোন প্রকাশিত বই বোধ হয় নেই, যা বেরুনোমাত্র আমরা ক্রয় না করেছি।......শুধু আমার প্রতিষ্ঠানগুলি নয়, ব্লকের বিভিন্ন লাইব্রেরীতেও আপনাদের বইগুলি কেনাই।......

—নগেন্দ্র মহাপাত্র,
বাণীস্মৃতি পাঠাগার, ব্যবত্তারহাট, মেদিনীপুর

......গল্প উপন্যাস বলতে 'মিত্র ও ঘোষ'কেই বোঝায়।...... আপনাদের প্রকাশিত বই আমরা সব সময়ে কিনে থাকি। আপনাদের বই আমাদের অনেক আছে এবং ভবিষ্যতেও কিনবো, আপনাদের প্রকাশিত বই নিঃসন্দেহে ভাল বলে বহু ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে, তাই নতুন করে আমাদের আর কিছু বলবার নেই।......**'লাল কেল্লা'** বইখানা আমাদের একখানা আছে, কিন্তু বইখানার খুব চাহিদা থাকায় আমরা আর একখানা বই (**লাল কেল্লা**) কিনতে চাই। আশা করি, দয়া করে V P করে একখানা 'লাল কেল্লা' পাঠাবেন।

—অমর রায়,
সহঃ সম্পাদক, মাইথন ক্লাব, পোঃ মাইথনডাম, ডি ভি সি

'লাল কেল্লা' বইটি আমরা আগামী মাসের পুস্তক ক্রয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলাম। আমরা আপনাদের বহু বই-ই কিনি। আপনাদের বই সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব উচ্চ।

—সুনির্মল চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক, সুভাষ পাঠাগার, বুদবুদ, বর্ধমান

নতুন কিন্তু ভাল বই কেনার জন্য 'মিত্র ও ঘোষের' শরণাপন্ন হলাম। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষের' সাহায্য ব্যতিরেকে ভাল বই পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

—শ্যামল শেঠ,
৩নং দ্বারিক গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—২৬

'লাল কেল্লা' আপনারা প্রকাশ করেছেন জেনে সুখী হলাম। বইটা আপনাদের সুনামকে আরও উন্নত করবে। ঐ বইটা আমরা পরের বার নিশ্চয়ই নেওয়ার চেষ্টা করব। এবার যে বইগুলির কথা লিখেছি, সেগুলি সত্বর পাঠালে বিশেষ উপকৃত হবো। আপনাদের শুভ কামনা করি।

—সনৎ মুখার্জি,
চতুরঙ্গ, নিউ প্রোজেক্ট, আগ্রা
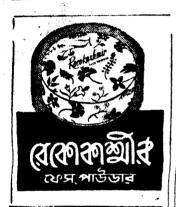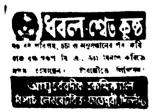
(১৬১৭-এ)

হার্নিয়া ফাইলেরিয়া, একশিরা, কোষ-বৃদ্ধি যতই পুরাতন হউক না কেন বিনা অস্ত্রে কেবল সেবনীয় ও বাহ্য ঔষধ দ্বারা স্থায়ী আরোগ্য হয় ও আর পুনরাক্রমণ হয় না। রোগবিবরণ লিখিয়া নিয়মাবলী লউন। হিন্দ রিসার্চ হোম, ১৫, শিবতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া। ফোন: ৬৭-২৭৫৫।

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ—শ্রীদিলীপকুমার দাস

৩১ বর্ষ ॥ ২৯ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ
Saturday, 23rd May 1964

অদৃশ্য হস্তের কারসাজি

পশ্চিমবঙ্গের নানাবিধ প্রকল্প ও শিল্পোন্নয়নের কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাব পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে বিরক্তি ও সন্ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতা শহরে জনসংখ্যার বিপুল চাপে যানবাহন চলাচল যখন প্রায় বিপর্যস্ত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে তখন স্থির হল সার্কুলার রেল নির্মাণ করা হোক জনসাধারণের যাতায়াতে আর কোনো সমস্যা থাকবে না। শুরু হয়ে গেল মাপজোক, দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞরা লেগে গেলেন গবেষণার কাজে, নগরবাসী আমরা বাদুড়ঝোলা অবস্থায় আর ট্রামে-বাসে অফিস যেতে হবে না—এমনই একটা সুখস্বপ্নে বিভোর থেকে বর্তমানের কায়ক্লেশকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছি। অনেক সময় পার করে এবং অনেক টাকা বিশেষজ্ঞদের উপঢৌকন দেবার পর কেন্দ্রীয় সরকার সেদিন জানালেন যে, কলকাতা শহরে সার্কুলার রেল ? অসম্ভব, সে অসম্ভব! বিকল্পে মনোরেলের টোপ শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হল, আমরাও যথারীতি আবার সুখস্বপ্নে মশগুল হয়ে আছি।

সম্প্রতি হলদিয়া বন্দর নির্মাণ নিয়ে এই রকমই একটা বিরাট প্রহসন পশ্চিমবঙ্গবাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে কলকাতা বন্দরের পরিপূরক হিসাবে হলদিয়া বন্দর নির্মাণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন ও আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দেন। ভারতের ক্রমবর্ধমান আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের বোঝা কলকাতা বন্দরের পক্ষে বহন করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে, হুগলী নদীর অববাহিকা পলিমাটির চাপে সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় একসঙ্গে একাধিক বাণিজ্যতরী কলকাতা বন্দরে আসা-যাওয়ায় প্রতিবন্ধকতা দেখা দিচ্ছে। হলদিয়া বন্দর নির্মিত হলে কলকাতা বন্দরের চাপ অনেকটা হ্রাস পাবে, সেই সঙ্গে আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের কাজ এই দুই বন্দরের সুষ্ঠু সহযোগিতায় দ্বিগুণিত হবার সম্ভাবনাও আছে। বন্দর নির্মাণের কাজ কিছুদূর অগ্রসর হবার পর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে, হলদিয়া বন্দরকে শুল্কমুক্ত একটি বন্দরে পরিণত করে তার আওতায় বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠবে। একটি তৈল-শোধনাগার, একটি সার উৎপাদন কারখানা এবং তৈল-শোধনাগারের যেসব উপজাত দ্রব্য পাওয়া যাবে তা থেকে নানাবিধ রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য একটি পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা স্থাপনেরও প্রস্তাব উঠেছে। এইসব প্রস্তাবিত প্রকল্প যদি বাস্তবে পরিণত করা যায় তা হলে পশ্চিম বাংলায় দুর্গাপুরের মত হলদিয়াও আর একটি ভারী শিল্প-কেন্দ্রিক নগরীরূপে গড়ে উঠতে পারে। নগরী গড়ে উঠলে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক কাঠামোই শুধু সুদৃঢ় হবে না, এ দেশের অধিবাসীরা বেকার সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্যশস্যোৎপাদন সমস্যা ইত্যাদি নানাবিধ জটিল অবস্থা থেকে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবার সুযোগ পাবে।

> তরুণ বাঙালী অভিযাত্রিদল সিকিম-হিমালয়ের কাব্রুডোম (২১,৬৫০ ফুট) আরোহণ করে বিজয়গৌরবে ফিরে এসেছেন। এই যুবক বীরদের ললাটে দেশবাসী পরিয়ে দিয়েছে জয়তিলক, আমরা আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আগামী সপ্তাহে এই দুঃসাহসিক অভিযানের একটি সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হবে, লিখছেন অভিযাত্রিদলের অন্যতম সদস্য শ্রীধ্রুব মজুমদার।

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, কলকাতা মহানগরীর উপর বেকার ও সদ্য আগত উদ্বাস্তুর চাপ অত্যধিক হয়ে পড়ায় এই শহর আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগীর মত চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ছে। তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনবার জন্য ভারী শিল্পের কারখানা অবলম্বন করে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণের প্রয়োজন সর্বাধিক। পাকিস্তান থেকে ইতিমধ্যে ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার উদ্বাস্তু ভারতে এসেছে এবং আরও আসছে। যদিও উদ্বাস্তু সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমস্যারূপেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং এদের পুনর্বাসনের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, তথাপি পশ্চিম বাংলার সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ আছে বলে এই সর্বহারা মানুষের মিছিলের কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাবেই। নরম মাটি ও জল-হাওয়ার দেশের মানুষ সীমান্ত থেকে সরাসরি জলহীন রুক্ষ মাটি ও অরণ্যের দেশে গিয়ে সেখানকার পরিবেশের সঙ্গে সব সময় নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে না, বিশেষ করে দেহে ও মনে গভীর ক্ষত নিয়ে যারা অসহায় অবস্থায় এ দেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। ইতিমধ্যেই কিছু উদ্বাস্তু পরিবার অন্ধ্র ও মধ্যপ্রদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ সহ্য করতে না পেরে পুনরায় পথের আশ্রয় নিয়ে চলে আসছে পশ্চিমবঙ্গের দিকে। দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসন ব্যবস্থা যদি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে, পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে তা হবে চরম বিপর্যয়।

হলদিয়া বন্দরকে অবলম্বন করে আর একটি জনপদ গড়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন। এই একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ কিছু দূর অগ্রসর হবার পর ধামাচাপা দেবার এক কুটিল চক্রান্ত সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। চক্রান্তকারী আর কেউ নন, কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকজন ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পকে যেভাবে এঁরা বানচাল করেছেন, হলদিয়া বন্দর প্রকল্পও সেই একই অজুহাতে বাতিল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। অজুহাত : পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি দখলে অপারগ, হলদিয়া বন্দর নির্মাণে যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরবরাহে অক্ষম। অথচ সংবাদে প্রকাশ, ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের চাহিদা অনুযায়ী ১০,০০০ একর জমির মধ্যে ৩০০০ একর জমি রাজ্য সরকার দখল করে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দিয়েছেন এবং বাকি জমি সংগ্রহের কাজে রাজ্য সরকার উদ্যোগী আছেন। দুঃখের বিষয়, যে পরিমাণ জমি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া হয়েছে তার এক পঞ্চমাংশ জমি ব্যবহার করে বাকিটুকু ফেলে রাখা হয়েছে, খাদ্যশস্যের অভাবের দিনে যে জমিতে প্রতি একরে ৩০ মণ উৎকৃষ্ট ধান উৎপন্ন হতে পারত। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের এই দীর্ঘসূত্রিতা ও মন্থরনীতি অদৃশ্য হস্তের গোপন ইঙ্গিতের কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয়।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমনুভাই শাহ হলদিয়া বন্দর প্রকল্প সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গবাসীর হতাশা দূর করার জন্য আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, হলদিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা পোষণ করার কোন কারণ নেই। তিনি আশা দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার হলদিয়াকে প্রধান বন্দর হিসাবে উন্নত করবার চেষ্টা করবেন এবং কর্মসূচী অনুযায়ী পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের উন্নয়নও যথাসময়ে সম্পন্ন করা হবে। মন্ত্রী মহোদয়ের সদিচ্ছায় আমরা সন্দেহ পোষণ করি না, দিল্লীর আমলাতন্ত্রের অদৃশ্য গোপন হস্তের কারসাজিকেই আমাদের ভয়।

রোদনরূপসী

(মহাভারত : আদিপর্ব : ৩৫)
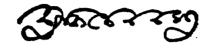
কে তুমি, সুন্দরী, যার বিন্দু-বিন্দু অশ্রু ঝ'রে ভেসে যায়
পদ্ম হ'য়ে নদীর সচ্ছল স্রোতে অবিরল ?
কোন প্রভূতে নীলিমায় লিপ্ত তুমি ? কোন পুণ্যজল
তোমার লাবণ্যসার আপনার তরঙ্গে মেশায় ?
রোদনরূপসী, তুমি কেন কাঁদো ? অশ্রু কেন পদ্ম হ'য়ে ফোটে ?
কেন তার হিরণ্ময় অভিযান দিগন্তেও হয় না বিলীন ?
কোন মন্ত্রে এই দিন অফুরান ?···মহাকবি দেননি উত্তর,
শুধু ব'লে গিয়েছেন দেবতারা তোমার অধীন।

দুঃসাহস—তবু বলি। মনে হয় কোনো-এক দূর জন্মান্তরে
তুমি ছিলে আমার একান্ত চেনা—অন্তরঙ্গ, অবিস্মরণীয়।
সেদিন আমার কান্না তুমি কে'দেছিলে ! আমিও জলের কলস্বরে
কান পেতে শুনেছি, কেমনে ধায় তোমার আজ্ঞায় মুগ্ধ পঞ্চভূত,
মুদ্ধ ভুলে, ছন্দের অঞ্জলি হ'য়ে রূপ নেয় আকাশে আলোকে।
অগাধ ঐশ্বর্য ছিলো—অখণ্ড, অমল এক বিশ্ব ছিলো সেদিন তোমার
ছিলো ঋতু, দ্যুলোক, সবিতা :—তবু ছিলো আমাকে তোমার প্রয়ো
মনে পড়ে সেই দূরস্বপ্নলোকে, আদিম উষার লগ্নে
আমি তা-ই তোমাকে দিয়েছিলাম, যা তোমার তখনো ছিলো না জানা
যা ছিলো না আলোর প্লাবনে কিংবা জলের হিল্লোলে—
অভাব—বিচ্ছেদবোধ—স্বপ্ন—স্মৃতি—হৃদয়স্পন্দন !
সেই থেকে নিখিলের রাজ্ঞী তুমি, ইন্দ্র হ'লো অকস্মাৎ অসহায়,
স্বর্গের ছলনাপ্রান্তে সে-অশ্রুপুলক চলে অন্তহীন :—
শুধু আমি মাঝে-মাঝে ভুলে যাই, খ'সে পড়ি যন্ত্রণার অন্ধকূপে,
শূলবিদ্ধ শূকরের মতো নড়ি, জীবনের অজ্ঞান চেষ্টায়।

বৈদেশিকী

করুণ অবস্থার সঙ্গে যদি তার চেতনারও অভাব ঘটে অথবা যা শোচনীয় তাকে বরণীয় বলে চালিয়ে দেওয়ার নির্লজ্জ চেষ্টা পলিসি বলে কীর্তিত হতে থাকে তা হলে তার চেয়ে অরুচিকর দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না। ভারত সরকার আজ সেই দৃশ্য দেখাচ্ছেন। সেই দৃশ্যের অপরিমেয় শোচনীয়তা উপলব্ধি করতে হলে শেখ আবদুল্লাহ-এর দোষগুণের বিচার অনাবশ্যক। যেটা বিস্ময়কর সেটা হচ্ছে এই—যাঁরা একজন মানুষকে এগারো বছর আটকে রাখার পরে তাকে ছেড়ে দিয়েই তাঁকে দেবদূতের ভূমিকায় বরণ করতে প্রস্তুত তাঁরা যে নিজেরা দেউলিয়া প্রমাণিত হলেন সে খেয়াল তাঁদের নেই। কিন্তু তাঁদের খেয়াল থাক আর না থাক, সরকারী নৌকোর হাল দেউলিয়া হাতে ছেড়ে দিয়ে দেশ চলেছে ভাবলে আতঙ্ক হয়!

ভার্সাই সন্ধির আলোচনা যখন চলছিল তখন উড্রো উইলসন-এর একটা "স্ট্রোক" হয়। তারপর থেকে তিনি আর প্রেসিডেন্ট-এর কাজ ঠিকমতো করতে পারেননি। মার্কিন কনস্টিট্যুশন সম্বন্ধে উইলসন-এর নিজের লেখা বই-এ প্রেসিডেন্ট-এর কর্তব্য এবং যে অবস্থায় পড়লে প্রেসিডেন্ট-এর পদত্যাগ করা উচিত বলে মত প্রকাশ করা হয়, স্বয়ং সেই অবস্থায় পড়ে কিন্তু উইলসন পদত্যাগ করেন নি। প্রেসিডেন্ট উইলসন নিজের অসুস্থতা স্বীকার করতেন না এবং তাঁর পত্নী এবং ডাক্তাররা মিলে তাঁকে এক রকম করে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতে পেরেছিলেন যাতে তাঁর মস্তিষ্ক কাজ করুক আর না করুক বাইরে থেকে তাঁকে এক রকমের কর্মক্ষম মানুষের চেহারায় দেখা যেত। কিন্তু আসলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট-এর সক্রিয় ভূমিকা তাঁর আর ছিল না। যদি থাকত তবে আমেরিকাকে হয়ত তিনি লীগ অব নেশনস্-এ যোগ দেওয়াতে পারতেন।

উড্রো উইলসন-এর সঙ্গে পণ্ডিত নেহরুর তুলনা যাঁরা করছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি করছেন। পণ্ডিতজী নিশ্চয়ই উড্রো উইলসন-এর চেয়ে ভালো আছেন। তা ছাড়া উড্রো উইলসনকে "চলনসই" চেহারায় রাখা আর পণ্ডিত নেহরুকে "চলনসই" চেহারায় রাখা এক জিনিস নয়। প্রেসিডেন্ট উইলসনকে ঘরে বসিয়ে রাখাটা তেমন অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু পণ্ডিত নেহরুর "চলনসই" চেহারা রাখতে হলে তাঁকে ঘরে বসিয়ে রাখা চলবে না। কিন্তু ঘোরাফেরা সম্ভব হলেই যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পুরো দায়িত্ব পালন করতে পারছেন সে কথা বলা যায় না। আর একটা কথা হচ্ছে এই যে, এখানে নায়কের নিজের মতই চূড়ান্ত নয়। প্রধান মন্ত্রীর পুরো দায়িত্ব পালন কেবল তাঁর আত্মবিশ্বাস বা তাঁর সহচরদের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। তার জন্যে জনসাধারণেরও এই বিশ্বাস থাকা চাই যে সে দায়িত্ব পালন করার মতো তাঁর স্বাস্থ্য আছে। দায়িত্ব পালনের শক্তির অর্থ দৌড়ঝাঁপ করার শক্তি নয়। দৌড়ঝাঁপ করার শক্তি কম থাকলেও মূল দায়িত্ব পালনের শক্তি থাকতে পারে। আবার সেই মূল দায়িত্ব পালনের শক্তি যদি কমে গিয়ে থাকে তবে বাইরের দৌড়ঝাঁপ কমালেই যে সমস্যার সমাধান হবে তা নয়। একজন "ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী" নিয়োগের দ্বারা সমস্যার সমাধান হতে পারে তাও নয়।

❋

আগে আমাদের স্লোগান ছিল—চীনা কম্যুনিস্ট সরকার "কলম্বো প্রস্তাবাবলী" পুরোপুরি মেনে না নিলে ভারত সরকার কোনো আপস-মীমাংসার আলোচনা করতে সম্মত নন। এখন আর ষোল-আনা কলম্বো প্রস্তাবাবলী মেনে নেওয়ার ওপরও জোর দেওয়া হচ্ছে না। এখন বলা হচ্ছে—লাদাকে প্রস্তাবিত "ডিমিলিটারাইজড্" অঞ্চল থেকে যদি চীনা "পোস্ট"গুলি উঠিয়ে নেওয়া হয় তা হলেই ভারত চীনা সরকারের সঙ্গে আলোচনা-বৈঠকে যোগদান করতে রাজী আছেন। পণ্ডিতজী বম্বেতে এ-আই-সি-সি'র সভায় যে কথা বলেছেন সে কথা কিছুকাল আগেই শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী পার্লামেণ্টেও বলেছিলেন। কিন্তু পিকিং সরকারের দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। উপরন্তু সীমান্তে চীনাদের ক্রমবর্ধমান সামরিক সংহতির খবরই ক্রমাগত পাওয়া যাচ্ছে। ভারত সরকারের একজন মন্ত্রীর মুখে ভবিষ্যতে চীনা আক্রমণের সম্ভাবনার কথাও শোনা গেছে। এ অবস্থায় অমুক শর্তে চীনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে রাজী আছি বলে ঘোষণা করার অর্থ কী? আর আলোচনা করে কী ফল ভারত সরকার আশা করেন, তাও বোঝা যায় না।

কারণ চীনাদের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং ভারত সম্পর্কে তাদের মতলব সম্বন্ধে ভারত সরকারেরই মুখপাত্রগণ যে ধারণা পোষণ এবং প্রচার করেন তাতে আপস-আলোচনার দ্বারা চীনাদের একতরফা যুদ্ধবিরতি শর্তানুযায়ী ঘোষিত সীমান্তের নৈতিক স্বীকৃতিদান ছাড়া বর্তমান অবস্থায় চীনাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দ্বারা আর কী লাভ হবে, বোঝা যায় না। চীনারা অস্ত্রবলে যা নিয়েছে তাকে নৈতিক স্বীকৃতিদানের দিকে ভারত সরকারের পা বাড়ানোর এরূপ ইচ্ছা কেন? বিবাদটা একটা সীমান্ত-বিবাদ মাত্র এবং চীনারা আক্রমণাত্মক কোনো কাজ করে নি, যা কিছু করেছে কেবল আত্মরক্ষার জন্যে—এই হচ্ছে পিকিং-এর কথা। বর্তমান অবস্থায় চীনাদের সঙ্গে আলোচনার জন্যে ভারত সরকারের আগ্রহ প্রদর্শন পিকিং-এর ঐ দাবির নৈতিক সমর্থন যোগাবে মাত্র। অথবা ভারত সরকার চীনা পাকিস্তান দোস্তিতে ভাঙ্গন ধরাবার আশায় পিকিং-এর দিকে জোড়-হাত বাড়াচ্ছেন? মনে হয় নয়াদিল্লীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উনপঞ্চাশী খেলা চলছে।

*

আগামী মাসে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন ডেকেছেন। আগামী অক্টোবরের মধ্যে বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন হবে এবং অনেকেরই ধারণা যে তাতে কনজারভেটিব পার্টি পরাজিত হবে। এই সময়ে স্যর অ্যালেক ডগলাস-হিউমের পক্ষে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন ডাকা উচিত হয়নি। এটাকে কনজারভেটিব গভর্নমেণ্টের প্রেস্টিজ বাড়াবার একটা অপচেষ্টা বলে অনেকে মনে করছেন। ইলেকশনে কনজারভেটিবদের কিঞ্চিৎ সুবিধা হতে পারে এই আশায় এটা করা হচ্ছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রধানমন্ত্রীরূপে যিনি সম্মেলন ডেকেছেন এবং সম্মেলনে যিনি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের হয়ে কথা বলবেন তিনি যদি তিনমাস বাদে আর প্রধানমন্ত্রী না থাকেন এবং গভর্নমেণ্টও বদলে যায় তাহলে এখন এই সম্মেলন ডাকা নিশ্চয়ই সময়োচিত হয় নি।

কমনওয়েলথ সম্বন্ধীয় অনেক ব্যাপারে কনজারভেটিব এবং লেবার পার্টির মধ্যে পলিসির পার্থক্য আছে। এ অবস্থায় তিন মাসের পরে কনজারভেটিব গভর্নমেণ্টের স্থায়িত্ব যেখানে অনিশ্চিত সেখানে এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান যুক্তিসংগত নয়। বৃটেনের পার্টি পলিটিকস্-এর ভিতরে কিসে করে সুবিধা বা অসুবিধা হবে সেটা অন্যের দেখার দরকার নেই, কিন্তু যেখানে অদূর ভবিষ্যতে বৃটেনে গভর্নমেণ্ট বদলের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল, এমন কি প্রায়-নিশ্চিত বলে অনেকের ধারণা, সেখানে স্যর অ্যালেকের প্রস্তাবিত তারিখে সম্মত না হওয়াই বোধ হয় উচিত ছিল। কয়েকমাস পরে বৃটেনে ইলেকশনের পরে—সম্মেলন হলে কোনো ক্ষতি ছিল না। পৃথিবীতে গুরুতর সমস্যা অবশ্য অনেক আছে, আজও আছে, ছ'মাস পরেও থাকবে, কিন্তু এমন কোনো সমস্যার কথা আমাদের মনে পড়ছে না, যার জন্যে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন অবিলম্বে হওয়া দরকার। যার জন্যে ছ'মাস দেরী করা যায় না। হয়ত স্যর অ্যালেকের মতো কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে আরো অনেকে আছেন যাঁরা নিজেদের গরজেই তাড়াতাড়ি সম্মেলন চান। কে জানে দেরী হলে যদি তাঁরা তখন প্রধানমন্ত্রী না থাকেন!

১৮-৫-৬৪।

'টেক্‌নিকাল ভবিষ্যৎ'

আমার দূর সম্পর্কের মামা কাঠের ব্যবসায় বিস্তর পয়সার মালিক। মামাতো বোনটি সুদর্শনা—ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে। **তারই জন্যে মামা একটি সুপাত্রের সন্ধান দিতে বলেছিলেন।**

এমন ভাগ্যবানের দুহিতার সৎপাত্র দুর্লভ নয়। অধ্যাপক বন্ধু প্রমুখাৎ একটির খবর মিলল। ফিলসফির লেকচারার হয়ে ঢুকেছে। বয়েস তেইশ-চব্বিশের বেশি নয়, স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ। বাপ রিটায়ার্ড হেডমাস্টার।

মামীমা পট্‌ থেকে চা ঢালছিলেন, শুনে খানিকটা চা ছলকে পড়ল টেবিলের ওপর। মামা একটা ইংরেজী কাগজে শেয়ারের দর

"লে লে বাবু ছ' আনা"

দেখছিলেন, হাত থেকে কাগজটা খসে পড়ল। এমন কি, দেয়ালে যে একটা হৃষ্টপুষ্ট টিকটিকি বিরাজ করছিল, সেটা পর্যন্ত কট্‌কট্‌ করে ডেকে উঠল। এক কথায়, তুফান দেখা দিলে চায়ের পেয়ালায়।

তারপর মামা একটি উদার হাসি হাসলেন। বালভাষিত শ্রবণ করে প্রাজ্ঞের মুখে যে কৃপাময় হাসিটি বিকীর্ণ হয়, সেটি উদ্ভাসিত করে বললেন, পাগল!

আমি বললুম, কেন, নেহাত খারাপ বলে তো—

মামীমা জানালেন : আই-এ-এস্‌ হলে বা কথা ছিল, এঞ্জিনীয়ারও মন্দ নয়। কিন্তু প্রফেসার! খাওয়াবে কী?

মামা বললেন, তার ফিলসফির প্রফেসার!

টেকনিক্যাল হ্যান্ড......ক্রমবিবর্তন

ডেড-সাব্‌জেক্‌ট্‌!

মামার এ-কথা বলবার এক্তিয়ার আছে, কারণ তিনবারের চেষ্টাতেও আই-এ পাস করতে পারেন নি; কিন্তু মনস্তত্ত্বটা বোঝা গেল। আরো বোঝা গেল, ওঁদের কন্যার জন্যে ঘটকালি করা অন্তত আমার কাজ নয়।

আই-এ-এস্‌ বাঙালী ছেলেদের মধ্যে এখন আর সুলভ নয়—কিন্তু এঞ্জিনীয়ার? আজ প্রত্যেক মা-বাপের আশার মুকুল, প্রতি হবু শ্বশুর-শাশুড়ীর (যাঁরা কিঞ্চিৎ খরচ করতে পারেন) দিবারাত্রির স্বপ্ন। ট্রেনে, ট্রামে, বাসে সব সময় আলোচনা : আপনার ছেলে কী পড়ছে?

: খড়্গপুরে বি-টেক। আপনারটি?

: যাদবপুরে। ইলেক্‌ট্রিকাল লাইনেই দিলুম। আর আপনার?

: হিউম্যানিটিজ্‌।

: আরে রাম-রাম, কী হবে?

হিউম্যানিটিজের অভাগা পিতা মরমে মরে গেলেন। জ্বালাভরা গলায় বললেন, কী করা যায়, বলুন! অন্য কোনো ব্রেন নেই। টেকনিকাল স্কুলেও জায়গা হবে না। বি-এই পড়ুক। একটা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হবে, নইলে স্কুল মাস্টারি। যদি ইকনমিক্‌স্‌টাও জানত—

আজ হিউম্যানিটিজের ক্লাসে যারা দায়ে পড়ে ভর্তি হয়, তাদের অভিভাবক জানেন—এসব ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার; ভদ্র একটা চাকরি জোটা তো দূরে থাক, ভদ্রসমাজের যোগ্যও তারা হতে পারবে না; এখন অধ্যাপকে আর প্রাইমারী স্কুল-টীচারে কোনো তফাত নেই; ডাক্তারেরা এককালে প্রচুর সামাজিক সমাদর পেতেন, এখন হাতখানেক বিলিতী ডিগ্রী জুটিয়েও তাদের সেকেন্ডহ্যান্ড মোটর কেনবার সঙ্গতি নেই বলে জনপ্রবাদ। আর উকিল? ও সম্পর্কে কিছু না বলাই ভালো।

"এই জন্যই তো ইঞ্জিনীয়ারকে বিয়ে করেছি"

এখন শুধু এঞ্জিনীয়ার। আর কিছু ইকনমিস্ট্‌।

শুধু বিয়ের বাসরেই নয়, দুনিয়ার সর্বত্র এদের বরমাল্য। আজ টেক্‌নিকালম্যান চাই, অর্থনীতিবিশারদ চাই। মানবতার অন্য দিকগুলোকে বিসর্জন দিলেও চলে।

ফ্রান্সের শিক্ষাবিভাগ থেকে প্রচারিত একটি সার্কুলার হাতে এসেছে। তাতে প্রাইমারী টীচার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যন্ত যে বেতনের হার দেওয়া
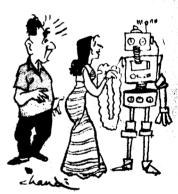
যন্ত্রবিদ মানুষকে নয়,
যন্ত্রমানবকেই মেয়েরা বিয়ে করবে

হয়েছে, আমাদের দেশে তা অচিন্তনীয়। ইয়োরোপের পক্ষেও তা উপেক্ষা করবার মতো নয়। তবু কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শিক্ষকের অভাবে বহু পদ খালি পড়ে আছে, শিক্ষণ-পরীক্ষার ফল নৈরাশ্যজনক, পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা ক্রমক্ষীয়মান এবং প্রাইমারী স্কুল থেকে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পর্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষকের নিদারুণ অপ্রাচুর্য।

কারণ?

কারণ অত্যন্ত সরল। হয় টেক্‌নোলজি, নইলে অর্থনীতি। দেশের সব তরুণ এখন এই দুটি দিকেই ছুটেছে। হিউম্যানিটিজের ভবিষ্যৎ মেঘাচ্ছন্ন।

শিল্পী-সাহিত্যিক-রসিকের তীর্থপীঠ ফ্রান্সেরই এই দশা। কেমন করে আর দেখা দেবে স্যাঁৎ বাভ্‌? কোত্থেকে আসবে স্তাঁদাল-প্রুস্তের উপন্যাস? কে আর কবিতা লিখবে ভ্যার্লেন মালার্মের মতো? পল ভালেরি, জাক প্রেভ্যার, এমিল আঁরিয়োর

পরে আর কি নতুন কবি আসবে না? মানে থেকে আরম্ভ করে মাতিস্-ব্রাক-পিকাসোর অপূর্ব চিত্রধারা থমকে দাঁড়াবে? সার্ত্র'ই কি তা হলে শেষ মহৎ ঔপন্যাসিক?

ফ্রান্সের দর্পণে আজ সারা পৃথিবীর মনের চেহারাটাই ধরা পড়ছে। আর ক্রুদ্ধ তরুণ সাহিত্যের জর্গনে, 'বীট' চিন্তার নৈরাজ্যে কি আগামী অপঘাতেরই তির্যক প্রতিবাদ? আজ সেই জন্যেই কি পৃষ্ঠা-সংখ্যাহীন উপন্যাস-বর্জিত উপন্যাস লেখবার চেষ্টা?

আমি সাহিত্যিক নই, এসব তত্ত্বচিন্তাও আমার নয়। কিন্তু টেক্‌নোলজী আর অর্থ-নীতির প্রেক্ষাপটে কোন্ রূপে দেখা দিচ্ছে আজকের পৃথিবী? এর পরে দর্শন থাকবে না, শিল্প থাকবে না, সাহিত্য থাকবে না। নিছক প্রয়োজনের বাইরে আর একটা জগতে মানুষ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলত, আর একটা উদার নীল আকাশের ছায়ায় উন্নত দেবদারুর মতো সূর্যস্নান করত সে। সেখান থেকে তার চির-নির্বাসনের দিন কি আসন্ন?

তা হলে আর ডক্টর ক্যারেল চ্যাপেকের মতো অনাগত লৌহমানবের কল্পনা করবার দরকার নেই; মানুষের মগজেই সেই লৌহ-পিণ্ডটি অনিবার্য টিউমারের মতো বিকশিত হয়ে উঠছে।

আমি আর একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছি। মনে আসছে স্পার্টার কথা। রুগ্ন দুর্বলদের সেখানে বাঁচবার কোনো অধিকার ছিল না। একদিন আর হিউম্যানিটিজেরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না; তখন নন্-টেক্‌নিকাল এবং নন্-ইকনমিকদের সংগত-ভাবেই 'লিকুইডেট্' করে দেওয়া হবে।

আর সেই লিকুইডেশনের যন্ত্রটাও আবিষ্কার করবেন এঞ্জিনীয়ারেরা—সে বলাই বাহুল্য।

দহন

নিখিলচন্দ্র সরকার

মার্ডিলা থেকে বেরিয়ে পথে নেমে তাপস দেখতে পেল গাছের মাথায় আলো দুর্বল, পাণ্ডুর। উত্তুরে হাওয়ায় মাঝে মাঝে কণাগুলি কাঁপছিল। এ পাড়ার মুখে পা দিয়ে প্রথম দিন সে বিস্মিত হয়েছে। মনে হয়েছিল, অনেকদিন আগে যেন সে এখানটায় এসেছিল। তখন অতসব বাড়িঘর ছিল না। জায়গাটা আরো অপরিচ্ছন্ন, নির্জন, পরিত্যক্ত ছিল।

তাপস যে পথটা দিয়ে এখন হাঁটছিল, ছোট ছোট পাথরকুচি দিয়ে সেটা তৈরী। রাস্তার একপাশে একই রকমের পর পর সব বাড়ি। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনেই একটু করে ফুলের বাগান। কোথাও কোথাও ফুল ফুটে রয়েছে। মধুর একটি সৌরভ ইতস্তত যেন পায়চারি করছে। জোরে, নিশ্বাসের সঙ্গে তাপস বারকয়েক সেই ঘ্রাণ নিল। অপর পারেও একটি দুটি করে ইমারত মাথা তুলছে। অগোছাল সরঞ্জাম চোখে পড়ে। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে একটা ঝিল। মাটি কেটে পাড়গুলোকে অনেকটা উঁচু করা হয়েছে। পাশে কট গাছ। চার কোণায় চারটে কৃষ্ণচূড়া। অদূরে তাদের কলেজ। কদিন আগে সে এই কলেজে জয়েন করেছে।

তাপস অন্যমনস্ক হয়েছিল। অনেককাল আগের অবহেলিত নিঃসঙ্গ জায়গাটা যে এমন করেই এ ক'বছরে মুখর হয়ে উঠবে, তা সে ভাবতে পারে নি। সেদিন সে ব্যঙ্গই করেছিল : এমন জায়গায় কেউ বাস করে নাকি!

কিন্তু কখন যে তার অগোচরে এতটা পরিবর্তন হয়ে গেল সে জানতেও পারল না। আর জানবেই বা কেমন করে। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল তাপস। আরো কি যেন ভাবতে ইচ্ছে করছিল তার। চকিতে একটা নারকেল গাছের মাথায় দৃষ্টি পড়ল তাপসের; দেখল, গাছের মাথা থেকে নরম ভীরু ছায়াটা অলক্ষে ধীরে ধীরে নেমে এসেছে অনেকখানি। অন্য একটা গাছেও তখন অনেকগুলি টিয়াপাখি এসে বিচিত্র কলহে মেতে উঠেছে।

হিম পড়তে শুরু হয়েছে আশ্বিনের গোড়া থেকেই। ক্রমশ তা ঘন ভারী হয়ে উঠছিল। তাড়াতাড়ি করে কাঁধ থেকে ভাঁজ করা চাদরটা তুলে নেয় তাপস। এতক্ষণ তার খেয়ালই ছিল না যেন। এ সময়টা একটু সতর্ক থাকা দরকার। কেননা তার আবার ঠাণ্ডার ধাত আছে। শীত পড়ার মুখে মুখে ঠাণ্ডা লাগলে সহজে তাকে ছাড়ে না। চাদরটা তাপস গায়ে চড়িয়ে নিল।

গাছের পাতায়, দূরের মাঠে, ঘাসের ডগায় সূর্যের শেষবেলার ঝিমানো লালচে কণাগুলি তির তির করছে তখন। এবার তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল তাপস। এক জায়গায় তার যাওয়ার কথা। একজন এসে তার জন্যে অপেক্ষা করবে। মীনাক্ষীদের বাড়ি থেকে আরো একটু আগে বেরোনো উচিত ছিল তার। এখানে আসার ক'দিন পরই ওকে পড়াবার একটা কাজ পেয়েছে। ওদের কলেজেরই অনার্স কোর্সের ছাত্রী।

তাপস কিছুটা অন্যমনস্কভাবে পথ হাঁটছিল। মীনাক্ষী আজ তাকে দেরী করিয়ে দিয়েছে। হয়ত লোকটা এসে অনেকক্ষণ ধরে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রথমে রাজী হয় নি তাপস, অথচ—। তাকে এখন ঈষৎ ম্লান বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। একটি ক্লান্ত অথচ কোমল ছায়া যেন ওকে স্পর্শ করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় একটু দূরে রাস্তার পাশের একটা বাড়ি থেকে ওর নাম ধরে কে যেন ডাকল। চোখ তুলে তাকাতেই দেখল, কুড়ি বাইশ বছরের একটি মেয়ে ওরই দিকে এগিয়ে আসছে। মুখে হাসি। তাপস তখনও বোকার মতন মেয়েটির চোখের দিকে চেয়ে আছে। আরো কাছে এগিয়ে এল মেয়েটি। দু মুহূর্ত তাপসকে দেখল। পরক্ষণেই সশব্দে হেসে ফেলল। বলল, 'চিনতে পারছ না তাপসদা?'

এতক্ষণ অন্যকথা ভাবছিল তাপস। এবার যেন মগ্নতা কাটল। মেয়েটির চোখের দিকে তাকিয়ে পরে সামান্য বিস্ময়ের সুরে বলল, 'নন্দিতা না?'

'আমি ভাবলাম বুঝি অন্য কোন নাম বলবে।' নন্দিতা তখনও হাসছিল।

'অন্য নাম মনে পড়লে তো।' তাপস হাসল। চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে একসময় নন্দিতার চোখের ওপর তার চোখ রাখল আস্তে আস্তে। দু মুহূর্ত কি যেন ভাবল সে। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত নরম গলায় বলল, 'এখানকার সব জিনিসই কেমন পাল্টে গেছে, তাই না?' বলে তাপস দূরের মাঠের দিকে, ঝিলের দিকে চোখ ফেরাল। আকাশের কোল বেয়ে একটি পাখি তখন পৃথিবীতে নেমে আসছিল।

'তুমি আবার এখানের চেহারা কবে দেখলে?'

তাপস এবার নন্দিতার চোখের ওপর চোখ রাখতে রাখতে হেসে ফেলল। অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার জন্যে বলল, 'তুমি এখানে কি করছিলে?'

'ওই তো আমাদের বাড়ি।' নন্দিতা আঙুল তুলে একটা বাড়ি দেখাল।

এবার তাপস ধরতে পারল কোন জায়গাটায় সেদিন তারা এসেছিল। তার দৃষ্টি কেমন যেন বিষণ্ণ কোমল হয়ে এসে-

ছিল এই মুহূর্তে। বাড়িটার দিকে চাইতে চাইতে দু-মুহূর্ত নীরব থেকে বলল, 'সুন্দর হয়েছে বাড়িটা।'

'দাঁড়িয়ে পড়লে কেন, চলো!' নন্দিতা তাপসের মুখের দিকে চাইল।

নিঃসঙ্গ পাখিটা এখন আরো প্রত্যক্ষ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাপস উদ্বিগ্ন হলো। আবার বাড়ির কথা মনে পড়ল তার। দু-দণ্ড পাখিটার কথা ভাবল। লোকটি হয়ত আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবে তার জন্যে। অন্ধকার শুরু হওয়ার পর আর থাকবে না। এমনি করেই চলে গেছে ক'দিন। আজও হয়ত চলে যাবে। নন্দিতার ওপর আলতো করে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় তাপস। পর-মুহূর্তে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আজ নয়, অন্যদিন।'

সামান্যক্ষণ নীরব থাকে নন্দিতা। তারপর তাপসের চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে আস্তে, নরম গলায় বলল, 'না না, তা হবে না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল নন্দিতা। কি ভাবল যেন। পরে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'সেদিন মা বলল: ওই ছেলেটি ঠিক তাপসের মতন। আমি তখন ঘরের ভেতরে, বাইরে এসে দেখি অনেক দূরে

চলে গেছ। আজ ঠিক ধরলাম।' বলে নন্দিতা তাপসের মুখের দিকে তাকাল।

তাপস অন্যমনস্ক হয়ে ছিল। নন্দিতা যেন ওর দিদির গলাটি কেড়ে নিয়েছে। সামনের একটা গাছের দিকে চাইতে চাইতে ও বলল, 'হ্যাঁ, রায়ভিলায় টিউশানি করি।'

'এখনও টিউশানি কর?'

তাপস বুঝল নন্দিতা ওকে আজ ছাড়বে না। তাকে অনুসরণ করতে করতে একসময় বলে, 'টিউশানিটা ছেলেবেলায় আমার ঘাড়ে পেত্নী হয়ে চেপে বসেছিল, কোনো ওঝা আজ পর্যন্তও ওটাকে ছাড়াতে পারল না।' বলে নিজের মনেই শব্দ করে হাসল তাপস।

নন্দিতা ততক্ষণে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাড়ির ফটকটা খুলে তাপসের দিকে চেয়ে মৃদু গলায় বলল, 'এসো।'

নন্দিতার মা তখন বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাপসের চোখে চোখে চেয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে, পথ ভুলে নাকি?'

কি বলবে তাপস ভেবে পাচ্ছিল না। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল।

'কেমন আছিস?' নন্দিতার মা-র চোখ তখনও তাপসের ওপর স্থির, অপলক।

কিছুটা সংকুচিত স্বরে এবার জবাব দিল তাপস, 'কোন রকম।' তাপসের কেমন যেন এই মুহূর্তে নিজেকে আড়ষ্ট বিব্রত বোধ হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, নন্দিতার মা-র মুখে যেন ততটা প্রসন্নতা নেই। কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিক মমতা সহানুভূতি যেন অনেকখানি মৃদু, অগভীর। অথচ একদিন যখন তারা সবু মিত্তির লেনে থাকত, তখন ওর মা-র যে পরিচয় তাপসের অন্তরে দীর্ঘদিন লালিত হয়েছিল, তার অনেকখানিই যেন আজ রিক্ত বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য এজন্যে তাপসের মনে কোন ক্ষোভ নেই। তবু এত বছর পর যখন আজ এভাবে দেখা হলো, তখন বিস্মৃত কথার স্পর্শ অকস্মাৎ ওর অন্তরে এক গোপন বেদনার ছায়া বিস্তার করল। তাপস ও'কে জেঠাইমা বলে ডাকত। এবার পরিপূর্ণভাবে ও'র দিকে তাকাল। চোখের কোলে বিষণ্ণ-সন্ধ্যার ম্লান বেদনার রেখা যেন টানা ছিল। জেঠাইমা আগের চেয়ে আরো গম্ভীর হয়েছেন। তাপসের দিকে চোখ রেখেই তিনি বললেন, 'তোর মা কেমন আছে?'

'ভাল।' তাপস চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বলল। সামনের মাঠের দিকে চেয়ে একটি বিকেলকে মরতে দেখল। কটা পাখি কুলায় ফিরে এসেছে। একটা বককে ঝিলের পারে নিঃসঙ্গ ভাবে মন্থর পায়ে ঘুরতে দেখল। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই তাপস জেঠাইমাকে উদ্দেশ করে বলল, 'এখন কেমন আছেন?'

'না, ভাল আর কই।' [illegible] আস্তে বললেন জেঠাইমা। দু-মুহূর্ত নীরব থেকে

আবার শুধোলেন, 'অরুণার বিয়ে হয়েছে ?'

তাপস মাথা নাড়ল, 'হাঁ।'

নন্দিতা ওর মা-র দিকে কাপটা এগিয়ে দেয়। শাসন করার সুরে বলল, 'কি হচ্ছে মা, ডাক্তারবাবু না তোমায় বেশী কথা বলতে বারণ করেছেন।'

'থাম্ তুই, তোকে আর জেঠামি করতে হবে না।' একটু জোরেই বুঝি বলেছেন কথাগুলো। ঘন ঘন শ্বাস পড়ল। একটু কষ্ট হচ্ছিল। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিচ্ছিলেন তিনি। মুখে নিস্তেজ বিষণ্ণ আলো এসে পড়েছে একটু। নন্দিতা ওর মাকে লক্ষ করতে করতে তাপসকে উদ্দেশ করে বলল, 'জান তাপসদা, সেদিন মা একটা হঠাৎ স্ট্রোক হলো, যায় যায় অবস্থা, সে কি কাণ্ড! ডাক্তারবাবুর স্ট্রিকট্ অর্ডার, বেশী কথা না বলা। অথচ কিছু বলতে যাও, উলটে তোমাকে দু-কথা শুনিয়ে দেবে।' নন্দিতার গলার স্বর ঈষৎ ক্ষুব্ধ বিরক্ত শোনাচ্ছিল।

জেঠাইমা ওর দিকে চেয়ে হেসে ফেললেন। বললেন, 'মেয়ের আমার একবার শাসন দেখ, তাপস।'

তাপস চমকে চোখ তুলল। এমন অন্তরঙ্গ মমতাভরা স্নিগ্ধ স্বরে শেষের কথাটা তিনি উচ্চারণ করলেন, তাপস কিছুক্ষণ আগেও এমনটা ভাবতে পারে নি। সে দেখল জেঠাইমা তারই দিকে চেয়ে আছেন। তাপস এই মুহূর্তে গভীর এক আবেগ অনুভব করল। 'সত্যি এভাবে আপনার বেশী কথা বলা ঠিক না।'

'ঠিক আছে আমি যাচ্ছি, তুই আবার চলে যাস না যেন।' তাপসের দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন কথাটা। আর অপেক্ষা করলেন না তিনি।

জেঠাইমা ভেতরে চলে গেলে নন্দিতা বেতের একটা চেয়ার টেনে নিল। তাপসের মনে তখন অলক্ষে একখণ্ড অতীত ধূসর মেঘ বেদনার জল ছিটিয়ে চলে যাচ্ছিল। চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে কাচটা মুছতে মুছতে অপলকে একবার নন্দিতার চোখে চোখে তাকাল তাপস। চশমাটা আবার পরতে পরতে ধীরে ধীরে শান্ত অনুচ্চকণ্ঠে বলল, 'সত্যি নন্দিতা, জেঠাইমার শরীর আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়েছে।'

নন্দিতা কোন কথা বলল না। তাপসের চোখের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিল শুধু। এখনো বসেই এতক্ষণ সোয়েটার বুনছিল। এখন আগের মতোই কাঁটা দুটো আবার তুলে নিল।

তাপস সাময়িকভাবে সোয়েটার বোনার কাজ লক্ষ করল। তারপর সোয়েটারটাকে পাশের ছোট একটি ফুলের বাগানের দিকে প্রসারিত করতে করতে শুধোল, 'তোমার কথা তো কিছুই জিজ্ঞেস করা হলো না নন্দিতা ?'

'আমার কি-ই-বা আছে জিজ্ঞেস করার মতন।' না তাকিয়ে মৃদু হেসে জবাব দিল নন্দিতা।

'এই ধরো, পড়াশুনো করছ কিনা, না করলে কেন করলে না ইত্যাদি ইত্যাদি।' বলে তাপসও হাসল।

'আপাতত তো বন্ধ।'

'কেন ?' তাপস নন্দিতার চোখের ওপর তার চোখ রাখল।

'অনার্স ছাড়া পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাসে আজকাল ভর্তি হওয়া মুশকিল।'

'এটা তো জানতাম না, কোন্ ইয়ারে গ্রাজুয়েট হয়েছ ?'

'গেল বছর।' সামনের গোলাপ গাছে একটা প্রজাপতি এসে বসেছে তখন। নন্দিতা সেই মনোহর পতঙ্গটার দিকে চোখ রাখতে রাখতে বলল, 'আর জানবে কি করে, তুমি তো সেই তেরশ বাহাত্তি সনের বিশে আষাঢ়ের পর থেকে সম্পর্কই ছেড়ে দিয়েছ আমাদের সঙ্গে, হয়ত বা তারও আগে।' নন্দিতা আড়-চোখে একবার তাপসকে লক্ষ করল। তারপর কেমন করে যেন অনুভব করল, কথাটা বলা তার অনুচিত হয়েছে।

তাপসকে এ সময় বড় বিমর্ষ বেদনার্ত দেখাচ্ছিল। কিছু সময় নীরব থাকল সে। এ ক'বছরের মধ্যে আর একটিবারও এলো না এদিকে। আসবে কি করে! সুপর্ণার সঙ্গে তাপসের ধীরে ধীরে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, ওর মা-বাবার কাছে তা অনুমোদন পায় নি। সুপর্ণাই একদিন তাকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করেছিল। বলেছিল : যে বাড়িতে তোমায় অপমান করে, সেখানে আর এসো না তাপস, কেননা, সে অপমান অসম্মানটা তোমার সঙ্গে আমারও। এমন করেই সুপর্ণা একদিন তার সম্মান অসম্মান ভাগ করে নিতে চেয়েছে। এরপর আর কোনদিন সে ওদের বাড়ি যায় নি। তখনই একদিন শুনেছিল জেঠাইমার ব্লাড-প্রেসার। সুপর্ণাকে ওর সঙ্গে মিশতে বারণ করেছে। ওর মা-র নিষেধ সত্ত্বেও সুপর্ণা তার সঙ্গে গোপনে দেখা করেছে। এরকম গোপন অভিসারে বেরিয়ে একদিন তারা এখানটায় বেড়াতে এসেছিল। আজ যেখানে বসে আছে তাপস, এখানে দাঁড়িয়ে প্রায় ন দশ বছর আগে সুপর্ণা বলেছিল : জান তাপস, এ জায়গাটা আমার পছন্দেই কেনা হয়েছে। তারপর ছেলেমানুষের মতন কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে বলেছিল : আমরা কিন্তু সময়ের এই জায়গাটা কিনবো, মনে থাকে যেন। তখন সূর্য ডুবছিল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছিল। পাখিরা কিচিরমিচির করছিল। একটা ভয় ভয় ও নির্জন প্রান্তরে ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছিল। ক'টা পাখি ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। তাপস দু-দণ্ড সুপর্ণার দিকে অভিভূতের মতন তাকিয়ে থেকে আবেগে কি যেন সেদিন বলেছিল মনে নেই আজ। সুপর্ণা ওর বুকে মাথা রেখে কেঁদেছিল।

এইমুহূর্তে দীর্ঘ করে একটি নিশ্বাস ফেলল তাপস। এতদিন একটি সুগভীর বেদনাকে সবার অলক্ষে সে লালন করেছে। আজও করল। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে চোখ তুলল। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। দূরে সামনে গাছের শাখায় পত্রপুঞ্জের অন্তরালে পাখিদের কলস্বর। দূরে দূরে হিমের ভাঁজে ভাঁজে ধোঁয়া লেগে গিয়ে ছোট ছোট পুঞ্জ রচিত হচ্ছে। বারান্দায় বসে তাপস আকাশের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছিল। সেই আকাশের কোলে কয়েকখণ্ড মন্থর-গতি মেঘপুঞ্জ। তাপস নির্নিমেষে কিছু সময় চেয়ে থাকল সেদিকে। তারপর সেখান থেকে আস্তে আস্তে দৃষ্টি গুটিয়ে আনল।

নন্দিতা তাপসের মুখের দিকে তাকাল: অনেকক্ষণ থেকে সে অনুভব করছিল শেষ বিকেলের বিষণ্ণ আমেজটা মাঠ থেকে এখানেও উঠে এসেছে। তাছাড়া তাপসদাকে এরকম কথাটা বলা যে তার উচিত হয়নি, এ বোধটা তখন থেকে তাকে পীড়ন করছিল। কিছু একটা বলার জন্যে ক'বারই চোখ তুলেছে। পারেনি। এবার তাপসের চোখের ওপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে নন্দিতা বলল, 'এ রকম সময়টা এখানে বড্ড খারাপ লাগে।'

দুমুহূর্ত কি ভাবল তাপস। তারপর সোজা সামনের জমিটার ওপর চোখে রেখে ধীরে ধীরে জবাব দিল, 'দু'দিন পর আর লাগবে না, দেখো।' কিছুক্ষণ নীরব থেকে এবার নন্দিতার মুখের দিকে চাইল। শান্ত গলায় শুধলো, 'সামনের জমিটা বিক্রী হয়ে গেছে ?'

নন্দিতা কিছুটা বিস্মিত হলো। পরক্ষণেই বিস্ময়ভাবটা লুকিয়ে ফেলতে ফেলতে বলল, 'কেন, কিনবে নাকি ?' গলার স্বরে ঈষৎ কৌতূহল ছিল।

'না।' তাপসকে এখন কেমন উদাসীন আহত দেখাচ্ছিল।

'ও জায়গাটা তো দিদিই কিনেছে।' বলতে বলতে নন্দিতা দেখল, প্রজাপতিটা এখন তাপসের পাশ দিয়ে উড়তে উড়তে কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনের মাঠের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

কি ভেবে তাপস মৃদু হাসল। বাইরের শীতল রেণুগুলো এতক্ষণে সিঁড়ি ডিঙিয়ে বারান্দায় উঠে এসেছে। চাদরটা আরো জড়িয়ে নিল সে। তারপর বাতাসে একটা সৌরভ অনুভব করে নন্দিতার চোখে চোখে তাকাল।—'কাছে বুঝি কোথাও শিউলির গাছ আছে ?'

'হাঁ।'

'গন্ধটা কিন্তু ভারী মিষ্টি।'

'আমার আর অমিতদার তাই মত, কিন্তু দিদির কাছে হাস্নুহানা।'

'অমিতদা—?' তাপসের চোখ তখনও নন্দিতার ওপর স্থির।

'দিদির বর।'

'ওঃ!' তাপস জানত সুপর্ণা হাস্নুহানার গন্ধ এক সময় সইতে পারত না। সময় তাকে তাও শিখিয়ে দিয়েছে। কিছু সময় কেউ আর কোন কথা বলল না। বিকেলের মরা রোদটা মাঠের মধ্যেই কখন ফুরিয়ে গেল যেন। সন্ধ্যার বিষণ্ণ পাতলা অন্ধকার কোন ফাঁকে গাছের পাতা থেকে শিউলি-ঝরার মতন টুপ করে মাটিতে পড়ল। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তাপস এক সময় বলল, 'তুমি তো এক সময় গাইতে নন্দিতা!'

'কেন, গাইতে বলবে নাকি?'

'এখন বললে বুঝি শুনবে না?'

'বারে, আমি কি তাই বললাম?' বলে উলের বল ও কাঁটা দুটো এক পাশে সরিয়ে রাখল নন্দিতা। চোখ বুজে ভাবল কোনটা গাইবে। দূরদিগন্তে তখন একটা শুনোতা হেঁটে বেড়াচ্ছিল। ঝিলের একটা কৃষ্ণচূড়ায় কটা বক এসে বসল। মাঠের ঘাস থেকে কটা ফড়িং উঠে এল ঘরে। সমস্ত প্রান্তরটা বুঝি এরই মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ছে।

নন্দিতা কি তাকে লক্ষ করেই গানটা গাইছে, তাপস বুঝতে পারল না। নাকি নন্দিতারও কোন গোপন ব্যথা গানের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে? গানের সঙ্গে নন্দিতা যে এমনভাবে নিজেকে মিশিয়ে দেবে, এটা ভাবতে পারেনি তাপস। 'একা মোর গানের তরী ভাসিয়ে ছিলাম নয়ন জলে।'

গান শেষ হওয়ার পরও সুরটা সমস্ত পরিবেশের মধ্যে ভাসতে লাগল। ক'মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। অভিভূতের মতন বসে থাকল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর নন্দিতাই প্রথম কথা বলল, ধীরে নম্র স্বরে, 'জান তাপসদা, এ সব গান গাইলে না মনটা কেমন হয়ে যায়।'

তাপস তখনও স্বাভাবিক হতে পারছিল না।

নন্দিতা আবার বলল, 'ইচ্ছে হয়, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই।' ভাঙা নরম শোনাল তার গলা।

তাপস ততক্ষণে অস্বস্তি ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে।

নন্দিতা উসখুস করছিল। মনের মধ্যে যে বেদনা এতক্ষণ ধরে ভারী ঘন হয়ে উঠছিল, এই মুহূর্তে যেন সেই বেদনা সযত্নে বাইরে এসে তাপসকে শোনাতে চাইল।

'একটা কথা বলব, তাপসদা?'

তাপস চোখ ফেরাল।

'সীতেশদার সঙ্গে আসছে মাসে আমার বিয়ে। দিদি খুব বাধা দিচ্ছে। কি বলে জান? আমার বোনকে যে বিয়ে করতে চাও, ক টাকা মাইনে পাও? ভাল একটা শাড়িও দিতে পারবে না কোনদিন, কর তো ক টাকা মাইনের কেরানীগিরি। আরও সব বাজে

যাক্তে কথা।' একটা ঢোক গিলল নন্দিতা। গলার স্বরটা কাঁপছিল তার। কিছুক্ষণ নীরব থেকে দৃঢ়, গভীর আত্মপ্রত্যয়ে বলল, 'ঠিক করেছি ওকেই আমি বিয়ে করব। বাড়ির সবার অমত, তবু—তবু আগামী মাসে আমরা রেজেস্ট্রি করবো। জানি, এতে অশান্তি বাড়বে, তবু দিদিকে আমি বোঝাতে চাই, ও যা ভাবে তা ঠিক না—।' দু মুহূর্ত চুপ থেকে টেনে টেনে বলল, 'ওর এখন বিবেক বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। ও একটা হিংসুটে।' ক্রুদ্ধ বিরক্ত শোনাল গলাটা।

তাপস কি বলবে ঠিক করতে পারল না। সুপর্ণার কথাটাই তার মনে পড়ছিল এখন। দীর্ঘ দিন তারা একসঙ্গে থেকেছে। সমস্ত বাড়িটার মধ্যে এমন নরম পবিত্র মনের মেয়ে আর দুটি ছিল না। কলেজে ওরা একসঙ্গে পড়েছে। ওর বাবা যখন কঠিন অসুখে মারা গেছেন, তখন তাপসের বয়েস-আর কত। সবে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। ওর দাদার স্বল্প রোজগারের ওপর ওদের সংসারটা তখন দুর্বল ক্ষীণ রোগীর মতন দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল। তখন সুপর্ণাই তাকে সাহস শক্তি জুগিয়েছে। তারপর এক সঙ্গেই গ্র্যাজুয়েট হলো। পাস করার পরই তাপসরা অন্যত্র উঠে এসেছিল। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটে ভর্তি হয়েছিল সুপর্ণারই প্রেরণায়। সুপর্ণা আর পড়ল না। ও বলত: আমার আর পড়া হলো না বলে দুঃখ করো না তাপস, তোমার হলেই আমার সুখ।

জেঠাইমার ব্লাডপ্রেসার তখন আরো বেড়েছে। তাপস যখন সিক্সথ ইয়ারের ছাত্র, তখন একদিন সুপর্ণা তাকে খবরটা দিল।

সব শুনে, প্রথমটায় সেদিন বিমূঢ় হতবাক হয়েছিল তাপস। ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না। ওর বুকের তলা থেকে একটা নিঃশব্দ করুণ কান্না তখন উঠে এসেছিল। সেই আবেগ বারবার ওকে আচ্ছন্ন করছিল। অনেক পরে ভাঙা গলায় শুধু বলেছিল: সে কি করে হয়, পর্ণা।

সুপর্ণাও কি বলবে ভেবে ঠিক করতে পারেনি সেদিন। সে তো তাপসের কাছে একটা পরামর্শ করতেই ছুটে এসেছে। তাপস জানত মা বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি সুপর্ণার কত কম! মেয়েটা বড় ভীরু। অথচ তাপসের ওপর তার গোপন অকৃত্রিম প্রেমকে সকলের উপেক্ষার সামনে লুণ্ঠিত হতে দিতে চায় না। সেদিন তাপসও কোন পথের নির্দেশ দিতে পারেনি। বরং এক ধরনের অভিমান এসে ওকে অভিভূত করেছিল। মনে মনে বুঝি বলেছিল: পর্ণা, তোমার মন বিচার বিবেচনায় আমি তোমার অযোগ্য। তোমার সম্বন্ধ তাঁরা একজন সরকারী বড় চাকুরের সঙ্গে ঠিক করেছেন। বেশ তো, তাঁরা যদি মনে করেন, আমি না হয় না থাকবো। তারপর উদাসীন নিষ্ক্রিয় গলায় বলেছিল: তোমার যা ভাল মনে হয়, তা করো।

নন্দিতা ওর দিকে চেয়ে বলল, 'কি, কিছু বলছ না যে, তাপসদা'

তাপস নন্দিতার দিকে চোখে ফেরাল। আস্তে করে বলল, 'সুপর্ণা যে এ রকম বদলে যাবে, তা আমি ভাবিনি নন্দিতা।' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তাপস। তারপর ধীরে ধীরে সামনের গাছের দিকে চোখ রাখল। প্রান্তরের নিঃসঙ্গতা যেন এখানের বাতাসকেও স্পর্শ করেছে। সুপর্ণা তার অতীতকে চিরদিনের জন্যে ভুলে গেছে। ভিন্নতর একরূপে আজ সে প্রতিষ্ঠিত। এই মুহূর্তে একটি গভীর দুঃখ তার অন্তরে সঞ্চিত হচ্ছিল।

অন্ধকার আরো গভীর ঘন হয়েছে। এই দণ্ডে তার মনে একটি বাসনা মুখ তুলল। মনের নিভৃতে যাকে একদা লুকিয়ে রেখেছিল, যার বিষণ্ণ সুন্দর সৌরভ মাঝে মাঝে কোনো মুহূর্তে তাকে উদাসীন বিমূঢ় করেছে, আজ এই মুহূর্তে তাকে একবার নতুন ঐশ্বর্যে দেখতে ইচ্ছে হলো। শিউলির গন্ধটা এখন আরো স্পষ্ট, বিষণ্ণ কুয়াশার গায়ে যেন থিক থিক করছে। স্পষ্টতই এখন মনে হলো তার, কোন অজ্ঞাত মুহূর্তে একা নিঃসঙ্গ হয়ে তার ছোট তরীখানি নয়নজলে ভাসিয়েছিল। কিন্তু তার তরী বাইবার জন্যে কেউ তো এলো না। আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মাত্র।

আরো খানিকক্ষণ পর তাপস যখন পথে নামল তখন অকস্মাৎ তার ঘরের কথা মনে পড়ল। তার জন্যে অপেক্ষা করে করে আজও সে ফিরে গেছে। তাপস দু মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। নিজের দিকে চোখ ফিরিয়ে চমকে উঠল। জীবনের একটা দুর্লভ সময় যেন কোন বিধাতাপুরুষ তার কাছে একদা গচ্ছিত রেখেছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তাপসের কেন যেন মনে হলো, জীবন থেকে সেই প্রার্থিত বস্তুটি কখন যেন সুপর্ণা চুরি করে নিয়ে গেছে। এখন গভীর এক কষ্ট অনুভব করল তাপস। এখন থেকে কোন কোন মুহূর্তে তাকে যন্ত্রণা দেবে। এই শূন্য প্রান্তরের মতনই তার মনটা এখন রিক্ততায় হাহাকার করে উঠল। আকাশের কোল বেয়ে সেই মুহূর্তে একটা পাখি কাঁদতে কাঁদতে কোথায় হারিয়ে গেল। আর দাঁড়াল না তাপস। চেনা, প্রতিদিনের পরিচিত পথটা অস্পষ্ট রহস্যময় হয়ে উঠছে। নিজেকেও তখন তার চিনতে বড় কষ্ট হচ্ছিল।

কিম্ভুতবিচিত্র

…বিক ইলেকট্রনিক্সের …ান্তকারী সম্ভাবনা

…ার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তি…জ্ঞানীরা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিকে আকারে …র ছোট এবং ওজনে হাল্কা করে তৈরি …ার এক অভূতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণ…রে বর্তমানে ব্যাপৃত আছেন। বিজ্ঞানীরা …দের এই বিশেষ আবিষ্কারের নাম …য়েছেন "আণবিক ইলেকট্রনিকস।" প্রযুক্তি…বিজ্ঞানী আর যন্ত্রবিজ্ঞানীরা এর নাম …রেছেন "মাইক্রোমিনিয়েচারা ইজেশন।" অর্থাৎ কোন জিনিসের ক্ষুদ্র প্রতিরূপকে আরও ক্ষুদ্র বলে বর্ণনা করার চেষ্টা কর…য়েছে এই শব্দটির মধ্যে।

কোন জিনিসকে ক্ষুদ্র রূপ দেবার চেষ্টায় …ক বিরাট সফলতা আসে ট্রানজিস্টার …বিষ্কারের ফলে। ট্রানজিস্টার আকারে …মন ক্ষুদ্র ওজনে তেমনই হাল্কা। এছাড়া …র যান্ত্রিকতার দিকটাও খুবই সাদাসিদে। …থচ অপেক্ষাকৃত বড় বায়ুশূন্য টিউব যে …জ করে এই ট্রানজিস্টারও সেই কাজই …রে। এই ট্রানজিস্টার দিয়েই তৈরি হচ্ছে …ানজিস্টার রেডিও। এই অভিনব রেডিও-…লি একটি সিগারেটের বাক্সের চেয়ে সামা…ন্য বড় এবং ওজনে সামান্য কিছু ভারি। …ন্তু মাইক্রোমিনিয়েচারাইজেশনের অন্যতম …দ্ধতিতে যে রকমের রেডিও তৈরি করা …ম্ভব হবে তার তুলনায় আজকালকার সব-…চেয়ে ক্ষুদ্র ও সবচেয়ে হাল্কা বেতারযন্ত্রও …বশালাকৃতি মনে হবে।

মাইক্রোমিনিয়েচার পদ্ধতির প্রাণবস্তু হল মাইক্রোসার্কিট।" একে কেউ কেউ "সংহত …র্কিট"ও বলে থাকেন। এটি এত ক্ষুদ্র যে, …লি চোখে দেখাই যায় না। কিন্তু তাহলে কি …বে, এদের একটিই ট্রানজিস্টার, ডায়োডস, …্যাপাসিটর রেজিস্টর এবং অন্যান্য যন্ত্র-…বস্থার পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে। …র্থাৎ এই সবগুলি মিলিত হয়ে যে কাজ …রে একটিমাত্র মাইক্রোসার্কিট সেই কাজ …রে থাকে। স্বরবিস্তার অথবা বৈদ্যুতিক …ংকেত পাঠানো প্রভৃতি ইলেকট্রনিকের সব …জই এর দ্বারা সম্ভব। অথচ প্রচলিত …দ্ধতির চেয়ে কম বিদ্যুৎ খরচে এসব কাজ …াইক্রোসার্কিট করে, আর কাজে কোন ত্রুটিও …য় না।

কতকগুলি সংহত সার্কিট পঞ্চাশটি …র্যন্ত উপাদান নিয়ে গঠিত হলেও সেগুলি …াকারে সাধারণত কেশরাই জাতীয় মাথার …র। এ রকমের দেড়শটি পর্যন্ত সার্কিট …কটি সিলিকনের টুকরার উপর বসানো

নতুন ফেশনদুরন্ত ওভারকোটটি ওদের সামনে দেখে বার্লিনের চিড়িয়াখানার এই জেব্রা দুটি এটাকে কোন প্রতিযোগিতা বলেই গণ্য করছে না। আর এটা ওদের ভুলও নয়। কারণ ওরা বুঝেছে যে বার্লিনের ফেশনস্রষ্টা হাইনজ ওয়েস্টারগার্ড পরিকল্পিত ওভারকোটটি তাদেরই নকল করে তোলা কাটা। এই ওভারকোটটি এবং সেই মতো টুপির নাম দেওয়া হয়েছে 'বেবি জেব্রা' যা চিড়িয়াখানায় পটভূমিতে প্রদর্শিত হয় এবং মডেলটিকে ওই পোশাকে দেখে কেবলমাত্র জেব্রারাই বিস্মিত হয়নি

যায়। সিলিকনের এই টুকরোকে বলা হয় "ওয়েফার"। ছোট একটি মুদ্রার সমান হল এর ব্যাস, আর এর বেড় হল এক ইঞ্চির হাজার ভাগের মাত্র আট ভাগ। (এক মিলি-মিটারের প্রায় দশ ভাগের দু ভাগ)।

বাল্টিমোরের ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশন এ রকম ক্ষুদ্র ওয়েফার দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র টেলিভিশন ক্যামেরা তৈরি করেছে। প্রায় দু সেলবিশিষ্ট ফ্লাশ লাইটের মত এর আকৃতি। চন্দ্র পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে মহাকাশযানে স্থাপনের জন্যই এটি তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, কক্ষপরিক্রমারত কৃত্রিম উপগ্রহের অভ্যন্তর-ভাগ পরীক্ষা করা এবং ভূপৃষ্ঠে পরীক্ষাকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা যাতে মহাকাশচারীদের ও মহাকাশ অভিযানকালে তাদের যন্ত্রপাতি নিরীক্ষণ করতে পারে সেজন্যও এটি প্রয়োজনীয়।

এই ক্যামেরাটির ওজন মাত্র সাতাশ আউন্স। এটি মাত্র পঞ্চাশ ইঞ্চি জায়গা জুড়ে থাকে। আর মাত্র চার ওয়াট বিদ্যুৎশক্তির এর প্রয়োজন হয়। বর্তমানে যেসব ক্যামেরা প্রচলিত, এদের তুলনায় সেগুলি দু থেকে দশ গুণ বেশি ভারি, আকারে দুই থেকে চার গুণ বড়। তার ওপর সেগুলিতে সাত গুণ বেশি বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয়।

অন্তত সমান চমকপ্রদ একটি নতুন মডেলের বেতার-গ্রাহক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে নিউ ইয়র্কের গ্রেট নেকের স্পেরি জাইরো-স্কোপ কোম্পানী। এটি বিমান চালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আবিষ্কার। ভূপৃষ্ঠে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে অবস্থিত বেতার-প্রেরক যন্ত্র প্রেরিত বেতারবার্তার মধ্যবর্তী বিরতির সময় পরিমাপ করে নিজের অবস্থান বুঝতে বিমানচালককে এই যন্ত্রটি সহায়তা করে।

আকার ও ওজনের দিক থেকে এটি আগের মডেলের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ। এর ওজন মাত্র উনিশ পাউন্ড। আর এটি কর্কপিটে মাত্র অর্ধ ঘন ফুট জায়গা দখল করে।

এই সংহত সার্কিটগুলি তৈরি করার সময় ওয়েফারগুলিতে প্রথমত রাসায়নিক পদার্থের সংযোগ ঘটানো হয়। তারপর ধাতুর ফিল্ম যা অতিশয় পাতলা আস্তরণ দিয়ে এগুলির উপর সার্কিটের ছাপ দেওয়া হয়। এ রকমের ২৫০,০০০টি ধাতব ফিল্মকে ওপর ওপর সাজিয়ে রাখা হলে তা সংবাদপত্রের মাত্র একটি পাতার সমান পুরু হবে।

বর্তমানে আণবিক ইলেকট্রনিকস প্রায় পুরোপুরি আবহমণ্ডল আর মহাকাশ প্রযুক্তি বিজ্ঞানের কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে সংহত সার্কিট উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম কারখানাটি খোলা হয়। এই কারখানায় তৈরি বস্তু নতুন এক ধরনের কম্পিউটারের কাজেও লাগানো হবে। এই নতুন কম্পিউটার প্রতি সেকেণ্ডে তিন কোটি ইউনিট তথ্যের হিসাব করতে পারবে। জনৈক বিজ্ঞানী ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন:

"ট্রানজিস্টার আবিষ্কারের ফলে রেডিও এখন জামার পকেটে স্থান পেয়েছে। মাইক্রো-মিনিয়েচার সার্কিটের কল্যাণে সেই রেডিওকে একদিন জামার একটা বোতামের মধ্যেই রাখা যাবে।"

ঘরে বাইরে

শ্রীমতী

মাছ মাংসের বাজারের যা অবস্থা তাতে নিরামিষ দু-একটি রকমফের পরিবেশন করলে গ্রীষ্মকালে কাজ চলে যেতে পারে। দু-চারদিন মুখবদলও হয়। ডালের কাটলেট খুব সাধারণ জিনিস কিন্তু গরম পরিবেশন করলে মাংসের চেয়ে খুব খারাপ লাগবে না।

উপকরণ ও পরিমাণ: এক পেয়ালা ছোলার ডাল, অল্প পাউরুটির গুঁড়ো বা মুড়ির গুঁড়ো, একটি ডিম, কাঁচালংকা, ধনে পাতা, আধখানা পেঁয়াজ, নুন ও ভাজবার জন্য ঘি বা তেল।

প্রণালী—১। আগের রাত্রে ডাল ঢেকে যায় এরকম জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখুন। ২। সকালে জল ঝরিয়ে এক পেয়ালা জলে অল্প আঁচে ঐ ডাল সিদ্ধ করে নেবেন। ৩। ঠান্ডা হলে পেঁয়াজ, ধনেপাতা, লংকা সব মিহি করে কুচিয়ে মিশিয়ে দিন ও আন্দাজমত নুন দিন। ৪। চেপ্টা কাটলেটের আকারে গড়ে ডিম ফেটে তাতে ডুবিয়ে রুটি বা মুড়ির গুঁড়ো মাখান। প্রথমে কাটলেটে একটু ময়দা লাগালে ডিম ও ক্রাম্ব লাগবে ভাল। খাবার আগে গরম ভেজে পরিবেশন করবেন।

ক্যাপসিকাম বা বড় লংকা মাংসের পুর দিয়ে অনেকে খুব পছন্দ করেন। মাংসের পুরের বদলে নিরামিষ করলেও চমৎকার হয়।

উপকরণ ও পরিমাণ: ৫০০ গ্রাম ক্যাপসিকাম, চায়ের চামচের ১½ চামচ ধনে, আধ-চামচ হলুদগুঁড়ো, ১½ চামচ পোস্তো, সামান্য নারকেল কোরা, ১½ চামচ ছোলার ডাল, শুকনো লংকা, ঘি, কাজুবাদাম কয়েকটা, নুন।

প্রণালী: ১। পাত্রে সামান্য ঘি গরম করে লংকা ও ধনে ভাজুন, ২। এবার ছোলার ডাল আর নারকেল ভাজুন, ৩। সবার শেষে ঐ ঘিতেই পোস্তোটা নেড়ে চেড়ে দিন, ৪। কাজুবাদাম সমেত সব মশলা মোটা মোটা পিশে রেখে দিন, ৫। ক্যাপসিকাম লম্বাভাবে একটা দিকে সাবধানে চিরে নুনমেশানো জলে রেখে দিন, ৬। ঐ চেরার ভিতর দিয়ে মশলা সতর্কতার সঙ্গে ভিতরে ঢুকিয়ে গরম ঘিয়ে ভেজে পরিবেশন করুন।

কাবুলী চানা (বড় সাদা ছোলা) অত্যন্ত মুখরোচকভাবে পরিবেশন করা যায়। অনেকেই নানাভাবে তৈরিও করেন। আমরা এখানে একটি প্রণালী দিচ্ছি। যদি পছন্দ হয় তবে আত্মীয় বন্ধুকে খুশী করে খাওয়াবেন।

উপকরণ ও পরিমাণ: ২৫০ গ্রাম কাবুলী চানা, দুটি পেঁয়াজ, চারটি কাঁচালংকা, সামান্য আমচুর, গরমমশলার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, চার পাঁচটি লবঙ্গ গুঁড়ো, নুন, চায়ের চামচের এক চামচ বাইকার্বোনেট সোডা, অল্প হিং, ঘি, একটুকরো আদা, ধনে-পাতা, লংকার গুঁড়ো আন্দাজমত।

প্রণালী: ১। অন্তত ৬।৭ ঘণ্টা ছোলা ভিজিয়ে রাখতে হবে, ২। জল ফেলে সোডা বাইকার্বোনেট মেখে দিন। যদি প্রেসার কুকারে সিদ্ধ করেন তবে অবশ্য সোডার দরকার নেই। ৩। নরম করে সিদ্ধ করুন, ৪। এক কাপ জল সরিয়ে রাখুন, পরে কাজে লাগবে, বাকী জল ফেলে দিন, ৫। একটি পাত্রে চানা রেখে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচালংকা, ধনেপাতা, আদাকুচি, গরম মশলার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, নুন, আমচুর লবঙ্গ গুঁড়ো সব দিন, ৬। এবারে ঘিতে লংকা আর হিং ফোড়ন দিয়ে সবটা ঢেলে যে এক পেয়ালা ছোলার জল রেখেছেন সেটা ঢেলে দিন। কিছু পরে নামিয়ে গরম পরিবেশন করুন।

চায়ের আসর জমানোতে পকোড়া আজ সর্বভারতীয় সমাদর পাচ্ছে। বাসি পাউরুটির টুকরো দিয়ে পকোড়া হয় জানতাম না। সম্প্রতি এক বন্ধুর বাড়ি খেয়ে মনে হলো নুতনত্ব আছে বই কি।

উপকরণ ও পরিমাণ: ৬ টুকরো বাসি শক্ত রুটি, এক পেয়ালা দই, তিনটি পেঁয়াজ, এক চামচ আনার দানা বা সামান্য আমচুর যা হাতের কাছে আছে, ৬টি কাঁচা লংকা, বেশ কিছু কাজুবাদাম বা বিকল্পে চীনে বাদাম, ১ কাপ বেশন, ধনে পাতার কুচি, নুন ঘি বা তেল।

প্রণালী: ১। দই ফেটে রুটির টুকরো হাতে ভেঙে তাতে ভিজিয়ে দিন, ২। পেঁয়াজ লংকা কুচিয়ে দিন, ৩। বাদাম সামান্য ঘি বা তেলে ভেজে মোটা মোটা গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেবেন, ৪। বেশন, ধনে পাতা, আমচুর বা আনার দানা মেশান, ৫। নুন দিয়ে দেখুন গোলা ঠিক হয়েছে কিনা, না হলে দরকার মত একটু বেশন আরও দিন, ৬। গরম ঘিয়ে চামচে করে গোলা ছাড়ুন আর লাল করে ভেজে পরিবেশন করুন।

সরকাঠি আর তারে তৈরি বাতির শেড

বাঁশের পাতলা কাঠিতে তৈরি শেড

গৃহশোভার নূতন উপকরণ

ঘর সাজানোর ধরনে যে যুগান্তর এসেছে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বড় বড় দামী আসবাব যে ঘরের সৌন্দর্য বা মর্যাদা বাড়ায় কাজেই বিত্তবানেরই তাতে একচেটিয়া অধিকার একথা আর কেউ বলতে পারে না। তাই ঘর সাজানো আজ শিল্পীর রচনাকৌশল, ঠিক আর পাঁচটা রচনারই মত। খুব সামান্য সাধারণ জিনিসের সুসমঞ্জস সজ্জায় গৃহাভ্যন্তরের রূপ সৃষ্টি হয়। ঘর-সাজানোকে তাই আর দোকানের পণ্য সংগ্রহের পর্যায়ে না রেখে, অনেকে বিশেষ অনুশীলনের ধারায় ধরে রাখতে চান। শিল্পী দেবনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় দু-একটি স্বল্পমূল্য জিনিসের এমন সুন্দর সমন্বয় দেখলাম যে তার দু-একটি আমরাও অনায়াসে ঘরে বসে তৈরি করতে পারি।

নানারকমের বাতিদান আর শেড বা ঢাকনা গৃহশোভার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছবিতে বাতির শেড দেখুন, দেবনাথবাবু ব্যবহার করেছেন সরকাঠি আর সামান্য, সাধারণ পাতলা তার। সরকাঠির বদলে ইচ্ছামত বাঁশের পাতলা কাঠি বা ঐরকম আর কিছুও স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। চারদিকে ২টি করে কাঠি আর তাকে ঘিরে সমান্তরালভাবে কাঠিগুলি সাজানো ও তার দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। তলায় ইলেকট্রিক বালবের হোল্ডার রাখার জন্য আবার দুটি সমান্তরাল কাঠি মাপ অনুযায়ী বাঁধা। তাতে হোল্ডার লাগানো। প্রথম চৌকোণ করে একবার কাঠি সাজাতে পারলে বাকীগুলি আর কোনও সমস্যাই নয়। বাতি জ্বেলে দেখবেন কি সুন্দর আধোছায়া আধোআলো ঘরকে মাধুর্যময় করে তুলবে। টেবিলের উপর রাখতে পারেন, ঘরের কোণে বই-এর শেলফে, ফোটো বা ছবির পাশে সর্বত্র সুন্দর দেখাবে।

ইচ্ছা হলে কাঠিগুলি ঘরের রং-এর সঙ্গে মানানসই রং দিয়ে নিতে পারেন। দুটো বা তিনটে রংও ব্যবহার করা যায়। বাল্ব রঙ্গীন দিয়ে কাঠি সাদা রাখতে পারেন। কখনও বা ইচ্ছা হলে তসর বা মুগার কাপড় দিয়ে একটি পাশ একটু আড়াল করে দিতে পারেন। জিনিষটি তৈরী এতই সহজ যে ময়লা হয়ে গেলে তার খুলে ফেলে ধুয়ে বা নূতন রং দিয়ে আবার তৈরি করে নিতেও পারেন। দারুণ গ্রীষ্মে বারান্দার কোণে রেখে অতিথিকে বসতে দেবেন, গরমের প্রখরতাও যেন স্নিগ্ধ আলোয় কম মনে হবে।

টুকিটাকি

পেঁয়াজ কাটবার সময় অনেক ক্ষেত্রেই "নাকের জলে, চোখের জলে" হতে হয়। কল খুলে দিয়ে জলের ধারায় পেঁয়াজ রেখে কাটুন চোখে জল আসবে না।

হাতে পেঁয়াজের গন্ধ হলে খুব ঠাণ্ডা জলে ধুলে চলে যায় একথা আমরা আগেই বলেছি। বরফ জলের বদলে নুন অথবা ভিনিগার দিয়ে যদি হাত ঘষেন তাতেও গন্ধ যাবে।

আজকাল অনেকেই কৃত্রিম ফুল ফুলদানিতে রাখেন। দুচার ফোঁটা সুগন্ধ তাতে ছিটিয়ে দিলে মন্দ হয় না।

আয়না বা জানালার কাচ পরিষ্কারের জন্য জলে দুচার ফোঁটা ভিনিগার মিশিয়ে নেবেন। কাচও ভাল পরিষ্কার হবে, মাছির উপদ্রব কমবে।

টিনের কৌটো ময়লা হলে বাদামি কাগজ (brown paper) একটু ভিনিগারে ভিজিয়ে ঘষে আবার তখনই অন্য কিছু দিয়ে মুছে ফেলবেন। ভিনিগার যেন বেশীক্ষণ টিনের গায়ে না থাকে।

আজকাল অনেকে 'নাইলন'-এর চুল বা চুলের গুছি ব্যবহার করেন। চুল আঁচড়াবার সময় যে চুল উঠে আসে তা একটি ছোট্ট থলিতে জমা করে রাখলে কিছুদিন পরে সুন্দর গুছি তৈরি হয়। নিজের চুলের গুছি হলে রংমেলাবার সমস্যাও থাকে না।

কাপড় ধুয়ে ইস্ত্রি করার সময় অনেক সময় ছোটখাটো ফুটো বা ছেঁড়া চোখে লাগে। আলপিন দিয়ে এক টুকরো রঙ্গীন কাগজ সেই জায়গায় আটকে দেবেন। পরে অবসর মত যখন মেরামত করার কাজে হাত দেবেন তখন খুঁজে পেতে দেরি হবে না।

সাধারণত শার্টের কলারই ছেঁড়ে সবার আগে। সাদা শার্ট হলে অনেক সময় উল্টে দেওয়া যায় কিন্তু রঙ্গীন হলেই মুশকিল। রং মিলাতে চায় না। যদি শার্ট তৈরি করবার সময়ই একটি বাড়তি কলার তৈরি করিয়ে রাখেন আর যখন সার্ট ধোবেন ঐ কলারটিও ধুয়ে রাখেন তবে দরকারমত ঐ কলার শার্টে লাগালে বেমানান হবার ভয় থাকে না।

প্যাণ্ট ইস্ত্রি করার সময় যেখানে ভাঁজ বা crease হয় তার উপর সরু করে বাদামি কাগজ রেখে ইস্ত্রি চালিয়ে দেখবেন, ভাঁজ সুন্দর হবে।

ভারতের অর্থনীতি

মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক সঙ্কট

অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুর্মূল্য হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মধ্যবিত্ত, বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ঐ শ্রেণীর বেশির ভাগ হচ্ছে বাঁধা-আয়ের লোক। সামাজিক কারণে তাদের অপরিহার্য ব্যয় (যেমন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য খরচ) বা ভোগ সামগ্রীর প্রয়োজন শ্রমিকদের চাইতে ব্যাপক। অথচ মূল্যাধিক্য ঘটলে মধ্যবিত্তেরা শ্রমিকদের মতো সংঘবদ্ধ ভাবে মজুরি বৃদ্ধি দাবি ও আদায় করতে পারে না।

গত এক বছরে পাইকারী মূল্যের সাধারণ সূচক (১৯৫২-৫৩=১০০) শতকরা ৯·৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাইকারী মূল্য সূচক সরকার-নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রিত মূল্যের ভিত্তিতে নির্ণীত হয় বলে বাজারে সত্যিকার যে দামে জিনিসপত্র পাওয়া যায় তা এতে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় না। এদিক থেকে দেখলে দেশের সকল শ্রেণীর লোকদের ভোগদ্রব্যের মূল্য সূচক পাইকারী মূল্য সূচকের চাইতে বেশি প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য। কিন্তু ভারতে পল্লী অঞ্চলের লোকদের ভোগসামগ্রীর কোনো মূল্য সূচক পাওয়া যায় না। কেবল প্রধান নগরগুলির শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়-ভারের একটা সূচক নির্ণয় করা হয়। [শ্রমিকদের ভোগদ্রব্যের সর্বভারতীয় মূল্য সূচক (আরম্ভ : ১৯৪৯=১০০) এক বছর আগে যেখানে ছিল, এখন তার চাইতে শতকরা ৭·৭ ভাগ উপরে।] মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় বাড়ছে কি কমছে তার নির্দেশক কোনো সরকারী সূচক বর্তমানে আমাদের দেশে নেই। 'ক্যাপিটাল' পত্রিকার পরিসংখ্যান বিভাগ যে সূচক প্রস্তুত করে থাকে তার আরম্ভ সাল বহু আগের (১৯৩৯=১০০) বলে অনেক সময় তা এখনকার যথার্থ পরিবর্তন নির্দেশ করতে পারে না। তা ছাড়া, ঐ সূচকের নির্ণয়ে বাড়ি ভাড়া ধরা হয় না। এ দুটো অসুবিধা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত সূচক থেকে দেখা যায় যে, এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসের তুলনায় মার্চে কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার মোট ব্যয় ৪৯৩ থেকে ৪৯৭ এবং খাদ্যের উপর তাদের ব্যয় ৫৭৬ থেকে ৫৮৩-তে পৌঁছেছে। (মূল্য সূচক থেকে যেমন দ্রব্যগুলি বাজারে কি পরিমাণে পাওয়া যায় তার কোনো আভাস মেলে না, সেই রকম জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক থেকে দ্রব্যের অপকর্ষ বা অকমতি সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়।)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পরিসংখ্যান ব্যুরো কলকাতার পরিবারদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের যে সূচক তৈরি করে থাকে তার থেকেও অবস্থার ক্রমিক অবনতি লক্ষ করা যায়।

জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়—আরম্ভ সাল: নভেম্বর ১৯৫০=১০০

মোট খরচের বিভাগ (টাকায়)

কাল	১—১০০		১০১—২০০		২০১—৩৫০	
	সমস্ত প্রকার খরচ	খাদ্য	সমস্ত প্রকার খরচ	খাদ্য	সমস্ত প্রকার খরচ	খাদ্য
১৯৬১ জানুয়ারী	১০৯·৭	১০৫·০	১০৮·৭	১০৩·২	১০৮·৪	১০২·৩
১৯৬২ জানুয়ারী	১১৪·৪	১১০·১	১১২·৮	১০৮·০	১১২·১	১০৭·৭
১৯৬৩ জানুয়ারী	১২০·৬	১১৯·১	১১৭·৯	১১৫·৮	১১৬·৪	১১৩·৭
ডিসেম্বর	১২৬·৮	১২৭·৭	১২৩·৪	১২৪·১	১২১·০	১২১·২
১৯৬৪ ২৮ মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে	১২৭·৮	১২৩·২	১২৫·২	১২১·০	১২৩·২	১১৯·৪
৪ এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে	১২৮·৬	১২৪·৫	১২৫·৯	১২২·৩	১২৩·৯	১২০·৭
১১ এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হয়েছে	১২৮·৯	১২৫·১	১২৬·১	১২২·৭	১২৪·১	১২১·১

যা জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় সূচকে কিছুটা প্রচ্ছন্ন, সেই মূল্য বৃদ্ধির তীব্রতা স্পষ্ট বোঝা যায় বাজারে জিনিসপত্রের প্রকৃত দাম থেকে। পাঁচ বছর আগে পাঁচজন সদস্য (স্বামী-স্ত্রী ও তিনটি সন্তান) সম্বলিত যে পরিবারকে কেবল অন্ন সংস্থানের জন্য যেখানে মাসে ১১৭ টাকার মত ব্যয় করতে হত এ বছর এপ্রিল মাসে তাকে একই প্রয়োজন মেটাতে মাসিক ১৭৬ টাকা খরচ করতে হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্যের মূল্য যখন একযোগে বাড়ে তখন অনধিক আয়ের মধ্যবিত্ত পরিবারের সমস্যা হল কিভাবে তার পরিমিত অর্থ দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় দুর্মূল্য দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করা যায়। নীচে দেওয়া হল কলকাতার কলেজ স্ট্রীট বাজারের এপ্রিল মাসের মূল্যের ভিত্তিতে রচিত একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসিক ব্যয়ের হিসাব, যার থেকে উপরোক্ত সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে ঃ

দ্রব্য	১৯৫৯ (টাকা)	১৯৬৪ (টাকা)
মাঝারি ধরনের চাল—এক মণ	১৯·২০	৩১·৮২
ময়দা—৩০ কিলোগ্রাম	১২·০০	১৩·২০
মসুর ডাল—৫ কিলোগ্রাম	৩·১০	৪·৫০
সরষের তেল—৪ কিলোগ্রাম	৮·৭০	১২·৮০
আলু—২০ কিলোগ্রাম	৬·২০	১৬·০০
মসলা (লাল লংকা)—২ কিলোগ্রাম	৪·০০	৬·৫০
চিনি—৮ কিলোগ্রাম	৮·০০	১০·৪০
কাটা রুইমাছ—১৫ কিলোগ্রাম	৪৮·৭৫	৬৭·৫০
হাঁসের ডিম—১ কুড়ি	২·৫০	৪·০০
মাংস—২ কিলোগ্রাম	৫·০০	৯·০০
মোট	১১৬·৭৫	১৭৫·৭২

উপরের হিসাবের ভেতর সবজি, দুধ ও ফলের খরচ ধরা হয় নি। খাদ্যের জন্য ব্যয় ছাড়াও কলকাতা বা তার পূর্ববর্তী অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া বাবত মধ্যবিত্ত পরিবারের মাসে অন্তত ৬০ টাকা লাগবে। তা ছাড়া, এরকম পরিবারের আরো যা দরকার হবে তা হচ্ছে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য ৩·৫০ টাকা, ট্রাম-বাসে যাতায়াতের দরুন ১২ টাকা, শিশুদের শিক্ষার জন্য ১০ টাকা, ধোবার খরচ ৩·৫০ টাকা, কাপড়চোপড় ৫ টাকা, দুর্দিন (যেমন চিকিৎসা খরচ)-এর জন্য ১০ টাকা। (ঠিকে ঝি বা চাকর, আমোদ প্রমোদ ও ধূমপানের খরচ এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে।)

সুতরাং অপরিহার্য ব্যয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৩০০ টাকার কাছাকাছি। এরকম অবস্থায় ২৫০ টাকা মাসিক আয়ের নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি আয় ও ব্যয়ের মধ্যে কোনোমতে সমতা রক্ষা করতে পারে একমাত্র খাওয়ার খরচ থেকে বাঁচিয়ে। ফলে পুষ্টির অভাবে তাদের কর্মক্ষমতা কমে আসে, কাজ করবার উৎসাহও অনেকটা চলে যায়। শত শত এরকম স্বল্প ও বাঁধা আয়ের পরিবার আজ সংকটের সম্মুখীন। হাজার হাজার আরো পরিবার আছে যাদের আয় ২৫০ টাকার চাইতেও কম। কলকাতার পরিবারদের শতকরা ৮৪ ভাগের মাসিক আয় ২০০ টাকা বা তার নীচে)। তাদের দুর্দশার পরিমাণ অনুমান করা যেতে পারে।

—শান্তিকুমার ঘোষ

রাখালচন্দ্র দাস ঃ

'সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা
ভবাম্যহম্‌
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্‌।'

'সূত (রথচালক) হই বা সূত-পুত্র হই অথবা আমি যে কেউ হই না কেন, দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম কিন্তু পৌরুষ আমার নিজের আয়ত্তে।' সম্প্রতি অ্যাকেডেমি অফ ফাইন আর্টসে শিল্পী রাখালচন্দ্র দাসের চিত্র-প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে কর্ণের এই পরুষ উক্তিটি মনে পড়ল।

রাখালচন্দ্রের জন্ম পূর্ববঙ্গে, এখন তিনি উদ্বাস্তু কলোনীর বাসিন্দা। সারাদিন স্টেট-বাসে (আধুনিক কালের রথ) চালিয়ে নিজের উদরান্নের সংস্থান করেন কিন্তু তার পরেও যে তাঁর শক্তির কিছুটা অবশিষ্ট থাকে এবং সেটুকু তিনি ব্যয় করেন শিল্প সৃষ্টির জন্য এটা ভাবতেই অবাক লাগে। যে পরিবেশে তিনি বাস করেন সেটা অবশ্যই শিল্প-সাধনার পক্ষে অনুকূল নয় কিন্তু রাখাল-চন্দ্রের সেজন্য কোন ক্ষোভ নেই। দামী কাগজ, দামী রঙ ব্যবহার করা তাঁর সাধ্যাতীত কিন্তু তাতেও রাখালচন্দ্র নিরুৎসাহ হন নি। সব কিছু প্রতিকূলতা বাধা-বিঘ্নকে তিনি জয় করেছেন অসাধারণ ধৈর্য এবং প্রচণ্ড মনোবলের সাহায্যে। সংকল্পে এতখানি দৃঢ়তা সচরাচর চোখে

'দমকা হাওয়া' শিল্পী : রাখালচন্দ্র দাস

পড়ে না। রাখালচন্দ্রের শিল্প প্রচেষ্টাকে আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাই।

গত বছর যখন রাখালচন্দ্রের প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী দেখেছিলাম তখনই আমরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। এত কম বয়সে (রাখাল-চন্দ্রের বয়স এখনও ত্রিশ ছোঁয় নি) এতখানি পরিপক্কতা (maturity) সচরাচর চোখে পড়ে না। প্যাস্টেল মাধ্যমে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা সাম্প্রতিককালে খুব কম শিল্পীর কাজেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এবারের প্রদর্শনীতে তাঁর ২৬-খানি ছবি ছিল—সবগুলিই প্যাস্টেলে আঁকা। চারখানি স্কেচ ছাড়া সবগুলিই ছিল সম্পূর্ণ (finished) ছবি। ছবিগুলি সবই সাদৃশ্য-মূলক কিন্তু তাই বলে বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়। এক কথায় বলা যায় রাখাল-চন্দ্রের ছবি ইম্প্রেশানিস্টিক (সদর্থে)। কয়েকটি ক্ষেত্রে বাস্তবের প্রভাব একটু বেশী হয়ে যাওয়ায় (যেমন ৬, ১১, ১৪) শিল্পরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু এগুলি নিতান্তই ব্যতিক্রম। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি যথেষ্ট কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে নিসর্গ চিত্র আঁকার ব্যাপারে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের বহুদিন মনে থাকবে। তাঁর ৯নং ছবিখানি এরই একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। দমকা হাওয়ায় প্রকৃতির মাঝে যে চাঞ্চল্য জেগেছে তাকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন রঙে ও রেখায়। ছবিখানির কম্পোজিশন, ব্যালেন্স এবং বর্ণ প্রয়োগ অপূর্ব। তাঁর ১৫নং ছবিখানিতে শিল্পী প্রকৃতির আর একটি রূপের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নিস্তব্ধ অরণ্যানীর মাঝে সাড়া জাগিয়েছে বাতাস, চতুর্দিকে শুকনো পাতার বৃষ্টি হচ্ছে। সাদা কাগজের উপর পাতলা রঙের প্রলেপ এমনভাবে তিনি দিয়েছেন, যাতে কাগজের সাদা ফুটে বেরোয় রঙের মধ্যে থেকে। এতে একটা অদ্ভুত আলো-আঁধারীর এফেক্ট সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য উপকরণ থেকে যিনি এরকম টেকনিকের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেন তিনি অবশ্যই প্রতিভাধর। তাঁর অন্যান্য নিসর্গ চিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৮, ১২ ও ২০। কয়েক ক্ষেত্রে দেখা গেল (৬, ৭, ১৯, ২৩ ও ২৫) তিনি শুধু লাল বা শুধু নীল রঙ ব্যবহার করেছেন কিন্তু এরকম একটি-মাত্র রঙ নিয়ে পরীক্ষা সার্থক হয়নি। এ ছাড়া তাঁর কতকগুলি ছবির রঙ অত্যন্ত জোরালো, আশা করব শিল্পী ভবিষ্যতে এ বিষয়ে একটু সতর্ক হবেন। কয়েকটি ছবিতে (৭, ১০, ২৬) কুয়াশার এফেক্ট সৃষ্টিতে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হানাহানির পটভূমিকায় আঁকা ছবিগুলি (১৩, ১৪, ১৬) অত্যন্ত জোরালো, যদিও একটু নাটকীয়। তাঁর কয়েকটি ছবিতে (১, ২, ১৭, ১৮) আধুনিকতার ছোঁয়াচ লক্ষ্য করা গেল, এটি চিন্তার কথা। আমরা শিল্পীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সস্তায় খ্যাতি লাভের পথ তাঁর নয়।

শিল্পীর প্রতিভা আছে। তিনি যদি উপযুক্ত guidance ও সুযোগ পান তাহলে ভবিষ্যতে বড় হতে পারবেন এই আমাদের বিশ্বাস।

ভারত-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধপূর্ণিমা

সুধাংশুবিমল বড়ুয়া

দেবাং পৃথিবীতে এমন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় যাঁদের প্রকাশের আলোকে সমগ্র দেশ প্রকাশলাভ করে। তখন দেশ ও কালের পরিধিতে তাঁদের আর কুলায় না, সর্বদেশে ও সর্বকালে পরিব্যাপ্ত হয় তাঁদের সাধনার ধারা। ভারত-ইতিহাসের এমনি এক মহান পুরুষ গৌতম বুদ্ধ। ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনাকে তিনি সমগ্র বিশ্বে জয়যুক্ত করেছেন। যুগে যুগে পৃথিবীতে কত লোকশিক্ষকের আবির্ভাব হয়েছে, দিগ্‌বিজয়ী বীরের অস্ত্রঝনংকারের মধ্য দিয়ে কত সাম্রাজ্যের উত্থানপতন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এঁদের পরিচয় খণ্ডকালের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে মানবহৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে নি। বুদ্ধদেবের মহিমা খণ্ডকালের সীমারেখা ডিঙিয়ে নিখিল মানবের হৃদয়াসনে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তার তুলনা কোথায়! বস্তুত যে দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদদেশে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল একমাত্র সেই গিরিরাজের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে। তুষারমৌলী হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গমালা একদিকে যেমন অম্লান জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত, আবার অন্যদিকে হিমালয়-নিঃসৃত পুণ্যপীযূষধারায় গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের বক্ষস্থল সুপরিপুষ্ট। এই বিগলিত করুণাধারায় সিঞ্চিত হয়ে ভারতভূমি চিরদিন সজীব হয়ে আছে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের অমৃতধারা সিঞ্চনে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয়, একদিন সমগ্র বিশ্বজগৎ অভিষিক্ত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়।—

> ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আ বি র্ভা ব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করে নি, এই জন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন ব্রহ্মদেশ জাপান, এল তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দুস্তর গিরিসমুদ্র পথছেড়ে দিলে অমোঘ সত্য বার্তার কাছে।
>
> —বুদ্ধদেব, পৃঃ ৬

যে মহামানবের আবির্ভাবে ভারতবর্ষ একদিন দেশ-বিদেশের প্রণাম টেনে এনেছিল, বৈশাখী পূর্ণিমা তাঁরই পবিত্র স্মরণতিথি। ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব, বুদ্ধত্বলাভ ও মহাপরিনির্বাণের এই দিনটি ভারত-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম পুণ্যলগ্ন। তাই বুদ্ধের ভারত একদিন আপনার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁর জন্মকাল বৈশাখ মাসকে বৎসরের প্রথম মাসের গৌরবদান করেছিল। পূর্বে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে অগ্রহায়ণই ছিল বৎসরের প্রথম মাস (অগ্র=প্রথম+হায়ণ+মাস)। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের জন্য পরবর্তীকালে বৈশাখ মাসকে প্রথম মাসের মর্যাদা দেওয়া হয়। বৌদ্ধদের স্মৃতিপূত এই বৈশাখী পূর্ণিমাই একদিন বুদ্ধপূর্ণিমা রূপে খ্যাত হয়।

দেশের চিরকালীন মহাপুরুষদের স্মরণ

ভগবান বুদ্ধ

করার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেকে উপলব্ধি করি। যেখানে আমরা তা স্বীকার করতে পারি নে সেখানে নিজেদের চিত্ত-দৈন্যেরই পরিচয় দেওয়া হয়। ভারত-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোন মহাপুরুষকে স্মরণ করার সার্থকতা থাকে তবে এর মধ্যে গৌতম বুদ্ধই নিঃসন্দেহে সর্বপ্রধান। এত বড় মহান নায়ক কি ভারতবর্ষে দ্বিতীয় কেউ জন্মেছেন, না সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসেই এ'র দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়? পুরুষ-সিংহ বিবেকানন্দ ভগবান বুদ্ধকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন,—

> ...আর কোন মানুষ তাঁহা অপেক্ষা অধিক কার্য করিয়াছিলেন? ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এতদূরে গিয়াছেন। সমুদয় মনুষ্যজাতি কেবল এইরূপ একটিমাত্র চরিত্র প্রসব করিয়াছে—এতদূর উন্নত দর্শন! এমন উদ্ভূত সহানুভূতি! এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর উপর পর্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ লোকের নিকট কোন দাবি-দাওয়া নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী—তিনি সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্য করিয়াছিলেন; আর মনুষ্যজাতির ইতিহাস দেখাইতেছে—যতলোক জগতে জন্মিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সহিত আর সকলের তুলনা হয় না।
>
> —কর্মযোগ (বিংশ সং), পৃঃ ১৬৮

একদিন ভগবান বুদ্ধের অমেয় প্রেমের বাণী নিয়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে যে প্রেমের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা কোথায়? এই ধর্মবিজয়ে জেহাদের যুদ্ধ ও বদরের যুদ্ধের হত্যাকাণ্ড হয় নি; আর এতে ছিল না সেই তথাকথিত ধর্মযুদ্ধের (Crusade) অমানুষিক নির্মমতা। ভগবান বুদ্ধের এই বিশ্ববিজয় অভিযানের নায়ক ছিলেন দেবপ্রিয় অশোক গুণবর্মণ কশ্যপমতঙ্গ ও কুমারজীব, মহাচীনের পরম সাধক হিউয়েন-সাঙ্ ফা-হিয়ান ও ইৎসিঙ্, আর মহেন্দ্র সংঘমিত্রা ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। মহাকালের অনন্তস্রোতে কত শত নেপোলিয়ান-হ্যানিবাল সিজার-চেঙ্গিস ও দর্পী হিটলারের সাম্রাজ্য বুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে গেছে; কিন্তু বুদ্ধ ও বুদ্ধ-শ্রাবকগণের এই প্রেমের সাম্রাজ্য চিরদিন অম্লান দীপ্তিতে বিরাজমান।

আজ অশোকচক্র আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতীক। কিন্তু একে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতীক বললে সবটুকু বলা হয় না, অশোকচক্র চিরন্তন ভারতীয় সাধনা ও আদর্শেরই প্রতীক—এই আদর্শ তপ, বিশ্বমৈত্রী ও মানবতার বাণীতে চিরভাস্বর। ভগবান বুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম উত্তরসাধকের মধ্য দিয়ে আজকের ভারত বুদ্ধের বাণীকেই আবার বরণ করে নিয়েছে। যে বুদ্ধ-বিভা একদিন আমাদেরই সংকীর্ণতায় সাগরপারে নির্বাসিত হয়েছিল, নবপ্রবুদ্ধ ভারত আবার তাকে অন্তরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর মহান শিষ্য দেবপ্রিয় অশোকের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে! সেই রাজাকে মাহাত্ম্য দান করেছেন যে গুরু তাঁকে আহ্বান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয়নি যেদিন তিনি জন্মেছিলেন এই ভারতে। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে।
>
> —বুদ্ধদেব, পৃঃ ৮

আজ এক বিরাট দুর্যোগের ঘনঘটা চারদিক থেকে ভারতভূমিকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছে। যে মহাচীন একদিন বুদ্ধের ভারতবর্ষের নিকট নতজানু হয়ে দীক্ষাগ্রহণ করেছিল, নিয়তির নির্মম পরিহাসে আজ সে হিংস্র ড্রাগনের নখদন্ত বিস্তার করে বুদ্ধের ভারতবর্ষকে রক্তের কলুষে রঞ্জিত করে দিতে উদ্যত। এই বিভীষিকা দেখে হিউয়েন-সাঙ্ ফা-হিয়ান পরলোকেও সন্ত্রস্ত হবেন কিনা জানি না। হয়তো মহাশান্তির কোলে চির নিমগ্ন এই পরম পুরুষদের শান্তি কিছুতেই বিঘ্নিত হবে না। হয়তো 'মহা প্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের যে নির্মল আত্মপ্রকাশ আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে' তারই প্রতীক্ষায় আছেন এ'রা। বুদ্ধের ভারতও প্রহর গুণছে সেই নব অভ্যুদয়ের আশায়। মহাচীন ও মহা-ভারতের সম্মুখে আজকের দিনে আর অন্য পন্থা নেই। একদিন ভারতের প্রেমের দৌত্যে রবীন্দ্রনাথ মহাচীনের নিকট যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তা এখানে উল্লেখ করতে চাই।[১]

My friends in China,

The truth that we received when your pilgrims came to us in India, and ours to you ...., that is not lost even now. What a great pilgrimage was that! What a great time in history! It is our duty today to revive the heroic spirit of that pilgrimage, following the ancient path which is not merely a geographical one that was built across the difficult barriers of race difference and difference of language and tradition, reaching the spiritual home where man is in bonds of love and co-operation.

— Santiniketan, 23rd April. 34.

কবি-মনীষী রবীন্দ্রনাথের এই কথা আজ আবার নূতন করে ভাববার দিন এসেছে। আমাদের মনে হয় মহাচীন ও মহান ভারতবর্ষে আজকের দিনেও বিবেকবান এমন মানুষের অভাব নেই যাঁরা বর্তমানের শত দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মধ্যেও কবিগুরুর এই আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা পোষণ করেন। আজ ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পুণ্যলগ্নে আমাদের অন্তর যেন কবিগুরুর এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, সর্বান্তকরণে এই কামনাই করি।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনে বুদ্ধপূর্ণিমার তাৎপর্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তা ছাড়া শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বৎসর যথারীতি ধর্মচক্রপ্রবর্তন তিথি হিসাবে আষাঢ়ী পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে রচিত 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি' গানটি রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'সকল কলুষ-তামস হর' গানটিও উল্লেখযোগ্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেও বুদ্ধপূর্ণিমার গুরুত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। যে মহামানবের আবির্ভাবে ভারতবর্ষ একদিন দেশে দেশান্তরে ধন্য হয়েছে তাঁকেই সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হবে। এর দ্বারা আমরা যে শুধুমাত্র আত্মবিস্মৃতির গ্লানি থেকে মুক্ত হব তা নয়, মহামানবকে শ্রদ্ধা করে নিজেরাও ধন্য হব। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন আজ মহামানবের জন্মদিনে কবির সঙ্গে আমাদের প্রার্থনাও যুক্ত করে বলি—

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধন মন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান্।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত—অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।

---

(১) বর্তমান বিশ্বভারতী চীনভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তান য়ুয়ানশান ১৯৩৪ সালে যখন স্বদেশে গমন করেন তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বারা চীনদেশবাসীর প্রতি এই মৈত্রী-পূর্ণ আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করেন। শ্রীযুক্ত তান আজও অবিচলিত নিষ্ঠায় বিশ্ব-ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসাধকের মহান ব্রতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

বাঁকুড়ার মন্দির

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১১ ॥
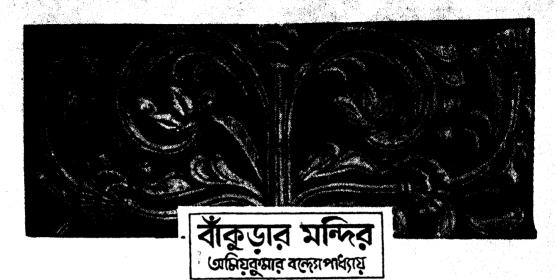
মন্দির-পরিচয়

আর্কিঅলজিক্যাল সার্ভের পূর্ব-বিভাগের এককালীন সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ ডি বি স্পুনার তাঁর ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে বিষ্ণুপুর শহরের মধ্যে অবস্থিত চারচালা-একচূড় মন্দিরের তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। প্রতিষ্ঠাকালের ক্রম-অনুসারে এগুলির নাম রাধাবিনোদ, মুরলীমোহন ও মদনমোহন। প্রথম দুটি দেবালয় যথাক্রমে ৯৬৬ ও ৯৭১ মল্লাব্দে (১৬৬১ ও ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত হয়েছিল। প্রায় ৫৪ বছর আগেকার মিঃ স্পুনারের রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, এ-মন্দির দুটির অবস্থা তখনই ছিল অতিশয় জীর্ণ। আমার বহুবার বিষ্ণুপুর পরিভ্রমণের সময় স্থানীয় সাহিত্য পরিষৎ শাখার কর্মীরা সর্বদাই আমার সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু তাঁরাও কোন সময়েই এ-মন্দির দুটিকে পরিদর্শন-তালিকার অন্তর্ভূক্ত করেন নি। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি আগে সৌধ দুটির অতিশয় শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করে অনুমান হয় এ-দুটি হয়ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে অথবা এখন আর দর্শনযোগ্য অবস্থায় নেই। সে যাই হোক, চারচালা-একচূড় মন্দিরশৈলীর ক্ষেত্রে এ-ইমারত দুটি থেকে মিঃ স্পুনার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আহরণ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের এ-জাতীয় বহু-সংখ্যক দেবালয়ের অধিকাংশই যে মাকড়া পাথর বা ল্যাটেরাইটে নির্মিত সে-কথা আগেই বলেছি। ঠিক কি কারণে ইঁটের পরিবর্তে এ-মন্দিরগুলির নির্মাণে দুর্লভ পাথরের সাধারণত ব্যবহার হয়েছিল তা খুব প্রাঞ্জল না হলেও, পোড়ামাটির ইঁট এ-ক্ষেত্রে যে একেবারে পরিত্যক্ত হয়নি তার নিদর্শন রাধাবিনোদ ও মদনমোহন মন্দির দুটি। ল্যাটেরাইটে গঠিত বিষ্ণুপুরের চারচালা-একচূড় যাবতীয় দেবালয় ১৬৫৬ থেকে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল এবং ইঁটের তৈরী রাধাবিনোদ ও মদনমোহন মন্দির দুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যথাক্রমে ১৬৬১ ও ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। অনুমান হয়, চারচালা-একচূড় মন্দিরশৈলীর পৃষ্ঠ-পোষকতার প্রথম দিকে এ-জাতীয় ইমারত-নির্মাণে, সুবিধা-অনুযায়ী, ইঁট এবং পাথর দুই-ই ব্যবহৃত হয়েছে; কিন্তু শেষের দিকে, অজ্ঞাত কারণে, পাথরই বেশি প্রাধান্য লাভ করেছিল।

বিষ্ণুপুর নগরমধ্যস্থ এ-তিনটি দেবগৃহের সর্বপ্রাচীন রাধাবিনোদ মন্দিরটি স্থাপত্য-বিবর্তনের একটি দিকে বিশেষভাবে আলোকপাত করে। মন্দিরের বাহিরের আকৃতি যেমনই হোক না কেন, বাংলা-মন্দিরের প্রবেশ-খিলান তিনটির ঠিক ভিতরে একটি ঢাকা বারান্দা বা দালান যে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিন্যস্ত হত সেকথা আগেই বলেছি। কালক্রমে, দেবালয়ের দুই তিন বা চারিদিকেই ত্রি-খিলানের সংলগ্ন এ-রকম দালানের প্রবর্তন হয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে বারান্দাগুলি পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে গর্ভ-গৃহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে আসত আবার অন্য ক্ষেত্রে মন্দিরের চারটি কোণে পৃথক

'টেরাকোটা'-অলংকৃত মদনমোহন মন্দির : বিষ্ণুপুর

চারটি প্রকোষ্ঠ নির্মিত হত যেগুলি থেকে সংলগ্ন দালানে যাবার দরজা থাকত দু'দিকে। বিষ্ণুপুরে ইঁটের তৈরী চারচালা-একচূড় দেবালয়গুলির মধ্যে রাধাবিনোদ মন্দিরটিই সর্বপ্রাচীন। এটিতে শুধু পূর্বদিকে একটি মাত্র ঢাকা বারান্দা ছিল; অন্যদিকের বারান্দা বা কোণের প্রকোষ্ঠ-স্থাপনের রীতিটি তখনও প্রচলিত হয়নি। পাঁচ বৎসর পরে, মুরলী-মোহন মন্দিরটি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেটিতে প্রকোষ্ঠ-বিহীন একটি টানা বারান্দা গর্ভগৃহের চারিদিক প্রদক্ষিণ করে এসেছিল। ইঁটের বদলে পাথরও ব্যবহৃত হয়েছিল সেটির নির্মাণে। বাঁকুড়া তথা বিষ্ণুপুরের মন্দির-তালিকায় রাধাবিনোদ ও মুরলীমোহন মন্দির দুটি এখন আর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে না। তবুও বাঁকুড়ার মন্দির-স্থাপত্য-বিবর্তনে প্রাসঙ্গিক নিদর্শন হিসাবে সে-দুটির কিছু মূল্য আছে।

বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে এক-দালান রীতিটি কালক্রম-অনুসারে অমোঘ-ভাবে চার-দালান রীতিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল এ-কথা মনে করা ভুল হবে। কেননা,১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত মদনমোহন মন্দিরটিতে দেখি শুধু পূব-পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে ত্রি-খিলান ও দালানের ব্যবস্থা হয়েছে; উত্তর দিকে এ রকম কিছু নেই। এই বিবর্তনের প্রবণতা সাধারণভাবে এক-দালান থেকে চার-দালান অভিমুখী হলেও, বিভিন্ন-সংখ্যক দালানযুক্ত পৃথক মন্দির যে একই সময়ে নির্মিত হয়েছে, এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়। মদনমোহন মন্দিরটি ইস্টকনির্মিত। বিষ্ণুপুরবাসীর অশেষ ভক্তিভাজন মদন-মোহনের অধিষ্ঠানের জন্যই শুধু নয়, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের দিক থেকেও এ-দেবালয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আয়তনেও মদনমোহন মন্দিরকে আপেক্ষিকভাবে বৃহদায়তনই বলতে হয়। ল্যাটেরাইট-নির্মিত সাড়ে-চার ফুট উচ্চতার ভিত্তিবেদীর উপরে সৌধটি প্রতিষ্ঠিত। ভিত্তিবেদীর প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট ও দক্ষিণমুখী এ-মন্দিরের সম্মুখভাগের প্রস্থ ৪০ ফুট। পূব,

উত্তর ও পশ্চিমের দেওয়ালে সামান্য অলংকরণ থাকলেও, রাশি রাশি উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির ভাস্কর্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে দক্ষিণের মন্দিরগাত্রে ও সেই দিকে অবস্থিত দালানের দেওয়ালে। বিষ্ণুপুরের জোড়-বাংলা অথবা শ্যামরায় মন্দিরের মত সংখ্যায় অজস্র না হলেও, এ-দেবগৃহের 'টেরাকোটা' অলংকরণগুলি কারিগরির উৎকর্ষে বাঁকুড়ার তথা রাঢ়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সঙ্গে অনায়াসেই উপমিত হতে পারে। মন্দিরের সম্মুখভাগে পোড়ামাটি-ভাস্কর্যগুলির সন্নিবেশে এক বিশেষ রীতি এ-দেবালয়ে অনুসৃত হয়েছে। প্রধান খিলান তিনটির ঠিক উপরে পৃথকীকৃত এলাকায় সূক্ষ্ম অলংকরণগুলি প্রথাগতভাবে নিবন্ধ হয়েছে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত মন্দির-সম্মুখের অন্য যাবতীয় অংশে চতুষ্কোণ "প্যানেল"-এর মধ্যে কারুকৃতিগুলি উৎকীর্ণ হয়েছে ছাদের বাঁকানো কার্নিসের বক্ররেখা অনুসরণ করে। খিলানের উপরে, সম্মুখভাগের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি, প্রতি সারিতে কুড়িটি "প্যানেল"-এর সহযোগে চারটি সারি নিবন্ধ হয়েছে। খিলানের দু'পাশে এরকম পাঁচটি করে সারি আছে যেগুলির প্রত্যেকটিতে চারটি করে "প্যানেল" সন্নিবিষ্ট হয়েছে। মোট ১২০টি "প্যানেলের" কেন্দ্রে কোন-না-কোন মূর্তিকে ঘিরে রচিত হয়েছে অতি চমৎকার লতাপাতার বেষ্টনী। মিঃ স্পুনার বলেছেন এ-সৌধের সম্মুখভাগের অলংকরণের জন্য যে-পরিমাণ পরিশ্রম নিয়োজিত হয়েছে তার তুলনা সমগ্র রাঢ়দেশে বিরল। "টেরাকোটা"-ভাস্কর্যের এই উচ্চ মান স্তম্ভগাত্রে ও দালানের দেওয়াল-গুলিতেও অনুসৃত।

এ-দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দুর্জন সিংহ। প্রতিষ্ঠাফলকটি নিম্নরূপ :—

শ্রীরাধাব্রজরাজনন্দন পদাম্ভোজেষু
তৎপ্রীতয়ে।
মল্লাব্দে ফণীরাজ শীর্ষ গণিতে
মাসে শুচৌ নির্মলে।
সৌধং সুন্দররত্নমন্দিরমিদং
সার্দ্ধংস্বচেতোহলিনা।
শ্রীমদ্দুর্জ্জন সিংহ ভূমিপতিনাং
দত্তং বিশুদ্ধাত্মনা॥

[শ্রীরাধা-ব্রজরাজনন্দনের পদকমলে তাঁহাদের প্রীতির জন্য বিশুদ্ধাত্মা দুর্জন সিংহ ভূমিপতি দ্বারা নিজ চিত্তরূপ অলির সহিত এই সুন্দর রত্নমন্দির সৌধ ১০০০ মল্লাব্দে নির্মল শুচি মাসে (বৈশাখ?) দত্ত হইল।]

কিংবদন্তী এই যে, রাজা বীর হাম্বির বিষ্ণুপুরে মদনমোহন-উপাসনার প্রবর্তন করেন। অন্যতম বিবরণ অনুসারে মদন-মোহনের মূর্তি নাকি আদিতে বিষ্ণুপুর পরগনার এক গ্রামে ধরণী নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে পূজিত হত। অপর বিবরণ অনুসারে,
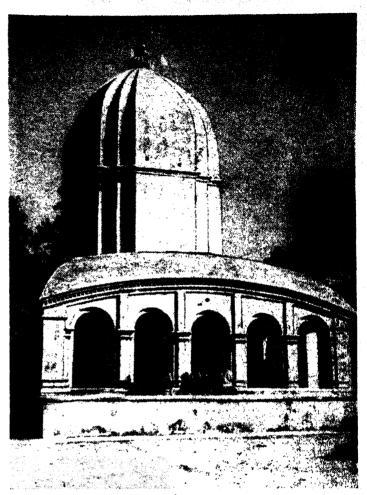
চারচালা রেখ-দেউল আকৃতির শিবমন্দির : পাত্রসায়ের

এ-ব্রাহ্মণের নাম যে ধরণী ছিল তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তিনি বাস করতেন বীরভূমে। বীরভূমের সে-অঞ্চল তখন মল্লরাজাদের শাসনাধীন ছিল। একদিন শিকারে বহির্গত হয়ে রাজা বীর হাম্বির ব্রাহ্মণের গৃহে বিগ্রহটি দেখেন এবং সেটির অপরূপ সৌন্দর্যে ও মূর্তি-নিঃসৃত এক স্বর্গীয় সুগন্ধে অভিভূত হয়ে পড়েন। অভীষ্ট জিনিস বলপূর্বক সংগ্রহ করবার প্রবণতা বীর হাম্বিরের হয়ত কিছু পরিমাণে ছিল। মল্লরাজবংশের ইতিহাস-বর্ণনার সময়ে শ্রীনিবাস আচার্য-বাহিত বৈষ্ণব পুঁথি লুণ্ঠনের ঘটনাটির সঙ্গে তাঁর সংযোগের জনশ্রুতির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ব্রাহ্মণ ধরণী শত অনুরোধ উপরোধেও কিন্তু মদনমোহন বিগ্রহটি রাজার হাতে তুলে দিতে রাজি হলেন না। বীর হাম্বির তখন কৌশলে সেটিকে অপহরণ করে বিষ্ণুপুরে নিয়ে এলেন ও তাঁরই প্রেরণায় সমগ্র রাজধানী মদনমোহন আরাধনায় মেতে উঠল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এদিকে বিগ্রহের সন্ধানে বিষ্ণুপুরে এসে উপস্থিত হলেন কিন্তু লুক্কায়িত মূর্তিটির দর্শন তার পক্ষে অসম্ভব জেনে নগরপ্রান্তবর্তী বিড়াই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে জীবনবিসর্জন করবেন স্থির করলেন। অন্তিম মুহূর্তে এক বৃদ্ধা তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে, বিগ্রহটিকে রাজা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন সে-রহস্য উদ্ঘাটিত করলেন। ব্রাহ্মণ তখন রাজসমীপে উপস্থিত হয়ে এই শপথ করেন যে বিগ্রহটি তাঁকে না দেখালে তিনি আত্মহত্যা করবেন। পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মণকে মূর্তিটি দেখান হবে এই অঙ্গীকার করে বীর হাম্বির মদনমোহনের একটি অবিকল প্রতিমূর্তি নির্মাণের জন্য কারিগরদের আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণকে কিন্তু এত সহজে বিভ্রান্ত করা গেল না। কিংবদন্তী অনুসারে, মদনমোহন তখন ব্রাহ্মণকে স্বপ্নাদেশ দিলেন যে তিনি রাজার প্রতি বিশেষ প্রীত হয়েছেন এবং তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র যাবেন না। অতএব
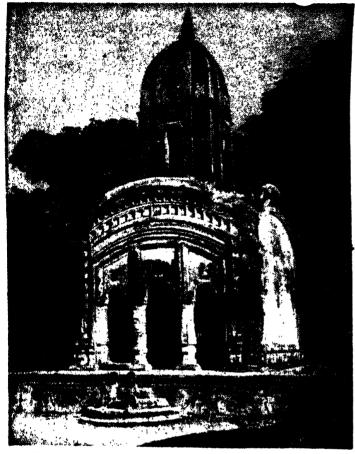
নন্দলালের দেউলশীর্ষ চার চালা মন্দির : সাহারজোড়া

রাজ-পৃষ্ঠপোষকতায় মদনমোহনের পূজো বিষ্ণুপুরে প্রচলিত হল। তৎকালীন বিষ্ণুপুরবাসীর দেব-কল্পনায় মদনমোহন যে শীর্ষ স্থান অধিকার করতেন তাতে সন্দেহ নেই। ভাস্কর রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠা আক্রমণের সময় স্বহস্তে দলমাদল কামানটি চালনা করে অশেষ কৃপায় তিনিই যে বর্গী-বাহিনীকে বিতাড়িত করেন এ-কাহিনী লোকমুখে বহুবিশ্রুত।

মল্লরাজত্বের অবনতি-কালে, রাজা চৈতন্য সিংহ যে মদনমোহনের বিগ্রহটি বাগবাজারের গোকুল মিত্রের নিকট অর্থাভাবে বন্ধক দিতে বাধ্য হন সে-কিংবদন্তীর কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। চৈতন্য সিংহের পরে পৃথক বিগ্রহ বিষ্ণুপুরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু সেটিও, অষ্টধাতু-নির্মিত ছিল বলে, বছর তিনেক আগে অপহৃত হয়েছে।

মদনমোহনের বিগ্রহ ও মন্দির বিষয়ে একটি অসংগতি আছে। কিংবদন্তী অনুসারে, রাজা বীর হাম্বির বিষ্ণুপুরে এ-দেবতার পূজোর প্রবর্তন করেন। দেবালয়ে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠাফলকটির নজিরে, রাজা দুর্জন সিংহ মদনমোহন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত করেন ১০০০ মল্লাব্দ, অর্থাৎ ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে। রাজা বীর হাম্বিরের শাসনকাল ১৫৯১ থেকে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ অবধি বলে নির্ণীত হয়েছে। সেক্ষেত্রে, তাঁর পূজো প্রচলিত হবার প্রায় ১০০ বছর পরে বর্তমান মদনমোহন মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। মধ্যবর্তী কালে মদনমোহন বিগ্রহ কোথায় স্থাপিত ছিল সে-সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। রাজা বীর হাম্বির যে এজন্য স্বতন্ত্র কোন দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এমন বিবরণও কোথাও পাইনি।

বিষ্ণুপুর শহর ও শহরতলীতে বিদ্যমান অথবা অধুনালুপ্ত প্রায় পনেরটি চারচালা-একচূড় মন্দিরের আমরা উল্লেখ করেছি। অন্য কোন শৈলীর এত অধিকসংখ্যক দেবসৌধ বিষ্ণুপুরে আর নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। বস্তুত, চারচালা-একচূড় মন্দিরের সংখ্যা বিষ্ণুপুরে বর্তমান যাবতীয় দেবালয়ের মোট সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। এই বিশেষ স্থাপত্যরীতিটি মল্লরাজধানীতে কেন যে এতদূর সমাদৃত হয়েছিল, এখন তার সঠিক কারণ নির্ণয় করা শক্ত। এই অসংগতি আরও বিভ্রান্তিকর মনে হয় যখন দেখি বাঁকুড়া জেলার অন্যত্র এ-নির্মাণপদ্ধতিটি অল্পই অনুসৃত হয়েছে। এ-জাতীয় দেবালয়ের প্রায় সবগুলিই মল্লরাজবংশের চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হবার পরবর্তী কালের। স্থাপত্য-বিবর্তনের বিভিন্ন ক্রম বা পর্যায় এক বাস্তব ঘটনা। মল্লভূমের স্থপতিরা হয়ত সংশ্লিষ্ট সময়টিতে এই বিশেষ ধরনের নির্মাণরীতির পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এ-অনুমান থেকে বিষ্ণুপুরের বাইরে, মল্লরাজত্বের অন্য অংশে, এ-জাতীয় সৌধ কেন যথেষ্ট সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি সে-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। এমনও হতে পারে, তৎকালীন মল্লরাজারা রাজধানীকে সুসজ্জিত করবার প্রয়াসেই তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে, পরম সমৃদ্ধির দিনে, বিষ্ণুপুর নাকি স্বর্গের ইন্দ্রপুরীর থেকেও সুন্দর ছিল। এহেন বিত্তবান ও প্রখ্যাত শহরকে অলংকৃত করবার জন্য মল্লরাজারা হয়ত তাঁদের দেবগৃহ-নির্মাণ প্রচেষ্টাকে এখানেই কেন্দ্রীভূত করেছিলেন।

রাজধানী থেকে দূরে, মল্লভূমের অন্যান্য অংশে, যে অল্পসংখ্যক চারচালা একচূড় মন্দিরগুলি এই একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের নির্মাণকৌশল, কয়েকটি ক্ষেত্রে, বিষ্ণুপুরে-অনুসৃত রীতিটি থেকে পৃথক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাত্রসায়ের-এর প্রসিদ্ধ শিব-মন্দির ও বড়জোড়া থানার সাহারজোড়া গ্রামের নন্দলাল মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। পাত্রসায়ের বাঁকুড়া জেলার বিখ্যাত প্রাচীন গ্রাম। জনসংখ্যার দিক থেকে এটি সম্ভবত জেলার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। এই জনবহুল পল্লীতে শিব বহুদিনের

আরাধিত দেবতা। পাত্রসায়ের-এর শিবপূজো সম্পর্কিত উৎসবাদিরও যথেষ্ট খ্যাতি আছে; চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন-উৎসবের সময়ে দূর-দূরান্ত থেকে অগণিত লোক এখানে সমবেত হয়। চারিদিকে অনেকখানি খোলা জায়গার কেন্দ্রে অবস্থিত স্থানীয় শিবমন্দিরটি স্থাপত্যগতভাবে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। উঁচু ভিত্তিবেদীর উপরে স্থাপিত এক চারচালা মন্দিরের শীর্ষে রেখ-দেউল আকৃতির চূড়াটি দেখলে সন্দেহ হয় আদিতে এ-দেবালয়টি হয়ত রেখ-দেউল পদ্ধতিতেই নির্মিত হয়েছিল, আধুনিক-দর্শন চারচালাটি পরে সংযোজিত হয়েছে। এ অনুমানের কারণ, কেন্দ্রীয় চূড়াটি মন্দিরের তুলনায় অস্বাভাবিক রকম বড় এবং এটির নির্মাণে খাঁটি উড়িষ্যাশৈলীর পাঁচটি 'রথ-পগ' প্রত্যেক দিকে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক চারচালাটিতে যে খিলানগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে তা প্রথাগত পত্রাকৃতি ত্রি-খিলান থেকে এতই পৃথক (আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য) যে, চারচালাটির অর্বাচীনতায় বিশেষ কোন সন্দেহ থাকে না। প্রাচীন ও নবীন স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণে পাত্রসায়ের-এর এ শিব-মন্দিরটি অভিনব।

প্রায় অনুরূপ চূড়াসমন্বিত আর একটি দেবালয় আছে বড়জোড়া থানার সাহারজোড়া গ্রামে। মিঃ জে সি ফ্রেঞ্চ লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড লেটার্স' নামক সাময়িক পত্রিকার ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি সংখ্যায় এ মন্দিরটি সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, মুঘল শাসনকালে মল্লভূমের স্থাপত্যক্ষেত্রে মোসলেম প্রভাব বেশ কিছুকাল বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে স্থানীয় 'সূত্রধর-স্থপতিরা' বহিরাগত সে প্রভাবকে নিজেদের সাবেক রীতির শামিল করে ফেলতে সক্ষম হন। সাহারজোড়ার দেবগৃহটি কৃষ্ণ-মন্দির; বিগ্রহের নাম নন্দলাল। মন্দিরটিতে যে প্রতিষ্ঠাফলক নিবদ্ধ আছে তা থেকে দেখা যায় এটি ১৬৪২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মিঃ ফ্রেঞ্চ তাঁর মত প্রতিপন্ন করবার জন্য এ-মন্দিরের খিলানগুলির বলিষ্ঠতা, কেন্দ্রীয় খিলান শীর্ষের দুটি ময়ূরমূর্তির রমণীয়তা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি কেন যে দূর গ্রামাঞ্চলের এই নগণ্য দেবালয়টিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে নির্বাচন করে-ছিলেন সে-কথা আমার কাছে খুব সহজ-বোধ্য নয়। মুঘল আমলে সামান্য পর-বশ্যতার গ্লানি মল্লরাজকুলকে স্পর্শ করে-ছিল তাতে সন্দেহ নেই। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে, কিছু কিছু মুঘল প্রভাবও যে সে-সময়ে মল্ল-স্থাপত্যের উপরে পড়ে নি এমন নয়।

পাচাল-এর বিখ্যাত আটচালা শিবমন্দির

আটচালা রামকৃষ্ণ মন্দির : সাত্রাকোণ

যথাসময়ে সেই ক্ষীণ প্রভাব 'সূত্রধর' স্থপতিরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন এবং সে-উত্তরণের নিদর্শন মল্লভূমের বিভিন্ন মন্দিরে বিধৃত। মিঃ ফ্রেঞ্চ তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে অনায়াসেই প্রাসঙ্গিকতর উদাহরণের উল্লেখ করতে পারতেন। হয়ত তাতে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় আরও পরিস্ফুট হত। মল্ল-স্থাপত্যে মুঘল প্রভাবের যতখানি গুরুত্ব মিঃ ফ্রেঞ্চ আরোপ করেছেন তত-খানি করা যায় কিনা সন্দেহ। আমার ধারণায় এ-প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়; যেটুকু ছায়া হয়ত পড়েছিল কোন সময়ে তা বাংলা দেশের চালা-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আপন স্বাতন্ত্র্য বেশি দিন রক্ষা করতে পারেনি। কুশলী 'সূত্রধর' স্থপতিদের হাতে সে-প্রভাব সহজেই বাংলা-মন্দির নির্মাণ পদ্ধতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। সাহারজোড়ার নন্দলাল মন্দিরটি তবুও অন্য এক কারণে বিশেষত্বের দাবি করতে পারে। এ-বৈশিষ্ট্য দেবালয়টির চূড়ার নির্মাণ-সম্পর্কিত। মন্দিরের নিম্নভাগ প্রথাগতভাবেই চারচালা-শৈলীতে গঠিত। শুধু এক দিকেই পত্রাকৃতি ত্রি-খিলানের মধ্য দিয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশের পথ আছে। বাঁকানো কার্নিসের নীচে সম্মুখের দেওয়াল ও স্তম্ভগাত্র একদা যে 'টেরাকোটা' অলংকরণে সজ্জিত ছিল এমনই মনে হয়। কিন্তু এ-মন্দিরের চূড়ার বিন্যাস এহেন প্রথাগত পদ্ধতিকে অনুসরণ করে নি। বিষ্ণুপুরের বহু সংখ্যক চারচালা একচূড় মন্দিরে চূড়া-নির্মাণের যে-রীতিটি প্রযুক্ত হয়েছে তা থেকে সাহারজোড়ার পার্থক্য লক্ষণীয়। বিষ্ণুপুরে এজাতীয় সৌধের চূড়া সর্বত্রই দুই পৃথক নির্মাণশৈলীতে বিভক্ত হয়েছে; নিম্নের অংশটি বিভিন্ন-সংখ্যক খাড়া 'রথ-পগ' ও উপরের অংশটি 'স্টেপ পিরামিড'-এর বিন্যাসে গঠিত হয়েছে প্রায় সকল ক্ষেত্রে। সঙ্গের আলোকচিত্রটি থেকে দেখা যাবে সাহারজোড়ার নন্দলাল মন্দিরের চূড়াটি রেখদেউল আকৃতির। অবশ্য খাঁটি উড়িষ্যা-শৈলীকে অনুসরণ করে পাঁচটি 'রথ-পগ' ব্যবহৃত হয় নি; হয়েছে মাত্র তিনটি। তবুও রেখ-দেউলের সঙ্গে সাদৃশ্য অতিশয় প্রকট। এদিক থেকে সাহারজোড়া ও পাত্রসায়েরে-এর মন্দির দুটি সমজাতীয় ও এক বিশেষ মন্দির-নির্মাণ-শৈলীর দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে স্থাপত্যরীতি অনুসারে হয়ত আরও দেবালয় একদা বাঁকুড়া জেলায় নির্মিত হয়েছিল।

আট-চালা মন্দির বাঁকুড়া জেলায় কেন যে অধিক সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি তার কারণ খুব স্পষ্ট নয়। ভাগীরথী-তীরবর্তী অঞ্চলে, বিশেষত সে-এলাকার দক্ষিণ অংশে, আট-চালা শৈলী যেরূপ বহুল-ব্যবহৃত হয়েছে বাঁকুড়া জেলায় সেরূপ হয় নি। আশ্চর্য শোনালেও এ-কথা সত্য যে বিষ্ণুপুর শহরে এখন একটিও উল্লেখযোগ্য আটচালা মন্দির নেই। পূর্বে কখনও ছিল এমন সন্ধানও

আমি পাই নি। নগরের প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে, কালিন্দী বাঁধের নিকটে, তেজপাল মন্দির নামে একটি আটচালা সৌধ আছে। ইমারতটি প্রস্তরনির্মিত মনে হয় কিন্তু এটি সর্বাংশে পলস্তারা-আচ্ছাদিত। পদ্মাকৃতি তিনটি খিলান ছাড়া এ-দেবগৃহে আর কোন অলংকরণ নেই। প্রতিষ্ঠাফলকটি থেকে অনুমান হয়—মল্লবংশের কোন সামন্ত রাজা একদা এ দেবালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধরাপাটের বর্তমান মন্দিরটির বর্ণনা-প্রসংগে আমরা সেটির প্রতিষ্ঠাতা অন্বেষ-রাজার উল্লেখ করেছিলাম। রতন কবিরাজের 'মদন-মোহন বন্দনার' অন্বেষ-রাজাও যে মল্ল-বংশের সামন্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন একথা উল্লিখিত হয়েছে। এই দুটি নজির থেকে এমন অনুমান অসংগত নয় যে, মল্ল-নৃপতি-দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সামন্ত-রাজারাও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করতেন। এই রেওয়াজ অনুসারে সিমলাপালের স্থানীয় রাজারা তাঁদের গৃহ-দেবতার অর্চনার জন্য আর একটি আটচালা দেবালয় স্থাপন করেছিলেন। সেটির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য এই যে, মূল মন্দিরটির সম্মুখে একটি প্রশস্ত ঢাকা বারান্দা সংযোজিত হয়েছে। কয়েকটি দর্শনীয় প্রস্তরভাস্কর্য নিবদ্ধ আছে সে দালানের দেওয়ালে। সোনামুখীর অনেকগুলি দেব-সৌধের মধ্যে একটি আটচালা-শৈলীর। এটি আয়তনে ছোট ও প্রথাগতভাবে নির্মিত। পাঁচাল-এর শিবমন্দিরটিও আট-চালা রীতির। আকারপ্রকারে খুব গুরুত্ব-পূর্ণ না হলেও বাঁকুড়ার যাবতীয় শিব-মন্দিরের মধ্যে সেটি অতিশয় বিখ্যাত। শিবপূজার সংগে সংশ্লিষ্ট বাণফোঁড়, আগুন-হাঁটা প্রভৃতি কৃচ্ছ্রসাধনের আলোচনা প্রসংগে আমরা ইতিপূর্বেই বিস্তৃতভাবে এ-মন্দিরের উল্লেখ করেছি।

বাঁকুড়ার আটচালা দেবালয়গুলির মধ্যে সারাকোণ-এর রামকৃষ্ণ মন্দিরটি নানা দিক দিয়েই উল্লেখনীয়। তালডাংরা থানার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে দেবগৃহটি অবস্থিত। পুরন্দর নামে অতি মনোরম একটি নদী উচ্চ ভূমিতে স্থিত মন্দিরটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। পূর্বে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পুরন্দর নদী দেবালয়টিকে বেষ্টন করে প্রবাহিত ছিল; একটি শাখার শুষ্ক খাত এখনও নজরে পড়ে। প্রথাগতভাবে নির্মিত এ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক থেকে দেখা যায়, রাজা বীর-সিংহ প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে এটির প্রতিষ্ঠা করেন। সৌধটিকে ঘিরে উচ্চ এক ইষ্টকপ্রাচীর এখনও বর্তমান। মন্দির-বিগ্রহ রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। রাজা বীর সিংহের রাজত্বকালে উত্তর-পশ্চিম দেশাগত এক সন্ন্যাসী রাম (বলরাম) ও কৃষ্ণের দুটি মূর্তি সংগে নিয়ে সারাকোণ-এর অরণ্যাকীর্ণ অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। একদিন তিনি ভিক্ষার বহির্গত

রামকৃষ্ণ মন্দিরের মনোরম বিগ্রহ : সারাকোণ

হলে, বিগ্রহ দুটি দুই বালকের বেশে সন্ন্যাসীর কুটিরের চারিদিকে খেলা আরম্ভ করে। এক গোয়ালা সেই পথ দিয়ে বিষ্ণু-পুরে যাচ্ছিল। বালকেরা রাজার হাতে দেবার জন্য তাকে একটি আম দেয়। বিষ্ণু-পুরে উপস্থিত হয়ে গোয়ালা কিন্তু আমের কথা বিস্মৃত হয়। সে-রাত্রে বিষ্ণুপুর রাজ এবং গোয়ালা একযোগে স্বপ্নাদিষ্ট হন। পরদিন প্রভাতে গোয়ালা আমটি নিয়ে রাজ-বাড়ির দিকে রওনা হলে পথে তার দেখা হয়

এক রাজভৃত্যের সঙ্গে; সেও রাজাদেশে আসটি সংগ্রহ করবার জন্য আসছিল। গোয়ালার কাছে বালক দুটির বর্ণনা শুনে রাজা সন্ন্যাসীর কুটিরে এসে উপস্থিত হন কিন্তু বালক দুটির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তিনি অনুমান করেন বিগ্রহ দুটিই বালকের রূপ ধারণ করেছিল। তাঁর অনুরোধে সন্ন্যাসী একটি মাত্র মূর্তি হস্তান্তরিত করতে রাজি হন কিন্তু কোন মূর্তিটি যে রাজা পেয়েছিলেন সে-কথা সঠিক না জানা থাকায় মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে বিগ্রহের যৌথ নাম রাখা হয় রামকৃষ্ণ। বিগ্রহটি কষ্টিপাথরে নির্মিত ও অতিশয় সুন্দর। সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় এত মনোরম কৃষ্ণমূর্তি বেশি নেই। রাজা বীরসিংহ মন্দির পরিচালনার জন্য বহু ভূসম্পত্তিও দান করেন। এ-দেবালয় সম্বন্ধে আর একটি কিংবদন্তী, কোন পাখি নাকি এ-মন্দিরের উপর দিয়ে উড়ে যাবার চেষ্টা করলে তৎক্ষণাৎ অচৈতন্য হয়ে ভূপতিত হয়। এই জনশ্রুতি কতদূর সত্য তা বলা কঠিন। কিন্তু এতে বিশ্বাস করেন এমন লোকের অভাব নেই।

(ক্রমশ)

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

বীয়ারকুল থেকে দীঘা

নারায়ণ সান্যাল

আজকের তমলুকের সঙ্গে প্রাচীন তাম্রলিপ্তের যেটুকু নাড়ির যোগ আজকের দীঘার সঙ্গে অষ্টাদশ-শতাব্দীর বীয়ারকুলের রক্তের সম্পর্কটা ছিল তার চেয়েও নিকট। রামনগর খাল, দীঘা মোহনা, বীরকুল পরগনার পরিচয় থেকে মনে হয় যে, আজকের দীঘা আর সেদিনের বীয়ারকুলের ভৌগোলিক অবস্থান অভিন্ন। বোধ করি কথাটা খুব স্পষ্ট হল না। তার কারণ বীয়ারকুলের কথা আমরা জানি না। বীরকুল মৃত। কেমন করে সেই মৃত বীরকুলের বুকে জন্ম নিল আধুনিক দীঘা তারই সন্ধান নিচ্ছিলুম জাতীয় গ্রন্থাগারে বসে। ঘাটাঘাটি করছিলুম প্রাচীন নথীপত্র।

ক্যারীসাহেবের Hon'ble John Companyতে পাচ্ছি: 'হিজলী (Hidgelee) থেকে অনতিদূরে এই সমুদ্রসৈকতটির নাম বারকুল (Burcool)। ১৭৮০ থেকে ১৭৮৫ সালের মধ্যে এই স্থানটি 'কলকাতার ব্রাইটন' নামের খেতাব পেয়েছিল। সে সময়ে সেখানে অনেকগুলি বাংলোবাড়ি ছিল—অবসর যাপনের উদ্দেশ্যে অনেকেই সেখানে যেতেন। তারপর কেন জানি না এই সমুদ্রসৈকত ক্রমশ সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়ে পড়ে। ১৮২৩ সাল তক্ সেখানে একটি মাত্র বাংলো খাড়া ছিল। এ বাংলোটি ওয়ারেন হেস্টিংস তৈরি করান।'

মহাকালের ইতিবৃত্তে এ কিছু নূতন কথা নয়। তিনি গড়তে গড়তে ভাঙছেন, এবং ভাঙতে ভাঙতে গড়ছেন। তবু কেমন যেন সন্দেহ হয়। এ কিছু পাঁচ-সাতশ-হাজার বছরের কথা নয়। ওয়ারেন হেস্টিংস তো কালকের ছেলে! তার আমলের সারি সারি বাংলোবাড়ি বেমালুম না-পাত্তা? কিন্তু স্থানটা সমুদ্রসৈকত। নিরন্তর ঝোড়ো হাওয়ায় এখানে নূতন নূতন বালিয়াড়ি রাতারাতি মাথা তোলে, যেখানে ছিল পাহাড় সেখানে দেখা দেয় খানা-খন্দ। তাছাড়া সমুদ্রও এগিয়ে আসছে গুটি গুটি। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তার। হয়তো বীয়ারকুল-সৈকতের যে উঁচু টিলায় ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলো বানিয়ে ছিলেন এখন সেটি সমুদ্রগর্ভে।

তা আজকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আমার তো সন্দেহ হয় ১৮২৩-তক্ সে বাংলোটি খাড়া ছিল কিনা। কারণ দেখছি চার্লস চ্যাপম্যান ১৭৯৬ সালেই একটি 'বেঙ্গল-লেটারে' লিখছেন: 'গত গ্রীষ্মের কটা দিন আমরা বীয়ারকুলে কাটিয়ে এলুম। এ সেই বীয়ারকুল যেখানে তুমি আর মিসেস হেস্টিংস একবার অভিযানে গিয়েছিলে। স্থানীয় লোকেরা তোমাদের জন্য তৈরি করা বাংলোর ছাদটি এখনও দেখায়। কিন্তু ঐ টুকুই মাত্র অবশিষ্ট আছে।'

দীঘা থেকে মাইল-পাঁচেক উত্তরে ছোট্ট গ্রাম—নাম বালিসাই। এখানকার ভূঁইয়া জমিদার সেকালে বেশ বর্ধিষ্ণু ছিলেন। কিম্বদন্তী—ওয়ারেন হেস্টিংস সদলবলে একবার বীয়ারকুল যাওয়ার পথে বালিসাইয়ের কাছাকাছি কাদায় আটক পড়েন। ভূঁইয়া জমিদার তাঁর হাতী পাঠিয়ে লাটবাহাদুরকে বিপদমুক্ত করেছিলেন। প্রতিদানে লাট-সাহেব জমিদারকে উপহার দিয়েছিলেন একটি ট্রিগার কামান, এবং একটি বিখ্যাত চিপেণ্ডাল খানা-টেবিল। এ দুটি এখনও আছে।

ওয়ারেন হেস্টিংস-এর রচনাও হাতড়েছি। কোন পথে তাঁরা আসতেন? পথের কী বিবরণ? হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে গেলুম মিসেস হেস্টিংসকে লেখা তাঁর চিঠি: 'বীয়ারকুল একটি স্বাস্থ্যাবাস—কলকাতার ব্রাইটন বলা যায় তাকে।'

খবরের কাগজে আর কাউন্সিলের নথীপত্রে ক্রমাগত নজরে পড়ে—অমুক অমুক স্বাস্থ্যের সন্ধানে বীয়ারকুলে গেছেন। এ অঞ্চলে নানাজাতীয় শিকার আর মাছ ধরার সুযোগ আছে শুনেছি। ১৭৮০ সালের মে সংখ্যায় বেঙ্গল গেজেট একটি পরিকল্পনার কথাও প্রচার করেছে—বীয়ারকুলকে একেবারে আধুনিক-ঢঙে ঢেলে

সাজাবার। এ সৈকতের কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধা এমনিতেই আছে। বেলাভূমি প্রশস্ত, গাড়ি চালানো যায়। পৃথিবীতে গাড়ি-চালানোর উপযোগী যত সমুদ্র-সৈকত আছে দীঘারকূল তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ ছাড়া উপদ্রবকারী জন্তুজানোয়ার একেবারেই নেই বলা চলে—একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ করি কাঁকড়া......' কাঁকড়া! হাঁ তা আছে বটে। কাঁকড়ার কথায় মনে পড়ে গেল সেবারকার দীঘা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।

গত বছরের কথা। দীঘাতে সমবেত হয়েছেন গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ। মন্ত্রীই আছেন সাত-আটজন। এমন কি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। কাঁধে-ক্যামেরা সাংবাদিকের দল ক্রমাগত ঘোরাফেরা করছেন। উদ্দেশ্য মহৎ এবং সনাতন। ওয়ারেন হেস্টিংসের ভাষায় —'দীঘাকে একেবারে আধুনিক-ঢঙে ঢেলে সাজাবার আয়োজন।' এ্যাডমিনিস্ট্রেটর অরুণ চাটুজ্জে মশায়ের চেহারাটা বরযাত্রীর অপ্রত্যাশিত সংখ্যাধিক্যে বিব্রত গ্রাম্য কন্যা-কর্তার মত। চোখ লাল, চুল উসকো-খুসকো—যেন 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' নাটকে নাম-ভূমিকায় মেক-আপ! দীঘা যদিচ দিল্লির মিণ্টায়া-বিশেষের উপমান নয়, তবু যাঁরা দীঘাকে চোখে দেখেছেন এবং যাঁরা দেখেন নি তাঁরা সবাই জানেন দীঘায় সব চেয়ে দুর্লভ বস্তু হচ্ছে মাথার উপর এক-খানা ছাদ। ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা।

ছোট্ট দীঘা-শহরের অবস্থা লোকাল ফাস্ট-টাইম এক্সপ্রেস-বাক্সের মত। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী! আমার বড়কর্তা যেতে পারলেন না। কাগজপত্র কাজে যেতে হল আমাকেই। ঘোড়ানিম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান প্রাণটুকু মুঠোয় নিয়ে দীঘায় এসে পৌঁছালুম। কিন্তু রাখে কেষ্ট মারে কে? আলাপ হয়ে গেল শার্দুল সিং তেওয়ারীজীর সঙ্গে। আরজাম্পা অঞ্চলের মানুষ—বাংলা সরকারের দীর্ঘদিন সেবা করছেন। অমায়িক সরল শান্ত ভদ্রলোক। নামেই শার্দুল—অবয়ব অতি মোলায়েম, ব্যবহার ততোধিক প্রাণ-জল! কথাবার্তায় জানা গেল তিনি আমার দাদার সহপাঠী। বল্লেন—বেশক্! আপনি অমুকের ভাই আছেন, তো হমারও ভাই লাগছেন। আপনি হমার ঘরে শুবেন। দো চারপাই ভি আছে। একঠো হমার একঠো আপনার।

অবাক হয়ে বলিঃ সে কি! আপনার ঘরে দ্বিতীয় সীট এখনও খালি? এত ভিড়েও? শার্দুলজী বলেন, ঃ হমার নাম শার্দুল আছে না! শেরের সাথে এক ঘরে শুবার হিম্মৎ চাই! বলেই হো হো করে হাসি!

আমি ভাবছিলুম—এমন অমায়িক পরো-পকারী ভালমানুষের নাম কে দিয়েছিল শার্দুল! যাই হোক তাঁর আতিথ্যই মেনে নিলুম। করিৎকর্মা লোক। নিজেই হাঁকা-হাঁকি করে লোক ডেকে আমার বাক্স-বিছানা নিয়ে গেলেন ঘরে। বললেন—খানা ভি হমার সাথে—

আমি ইতস্তত করছি দেখে আবার বলেন —বেশক্! আপনি ঘবড়াইবেন না। হমরা টেম্পরারি মেসিং খুলিয়েছি। আপনি ভি মেম্বার আছেন।

ঠান্ডা-মাথা কাজের লোক তেওয়ারীজী। ঘরের সর্বত্র ফাইলের স্তূপ। সাময়িক টেলিফোন বসেছে ঘরে। ক্রমাগত কল আসছে। আসছে পিয়ন, আসছে আদেশ, আর আসছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা। গায়ে সামার-কুল গেঞ্জি, পরিধানে নীল লুঙ্গি, হাতে ধূমায়িত সিগারেট—তেওয়ারীজী নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। আগামীকাল মিটিং—দীঘা-উন্নয়ন পর্ষদের। মিটিং-এর আগেই কাগজপত্র তৈরি হওয়া চাই। নূতন টাইপিস্ট বসেছে সমুদ্র-গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিতে।

আমার হাতে কাজ নেই। নেহাত বেকার। কাল মিটিং-এর সময় একপাশে খাড়া থাকতে হবে। তাক-পড়া মাত্র দাখিল করতে হবে নক্সা অথবা খরচের খতিয়ান। সৈকতাবাসই মুখ্য আলোচ্য বিষয়। আমারই নক্সা—তার হিসাব আমার ঠোঁটস্থ। চুপচাপ বসে না থেকে তেওয়ারীজীকে এক-আধটু সাহায্য করছি। খোলের টেটাল দিয়ে দিচ্ছি। টাইপ কাগজের বানান দেখে দিচ্ছি। লোকচৈতি, অপরাহ্নে সন্ধ্যায় সমুদ্রের ধারে একটু

১। ডাক বাংলো, সেচ বিভাগ, ২। স্নেইথ-সাহেবের কুঠি, ৩। টিলার উপর চতুষ্কোণ পাথর, ৪। ডাক-বাংলো, পূর্ত বিভাগ, ৫। সৈকতাবাস (অসমাপ্ত), ৬। যাত্রী কুটির, ৭। মেরিন করোআন রিসার্চ ইন্সটিট্যুট, ৮। টুরিস্ট লজ (অসমাপ্ত), ৯। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অফিস ইত্যাদি (অসমাপ্ত), ১০। নাড়াজোল প্রাসাদ, ১১। বাজার ও বে-কাফে, ১২। যাত্রীশালা, ১৩। কাফেটেরিয়া, ১৪। যাত্রী কুটির, ১৫। অঘোর-কামিনী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১৬। ডাক-বাংলো বনবিভাগ, ১৭। চীপ ক্যানটিন—সাধারণ যাত্রী-নিবাস, ১৮। বনবিভাগের অফিস

বেড়াতে যাবার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু তেওয়ারীজীকে কাগজের সমুদ্রে নিমজ্জমান দেখে সে ইচ্ছা দমন করলুম। রাত্রে ভূরি-ভোজনের আয়োজনটি ছিল পরিপাটি। আহারান্তে একটু গল্পগুজব করা গেল। তারপর রাত দশটা নাগাদ শুয়ে পড়ি দুজনে বাতি নিবিয়ে।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি ঐ একই কথা। ভদ্রলোকের নামটা বড় বেমানান। গল্প-উপন্যাসে নামকরণের সময় আমরা খেয়াল রাখি নামটা যেন চরিত্রের সঙ্গে ঠিক খাপ খায়। কাল্পনিক চরিত্রের নামকরণটা যেন বাস্তবানুগ হয়। সে প্রচেষ্টায় বিড়ম্বিতও হয়েছি। দেখা গেছে ঐ কল্পিতনামের বাস্তব মানুষ সত্যিই আছে সেই পরিবেশে। ভগবানও একজন কাহিনীকার—তাঁর কি এটুকু সেন্স নেই? জন্মমুহূর্তে যার বাপ-মা পুত্রের নামকরণ করলেন শার্দূল—তার চরিত্রটা ডেভেলপ করবার সময় কিছু বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করতে হবে না? আর কিছু না হোক নামের খাতিরে একজোড়া আশু-মুখুজ্জে মশায়ের মত গোঁফ দিলেও তো পারতেন? এই সব ভাবতে ভাবতে কখন নিদ্রায় দুটি চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছে—হঠাৎ একটা বিকট শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসি খাটের উপর। এ কী! এ কিসের শব্দ? বাঘ! দীঘায় বাঘ আছে নাকি? কিন্তু আজ এত লোকের ভিড়ে সেই বা পথভুলে এ পাড়ায় আসবে কেন? শব্দটা ক্রমশই বাড়ছে। হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বালি। মুহূর্তে আলোকিত হয়ে গেল সমস্যাটা। শুধু শব্দের উৎপত্তিস্থলই নয় সেই সঙ্গে উপলব্ধি করলুম ভদ্রলোকের নামের যৌক্তিকতা। মনে মনে প্রণাম করলুম বিশ্বনিয়ন্তাকে। তিনি কাজ করে যান গোপনে গোপনে। শব্দটা আসছে গভীর নিদ্রামগ্ন শার্দুল সিংজীর নাসিকা-গহ্বর থেকে!

ডাকলুম তাঁকে। উঠে বসলেন। বললুম—আপনি বোধ হয় বেকায়দায় শুয়েছেন।

ঘুম-জড়ানো দুটি রক্তচক্ষু মেলে তেওয়ারীজী বলেন,—জী হাঁ, তাই ঘুম আসছে না। তামাম রাত বিলকুল জাগতে হোবে—বহুৎ গরমি!

বলেই তিনি পার্শ্বলাভ করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তামাম রাত কিভাবে জাগাবেন তার সগর্জন প্রমাণ দিতে শুরু করলেন—'গম্ভীরে অম্বরে ঘণা নাদে কাদম্বিনী!'

ক্লান্তিতে দু-চোখ জড়িয়ে আসছে আমার। ধকল তো কম যায় নি সারাদিন। কিন্তু ঘুমাবার উপায় নেই। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম—কাঁটা দুটো আমারই মত যুক্ত-করে নমস্কার করছে বিশ্বনিয়ন্তাকে—নামের যাথার্থ্য রক্ষা করতে কী সূক্ষ্ম হাতের কাজ! রাত বাড়ছে। চারিদিক নিষুতি। শুধু জেগে বসে আছি আমি। রাত একটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ি ঘর ছেড়ে। বগলে বালিশ আর চাদর। আশপাশে যতগুলি বাড়ি তার বারান্দা ঘুমন্ত মানুষে উপচীয়মান। অগত্যা হাঁটিতে হাঁটিতে চলে এলুম রোডস্-বাংলোর সামনে। রাস্তার উপর সারি সারি ঝিমন্ত গাড়ি। ভাবলুম ওরই কোন একটার গর্ভে বাকি রাতটুকুর জন্য আশ্রয় নিই। বেশ একটা বড় সিডানবডি গাড়ির হাতলে হাত দিয়েছি কি দিই নি—হাঁ হাঁ করে, ছুটে এল আরক্ষপুঙ্গব। চোর দায়ে ধরা পড়লুম শেষে। তখন লক্ষ হল গাড়ির বনেটে ছোট্ট একটা তেরঙা পতাকা। কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বলি—"ঐ ঘরে আমার সীট, কিন্তু ঘরের কাছে গিয়ে জেনে এস কেন রাত কাটাতে এসেছি এখানে।"

সেপাইটি অমায়িক। জানালার কাছে গিয়ে

গিয়ে কি যেন শুনে ফিরে এল। বললে—বুঝেছি স্যার। আমাকেও এ বিপদে পড়তে হয়েছে। আমাদের বড় দারোগাবাবুর যেমন নাক ডাকে তেমনই ভূতের ভয়। একা ঘরে শুতে পারেন না। কত রাত যে মেঝেয় শুয়ে জেগে কাটিয়েছি।

মনে মনে ধন্যবাদ দিলুম ভূতভীত বড় দারোগাবাবুকে। তাঁরই দয়ায় আজ সেপাইজীর এই দরদী মনোভাব। সেপাইজী বললেন—কিন্তু এ গাড়িতে নয় স্যার, আপনি বরং ঐ স্টেশন ওয়াগনে গিয়ে শুয়ে থাকুন। অত নাক-ডাকায় ঘুমাতে পারবেন না।

স্টেশন-ওয়াগন তো ভাল, ময়লা-ফেলা গাড়ি পেলেও তখন আমি রাজী। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, ঘুম আজ বরাতে নেই। প্রচণ্ড মশার আক্রমণেই আবার উঠে পড়তে হল। রাত দেড়টা নাগাদ। ভাবলুম—সমুদ্রের ধারে তো নিরন্তন ঝোড়ো হাওয়া বইছে—সেখানে অন্তত মশার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। বালিশ-চাদর বগলে—গুটি গুটি গিয়ে হাজির হলুম সমুদ্র-সৈকতে।

সুদীর্ঘ দীঘা সৈকত সম্পূর্ণ নির্জন। রাত তখন দুটো। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই। কৃষ্ণপক্ষের রাত। এক-আকাশ তারা। বে-কাফের কাছাকাছি একটিমাত্র জোরালো বাতি। কিন্তু দিগন্ত-জোড়া অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিতে সে রাজি নয়। একপায়ে-খাড়া বিজলি-বাতির আলোয় একমুঠো সমুদ্র আলোকিত হয়েছে মাত্র—বাদবাকি আঁধারের রাজত্ব। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় শুধু আবছা সাদা ফেনা। দুটি খঞ্জন সেই গভীর রাত্রেও বালির উপর পুচ্ছ নাচিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

বালির উপর চাদর বিছিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন কালো রঙের একটা যবনিকা উঠে গেল আমার দৃষ্টির সামনে থেকে। মনে হল দিগন্ত-অনুসারী একটা কালো ক্যানভাসে কে যেন একটা অদ্ভুত ইঙ্গিতধর্মী ছবি এঁকেছে। সে ছবির সবটা বোঝা যায় না, কিন্তু অনেক কিছু যে বোঝা যায় না তা বোঝা যায়! রাত্রের অন্ধকারে আকাশ আর সমুদ্র হারিয়েছে তাদের পৃথক সত্তা। মনে হল এই নির্জন রাত্রির দুর্লভ মুহূর্তটির জন্য যেন আমি দীর্ঘ তীর্থপথ অতিক্রম করে এসেছি। ঘুম-না-আসা বিনিদ্র রাত্রি তো এই আমার প্রথম নয়। আসন্ন পরীক্ষার দুর্ভাবনায়, রোগাক্রান্ত আত্মীয়ের শয্যা-পার্শ্বে—কিছু না-হোক গভীর রাত্রি পর্যন্ত কলম-চালানোর মানসিক উত্তেজনায় বাকি রাত এমন করে জেগে কেটেছে। সমুদ্রকেও আজ কিছু প্রথম প্রেমের দৃষ্টিতে নূতন দেখছি না। বিভিন্ন সৈকতে, বিভিন্ন ঋতুতে তার সঙ্গে মোলাকাত ঘটেছে। তবু বিশেষ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত চেনা-মানুষকেও যেমন মাঝে মাঝে মনে হয় অচেনা, অজানা—বাহুবন্ধনে আবদ্ধ আটপৌরে গৃহলক্ষ্মীকেও যেমন হঠাৎ মনে হয় অধরা, রহস্যময়ী—তেমনি যেন চিরচেনা সমুদ্রকে দেখে আজ মনে হল—কই এর এ রূপ তো আগে নজরে পড়েনি। স্পষ্ট অনুভব করলুম ওর তরঙ্গ ভঙ্গিমার সঙ্গে আমার অন্তরের একটা নিবিড় যোগ আছে। আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনছন্দের সঙ্গে ঐ বীচিভঙ্গের একটা ঐক্যতান আছে। ও যেন আমি-ছাড়া নয়। ঠিক কি যে মনে হল বুঝিয়ে বলা শক্ত—কিন্তু অন্তর দিয়ে বিরাটের এক বাজনাকে যেন অনুভব করলুম। সে বাজনা শুধু সমুদ্রের মধ্যেই সীমিত নয়—মাথার উপর ঐ সিগ্‌নাম নক্ষত্র-মণ্ডলের হংসবলাকার পাখার স্পন্দনেও যেন

সেই একই সুর, একই ছন্দ—ডেনেব-নক্ষত্রের অদূরেই জ্বলছে অভিজিৎ, স্বর্গীয় বীণার ঝংকারেও সেই একই রেসনেন্স! এমন একটা অবাক-রাত্রি আসে নি আমার জীবনে।

আবেশে কখন মুদে এসেছে দুটি চোখ—হঠাৎ পায়ের কাছে সুরসুরি লাগায় চমকে উঠে বসি। এ আবার কী! স্বপ্ন দেখছি নাকি! অসংখ্য কাঁকড়া এসে ঘিরে ধরেছে আমাকে। কুঁচফলের মত টুকটুকে কৌতূহলী লাল চোখ মেলে আমাকে দেখছে! শত শত নয়, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কাঁকড়া! তড়াক্ করে উঠে বসলুম। ভাল করে চোখ মেলে তাকাতেই দেখি—আরে একি? কোথায় কাঁকড়া? নির্জন সমুদ্র তীরে একমাত্র আমিই প্রাণের প্রতীক। কাঁকড়ার চিহ্নমাত্র নেই—এমনকি আকাশেও নেই কর্কট রাশি।

স্বপ্নই দেখছিলুম তাহলে। কিন্তু এত স্পষ্ট? একটু পরেই বুঝতে পারি—না, ভুল দেখিনি। স্বপ্ন না, মায়া মতিভ্রম তো নয়ই—নায্য কাঁকড়াই। অল্প কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকলেই লক্ষ লক্ষ কাঁকড়া বালির গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। ক্রমাগত ছোটাছুটি করছে, বালি খুঁড়ছে, রক্তচক্ষু কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দেখছে এই অবাঞ্ছিত বহিরাগতকে। আবার একটু নড়ে চড়ে উঠলেই নিমেষে উধাও হয়ে যাচ্ছে তারা—বালির গর্তে।

বুঝলুম—আজ রাতে ঘুম নেই বরাতে। জেগেই কাটাতে হবে বাকি রাতটুকু। অবশ্য অল্পই বাকি আছে সে অধ্যায়ের। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি রূপ বদল হয়েছে তারার বাসরে। পশ্চিমাকাশে শ্রবণা সমুদ্র ছুঁই-ছুঁই করছে। ব্রহ্মহৃদয় উঠে এসেছে পূর্ব দিগন্ত ছেড়ে। মাথার উপর অ্যাণ্ড্রোমেডা। আকাশ এত স্বচ্ছ যে, মনে হয় হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি তার নীহারিকাটিকে!

ক্রমে আলো ফুটে উঠল পূর্বদিগন্তে। একটি আশ্চর্য রাত্রির দুর্লভ অভিজ্ঞতা মনের মঞ্জুষায় তুলে রেখে প্রণাম করলুম নূতন দিনের প্রভাত সূর্যকে!

এ খণ্ড-কাহিনীর এখানেই শেষ। সকাল বেলা ঘরে ফিরে দেখি শার্দুলজী তখনও শয্যাত্যাগ করেন নি। আমার পদশব্দে চোখ না খুলেই বলেন—মর্নিং ওয়াক হল?

কেমন করে তাঁর নজর এড়িয়ে বগলে-চাপা বালিশ নিজের বিছানায় পাচার করে-ছিলুম সে কথা এখানে অবান্তর।

কি কথা থেকে কি কথায় এসে পড়েছি। কথা হচ্ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর হারিয়ে-যাওয়া বীয়ারকুলকে নিয়ে। কলকাতার কুঠিয়ালের বড় বড় সাহেব-বিবি সেখানে আসতেন, ঘোড়ায়, নৌকায়, পালকিতে। প্রবাসী ইংরাজের চোখে এ সমুদ্র-সৈকত ব্রাইটনের স্মৃতি জাগিয়ে তুলত। বালিয়াড়ির

টুরিস্ট লজ
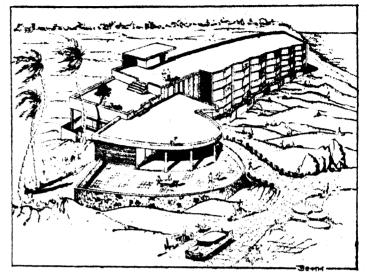
উপর গড়ে উঠেছিল সারি সারি বাংলো-বাড়ি। সদলবলে যখন ওঁরা আসতেন তখন সমুদ্রতীর কলরব-মুখরিত হয়ে উঠত। মাছ ধরা, শিকার, নাচ, আর মদের ফোয়ারা ছুটত। কী আশ্চর্য রাজানুগ্রহ লাভ করা সত্ত্বেও সে বীরকুলের আজ চিহ্নমাত্র নেই। কেন নেই? উনবিংশ শতকেই কেন এখানে গড়ে ওঠেনি নতুন শহর? আধুনিক স্বাস্থ্যাবাস? আর পাঁচটা জনপদ যেভাবে গড়ে ওঠে?

'—হয়তো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মুছে গেছে সমুদ্র-সৈকতের সে জনপদ' বললেন, শ্রী চট্টোপাধ্যায়। অরুণবাবু। দীঘার বর্তমান আডমিনিস্ট্রেটর। কথা হচ্ছিল দীঘাতেই। গল্প বলছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার।

দীঘাতে উনি প্রথম আসেন আটচল্লিশ সালে। সরকারী অফিসার হিসাবে অবশ্য নয়। একবেলা মাত্র ছিলেন। ওঁর যতদূর মনে পড়ে দুখানি মাত্র পাকাবাড়ি দেখে-ছিলেন সে সময়। একটি সেচবিভাগের ডাক-বাংলো, অপরটি স্নেইথ-সাহেবের কুঠি। বললেন—স্নেইথ সাহেবকে সেবার দূর থেকে দেখেছিলাম মাত্র। আলাপ হয়নি। দেখেছিলাম নির্জন বালিয়াড়ির উপর হ্যাট

মাথায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন একজন সাহেব— সঙ্গে একজোড়া অ্যালসেশিয়ান।

প্রশ্ন করলুম—স্নেইথ সাহেবটি কে?

বললেন—লিভিং স্টোন অফ দীঘা।

সব খুঁটিয়ে শুনলুম। বিংশ শতাব্দীতে নূতন করে দীঘাকে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব যে কয়জনের প্রাপ্য, স্নেইথ সাহেব তাদের ভিতর আজও আছেন আমাদের মধ্যে। খাঁটি ইংরেজ। বর্তমান বয়স বিরাশী। বিখ্যাত হ্যামিলটন কোম্পানির কাউণ্টার সেলস-ম্যানরূপে কালাপানি পার হয়ে ভারতবর্ষে যখন তিনি প্রথম আসেন, তখন এ শতাব্দী সবে চোখ মেলে তাকিয়েছে। কুশাগ্রধি কর্মঠ মানুষ। বছর দশবারোর মধ্যেই হয়ে পড়েন কোম্পানির অপরিহার্য অঙ্গ। শুধু ভারতবর্ষই নয়, পৃথিবীর এই পূর্বপ্রান্তে বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদে হেন ধনকুবের কেউ ছিল না, যার সঙ্গে হ্যামিলটন-কোম্পানির এই বড় সাহেবটির সম্পর্ক হা-ডু-ডুর চেয়ে নিকটবর্তী না হয়েছিল। কত রাজা-মহারাজা-নবাব-শেঠ-শাহএর সঙ্গে হীরে-জহরতের হাত-ফিরি করেছেন। ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে তৈরি করিয়েছিলেন বিরাট বাগানবাড়ি। সপ্তাহান্তে সেখানে প্রমোদভ্রমণের আয়োজন হত। পালতোলা প্রমোদতরী ভাসত গঙ্গার বুকে।

উনিশ শ' বাইশ-তেইশ সাল হবে। ব্যারাকপুরের বাগানবাড়িতে নৈশ ভোজের আসরে কে যেন কথাটা তুললেন—চল, একটু আউটিং করে আসা যাক। আউটিং? তা বেশ। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? ম্যাকেঞ্জি কোম্পানির বড়সাহেব বললেন—ভালকথা। আমাদের ওভারল্যাণ্ড ৯১ নূতন মডেল গাড়িগুলো সবে এসেছে। এঞ্জিনিয়ার বলছে এর চেয়ে কষ্টসহিষ্ণু মজবুত গাড়ি নাকি আজ পর্যন্ত কেউ বানাতে পারে নি। খুব একটা দুর্গম, রাস্তার নাম করুন দেখি। একবার বাজিয়ে নিই গাড়িটা।

নৈশভোজে উপস্থিত ছিলেন মিস্টার জেনকিন্স। বলেন—ওয়াণ্ট এ ন্যাস্টি রোড? দেন ড্রাইভ হেডলং টু বীয়ারকুল!

—বীয়ারকুল! সেটা আবার কোথায়?

জেনকিন্স বলেন, সেদিন পুরানো নথী-পত্র ঘাটছিলাম। হিকির গেজেটে দেখলাম কলকাতার কাছেই আছে বীয়ারকুল—দ্য ব্রাইটন অফ ক্যালকাটা!

সবাই কৌতূহলী হয়ে ঘনিয়ে আসে। জেনকিন্স বলেনঃ দাঁড়াও আমার ডায়েরিতে নোট করা আছে। দেখাই তোমাদের।

আনা হল গাড়ি থেকে সাহেবের নোট-বই। জেনকিন্স পড়ে শোনালেনঃ

Hicky's Gazette, May 1780: We are informed that the following persons of figure and consequences arrived at Beercool for the benefit of their health and han: Henry Grant Esq., and lady, and brother-in-law, Major Camac, Capt. Robinson of the Vellow, Dr. Allen (lately returned from Europe), Simeon Dronge Esq., with his lady and son and heir, Miss Burne, an extremely elegant and agreeable young lady.

স্নেইথ কৌতুক করে বলেন, কিন্তু খবরটা সংগ্রহ করতে বড্ড দেরি করে ফেললে যে জেনকিন্স! সুন্দরী মিস বার্নের সমুদ্রস্নান বোধ করি এতদিনে শেষ হয়ে গেছে।

গ্রীনফিল্ড হেসে বলেন—তা ঠিক। স্নান সারা না হয়ে থাকলেও লাভ নেই। ইতি-মধ্যে তাঁর বয়স আরও দেড়শ বছর বেড়ে গেছে। এখন আর সেই এগ্রিয়েবল্ মিস বার্নে তোমার কোন প্রপোজালে এগ্রি করলেও লাভ নেই—

ঘরসুদ্ধ সবাই হোহো করে হেসে ওঠেন। উত্তর চল্লিশ স্নেইথ সাহেব সেদিন ছিলেন অকৃতদার যুবক। তা সে যাই হোক, আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে কোন এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল ১৫ই অক্টোবর দুখানি ওভারল্যাণ্ড ৯১ গাড়িতে রওনা হয়ে পড়লেন ছয়জন উৎসাহী ইংরেজ। দলপতি এইচ গ্রীনফিল্ড, জে জেনকিন্স, জে এফ স্নেইথ, মিস্টার রিচ বীক্রফট এবং তদানীন্তন বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক ইংলিশ-

ম্যানের একজন সাংবাদিক। পথ যে এত দুর্গম তা ও'রাও আন্দাজ করতে পারেন নি। কিন্তু কঠিন উৎসাহ ইংরেজ অভিযাত্রীর—কঠিনতর জান ওভারল্যান্ড গাড়ির। জগন্নাথের রথের রশিতে সাদাকালোর ভেদ নেই। এক হাঁটু কাদায় নেমে মটোরগাড়ি ঠেলছে লালমুখো সাহেব আর নেংটি-সার গাঁয়ের লোক। ইংলিশম্যানে এ অভিযানের একটি বিবরণী বার হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ও'রা এসে পৌঁছালেন দীঘায়। সেখানে তখন তাঁরা একটিমাত্র পাকাবাড়ি দেখতে পেয়েছিলেন—সেচবিভাগের ডাকবাংলো। বর্তমান কালের স্নো-সেমিত দ্বিতল-বাড়িটির সঙ্গে সেদিনকার সেই ছোট্ট দু কামরা বাংলোর প্রভেদ দুস্তর। স্নেইথ সাহেবের জীর্ণ অ্যালবামে পীতাভ আলোক-চিত্র দেখে তবু বুঝতে পেরেছিলাম এই সেই। সমুদ্র উপকূলে বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দীর্ঘদিন পূর্বে এই বাংলোটি তৈরি করিয়েছিলেন পূর্তবিভাগ—সিপাহী বিদ্রোহেরও আগে, বোধ করি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে।

স্নেইথ তখন চল্লিশের কোঠায়। অকৃতদার কর্মঠ যুবাপুরুষ। দীর্ঘ ক্লান্তিকর পথ অতিক্রম করে এসে সেদিন দীঘাকে তিনি কী চোখে দেখেছিলেন জানি না, কিন্তু প্রথমদর্শনেই তিনি সুন্দরী দীঘার প্রেমে পড়ে গেলেন। পল্লবগ্রাহী দর্শনেন্দ্রিয়ের মোহগ্রস্ত প্রেম নয়—নিবিড় ভালবাসা। অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থি পড়ল তাঁর মনে। বীয়ারকুল নয়—দীঘা, সুইট দীঘা।

পরের বছর ঐ দুর্গম পথ অতিক্রম করে তিনি আবার এলেন দীঘায়। বালিয়াড়ির উপর বানালেন একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। অবসর পেলেই তিনি ফিরে ফিরে আসতেন সেখানে। কিন্তু নাঃ, কয়েক বছরের মধ্যেই খেয়াল চাপল দীঘাতে একটি পাকাবাড়ি বানাতে হবে। যে কথা সেই কাজ। প্রায় বাইশ বিঘা জমি নামমাত্র মূল্যে কিনে একটি দ্বিতল প্রাসাদ বানালেন। একদিনেই কিছু সবটা হয়নি: কিন্তু উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সালের পর থেকে প্রতি বছরই তিনি বছরের কয়েকটা মাস এখানে কাটিয়ে যান। ক্লান্তিকর পথের তোয়াক্কা রাখেন না। একটি ছোট প্লেন আছে। সমুদ্র-সৈকতে অনায়াসে ওঠে এবং নামে।

চল্লিশ বছর আগে ও'রা 'বীয়ারকুল, দি ব্রাইটন অফ ক্যালকাটা' চিহ্নমাত্র কেন খুঁজে পাননি ভাবছেন তো? সেদিনকার ইংলিশম্যান খুলে পড়লেই বুঝতে পারবেন। স্নেইথ সাহেবের অ্যালবামে পীতাভ বিবরণটি আমি দেখেছি। তদানীন্তন দীঘার যে বর্ণনা তাতে লেখা আছে তার তুলনায় সমুদ্র আরও এগিয়ে এসেছে মনে হয়। মনে হয় সেদিনের বীয়ারকুল আজ সমুদ্রগর্ভে। বন-বিভাগ তাই সমুদ্রতীরে ঝাউগাছের সারি রোপণ করেছেন। শুনলুম, গত দশ বছরে

সমুদ্র আর জমি গ্রাস করতে পারেনি। রাজা ক্যানিউট যা পারেন নি কর্মবিভাগ নাকি তাই পেরেছেন।

এই প্রসঙ্গে দীঘায়-শোনা একটা গল্প মনে পড়ছে। বছর দুই আগের কথা। কলকাতার একজন নামকরা উকিল কয়েক দিনের জন্য সপরিবারে দীঘায় বেড়াতে এসেছেন। সকলেরই ভাল লেগে গেল জায়গাটা। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে এখানে একটি ছোট্ট বাংলোবাড়ি বানিয়ে বাস করলে মন্দ হয় না। উকিল-গিন্নী বল্লেন—দ্যাখো না গো, একটু খোঁজ করে, জমি পাওয়া যায় কিনা।

বেশী পরিশ্রম করতে হল না। উকিলবাবু হাঁ করবার আগেই হাঁহাঁ করে ছুটে এল একজন—গলায় কণ্ঠি, গালে আঁচিল, খাটো ধুতি, হাতে ছাতি, মুখে অমায়িক হাসি। বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে—আমার নাম সাতকড়ি জানা আজ্ঞে (এখানে বলে রাখা ভাল নামটি কল্পিত। ঘটনাচক্রে দীঘাতে কোন বাস্তব সাতকড়ি জানার অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে মনে করতে হবে এ চরিত্রটির নাম ভজগোবিন্দ বটব্যাল)। ঠাকুরের নাম *পাঁচকড়ি জানা। হুজুর ঠিক যেমনটি চাইছেন ঠিক তেমনটি জমির সুলুক সন্ধান জানা আছে আমার। তবে এই, হাট-বাজারের লাগ-বরাবর হবে নি।

উকিল-গিন্নী বল্লেন—সেতো আরও ভাল, একটু নিরিবিলিই খুঁজছি আমরা। হাট-বাজার ট্রাম-বাসের ভিড় এড়াতেই তো আসা এখানে—

উকিল-তনয়া বল্লেন—বাজার দূরে হ'ক ক্ষতি নেই, সমুদ্র থেকে কত দূর?

—সে আপনি ভাববেন নি মাঠান, একেরে সমুদ্দুরের লাগ-বরাবর।

উকিলবাবু ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন ওদের।—তোমরা থাম দেখি। ব্যাপারটা আমাকে বুঝে নিতে দাও। জমিটা কোথায়, কতটা জমি, মালিক কে? শর্ত কি? দাম কত চাইছে? দলিলপত্র সব দেখাতে পারবে তো?

হাত দুটি কচলে একগাল হেসে সাতকড়ি বলে—উকিলবাবুরে জমি বেচাতি এইচি, দখিল দেখাব নি?

লালশালু মোড়া কাগজের বাণ্ডিল খুলে সে ছড়িয়ে বসে। সব আছে। মূল দলিল, খাজনার দাখিলা, সেটেলমেন্টের নক্শা, পর্চা, খতিয়ান—কী নেই? অভিজ্ঞ উকিলবাবু কাগজপত্র উল্টোপাল্টে দেখেন—না কোন গোল নেই। গত বছরও এই নামে খাজনা জমা পড়েছে। সন্ধ্যায় জমিও দেখিয়ে আনল সাতকড়ি। জনমানবহীন প্রান্তরে উ'চু টিলার উপর চমৎকার প্লট।

বলাবাহুল্য উকিলবাবু মোটা টাকায় জমি বায়না করে গেলেন।

গল্পের উপসংহারটি করুণ। জমির দখল নিতে এসে দেখেন, যে জমি তিনি দেখে গেছেন সে জমি দলিলবর্ণিত ভূখণ্ড নয়। দাগ নম্বর ধরে সন্ধান নিতে গিয়ে শোনেন গোটা মৌজাটাই সমুদ্রগর্ভে। অথচ বছর বছর খাজনা জমা পড়ছে সাতকড়ি জানার তরফে। সাতকড়ি জানা কে এবং সে কোথায় থাকে তা অবশ্য কেউ বলতে পারলে না।

বর্তমান দীঘা বছর আটেকের শিশু। ওয়ারেন হেস্টিংসের পর দুশ বছর পরে আবার একজন দীঘাকে আধুনিক-ঢঙে সাজাবার স্বপ্ন দেখলেন—তিনি ডাক্তার বিধানচন্দ্র। গড়ে উঠল ছোট্ট জনপদ। তৈরি হল খড়্গপুর থেকে পাঁচমোড়া সড়ক, সাত মাইল ব্রীজ, পিছাবনী সাঁকো। দীঘাতে গড়ে উঠল নানান ধরনের বাড়ি, বাজার, ব্যারিস্টারস্ কলোনী।

শহরের যেখানটা হতে পারত কলকাতার এসপ্ল্যানেড অথবা দার্জিলিঙের ম্যাল—যেখানে তৈরি হতে পারত গোপালপুর অথবা পুরী বি এন আর হোটেলের ঢঙে পূর্বভারতের শ্রেষ্ঠ সৈকতাবাস—সেখানে সর্বপ্রথমেই বানানো হল একটি বাজার। ছোট ছোট খুপরি, চাল-ডাল, সাবান-সোডা মায় রঙিন ফিতে এমন কি চারমিনার সিগারেটও পাবেন সেখানে! দীঘার হগ মার্কেট! উল্টো দিকে পূর্তবিভাগের ডাক-বাংলো। সুন্দর দেখতে। ছাদটি অভিনব। এ বাড়িটি কোনদিন দ্বিতল হবে না। এ ছাড়া আরও দুটি ডাকবাংলো আছে দীঘায়। একটি বনবিভাগের—অপরটি সেচ-বিভাগের। শেষোক্ত বাড়িটিই দীঘার সবচেয়ে প্রাচীন। কিন্তু এ সব ডাকবাংলো তো সাধারণের নাগালের বাইরে। তাদের জন্য আছে ছোট ছোট কটেজ। এক কামরা ও দু কামরার। ছোট হলেও ব্যবস্থা ভাল। প্রতি ঘরে গদিওলা দুটি করে খাট, আয়না, ফ্যান, টেবিল, চেয়ার, ইজিচেয়ার। জলের ব্যবস্থা, মায় রান্না করার উপযুক্ত বাসনপত্র। সন্ধ্যায় ভাড়া দিলে [illegible]
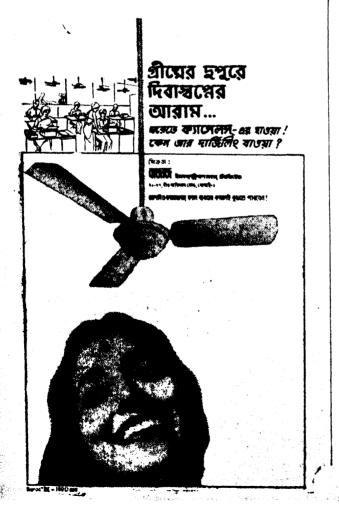
পাবেন। শীতকালে কম্বল। একটু খোঁজ নিলে রান্না-কন্না, বাসন-ধোওয়ার লোক পাবেন—দৈনিক চুক্তিতে। ঘরে বসেই বাজার করা যায়—মাছ, ডিম, ডাব, কয়লা, আর মুরগী। আর ঝামেলা যদি এড়াতে চান কাফেটারিয়ার সোজা অর্ডার দিয়ে দিন। ব্যবস্থা সবই আছে, কিন্তু আপনার বরাতে তা আছে কিনা জানতে হলে কোনও গ্রহাচার্যের কাছে প্রথমে আপনাকে কোষ্ঠীটা একবার বিচার করাতে হবে। তুঙ্গে বৃহস্পতি ছাড়া আপনি ঘরের অ্যালটমেন্ট পাবেন না। ঘর যত, দাবিদার তার চেয়ে বেশি। বছরে ন মাস। যথেষ্ট সময় হাতে রেখে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সাহেবের কাছে দরখাস্ত পাঠাতে হবে।

তবে হ্যাঁ, অবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। সমুদ্রতীরে, স্নেইথ সাহেবের বাড়ির দক্ষিণে তৈরি হচ্ছে বিশালায়তন 'সৈকতাবাস'। দ্বিতল বাড়ি। ভবিষ্যতে ত্রিতলও হবে। আপাতত চব্বিশটি এককাসন এবং ছয়টি দ্বৈতশয্যার কামরা থাকবে তাতে। থাকবে রেস্তোরাঁ, পাঠাগার ইত্যাদি। বনবিভাগের ডাকবাংলোর দক্ষিণে সম্প্রতি যে দুটি বাড়ি তৈরি হল তাতেও অনেক লোক থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এগুলি নিম্নবিত্তের। যাত্রিশালা বা ধর্মশালার ধরন। সস্তা। সে তুলনায় 'সৈকতাবাস' মধ্যবিত্তের উপযোগী। সম্প্রতি সরকার উচ্চবিত্তের তথা বিদেশী পর্যটকদের উপযোগী একটি ট্যুরিস্ট লজ তৈরি করার বায়বরাদ্দ মঞ্জুর করেছেন। এ বাড়িটি খুবই উন্নতমানের হবে বলে মনে হয়। আপাতত বারোটি দ্বৈতশয্যার ঘর থাকবে তাতে। এ ছাড়া ছাত্র ও শিল্পাঞ্চলের মেহনতি মানুষদের জন্য পৃথক আবাস তৈরি হবার কথাও প্রায় পাকা। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সরকারী উদ্যোগে একটি নতুন কলোনী গড়ে তোলার পরিকল্পনাও আছে। এতদিনে সেখানে সারি সারি বাড়ি তৈরি হয়ে যাবার কথা। কেন হয় নি, সে কথা থাক। আজ আমার ভূমিকা সঞ্জয়ের, বিকর্ণের নয়।

শত-তরঙ্গভঙ্গে সাগর বাংলার বন্দনা রচনা করে। অথচ দুর্ভাগ্য বাঙালীর, সমুদ্রদর্শন করতে এতদিন তাকে যেতে হত প্রতিবেশী রাজ্যে। এ দীর্ঘদিনের অভাব মোচন করেছে দীঘা। দেখবার জিনিস ওখানে আর কিছু নেই। শুধু সমুদ্র, সমুদ্র, আর সমুদ্র। নেই জগন্নাথের মন্দির, কোনারক, উদয়গিরি। যাঁরা ওস্তাদ সাঁতারু নন, তাঁরা পুরীর তুলনায় দীঘাতে স্নান করে বেশী আরাম পাবেন। দীঘাতে আর একটি জিনিসের অভাব বড় দাগা দেয়। ঝিনুক। পুরীতে দেখেছি ছেলেবুড়োর দল নিরন্তর ঝিনুক কুড়াচ্ছে। সে দৃশ্য দীঘায় দেখতে পাবেন না।

ফিরে আসার আগে অশীতিপর দীঘা-জনকের সঙ্গে দেখা করে এলুম। আমি সাহিত্যসেবী শুনে সাদরে আপ্যায়ন করলেন। অনেকদিনের পুরানো গল্প শোনালেন, দুর্লভ ফটোর অ্যালবাম দেখালেন। বক্রেশ্বর তীর্থে সেবার একজন টিপিক্যাল ভারতীয় বৃদ্ধের ভিতর দেখেছিলুম গত শতাব্দীর ধর্মবিশ্বাসকে—দীঘাতে এবার একজন টিপিক্যাল ইংরেজ বৃদ্ধের ভিতর দেখলুম গত শতাব্দীর কর্মবিশ্বাসকে। চোখ গেছে, কান গেছে—তবু নিরলস-নিষ্ঠায় কাজ করে চলেছেন অশক্ত-দার বৃদ্ধ-যুবা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন সব। যাঁরা ছিল ও'র শেষজীবনের সহচর—বেয়ারা, আর্দালী, স্টুয়ার্ড তাদের জন্য বাড়ি তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছেন। দুঃখ করে বললেন—ঐ যে বাড়িটা উঠছে আমার বাড়ির দক্ষিণে, ওর নাম সৈকতাবাস। ওটা তৈরি হয়ে গেলে আর বাড়ি বসে সমুদ্রকে দেখতে পাব না।

দৃঢ়তার সঙ্গে বললুম—না! আপনার বাড়ির দ্বিতলের বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখা যাবে তা সত্ত্বেও।

—যু থিংক্ সো? আমার আন্দাজ জানতে চাইলেন উনি।

কোন্ লজ্জায় বলব—এ আমার আন্দাজ নয়, নিজে হাতে পরখ করা সত্য।

কত গাছ পুঁতেছেন, কত অভিনব পরিকল্পনা আছে তাঁর—সব জানালেন। বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় বললুম—ঐ উঁচু টিলার উপর বাঁধানো চতুষ্কোণ চাতালটা কিসের?

বৃদ্ধ একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। চোখ থেকে পুরু কাঁচের চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে থাকেন। সঙ্গে ছিলেন অরুণবাবু—তিনিও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছেন মনে হল। কি হল? অশোভন কোন প্রশ্ন করে বসেছি নাকি? ওটা কি ও'র কোন প্রিয়জনের সমাধি? কিন্তু কার? অকৃতদার বৃদ্ধ স্নেইথের মনের তন্ত্রীতে হঠাৎ এমন আঘাত লাগল কিসে?

অরুণবাবু তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলেন—স্নেইথ সাহেব দীঘায় এসে ঐ টিলার উপরেই প্রথম খড়ে-ছাওয়া কুটিরখানি নির্মাণ করেন, তাই—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে তিনি আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে বেরিয়ে এলেন গেট দিয়ে। ভাল করে বিদায় নেবার সুযোগও পেলুম না।

বাইরে এসে বলি—ব্যাপার কি? ওটা কি কারও কবর?

বিচিত্র হেসে অরুণবাবু বলেন—বর্তমানের নয়, ভবিষ্যতের।

ঃ তার মানে?

ঃ তার মানে আজ ঐ চতুষ্কোণ পাথরখানার নীচে কেউ শুয়ে নেই—কিন্তু একজনের নির্দেশ—ঐ পাথরখানি খুঁড়ে ফেলে তাঁকে ঐ সমুদ্র-সৈকতেই অন্তিমশয্যায় শুইয়ে দিতে হবে।

পিছন ফিরে দেখি সমুদ্রের পটভূমিকায় এক বৃদ্ধের সিল্যুয়েৎ। সমুদ্র-প্রেমিক। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের দিকে, না টিলার উপর ঐ চতুষ্কোণ পাথরখানার দিকে? পকেট থেকে রুমাল বার করে, মনে হল, চশমার কাঁচটা আবার মুছলেন। চশমা? না আর কিছু?

এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই দৃশ্যটা। সান্ধ্য-আকাশের পটভূমিকায় সমুদ্রের পশ্চাৎপটে দাঁড়ানো লাঠি-ভর এক বৃদ্ধের সিল্যুয়েৎ। দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী।

বেগম মেরী বিশ্বাস

বিমল মিত্র

॥ ২০ ॥

রোজ রাত্রে যে-শব্দগুলো চেহেল-সতুনের ভেতরে তোলপাড় করে বেড়ায়, যে-ভাবনাগুলো হারেমের হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সারা বাঙলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তার খবর এ-কদিনেই পেয়ে গেছে মরালী। নজর মহম্মদ যতই পাহারা দিক, পীরালি খাঁ যতই তদারক করুক, মরালীকে আর কেউ আটকে রাখতে পারেনি চারটে দেয়াল আর একটা ছাদের জেলখানায়।

মরালী জেনে গেছে সে হাতিয়াগড়ের রানীবিবি আর নয় আজ, সে এখন লস্কর-পুরের তালুকদার কাশিম আলির লেড়কি মরিয়ম বেগম। তাকে সবাই জিজ্ঞেস করেছে—তুমি কেন মরতে এলে ভাই এখানে?

মরালী বলেছে—এখানে এলে খুব যে আরাম শুনেছিলুম—

—ছাই, ছাই! ছাই আরাম—নবাবের নিজের মাসী, তার দুর্দশা যদি দেখ—

—ঘেসিটি বেগম?

—হ্যাঁ, ওর ডাক নাম মেহেরুন্নিসা, আমাদের এখানে পীরালি খাঁ আছে খোজা সর্দার, সে বলে মতিঝিলের বেগম—

—কেন?

—মতিঝিল তো ঘেসিটিবিবিই বানিয়েছিল কিনা। নবাব মতিঝিল থেকে গ্রেফতার করে এনে এখানে নজরবন্দী করে রেখেছে। আমাদের কারোর সঙ্গে দেখা করতে দেয় না, আমাদের কারোর সঙ্গে মিশতে দেয়না—ঘেসিটিবিবি বড় কষ্টে আছে ভাই—।

মরালী জিজ্ঞেস করে—তুমি বুঝি হিন্দু? তুমি কী করে এখেনে এলে?

গুলসন বেগম বলে—আমি কি ভাই নিজে সখ করে এসেছি তোমার মত? আমাকে পায়দায় টেনে এনেছে। ওই যে মেহেদী নেসার সাহেব, চেনো তো?

—না?

—সে কি, মেহেদী নেসার সাহেবের নামই শোন নি? ওই বেটাই তো সব। নবাব শুধু নামে নবাব। নবাবের ইয়ার-বক্সীরাই তো ছারখার করে দেবে সব। আমার ভাই বর আমাকে নিত না—আমি বরকে সেই বিয়ের রাত্তিরে যা একটুখানি দেখেছিলুম, তারপর আর আসেনি আমাদের বাড়িতে, কেবল বাবার কাছে টাকা চাইত। আমার বাবা টাকা কোথায় পাবে—টাকা তো চাইলেই কেউ দিতে পারে না? বাবা তো পুজোরি বামুন—যজমানরা টাকা দিলে তবে তো বাবা হাতে পাবে—

—তোমরা বামুন নাকি

অদ্ভুত মেয়ে ওই গুলসন বেগম। বামুনের মেয়ে, কিন্তু চেহারা দেখলে আর চেনাই যায় না। বেশ নাকে বেশর, কানে কণকচুড়, মাথায় মুসলমান মেয়েদের মত জরির ফিতে বাঁধা বেণী, চোখে সুর্মা, ঠোঁটে আর আঙুলের নখে মেহেদী রং, বুকে কাঁচুলী, পরনে পুটিদার ঘাগরা। বোঝাই যায় না যে গুলসন বামুনের মেয়ে।

—তারপর পুকুর-ঘাটে একদিন চান করছিলুম ভাই, হঠাৎ কোথেকে কে একজন এসে মুখে গামছা পুরে দিয়ে একেবারে চ্যাংদোলা করে তুলে এখানে নিয়ে এল। এসে কলমা পড়িয়ে জাত নিয়ে নিলে। তারপর কোথায় রইল বাবা, আর কোথায়ই বা রইল মা, ছোট-ছোট বোনগুলোর জন্যে বড্ড মন-কেমন-করে ভাই—

বলতে বলতে হয়ত গুলসনের বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। চোখ দুটো মুছে নেয় ওড়না দিয়ে। বলে—এই তো জষ্টি মাস, জষ্টিমাসে আমরা ভাই বোনরা মিলে আম কুড়োতে যেতুম, সে যে কত আম ভাই, তোমাকে কী বলবো। এক-একটা আম কী মিষ্টি যে কী বলবো। পাথর বাটিতে আম আর কাঁঠালের রস করে সেই খেতাম পান্ত ভাত দিয়ে, এখানে এত কালিয়া-কাবাব-কোপ্তা খাচ্ছি, কিন্তু সে-রকম তার আর পেলাম না।

তারপর বলে—এতদিন রইছি ভাই এখেনে, কিন্তু তবু সে-সব কথা ভুলতে পারিনি। আচ্ছা তুমিই বলো না ভাই, ভাই-বোন-বাপ-মার কথা কেউ কখনও ভুলতে পারে—? তাই সেদিন যখন শুনলুম যে নাকি আর একজন মেয়ে আসছে এখেনে, শুনে ভাবলুম, আবার বুঝি কোন মেয়ের কপাল ভাঙলো—। তখন থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছি—

—কার কাছে শুনলে আমি আসছি?

গুলেসন বললে—এখানে ভাই কেউ কি কিছু বলে? কেউ কাউকে কিছু বিশ্বাস করে না, সবাই ভাই সবাইকে সন্দেহ করে। নানী-বেগম পর্যন্ত......

—নানী-বেগম কে?

—ওমা, নানী-বেগমকেই চেনো না? নানী-বেগমই যে এখানকার বেগমদের মাথা। নবাবের নানী কিনা, ভাই তাকে সবাই নানী-বেগমসাহেবা বলে ডাকে।

—নবাবের নানী মানে?

—নানী বলে এরা দিদিমাকে। আমরা যাকে বলি দিদিমা, তাকেই এরা বলে নানী। প্রথম-প্রথম ভাই আমিও এদের কথাবার্তা বুঝতে পারতুম না। যা খেতুম গা-বমি-বমি করতো। এত ঝাল-গরম-মশলা তেল-ঘি দিয়ে রাঁধে যে মুখে কিছু রুচতো না। শেষকালে আস্তে আস্তে সব অব্যেস হয়ে গেল। তা তুমি খেতে পারছো? তোমার অসুবিধে হচ্ছে না?

মরালী বললে—না—

—তা এখন তো পাবেই না, কিন্তু কেরমে-কেরমে সব সহ্য হয়ে যাবে।

মরালী হঠাৎ বললে—আচ্ছা, এখানে গান গায় কে?

—ওমা, গান তো সব্বাই গায়। গান যে শিখতে হয় আমাদের। তোমাকেও শিখতে হবে। গানের ওস্তাদজী আসে যে গান শেখাবার জন্যে—

—কিন্তু আমি তো গান কখনও গাইনি।

—গান না পারলে বাজনা শেখাবে। সেতার শেখাবে। বীণ্ শেখাবে। ওস্তাদজী যে সব বাজনা বাজাতে পারে ভাই। তারপর নাচতে পারলে আরো ভালো হয়—নাচ যদি একবার শিখতে পারো ভাই তো তখন তুমি একেবারে নবাবের পেয়ারের বেগম হয়ে যাবে—তখন আর তোমাকে পায় কে! এখানে তো সব্বাই তাই নবাবের পেয়ারের বেগম হতে চাইছে—

গুলেসন বেগমের কথা বেশি বলা স্বভাব। যখন বকে যায় তখন আর রাশ থাকে না মুখের।

মরালী বললে—আর রোজ কাঁদে কে? রাত্তিরে যে প্রায়ই কান্না শুনতে পাই—

—ও পেশমন। ওর কথা আর বোল না—

—কেন? কী হয়েছে ওর? কেন কাঁদে?

—ও ভাই তোমার মতই মুসলমানের মেয়ে। ওরা পাঠানী মুসলমান। ওর এক বিচ্ছিরি রোগ হয়েছে—

রোগের নাম শুনেই মরালী চমকে উঠলো। আহা গো!

—সে বড় বিচ্ছিরি রোগ ভাই। দেখলে তোমারও মায়া হবে। যন্ত্রনা যখন হয় তখন আর চেপে রাখতে পারে না, খুব চেঁচায়—

—তা কবিরাজকে দেখায় না কেন?

—কবিরাজকে দেখায় না ভাই। এরা হেকিমী দাওয়াই এনে দেয়। কিন্তু আমি বলছি ভাই ও-রোগ ওর সারবে না। ও রোগ একবার হলে আর কারো সারে না।

—রোগটা কী?

গুলেসন বলে—এরা বলে সুজাক। এরা বলে মালেখ্‌খুলিয়া দিমাগী। ও সব মুসলমানী রোগের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি নে ভাই। তুমি যদি তাকে দেখ তাহলে তোমারও কান্না পাবে। আমি বলি আসলে ভাই ওরই দোষ!

—কেন?

—দোষ নয়? তোর সকলকে টেক্কা দেবার দরকার কী ছিল? এতগুলো বেগম রয়েছে, তারা আগে না তুই আগে? ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাওয়ার দরকার কী ছিল শুনি? তা ছাড়া ভাই নবাবের নিজের সাদি করা বউও তো রয়েছে। তার মনে কষ্ট দিলে তোর কি ভাল হয় কখনও? বলো ভাই, তুমিই বলো।

মরালী এ-সব কথা অবাক হয়ে শোনে। এ এক বিচিত্র জগৎ। এ-জগতের খবর এতদিন সে জানতোই না একেবারে। এই জগতের মধ্যে এতগুলো মেয়ে এসে জমা হয়েছে। এদের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না সমস্তই যেন একজন পুরুষকে কেন্দ্র করে। সেই মানুষটির কাছে কে কেমন করে সকলের চেয়ে প্রিয় হবে সেইটেই এদের একমাত্র সমস্যা। কে গান শুনিয়ে তাকে মুগ্ধ করবে,
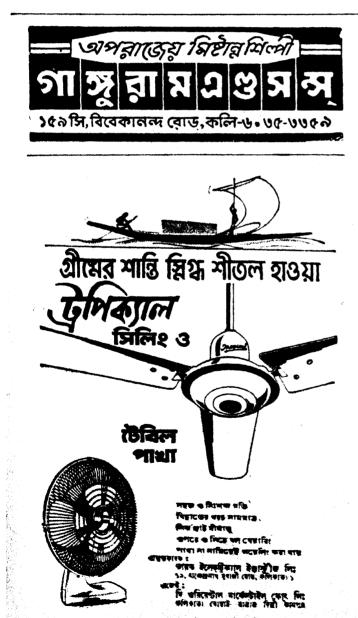
কে নেচে তাকে নিজের তাঁবে আনবে, তারই প্রতিযোগিতা চলে দিনরাত। গুলসন-এর কাছে সব গল্প শুনে শুনে এই ক'দিনের মধ্যেই মরালীর সব চেহেল-সতুনটা যেন দেখা হয়ে গিয়েছিল। সে যেন চোখ বুজেই বলে দিতে পারে কোন্ দিকে নানী-বেগম থাকে, কী করে। বলে দিতে পারে লুৎফা বেগম-এর রাত কাটে কেমন করে। পেশমন বেগম কেন কাঁদে। বব্বু বেগম কেন অত মন দিয়ে গান শেখে, তক্কি বেগম কেন নাচ শেখে মন প্রাণ দিয়ে। একদিন এমনি করেই যদি নবাবের নজরে একবার পড়ে যেতে পারে কেউ তো তখন তাকে আর কে পাবে? তখন মতিঝিলের মত তার একটা বাড়ি হবে, তখন তার জন্যে সাজাহানাবাদ থেকে হীরের গয়না আসবে, জয়পুর থেকে সাচ্চা মোতির মালা আসবে। তখন রুপোর বদলে সোনার গেলাসে সে সরবৎ খাবে। তখন তার খেদ্‌মত্ করবে দশটা খোজা, বিশটা বাঁদী। তখন আর তাকে নানী বেগমের ধমক্ খেতে হবে না, তখন সে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে হুকুম করবে সবাইকে।

—এই যে তোমার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে গল্প করতে আসি না, নজর মহম্মদ যদি জানতে পারে তো আমাকে আর আস্ত রাখবে না ভাই, তাই রাত্তির বেলা লুকিয়ে ছাপিয়ে আসি!

—কেন? আমি কী দোষ করেছি? আমাকে মিশতে দেয় না কেন তোমাদের সঙ্গে?

গুলসন বলে—ও প্রথম-প্রথম আমাদেরও ওই রকম কারোর সঙ্গে মিশতে দিত না, পোষ মানাবার চেষ্টা করতো। তা এখেনে পোষ না-মেনে তো উপায়ও নেই ভাই। পোষ না-মেনে করবোই বা কী! আর তো করবারও কিছু নেই আমাদের—সারাজীবন যখন এখেনেই কাটাতে হবে তখন সব কিছু মেনে নেওয়াই ভালো—

—সারাজীবন কাটাতে হবে? সারাজীবন আর কোথাও বেরোতে পারবো না?

গুলসন বলে—সেই জন্যেই তো এখেনে এলে সব্বাই নেশা করে—

—তুমিও নেশা করো?

—হ্যাঁ, নেশা না-করলে যে ভাই থাকা যায় না। দম আটকে আসে। আমরা যে বেঁচে আছি এটা যে ভুলতে পারি নে। সেটা ভোলবার জন্যেই তো নেশা করি। তুমিও ভাই দেখো, ঠিক নেশা ধরবে, তুমিও একদিন নেশা না-করে থাকতে পারবে না—আমাদের মত—

—কী নেশা করো?

গুলসন বললে—নেশা কি আর এক-রকমের ভাই। হাজার-রকমের নেশা আছে। আফিম, চরস, কত কী! এক রকম সাপের বিষ আছে......

—সাপের বিষ!

—সে সাপের বিষ খেলে মরবে না, কিন্তু অসাড় হয়ে পড়ে থাকবে দু'দিন। সেটা খেলে খুব আরাম, আমি একবার খেয়েছিলুম—

মরালী জিজ্ঞেস করলে—এ সব নেশার জিনিস কোত্থেকে আসে?

—এ সব খোজারা এনে দেয়। নানী-বেগম জানতেও পারে না। জানলে অনাচ্ছিষ্টি করবে। পীরখাঁ খাঁ, নজর মহম্মদ, বরকত আলি ওরা লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের সব যোগায়—

—ওরা কোত্থেকে পায়?

—সে ভারি মজার ব্যাপার। চেহেল-সতুনের বাইরে চক্-বাজার বলে নাকি একটা জায়গা আছে, সেখানে সারাফাত আলি বলে এক বুড়োর দোকানে ও-গুলো কিনতে পাওয়া যায়। আসলে গন্ধ-তেলের দোকান, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে এই সব বিষ বেচে সে। নজর মহম্মদ তোমাকে আরকের কথা বলেনি?

মরালী বললে—হ্যাঁ, প্রথম দিনেই তো বলেছিল আরক চাই কি না—

—ওই তো! ওর নামই তো বিষ। ওই বিষ খাইয়ে খাইয়েই তো আমাদের পোষ মানায়। নইলে তো কান্নাকাটি করে প্রথম-প্রথম সবাই ভাসিয়ে দেয়। তারপরে যখন নেশাটা ধরে তখন যা বলবে তাই করতে হয়। তাই করতে ভালোও লাগে। প্রথম-প্রথম ভাই আমারও লজ্জা করতো। লজ্জা লাগবে না? তুমিই বলো? সবে গাঁ ছেড়ে এসেছি, গায়ের

কাপড় টানাটানি করলে লজ্জা লাগবে না? চেনা-নেই শোনা-নেই অচেনা পর-পুরুষের সামনে খালি-গা হওয়া যায়?

মরালী জিজ্ঞেস করলে—কে? পর-পুরুষ কে?

গুলসন উত্তর দিতে যাচ্ছিল কিন্তু হঠাৎ ওদিকে বোধহয় কার পায়ের শব্দ হলো। শব্দ হতেই গুলসন্ ফস্ করে সরে গেছে। যাবার সময় বলে গেল—বোধহয় নজর মহম্মদ আসছে, আমি ভাই পালাই, কাল আসবো আবার—

অন্ধকারে বাইরে সত্যিই পায়ের শব্দ হয়েছিল। মরালী অতটা টের পায়নি। কিন্তু গুলসনের কান সজাগ।

সে এমন করে পালিয়ে গেল যে, মরালীও যেন হঠাৎ বুঝতে পারলে না কখন পালালো। আর ঠিক তার পরেই নজর মহম্মদ ঘরে ঢুকেছে—কসুর মাফ কীজিয়ে বেগমসাহেবা।

বলে তিনবার কুর্ণিশ করলে মাথা নিচু করে করে।

মরালী কোনও উত্তর দিলে না। নজর মহম্মদ নিজেই জিজ্ঞেস করলে বেগম-সাহেবার কিছু তখ্‌লিপ হয়েছে কিনা। সরবৎ পান কিমাম জর্দা কিছু দরকার কি না। আরক জরুরৎ আছে কি না। বাঁদী কিছু কসুর করেছে কি না। হাজারো রকমের বাঁধা প্রশ্ন। এ ক'দিন ধরে মরালী দেখে আসছে এমনি করে কথা বলাই এদের রেওয়াজ। এর উত্তর তারা চায় না, এর উত্তর তারা হয়ত আশাও করে না। এতদিন ধরে এখানে এই একঘেয়ে দিন কাটানোর সময়ে কারো সংগে মরালী কথাও বলেনি। ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার চেষ্টাও করেনি। চেষ্টা করলেই কোত্থেকে নজর মহম্মদের আবির্ভাব হয়েছে, আর অন্য কোথাও যেতে মানা করেছে। ভোর বেলা সূর্য ওঠাটা টের পাওয়া যায় রোদ দেখলে। তারপর কোথাকার কোন্ মসজিদ থেকে আজানের টানা টানা সুর কানে এসেছে। আর কানে এসেছে নহবতের রাগ-রাগিণী। ছোটমশাইএর বাড়িতেও আগে নহবত বাজানো হত। পরে আর হত না। তারপর একটা বাঁদী আসে। বেশি কথা বলে না বাঁদীটা। হয়ত বোবা। সোজা নিয়ে যায় গোসলখানায়। সে মরালীর গায়ে কী রকম তেল মাখিয়ে দেয়। প্রথম প্রথম লজ্জা করত মরালীর। কিন্তু বাঁদীটার লজ্জা-সরম কিছু নেই। সে তেলটা মাখিয়ে গা-শরীর-পা সর্বাঙ্গ মালিশ করে দেয়। তারপর গরম জল দিয়ে ঘষে ঘষে গা-হাত-পা পরিষ্কার করে দেয়। তারপর চুলে তেল মাখায়। চুলটা নিয়ে কসরৎ করতেই বেশি সময় লাগে তার। তারপর শরীরটা আগা-পাশ-তলা মুছিয়ে দিয়ে নতুন কাচা পোশাক পরিয়ে দিয়ে ঘরে আনে। চুলটা হাওয়া দিয়ে দিয়ে শুকোয়। তখন আসে নাস্তা। ফল, বাদাম, দুধ, মাখন।

ও-সব খেতে ভালো লাগে না মরালীর। এরা মুড়ি-চিঁড়ে দিলে বোধ হয় বেশি ভালো লাগত তার। কিন্তু কে বলে সে সব কথা। তারপর সেই খাওয়ার পরই আসে পান, জর্দা কিমাম, তাম্বুল-বিহার, এলাচ, লবঙ্গ। তারপর পাশার ছকটা নিয়ে এসে মরালীকে পাশা খেলায় ভুলিয়ে রাখতে চায়। মরালী বলে—না, তুমি যাও এখন, আমি পাশা খেলব না—

এমনি করেই দিন কাটাতে কাটাতে হঠাৎ একদিন ওই গুলসন্ মেয়েটা এসে আলাপ করে গিয়েছিল লুকিয়ে লুকিয়ে। তারপর থেকে ফাঁক পেলেই চলে আসে। এসে নানারকম গল্প শোনায়। এই চেহেল্-সুতুনের গল্প। এই নবাব আর নবাবজাদীদের গল্প। শুনতে বেশ লাগত মরালীর। আর হঠাৎ কারো পায়ের শব্দ শুনলেই কোথায় কোন্ সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে সুড়ুৎ করে পালিয়ে যেত।

নজর মহম্মদ চলে যাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ নহবৎখানা থেকে অসময়ে নবৎ বেজে উঠলো।

মরালী অবাক হয়ে গেল। এ সময়ে তো কোনওদিন নবৎ বাজে না। জিজ্ঞেস করলে—নবৎ বাজছে কেন এই অসময়ে?

—খবর এসেছে জাঁহাপনা কলকাতার লড়াই ফতে করে দিয়েছে। কলকাতার নাম বদলে আলীনগর রাখা হয়েছে, কলকাতায় আগ্ লাগিয়ে দিয়েছে জাঁহাপনা। ফিরিঙ্গি লোগ ভি কলকাতার কেল্লা ছেড়ে ভেগে পালিয়েছে।

মরালী জিজ্ঞেস করলে—তাই বুঝি খুব খুশী হয়েছে মুর্শিদাবাদের লোক?

—জী বেগমসাহেবা! মেহেদী নেসার সাহেব হুকুম ভেজিয়েছে আলীনগর থেকে মুর্শিদাবাদের লোককে খবরটা ওয়াকিবহাল করতে!

—ও!

নজর মহম্মদ তবু নড়লো না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তবু।

মরালী জিজ্ঞেস করলে—জাঁহাপনা কি এইবার মুর্শিদাবাদে ফিরে আসছেন?

—জী বেগমসাহেবা! ওর তিন-রোজের ভেতরেই ফিরে আসছে—

এবার মরালীর বুকটা যেন কেমন কেঁপে উঠল। এতদিন বেশ ছিল মরালী। কিন্তু এবার? এবার যদি নবাবের সামনে যেতে হুকুম করে? এবার যদি পরীক্ষা দিতে হয় তাকে!

—বেগমসাহেবা, একটা কথা ছিল!

মরালী মুখ তুলে তাকাল।

—একঠো জওয়ান ছোকরা বেগমসাহেবার সঙ্গে মুলাকাত করতে চায়—

—কে সে? আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কেন?

—বান্দা তা কিছু জানে না বেগমসাহেবা। তার বড় জরুরী কাম আছে বেগমসাহেবার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে কাজ আছে? আমার সঙ্গে তার কী কাজ থাকতে পারে? কে সে?

—বান্দা তা জানে না বেগমসাহেবা। জওয়ান না-ছোড়বান্দা। বেগমসাহেবার সঙ্গে তার জান-পছান আছে। বেগমসাহেবাকে হাতিয়াগড় থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল এখানে।

মরালী নিজেকে সামলে নিলে। মুখে বললে—কে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল আমি জানি না। কারো সঙ্গে আমার চেনা-জানা নেই। আমি কারো সঙ্গে দেখা করবো না এখন। তুমি তাকে বলে দিও। বলে দিও এখানে পুরুষমানুষের আসা-যাওয়ার নিয়ম নেই।

—জী, বেগমসাহেবা। আমি তাহলে তাকে তাই-ই বলে দেব।

—হাঁ, তাই বলে দিও—

নজর মহম্মদ তবু দাঁড়িয়ে রইল। ফিরতে গিয়েও তার ফেরা হলো না। তারপর সোজা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—বেগমসাহেবা, আপনি যদি তার সঙ্গে মুলাকাত করতে চান তো কেউ জানতে পারবে না। কৌয়া-চিড়িয়া ভি টের পাবে না। আমি খুদ্ এখানে দাঁড়িয়ে পাহারা দেব, কোনও গুণাহ্ হবে না—

মরালী কী বলবে বুঝতে পারলে না। নজর মহম্মদ কি তাকে পরীক্ষা করছে! শেষকালে যদি কোনও বিপদ হয়। গুলসনকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হত। সে কিছু পরামর্শ দিতে পারত। মরালীর সমস্ত শরীরটা [illegible] থর থর করে কাঁপতে [illegible]। এমন যে [illegible] হবে তা তো ভাবতে পারেনি [illegible]। সে যদি ধরা পড়ে! যদি কোতল্ হয়, [illegible]! মরালীর জন্যে [illegible] যদি কোনও ক্ষতি হয়!

মনের কথাও যেন নজর মহম্মদ বুঝতে পারলে। বললে—কোনও ডর নেহি বেগমসাহেবা, বান্দা তো জিম্মাদার রইল—

বলেই চলে যাচ্ছিল। যাবার সময় বললে—বান্দা এখুনি তাকে এত্তেলা দিচ্ছে—

—এখুনি? এত রাত্তিরে?

কিন্তু নজর মহম্মদ ততক্ষণে ঘরের বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এখুনি হয়ত কান্তকে ডেকে নিয়ে আসবে। এলে কী বলবে মরালী! কী বলে কথা আরম্ভ করবে!

লুকিয়ে লুকিয়ে আবার গুলসন্ এসে এসে হাজির।

—কী বলছিল ভাই নজর তোমাকে? আরক খেতে বলছিল বুঝি? খবরদার, খবরদার আরক খেও না যেন ভাই তুমি। ও একেবারে সর্বনেশে বিষ। একবার ধরেছ কি আর তোমার ছাড়ান-ছোড়ন নেই। কিছুতেই খেও না তুমি। যে খেয়েছে সে-ই পস্তাচ্ছে। যদি জোর করে খাওয়াতে আসে তো নানী-বেগমকে বলে দেবে, বুঝলে? নানী-বেগম ওসব পছন্দ করে না মোটে!

মরালী বললে—না, আরক নয়......

—আরক নয় তো কী? পান? পানও খেও না তুমি ওদের হাত থেকে। পানের খিলি নিজে সেজে খাবে, নইলে পানের

খিলির ভেতরেও ওই সব বিষ পুরে দেয় পোষ মানাবার জন্যে।

—না পানও নয়। আমি বুঝতে পারছি না ভালো করলুম কি মন্দ করলুম।

—কেন? কী হয়েছে কী?

—নজর মহম্মদ বলছিল কে-একজন নাকি দেখা করতে চায় আমার সংগে। তাকে এখানে নিয়ে আসবে। আমি প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। বলেছিলুম—না আনতে হবে না। কিন্তু আমার কথা শুনলে না, তাকে ডেকে আনতে গেল—

—সর্বনাশ করেছে। লোকটা কে? কী জন্যে দেখা করবে?

—তা জানি না।

—তাহলে এখ্খুনি গিয়ে মানা করে এসো ভাই। তোমাকে বিপদে ফেলবে। ওরা ওই রকম করে প্রথম প্রথম পরখ করে নেয়। ওরা দেখে কী রকম চরিত্তিরের মেয়ে তুমি। তুমি যদি একবার বলে দাও হ্যাঁ, তখন পেয়ে বসবে, তখন তোমাকে নিয়ে যা-তা করবে। তুমি এখ্খুনি গিয়ে মানা করে এসো—

মরালী বললে—কিন্তু ও যে চলে গেল—

—তুমি দৌড়ে যাও না। এখনও সময় আছে। যাও—যাও—ও-সব ওদের ছল, ওই করে ওরা পোষ মানায়, একবার ওদের হাতের কব্জার মধ্যে পড়ে গেলে তখন তুমি একেবারে মরবে—যাও—

মরালী কী করবে বুঝতে পারলে না। তারপর বেরোল ঘর থেকে। যে-দিকে নজর মহম্মদ গেছে সেই দিক লক্ষ্য করেই বেরোল। তারপর অন্ধকার পেরিয়ে একবার চিৎকার করে ডাকতে চেষ্টা করলে—নজর মহম্মদ—নজর মহম্মদ—

কিন্তু মরালীর গলা দিয়ে এতটুকু শব্দ বেরোল না। তার মনে হলো কে যেন তার গলা টিপে ধরেছে। সেই অন্ধকার চেহেল-সুতুনের ভুল্-ভুলাইবার মধ্যে দাঁড়িয়ে সে যেন দিশেহারা হয়ে গেল।

কলকাতার অন্ধকার কেল্লার ভেতরে দাঁড়িয়েও নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাও যেন দিশেহারা হয়ে গেছেন। পেছনে রাজা মানিক চাঁদ, মীরজাফর, তারাও দাঁড়িয়ে। হাতে হাত-কড়া বাঁধা হল্‌ওয়েল সঙ্গে। হলওয়েল সাহেব পালাতে পারেনি শেষ পর্যন্ত! ফিরিঙ্গি মেমসাহেবরা ভয়ে গিয়ে লুকিয়ে ছিল একটা গুদাম ঘরের মধ্যে। ওদিকে লুঠ-পাট চলেছে, কেউ পেয়েছে ঘড়ি, কেউ বোতাম। কেউ বগলস্। কিছুই বাদ দেয়নি সেপাইরা। চাপা কান্নার শব্দে সমস্ত কেল্লাটা যেন গুম-গুম করছে। এতদিন যে আক্রোশ বাংলার ইতিহাসের দরজায় মাথা কুটছিল দিন-রাত, তা যেন আজ চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেল। ফিরিঙ্গিদের সাধের কলকাতা তখন পুড়ছে। বির্জিতলা, দর্জিপাড়া, গোবিন্দপুর, বাদাম-তলা থেকে শুরু করে ক্যাপ্টেন পেরিন সাহেবের বাগানের পাশের বারুদখানাটাও বাদ যায়নি। সেই আগুনের মধ্যেই ষষ্ঠীপদ এধার থেকে ওধারে দৌড়চ্ছে। আমিচাঁদ সাহেবের বাড়িতেই বেশি টাকা থাকা সম্ভব। সেদিকটাতেই দৌড়ে গেল ষষ্ঠীপদ।

কিন্তু বাড়ির সামনে গিয়ে হতবাক। আমিচাঁদ সাহেবের দরোয়ান জগমন্ত সিং সেখানে সব কিছু জড়ো করেছে। আমিচাঁদের বাড়ির জিনিসপত্রগুলো এনে এনে ফেলছে সেখানে।

—এ কি, দরোয়ান সাহেব, তুমি? তুমি একলা এ সব কী করছ? কেয়া করতা হ্যায়?

জগমন্ত সিং এ সব দুদিন আগে নিজেই পুড়িয়ে দিয়েছিল। শুধু এই-ই পোড়ায়নি। মালিকের বাড়ির জেনানাদেরও পুড়িয়েছে। আজ আর আগুনে পুড়ে মরবার কেউ নেই। ফিরিঙ্গিসাহেবেরা এতদিন কেল্লার মধ্যে জগমন্ত সিংকে আটক করে রেখেছিল। কৃষ্ণবল্লভ, আমিচাঁদ জগমন্ত সিং সবাই নজর-বন্দী হয়ে ছিল কেল্লায়। কিন্তু যখন সবাই পালিয়ে যাবার তোড়জোড় করছিল জগমন্ত সিংও মালিককে এসে বলেছিল—হুজুর, আপ্ ভি পালিয়ে চলুন—এই-ই সুযোগ—ফিরিঙ্গিলোগ ভাগ্ যা রাহা হ্যায়—

সে রাত্রে সত্যিই কেউ কিছু ঠিক করতে পারেনি কী হবে শেষ পর্যন্ত, সে অবস্থায় কী করা উচিত। রাজা রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণবল্লভ মুখ ভার করে বসেছিল। নবাবের হাতে তার নিস্তার নেই তা সে জানতোই। কিন্তু পাঞ্জাবী মানুষ আমিচাঁদ অত সহজে ভেঙে পড়বার লোক নয়। অনেক ঝড়-ঝাপটা তার মাথার ওপর দিয়ে গেছে। আমিচাঁদ সাহেব সুদূর পাঞ্জাব থেকে বাঙলা দেশের নরম মাটিতে এসে রসের সন্ধান পেয়ে এই-টুকু বুঝে নিয়েছে যে, এদেশে নরম হয়ে থাকলে সুনাম হয়ত হয় কিন্তু বড়লোক হওয়া যায় না। বুঝে নিয়েছে যে টাকার মালিক হতে গেলে সম্মান-অপমান-জ্ঞান থাকলে চলে না। আর যারা টাকা কামাই করতে চায় তাদের পক্ষে এই-ই উপযুক্ত সময়। এই যখন দেশের রাজা বদলায়। দেশের রাজা বদলাবার সময়েই যা কিছু উন্নতি করতে হয় করে নাও। এর পর যখন শান্তির সময় আসবে তখন আর ভাগ্য-উন্নতি করবার সুযোগ পাওয়া যাবে না।

আমিচাঁদ সাহেব এক ধমক দিয়ে উঠেছিল—যা, তু ভাগ যা ইহাঁসে—

এর পর জগমন্ত সিং আর সময় নষ্ট করেনি। কেল্লায় তখন আর পল্টনদের পাহারাও নেই। সোজা পাঁচিল টপ্‌কে একেবারে মালিকের বাড়ির সামনে এসে হাজির। আগেই সব কিছু পুড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনও অনেক কিছু বাকি ছিল পুড়তে। জগমন্ত সিং জানতো কোথায় থাকে সাহেবের সিন্দুক, কোথায় কোন ঘরের কোন মেঝের তলায় সোনা-রুপো পোঁতা আছে। জগমন্ত সিং সেখানে ঢুকতে যাচ্ছিল। হঠাৎ বিভারিজ সাহেবের মুন্সীকে দেখে অবাক হয়ে গেল। মুন্সীজী, তুমি?

ষষ্টিপদ বললে—আমার নোকরি গেছে দরোয়ানজী, আমি এখন কী করব?

বলতে বলতে ষষ্টিপদ সেই আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়েই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে।

—কাঁদছিস কেন বেল্লিক?

ষষ্টিপদ কাঁদতে কাঁদতেই বললে—চাকরি গেলে আমি খাবো কী দরোয়ানজী?

জগমন্ত সিং ষষ্টিপদর দিকে চেয়ে ভেঙচি কেটে উঠলো। তুই এখন খাবার কথা ভাবছিস উল্লু-কি-পাট্টা? দুনিয়া বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, জমানা ভি বদল হয়ে যাচ্ছে, এখন কেউ তোর মতন খাওয়া নিয়ে ভাবছে? মরতে পারবি?

ষষ্টিপদ চমকে উঠলো। একবার জগমন্ত সিংএর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। আগুনের

হল্‌কা লেগে মুখখানা তার যেন বীভৎস হয়ে উঠেছে তখন।

—হ্যাঁ, মরতে পারব দরোয়ানজী! খুব মরতে পারব। আর মরেই তো আছি আমি—

—তব্‌ ইধর্‌ আ—

বলে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। আমিচাঁদ সাহেবের এত সাধের সাজানো বাড়ি। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ করা টাকার জমানো সোনা-রূপো-হীরে ভরা বাড়ির মালখানার ভেতরে ঢুকলো দুজনে। তারপর জগমন্ত সিং মালখানার দরজাটা নিজের ট্যাঁকের চাবি দিয়ে খুলে ফেললে। কী রকম একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল। জগমন্ত এক হ্যাঁচ্‌কা টানে সিন্দুকের ডালাটাও খুলে ফেললে। খুলে ফেলতেই ষষ্টিপদর চোখ দুটোয় ধাঁধাঁ লেগে গেল। এত সোনা, এত রুপো, এত মোহর, এত টাকা! মা মা, পতিতোদ্ধারিণী, তুমি কি আমার মনের কথা শুনেছ তাহলে মা?

—আগ্‌ জ্বালাও, আগ্‌ জ্বালাও—

বলে কী জগমন্ত সিংটা! ষষ্টিপদ হাঁ করে চেয়ে রইল দরোয়ানজীর দিকে। জগমন্ত সিং সত্যি সত্যিই আগুন জ্বালিয়ে দিলে সিন্দুকের চারদিকে। আগুনটা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো।

জগমন্ত সিং বলে—এই আগুনের ভেতর লাফিয়ে পড়—আগে তুই ঝাঁপ দে, তারপর হাম—

ষষ্টিপদ কী করবে বুঝতে পারলে না। এমন হবে তা তো ভাবেনি সে। সোনা-রুপো-মোহর-টাকার সঙ্গে একাকার হয়ে যাবার কথা তো সে কল্পনা করেনি। তুমি বাপু প্রভুভক্ত চাকর হতে পারো কিন্তু আমি তো পারবো না এ-কাজ। আমার তো এই সব টাকা চাই। আমি যে বড়লোক হবো গো! তোমার মালিক আমিচাঁদ সাহেবের চেয়েও বড়লোক!

—নে, লাফিয়ে পড় ভেতরে—

ষষ্টিপদ আর দেরি করলে না। দুহাতে জগমন্ত সিংকে ধাক্কা দিয়ে সিন্দুকের ভেতর ফেলে দিয়েই ভারি ডালাটা বন্ধ করে দিয়েছে এক মুহূর্তে। থাক্‌, পুড়ে মরুক ওর ভেতরে। তারপর আগুনটা নিভে গেলেই আবার বার করে নিলে চলবে। তখন সমস্ত সোনা-রুপো-মোহর-টাকার মালিক সে। সেই ষষ্ঠিপদ। ষষ্ঠিপদ আবার মাকে ডাকলে।

নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলাও তখন কেল্লার মালখানার ভেতরে খোলা সিন্দুকটার সামনে দাঁড়িয়ে। রাজা মানিকচাঁদ, মীরজাফর, মেহেদী নেসার, কৃষ্ণবল্লভ, আমিচাঁদ, সফি-উল্লা, ইয়ারজান সবাই পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

—আর টাকা? আর টাকা নেই?

হলওয়েল সাহেব হাত বাঁধা অবস্থায় তখন থর-থর করে কাঁপছিল। বললে—আর টাকা নেই জাঁহাপনা, এই-ই সব—

—স্রেফ পঞ্চাশ হাজার টাকা? এতদিনের কারবার তোমাদের, এত আমদানি-রপ্তানি, স্রেফ পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমাদের মালখানায়?

আর কোনও কথা নয়। রাজা মানিকচাঁদ সামনেই দাঁড়িয়েছিল। নবাব বললেন—হলওয়েলকে গ্রেফ্‌তার করে মুর্শিদাবাদ পাঠিয়ে দাও—আর কৃষ্ণবল্লভ, আমিচাঁদ ওরাও আমার সঙ্গে যাবে—

ষষ্ঠিপদর আর দেরি সহ্য হলো না। সিন্দুকের ডালাটা খুলে ফেললে একটা শাবল দিয়ে। ভেতরের আগুন তখন নিভে গেছে। কিন্তু কালো-কালো জমাট ধোঁয়া শুধু গুমিয়ে গুমিয়ে নিঃশব্দে কুণ্ডলি পাকিয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। ষষ্ঠি-পদ নাকে কাপড় দিয়ে নিচু হয়ে দেখলে একবার। জগমন্ত সিং তখন বেগুন-পোড়া হয়ে পড়ে আছে ভেতরে। মা পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, তাহলে আমাকে সত্যি-সত্যিই রাজা করে দিলে মা—সত্যিই রাজা হলুম—

•

চেহেল-সতুনের ভুল-ভুলাইয়ার মধ্যে যদি কোনও রহস্য থাকে তো সে-রহস্য ইতিহাসের। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশেই সেখানে নানী-সুদ্ধো আর বেগমদের আস্তানা হয়েছে। তার জন্যে যদি কাউকে দায়ী করতে হয় তো সে মোগল-বাদশা, সুলতান আকবর নয়, সুলতান সাহজাহান নয়, সুলতান জাহাঙ্গীর নয়, সুলতান আওরঙ্গজেবও নয়। এমন কি মুর্শিদকুলী খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আলীবর্দী খাঁও নয়। নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলাও নয়। চক বাজারের সারাফত আলি যতই বলুক, হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই যতই কষ্ট পাক, শোভারাম বিশ্বাস যতই পাগল হোক, ইতিহাসের রথ নির্মম নিষ্ঠুর গতিতে এগিয়ে চলবে। তার গতি কেউ থামাতে পারবে না।

১৭৩০ সালে যে ছেলেটির জন্ম হয়েছিল, সে দেখে এসেছে এমনি করেই বাঙলার নবাবিখানা চালাতে হয়, এমনি করেই মারাঠাদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। আলীবর্দী খাঁর বড় পেয়ারের নাতি সে। সে জানে লড়াই কাকে বলে, সে জানে মেয়ে-মানুষকে কেন সৃষ্টি করেছে খোদাতালা, সে জানে নবাব হলে তার দুষমনি করবার লোকের অভাব হয় না। এই ফিরিঙ্গি, এই মীরজাফর, এই জগৎশেঠ, এই মেহেদী নেসার, এদের সকলকেই নিয়েই তার চলতে হবে। ক্ষমতা যতদিন থাকবে ততদিন তার বন্ধুও থাকবে, দুষমনও থাকবে। এদের বাদ দিয়ে যে ক্ষমতা চায় সে উজবুক, সে আনাড়ী!

তাই চেহেল-সতুনের ভেতরের চেহারাটাও কোনওদিন বদলায়নি। বদলাতোও না। কিন্তু কেন যে বদলালো সেই কাহিনীই বলতে বসেছি।

অন্ধকারে তখনও মরালী আর একবার গলা ছেড়ে ডাকবার চেষ্টা করলে—নজর মহম্মদ নজর মহম্মদ—

হয় সে স্বপ্ন দেখছে, নয় তো সে বোবা হয়ে গেছে। তখনও নহবৎটা বাজছে। নবাব ফিরে আসছে। হয়ত কাল, কিম্বা পরশু, কিম্বা হয়ত তার পর দিন, তারপর? তার আগে যদি নজর মহম্মদ সত্যিই তাকে নিয়ে আসে।

সামনেই যেন কার পায়ের শব্দ হলো। অস্পষ্ট ঝাপসা আলোয় ভালো দেখা যায় না। তবু নজর মহম্মদ ভুল করেনি চিনতে। নজর মহম্মদরা সাধারণত ইচ্ছে করে কখনও ভুল করে না।

—বেগমসাহেবা!

মরালী যেন নিজের চোখ দুটোকেও বিশ্বাস করতে পারলে না। পেছনেই কান্ত।

মরালী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—তুমি?

কান্তর তখন বোধ হয় বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। তার মুখে তখন সব কথা যেন ফুরিয়ে গিয়েছে। খানিকটা ভয়ে, খানিকটা আনন্দে, খানিকটা রোমাঞ্চে, আর খানিকটা হয়ত বা বিস্ময়ে। (ক্রমশ)

২০শে এপ্রিল ১৯৬৪

কিছুদিন আগে সকালে অফিসে গিয়ে সবে ফাইলপত্র খুলে বসেছি, আমার সেক্রেটারী একটি বিরাট প্যাকেট হাতে করে ঘরে এসে ঢুকল।

"ব' জুর মঁসিয়ো, এই প্যাকেটটা আপনার।"

"ব' জুর, মাদমোয়াজেল", হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলাম। এখানে বলে রাখি, ফরাসী কায়দায় 'ব' জুর' বলে পরিচিতদের করমর্দন করতে হয়, শুধু মুখে বলে ঘাড় নাড়লে হয় না। ফলে প্রত্যেকদিন আমাদের অন্তত বার-পাঁচিশ করমর্দন করতে হয়।

একটু অবাক হয়েই নিলাম প্যাকেটটা। সুন্দর কাগজে মোড়া, মনে হচ্ছে একটি উপহার। কে আবার উপহার পাঠাল? আস্তে আস্তে প্যাকেটটা খুলে ভিতরে দেখলাম একটি মস্ত বড় চামড়ার ডবল প্যাড। উপরে কাগজ রেখে লেখার, ভিতরে কাগজ, খাম ইত্যাদি রাখার। সংগে ছোট্ট একটি চিঠি। আমাদের একটি ফ্যাক্টরির জনৈক কর্মী রেজ্ঞাঁ পাঠিয়েছে উপহারটি। লিখেছে: "আপনি আমার জন্যে যা করেছেন তার জন্য আমি ও আমার স্ত্রী বরাবর কৃতজ্ঞ থাকব। আমাদের কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ছোট্ট ও সামান্য এই উপহার পাঠালাম। যদি দয়া করে গ্রহণ করেন তাহলে আমরা খুব খুশী হব।" কিছুই করি নি এমন ওর জন্য। এই যুবকটিকে আমরা পাঠিয়েছিলাম কলকাতার কাছে আমাদের জনৈক ভারতীয় ক্রেতার ফ্যাক্টরিতে আমাদের একটি মেশিন চালু করতে। সেখানে একটা অনিশ্চিত অবস্থায় পড়ে ওকে স্ত্রী পরিবার ছেড়ে দুই মাসের জায়গায় ছয় মাস থাকতে হয়। বুঝতেই পারছেন ত কলকাতার শহরতলিতে সেই প্রচণ্ড গরমে একটি অনভ্যস্ত পরিবেশে, একটি অনিশ্চিত অবস্থায় প্যারিস থেকে গিয়ে একটি অনুদ্দেশক মাসের পর মাস থাকতে কি রকম লাগে! সে সময় আমি নিজে কলকাতায় গিয়ে ওকে প্যারিসে ফিরে আসার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করেছিলাম। এই জন্যেই ছেলেটি এত কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। ছোট্ট একটি ঘটনা, কিন্তু ওর উপহার সেদিন খুব স্পর্শ করেছিল আমায়।

আসলে ফরাসী তরুণ শ্রমিক-সমাজের এই হৃদয়, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাবার সুযোগ হয়েছে আমার অন্যত্রও। এই তো কদিন আগে।

লোকটির চেহারা আমার খুব পরিচিত মনে হচ্ছিল। দৃষ্টি একটু কঠিন, সদ্যধৌত, পেশীবহুল চৌকো হাতের সাদা চামড়ায় মনে হচ্ছিল পাউডার মাখানো। মাথার চুল এখন ভেজা, মনে হচ্ছে একটু আগেই কারখানায় স্নান সেরে এসেছে। দিনের কঠিন পরিশ্রমের পর মানুষটির শ্রান্ত, ক্লান্ত, পরিমার্জিত রূপ। হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য। পেশীবহুল, চৌকো সেই হাত। একটি শ্রমিকের হাত। প্যারিসের উত্তর শহরতলিতে শনিবারের দুপুরে একটি বিরাট কারখানার সামনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কাছেই একটি কাফে, ওখানে অন্যান্য শ্রমিকরাও সমবেত হয়েছে কাজের পর। সেদিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল লোকটি: "চলুন, ওখানে গিয়ে বসি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার কথা বলতে ভালো লাগে না।" কাফেতে গিয়ে বসে বিয়ারের গ্লাসে একটি চুমুক দিয়ে বলল ক্রুদ, "উঃ! এখন থেকে ছত্রিশ ঘণ্টা বিশ্রাম। সারা সপ্তাহ এ-রকম কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। ঠিক কী জানতে চান বলুন!" খুব সহজ ছিল না বলা ঠিক কী জানতে চাই। বললাম: "না, এই একটু সুখ-দুঃখের গল্প করব।"

ক্রুদ শুরু করল: "দেখুন, মার্ক্সবাদী শ্রমিক মহলে তো বলা হয় শ্রমিক-সমাজের দ্রুত ও সামগ্রিক উন্নতি চাই। কি জানি, অতশত বুঝি না। ওরা বলে, তরুণ প্রলেটারিয়েটদের সামনে একটিই মাত্র ভবিষ্যত আছে, তাদের শ্রেণীর সামগ্রিক উন্নতি। তাদের সামনে দুটি মাত্র পথ আছে: হয় মানুষ হওয়া, নয়ত চিরকাল শ্রমিক থেকে যাওয়া (সংক্ষেপে যাকে বলে "ও. এস")। মেশিনও নয় দাসও নয় এ এক অদ্ভুত অবস্থা। অনেক সময়ই কর্মদক্ষতা ও সুযোগ সত্ত্বেও ওদের উন্নতি হয় নি। কেন? অনেকেই ভাবছে যে, জীবনে সাফল্যের মূলে রয়েছে সামাজিক সম্পর্ক ও পিস্ত' (Piston মানে প্রভাবশালী কারও সুপারিশ)। দেখুন, সাফল্য চাই আমরা সবাই। কিন্তু বেশী কিছু করতে পারছি না কেউ। মনে হচ্ছে আমরা ক্ষমতাহীন, নতুন জীবনের ধ্যানধারণার সামনে অনগ্রসর। সাধারণত একটি শ্রমিকের ছেলেকে তার সংগী বুর্জোয়া শ্রেণীর ছেলের চাইতে অনেক বেশী বাধা ভোগ করতে হয়। তার বাবা-মায়েরা তাকে সাহায্য করতে পারে না, কোন পরামর্শও দিতে পারে না। তার সংগে এসে জোটে পারিবারিক অসুস্থ আবহাওয়া। বইপত্রের অত্যধিক দাম। পড়াশুনার ব্যবস্থারও সুবিধে নেই। বাড়িও তো খুব ছোট, তাতে চারদিকেই আওয়াজ। রান্নাঘরের টেবিলের কোণে হয়ত স্কুলের কাজ করতে হয়। ছোট ছোট ভাইবোনেরা কেঁদে ওঠে, চীৎকার করে। তরুণ শ্রমিকদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার আরও দুটি কারণ রয়েছে। অনেক সময় স্কুল থেকে

প্যারিসে ছাত্র উৎসবে যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধি ছেলেমেয়েরা

ক্লান্ত হয়ে, দিশেহারা হয়ে এই তরুণের দল কোন কাজের প্রস্তুতি, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ছাড়াই কারখানায় ঢুকতে বাধ্য হয়, অথবা শিক্ষানবিশ থাকার সময় তাকে বারো, চৌদ্দ, ষোল ঘণ্টা কাজ করতে হয়। অনেক সময় এরা কাজ শেখেও না। এভাবে শ্রমিক-সমাজের একটা মস্ত অপচয় হয়ে যাচ্ছে।"

থামল রুদ। একটু স্তব্ধতা। একটি সিগারেট ধরিয়ে কয়েকটি টান দিয়ে আবার শুরু করল : "বেশ বুঝতে পারছি, আসলে আপনি থিয়োরিটা জানেন। ভিতরে কি হয় শুনুন। আমার নিজের জীবনকাহিনী বলতে ভালো লাগে না, তবু আপনাকে বোঝাবার জন্য বলছি। আমার বাবা ছিলেন রাজমিস্ত্রী। চৌদ্দ বছর বয়সে আমি স্কুল সার্টিফিকেট পাশ করলাম ও সেইসঙ্গে শিখলাম শ্রমিক-সমাজের অভিধানের প্রথম শব্দ : "বেকার"। আমার পরীক্ষার পরদিন আমার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কি হতে চাস ?" আমি তার কি জানি ? আমার বাবাও জানতেন না। শুধু এটুকু বুঝেছিলাম, বাড়ি তৈরির কাজ আমায় আকর্ষণ করছে না। কারণ সেখানে অনেক অসুবিধে, অনিশ্চয়তা। কাজেই এমন একটি কাজ আমার চাই যেখানে আমায় বেকার হতে হবে না। আমাদের শ্রমিক মহলে একটি ভীতি এসে গেছে ছাঁটাই সম্বন্ধে। আমি সাইকো টেকনিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, ওরা বলেছেন, আমি কায়িক শ্রমের উপযুক্ত। অতএব কায়িক শ্রমজীবীই হয়েছি আমি। দেখুন, গোড়াতেই জীবনের পথ ঠিক করা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া দরকার। আমি কাগজে পড়েছি সমাজে সবচেয়ে গুরুতর অসাম্যের কারণই হল কারও কারও পক্ষে সংস্কৃতির বন্ধ ঘরে প্রবেশে বাধা। আমি বা আমার সহকর্মীদের কাছে সংস্কৃতিবান হওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে সংবাদ সংগ্রহ করা। একজন শ্রমিক চিন্তা করতে পারে না, চিন্তা করতে সাহস পায় না যে তার ছেলে শ্রমিক ছাড়া আর কিছু হবে। কি সম্ভব, আর কি সম্ভব নয় সে সম্বন্ধে ভালো করে খবরই দেওয়া হয় না আমাদের। একগাদা স্কুলের নাম ও একরাশ কাগজপত্র দিয়েই খালাস, তারপর তোমরা বোঝ। ভাবছেন খুব সহজ এটা! দেখুন সাইকোলজির বাধা কি রকম। যদি সম্ভবও হয় একটি শ্রমিক-পরিবার চেষ্টা করবে না তাদের ছেলেমেয়েকে তাদের নিজেদের অবস্থার থেকে পৃথক করে মানুষ করতে, তাদের ছেলেকে প্রলেটারিয়েট ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে যে সীমান্ত তা পার হতে দিতে। তাদের বুর্জোয়ায় গ্রহণ শুধু দৈনন্দিন জীবনের সুখ অর্জনের মধ্যেই, তাদের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতির চেষ্টায় নয়।"

বাইরে ততক্ষণ অন্ধকার নেমে এসেছে। কারখানা শহরের শ্রমিক-পল্লীতে রাস্তায় একটুকরো ময়লা হলুদ আলো, রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায় না। কাফের ভিতরে কাউণ্টারে কয়েকটি লোক পরদিনের রেসের কাগজ দেখছে। ঘরের এক কোণে ইলেকট্রিক বিলিয়ার্ড খেলছে কয়েকটি তরুণ। অন্যদিকে "জুক" বাক্সের সামনে টেবিলে ভিড় করে কয়েকটি তরুণ ছেলেমেয়ে গান শুনছে ও কফি নিয়ে আড্ডা জমিয়েছে। ঘরের অন্যপ্রান্তে কয়েকটি বৃদ্ধ তাস পিটছে।

কথার খেই ধরিয়ে দিলাম : "বেশ সার্টিফিকেট তো পেলেন, তারপর কি হল ?"

"এ বিরী, এরপর আমি কয়েকটি কারখানায় গেলাম। চাকরি পেতে অসুবিধে হল না একটুও। তবে সতের বছর বয়সে আমি তো শিক্ষানবিশ মাত্র। আমার তখনো অনেক কিছু শেখার বাকি আছে। আমি যে-কাজে ঢুকেছি তাতে টাকা পাওয়া যায়

উৎপাদন ক্ষমতার উপর। আমার তখনো বুঝতে বাকি ছিল আমার পরিশ্রমের কতটা মূল্য দিচ্ছে এরা। মিলিটারি সার্ভিসে যাবার আগেই যে-বেতন আমাকে দেওয়া হত তাই নাকি আমার সর্বোচ্চ বেতন। এর বেশী এক পয়সাও আর দেবে না। সে যাই হোক, এ-পর্যন্ত কোন সমস্যা ছিল না। তারপর গেলাম মিলিটারি সার্ভিসে। (এখানে প্রসংগ-ক্রমে বলে রাখি, ফরাসী দেশে প্রত্যেকটি সক্ষম তরুণকে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা নিতে হয়। আগে ছিল দুই বছর, এখন সেটা কমিয়ে আঠার মাস করা হয়েছে) সে সময় আমার জীবনের সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। আলজিরিয়াতে বিভিন্ন রকমের লোকের সংস্পর্শে এলাম মিলিটারি সার্ভিস করার সময়। আমার সমবয়সী, আমার চেয়ে ছোট, নিরক্ষর, টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার। তখন ঠিক ব্যবধানটা বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম আমার কর্মে উন্নতি নির্ভর করছে আমার ডিগ্রি পাওয়ার উপর। সবাই যা দিয়ে মানুষের মূল্য নির্ধারণ করে তা হল বেতন, কর্মোন্নতি, সংস্কৃতি। আমার বেতনের কাগজটিই হল আমার জীবনের পরিচয়। আমার থার্মোমিটার।" (ফ্রান্সে প্রত্যেকটি বেতনভোগীকে মাসের বেতনের সংগে একটি কাগজ দেওয়া হয় তাতে উল্লেখ থাকে কি বাবদ কত টাকা দেওয়া হল বা কোন্ খাতে কত টাকা কাটা হল। এটি প্রত্যেকটি লোকের মাসিক উপার্জনের প্রমাণ।)

রুদ আবার শুরু করল : "সামরিক জীবন থেকে ফিরে এসে আমি বিয়ে করলাম এবং সিদ্ধান্ত করলাম জীবনের এই অবস্থার গণ্ডি ছেড়ে বেরোতে হবে।"

এভাবে রুদ কাজের পর পড়াশুনো করে অনেক উন্নতি করেছে। তার স্ত্রী চাকরি করে। তার অন্যান্য অনেক সহকর্মীর মতই তারও একটি টেলিভিশন আছে, একটি মোটরগাড়ি আছে ও জীবনের অন্যান্য বিলাস উপকরণ আছে। মোটরগাড়ির কথায় রুদ বেশ গর্ব করে বলল, "'বানিয়ল'। মোটর-গাড়িকে চলতি ফরাসীতে বানিয়ল বলে। টি কিন্তু শ্রমিক-শ্রেণীর প্রত্যুত্তর বলতে পারেন। ওটা একটা উন্নতির প্রতীক। আমাদের মালিকদেরও গাড়ি আছে, আমাদেরও আছে। রাস্তায় আমরা শ্রমিক-মালিক সব এক। কি বলেন?"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আবার শুরু করল : "বলুন তো, যদি কাউকে উচ্চাকাঙ্ক্ষার দৈত্য চাপ দিতে থাকে তবে কি লোভ সংবরণ করা যায়? মনের ও শরীরের ওই পরিশ্রম করে যদি উন্নতি করতে পারি তবে ইঞ্জি-নিয়ার হয়ত হতে পারব না, কিন্তু টেক-নিশিয়ান তো হতে পারি। তিন বছর চেষ্টা করে টেকনিশিয়ান হওয়া যায় শুনেছি। ইঞ্জিনিয়ার হতে সাত বছর লাগবে। সে বড় দীর্ঘ সময়, আর আমি হয়ত তার উপযুক্ত নই। টেকনিশিয়ান হব এই আমার স্বপ্ন। অন্তত মেশিন নই এই ভাবটা তো হবে। কিছুটা তো দায়িত্ব পাব, কিছুটা এগিয়ে যাবার প্রেরণা!"

প্যারিসে ছাত্র উৎসবে আর্মেনিয়ান তরুণী

একটু সময় গেল। কুণ্ঠিত হেসে জিজ্ঞেস করল রুদ : "আমার এই জীবনকাহিনী আপনার ভালো লাগছে?"

—"হ্যাঁ, খুব। তা' অবসর সময়ের আমোদ আহ্লাদ কি করেন? সিনেমা, থিয়েটার?"

—"সময় নেই। আমি গত ছয় মাস সিনেমা যাই নি। এমন কি "ফুট"-এও যাই নি। ফুটবল। এখানে ফুটবল খুবই জনপ্রিয়। ক্যান্টিনে একটি স্যান্ডউইচ মুখে দিয়ে পড়াশুনো করি।"

—রোববার?

—বিশ্বাস করুন, রোববারও অন্তত "আধ ডজন ঘণ্টা" পড়াশুনা করি আমি।

এই তরুণ ছেলেটি হয়ত খুবই সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের দলে পড়ে। যারা সাহস, সদিচ্ছা নিয়ে বর্তমানকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনের আশায় বলি দিয়েছে সেই দলের ওরা। কিন্তু আজকের ফ্রান্সের শ্রমিক-মালিক উভয় শ্রেণীই আশা করছে একটু একটু করে শত সহস্র এই রকম উৎসাহী, পরিশ্রমী ছেলে বেরোবে।

আস্তে আস্তে আমাদের চারদিকে আরও কয়েকটি তরুণ-তরুণী এসে ভিড় করল।

ওদের মধ্যে জানোর বয়স বছর আঠার, তার বন্ধু রনের বয়স বছর উনিশ। দুজনেই কারখানায় কাজ করে প্রতিদিন সাড়ে নয়, পৌনে দশ ঘণ্টা করে। তারপর সপ্তাহে তিনদিন কারখানার টেকনিক্যাল স্কুলে যায় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা থেকে আটটা পর্যন্ত।

জিজ্ঞেস করলাম : "তোমরা ক্লাসে যাও কেন ভাই?"

জানো একটু মশকরা করে বলল : "মজা করার জন্য। দশ ঘণ্টা ফ্যাক্টরিতে কাজ করেও সবাই ভাবে এ-ও যথেষ্ট নয়।"

দুটি তরুণ ছেলেই প্রাণ খুলে হেসে উঠল। এরপর রনে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। লম্বা গড়নের, সুন্দর ছেলেটি। বলল : "ক্লাসে যাই আমরা একটু কম কষ্টকর কাজ যাতে পাওয়া যায় তার জন্যে আমাদের জ্ঞান বাড়াতে। এরকমভাবে সারা জীবন তো আর "রবটের" মত যে কাজ ভালো লাগে না তা করে যাওয়া যায় না। কি ভয়ংকর বলুন তো!"

জানো একটি সিগারেট বাড়িয়ে দিল। বললাম, "ধন্যবাদ, খাই না।" সে নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে একটু চিন্তান্বিত সুরেই শুরু করল: "আমরা চেষ্টা করছি একটি ভালো চাকরি যোগাড় করতে। প্রথমত, স্বচ্ছলভাবে জীবন ধারণ করার মত উপার্জন করতে হবে। আমার ছোট বয়স থেকেই চোখের উপর তো দেখে আসছি কিভাবে আমার বাবা মা দৈত্যের লেজ ধরে টানাটানি করছে (এটা একটা ফরাসী চলতি কথা)। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি আমার সমস্ত অস্তিত্ব এভাবে কাটাব না। আমার অজস্র 'কোপ্যাঁ'র (বন্ধু)ও এই মত। মাসের শেষে ভীষণ অবস্থা। সব মাটিতে ছড়াছড়ি। এতে মানসিক অবস্থার একেবারে শেষ। অথচ একটি বেশ সুন্দর গোছের বেতন পেলে সবদিক থেকে বেশ একটি "শুয়েত"(একটি ফরাসী চলতি শব্দ) জীবন গড়া যায়।

"তারপর আমাদের এমন হতে হবে—কি যেন বলে? মানে, সমীহ পেতে হবে সবার।"

আজকের ফরাসী শ্রমিক-জীবনে এই তিনটে হল প্রধান লক্ষ্য। নিজের পছন্দমত বেশ ভালো একটি কাজ যোগাড় করা—নিটোল একটি বেতন ও লোকের সমীহ পাওয়া। ছাত্র-মহলের চাইতেও অনেক বেশী চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে তাই এই তরুণ শ্রমিক-মহলে। ওদের এই নতুন আদর্শে, নতুন চিন্তাধারায় সবাই একটা সৌভ্রাত্র-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক নতুন শক্তির সন্ধান পেয়েছে নিজেদের মধ্যে।

রনে শুরু করল: "আমরা এটুকু বুঝেছি যে, আজকের জগতে বিশেষজ্ঞেরই কিছু করার সুবিধে আছে। আজকের টেকনোলজিই রাণী। তার প্রতি অভ্যস্ত হবে হবে। আমাদের যুগোপযোগী হয়ে চলাই উচিত। আমরা যারা তরুণ, তাদের তবু এক রকম চলে যাচ্ছে। কিন্তু বৃদ্ধের দল? তাদের নানা সমস্যা আর আমাদের মত তরুণদের সঙ্গে প্রায়ই কাজের ধারা নিয়ে গোলমাল লাগছে। তারা নিজেদের নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছে না। তরুণদল তবু আজকের এই নতুন টেকনোলজিক্যাল সভ্যতার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে—কিন্তু বৃদ্ধরা পারছে না, তাই এই সংঘাত।"

সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় ক্লাস করতে এরা সবাই ক্লান্ত। সমস্ত পৃথিবী থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে-সব তরুণ আবার বিবাহিত তাদের যদিও সামাজিক, কর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এই পড়াশুনা করা প্রয়োজন, কিন্তু তাতে ওরা পারিবারিক ও সেণ্টিমেণ্টাল জীবন থেকে দূরে সরে যায়।

এতক্ষণ লক্ষ করি নি, ঘরের কোণ থেকে কোন সময় তিনটে মেয়েও এসে যোগ দিয়েছে। টুকটুকে লাল গাল, বিজিত বার্দোর মত করে চুল ছাঁটা বছর আঠার বয়সের একটি মেয়ে বলল:

"আমার কি মনে হয় জানেন, জীবনটা গোলাপ দিয়ে মোড়া নয়। খুব শক্ত সামর্থ্য হলে হয়ত কিছু রোজগার করা যায় কিন্তু দেখছেনই তো আমার কতটুকুই বা শক্তি। আমাদের কারখানায় আমার কথা বলা বারণ, একটু গোলমাল হলেই সোজা দরজা।"

তার সঙ্গিনী মেয়েটি বলল: "আমি দরজীর কাজ করি। ইলেকট্রিক কাঁচিতে সুইমিং কস্টিউম, ট্রাউজার ইত্যাদি কাটি। প্রত্যেকদিন নয় ঘণ্টা কাজ করি। কোন কোন সময় রবিবারেও। মাসের শেষে মাইনে পাই দুই শ' ফ্রাঁ। আমার বাবা মা বলেন এই বয়সে এই মাইনে মন্দ না। কিন্তু আমার তা মোটেই ভালো লাগে না, এই কাজে কিছু শেখা যায় না।"

আজকের তরুণ ফরাসী শ্রমিক সমাজের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতার ভাব আর নেই। তাদের মধ্যে একটা সংঘবদ্ধ, পারস্পরিক সাহায্য, প্রচেষ্টা ও সৌভ্রাত্রের মনোভাব খুব সহজেই জন্ম নিয়েছে। এরা এদের শক্তি সম্বন্ধে খুবই সচেতন। তারা মনে করছে তারা এক নতুন যুগের মানুষ—নতুন "এলিট"-এর সভ্য। কারখানায় যারা এক সঙ্গে কাজ করে, একই সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা ক্লাসে যায় তারা নিজেদের মধ্যে একসঙ্গে বসে পড়াশুনা করে, পরস্পরকে সাহায্য করে, এক সঙ্গে সফল হতে চেষ্টা করে। আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারেও যারা একই সময় কাজে যায়, কি একই দিনে ছুটি উপভোগ করে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে খেলাধুলো, গান বাজনা, নাটক, থিয়েটার, ভ্রমণের ব্যবস্থা করে। এই তরুণ বয়সে অন্যদের সঙ্গে একটা মানসিক সুমধুর সম্পর্ক স্থাপনই এদের উদ্দেশ্য। সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে এই তরুণের দল পরস্পরকে হৃদয়গত কি বুদ্ধিগত ব্যাপারে সমৃদ্ধিশালী হতে সাহায্য করছে। এদের বিরাট সংগঠন। অন্যান্য সহকর্মী, সাথী যারা ফ্রান্সের বিভিন্ন গ্রাম, পল্লী থেকে এসে এই শহরের জনারণ্যে একেবারে হারিয়ে গেছে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। বাড়ি-ঘর যোগাড় করে দিয়ে, আমোদ-প্রমোদের

প্যারিসে ছাত্র উৎসবে স্পেনের ছেলেমেয়েরা

ব্যবস্থা করে হাতে হাত দিয়ে এক তালে এক পারে এগিয়ে চলেছে। একটু সহমর্মিতা, একটি দরদী অন্তর, একটি মানবিক হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শে এরা পরস্পরকে সজীব করে এগিয়ে চলেছে আগামী দিনের সমাজ গড়তে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলিও ওরা ভালো করে বুঝতে চায়।

"পলিটিক্স? খুব বেশী কিছু বুঝি না তবে ভালো করে বুঝতে চাই। আমাদের কেউ সম্পূর্ণ খবর দেয় না, ভালো করে সমস্যাগুলি বোঝায় না। টেলিভিশন হয়ত এই অভাব পূরণ করতে পারে। পলিটিক্সে আমরা উৎসাহ বোধ করি যখন আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থে সোজাসুজি আঘাত লাগে। আমাদের বাড়িঘরের সমস্যা, শ্রমিকের সাধারণ দৈনন্দিন সমস্যা, কারখানা পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ এইসব সমস্যায় আমাদের আগ্রহ বেশী।

"যদি তরুণ শ্রমিক সমাজকে রাজনৈতিক নেতারা কিছু বোঝাতে চান তবে তাদের ভাষা পাল্টাতে হবে। পুরনো স্টাইল আর চলবে না—ওটা মৃত।

"এ্যাটম বোমা আমরা চাই না। ওই "পটকা" খুব বেশী দামী। এর চাইতে রাষ্ট্র বরং আমাদের সামাজিক উন্নতি, তরুণ শ্রমিকদের উন্নতি, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভ্রমণের ব্যবস্থা বেশী করে করুন না! আমরা প্রত্যেক শহরে প্যারিসের TNP (THEATRE NATIONAL POPULAIRE)র মত থিয়েটার চাই।

"আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কোন মূল্যেই হোক শান্তি আমরা চাই। সেই জন্যই আমরা পারস্পরিক সহাবস্থানের পক্ষপাতী। তোমাদের 'গান্ধী' (গান্ধীজী) কিন্তু এদিকে সত্যি করে পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছিলেন। কি আফশোসের কথা, তোমাদেরই এক পাগলা দেশবাসীর গুলিতেই সেই শান্তির অগ্রদূতকে প্রাণ হারাতে হল......।"

সেদিনের সন্ধ্যায় কাফেতে ফরাসী তরুণ শ্রমিকদের মনোভাব এভাবেই ব্যক্ত হয়েছিল। তাদের লক্ষ্য আজ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নতুন ঐশ্বর্যশালী, শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলা। এদের সরলতার পরিচয় বহু জায়গায় পেয়েছি—আজ একটি ঘটনার উল্লেখ করে এই লেখা শেষ করব।

বেশ কিছুদিন আগে আমাদের ব্রতান (BRETAGNE) অঞ্চলের একটি ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলাম কয়েক দিনের জন্য। ওয়ার্কশপে কাজ দেখে এসে অফিসে বসেছি। খানিক বাদে "পল" নামে বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের একটি কর্মী খুব অমায়িকভাবে করমর্দন করে দাঁড়াল। এটা সেটা কথার পর খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল: "যদি রাগ না করেন, একটা কথা বলব?" অভয় দিতে বলল: "যদি একদিন সন্ধ্যায় (সুবিধে হলে আজই—কারণ আজ তো শুক্রবার) আমাদের বাড়িতে ডিনার খান তা হলে আমার স্ত্রী, আমি ও ছেলেমেয়েরা সবাই খুব খুশী হব। সে সময় ভারতবর্ষের কথা শুনব আমরা সবাই।" ওর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলুম। বললাম: নিশ্চয়ই যাব আজই যাওয়া যাবে। লোকটির মুখে চোখে এক অনির্বচনীয় আনন্দের ঝিলিক দিয়ে গেল। ফরাসী দেশের সামাজিক কাঠামোতে কিন্তু খুব সহজ নয় এটা।

সন্ধ্যায় কারখানা ছুটির পর লোকটি এসে দাঁড়াল অফিসে; বলল: "চলুন যাই তা হলে। আমার গাড়ি নিয়ে এসেছি, আপনি অতদূর বাসে কি করে যাবেন, কষ্ট হবে।" লক্ষ করলাম দুপুরে লাঞ্চে বাড়ি গিয়ে স্যুট প্যান্টে নতুন স্যুট পরে এসেছে।

শহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে লোয়ার নদী পার হয়ে খুব সুন্দর শ্যামল প্রান্তরে এসে পড়লাম। গাড়ি চালাতে চালাতে পল বলল: "মিশেলও আসবে (আর একটি সহকর্মী টেকনিশিয়ান)। ও সোজাই আসবে গাড়িতে।"

ধীরে ধীরে পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি বাড়ির সারি, তারই একটির ফটকে এসে গাড়ি দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামতেই পল-এর ছেলেমেয়েরা এসে ঘিরে ধরল। "এই টে আমার বড় ছেলে—ওই টে বড় মেয়ে......।" এরকম সব কটি ছেলেমেয়ের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিল—ওরাও "বঁ জুর" বলে করমর্দন করে গেল। ঘরের সামনে পলের স্ত্রী গিন্নীবান্নী মত একটি মহিলা "বঁ জুর" বলে অভ্যর্থনা করলেন।

আমি একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলাম। কারণ ফরাসী দেশের রীতি অনুযায়ী কারো বাড়ি নিমন্ত্রণে গেলে কিছু একটা নিয়ে যেতে হয়। পল তো আমায় কারখানা থেকেই সোজা ধরে নিয়ে এসেছে।

সুন্দর ছোট্ট দোতলা বাড়ি ওদের। সামনে একটু গোলাপের বাগান। পল বলল: "এই গ্যারাজ, বাগান আমি নিজেই তৈরি করেছি।" নিচতলায় ওদের তিনটে ঘর, ওপরে দুটি। নিচে খাবার ঘরে টেবিলে বসে কথাবার্তা হচ্ছিল। একটু বাদেই মিশেল এল এক বোতল শ্যাম্পেন নিয়ে। পল ও তার স্ত্রী খুব অনুযোগ করল কেন আনা হয়েছে ওসব!

তারপর আমরা সবাই খেতে বসলাম একসঙ্গে। আমাদের সঙ্গে পলের বড় ছেলেমেয়ে দুটিও বসল। পল ও তার স্ত্রী খুব সংকুচিত হয়ে বলল: "আপনার হয়ত খেতে কষ্ট হবে। আমরা দুজনেই তো কাজ করি, বিশেষ কিছু করতে পারি নি। ওদের মেনুতে ছিল: গরম সুপ, মাছের একটা "অর-দভ্র" —HORS DOEUVRES (ব্রতান মাছের জন্য বিখ্যাত)। রোস্ট পর্ক ও তার সঙ্গে আলুভাজা, স্যালাড ও ক্রিম দিয়ে স্ট্রবেরি ফল। অতি চমৎকার খাওয়া। বেশ ভালো লাল মদও এনেছিল। একটু দুঃখিত হল ওরা যখন বললাম মদ আমি খাই না, আমি জলই খাব।

ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, পৃথিবীর নানা দেশের গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ হল। রাত তখন প্রায় দশটা বাজে। খাওয়ার পর ওরা বলল: চলুন, ওপরের ঘরে গিয়ে বসে গল্প করা যাক। সেখানে কফিও খাওয়া যাবে। ছেলেমেয়েদের ওরা শুতে পাঠিয়ে দিল।

ঘরের কোণে একটি রেকর্ড প্লেয়ার। সে-দিকে তাকাতেই পল বলল: আপনার বাজনা ভালো লাগে? আমার খুব ভালো লাগে। "হ্যাঁ" বলতেই সে ব্রাহ্‌মসের একটি বাজনা লাগিয়ে দিল। তারপর তার প্রজাপতির সংগ্রহ দেখাতে লাগল। "ওই একটি শখ আমার।" রঙ বেরঙের ছোট বড় অপূর্ব সব প্রজাপতি সংগ্রহ করে রেখেছে সে। বিভিন্ন রঙের এই প্রজাপতির পৃথিবীতে এসে ঋতু উৎসবের বাজনা শুনতে শুনতে আমি সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল এক অপরূপ জগতে এসে গেছি। সুন্দর—সুন্দর—এখানে সব সুন্দর শাশ্বত, অবিনশ্বর। এখানে মেশিন নেই, তেল নেই, কালি নেই—নেই শ্রমিক মালিক। আছে একটি সুন্দর ঘর, সুন্দর পরিবেশ, সুন্দর মন। দুটি উষ্ণ হৃদয় চোখে নতুন জগতের স্বপ্ন নিয়ে সংসার গড়েছে। রেকর্ডে বাজছে ঋতু উৎসবের বাজনা। আর ঘরের কোণে রয়েছে মস্ত ফুলদানিতে বাগান থেকে তুলে আনা বিরাট একটি রক্ত গোলাপের তোড়া।

ওরা তখন ছোট্ট গেলাসে করে ও-দা-ভি (L' EAU DE VIE)—"জীবনের জল" সুরা পান করছে!

অজিতকুমার দাস

(১২)

বিয়ের আসরে কনেকে কীভাবে নেওয়া হবে তা নিয়ে একটু মতদ্বৈধ দেখা গেল। কেউ কেউ বললেন, 'মেয়ে নিজেই হেঁটে যাক। আজকাল তো আর ছোট মেয়ের বিয়ে হয় না। সেই আগেকার দিন তো আর নেই। বড় মেয়েকে এভাবে পিঁড়িতে করে ঘোরানো দৃষ্টিকটু।'

কিন্তু অন্দর মহল থেকে আপত্তি উঠল। এ বাড়িতে নিয়ম নেই মেয়ে হেঁটে গিয়ে নিজেই বরের চারপাশে ঘুরবে। মেয়েকে তুলে নিতেই হবে। কেন, সমর্থ জোয়ান ছেলেদের কি অভাব? তারা ক'জন মিলে ধরতে পারবে না পিঁড়িখানা? কি রকম কবজীর জোর তাদের? কয়েক মিনিটের জন্যে একটি মেয়ের ভার বইতে পারবে না?

মৃদুকণ্ঠে মন্দিরা বলল, 'আমি হেঁটেই যাব।'

ইন্দিরা বলল, 'কেন, হাঁটবি কেন? যা নিয়ম নেই তা কেন করতে যাবি।'

সুরজিৎ কাছেই ছিল, হেসে বলল, 'দেখছ কি টুকু, নিয়মনিষ্ঠায় তোমার দিদি এখন দিদিমা সমানা হয়েছেন। কিছু ভেব না। ভার বওয়া আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমি একাই তোমার বাহন হতে পারব।'

মন্দিরার খুড়তুতো ভাইয়ের স্ত্রী অমলা ঠাট্টা করে বলল, 'আপনার তো সবই মুখে মুখে ভাই। কোন কাজে তো এখন পর্যন্ত হাত লাগাতে দেখলাম না। আর সেই সন্ধ্যে থেকে কেবল মেয়ে মহলের কাছ দিয়েই ঘোরাঘুরি—'

সুরজিৎ জবাব দিল, 'কী করব বলুন। হিন্দু বিয়েটাই তো আসলে মেয়ে মহলের ব্যাপার। আমার যা কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা তাতে দেখেছি বিয়ের পৌনে ষোল আনাই স্ত্রী-আচার। সবই আপনাদের হাতে। পুরুষের সমাজ থেকে একজন বর আর একজন পুরোহিতকে শুধু দয়া করে আপনারা নিয়েছেন।'

শাশ্বতী বলল, 'শুধু মুখের মিষ্টি কথায় হবে না। যান এবার আস্তিন গুটিয়ে শ্যালিকার পিঁড়িখানা ধরুন গিয়ে।'

জামাইকে অবশ্য পিঁড়ি ধরতে হল না। তার শালকেরাই এগিয়ে এল। ব্যাপারটা মোটেই স্বস্তিকর নয়। তবু সাঁচির পিঁড়িতে বসে খুড়তুতো দুই ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে মন্দিরা বিবাহসভায় যাত্রা করল।

আকাশের মেঘ কেটে যাওয়ায় বড় সামিয়ানার নিচে উঠোনেই বিবাহ-আসর বসানো হয়েছে। উজ্জ্বল আলোয় সারা বাড়ি ঝলমল করছে। জন পঞ্চাশেক বরযাত্রীর মধ্যে দুজন জার্মান যুবক আছে। কে একজন ইংরেজীতে তাদের সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পুরোহিতের মন্ত্রের ফাঁকে ফাঁকে তার কিছু কিছু কানে যেতে লাগল মন্দিরার। একজন ক্যামেরাম্যান ঘন ঘন ফটো তুলছেন। ইনিও কি ওই জার্মান ভদ্রলোকদের সঙ্গে এসেছেন? মন্দিরার বিয়ের আসরের এই ছবিগুলি কি কোন বিদেশের কাগজে ছাপা হবে? ভাবতে মন্দ লাগছে না মন্দিরার। সব মিলিয়ে এখন যেন ভালোই লাগছে। এত আলো লোকজন সানাইয়ের সুর, পুরোহিতের কণ্ঠে সংস্কৃত মন্ত্র, সম্প্রদানকর্তার আসনে বড় জেঠামশাই, জ্ঞাতি সম্পর্কে দাদা হন বাবার। গরদের ধুতি চাদর তাঁর পরনে, গলায় শ্বেত উপবীত, সৌম্য প্রশান্ত প্রসন্ন তাঁর মুখ। তিনি নিজেই

এক প্রীতিকর পবিত্র পরিবেশ হয়ে উঠেছেন। এতদিনের সেই বিতৃষ্ণা বিদ্বেষ এখন অন্তর্হিত। খানিকটা কৌতূহল খানিকটা আত্মসমর্পণের ভাব নিয়ে মন্দিরা এখন অপেক্ষা করছে। এই উৎসবের আসর তাকে ভবিষ্যতের কোন কক্ষপথে পৌঁছে দেবে কে জানে। যেখানেই দিক মন্দিরার পথ ঠিক হয়ে গেছে। এখন শান্ত পায়ে শুধু অনুগমন। আর ছটফট করে লাভ নেই। মন্দিরার মন এতদিনের অন্তর্দ্বন্দ্বের পর পরম স্বাভাবিকভাবেই এখন যেন সব কিছু মেনে নেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে। অতীতের সব কথা ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের কোন কল্পনাকে মনের মধ্যে পোষণ না করে উৎসবমুখর এই বর্তমান মুহূর্তটিকেই একান্তভাবে আশ্রয় করে থাকতে চাইছে।

তোমাকে মিত্রের চোখে দেখছি।

পিঁড়িতে করে বরের চারপাশে কনেকে সাতবার ঘোরানো হল। তারপর বরের সামনে উঁচু করে ধরা হল তাকে। পিছনে পুরোহিত মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন

অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি...

অক্ষ্যৌ নৌ মধুসংকাশে অনীকং নৌ সমঞ্জনম্‌
অন্তঃ কৃণুষ্ব মাং হৃদি মন ইন্নৌ সহাসতি॥

আমাদের উভয়ের নয়ন মধুময় হোক, আমাদের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি প্রীতির অঞ্জন পরুক, আমাকে অন্তরে গ্রহণ করো, আমাদের উভয়ের হৃদয় ও মন এক হোক।

মন্দিরা মুখ নিচু করে ছিল। কিন্তু সবাই বলতে লাগল, "চোখ তুলে তাকাও, চোখ তুলে তাকাও। ভালো করে দেখ। লজ্জা কি. দেখ, দেখ, এই সময় দেখতে হয়।"

বর আর কনের মাথার ওপর আচ্ছাদন। শুধু দুজন দুজনকে দেখবে। পরস্পরের সেই প্রথম সলজ্জ শুভদৃষ্টি বাইরের আর কেউ দেখতে পারবে না।

সবাইর অনুরোধে মন্দিরা চোখ তুলে তাকাল। মাত্র পলকের জন্যে। কিন্তু সেই একটি পলকেই বুঝতে পারল যাকে সে এতদিন ধরে দেখেছে তার সঙ্গে এই সদ্যদৃষ্ট মুখের কোন তুলনাই হয় না। যদিও মাথায় উচ্চচূড় মুকুট, যদিও মুখখানি চন্দনচর্চিত, তবুও বড়ই কালো আর প্রায় গোলাকার। পুরু ঠোঁট, চ্যাপটা নাক। চোখদুটি সুন্দর নয়। সেই মুখের কাছে এই মুখ?

কিন্তু ছি ছি ছি, সে স্মৃতি এখন কেন? সেই তুলনায় কি এখন আর কোন মানে হয়? তা ছাড়া বাইরে সুন্দর হলেই তো মানুষের সবখানি সুন্দর হয় না। সুন্দর যে হয় না তা মন্দিরার চেয়ে কে আর বেশি জানে? তিনি অনেক বই আর একটি সেতার পাঠিয়েছিলেন। কেন, কী দরকার ছিল? কেই বা নিমন্ত্রণ করেছিল তাঁকে? মন্দিরা করেনি। সে অত বোকা নয়, সম্মানবোধহীনা নয়। তবে কে এমন অপকর্ম করল? ছন্দাই কি? মজা দেখবার জন্যে সেই কি গোপনে গোপনে আর একখানি চিঠি পোস্ট করে এসেছে? প্রথম চিঠিখানা মন্দিরা আর কাউকে না জানিয়ে পোস্ট করতে বলেছিল। দ্বিতীয় চিঠির বেলায় ছন্দা হয়তো দিদির ওপর
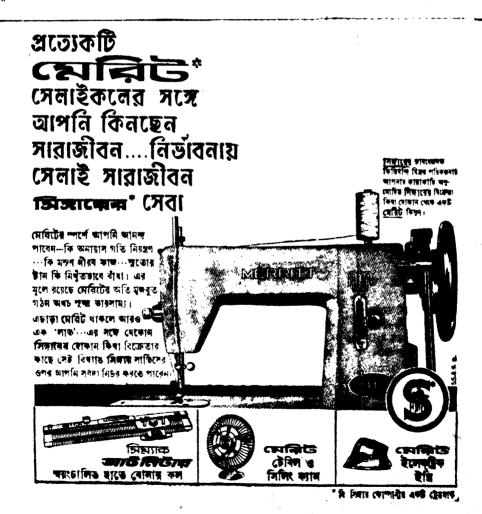
টেক্কা দিয়েছে। কিন্তু চিঠি পেয়েই তিনি উপহার পাঠালেন কোন সাহসে? কোন লজ্জায়? বাবা সেগুলি ফেরৎ দিয়ে ভালোই করেছেন। মন্দিরা নিজে হলেও ফেরৎ পাঠাত।

দুদিকে দুপক্ষের পুরোহিত। বরাসনে বর। সামনে সিঁদুরের পুত্তলী আঁকা জল-ঘট, আম্রপল্লবে শোভিত। মন্দিরার মন্ত্রঃপূত হাতখানি জ্যেঠামশাই আর একখানি হাতে তুলে দিলেন। মন্দিরা সেই অপরিচিত হাতের স্পর্শ অনুভব করল। স্বল্প অব-গুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করল হাতখানা কালো, রোগা, আর নরম। তবু সেই হাতের উপর মন্দিরার হাতখানা কেন যেন একটু কেঁপে উঠল। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন—

বরেণাস্মং বৃণে ত্বাদ্য বৃণে চিত্তং বৃণে মনঃ।
বৃণে সৌমনসভ হার্দিম্ আত্মানং
হ্যাত্মনা বৃণে॥

জ্যেঠামশাইর সবই অদ্ভুত। তিনি সংগে সংগে সংস্কৃত শ্লোকগুলির বাংলা বলে দিচ্ছেন—তুমি বরণীয়, তোমাকে আজ বরণ করি। তোমার মনকে বরণ করি, তোমার প্রীতি ও তোমার হৃদয়কে বরণ করি, আমার আত্মা দিয়ে তোমার আত্মাকে বরণ করি।

যদন্তরং তদ্ বাহ্যং যদ্ বাহ্যং তদন্তরম্
অসৌ মে স্মরতাদিতি প্রিয়ো
যে স্মরতাদিতি॥

যা অন্তরে আছে তা বাইরে প্রকাশ হোক যা বাইরে প্রকাশ হয়েছে তা অন্তরের বস্তু হোক। ইনি আমাকে স্মরণ করুন, ইনি আমার প্রিয় বলেই আমাকে প্রীতিপূর্বক স্মরণ করুন।

স্ত্রী-আচারের জন্যে বর-কনেকে ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। চিকনপাটির ওপর স্বামীর পাশে বসে মন্দিরা অনন্যমনা হতে চেষ্টা করল। অন্য কোন কথা ভেবে এখন আর লাভ নেই। অন্য কারো কথা ভাবা এখন পাপ।

দিদি-বউদিরা সবাই মিলে বরকে কীভাবে নাস্তানাবুদ করে তুলছে মন্দিরা সকৌতুকে তাই বরং আড়চোখে একটু তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল।

কত খেলাই যে আছে। আজকালকার মেয়েরা এসব খেলা জানে না। বিশেষ পছন্দও করে না। কিন্তু মায়ের ছোট মাসিমা, মন্দিরার রাঙাঠানদি কোন খেলা বাদ দিতে চাইলেন না। তাঁর পাকা চুলে সিঁদুর। মুখের কথাগুলি রসে টসটস করছে।

রাঙাঠানদি বললেন, "ভাই বর, এসব খেলা তো আজকালকার মেয়েরা খেলে না। তারা সব নতুন খেলা খেলে। এসো দুজনে মিলে একটু সেকেলে খেলা খেলা যাক। আমি তো সেকেলে মানুষ। ভাবগতিক দেখে তোমাকেও খুব একেলে বলে মনে হচ্ছে না।"

বর বলল, "কেন বলুন তো?"

ঠানদি বললেন, "চুলের অমন কদমছাঁট কেন ভাই? আমার নাতনী কিন্তু অমন ছাঁট পছন্দ করে না।"

"বেশ তো এখন থেকে বাবরি রাখলেই হবে।"

ঘরসুদ্ধ মেয়েরা হেসে উঠল।

মন্দিরা ভাবল, "রসবোধ আছে। ঠাট্টা-তামাসার জবাব দিতে তো জানে।"

রাঙাঠানদি সহজে ছাড়লেন না। মুঠি মুঠি সরু চাল মন্দিরার হাতে দিয়ে বললেন, "বরের গায়ে ছুঁড়ে মার। আহা, অত আস্তে আস্তে নয়। জোরে খুব জোরে। লাগবে না লো, লাগবে না। ভাবিসনে তুই। এতো কেবল চাল। তুই পাথরের কুচি ছুঁড়লেও আমার নাতজামাইর কাছে তা পুষ্পবৃষ্টি মনে হবে।"

তারপর ঠানদির হুকুমে পাটির ওপরে ছড়িয়ে পড়া চালগুলি সব কুড়িয়ে বরকে ফের কনের মুঠি ভরে দিতে হল। কনে আবার ছড়াল, বর আবার কুড়োল, বারবার তিনবার।

মন্দিরা দেখল ভদ্রলোক আপত্তি করছেন না। রাঙাঠানদির মুখের কথা যেন শাস্ত্র-বাক্য। সবই নির্বিবাদে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছেন।

ঠানদি বললেন, "প্রথম পরীক্ষায় পাশ করলে। এ হল ধৈর্যের পরীক্ষা। কোন পুরুষ কেমন মেজাজের মানুষ হবে তা আমরা এই বাসরঘরে প্রথম রাত্রেই টের পাই।"

আরো অনেক পরীক্ষা করলেন ঠানদি। এক হাঁড়ি জলের মধ্যে ঘূর্ণিস্রোতের সৃষ্টি করে দুটি কুটো তার মধ্যে ভাসিয়ে দিলেন। বরকে বললেন, "ওদের এক করে দাও।"

বর বলল, "ভাববেন না, ভাসতে ভাসতে ওরা আপনিই মিশে যাবে।"

ঠানদি বললেন, "তাই কি হয় ভাই।

নিজেরও হাত লাগাতে হয়। শুধু স্বভাবের ওপর ছেড়ে দিলে চলে না।"

যতক্ষণ সেই কুটো দুটো আপনা আপনি মিশে না যেত ততক্ষণ বরকে সেই হাঁড়িতে ধরা সমুদ্রের দিকে স্থিরনেত্র হয়ে থাকতে হল। এমনি বার বার তিনবার।

তারপর দ্বীপের খেলা শুরু করলেন রাঙা ঠানদি। হেসে বললেন, "এসো ভাই বর, এতক্ষণ জল নিয়ে খেলেছি, এবার এসো একটু আগুন নিয়ে খেলি। জীবনভোর এই দুই খেলাই তো খেলতে হবে। একবার জলের খেলা আর একবার আগুনের খেলা। কেমন খেলোয়াড় তুমি তার একটু নমুনা দেখাও।"

ঠানদি এবার দুটি চিত্রিত সরার মধ্যে একটি পিতলের জ্বলন্ত প্রদীপ রাখলেন। তারপর ওপরের সরাটি সরিয়ে নিয়ে বললেন, "দেখেছ? এই হল পরিবার। ঘরের বউ। পরিবারকে কি বেআব্রু করে রাখবে? তা কি কোন পুরুষে করে? ঢাকো ঢাকো, আব্রু দাও।"

সরাটি একবার পাশে একবার পিছনে একবার ঘরের কোণে আর একবার আঁচলের তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে রাখতে লাগলেন ঠানদি। বরের কাজ হল সেই আবরণ খুঁজে বার করা। ঠানদি সরা বার বার সরান, আর বর বার বার তা কুড়িয়ে এনে দ্বিতীয় সরার মুখে বসিয়ে দেয়।

ধৈর্যের পরীক্ষায় এবারও বর বিজয়ী।

রাঙাঠানদি বললেন, "সাবাস। জীবনভোর এই করবে। বউকে ঢেকে রাখবে। তার কোন দোষ বাইরে ছড়াতে দেবে না। মনে রেখো বর, সতীর নিন্দের সব চেয়ে বড় অপযশ হল পতির। পুরুষের দুর্নামে স্ত্রীর কিছু হয় না। কিন্তু স্ত্রীর দুর্নামে পুরুষের দুকান কাটা যায়। এই সরার ওপর হাত রেখে তিনবার প্রতিজ্ঞা করো ভাই বর—আমি আমার বউয়ের সব দোষ ঢাকব, সব দোষ ঢাকব, সব দোষ ঢাকব। হ্যাঁ তিনবার। তিনবার না হলে মন্তরতন্তর ফলে না।"

শুনতে শুনতে মন্দিরার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। এ কি খেলা শুরু করলেন রাঙা-ঠানদি। অবশ্য এ খেলা উনি দিদির বেলাতেও খেলেছিলেন। রাঙা ঠানদি হয়তো কিছু জানেনও না। কোনরকম কিছু না ভেবেই তিনি এসব পুরোন স্ত্রী-আচার পালন করে যাচ্ছেন। তবু মন্দিরার মন থেকে অস্বস্তি দূরে হচ্ছে না।

বর হেসে বলল, 'যেভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছেন তাতে মনে হয় আপনার নাতনীর দোষের পরিমাণ কিছু বেশি।'

রাঙা ঠানদি তাঁর পাকা মাথা নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'মোটেই না। আমার নাতনীটি একেবারে খাঁটি সোনা। সবটুকুই গুণ। তোমার নিজের যদি চেনার ক্ষমতা না থাকে তুমি জহুরী দিয়ে যাচাই করে নিতে পারো ভাই। আমার নাতনীর কোন দোষ নেই। মেয়েদের কোন দোষ নেই। যত নষ্টের গোড়া তোমরা পুরুষ মানুষরা।

ইন্দিরা বলল, 'তোমার বুড়ো জহুরীর কাছ থেকে তুমি বোধহয় এসব শিখেছ ঠানদি। সবাই কি একরকম নাকি?'

রাঙা ঠানদি বললেন, 'বুড়ো বলিসনে দিদি, বুড়ো বলিস নে। মনে বড়ো দাগা লাগে। চুল পাকলেই কি মানুষ বুড়ো হয়? মুখ শুকিয়ে আমসি হলেই কি মানুষ বুড়ো হয়? মুখের ভিতরের জিভখানা কিরকম তাই তোরা একবার দেখ।'

ইন্দিরা বলল, 'দেখেছি ঠানদি। জিভ তো নয় একেবারে জিভেগজা।'

রাঙা ঠানদি খুশি হয়ে বললেন, 'তবে? তবে যে বুড়ী বুড়ী করছিলি? আচ্ছা ভাই বর, তোমাকেই সাক্ষী মানি ঘরের মধ্যে তো এতগুলি মেয়ে গিজ গিজ করছে। কত বেশ-বাসের বাহার, কত রঙ কত ঢং। এখানে সব চেয়ে সেরা সুন্দরী কাকে তোমার মনে হচ্ছে বলতো?'

বর হেসে বলল, 'আপনাকে।'

রাঙাঠানদি সঙ্গে সঙ্গে তার চিবুকে হাত দিলেন, 'বাঃ। বেঁচে থাকো দাদা, বেঁচে থাকো। এই তো চাই। আর আমার কি মনে হচ্ছে জান? এমন সুপুরুষ আমি আর জন্মে দেখিনি। বুঝলি মন্দিরা, দেখাদেখির রীতিই হল এই। তুই বলবি, তোমার মত মানুষ হয় না, আর আমার নাতজামাই বলবে তোমার মত মেয়ে হয় না। তবেই তো রাজযোটক হবে।'

রাঙাঠানদির খেলা শেষ হল তো এল গানের আবদার। বাসরঘরে গান না হলে চলে নাকি? কিন্তু সবাইর মুখেই কেবল না না না। গান জানে অনেকেই। কিন্তু সবাইর সামনে গাইতে কেউ রাজী নয়। গানের নাম শুনে মেয়েরা একটি দুটি করে পালাতে লাগল। ইন্দিরা মীনাক্ষীকে ধরে ফেলল, 'তোমার বন্ধুর বিয়ে, তুমি একখানা গান না গাইলে কিছুতেই ছাড়ব না।'

মীনাক্ষী মিনতি করে বলল, 'গান আমি জানিনে ইন্দুদি।'

জন্দা বলে উঠল। 'না না জানে। আমরা শুনেছি।'

মীনাক্ষী বিনয় করে বলল, 'সে ঠিক সবাইকে শোনাবার মত নয়।'

রাঙাঠানদি বললেন, 'শোন কথা। এখানে সবাই আবার কোথায়। পুরুষ তো এখানে একজনই। তোমার সইয়ের বর।

আমরা সবাই কদমতলায় গোপের নারী
গাছের ওপর পুরুষ কেবল বংশীধারী।'

শেষ পর্যন্ত গান গাইতেই হল মীনাক্ষীকে। হারমনিয়ম বাজাতে জানে না। খালি গলায় গায়। গলাটি মিষ্টি। যেটুকু পটুত্ব আছে তা বিনা শিক্ষার।

একটু ভেবে মীনাক্ষী গান ধরল—

'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো
তোমার এই দেবালয়ের প্রদীপ করো—'

গানের সবাই প্রশংসা করল। বেশ গেয়েছে মীনাক্ষী।

শুধু সুরজিৎ ঘরের বাইরে থেকে বলল, 'এর পর বোধ হয় রামমোহন রায়ের—মনে করো শেষের সেদিন ভয়ংকর। বাসরঘরে কোথায় মীনাক্ষী দু-একটি রাগ-সংগীত অনুরাগ সংগীত গাইবে তা তো নয় একেবারে আধ্যাত্মিকতায় চলে গেলে!'

মন্দিরা ভাবল এ গানটি কি মীনাক্ষী তাকে লক্ষ্য করে তার জন্যেই গাইল। গানের ভিতর দিয়ে এ কি মিনুর সেই চিরাচরিত উপদেশ আর পথ নির্দেশের ধারা?

কিন্তু পথ তো মন্দিরার ঠিক হয়েই গেছে।

ঠিক হয়ে গেছে। তবু বাসরঘরে একজন অপরিচিত—অপরিচিত না হোক অল্প পরিচিত পুরুষের সান্নিধ্যে মন্দিরা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। আর কোন উপায় নেই। আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। মুখ বুজে মেনে নিতে নিতে মন্দিরা সবই মেনে নিয়েছে। আসতে আসতে এই বাসরঘর পর্যন্ত এসেছে। এখন এই ঘরই তার পৃথিবী। বাইরের কারো কথাই আর মনে রাখলে চলবে না। সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে হবে। ভালো লাগুক আর না লাগুক, ইচ্ছা করুক আর না করুক তার জীবন মিহির মুখুয্যে নামে এই মানুষটির সঙ্গে গাঁথা হয়ে রইল। সে এই মানুষটির স্ত্রী। এই এখন মন্দিরার একটি মাত্র পরিচয়। জীবনভোর এই পরিচয়কেই মনে করে রাখতে হবে, এই পরিচয়কেই সার্থক করে তুলতে হবে। সেই তার জীবনের একমাত্র কাজ। ভালো লাগুক আর না লাগুক এই হবে একমাত্র কর্তব্য। মীনাক্ষী বলে 'কর্তব্য যে সব সময়েই প্রীতিকর হবে তার কোন মানে নেই।'

কিন্তু মন্দিরার ভয়, কোন সময়েই যদি প্রীতিকর না হয়। তাহলে তো এক শুকনো কর্তব্যের বোঝা সারাজীবনই তাকে বয়ে বেড়াতে হবে।

ঘরে এখন তীব্রদ্যুতির বিদ্যুৎ বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরের আলোগুলিও এখন জ্বলছে না। এই শেষ রাতে উৎসবমুখর বাড়িটি সত্যিই যেন এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। যারা যাবার তারা চলে গেছে। যারা যেতে পারেনি তারা যে যেখানে পেরেছে ঘুমোবার জায়গা করে নিয়েছে। মন্দিরা লক্ষ্য করল তাদের এই ঘরখানি কিন্তু একেবারে নিষ্প্রদীপ হয়নি। এক কোণে পিতলের পিলসুজের ওপর ঘিয়ের দীপ জ্বলছে। বাসরঘরের মঙ্গলদীপ। এ দীপ নেবাতে নেই। এ দীপটি সারারাত জ্বালিয়ে রাখতে হবে। সারাজীবন জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

মেঝেয় বিছানা পেতে শুতে হয়। উঁচু খাটে শোয়ার নিয়ম নেই আজ। বিছানার এক ধার ঘেঁষে পড়ে রইল মন্দিরা। যে অবগুণ্ঠন তাকে পরানো হয়েছিল তা খুলল না। এই গুণ্ঠন আজ তাকে সারা পৃথিবী থেকে আড়াল করুক। পরম নিভৃতির মধ্যে তাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখুক। কিন্তু এই শেষ রাতেও পাশের ভদ্রলোকের কৌতূহল শেষ হয়নি। ঠানদির সঙ্গে অত রসালাপের পরেও আলাপের তৃষ্ণা মেটেনি।

তিনি মন্দিরার একটু কাছে সরে এসে বললেন, 'ঘুম পেয়েছে বুঝি? ক্লান্তি লাগছে, না?'

দ্বিতীয়বারে প্রশ্নের মন্দিরা সংক্ষেপে জবাব দিল, 'হুঁ'!

ভদ্রলোক সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'ক্লান্তির আর দোষ কি। সারাদিন ধরে আচারের যা অত্যাচার চলে। হয়তো স্নেহের অত্যাচার। আমার কোন কোন বন্ধু একেবারে কালাপাহাড়। কিছু মানে না। তারা রেজিস্ট্রি ম্যারেজের পক্ষপাতী। বাকি আচার অনুষ্ঠান তাদের পক্ষে সময় নষ্ট আর অর্থ নষ্ট। এই স্পীডের যুগে এমন সব অতিকায় মহোৎসবের সময় কই মানুষের। তারা নেহাৎ মিথ্যে বলে না।'

ভদ্রলোক একটু থামলেন। হয়তো মন্দিরার কাছ থেকে কিছু একটু মন্তব্য শোনার জন্যে প্রতীক্ষা

করলেন। যাই হোক কিছু অন্তত বলা নিশ্চয়ই ভদ্রতা। কিন্তু মন্দিরা কী যে বলবে কিছুই ভেবে পেল না। মীনাক্ষী হলে হয়তো পারত। যে কোন সময় যে কোন রকমের তত্ত্বে তর্কে আলোচনায় তার অপার উৎসাহ। কিন্তু মন্দিরার ভিতর থেকে সামান্য একটা কথা বলবার আগ্রহটুকুও এমন করে কেড়ে নিল কে?

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'তারা মিথ্যে বলে না! কিন্তু আমার যেন কেমন বড়ো মায়া হয়। তাদের মত আমি সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারিনে। তারা এইসব প্রথা আচার, রিচুয়ালের মধ্যে কোন সৌন্দর্যই দেখতে পায় না, আমি পাই। তারা বলে আসলে এ আমার গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা। পৈতৃক প্রভাব। তারা মাঝে মাঝে আমাকে ঠাট্টা করে বলে টালিগঞ্জের আনোয়ার শা রোডে দুজন মুকুন্দ মুখুয্যে আছেন। একজন সিনিয়র মুকুন্দ আর একজন জুনিয়র মুকুন্দ। মুকুন্দলাল মুখোপাধ্যায় আমার বাবার নাম। জানো বোধ হয়?'

জানবে না কেন, জানে। শ্বশুরের নাম মন্দিরা অনেকবারই শুনেছে। কিন্তু জানান দিল না। তাহলে অনেক কথা বলতে হয়। আলাপে যোগ দিতে হয়। বাসরঘরে এ ধরনের আলাপ কেউ করে কিনা মন্দিরার জানা নেই। অন্তত সে কারো কাছে কখনো শোনেনি। মন্দিরার যতদূর ধারণা বাসর-ঘর এ ধরনের তত্ত্ব আলোচনার জায়গা নয়। কিন্তু মন্দিরার বেলায় সব অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটবে বলে কপালে লেখা আছে। ভদ্রলোক বিয়ের আগে তাকে নিজে দেখতে আসেননি। বাপ-মার দেখাকেই পাকা দেখা বলে মেনে নিয়েছেন। আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে তিনি নাকি বলেছেন, 'একদিন মেয়ে দেখে আমি আর কতটুকু দেখব? কয়েক মিনিটের আলাপে আমি আর কতটুকু বুঝব। কয়েক বছর ধরে কোর্টশিপ যদি হত তাহলে আমার যাওয়ার একটা মানে ছিল। তার চেয়ে না দেখার রোমানস, প্রথম দৃষ্টিতেই শুভদৃষ্টির রোমানস আমার কাছে বড়।'

কিন্তু ভদ্রলোক এখন যেসব কথা বলছেন তাতে ও'কে তো খুব রোমাণ্টিক বলে মনে হচ্ছে না। বরং মন্দিরার কেন যেন মনে হল নিজে দেখতে শুনতে ভালো বলেই তিনি আর বেশি যাচাই বাছাইয়ের প্রয়োজন বোধ করেননি। কে জানে, নিজের শালীনতাই তাঁকে হয়তো এতখানি উদার করেছে।

ভদ্রলোক তাঁর স্বগতোক্তি শেষ করলেন, 'কিন্তু আমার কথাটা ভুল বোঝো না। দেখতে টেকতে অনেকটা একই রকম হলেও আমি আমার বাবার অবিকল প্রোটোটাইপ নই। আমি তাঁর চেয়ে আলাদা। আমি নির্বিচারে গ্রহণ করিনে। বিচার করে গ্রহণ করি। আর দরকার হলে বর্জন করতেও জানি। তিনি একটু থামলেন। তারপর বললেন, কিন্তু তোমার বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। তুমি ঘুমোও। আর তোমাকে ডিস্টার্ব করব না।'

ভদ্রলোক পাশ ফিরলেন। আর আশ্চর্য, ও'র যেন সাধা ঘুম। খানিকক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়লেন। আর মন্দিরা এতক্ষণ ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল। তার শাস্তি হিসেবে বোধহয় তার আর সত্যিকারে ঘুম এল না। এ পাশে ফিরে ও পাশে ফিরে অনেক চেষ্টা করল। কিছুতেই ঘুম এল না। মন্দিরা একবার ভাবল উঠে গিয়ে ঠাণ্ডা জলে মুখহাত ধুয়ে আসে। কিন্তু উঠতে সাহস হল না। যদি ও'র ঘুম ভেঙে যায়, ঘুম ভাঙবার পর টের পান মন্দিরা ঘুমায়নি, জেগেই আছে—সে আর এক বিপদ হবে। তার চেয়ে বাকি রাতটুকু এইভাবে কাত হয়ে পড়ে থাকা ভালো। রাত্রি আর কতটুকুই বা আছে। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

কিন্তু কাটতে যেন আর চায় না। ভারি অসহ্য মনে হতে লাগল মন্দিরার। মনে হল এই নিঃসঙ্গ বিনিদ্র রজনীর যেন আর শেষ নেই। এ বাড়িতে সবাই যেন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। শুধু তারই চোখের ঘুম চলে গেল। পৃথিবীতে সবাইরই সঙ্গী আছে শুধু তারই কোন সঙ্গী রইল না।

হঠাৎ কিসের এক অবর্ণনীয় অহেতুক যন্ত্রণায় মন্দিরার বুক ভেঙে কান্না এল।

কাঁদা উচিত নয়। দেয়ালের কাছে পিলসুজের ওপর মঙ্গল দীপ জ্বলছে। মন্দিরার ঠাকুরদার আমলের এই দীপ। এই মঙ্গল দীপ ঠাকুরদা ঠাকুরমার ঘরে, বাবা-মার ঘরে জ্বলেছে, পিসীদের, দিদির বাসরশয্যা স্নিগ্ধ পবিত্র আলোয় ভরে দিয়েছে; কিন্তু তার বেলায় এমন হল কেন? তার বেলায় দীপটাকে এমন উদ্ভট রাক্ষসের চোখের মত দেখাচ্ছে কেন? পিলসুজের নিচেই বরণডালা। কত সুন্দর করে আলপনা দিয়েছেন মা, কত সুন্দর করে সাজিয়েছেন। পঞ্চ শস্য, পঞ্চ পুতুল, পঞ্চ মধু, পঞ্চ প্রদীপের মাঙ্গলিক।

তবু চোখের জল কেন? এও কি মঙ্গল চিহ্ন? এও কি শান্তিবারি? না কি অশান্তির বন্যার সূচনা?

মন্দিরা সভয়ে চোখ বুজল। (ক্রমশ)

রূপকথার কলকাতা

রূপচাঁদ পক্ষী
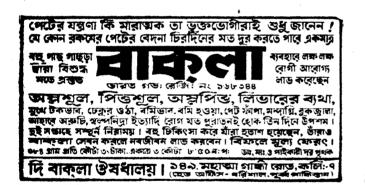
"Calcutta is a potpourri of sound and silence, a clash of smells & colours, a disharmony of history & culture, a kalidoscopic minging of people of all shades of colour, tradition, wealth & poverty."

বর্গী তাড়াতে মার্কুইস অব হেস্টিংস খাল কাটলেন কাশীপুর আর বাগবাজারের কোল থেকে। খালের নাম হলো মারহাট্টা ডিচ্। এরই এক প্রশাখা গেল মানিকতলা পার হয়ে বেলেঘাটা, ধাপা, অন্যটির নাম কৃষ্ণপুর খাল। এই খাল যোগাযোগ স্থাপন করলো মহিষবাথান, ঘাসখালি, ধর্মতলা, ভাঙ্গর, অর্থাৎ উভয় দিকেই এই দুটি খাল গিয়ে মিশলো অকূল জলার সঙ্গে। কলকাতার বাজারের জন্য মাছ আর কাঁচা তরিতরকারি এই দুই পথে মোটরলঞ্চ আর গয়নার নৌকোয় ভেসে এলো। বারাসত-বসিরহাটের ছোট রেল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বহুদিন, ফলে এই পথই হলো একমাত্র পথ। উল্টোডিঙ্গি ইস্টিশন ছাড়িয়ে পূর্বদিকে আধ মাইলটাক হেঁটে গেলে পাওয়া যাবে দক্ষিণদাড়ী বা দুর্গাপুর অঞ্চল। সেই দুর্গাপুর অঞ্চলের জলা—নলখাগড়া, শর আর বেতবনে ভরা মাইল মাইল দুর্গম জায়গা উত্তর-পূর্ব কলকাতার বিভীষিকা ছিলো একদা। ডাকাতের দল লুকিয়ে থাকতো এর ভেতর, দু-তিনটে কালী-মন্দির ছিলো, সেখানে আকছার নরবলি হতো, চোলাই মদের ভাটি ছিলো শতাধিক—কত রকম শয়তানির আকর ছিলো এই অঞ্চল, তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য। কলকাতার এক প্রান্তে হুগলী নদী, অন্য প্রান্তে এই দুর্দান্ত জলাভূমি—দুদিক থেকেই কলকাতার বৃদ্ধি রোধ করে রেখেছে। উত্তর-দক্ষিণে, টালা-টালিগঞ্জ-বিস্তৃত কলকাতার এই একপেশে প্রসার আর যাই হোক, কলকাতার বর্ধমান জনসংখ্যার যোগ্য নয়। আধুনিক শহরের সংজ্ঞায় এই একপেশে প্রসারণের কোনো মূল্যই নেই। অধিকন্তু শহরতলির এই জলা যে শহরের স্বাস্থ্য আর স্যানিটেশনের প্রতিকূলে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

এই জলা অঞ্চলের নাম লবণ হ্রদ। মোট আঠারো বর্গমাইল এলাকা। বাগজোলা পাম্পিং স্টেশনে মেশিন বসিয়ে হুগলী নদীর পলিমাটি আর কাদাজল তুলে আনা হলো এই আঠারো বর্গমাইলের ভেতর চার বর্গ-মাইল অঞ্চল ভরাট করার জন্যে। অবশিষ্ট চোদ্দ বর্গমাইল স্থান, স্থির হলো ডাচ পোল্ডার রীতিতে চাষবাসের কাজে লাগানো হবে। পুনরায় স্থির করা হলো, আরো দুই বর্গমাইল জায়গা—অর্থাৎ মোট ছয় বর্গ-মাইল অঞ্চলে এক নতুন শহরের পত্তন করা হবে। এই সুবার্বন অঞ্চলে আধুনিক শহরবাসের সুযোগ-সুবিধা সবই থাকবে—নতুন রাস্তা-ঘাট, পার্ক, স্কুল-কলেজ; হাসপাতাল তৈরি হবে। রিক্লেমেশন শুরু হয়েছে প্রকৃতপক্ষে ১৯৬২ সালের মার্চ মাস থেকে, চৌষট্টি সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সাতশত একর জমি ভরাট করা হয়ে গেছে, মোট এলাকায় দু হাজার সাত শত একর জমি আছে এবং এই অঞ্চল পরিপূর্ণভাবে ভরাট করতে গেলে কমপক্ষে নব্বই মাস লাগবে। শহর পত্তন শেষ হতে আরো ন বছর সময় লাগবে কল্পনাও করা হয়েছে।

এই লবণ হ্রদ পরিকল্পনা কার্যকরী হলে একদিকে যেমন শহরের স্বাস্থ্য ও স্যানি-টেশনের উন্নতি হবে, অন্যদিকে শহরে যে [illegible] উত্তরোত্তর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা থেকে আংশিক নিস্কৃতি পাওয়া যাবে। [illegible] দু লক্ষ লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই নতুন উপনিবেশে।

লবণ হ্রদ অঞ্চলের উপনিবেশ ছাড়া অবশিষ্ট বারো মাইল অঞ্চল ডাচ পোল্ডার রীতি অনুসারে চাষের কাজে লাগানো হবে। এই পোল্ডার রীতি আর কিছুই নয়—মোট আবাদি অঞ্চলের চতুর্দিকে বাঁধ দিয়ে সুরক্ষিত করা হবে—যাতে বাইরে থেকে বন্যার জল তার মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে এবং এ ছাড়া ব্যবস্থা থাকবে ভিতরের উদ্বৃত্ত জল পাম্পের সাহায্যে যাতে নিষ্কাশিত করা যায়।

এই বস্তু-আটুনি মনোভাব, বিশেষজ্ঞরা বলতে পারবেন, কেন নিতে হচ্ছে? এলিভেশন কম বলে? সেক্ষেত্রে আমাদের মনে হয়, অধিকতর এলিভেট করে বিশাল বাঁধের এই অর্থব্যয় এড়ানো যেতে পারতো। বন্যার লোনাজল ঢুকে পড়ার সম্ভাবনা কোথায়? এবিষয়ে আমাদের কল্পনায় অস্পষ্টতা রয়ে গেলো।

যাই হোক, অধিকন্তু ন দোষায়! জানা যাচ্ছে, এই পোল্ডার অঞ্চলে চাষের জল ধরে রাখার জন্যে বিশালকায় এক রিজার্ভার তৈরি হবে। রিজার্ভার জলপূর্ণ হলে উদ্বৃত্ত জল সরাসরি কুলটী নদীতে ফেলে দেওয়া হবে। ফলে, কুলটী নদী অধিকতর নাব্য হবে আশা করা যায়। এই জমি হবে দো-ফলা এবং এতাবৎকাল সুদূর

— লবণহ্রদে গঙ্গার পলিমাটি ক্ষেপণের পাইপ লাইন
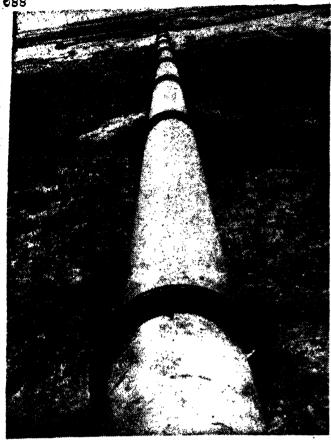
যুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং দার্জিলিঙ থেকে কলকাতায় যে কাঁচা তরি-তরকারির আমদানি করতে হতো, কল্পনা করা হচ্ছে, তার আর মোটেই প্রয়োজন হবে না। কলকাতা কলকাতার ভিতরেই জীবনধারণ করবে অদূর ভবিষ্যতে। কলকাতার কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবার দিনের আর দেরি নেই। লবণ হ্রদ পরিকল্পনা থেকে একটু ব্যক্তিগত কথায় সরে যেতে হচ্ছে, পরিষ্কার মনে নেই, আসার না যাওয়ার পথ—দরিয়াগঞ্জ লেভেল ক্রসিং-এর কাছে আমাদের দিল্লি-কালকা মেল হঠাৎ থেমে গেলো। খোঁজ নিয়ে জানলাম, দু-তিন ঘণ্টা দেরি হবে ছাড়তে—কলকব্জার গণ্ডগোল। যাত্রী-দের অনেকেই নেমে গেলেন। আমরাও নেমে যমুনা ব্রিজের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। ফেব্রুয়ারীর শেষের দিক কিংবা মার্চ মাস হবে। যমুনা ব্রিজের তলে আর যমুনার দেখা পেলাম না। রিক্লেমেশন-এর পর লবণ হ্রদের যেরকম আধা-মরুভূমির রূপ হয়েছে যমুনারও তাই। সন্ধ্যার অন্ধকার তখনো গাঢ় হয় নি যথেষ্ট—বহুদূর পর্যন্ত চোখ চলে। দেখি, নৌকার লণ্ঠনের মতো অপর্যাপ্ত আলোর বিন্দু ইতস্তত। আমার কৃষিবিদ্ বন্ধুকে শুধিয়ে জানতে পারলাম, ওগুলো চাষীর হাতের লণ্ঠন—হাজার হাজার চাষী, নাকি নৌকা নেমে পড়েছে যমুনা ব্রিজের আধা-মরুভূমি অঞ্চলে—ধু-ধু করছে আদিগন্ত বালি—চায়ের জমির মতো ডোরাকাটা। শুনলাম, এ-সময় লক্ষ লক্ষ টাকার তরমুজ-খরমুজ আর ফুটি-গুড়মির উৎপাদন হয় এই জমি থেকে। সেই কথা, কলকাতায় যখন লবণ হ্রদ দেখতে গেলাম, তখন আমার মনে পড়লো। কিন্তু কোথায় কলকাতায় যমুনার চাষার সেই স্বভাব! একই আবাদের এক-প্রান্তে শূন্য আর অন্যপ্রান্ত পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি।

হ্রদ অঞ্চল ঘুরে ঘুরে প্রথম যখন দেখি, তখন ছিলো শীতকাল। নতুন জমির গায়ে ভেজিটেশনের চিহ্নমাত্র নেই। শুনলাম, হাজার হাজার টাকা খরচ করে সুন্দরবনের জলা অঞ্চল থেকে এক ধরনের লতা আনা হয়েছে। হ্রদ অঞ্চলে ইতস্তত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সব লতা। কারণ? কারণ হলো—এই লতা বিস্তৃত হবে, শিকড় বসাবে আমূল বালির বুকে—ঝোড়ো হাওয়া কিছুতেই বালি তুলে নিয়ে যেতে পারবে না এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। পাশের কৃষ্ণপুরে আর জঞ্জাল হয়ে যাবে না এই অকস্মাৎ বালির পাহাড়ে। চিন্তা বৈজ্ঞানিক—কিন্তু মার্চ মাস পর্যন্ত সেই সব অক্টোপাশস্বরূপা লতার চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা যায় নি। আমাদের মনে হয়, এই নিষ্ফলা লতাপাতার চেয়ে হ্রদের জমিতে তরমুজের চাষ অনেক বেশি লাভজনক হতো—অন্তত বর্ষা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত। বৃষ্টির পর এই আধা-মরুভূমি অঞ্চল যে সবুজে ভরে যেতো না, অর্থাৎ সাধারণ মুথা কিংবা নাজি ঘাসে সবুজতর হতো না, এই নতুন জমি—কে বলতে পারে? ইতস্তত পুরানো শর আর নলখাগড়ার ক্ষীণ মুষ্টি গ্রীষ্মের দুঃসময়েও দেখে এসেছি। দেখেছি কেসুত আর গিমে শাকের চাপড়া। এই হ্রদ অঞ্চলের এখন আছে দুরকম অধ্যায়। প্রথমটি রিক্লেমড্ অঞ্চলের আধা-মরুভূমি ভাব, দ্বিতীয়টি মাইল পাঁচেক হেঁটে গিয়ে প্রাক্তন জলাভূমি দেখা। জলার ভিতর দিয়ে আল-পথ গেছে কৃষ্ণপুর গাঁয়ে—দূরদূরান্তে। জলা ভর্তি শর আর হোগলা—কচুরীপানা, ক্যাকটাস, বাজবরণ লতা, জায়ান্ট পটুলকা। মাথার উপর জলপিপি আর মাছরাঙা—জলের তলায় ঝাঁঝি আর নুনো পানিফল। অদূর ভবিষ্যতে এই অঞ্চল জুড়েই হবে পোল্ডার-রীতিতে চাষবাস।

হ্রদের বুকে হাতে নিড়ানি কিংবা দা নিয়ে এক দলকে ঘুরতে দেখা যাবে ইতস্তত, পিঠে বাঁধা ঝুড়ি। এদের দেখে মনে হবে যেন এরা প্রসপেক্টিং-এ বেরিয়েছে। যেখানে-সেখানে বসে গিয়ে এরা বালি খুঁড়তে শুরু করে হঠাৎ—যেন কোন্ অরুপরতনের সন্ধান পেলো বা। এগিয়ে গিয়ে বুঝতে পারলাম, এরা খুঁটে তুলছে পাথুরে কয়লা। কয়লা এই সুদূর লবণ হ্রদে এলো কোথা থেকে? এ নিয়ে অনেক মজার গল্প শুনলাম। কয়লা-কুড়োনিদের কেউ কেউ বললো, গঙ্গায় নৌকোডুবি হয়েছে কত। সেখান থেকে পাইপের মধ্য দিয়ে পলি-জলের সঙ্গে এসেছে এই সব কয়লা। তাদেরো অনেকে স্বপ্ন দ্যাখে, এইরকম কয়লা কুড়োতে কুড়োতে তারা একদিন কমল হীরেও পেয়ে যেতে পারে। শুনেছি এ পর্যন্ত অনেকেই নাকি সোনাদানা কুড়িয়ে পেয়েছে হ্রদ থেকে, মানুষের অস্থি এসেছে ঘোলাজলে ভেসে, নৌকোর কাঠ এসেছে, নানান ঝিনুক কড়ি শাঁখ। দুপুর বেলায় চতুর্দিকেই দূরে মরীচিকা দেখা যায়। সন্ধ্যাবেলা মহিষের কাঁধে চড়ে দূর থেকে কাছে আসে ভোজপুরী ছেলে, শকুন উড়ে চলে যায় নিরুদ্দেশের পানে, রীদিংস্পেসের জন্যে ছুটে যায় চখা-চখী কলকাতার মানুষ—নতুন উপনিবেশ গড়ে ওঠার স্বপ্ন দ্যাখে যুগপৎ তাদের হৃদয়ে আর লবণ হ্রদে।

শেখ আবদুল্লা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সূত্রটি আবিষ্কার করিয়াছেন। এই 'সওদা' তিনি এখন পাকিস্তানে ফেরি করিবেন। আমাদের এক সহযাত্রী পূর্বে পাকিস্তানের এক ফেরিওয়ালার গান শুনাইলেন—"ভালো

বাদাম, রাজা-বাদাম, মিলাকে লেগে দাম, কোয়া মজাদার চীনা-বাদাম, বাদাম বাদাম রাজা বাদাম"—এবং বলিলেন—"গানটিতে কোন ব্যক্তি বা স্থানের নাম যদি এসে গিয়ে থাকে তবে তার জন্য দায়ী সংগীত রচয়িতা স্বয়ং, এ গান বছর চল্লিশ আগে ঢাকার পথে পথে শোনা যেত।"

সংবাদে শুনিলাম, শেখ আবদুল্লা ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষ করিয়াছেন, এখন তিনি পাকিস্তানের নাড়ী টিপিয়া দেখার জন্য পাকিস্তানে যাইতেছেন। শ্যামলাল নাড়ী দেখার একটি মজার গল্প

শুনাইল—"রোগীর বিছানার পাশে পাকা আমের খোসা পড়ে থাকতে দেখে কবরেজ নাড়ী টিপতে টিপতে বললেন—নিশ্চয়ই কোনও কুপথ্য করা হয়েছে, এই যেমন—আমটা-আঁশটা। রোগী সলজ্জে স্বীকার করল সে আম খেয়েছে। এই আন্দাজ-অনুমানের বিদ্যে ফলাতে গিয়ে কবরেজের ছাত্র এক রোগীর বিছানার পাশে জুতো পড়ে থাকতে দেখে নাড়ী টিপতে টিপতে বিজ্ঞের মতো বলল—নিশ্চয়ই কোন কুপথ্য আপনি করেছেন, এই যেমন ধরুন, জুতোটা-আঁশটা। শেখজীর জ্ঞানের নাড়ী যে টনটনে তা জানি, তবে নাড়ী টেপার জ্ঞান জুতোটা-আঁশটা উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা সে কথাটাই ভাবছি!"
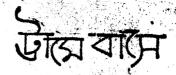
শুনিলাম আমদানী না থাকায় শহরের বহু চাউলের দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং অবিলম্বে সকল দোকানই বন্ধ হওয়ার আশংকা দেখা দিয়াছে। সরকারী মুখপাত্র অবশ্য বলিয়াছেন—'ভয়ের কোন কারণ নাই'। বিশু খুড়ো বলিলেন—"না, ভয় আর কী, বড়জোর অনাহারে মৃত্যু; তা আমরা ছোট-বেলা থেকেই তো মৃত্যুকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার অভ্যেস সড়গড় করেছি—ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়!"

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, সরকার-নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কোথাও চাউল পাওয়া যাইতেছে না। এই সংবাদ সম্পর্কে সংবাদ-দাতা বলিতেছেন—নিয়ন্ত্রণটা যেন একটা 'প্রহসনে' দাঁড়াইয়াছে।—"তা তো দাঁড়াবেই, যাত্রার পালা প্রহসন দিয়ে শেষ করার রেয়াজ আছে যে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

শুনিলাম এখন নাকি চিনিতেও কাঁকর মিশানো হইতেছে। বিশু খুড়ো সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"বেটার লেট্ দ্যান নেভার!"

সংবাদে প্রকাশ বিক্রীত টিকিটের সঙ্গে যাত্রী সংখ্যার হিসাব মিলাইবার জন্য বাসে-বাসে ছদ্মবেশী কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা হইতেছে।—"হিসেব কতটা মিলবে বলা শক্ত, তবে একে তো দুঃসহ ভিড়, তার ওপর হিসেবনবীশরা এলে যে গোদের ওপর বিস্ফোটক অনিবার্য হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই"—বলেন সহযাত্রী।

সন্ত-বাবের প্রচেষ্টায় দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২০শে মে তারিখে হরতাল প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।—"হরতালের সঙ্গে হরিমটরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে আরো ভালো হতো, কেননা একদিনের চাল আর মাছ সংগ্রহের পয়সা আর ঝামেলা কোনটাই তো কম নয়"—বলেন বিশু খুড়ো।

পো[illegible] পেশ-করা এক রিপোর্টে নাকি বলা হইয়াছে যে, পোস্টকার্ডের কারবারে সরকারের লোকসান হইতেছে।—"আমরা অবশ্য ব্যবসার কিছু বুঝি নে সুতরাং এ ব্যাপারে কিছু বলতে যাওয়াও আমাদের সাজে না। তবে মনে হয়, লোকসানটা পুষিয়ে নিতে হলে পোস্টকার্ডের আশু মূল্য বৃদ্ধিই একান্ত প্রয়োজন। সর্ব-সাধারণের কাছে বর্ধিত মূল্যে পণ্য ক্রয় তো এখন জলভাতের সামিল।"

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য মন্ত্রী সাংবাদিকদের নাকি জানাইয়াছেন যে, কোন এক মৎস্য ব্যবসায়ী তাঁহার বাড়িতেই পচা মাছ সরবরাহ

করিয়াছে।—"সুতরাং ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ যেখানে গেল সেখানে আমাদের মতো শল্যদের পচা মাছ নিয়ে নৃত্য করা ছাড়া আর কীই বা আছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

অবিলম্বেই 'নয়া পয়সা' শুধু 'পয়সা' নামে চালু হইবে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।—"পয়সা নিজে কথা বলতে পারে না, পারলে প্রতিবাদ অবশ্যই করত, কেননা পয়সা নিয়ে টানাহেঁচড়া সরকার কিছু কম করেন নি; প্রথমে তার তামার ভাগে সরকার ভাগ বসালেন, তারপর তাকে করলেন ফুটো, এবারে তার আধুনিকতা অর্থাৎ 'নয়া' কেটে দিয়ে একবারে বস্তাপচা শুধু 'পয়সা' করে দিলেন। অথচ পয়সা নিজে নিঃস্ব সেজে পয়সাওলাদের কদর বাড়িয়েছে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

বেটন কাপ প্রতিযোগিতায় প্রথমে সেমি-ফাইন্যালে মোহনবাগান বনাম সেণ্ট্রাল রেলওয়ে এবং পরে ফাইন্যালে মোহনবাগান বনাম ইস্ট বেঙ্গল দলের মধ্যে যে অপ্রীতিকর অবাঞ্ছনীয় অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়া গেল সেই সম্পর্কে বৃদ্ধ ক্রীড়ারসিক বিশু খুড়ো বলিলেন—"হবু-অর্জুনরা হয়ত খেলার মাঠটাকে কুরুক্ষেত্র বলে ভুল করেই খণ্ডযুদ্ধে মেতে উঠেছিলেন,—হায় অর্জুন, হোয়াট এ ফল!"

মামুলি সৌজন্য। হিন্দী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাই সরকারী উৎসাহ পায় বলে আমাদের জানা নেই। আকাদমি পুরস্কার বলে যে পুরস্কারটি দেবার প্রথা আছে, তার দ্বারা কোনো ভাষারই তিলমাত্র উপকার ঘটে না। অবশ্য এ-ধরনের পুরস্কার ভাষার উন্নতি ঘটাবার জন্যে দেওয়াও হয় না।

সাহিত্যকর্ম বলতে ঠিক ঠিক যা বোঝায় আমরা তার কথা বাদ দিচ্ছি। বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি ছাড়াও প্রতিটি ভাষার আরও অনেক-গুলি করণীয় কর্ম আছে। সাধারণ মানুষ যে-ভাষায় তার মনের ভাব প্রকাশ করে সেই ভাষার সাহায্যেই তার আত্মশিক্ষা প্রয়োজন। জীবন ধারণের জন্যে মানুষের মানসিক চেতনা উন্নত হওয়া আবশ্যক এই কথাটি স্বীকার করে নেওয়া হয় বলেই 'লোকশিক্ষা' বলে একটা কথা তৈরী হয়েছে। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য বহুজনের কাছে যথাসম্ভব বহু বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু পৌঁছে দেওয়া। এ-ধরনের শিক্ষা বিস্তারে একটি ভাষাকে নানা দিক থেকে তৈরী হতে হয়। তার ভাব প্রকাশের সমৃদ্ধিও যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার ব্যাপক প্রচারও দরকার। আমাদের ভারতীয় ভাষার মধ্যে অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার ভৌগোলিক সীমা খুব বিস্তৃত নয়, পড়ুয়ার সংখ্যাও অল্প। এ-রকম ক্ষেত্রে বেসরকারী চেষ্টায় লোকশিক্ষা বিস্তারের খুব একটা সুযোগ নেই। ফলে ঠিক যে-ধরনের শিক্ষায় সাধারণের উপকার হত, অথচ প্রাদেশিক ভাষাগুলি নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ হবার সুযোগ পেত তার উপায় হচ্ছে না। ভারতের মতন গরীব ও স্বল্পশিক্ষিতের দেশে যদি প্রাদেশিক ভাষাগুলির উন্নতি ঘটাতে হয়, তবে লোকশিক্ষার কারণে সম্ভবত কিছুটা সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ দরকার। হিন্দী ভাষা এ-ধরনের সাহায্য পায় শুনি, অন্তত তার পক্ষে পাওয়ার সুযোগ ঘটানো হয়েছে, যদিও অন্য কোনো প্রাদেশিক ভাষা তা পায় না— যেটুকু পায় তাকে পাওয়া বলে না। হিন্দী অধিক মানুষের মুখের ভাষা এই যুক্তি যাঁরা দেন তাঁদের কাছে আমাদের পাল্টা প্রস্তাব, বহু মানুষের মুখের ভাষা আপন ক্ষমতায় চলতে পারে, তাকে সাহায্য দেবার প্রয়োজন কোথায়! কেন হিন্দীর জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের এত মাথা ব্যথা?

বাংলা যে ঐশ্বর্যপূর্ণ ভাষা এতে আমাদেরও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা এও জানি, বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান প্রধান ভাষাগুলির মতন এখনও সবরকম জ্ঞানের রাজ্যে অবাধে বিচরণ করতে পারে না, তার এখনও অনেক অভাব এবং সেগুলি পূর্ণ করতে হবে। যদি বাংলা ভাষায় প্রতি মমতা আমাদের থাকে তবে বোধ করি সেদিক থেকে সাহায্য করাই সঙ্গত হবে।

গল্প সংকলন : সেকাল ও একালের লেখিকা

লেখিকা মন : বাণী রায় সম্পাদিত। সাহিত্যায়ন, ৮এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য আট টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে সংকলনের অভাব খুব নেই। প্রেমের গল্প, প্রেমের কবিতা, শ্রেষ্ঠগল্প, নির্বাচিত গল্প ইত্যাদি সংকলন বর্তমান। ছোট গল্পের এবং কবিতার সীমিত বাজারই এর কারণ। বলতে দ্বিধা নেই, যোগ্য সম্পাদক সংকলিত এ ধরনের গ্রন্থ স্থায়ী মূল্যবোধ সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম। এবং তেমনতর সংকলন গ্রন্থ বহুলাংশে মৌলিক সমালোচনা গ্রন্থের মতোই উত্তম ও স্মরণীয়।

শ্রীবাণী রায় সম্পাদিত আলোচ্য গ্রন্থ বাংলা দেশের লেখিকাদের ছোটগল্প সংকলন। ভূমিকায় সম্পাদিকা জানাচ্ছেন, "লেখিকাদের শ্রেষ্ঠ গল্পের এ সংকলন নয়। নারী গল্পকারদের কয়েকটি লেখা একত্রিত ভাবে নিয়ে চেষ্টা করেছি একখণ্ড গল্প সংগ্রহ সাহিত্য ক্ষেত্রে উপস্থিত করতে। বিভিন্ন রসের লেখিকার বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী ধরবার যে প্রয়াস পেয়েছি তার মধ্যে কেবলমাত্র ওজনকরা শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্ন ওঠে না। অতএব নাম মনোনয়ন তালিকা কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত। অনেক দিন হল পরিকল্পনাটি কার্যকরী করার আশায় নানা প্রকাশকের সাহায্য চেয়ে নিরাশ হয়েছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল এইরূপ একটি মহিলা গল্পলেখকের সমাবেশ সকলের সম্মুখে তুলে ধরি। সাহিত্য জগতের নেতা এখন পুরুষ। তাঁরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। গোষ্ঠীগত যে বাঙলা সাহিত্যের রূপ, সেখানে নারী লেখকের স্থান কোথায় ?......"

সম্পাদিকার সুদীর্ঘ ভূমিকায় বহুতর ক্ষোভ ও সূচীমুখ সমালোচনার খোঁচা ইতস্তত ছড়ানো। বলা বাহুল্য তা বহুলাংশে সত্য নয়, প্রমাণ, প্রতিটি সংকলন গ্রন্থেই শক্তিমতী লেখিকারা তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা পেয়েছেন বলেই সমালোচকের বিশ্বাস।

আলোচ্য গ্রন্থে খ্যাতনাম্নী প্রতিটি লেখিকাই উপস্থিত। গল্প নির্বাচনে সম্পাদিকা যথার্থ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে কিছু সংখ্যক বিস্মৃতপ্রায় লেখিকা যথা, কাঞ্চনমালা দেবী, হেমনলিনী দেবী, সরসীবালা বসু, গিরিবালা দেবী, জ্যোতির্মালা দেবী ইত্যাদির গল্প বাঙালী লেখিকাদের দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা সম্পর্কে পাঠককে সচেতন হতে সাহায্য করে।

সংকলনের প্রতিটি গল্পেরই আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। পাঠযোগ্যতা এবং রচনা কুশলতায় প্রায় প্রতিটি গল্প মনোযোগ কাড়ে। বিশেষ করে তিনটি দৃশ্য, ওস্তাদজী, রাজুর মা, সখ্যে, চিন্তা, একটি মামুলী গল্প, ও নিজের অচেনা মুখ উল্লেখযোগ্য। এবং লক্ষণীয় এই যে, একালের লেখিকারা অনেক বেশী পরিমাণে বাস্তববাদী ও সমাজ সচেতন। এবং তাঁদের রচনাকুশলতা নিঃসন্দেহে যে কোন লেখকের রচনার পাশে স্থান পাবার মতোই পরিণত ও সমগ্রতায় নিটোল।

সম্পাদিকার ক্ষোভকে যদি উহ্য রাখি তাহলে ভূমিকাংশ নিঃসন্দেহে সুপাঠ্য ও উপভোগ্য। ৩০৮।৬৩

উপন্যাস

সে নহি সে নহি। চাণক্য সেন। ক্লাসিক প্রেস, ৩।১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দশ টাকা।

চাণক্য সেনের যেকোন রচনাই আজ পাঠক মহলে প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। তার এই সাম্প্রতিকতম উপন্যাস। তা পূর্ণ করে।
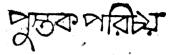
আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি বিগত পঞ্চাশ বছরের ভারতবর্ষকে ছুঁয়ে আছে। বহু চরিত্রের আনাগোনা রয়েছে এই বিস্তৃত পরিবেশে। এদের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত দুটি নারী চরিত্র এদের নিয়েই এই উপন্যাস। নারীত্বের গৌরব ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত এই দুই নারীই যেন বলতে চান—'পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে সে নহি সে নহি, হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি'। এদের মধ্যে একজন তামিলনাদের সাবিত্রী আম্মা, অপরজন বাংলার দেববাণী।

সাবিত্রী আম্মা ও দেববাণী সাধারণ নারী। কিন্তু তবু পাঠকের মনে কেমন যেন এক অসামান্যতার স্পর্শ রেখে যায় এ দুটি চরিত্র।

যৌবন অতিক্রম করার আগেই স্বামীকে হারিয়ে ছিলেন সাবিত্রী আম্মা। তারপর জীবনের বহু ক্ষয়ক্ষতিকে মহৎ আদর্শের পূর্ণতায় একদিন ধন্য করে তুলেছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে উদ্বেলিত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচণ্ড প্রাণপ্রবাহে নিজের প্রাণ মিশিয়ে দিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছিলেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের দেববাণীর জীবনও একদিন নির্মম নিয়তির পরিহাসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত। কিন্তু দুশ্চর সংগ্রামের ভিতর দিয়ে সেও জীবনে প্রতিষ্ঠা পেল, বিজ্ঞানসাধিকা হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করল। স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লীতে এই দুই নারীর প্রথম সাক্ষাৎ। সাবিত্রী আম্মা এখন জীবনের অপরাহ্ণে এসে পৌঁছেছেন। দেববাণীর দুই অতন্দ্র চোখে এখন কল্যাণকর্মের প্রেরণা। এই দুই চরিত্রের প্রথম পরিচয়ের সন্ধিক্ষণেই উপন্যাসের মূল কাহিনীর সূচনা। অবশ্য সাবিত্রী ও দেববাণীর কর্ম

ও কীর্তির ঘটনাই উপন্যাসের মূলে আখ্যের-বস্তু নয়। কাহিনীর দৃষ্টি আরও গভীরে, জীবনের প্রত্যন্ত প্রদেশে। এবং সেখানেই সাহিত্য রচনা হিসাবে এই উপন্যাসের সার্থকতা। লেখক তাঁর অন্তরঙ্গ সমীক্ষায় উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। নারী মনের বিচিত্র অনুভব ও তার উত্তরণের একটি ভাবাসিদ্ধ চিত্রকল্প গড়ে তুলেছেন—যা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। কাহিনীতে আরও দুটি চরিত্র আছে। হিমাদ্রি ও সরোজা। হিমাদ্রি সরোজার কাহিনী শোনবার এবং এদের মনকে জানবার একটি নিবিষ্ট আগ্রহ পাঠকের মনে স্বভাবতই জেগে ওঠে। বিরাট পটভূমিতে কাহিনীর বুনোট সপ্রশংস চিত্তে লক্ষ করার মত। লেখকের ভাষা স্বচ্ছন্দ।

১৬৩

কিশোর সাহিত্য

ছেলেমেয়েদের কংগ্রেস (ইতিহাস) ধীরেন্দ্র নাথ সিংহ। ২·৭৫ টাকা।

ছেলেমেয়েদের কংগ্রেস (চিত্রে ও গল্পে) দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ। ১·৭৫ টাকা। ডি এন সিংহ এন্ড কোং। জাতীয় প্রকাশন। ৩১এ বাদুড়বাগান স্ট্রীট। কলিকাতা ৯।

বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি বলে একটি দুর্নাম আছে। সে দুর্নাম দূর করার একমাত্র উপায় হল কিশোর বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের ইতিহাস পাঠে উদ্বুদ্ধ করা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কংগ্রেসেরই ইতিহাস। অত্যন্ত দুঃখের কথা ঠিক কিশোরমনের উপযোগী করে ভারতবর্ষে কংগ্রেস আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাসের ওপর কোন ভাল গ্রন্থ রচিত হয় নি। সেদিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থ দুখানি কিশোর সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে গণিত হবে। সহজ করে অথচ মোটামুটি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো রেখে এরকম দুটি গ্রন্থ রচনা করা বিশেষ প্রশংসার কাজ। লেখকদ্বয় তাতে সফল হয়েছেন। দুখানি গ্রন্থেরই ছাপা অত্যন্ত ঝরঝরে। পেপারব্যাকের বদলে বোর্ড বাঁধাই হলে ভাল হত।

২১।২৭।৬৪

বিবিধ

The New Year Book. Edited by P. C. Sarkar. S. C. Sarkar & Sons. 1-C College Square. Cal.-12. Rs. 3.75.

বিবিধ বিষয়ে তথ্য জানবার একটা সহজলভ্য উপাদান হিসেবে 'ইয়ার বুক' বা বর্ষপঞ্জীর প্রয়োজনীয়তা এখনকার দিনে অপরিহার্য। আলোচ্য বর্ষপঞ্জীখানি গত একুশ বছর ধরে দেশ ও বিদেশের নানা জাতীয় তথ্য সংকলন ও পরিবেশন করে জন-

সাধারণের সাধারণ জ্ঞান সমৃদ্ধ করার সহায়তা করে আসছে। ভবিষ্যতে ইতিহাস রচনায়ও এর পরিবেশিত তথ্যসমূহ কাজে লাগবে। ১৫৪।৬৪

পত্রিকা

সমকালীন। **সম্পাদক—শ্রীআনন্দগোপাল** সেনগুপ্ত। ২৯, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩। মূল্য ০·৫০ নঃ পঃ।

শুধুমাত্র প্রবন্ধের একমাত্র মাসিক, আলোচ্য পত্রিকাখানির বর্তমান সংখ্যায় দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ থেকেই এর জনপ্রিয়তা সুপ্রমাণিত হয়। আলোচ্য সংখ্যাখানিতে গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা সম্পর্কে, অমৃতময় মুখোপাধ্যায়ের 'সেকালের সংবাদপত্র ও দ্বারকানাথ', অধীর দে'র 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও বাঙলার লোকসাহিত্য', চণ্ডী লাহিড়ীর 'বাঙলা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দ' এবং নরেন্দ্রকুমার মিত্রের 'নাটকে বাদাপ্রয়োগ' প্রবন্ধাবলী তথ্যান্বেষী পাঠকদের জ্ঞানবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

প্রাপ্তি স্বীকার

যে কোন ফাল্গুনে ২৩—মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

রতনবাঈ—দেবপ্রিয় দে।

কিশোর নজরুল—এম আবদুর রহমান।

অর্ঘ্য—অজিতনারায়ণ চট্টরাজ।

মাথ রচিত মঙ্গল সমাচার।

শান্তি গীতি—সুনীল দত্ত।

জীবন জ্যোতি (নাটক)—চন্দ্রকুমার।

রঙ্গজগৎ

চিত্রকাহিনীর বিচার

সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় অ্যাওয়ার্ড কমিটির সভাপতি ডঃ বি গোপাল রেড্ডি তাঁর রিপোর্ট পেশ করেছেন। আমাদের কাহিনীচিত্রের মান উন্নত বলেই তিনি রিপোর্টে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন, দুই বছর আগে সরকার শ্রেষ্ঠ কাহিনীকারের পুরস্কার প্রবর্তন করেছিলেন। এ বছর কমিটি ছায়াছবিতে রূপায়িত এমন কোন কাহিনী খুঁজে পাননি যা ওই সম্মানের যোগ্য। প্রসংগত তিনি এই মন্তব্য করেছেন, চিত্রপরিচালক অথবা শিল্পী নির্বাচনের মতই কাহিনী নির্বাচনের ব্যাপারটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ—হয়ত তার চেয়েও বেশী। এবং আমাদের ছায়াছবিতে সুসংবদ্ধ, রসসমৃদ্ধ, চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষামূলক কাহিনীর অভাব দেখা যায়।

ডঃ রেড্ডির এই মন্তব্য অন্তত বাংলাদেশের দর্শকেরা প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারবেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে। কাহিনী-সম্পদের জন্য বাংলা ছবি দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে প্রশংসিত। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য যে কয়টি বাংলা ছবি এ বছর দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে কেন্দ্রীয় অ্যাওয়ার্ড কমিটি যদি উল্লেখযোগ্য কাহিনীর সন্ধান না পেয়ে থাকেন তবে সেটা খুবই বিস্ময়ের কথা। কেন্দ্রীয় অ্যাওয়ার্ড কমিটির বিচারে কী ধরনের চিত্রকাহিনী শ্রেষ্ঠ, চিত্ররসিকদের মনে এ নিয়ে কৌতূহল জাগাও অস্বাভাবিক নয়। ডঃ রেড্ডি তাঁর রিপোর্টে শ্রেষ্ঠ কাহিনীর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে 'শিক্ষামূলক' কথাটি রয়েছে। জানি না, ওই একটি বিশেষণের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ কাহিনীর রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের শর্ত নিহিত কিনা। যদি তাই হয়, আমাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করছি। আর যদি তা না হয় তবে ডঃ রেড্ডির ভাষায়ই বলব, 'সুসংবদ্ধ' 'রসসমৃদ্ধ' ও 'চিত্তাকর্ষক' কাহিনী সংবলিত বাংলা ছবি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য এবারও দিল্লিতে পাঠানো হয়েছিল—প্রতিবারেই যা হয়ে থাকে। পুরস্কারযোগ্য কাহিনী অন্যান্য অঞ্চলের ছবিতেও হয়ত অলভ্য ছিল না। সুলভ ছিল না বুঝি শুধু শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের শক্তি!

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকে ভূষিত নয়া সংসারের "শেহর ঔর সপ্না"-র (কাহিনীকার-পরিচালক: কে এস আব্বাস) নায়ক-নায়িকা দিলীপরাজ ও সুরেখা

সরোজ সেনগুপ্ত প্রোডাকসন্স-এর "সিঁদুরে মেঘ" (পরিচালনা: সুশীল ঘোষ) ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায়

বি-এফ-জে-এ পুরস্কার

একাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে শুক্রবার (২২শে মে) সন্ধ্যায় বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উৎসবের উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। শ্রীতুষার-কান্তি ঘোষ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন শ্রীঅশোককুমার সরকার।

বিদেশের চলচ্চিত্র উৎসবে "সাত পাকে বাঁধা"

মস্কোর পর মেলবোর্ন ও সিডনি। আর ডি বনসাল প্রযোজিত ও অজয় কর পরিচালিত "সাত পাকে বাঁধা" ছবিটি গত বছর মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেছিল। ভারত সরকার এ বছর ছবিটি মেলবোর্ন ও সিডনি চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠাচ্ছেন। এই মাসের শেষেই ওই দুটি উৎসব শুরু হবে। ইংরেজী সাব-টাইটেল সহ ছবিটি প্রদর্শিত হবে।

বিশ্বরূপার নবতম কীর্তি মঞ্চে থিয়েটারস্কোপ ॥ এই মঞ্চরীতিতে নাটকের ঘটনা ঘটে বিস্তৃত মাল্টি কম্পার্টমেন্টাল স্টেজের উপর, যার ফলে পশ্চাৎভূমি হিসাবে সংলগ্ন উদ্যানটিও স্পষ্ট চোখে পড়ে। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত ঘটনার পরিবর্তন হয়, প্রয়োজনমতো আলোর তারতম্য ঘটে। একই সঙ্গে কোনো কোনো সময়ে দুই জায়গার ঘটনা দেখানো যায়—নিচে কিংবা উপরতলায় আর কিংবা একই সঙ্গে উভয় জায়গায়—যার ফলে সিনেমার মতো মন্তাজ এফেক্ট সৃষ্টি হয়। উপরের চিত্রটি বিশ্বরূপার বর্তমান আকর্ষণ 'লগ্ন' নাটকে থিয়েটারস্কোপ স্টেজের। ফটো : সাতকড়ি পাল

* ছবির পর ছবি *

সিঁদুরে মেঘ
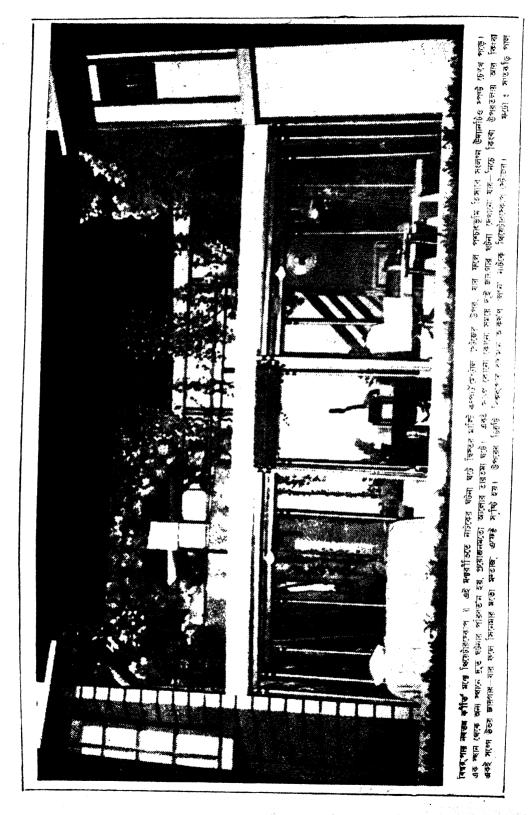
প্রযোজক সরোজ সেনগুপ্তের "সিঁদুরে মেঘ" আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। সুলেখা সান্যালের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা ও চিত্র-পরিচালনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন সুশীল ঘোষ। অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহঠাকুরতা, অসিতবরণ, গীতা দে, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয়

করেছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

অনুষ্টুপ ছন্দ

পরিচালক পীযূষ বসু, বি কে প্রোডাকশনস-এর "অনুষ্টুপ ছন্দ"র বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ সম্প্রতি শেষ করেছেন। ছবির দৃশ্য গ্রহণের জন্য তিনি তাঁর ইউনিট নিয়ে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এই ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন বসন্ত চৌধুরী, সুমিত্রা সান্যাল, নবাগতা অপর্ণা ভৌমিক, এন বিশ্বনাথন, মলিনা দেবী, বীরেশ্বর সেন প্রভৃতি। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক।

মোরে মন মিতুয়া

আরতি ফিল্মসের প্রথম ভোজপুরী চিত্র "মোরে মন মিতুয়া"র শুটিং আরম্ভ হয়েছে। গিরিশরঞ্জন ছবির কাহিনীকার-পরিচালক। নথুরাম সুরকার। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে মুকেশ, মহম্মদ রফি, মান্না দে, সুমন কল্যাণপুর ও আশা ভোঁসলের কণ্ঠে ছবির কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। নাজ, সুধীরকুমার, সুজিতকুমার, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, অনুভা গুপ্ত, হেলেন প্রভৃতি ছবির প্রধান শিল্পী।

মধুমানসের "প্রথম প্রেম" (পরিচালনা : অজয় বিশ্বাস) ছবির একটি দৃশ্যে তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, রবীন্দ্র বসু ও চুনী গোস্বামী

প্রভাতের রঙ

অজয় করের পরিচালনায় এস এম পিকচার্স-এর "প্রভাতের রঙ" ছবির শুটিং সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ছবিটির সম্পাদনার কাজ চলছে। বিশ্বজিৎ, শর্মিলা ঠাকুর, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, লিলি চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, পদ্মা দেবী, অমর বিশ্বাস, মিণ্টু দাশগুপ্ত, নবাগত তাপস গঙ্গোপাধ্যায় ও অনিন্দ্য ঘোষ ও নবাগতা স্মিতা মজুমদার ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

নেতাজী সুভাষ

ভারত চিত্রণের পরবর্তী প্রয়াস "নেতাজী সুভাষ"। ছবিটি হিন্দীতে কলকাতায় তৈরি হবে। ভারতে এবং ভারতের বাইরে নেতাজীর কর্মজীবনের বিশিষ্ট ঘটনা ছবিতে থাকবে। হিরণ্ময় সেন চিত্রপরিচালক।

ঠিকানা

চিত্র তীর্থের প্রথম প্রয়াস "ঠিকানা" ক… রায়ের পরিচালনায় দ্রুত সমাপ্তির পথে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ "ঠিকানা"র বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে রয়েছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, তরুণকুমার, কাজল গুপ্ত, তপন চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ, নিভাননী ও মাঃ ইন্দ্রজিৎ। নীতা সেন সংগীত পরিচালিকা।

মরুতৃষা

কালিকা চিত্রমের "মরুতৃষা"র মুক্তি আসন্ন। কাহিনী ও চিত্রনাট্যরচনা এবং চিত্র পরিচালনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন সুরেশ রায়। অসিতবরন ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ছবির দুটি মুখ্য চরিত্রে অবতরণ করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন রবীন মজুমদার, নমিতা বসু, তপতী ঘোষ, বিপিন গুপ্ত, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, জয়শ্রী সেন প্রভৃতি। কালোবরন সুরকার।

দোলনা

পদ্মদীপ ফিল্মস-এর প্রথম প্রয়াস "দোলনা"র শুভমহরৎ অনুষ্ঠান গত সপ্তাহে সম্পন্ন হয়। আশাপূর্ণা দেবীর গল্প অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী। চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা। শৈলেন মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক।

চিত্র-সমালোচনা

সাহিত্যের স্বাদ

চলচ্চিত্র, সর্বাংশে না হলেও বহুলাংশে, যদি মূল সাহিত্যের প্রতি বিশ্বস্ত হয় তবে তাকে আমরা সহজেই সানন্দে ও সাগ্রহে গ্রহণ করতে পারি। "কিনু গোয়ালার গলি" (কে জি প্রোডাকশন্স) এই বিশেষ গুণের জন্য নিঃসন্দেহে আদরণীয় হবে।

সন্তোষকুমার ঘোষের "কিনু গোয়ালার গলি" উপন্যাসের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল এবং রস ও স্বাদ সামগ্রিকভাবে হয়ত এই ছবিতে লভ্য নয়। কিন্তু উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র শান্তি ও তার কাহিনী ছবিতে সাহিত্যের স্বরূপতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এবং ওইখানেই ছবির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য।

সংসারবিমুখ, আত্মকেন্দ্রিক এক কথা-সাহিত্যিকের স্ত্রী শান্তি। তার বঞ্চিত

নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণা ও জড়তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে আত্মনিগ্রহের অস্থিরতা। তাই বুঝি সুন্দর জীবনের ব্রত ও শর্ত অনেক সময় তার কাছে মিথ্যা, অর্থহীন মনে হয়। মূল্যবোধ সে হারিয়ে ফেলে। সত্য ও মিথ্যার সাদা-কালোয় চিত্রিত এই চরিত্রের মর্মলোকে স্বচ্ছন্দ প্রবেশের গুহাপথটি ছবিতে উন্মুক্ত। এই চরিত্রবিশ্লেষণ সম্পূর্ণ জীবনানুগত। শান্তির উপাখ্যান স্থূল অতিনাটকীয়তার উপর গড়ে ওঠেনি। অথচ এতে আবেগ আছে, রস আছে।

শান্তির কাহিনীই ছবিতে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু গোয়ালার গলির অন্য মানুষদের আনাগোনা ছবিতে আছে। তাদের সকলকে নিয়ে কিনু গোয়ালার গলির দুঃসহ বদ্ধজীবনের রূপটি ছবিতে ফুটে ওঠেনি। পোদ্দারের কৌতূহলী দ্রষ্টার ভূমিকা ছবিতে দুর্লক্ষ্য। ইন্দ্রজিত ও লীলার কাহিনীও পরিপূর্ণতা পায়নি।

বি কে প্রোডাকশন্স-এর "অনুষ্টুপ ছন্দ" (পরিচালনা : পীযূষ বসু) ছবিতে নবাগতা অঞ্জনা ভৌমিক

কিন্তু যাকে নিয়ে মুখ্যত এই ছবি সেই শান্তিকে অন্তরঙ্গভাবে আমরা জানতে পারি, তার সঙ্গে সমপ্রাণতা অনুভব করবার সুযোগ পাই। জীবনবোধের যে স্পর্শ শান্তির উপাখ্যানে ছড়িয়ে রয়েছে তা দর্শকের মনকে আবিষ্ট করে। এই উপকাহিনী নিয়েসে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক ও সি গাঙ্গুলী কয়েকটি সুন্দর মুহূর্ত গড়ে তুলেছেন। মুহূর্তগুলিতে শান্তির মনের দ্বন্দ্ব ও বিড়ম্বনা এবং দুই বিপরীত মানসিকতার (শান্তি ও তার স্বামীর) বিরোধাভাস সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এবং এই আপাতভাবে ছবিটিকেও বহু দুর্বলতার ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে এবং সর্বাঙ্গীণভাবে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুরচিত সংলাপ (সন্তোষকুমার ঘোষ কৃত) ছবিতে কী গভীরতা এনে দিতে পারে "কিনু গোয়ালার গলি" তার এক উজ্জ্বল প্রমাণ।

প্রথম স্বাধীন চিত্রপরিচালনায় ও সি গাঙ্গুলী প্রয়োগ-কর্মের যে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। মামুলী এবং অতিব্যবহৃত প্রয়োগকৌশল ছবিতে অবশ্য আছে—যেমন বালিশের উপর "সুখে থাক" অথবা বাঁধানো ফ্রেমে "সতীর দেবতা পতি" প্রভৃতি বার বার দেখানো। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিচালকের কল্পনাশক্তি দুয়েকটি মুহূর্তে উল্লেখযোগ্য। স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতে যেতে শান্তির আপত্তি এবং মাথায় ঘোমটা টেনে খেলতে যাওয়া ও পরে খেলার সময় ঘোমটা খুলে পড়ার ঘটনা ও বাক্যটির মধ্যে সূক্ষ্ম কল্পনা-রই পরিচয় মেলে। ছবির কোন কোন বাস্তবতায় অবশ্য বক্তব্য যতটা না প্রতিষ্ঠিত তার চেয়ে বেশী প্রকটিত। শিল্পী জ্ঞানগণের ছবি ও তার বাণী উপস্থাপনেও চিত্রকার অতিমাত্রায় সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এই দোষত্রুটির মধ্যেও চিত্রকারের শিল্পদৃষ্টির প্রকাশটি লক্ষণীয়। তার কাহিনীবিন্যাস আরও ঘনসংবদ্ধ এবং ছবির পরিণতি আরও সুপরিণত হতে পারত। একটি নিটোল চিত্রনাট্য হয়ত ছবিতে মেলেনি। কিন্তু যা ছবিতে আছে তা দেখা হয়ে যাওয়ার পরেও কিছু অবশিষ্ট রেখে যায়। সেখানেই ছবিটির বৈশিষ্ট্য, যা উপেক্ষা করা যায় না, যা রসোত্তীর্ণ।

মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটার গ্রুপ অভিনীত "ওথেলো" নাটকের একটি দৃশ্যে উৎপল দত্ত ও গীতা চৌধুরী

কাহিনী ও সংলাপে সমৃদ্ধ একটি পরিচ্ছন্ন রুচিস্নিগ্ধ ছবি হিসেবে "বিন্দুর গোয়েন্দার গলি" আকর্ষণীয়।

ছবিতে প্রশংসার কাজ করেছেন একজন শিল্পী। তিনি সুমিত্রা দেবী। শান্তির মনের পূর্ণ পরিচয়টি যেন তাঁর অতুলনীয় অভিনয়ে বিধৃত। শান্তির বিরুদ্ধ মনের অভিমান ও অভিযোগ তিনি তাঁর অভিব্যক্তিতে অবলীলায় প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন পর বাংলা ছবিতে সুমিত্রা দেবীর এই অভিনয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শান্তির স্বামী মনীন্দ্রের চরিত্রাংকনে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় বাস্তবতা আরোপ করেছেন। কিন্তু স্ত্রীর কাছে নিজেকে ধরা দেওয়ার মুহূর্তে তাঁর অভিনয় প্রাণহীন।

ইন্দ্রজিতের ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একটি অন্তর্দীপ্ত মার্জিত চরিত্র সৃষ্টির কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর আবৃত্তি সুন্দর।

নীলার চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুরের অভিনয় সাবলীল, স্বচ্ছন্দ। দ্বিতীয় গানটি গাইবার সময় তাঁর হাব-ভাব চরিত্রটির সঙ্গে বেমানান মনে হয়েছে। একটি ক্ষয়িষ্ণু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নীলার পরনে স্লীভলেস ব্লাউজ খুবই অস্বাভাবিক, দৃষ্টিকটু।

অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রে মনোজ্ঞ অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, জীবেন বসু, গীতা দে, প্রশান্তকুমার ও রুমা গুহ-ঠাকুরতা। অল্প অবকাশে চরিত্রাভিনয়ের জন্য যাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁদের মধ্যে আছেন রবীন মজুমদার, শশাংক সোম, ননী মজুমদার, লীলা, মাধুরী চক্রবর্তী ও ননী প্রভৃতি।

সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরী ছবির দুটি গানের সুরারোপে প্রভূত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গান দুটি সংগীত (সবিতা) বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে)। কিন্তু আবহ-সুররচনা দর্শককে নিরাশ করবে। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের ঢঙে রচিত আবহসুর এই ছবির পরিবেশের অনুকূল নয়। তা-ছাড়া উঁচু পর্দায় বাঁধা সুর কর্ণবিদারক। এবং তার অপরিমিত ব্যবহার বিসদৃশ। যেখানে শান্তির জীবনের শূন্যতা নৈঃশব্দের মধ্যেই বেশি প্রকাশ পেতে পারত, সেখানেও সংগীত সশব্দে ধ্বনিত।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে সর্বাধিক প্রশংসা পাবেন আলোকচিত্রশিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায় ও বিভূতি চক্রবর্তী। ক্যামেরার গুণে ছবিটি বহু দৃশ্যেই দৃষ্টিনন্দন হয়েছে, এর বহিরঙ্গ শিল্পসুষমা গড়ে উঠেছে।

চিত্রসম্পাদনা (অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় কৃত) আরও সুষ্ঠু হতে পারত। রবি চট্টোপাধ্যায়ের শিল্পনির্দেশ প্রশংসনীয়।

"টু হাফ-টাইমস ইন হেল"

গত সপ্তাহে ১২ই মে নিউ এম্পায়ারে সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা ও হাঙ্গেরিয়ান রাষ্ট্রদূতাবাসের যুগ্ম উদ্যোগে হাঙ্গেরিয়ান চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন দেখানো হয় জোলটান ফাব্রির "টু হাফ-টাইমস ইন হেল"। ১৯৫৬ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ফাব্রির "মেরি-গো-রাউন্ড" ছবিটি সমাদৃত হয়। যুদ্ধোত্তর কালে হাঙ্গেরিতে চলচ্চিত্র শিল্পে যে কয়জন চলচ্চিত্রকারের পদক্ষেপ ঘটেছে, জোলটান ফাব্রি তাঁদের অন্যতম। চলচ্চিত্রে যোগদানের আগে বুদাপেস্টের ন্যাশনাল থিয়েটারে শিল্প-নির্দেশক, অভিনেতা ও নাট্যপ্রযোজক হিসাবে ফাব্রি সুনাম অর্জন করেন। ফাব্রির "টু হাফ-টাইমস ইন হেল" ছবিতে যুদ্ধোত্তর হাঙ্গেরির চলচ্চিত্র অনুশীলনের ধারাটি অনুধাবন করা যায়। ১৯৬২ সনে বোস্টন চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি সমালোচকদের পুরস্কারে ভূষিত হয়।

ফিল্ম আর্ট-এর দিক থেকে এই ছবি মহৎ না হলেও এতে প্রয়োগ-পদ্ধতির নৈপুণ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সুন্দর পরিবেশ রচনা ও ডিটেলের প্রতি অনুগতা ছবিটিকে বহিরঙ্গ বাস্তবতায় সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্মম অভিজ্ঞতা য়ুরোপের অনেক দেশ আজও ভুলতে পারেনি। হাঙ্গেরিও যে নয় তার প্রমাণ এই ছবি।

একদিকে নাৎসীদের অমানুষিক অত্যাচার হাঙ্গেরির জনসাধারণ কীভাবে সয়েছে, ছবিতে তারও একটি চিত্ররূপ দেখা যায়। এবং এই অধ্যায়ের উদ্ঘাটনের মধ্যে কিছুটা ফাঁকও যেন রয়েছে। সেই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন প্রচার-মনোবৃত্তি। বলা বাহুল্য, এই মনোবৃত্তি শিল্পবিরোধী।

ছবির শেষাংশ খুবই উপভোগ্য। নাৎসী ক্যাম্পে বন্দীদের মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় দিও। হিটলারের জন্মদিন উপলক্ষে হাঙ্গেরীর গ্রামাঞ্চলে উৎসব হবে। জার্মান কর্নেল ও সৈন্যদলের আনন্দবর্ধনের জন্য জার্মান ফুটবল ম্যাচের ব্যবস্থা করেছে। জার্মান রেজিমেণ্টের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য টিম গঠনের আদেশ পেল দিও। ফুটবল খেলা অভ্যাস করার জন্য দিও ও তার সহ-খেলোয়াড়রা ব্যারাকের নারকীয় বন্দিদশা থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি পায়। এই সুযোগে ওরা পালাবার চেষ্টা করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ে। এবং নির্দিষ্ট দিনে খেলার মাঠেও তাদের নামতে হয়। খেলার শেষে মৃত্যুদণ্ড ভাগ্যে আছে জেনেও তারা শেষ পর্যন্ত প্রাণপণে খেলে যায় ও জয়ী হয়। হাঙ্গেরির জনসাধারণের উল্লাস সহ্য করতে পারে না জার্মান কর্নেল। তার রিভলবারের গুলিতে দিও ও দলের সবাই খেলার মাঠেই প্রাণ দেয়। ছবির পরিণতি করুণ। কিন্তু তবুও যেন মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি ছবিতে দানা বাঁধেনি। ফুটবল খেলাটি যে কৌতুক উপকরণের ভিতর দিয়ে বিন্যস্ত হয়েই বেশ থেকে যায় শেষ পর্যন্ত। ফুটবল খেলার অংশটি খুবই চিত্তাকর্ষক। ছবিটিও

আনন্দময়ী চিত্রপীঠ-এর 'মহাতীর্থ কালীঘাট' (পরিচালনাঃ ভূপেন রায়) ছবিতে অমরেশ দাস ও কৃষ্ণা

তাই দেখতে ভাল লাগে। শিল্পীরা সকলেই চমৎকার অভিনয় করেছেন। ক্যামেরার কাজ প্রশংসনীয়।

রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান

গত রবিবার সকালে স্টার থিয়েটারে রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্যের একটি চিত্তাকর্ষক আসর বসেছিল। গান গেয়ে যাঁরা শ্রোতাদের আনন্দ দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, অর্ঘ্য সেন, বন্যা গুহঠাকুরতা, সুমিত্রা সেন, বন্দনা সিংহ প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন সুমিতা ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন সবিতাব্রত দত্ত। বারীন ধর অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিলেন।

চতুরঙ্গর নতুন নাটক "বাবু"

যে সমস্ত নাট্যগোষ্ঠীর কাছে দর্শকবৃন্দ উন্নত পর্যায়ের নাট্য সৃষ্টি প্রত্যাশা করেন, চতুরঙ্গ সম্প্রদায় সেই গোষ্ঠীভুক্ত। এবার চতুরঙ্গ জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেছেন রসরাজ অমৃতলালের একটি বিখ্যাত সামাজিক নকশা "বাবু"। যে মাস থেকে নিয়মিত বাবু রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। দীর্ঘ ৭০ বছর আগে স্টার রঙ্গমঞ্চে এই নকশাভিনয় সমগ্র দেশে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। তারপর দীর্ঘদিন "বাবু" অভিনীত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় রচিত এই সামাজিক নকশাটির সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে।

উমার তপস্যা

দিল্লী ... স্কুলে সম্প্রতি সৌভনিক গোষ্ঠী "উমার তপস্যা" অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। এস এল ... রচিত "উমার তপস্যা" ইংরেজী

এম এম পিকচার্স-এর "প্রভাতের রঙ" (পরিচালনা: অজয় কর) ছবির একটি দৃশ্যে তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, অনিন্দ্য ঘোষ, বিশ্বজিৎ ও রবি ঘোষ

কবিতাগ্রন্থের ভিত্তিতে নৃত্যনাট্যটি রচিত। নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করেন সুরূপা বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট উমা), গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় (উমা), অসিত চট্টোপাধ্যায় (মহাদেব), বটু পাল (তারকাসুর)। বীরেশ মুখোপাধ্যায় নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন। প্রবীর মজুমদার ও অনিল সাহা যথাক্রমে সংগীত পরিচালনা ও আলোকসম্পাতের দায়িত্ব পালন করেন। বিষয়বস্তু বাংলায় রচনা করেন নিবেদিতা দাস। রূপসজ্জার দায়িত্বও ইনিই সম্পন্ন করেন।

চতুরঙ্গ-র সপ্তম নাট্যোৎসব

সম্প্রতি দিল্লির 'চতুরঙ্গ' গোষ্ঠী তাঁদের সপ্তম নাট্যোৎসব উপলক্ষে কনস্টিটিউশন হলে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গেটম্যান", মন্টু গঙ্গোপাধ্যায় "ঝড়" এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নটীর পূজা' মঞ্চস্থ করেন। ১৯৫৭ সালে দিল্লির কয়েকজন শিল্পানুরাগী বাঙালী সংগীত-নৃত্য-নাটক ও শিল্পের যথাযথ অনুশীলনের উদ্দেশ্যে চতুরঙ্গের গোড়াপত্তন করেছিলেন। 'চতুরঙ্গ' এ পর্যন্ত ১১টি নাটকের ৩৬টি অভিনয় দিল্লিতে এবং দিল্লির বাইরে মীরাটে ও সিমলায় কৃতিত্বের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে সুনাম অর্জন করেছেন। সপ্তম নাট্যোৎসবে চুনি রায়চৌধুরী পরিচালিত 'গেটম্যান' এবং জীবু রায়চৌধুরী পরিচালিত 'ঝড়' নাটকের প্রতিটি চরিত্রের সুন্দর অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। হরি সেনের নিপুণ পরিচালনায় 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যটি এই নাট্যোৎসবের একটি বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে গণ্য হয়।

ইণ্ডিয়ান রিভাইভ্যাল গ্রুপ

বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা দি ইণ্ডিয়ান রিভাইভ্যাল গ্রুপ সম্প্রতি দিল্লীতে বিদেশী অভ্যাগতদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে প্রায় পঁচিশটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গৌহাটি বিহু সম্মিলনীর আমন্ত্রণে এই সংস্থা সেখানকার বিহু উৎসবে অংশ নেবেন। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় সীমান্তের ভারতীয় জওয়ানদের আনন্দবর্ধনের জন্য সংস্থার শিল্পীরা গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক যোগসুন্দরের নেতৃত্বে অবিলম্বে নেফা অঞ্চল পরিভ্রমণ করবেন। সংস্থার সংগীত পরিচালক কমলেশ মৈত্র এবং শিল্প-নির্দেশক মালতী মেহতাও তাঁদের সঙ্গে থাকবেন।

বোম্বাই সমাচার

প্রযোজক-পরিচালক প্রমোদ **চক্রবর্তীর** পরবর্তী ছবির নাম **লভ ইন টোকিও।** জাপানে ছবির কিছু দৃশ্য গৃহীত হবে। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন জয় মুখার্জি ও আশা পারেখ। শচীন ভৌমিক ছবির কাহিনীকার, শচীন দেববর্মন সুরকার।

ফিল্মযুগের **আয়ি মিলন কি বেলা** ছবির শুটিং শেষ হয়েছে। রাজেন্দ্রকুমার, সায়রাবানু ও ধর্মেন্দ্র ছবির তিন প্রধান শিল্পী। শচীন ভৌমিক রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন মোহনকুমার। শঙ্কর-জয়কিষণ সংগীত পরিচালক।

দিলীপকুমার, ওয়াহীদা রেহমান, রেহমান ও প্রাণকে নিয়ে পরিচালক এ আর কারদার সম্প্রতি **দিল দিয়া দর্দ লিয়া** ছবির তিন সপ্তাহব্যাপী শুটিং সম্পূর্ণ করেন। নৌশাদ সুরকার।

রূহি ফিল্মস-এর **জানোয়ার** ছবির শুটিং এগিয়ে চলেছে। শাম্মি কাপুর ছবির নায়ক, রাজশ্রী নায়িকা।

হা হা
মোজা

রেকোকাশ্মীর
ফেস পাউডার

বক্ষ আবরনী
(BRASSIERE)

নির্মল
আয়ুর্বেদীয়
দাঁতের মাজন
নিয়মিত ব্যবহারে
দন্ত ও মাড়ি
সুস্থ রাখে
আর্য্য ঔষধালয় - ঢাকা
কলিকাতা-১৭

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

শ্রীব্রজানন্দ সেনের উপন্যাস

তুমি মধু তুমি মধু ২·৫০

রসমধুর গল্পসমষ্টি

যদি গরম লাগে তবে ৩·৫০

ডি এম লাইব্রেরি

৪২ বিধান সরণি, কলিকাতা—৬

(সি/এম ১৬২৬)

উপনিষদ

(২য় সংস্করণ)

চিত্রিতা দেবী রচিত

উপনিষদের সুললিত কাব্যানুবাদ ও ভাবগম্ভীর ব্যাখ্যা—সুধীজন প্রশংসিত, **'লীলা পুরস্কার'** প্রাপ্ত। সকল প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

সাধনা—

—প্রগতিশীল সাহিত্য মাসিক—

আগামী আষাঢ়ে—

—নব কলেবরে ও নূতন উদ্দীপনায় দ্বিতীয় বর্ষের যাত্রা শুরু।

সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কাম্য

বার্ষিক চাঁদা (সডাক)—৪, টাকাঃ

প্রতি সংখ্যা ৩৬ নঃ পঃ

সাধনা কার্যালয়

১৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪

ঋষি দাসের

সোভিয়েত দেশের ইতিহাস ১২·৫০

প্রমথনাথ পালের

দেশপ্রাণ শাসমল—৬·০০

শরৎ সাহিত্যে নারী—৪·০০

দত্তা পরিচয়—২·০০

বিনয়কৃষ্ণ ঘোষের

অগ্নিযুগের অস্ত্রগুরু হেমচন্দ্র—৩·০০

ফণিভূষণ বিশ্বাসের

শিশু শিক্ষার গোড়াপত্তন—৩·০০

ডাঃ হরিসাধন গোস্বামীর

আধ্যাত্মিক শিক্ষার পুনর্গঠন—৩·০০

নন্দগোপাল সেনগুপ্তের

রবীন্দ্রচর্চার ভূমিকা—৪·০০

নীরেন্দ্রলাল দত্তের

আমাদের রবীন্দ্রনাথ—৮·০০

ক্যালকাটা পাবলিশার্স

কলিকাতা : ৯

(সি ৬২৫২)

আমাদের কালের মৌল সমস্যাবলী

সম্পর্কে

বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী

এন, এস, ক্রুশ্চেভ

সাম্রাজ্যবাদ—জনগণের শত্রু, শান্তির শত্রু

সাম্রাজ্যবাদের দস্যু প্রকৃতির বলিষ্ঠ উদ্ঘাটন এক পারমাণবিক যুদ্ধের প্রলয়কাণ্ডের দিকে যা বিশ্বকে ঠেলে নিয়ে যেতে চাইছে। গ্রন্থকার সাবলীল বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি না বদলালেও, সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান শক্তির দ্বারা যুদ্ধের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে দেওয়া গেছে। এই মহাশক্তি বিশ্বকে এক পারমাণবিক প্রলয়ের দিকে ঠেলে দেওয়ার সবরকম চেষ্টাকে প্রতিহত করে দেবার ক্ষমতা রাখে। (দাম : ২৫ নঃ পঃ)

সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ

কমিউনিজমের গঠনকাণ্ডের মূলে সমস্যাবলী সমাজতন্ত্রের অবস্থান ও সাফল্যগুলির সংহতিসাধন এবং দুই ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা। (দাম : ৪০ নঃ পঃ)

বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট আন্দোলন

বর্তমান যুগের শ্রেণীসংগ্রামের এবং সাম্রাজ্যবাদের চরম পতনের ও সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের সংগ্রামে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির ভূমিকার সুগভীর বিশ্লেষণ (পৃথিবীর প্রায় ৯০টি দেশে এই পার্টিগুলি রয়েছে, যার সর্বমোট সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৪২ কোটিরও বেশী)। (দাম : ২৫ নঃ পঃ)

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিকাশ-বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ের বিশ্লেষণ, এতে দেখানো হয়েছে যে উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রাম ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি কী অপরিসীম সাহায্য ও পথনির্দেশ করে চলেছে। গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে সদ্য-স্বাধীন দেশগুলিকে কোন পথ ধরে এগোতে হবে। (দাম : ২০ নঃ পঃ)

যুদ্ধ রোধ করা আমাদের মূল কর্তব্য

বর্তমান দুনিয়ায় শক্তির ভারসাম্য এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনবাদী নীতিটি সমগ্র বিশ্বের জনগণের মূল স্বার্থকে কিভাবে পরিপুষ্ট করে তুলেছে, তার এক সুগভীর বিশ্লেষণ। (দাম ৪০ নঃ পঃ)

পাঁচটি বই একত্রে ১·০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

মনীষা : ৪।৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি : ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কালান্তর প্রকাশনী : ৫৯।১বি, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

(১৬৩০এ)

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : ও. সি. গাঙ্গুলী

DESH 40 Paise
Saturday, 13th June 1964

৩১ বর্ষ ॥ ৩২ সংখ্যা ॥ ৪০ পয়সা
শনিবার, ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

নূতন প্রধানমন্ত্রী ও আমরা

একটি সর্বজনীন সত্য এই, প্রতিক্রিয়া যতক্ষণ ঘটনার সমান সমান ততক্ষণ ভয়ের কোনো কারণ নেই। মাথার ওপর আবহাওয়ার চাপ যতই হোক যদি শরীরের অভ্যন্তরে ফুসফুসে সেই চাপকে প্রতিহত করে তবে চিন্তার কি আছে। এমার্সনের তাই উপদেশ ছিল, আমরা উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে বাইরের চাপকে প্রতিহত করতে পারি, হতাশা থেকে মুক্তি পেতে [illegible] করতেও পারি।

নেহরুজী [illegible] নিঃসংশয় প্রকৃতি [illegible] মানুষের থাকে না, এবং যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ একান্ত নিজের [illegible] ওপর সেই বিশ্বাস রেখে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। আমাদের কালে, এ নিতান্তই দৈব ঘটনা, দুটি মহৎ জীবনকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে ভারতবাসী তাঁদের ভরসা, বিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ এঁদের হাতে তুলে দিয়েছিল। গান্ধীজীর অবর্তমানে আমাদের যখন গভীর হতাশাবোধের সংগত কারণ ছিল তখন সত্যিই আমরা নিরাশ্রয় বোধ করি নি, কেননা, নেহরুজী ছিলেন। নেহরুজীর জীবনের শেষের দিনেই সর্বপ্রথম একটি দুশ্চিন্তার কথা শোনা গেল, নেহরুর পর কে?

নেহরুজীর সেই শূন্য আসন কার দ্বারা পূর্ণ হবে—এই চিন্তা [illegible] দুরূহ ও সমস্যা জটিল ছিল। [illegible] সতেরো বছরের একটি নাবালক স্বাধীন দেশের অভিভাবক নির্বাচন সহজ কথা নয়। এমন কি বললে বাহুল্য হবে না, নেহরুজীর অভিভাবকত্ব স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে কোনো প্রশ্ন ছিল না, স্বাভাবিক অধিকারেই তিনি সর্বজনের দায়িত্ব নিতে এসেছিলেন। তাঁর পর যাঁর আসার কথা তাঁকে নিয়েই আমাদের প্রশ্ন ছিল, সমস্যা ছিল, দ্বিধা ও সন্দেহ ছিল। যদি স্পষ্টত বলতে হয়, তবে বলব, ভারতের পক্ষে এই প্রথম তার বিবেচনা মতো [illegible] স্থির করে নেবার দায়িত্ব এল। নেহরুজী বলতেন : তাঁর পর কে, দেশবাসী তা স্থির করে নেবে।

আমরা নেহরুজীর পরবর্তী নেতাকে আজ নির্বাচন করে নিয়েছি। ঘটনার যে চাপের কথা আগে বলেছি তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই নির্বাচনকে দেখতে হবে। এ-কথা সত্য, নেহরুজীর পরলোকগমনের পর ভারতের মাথার ওপর রাজনৈতিক আবহাওয়ার চাপ ভারী হয়েছে, আরও হবে হয়ত—; কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা আমাদের অভ্যন্তর থেকে প্রতিক্রিয়ার যে চাপ সৃষ্টি করেছি তাতে বাইরের চাপ প্রতিহত হয়েছে, [illegible] কোনো কারণ নেই। [illegible] আমাদের [illegible] কিছু, কম নয়।

লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে আমরা আমাদের নতুন নেতারূপে নির্বাচন করেছি। এই নির্বাচন [illegible] প্রথমত, যদিও মূলত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শাস্ত্রীজী নির্বাচিত [illegible], তবু, ভারতের জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া থেকে প্রমাণ হয় তাঁর নির্বাচন সর্বসাধারণেরই অভিপ্রেত ছিল। [illegible] হিসাবেই এই নির্বাচন একটি অসামান্য [illegible] করেছে। [illegible] কংগ্রেসের [illegible] শাস্ত্রীজীর নির্বাচন [illegible] অধিকাংশের [illegible] শাস্ত্রীজীকে [illegible] নেহরুজীর মতন বিরাট ব্যক্তিত্বের সমতুল্য না হলেও শাস্ত্রীজী মনের দিক থেকে যে তাঁর খুব কাছাকাছি ছিলেন, এবং নেহরুজী ওঁর ওপর ভরসা করতেন, আস্থা রাখতেন, দুরূহ কাজের দায়িত্ব দিতেন, উপরন্তু কাজের মানুষ বলে বিশেষ স্নেহ করতেন—এ-কথা আজ [illegible] বোঝা যায়। এক্ষেত্রে স্বভাবতই আমরা আশা করব, নেহরুজীর মানসিক গুণ এবং [illegible] সম্পদ শাস্ত্রীজীর মধ্যে আছে যা আমাদের [illegible], বিচ্ছেদের [illegible] অভাব মেটাতে পারবে, এবং কখনই অপ্রত্যাশিত কোনো সংকটে টেনে নিয়ে যাবে না। চতুর্থত, এবং সর্বোপরি এ-কথা আজ স্বীকার করতে হবে, শাস্ত্রীজীর নির্বাচন নৈতিক দিক থেকে ভারতের জনসাধারণেরই নির্বাচন সাফল্য, আমাদেরই জয়।

অতি সাধারণ পরিবারের ছেলে শাস্ত্রীজী। নিতান্ত সাধারণভাবেই তাঁর জীবন শুরু। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ সাধারণ ভারতবাসীর মতন; তারপর নিজ কর্মগুণে একটি একটি করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছেন বৃহৎ রাজনীতি-ক্ষেত্রে। সেখানেও সদাহাস্য, খর্বকায় এই অতি সাধারণ মানুষটি যত বেশী কাজ করেছেন ভেতরে ভেতরে তার খুব কমই তিনি প্রচারিত হতে দিয়েছেন জন-সাধারণের কাছে। নেতৃত্বের ও ক্ষমতার ভীষণ প্রলোভনটি তাঁকে বিপথ-চালিত করে নি। যে চরিত্রগুণে মানুষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের, বিশ্বাস ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে ওঠে শাস্ত্রীজী সেই চরিত্রগুণেই বড় হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীরূপে মনোনীত হবার পরেই শাস্ত্রীজী সরল ভাষায় আবেদন জানিয়েছেন, তিনি সকলের সমর্থন চান ও পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করেন। কথাটিকে নিছক মৌখিক অর্থে ধরলে [illegible] ভুল হবে। কারণ এমন কোনো নেতা আসেন নি যিনি গান্ধী বা নেহরুর [illegible] দেশের দায়িত্ব দশজনেই বহন করে থাকেন, তার মধ্যে যেমন নেতা আছেন তেমনি জনসাধারণও রয়েছেন। আজকাল প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়, যৌথ নেতৃত্ব। আমরা অবশ্যই তার সমর্থন করি। কিন্তু এই যৌথ নেতৃত্বের অর্থ শুধু পাঁচ নেতার ইচ্ছানুযায়ী কাজ নয়, দেশের সাধারণ মানুষেরও সেই কাজে অংশগ্রহণ করা। নৈতিক দিক থেকে তার [illegible] নেহরুহীন ভারত আজ শুধু সরকারী যৌথ নেতৃত্বে এগিয়ে যেতে পারে না—যদি না সাধারণ মানুষ মনেপ্রাণে সেই নেতৃত্বের শরিক হন। শাস্ত্রীজীকে নির্বাচিত করে আমরা যে সাহসের ও সংকল্পের পরিচয় দিয়েছি তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে জনসাধারণের দায়িত্ব ও বিবেকবোধের ওপর। শাস্ত্রীজীর সাফল্য যদি সাধারণ মানুষের সাফল্য হয়ে থাকে তবে আমাদের কর্মস্বারাই তাঁর এবং ভারতের স্বার্থ রক্ষিত হতে পারে। আজ সে দায়িত্ব বহন করার শক্তি আমাদের হোক। প্রসঙ্গত আমরা নবাগত তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রী এন সঞ্জীব রেড্ডিকেও [illegible] যোগ্য সহকর্মী হিসাবে প্রত্যাশা করি।

যাবার বেলায়

ত্রিদিবরঞ্জন মালাকার

গানের আসর থেকে উঠে যেতে হলে
পেছনে, দেয়াল ধরে, পা-টিপে পা-টিপে চলে যেয়ো।
যখন স্বর্গীয় পাখি বয়ে যায় সাগরের [illegible]
বেহাগে, বাহারে। দুঃখের তুষার গলে গলে
যখন বহতা নদী: অনুভবে যখন অমেয়
অমৃতে ভেসেছে সব,
নিসর্গের মাঠবন অপ্রাকৃত তন্দ্রার কবলে।

সাজানো সংসার থেকে উঠে যেতে হলে
কোন পতনের শব্দ না জাগিয়ে বিশাল অম্বরে
চলে যেয়ো। যাবার বেলার দৃষ্টি সকরুণ কম্পিত অধরে
জাগায়ো না। "চলে যাই" কখনো না বলে
চলে যেয়ো।

দুঃখ বড় প্রতারক, বারবার ফেরায় হৃদয়ে।*

---

* জওহরলাল নেহেরু স্মরণে।

আকাঙ্ক্ষায় আরক্ত গোলাপ।

নবনীতা সেন

প্রিয়তম, দিল্লি আর ক্রমাগত দূরে নয়, তবে
এবারে অশেষ দূরে জমিয়েছো নিরুদ্দেশ পাড়ি
আমরা একাকী লিপ্ত অন্তহীন শোকের উৎসবে
তুমি এতক্ষণে খুঁজে পেয়ে গেছো শৈশবের বাড়ি।

অবিশ্বাসই পাপ, তুমি জেনেছো তা মৃত্যু ডেকে আনে-
চেয়েছো গাঁথতে প্রেমে অনশ্বর অমরার ভিত,
আমরা অপ্রেমে ক্লিষ্ট, ক্ষয়াতুর, তোমার সম্মানে
পারিনি সবর্ণ হতে, মৃত্যুকেই করেছি সুহৃদ।

প্রিয়তম, শতকের বিবেকের একান্ত প্রতিমা,
বিধাতার মতো তুমি নিঃসঙ্গ থেকেছো আধুনিক
এখন সম্মুখে শুধু কূলহারা নিতল নীলিমা—
আমরা নির্লজ্জ দোষী— ক্ষমা করো, হে সূর্য-প্রতীক!

ইন্দ্রপতনেরও পরে পূর্ণচ্ছেদ নয়, তবু, প্রিয়,
অনুজ্জ্বল উষাকাল। এ সাঁঝ তোমার চাওয়া দিক।
পুনশ্চ নবীন নীতি শুরু হবে জেনেছি যদিও,
আরক্ত গোলাপ! তুমি আকাঙ্ক্ষায় জ্বলো অমলিন।

পার্লামেন্টের কংগ্রেসী সদস্যগণ কর্তৃক জওহরলালজীর জায়গায় নূতন নেতা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালাবার জন্যে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ শ্রীগুলজারিলাল নন্দকে অস্থায়ীভাবে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে নেতা নির্বাচিত করেছেন। সর্বসম্মতিক্রমে বিনা ভোটাভুটিতে। তবে আসল নেতা নির্বাচনের ব্যাপারটা কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির উপর ঠিক ছেড়ে দেওয়া হয়নি। নেতা নির্বাচনের ব্যাপারে পার্লামেন্টের সদস্যদের "উপদেশ" দেওয়ার অধিকার এবং দায়িত্ব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক পালিত হয়েছে।

পার্লামেন্টের বিশিষ্ট কংগ্রেসী সদস্য ও অন্য কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে এবং দলে কাকে বেশি লোক চায় জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কংগ্রেসী পার্লামেন্টারী পার্টিকে উপদেশ দেওয়ার ভার ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীকামরাজের উপর অর্পণ করেন। একটা গোপন ভোট নেওয়া মাত্র শ্রীকামরাজের কাজ ছিল এরূপ মনে করলে কিন্তু অত্যন্ত ভুল করা হবে। নিরপেক্ষ মতসংগ্রাহকের বা মতপরীক্ষকের ভূমিকা শ্রীকামরাজের ছিল না। প্রকাশ্যে ভোটাভুটি এড়ানোর উদ্দেশ্য তো ছিলই। তাছাড়া শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী যাতে নির্বাচিত হন সেটাও তাঁর চেষ্টার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

এই লক্ষ্যের অনুসরণ যে শ্রীকামরাজ তাঁর একলার তরফ থেকে করেন তা নয়। কয়েকজন নেতা দলবদ্ধভাবে এই লক্ষ্য স্থির করেন। "সর্বসম্মতির" [illegible] দেখাবার আগে শ্রীকামরাজের জানা ছিল কোন প্রার্থীর পক্ষে সর্বসম্মতি লাভ ঠিক করতে হবে। শ্রীলালবাহাদুরের নির্বাচন এবং "সর্বসম্মতি"—এই উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হয়েছে এবং এমন ক্ষেত্রে "সর্বসম্মতির" উপর রং চড়াবার যে কর্তব্য বা "রিচুয়াল" চালু হয়েছে তাও যথারীতি কবলিত হয়েছে অর্থাৎ লালবাহাদুরজীর যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারতেন বা লালবাহাদুরজীর নির্বাচনে যাঁদের প্রসন্নতা সন্দেহাতীত নয় তাঁদের দ্বারা সমর্থ

বৈদেশিকী

নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপিত ও সমর্থিত হয়।

কংগ্রেস পার্টির দ্বারা নূতন নেতা নির্বাচনপর্ব যেভাবে সম্পন্ন হয়েছে তাতে দলপতিদের দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। জওহরলালজীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কংগ্রেস পার্টির ঐক্যরক্ষা কেবল কংগ্রেসের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নয়, দেশের পক্ষেও প্রয়োজনীয়। নেহরুজী নেই কিন্তু কংগ্রেসের শক্তি এবং স্বভাব যে রকম ছিল ঠিক সেই রকমই থাকবে এটা সম্ভব নয়। নানাভাবে পরিবর্তন আশাতীত এবং তার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে বর্তমান সন্ধিকালটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদে উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে কংগ্রেসী ঐক্য—সেটা অগভীর হলেও বিশেষ বাঞ্ছনীয়। সেজন্যে কংগ্রেস পার্টি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে নূতন প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনে দেশহিতৈষী মাত্রেই আনন্দিত হবেন।

তবে ভোটাভুটি হয়নি বলেই সকলে এক-দিল এরূপ কল্পনা করে নিয়ে ভাবাবেগে থাকার কোনো মানে হবে না।

সমষ্টি-নেতৃত্বের প্রতিভূ—শাস্ত্রী

সুবোধ ঘোষ

ভারতের রাজনীতিক আকাশপট হতে নেহরুর অন্তর্ধান; এ ঘটনা নিশ্চয়ই এক জ্যোতিষ্কের অস্তগমন। নেহরুর চিন্তা. প্রতিভা ও যোগ্যতার প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ভারতজীবনের ঐতিহাসিক পরিণামের একটি অধ্যায় রচনা করে চিরকালের বিদায় গ্রহণ করেছে।

অস্তাচলের দিকে তাকাবার পর পূর্বাচলের দিকে তাকাতে পারা যায়। স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হয়ে যিনি আজ রাষ্ট্রিক নেতৃত্বের প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছেন, তাঁকে আজ অবশ্যই নেহরুর মত একটি জ্যোতিষ্ক বলে মনে হবে না। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, যিনি আমাদের নতুন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, তাঁর জীবনের ঘটনার ছবিটির দিকে একবার দৃক্‌পাত করলে মনে হবে, এ যেন 'ফ্রম লগ কেবিন টু হোয়াইট হাউস' ধরনের একটি গতি, প্রকৃতি ও পরিণামের ছবি। নিতান্ত নিম্নবিত্ত গরীবের ঘরের মানুষ লালবাহাদুর, রাজনীতির কাজের কাছে শুধু কর্মী হয়েই যাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় পার হয়ে গিয়েছে, বড়রকমের নেতৃত্বের পদে কিংবা মন্ত্রিত্বের পদে যাঁর আবির্ভাব বেশি দিনের ঘটনা নয়, এবং যিনি তাঁর চিন্তা প্রতিভা ও প্রকৃতিতে নেহরুর অনুরূপও নন, তিনিই নেহরুর শূন্য আসন পূর্ণ করবার যোগ্যতমজন বলে বিবেচিত হয়েছেন। এই বিবেচনা কিন্তু কংগ্রেস নামক সেই রাজনীতিক দলেরই বিবেচনা, যে-দল ভারতীয় জনতার সর্ববৃহৎ নির্বাচনী সমর্থন লাভ করেছে।

নেহরুর শূন্য আসন পূর্ণ করা, ঘটনাকে এভাবে কল্পনা করলে কিন্তু ভুল করা হবে। কারণ, নেহরু ভারতীয় জনজীবনে শুধু প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন না; আরও কিছু ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর আসন ছাড়া আরও বৃহৎ একটি আসন তিনি শূন্য করে চলে

নতুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী
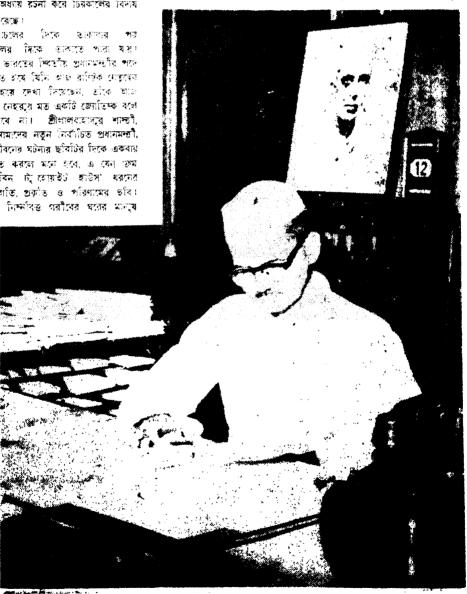
গিয়েছেন। সুতরাং, এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সেই বৃহৎ আসনের শূন্যতাও পূর্ণ করেছেন। শ্রীনেহরুর অন্তর্ধানের সংগে সংগে এমন বিশেষ কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রেরণার নেতৃত্ব অন্তর্হিত হয়েছে, যেটা শাস্ত্রীজীর প্রতিভার কাছ থেকে আশা করবার কোন যুক্তি নেই, কারণও নেই। মনে হয়, শাস্ত্রীজীর প্রতিভার শক্তি, প্রভাব ও যোগ্যতা মোটের উপর ভারতের রাষ্ট্রিক কর্মপ্রবণতার মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকবে।

যাই হোক, শাস্ত্রীজী যে দ্বিতীয় নেহরু নন, এটা আক্ষেপ করবার মত কিংবা হতাশ হবার মত কোন কারণ সৃষ্টি করছে না। বরং, এই ধারণাই করা উচিত হবে যে, শাস্ত্রীজীর নেতৃত্ব একটি নূতনত্বের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। নেহরু-ঐতিহ্য অটুট রাখবো, এমন সংকল্প ও ঘোষণার একটা নৈতিক সার্থকতা অবশ্য আছে। কিন্তু ব্যাপারটা বাস্তবে সম্ভব নয়। যে-প্রতিভা বিশেষভাবে নেহরু-প্রতিভার অনুরূপ নয়, যে-ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে নেহরু-ব্যক্তিত্বের অনুরূপ নয়; তাদের কারও পক্ষে হুবহু নেহরু-ঐতিহ্য সঞ্জীবিত ও প্রচলিত করে রাখা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে একটা যোগসূত্র রাখা অবশ্য অসম্ভব নয়। তবু, এই যোগসূত্র সত্ত্বেও ঘটনা ও পরিবেশ ভিন্নতর রূপ গ্রহণ না করে পারবে না। শাস্ত্রীজীর নেতৃত্বের আবির্ভাব ভারতের রাষ্ট্রিক জীবনের চেষ্টা, কাজ ও চিন্তার মধ্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সংকেত হয়ে দেখা দিয়েছে, বরং এই ধারণা করাই ঠিক।

কল্পনা করতে ইচ্ছা করে, কেমন হবে এই নতুন অধ্যায়ের রূপ? নেতারা কেউ কেউ বলছেন, ভারতের রাষ্ট্রিক জীবন এইবার সমষ্টিগত প্রতিভার নেতৃত্ব লাভ করতে চলেছে। যুক্তিটা এই যে, এতদিন নেহরু-প্রতিভার একক বিরাটত্ব নেতৃত্বের সব প্রয়োজনের দাবি পূর্ণ করে রেখেছিল। এখন সেটা আর সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী এখন সমষ্টিগত নেতৃত্বের প্রধান।

এটা একটা ইচ্ছা কিংবা আশার দাবি হতে পারে। সদিচ্ছা এবং ভাল আশার দাবি। কিন্তু এর মধ্যে কিছুটা ভাবের ঘরে চুরির ব্যাপারও থাকতে পারে। গান্ধী-নেতৃত্ব ও নেহরু-নেতৃত্ব উভয়ই ছিল উচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিনায়কত্বের ব্যাপার। কংগ্রেস দলের পক্ষে সমষ্টিগত বিজ্ঞতা ও বিবেচনা নিয়ে নেতৃত্ব করবার অভিজ্ঞতা নেই, যদিও একথা সত্য নয় যে, গান্ধী ও নেহরু প্রতিভা ষোল-আনা ডিক্টেটর হয়ে নেতৃত্ব করেছে। কিন্তু পুরোপুরি সমষ্টিগত যোগ্যতা ও বিজ্ঞতার পরীক্ষা হয়ে কংগ্রেসী সাধারণ্যের সম্মুখে কোন ঘটনা বা পরীক্ষা দেখা দেয়নি। ঐতিহ্য এক্ষেত্রে কংগ্রেসের সহায়ক নয়; সংস্কারও অভ্যস্ত নয়।

কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, এই পরীক্ষাকে স্বাগত করে নেবারই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মনস্তত্ত্বের পরিভাষাতে মেগালো-মেনিয়া ('megalomania') নামে একটা কথা আছে। আকারে ও প্রকারে নিছক বৃহত্ত্ব যেন সবচেয়ে বড় গুণের প্রমাণ। যে দেশের মানুষ ডিক্টেটরী শাসন মেনে নেয়, তাদের মানসিক চরিত্রটি এই মেগালো-মেনিয়ার দাস। ভারত-ইতিহাসের পক্ষে নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে, যদি নিছক বৃহত্ত্বের প্রতি একটা পূজকতার ভাব জনতার মনোভাব অভিভূত না করে। উপনিষদের কথা আছে—সমষ্টিমহৎ হিরণ্য-গর্ভ। এই কথার গভীর তাত্ত্বিক তাৎপর্য যা-ই হোক না কেন, সাধারণ বুদ্ধির বিচার নিশ্চয় বুঝে নিতে পারবে যে, জ্ঞানেরও একটি সমষ্টিমহৎ রূপ আছে। আশা করতে অসুবিধে নেই যে, ভারতের গণতন্ত্র সমষ্টি-মহৎ নেতৃত্বের পরিচালনা লাভ করলে তার পরিণাম ভারত-জীবনের পক্ষে নিশ্চয়ই শুভাবহ হবে।

আশা করতে ইচ্ছা করে, সমষ্টিমহৎ হবার নামে বৃহত্তম রাজনীতিক দল কংগ্রেস নিজেকে নিছক কলোসাস করে তুলতে চাইবে না। পৃথিবীর রাজনীতিক ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নয়, যেখানে দেখা গিয়েছে যে, দলীয় আধিপত্য ও শক্তিকে কলোসাসে পরিণত করবার জন্যেই দলের ভিতরে চমৎকার ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দলের পক্ষেই জনজীবনের নিরঙ্কুশ ডিক্টেটর হবার, আর গণতন্ত্রকে বিকল করে দেবার ভয় থাকে। চেম্বারলেন ইতালীয় ফাসিস্তির প্রশংসা করেছিলেন। মুসো-লিনীর ডিক্টেটরী শাসনের সুফল সম্পর্কে প্রশস্তি করতে গিয়ে এমন কথাও বলা হয়েছিল : ইতালীর জীবনে এই প্রথম দেখা গেল যে, ট্রেনগুলি ঠিক সময়ের অনুবর্তী হয়ে যাওয়া-আসা করছে। ক্ষমতার কলোসাস জনকল্যাণের কাজও করে থাকে; কিন্তু সে-জন্য নিশ্চয় মনে করা উচিত হবে না যে, ফাসিস্তির মত নিরেট দলীয় সংহতির দ্বারা ক্ষমতার কলোসাস হওয়া মানেই সমষ্টিমহৎ হওয়া। কংগ্রেসের সুসংহতি ও সমষ্টিপ্রধান নেতৃত্বের মধ্যে ভয়ানক কিছু সন্দেহ করবার মত কোন কারণ দেখা দেয়নি বলেই মনে হয়, যদিও নেপথ্যে কিছু শঙ্কাময় সম্ভাবনার ছায়া দেখা দিতে পারে।

তাই আক্ষেপ করবার কোন মানে হয় না যে, আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিত্বের একজন টাইটান নন। তিনি গরীব-ভারতের একটি সাধারণ ঘরের মানুষ। দুঃখের ও অভাবের রূপ, দুঃখী হবার দুঃখ, কোনটিই তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরের সত্য নয়। কিন্তু তবু: শুধু এই অভিজ্ঞতাই নিশ্চয় তাঁর নেতৃত্বের শক্তি হয়ে উঠতে পারে না। তিনি যে চরিত্রের অধিকার লাভ করেছেন, সেটাই হবে তাঁর নেতৃত্বের শক্তি। জন বানিয়ান তাঁর 'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস' গ্রন্থে যে-সব চরিত্রের ব্যক্তিত্ব কল্পনা করেছেন, তার মধ্যে নিষ্ঠাশীল তথা সিন-সিয়ার (Sincere) হলেন একটি ব্যক্তি। শ্রীসিনসিয়ার একজন মেষপালক। শ্রীসিনসিয়ার, জীবনের রূপে তিনি একটি সামান্য ও শান্ত দীনজন মাত্র, কিন্তু চরিত্রে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান। আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীকে জন বানিয়ানের কল্পনার 'সিনসিয়ার' ব্যক্তিটির সংগে তুলনা করা যায়। আন্তরিকতার মানুষ, নিষ্ঠার মানুষ শাস্ত্রীজী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি নূতন শক্তির ব্যক্তিত্ব হয়ে দেখা দেবেন, এটা আশা করা যায়। তা না হলে তাঁর পক্ষে সমষ্টি-প্রভাবের একটি ক্রীড়নক হয়ে পড়তে হবে, এবং সেটাও নিশ্চয় নেতৃত্বের সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে একটা কাম্য অবস্থা নয়।

সমষ্টিনেতৃত্বের প্রতিষ্ঠ হওয়া, মনে হয়, এটাই নতুন প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীর প্রতিভার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। ভারতের রাজনীতিক জীবন ব্যক্তিপ্রধান নেতৃত্বের অধ্যায় থেকে সমষ্টিপ্রধান নেতৃত্বের অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হতে চলেছে। এই পরিবর্তন জাতির পক্ষেও একটি দুরূহ ঐতিহাসিক পরীক্ষা।

নেহরু-কথায় বাসন্তী দেবী

লক্ষ্মী ঘোষ

"কত কথাই না মনে পড়ছে, অনেকদিনের অনেক কথা, টুকরো ছবি, টুকরো কথা; স্মৃতিতে এসে তারা ভিড় করেছে: সবই আমার চেনা, আমার অতি পরিচিত, কিন্তু তাদের পরিচয় আজ আর মনে নেই; আর মনে রেখেই বা কি হবে বল? আসল মানুষটাই ত চলে গেল।" গলা ধরে আসছিল বাসন্তী দেবীর। ডাক্তারের নিষেধ, আত্মীয়-পরিজনের মানা; তবু, তবু ঐ অসুস্থ শরীরে বিছানায় শায়িত অবস্থাতেই তিনি কথা বলছিলেন। না-বলে কি থাকতে পারেন? জওহরলালের সঙ্গে সঙ্গে অবসিত হল একটি যুগ: নবভারতের নতুন পদ-ক্ষেপের ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায়। শুধু অধ্যায়টির সঙ্গেই নয়, মানুষটির সঙ্গে যে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়। অন্তরের অপরিমাপ্য গভীরতা থেকে উৎসারিত স্নেহ আর প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছেন জওহরলাল। সেই বাঁধন-ছেঁড়ার সুগভীর বেদনার মূর্তিমতী প্রতিমা বাসন্তী দেবী, কখনও বা তিনি পাষাণের মতই নীরব এবং নীরবতার অন্তরালে অসংখ্য স্মৃতির আন্তরশায়িতা, কখনও বা প্রিয়জন হারাণোর শোকে অশ্রুবাষ্পাকুলা।

চুপ করে বসেছিলাম; কি কথাই বা জিজ্ঞাসা করব? যা জিজ্ঞাসা করব ভেবে-ছিলাম, সবই ভুলে গেছি। যে-বেদনা গভীর, যে অনুভব নিবিড় তা' হৃদয়-সঞ্চারী। সে-বেদনা সব কিছু ভুলিয়ে দেয়; বিস্মৃত হতে হয় উদ্দেশ্য, বিস্মৃত হতে হয় পারিপার্শ্বিক।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম; তারপর একসময় নিজের অজান্তেই জিজ্ঞাসা করলাম, "জওহরলালের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?"

"কতদিনের পরিচয়?" মনে মনে যেন কি হিসেব করলেন; তারপর বললেন, "মনে নেই, প্রথম পরিচয়ের দিনটির কথা আজ একেবারেই ভুলে গেছি। মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে আমার চিরদিনের পরিচয়, মনে হচ্ছে সে পরিচয় আশৈশবের।" একটু থামলেন তিনি; মনে হচ্ছিল অনেক দূরে থেকে তাঁর কথা ভেসে আসছে। "আমার মনে হচ্ছে জওহরের সঙ্গে আজায় প্রথম পরিচয় আমার। কোনো মামলা উপলক্ষে দেশবন্ধু ও মতিলাল তখন ওখানে। তারও পর জওহরের বিয়ে; তার বিয়েতে যেতে পারিনি, কেন যেতে পারিনি তা আজ আর মনে নেই; শুধু যেতে পারিনি— এইটেই মনে আছে; হ্যাঁ, না-যাওয়ার জন্য অনেক অনুযোগ শুনতে হয়েছিল। অনুযোগ জওহর করেনি, করেছিলেন তার বাবা মতিলাল। আজ শুধু জওহর নয়, মতি-লালকেও মনে পড়ছে: তাঁর সেই মিষ্টি 'বোনটি' ডাক যেন আজও শুনতে পাই। সে আন্তরিকতা, মনে হয়, জওহরের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিবা শেষ হয়ে গেল।"

হারানোর শঙ্কাই ত ভালোবাসা। একটু থেমে আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন বাসন্তী দেবী।

"—হ্যাঁ, যা বলছিলাম; জওহরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯১৬ সালে। জওহরকে খুব ভালো করে চিনলাম ১৯১৯ সালে। দেশব্যাপী গভীর ক্ষোভ আর বেদনার মধ্যে তাকে চিনলাম।"

দুঃখের অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যেই ও

জওহরলালের পাশে উপবিষ্ট বাসন্তী দেবী—পশ্চাতে দেশবন্ধুর পুত্রবধূ সুজাতা দেবী

[illegible] অধিনায়কত্বে ঘোষিত হয়ে [illegible]

[illegible] বর্বর ব্রিটিশ [illegible] মারা ভারতের মানুষকে [illegible] শাণিত করেছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি পরিত্যাগ করলেন; মহাত্মা গান্ধীও কাইজার-ই-হিন্দ পদক পরিত্যাগ করলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে পাঞ্জাবে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করা হল। শুধু শোক নয়, শুধু বেদনা নয়, নিরস্ত্র জনতার উপর বর্বর আক্রমণের প্রতিবাদ করাই ছিল সেই অধিবেশনের মূল কথা। জওহরলাল তখন যুবক; তখন কতই বা তার বয়স; কিন্তু তখনই তার সদাহাস্যময় প্রফুল্লতার পিছনে এক নির্ভীক অত্যাচার আর অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর, অজস্র মানুষের মূক বেদনায় দীপ্ত, প্রোজ্জ্বল বুদ্ধি অথচ অতি সহজ ভাবালুতায় সিক্ত জওহরলালকে দেখেছি, বুঝেছি আর ভালোবেসেছি। কী অক্লান্ত পরিশ্রমই না জওহর তখন করেছে। ভারতের বিখ্যাত ব্যবহারজীবীর একমাত্র সন্তান বিলাস আর প্রাচুর্যের মধ্যেই যে তার বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেছে, তার পক্ষে এই প্রচণ্ড পরিশ্রম করাটা বাস্তবিকই বিস্ময়ের ব্যাপার। শুধু কি পরিশ্রম? কঠোরতাও কি কম সহ্য করেছে? সেই অসাধারণ তিতিক্ষার বুঝি কোনো তুলনাই নেই। মতিলাল ছিলেন বিলাসী; জওহরলালের কোনো বিলাসিতাই ছিল না। তাই ত সে দেশের মানুষের নিকটতম বন্ধু হতে পেরেছিল, দেশের দারিদ্র্য, দুঃখ, বেদনার বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের পবিত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পেরেছিল। সেই তাকে প্রথম চিনলাম, চিনলাম জনগণমন অধিনায়ক জওহরলালকে। তারপর থেকে তাকে অসংখ্যবার দেখেছি। পাটনা কংগ্রেসের সময় থেকেই জওহর ওঁর (চিত্তরঞ্জন) সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করতে থাকে। জওহর ছিল কাজ-পাগল; কাজ ছাড়া থাকতে পারত না। ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তুতি চলছিল এইভাবেই। কাজের পথে কোনো বাধাকেই সে কোনোদিন স্বীকার করেনি; সহ্য করেনি কোনো অবহেলা। কাজের ভার গ্রহণ করে কেউ যদি কোনো অবহেলা করত তবে তাকে জওহর কোনোদিন ক্ষমা করে নি। একদিকে যেমনই ছিল সে সদাহাস্যময়, অপরদিকে তেমনই রাগী। সে রাগ ওদের বংশগত। মতিলালও খুব রাগী ছিলেন। জওহরের মাও ছিলেন অত্যন্ত রাগী। কাজে অবহেলা কেউই সইতে পারতেন না; জওহর ত তাঁদেরই ছেলে।"
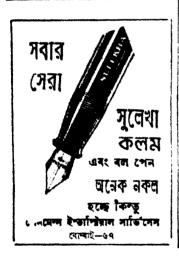
থামলেন বাসন্তী দেবী; কিন্তু সে বিরতি ক্ষণকালের। তারপর নিজে থেকেই আবার শুরু করলেন।

"জওহর ত সমস্ত দেশকে শোকে ভাসিয়ে গেল। কিন্তু নিজেও জীবনে কম শোক পায় নি। ওর অনেক আগে কমলা চলে গেছে। জওহরের মত সেও ছিল সহৃদয়। দুবার তাকে খুব কাছে পেয়েছি, এই কলকাতায় আমাদের সঙ্গেই থেকে গেছে; একবার এসেছিল চিকিৎসার জন্য। ডাঃ রায়ের চিকিৎসাধীনে অনেক দিন কাটিয়ে গিয়েছিল এখানে। দ্বিতীয়বার যখন এল, জওহরলাল তখন সেণ্ট্রাল জেলে। সেবা-সদনের বর্তমান এক্স-রে ব্লকের উপরতলার দুটি ঘরে থাকত শাশুড়ি আর বউ। মনে হচ্ছে এই ত সেদিনকার কথা; অথচ কতদিনই না হয়ে গেল।"

উদাস দৃষ্টিতে কী যেন ভাবলেন তারপর আবার বলতে শুরু করলেন:

"কী ভালোই না বাসত আমাকে। যখনই কলকাতায় এসেছে দু-পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও আমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেছে। দিল্লিতে প্রতি বছর আমার দেওর সুধীরঞ্জনের কাছে গিয়ে কয়েকদিন থাকতাম। প্রতিবারই দেখা হয়েছে। সহস্র কাজের মাঝেও কিছুক্ষণের জন্য আমার সঙ্গে দেখা করতে তখনও তার ভুল হয়নি। একবার ত আমাকে ও হেলিকপ্টারে ওঠাবেই। আমি যত বলি 'না', সে ততই বলে 'হ্যাঁ'। হেলিকপ্টারে আমাকে দিল্লি দেখাবার বাসনা তার", "বললাম—"ও তোমরা দেখোগে।"

"—আমরা ত দেখছিই, তোমাকেও দেখতে হবে। অনেক কষ্টে তার হাত থেকে রেহাই পাই। শেষবার যখন কলকাতায় এল, তখন নিজেই দেখা করতে গেলাম। জুলাই মাস। আমাকে পেয়ে তার কী আনন্দ। দুহাতে ধরে আমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিজে বসল। যখনই দেখা হয়েছে তখনই আমার শরীর সম্পর্কে সে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অথচ, আজ,...সেই আগে চলে গেল।

"জানো, আজ সুভাষের কথাও খুব বেশি করে মনে পড়ছে; ওরা যে দুটি ভাইয়ের মত ছিল, জওহর বড় সুভাষ ছোট। দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল গভীর। মতে বা পথে পার্থক্য ছিল ঠিকই, কিন্তু দুজনেরই লক্ষ্য ছিল এক; দেশের প্রতি ভালোবাসা ছিল গভীর। সে-ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না। নতুন ভারত গঠনে সুভাষকে সে আন্তরিকভাবেই চেয়েছিল।

"জওহর ত চলেই গেছে, ইন্দিরার কথা [illegible] আজ খুব বেশি করে মনে পড়ছে; বাবার কাছ ছাড়া হয়নি কোনোদিন। বাবার কখন কি চাই, সব ছিল তার নখদর্পণে। আজ আর তার ভাবনার কিছু নেই, কোনো উদ্বেগ নেই। একটা শূন্যতা শুধু। ওর শুধু বাবা নয়, নিকটতম বন্ধুকে ও হারিয়েছে। ওর শোকের সান্ত্বনা কোথায়? ওর হৃদয়ের শূন্যতাকে কি দিয়ে ভরাবে?......বাবার অসম্পূর্ণ কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে যদি সে নিজেকে সংবরণ করতে পারে; বাবার সঙ্গ থেকে অনেক অভিজ্ঞতাই সে সঞ্চয় করেছে। মনে হয়, পররাষ্ট্র দপ্তরকে সে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারবে।"

রেডিওর সংবাদ ভেসে এলো "নেহরুর ভস্মাবশেষ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হবে।"

একটু নিশ্বাসের অবকাশ। চমকে উঠলেন বাসন্তী দেবী। দেখলাম চোখের কোণ দিয়ে দু-ফোঁটা জল নেমে এল।

ধীরে ধীরে রেডিওটা বন্ধ করে দিলেন।

দ্বৈত শাসনতন্ত্র

আমি আর একবার দেশ-বিভাগের প্রস্তাব করছি।

উত্তেজিত হবেন না মশাই, নয়া পাকিস্তানের কথা বলছি না। ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত পড়ে যান।

কথাটা মনে এল সকালে মাছ কিনতে গিয়ে। চারদিক প্রায় ফাঁকা, কিছু রোরুদ্যমান মাছি এবং একান্তে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ তাঁর বিশাল বঁটিটি নিয়ে সবেগে পোনা মাছ কর্তনে রত। আরো জন পঁচিশেক তৃষিত চাতকের সঙ্গে আমিও সেখানে পৌঁছে গেলুম।

'কত করে সের?'

'লেখা আছে দেখছেন না?'—বাজখাঁই গলায় জবাব এল : 'চোখে তো আবার চশমা চড়িয়েছেন।'

চশমা সম্পর্কে মন্তব্যটুকু অনাবশ্যক, কিন্তু হাতের মাস্‌ল এবং বঁটির ধার দেখে দাঁড়াতে সাহস হল না, হজম করেই যেতে হল।

দেখলুম আট-দশটি দু-আড়াই সেরী রুই-কাতলা-মৃগেল। তার মধ্যে গুটি তিনেক রুইয়ের চেহারা একটু তরুণ—বাকীগুলো দেখে রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়ে : 'ওগো সন্ন্যাসী, হিমগিরি ছেড়ে নীচে নেমে এলে কিসের জন্যে?'

লোকটা একটা পেটপচা মৃগেল কাটছিল। বললুম, 'মাছটা তো ভালো নয়।'

জবাব এল : 'এই খেতে হবে। নিতে ইচ্ছে না হয়, বাড়ি চলে যান।'—মাছটা থেকে তখন দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে।

বললুম, 'একটা রুই কাটা হোক।'—আরো দু-তিনজন সায় দিলেন।

নির্বিকার উত্তর এল : 'রুই বিক্রী হয়ে গেছে।'

'কে কিনল?'

'আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে?'

রোগা এক ভদ্রলোক ক্ষেপে উঠলেন : 'ও মাছ নিয়ে তুমি ব্ল্যাক-মার্কেট করবে। পুলিস ডাকব আমরা।'

'পুলিস ডাকবেন?'—বিনয়ে বলবান লোকটি তরল হয়ে গেল : 'শুধু পুলিস কেন'—অত্যন্ত নম্রভাষায় আরো ওপরওলাদের উল্লেখ করে সে বললে, 'তাদেরও ডাকুন না, আমি তো এই বসে রইছি।'

ইনি হলেন [illegible] নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের ইন্‌স্‌পেক্টর

সবিনয়ে সে বসেই রইল, আমি তিনশো পঁচাত্তর গ্রাম সেই মৃগেল মাছ কিনে বাড়ি চলে এলুম। তারপর উদাস হৃদয়ে বঙ্কিমের পাতা খুলতেই : "মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌পাচ্‌ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।"

সে তো বাংলা দেশে সেই ডায়ার্কি—অর্থাৎ দ্বৈত শাসনতন্ত্রের যুগ। তার ফল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। আজ এই স্বাধীন ভারতে এ-রকম অন্যায় কথা মনে পড়া উচিত নয়। তবুও যেন আজও পাশাপাশি দেখতে পেলুম দুটি শাসনতন্ত্র—একেবারে সমান্তরালভাবে চলছে। একেই কি প্যারালাল গভর্নমেন্ট বলে?

একটি সরকার বলছে, ভালো হও, সৎ নাগরিকের কর্তব্য পালন করো। মুনাফা-শিকারীকে প্রশ্রয় দিয়ো না, অপব্যয় বন্ধ করো, বিলাস-বাহুল্য কমাও, খাদ্যের অপচয় ঘটিয়ো না; জরুরি অবস্থার কথা ভেবে বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে নিজের স্বার্থকে সংকুচিত করো।

রাজ্য সরকার বনাম নৈরাজ্য সরকার

এই সরকার আমাদের মনোনীত। গণ-তান্ত্রিক নির্বাচনে দেশের নিয়ন্তা। অ্যাসেম্‌ব্লি, কাউন্সিল, পার্লামেন্ট, মন্ত্রি-সভা, দেশরক্ষা, আইন, শৃঙ্খলা। এই সরকারকেই আমরা ট্যাক্স দিই এবং বিশ্বাস করি।

কিন্তু আর একটি সমান্তরাল সরকারকে আমাদের মনোনীত করতে হয়নি; তার জন্যে ভোট দিতে হয়নি তার অ্যাসেম্‌ব্লি-পার্লামেন্ট নেই, তার পুলিস নেই, সৈন্য নেই, অফিস নেই, লাল ফিতে নেই, কিছুই নেই। তবু তার কী নেই? সে সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ—অণোরণীয়ান্‌ মহতোমহীয়ান্‌। গীতার বিশ্বরূপের মতো ত্রিভুবন জোড়া শুধু একটি বিপুল হাঁ মেলে সে বসে আছে, আর আমরা দলে দলে শুদ্ধশান্তচিত্তে তার বদনমণ্ডলে প্রবেশ করছি!

সে বলছে : সৎ নাগরিক? হাঃ হাঃ! কত চাল চাই দাদা—ক'মণ? কণ্ট্রোলদরের মোহ ছাড়ো, ভারে ভারে পৌঁছে দেব। বিলিতী ইম্‌পোর্ট বন্ধ? টাকা দাও—যে-কোনো বিদেশী জিনিস মজুত আছে। বৃহত্তর স্বার্থ? আরে রামোঃ! আগে নিজের পেট মুটিয়ে নাও, তারপর দু-চার হাজার টাকা ডোনেশ্যান দিয়ে দেশের সেবা করলেই চলবে। দুর্নীতি? নীতি কোথায় আছে বাপু যখন তোমাদের কোনো সরকারী কর্তা-ব্যক্তিকেও ঘুষ দিয়ে দিল্লীর প্যাসেজ্‌ বুক করতে হয়েছিল?

এখন প্রশ্ন হল, আমরা কোথায় যাই?

প্রথম সরকার চোখ পাকিয়ে বলছে : খবর্দার! ওদের ত্রিসীমানায় গেছ কি মোটা টাকা ফাইন, তিন বছর পর্যন্ত জেলও হতে পারে।

দ্বিতীয় সরকার অট্টহাস্য করছে। যাবে কোথায়? আসল রাজা তো আমরাই। আমাদের চরণে শরণ না নিয়ে উপায় আছে তোমাদের?

এই হচ্ছে আসল ডায়ার্কি। এর মাঝখানে আমরা ত্রিশংকুরা যে মারা গেলুম।

সুতরাং এই অবস্থায় উক্ত প্রস্তাবটি আমি পেশ করছি।

দুই বার্লিনের মতো আমাদের দেশকেও দু ভাগ করে এই দুটি সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হোক। একদিকে থাক ভারে ভারে চাল-ডাল-মাছ-তেল, আয়েস আর টাকা' যে ভাগ্যবানদের সুযোগ আছে তাঁরা সে-সব নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করতে থাকুন। প্রাচীরের আর এক ধারে থাকব আমরা, সৎ, নিঃস্বার্থ নাগরিকেরা। লাল রুই মাছ আর চোখেই পড়বে না বলে সম্পূর্ণ বীতশোক হয়ে যাব, চাল সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে সব দুশ্চিন্তা মুছে যাবে এবং সর্বশেষে যখন নাভিশ্বাস উঠবে, তখন উদারা-মুদারায় গলা তুলে 'মোহ-মুদ্গর' গাইতে থাকব : 'সুরমন্দিরতরুতলবাস'—

এইবার বলুন, প্রস্তাবটা কি পছন্দ হল না?

বিয়ের অনেক আগে থেকেই শাশ্বতীকে উপদেশ দিতে শুরু করেছিলেন আত্মীয়েরা : 'অনেক ভাগ্যে এমন ছেলে তোকে পছন্দ করেছে। যেমন রূপে, তেমনি শাঁসালো চাকরিতে, ছেলে তো হীরের টুকরো। এখন চলনে বলনে তোকে ওরই পর্যায়ে উঠতে হবে।'

শাশ্বতীর মা গর্বে, স্নেহে শাশ্বতীর দীঘল শরীর আর পেয়ারাফুল মুখ, উত্তপ্ত কাঞ্চনের মতো রক্তিম বর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। । বলেছেন, 'পারবি না কেন, পারবি। মাস্টার রেখে কি ভালো ইংরেজী শেখাই নি? ডিবেট, ডিক্লামাশনে আর দশজনকে হারিয়ে কাপ মেডেল আনিস নি বার বার? জমাট মজলিসেই বা পেছনে পড়বি কেন? নিশ্চয়ই ওর যথাযোগ্য সহধর্মিণী হবি।'

এমন কি, শাশ্বতীর বাবা, যিনি অধ্যাপনার বাইরে অন্য পৃথিবীটাকে খুব বেশী জানেন না বলে সংসারে খানিকটা অকর্মণ্য বলে প্রতিভাত, তিনিও শাশ্বতীকে ডেকে বলেছেন, 'শাশ্বতী মা, মনে রেখো, নতুন পরিপার্শ্বিক এবং নতুন ধাঁচেতে চলতে মনে [illegible] চলবে না। ভেতরে নাও, [illegible] শাশ্বত অন্তরে। এবং বাইরে যেমন-দেশে তেমনি হতে কোনও বাধা নেই।'

একেক বছরের [illegible] থেকে শাশ্বতী শুধু তার [illegible] প্রীতিভাজন ছায়াকে [illegible]। সে ছায়া তার [illegible] কাছেও প্রতিভাসিত। নিজের ভেতরে সে কখনও গভীরভাবে অন্তঃপ্রবেশ করে নি, দেখে নি তার ব্যক্তিত্বের আড়পাথরে [illegible] কেমন। শাশ্বতী ছায়াকে হাসতে বলে, ছায়া হাসে। রাগ করতে বললে ছায়া গম্ভীর মুখ করে। শাশ্বতীর ছায়া ভারী বাধ্য। শাশ্বতী সব কথাতেই স্মিত হেসেছে। আর একুশ বছরের উজ্জ্বল আত্মবাসী মন নিয়ে ভেবেছে 'যোগ্য স্বামীর সুযোগ্য স্ত্রী হব। চলব, যেমন চালাবে। প্রশংসা কুড়িয়ে দেবো ওর সংসারের থলিতে। নিজের সামান্য দুর্বল জায়গাগুলো রিপু করবো সযত্নে। নতুন একটা [illegible] চলার সাধনা, এরই নাম তো যুগ্মজীবন।'

বিয়ের পরেই কর্মস্থল ভাইজাগের দিকে রওনা হতে হলো। হাওড়া স্টেশনে শাশ্বতীর হাতে-খাড়ু চুড়ির কাঁটা, [illegible] নির্দিষ্ট প্রণামীর সঙ্গে। বাকি পথে এলোমেলো দু-একটা কথাবার্তা হলো। সমর চঞ্চল, একটা অন্তর্নিহিত ছটফটানিতে উদ্দীপিত। ট্রেনের দীর্ঘ সময় যেন তার কাছে অস্বাভাবিক দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। রাতের পানীয়ও তাকে গাঢ় ঘুম এনে দেয় নি। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই শাশ্বতীর বার্থের কাছে এসে শাশ্বতীর [illegible] নিটোল ঘুম ভাঙিয়ে দিলো সে।

'ওঠো, তাড়াতাড়ি উঠে তৈরী হয়ে নাও। ভাইজাগ স্টেশনে আমার সব বন্ধু-বন্ধুনীরা আসবে আমাদের রিসিভ করতে।'

শাশ্বতী নেমে পড়লো, সুটকেশ খুলে জামা কাপড় বের করলো।

'না, না, ওসব হাতওয়ালা জামা পরো না। [illegible] রেখেছো ওইসব জামার। বরং আমাদের তরফ থেকে যা পাঠানো হয়েছিলো, তারই একটা পরো।'

'বাবাঃ, মেয়েদের পোশাক পর্যন্ত দেখছি নখদর্পণে।' টুথব্রাশ-ভর্তি মুখে শাশ্বতী ঠাট্টা করলো।

সমর একটুও হাসলো না। 'লিপস্টিক লাগাতে জানো তো? বিয়ের রাতের পর থেকে তো ঠিকমতো প্রসাধন করতে দেখলাম না। তোমার স্মার্টনেসটা যথেষ্ট, কিন্তু জানো তো ফার্স্ট ইম্প্রেসন ইজ ফার্স্ট ইম্প্রেসন। ওদের সামনে যেন ঠিকমতো সাজে, পোশাকে দাঁড়িয়ো।'

'কে কে আসছে?'

'আপাতত রজত বোস আর [illegible] বোস। হয়তো ত্রিবেদীরাও আসবে। ওরাই আমার ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড। দুজনেই খুব স্মার্ট, তুলনা হয় না। পার্টিতে [illegible] একাই এক হাজার [illegible]।'

'কে মিসেস ত্রিবেদী?' ছাত্রীর মতো কৌতূহলে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো শাশ্বতী।

'ও? ভেরি স্মার্ট, তার ওপর সুন্দরী। কিন্তু আই এ এস এর মেয়ে বলে

একটু নাক উঁচু, অহংকারী। বুলবুল অন্যরকম। উজ্জ্বল, উচ্ছল, হাসিখুশী। অনায়াসে জমিয়ে নিতে পারে।',

ঝলমল করতে করতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো শাশ্বতী। সমরের চোখে যে মুগ্ধদৃষ্টি আশা করেছিলো, তা ফুটলো না। তবে শাশ্বতীকে আপাদমস্তক দেখে নিলো সে।

'কী, চলবে?' হাসছিলো শাশ্বতী।

সমর লাফিয়ে উঠলো। 'তাই তো, এবার আমার পালা। কোথায় স্যুট, কোথায় রুমাল, কোথায় টাই! দেখো তো, দেখো একবার হাত বুলিয়ে গালটা ঠিক মসৃণ আছে, না আর একবার শেভিং-ব্লেডের পোঁচড়া চাই।'

শাশ্বতী হেসে লুটোতে লাগল। তবে শাড়ির ভাঁজ, মুখের পেণ্ট ইত্যাদি বিন্যস্ত রাখতে গিয়ে এই প্রথম তাকে হাসির অর্ধপথে থামতে হলো।

ভাইজাগ স্টেশনে গাড়ি থামতে না-থামতে প্লাটফর্ম থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে কামরায় উঠে এলো ওরা। রজত বোস আর ত্রিবেদীর পোশাক যেন সমরের সাজকে হার মানায়। চন্দ্রা ত্রিবেদী সাজে পোশাকে পট-আঁকা ছবি। আর বুলবুল বোস যেন একটা উজ্জ্বল প্রজাপতির মতো সহসা এসে শাশ্বতীর গলা জড়িয়ে ধরলো। 'ফোটোর চেয়েও বেশী সুইট। সমর, এবার বলবে তো আমার পছন্দ দারুণ। জানিস, চন্দ্রা—চল্লিশখানা ফোটোর ভেতর এর ফোটো আমি সমরকে বেছে দিয়েছিলাম।'

এতোক্ষণে সমরও কিন্তু হাসছিলো। অবিমিশ্র গর্বের, উল্লাসের হাসি। চন্দ্রা ত্রিবেদীর সূক্ষ্ম ঠোঁটেও পরিমিত হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেলো। 'সত্যিই সুন্দরী।'

'অবশ্য তোর সঙ্গে তুলনা করছি না। তবে আমাদের মতো খাঁদা-পেঁচাদের পাশে অপ্সরী।' বুলবুল পেয়ারা-ভাঙার মতো করে হেসে উঠলো।

সবাইকেই হাসতে হচ্ছিলো। রজত বোস আর শাশ্বতী মুখোমুখি হাসলো, কেন তারা জানে না। ত্রিবেদী হেসেই চলেছে প্রথম থেকে। হাত বাড়িয়ে দিলো, 'আসুন, মিসেস্ সেইন।'

সমর কোথায়, সমর বুঝি বুলবুলকে নিয়ে আগেই নেমে গেছে। আর চন্দ্রা ত্রিবেদীকে নিয়ে রজত বোস। ত্রিবেদীর বাহুর আকর্ষে শাশ্বতী ভাইজাগ স্টেশনে পা রাখলো। ত্রিবেদী কী ভাবলো, মালপত্র গোছালো। 'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, এসব আমাদের পারস্পরিক বন্ধুকৃত্য।'

সমরের বাড়িতে বন্ধুরা এসে শাশ্বতীকে খুঁটিয়ে দেখলো। বন্ধুরা এবং আরও বন্ধুরা। অর বুলবুল বোস শেষ পর্যন্ত হাই তুলে বললো, 'রজত, আজ আর আমি দুপুরে বাড়ি যাচ্ছি না। তুমি চলে যাও, আমি এখানেই থাকছি। একেবারে বিকেলে যাবো।'

সমর ওকে একটা ভাঁজ-করা খাট এনে পেতে দিলো। 'শোও, শুয়ে পড়ো।'

'তোমার শুতে যাও না,—আমার জন্য ভাবনা করতে হবে না। মেয়েটা নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে এসেছে দূর থেকে রাস্তা। তোমার

'কী জানো? এসব নিয়ে আমরা অতোটা বাছাবাছি করি না। আর, ধরো একটু আধটু ছোঁয়াছুঁয়ি কি হালকা কথাবার্তায় মনটাতে বৈচিত্র্য এনে দেয়। জীবনকেও উপভোগ করা যায় ঠিকমতো। তা নইলে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কটা একটু একঘেয়ে হয়ে যেতো না কি? আমার কথাগুলো তোমার খারাপ লাগছে?'

'না, ঠিক খারাপ নয়। তবে অন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জীবনকে দেখতে হবে, তা বুঝতে পারছি। যাক্, চেষ্টা করবো।'

মিতুর বিয়ের পার্টিতে নববধূর মতো বসার কোনো রেওয়াজ নেই। বরং এ কোণ থেকে ও কোণে সকলকে স্মিত হাস্যে ও কুশল প্রশ্নে আপ্যায়ন করাই শাশ্বতীর কাজ। আর সে কাজ শাশ্বতী প্রশংসনীয়ভাবেই করে যাচ্ছিলো। সহসা নতুন ভদ্রলোকটির দিকে চোখ পড়লো তার। যেন সাধারণের চেয়ে একটু আলাদা চেহারা। শাশ্বতী কাছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে করমর্দনের হাত না বাড়িয়ে দুটি হাত যুক্ত করে কপালে ছোঁয়ালো, বললো, 'নমস্কার। নাম অরুণ চৌধুরী। বেশ কিছুক্ষণ ধরে আপনাকে লক্ষ করছি। বলেন বটে সোজা সোজা, পারেন বটে জুতোমোজা, কিন্তু আপনি ঠিক এঁদের দলের নন। ঠিক ধরেছি?'

শাশ্বতী অকৃত্রিম হেসে উঠলো, বললো, 'বসুন। পরে কথা হবে। আমাকে এখন একবার ওদিকে—'

'নিশ্চয়। যাবেন বইকি।' বলে অরুণ চৌধুরী তার হাতের গ্লাসে পানীয় ঢালবার জন্যে অন্য দিকে এগিয়ে গেলো।

'এই ভদ্রলোক কে, বলো তো?' এক ফাঁকে সমরকে কাছে পেয়েই ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করলো শাশ্বতী।

'অরুণ চৌধুরী। লণ্ডন থেকে সদ্য আসা, নিউ ইয়র্ক থেকে টাই আনান। জাপান থেকে কামস্কাটকা পর্যন্ত ঘুরে বেড়ান ফার্মের টাকায়। বিরাট লোক।'

'তাই বুঝি?'

সমরের আর দাঁড়াবার সময় হলো না। সে চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। শাশ্বতীর মনোযোগের কাঁটা কিন্তু একটি বিন্দুতে স্থির হয়েছিলো। দুটি হাস্যোজ্জ্বল চোখ বারবার একটা মুগ্ধতা নিয়ে তার দিকেই যেন এসে আবার ফিরে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ছোট এক গ্লাস ওয়াইন নিয়ে অরুণ চৌধুরী তার কাছে এগিয়ে এলো। বললো, 'জানি, আপনি এসবে নতুন। তাই আমার হাতেই শুরু করুন। আপনাকে কিছুক্ষণ স্বচ্ছ এবং স্বাভাবিক চেহারায় দেখতে পেয়ে আজ আমারও অবাক লাগছে। কৃত্রিমতার পোশাক পরেই তো আমাদের দৈনন্দিন চলাফেরা; তার মধ্যে, আপনি!'

'শেষের কবিতা'র অমিতকে শাশ্বতী জানতো, সে কুশ্রী তরুণীর রূপের প্রশংসা করে এবং যার গলায় সুর নেই তাকে পীড়াপীড়ি করে গান গাওয়ায়। এসব কথা-বার্তাও বুঝি সেই জাতের। হেসে বললো, 'আপনার যে বিচক্ষণ চোখ, তাই ঠিক বুঝে নিয়েছেন আমি অন্য গড়নের মানুষ। এখনো কলেজের খোপ ভাঙেনি।'

'তার ওপরেও কিছু। আপনি নিজের মতো করে ভাবেন। দম-দেওয়া পুতুলের মতো মাপা হাসি আর পরিসীমিত আলাপের মধ্যে কখনো নেমে আসতে পারবেন না। আস্ত, অখণ্ড, প্রাণময় মানুষের সঙ্গে আমাদের তো দেখা হয় না।'

'আদবকায়দাগুলি তো বাইরের। ভেতরে সবারই কি একটা মানুষ থাকে না?'

'থাকে না। মরে যায়। সর্বদা শাড়ির জাঁক কি নেলপালিশ, কি ধরুন—সারাদিনের ছোট বড় এনগেজমেণ্ট ভাবতে ভাবতে সে মানুষ মরে যায়, যে নিশ্চিন্তে দু ঘণ্টা বাজে আলাপ করে কারো চোখে হাসি দেখতে ভালোবাসতো। যার জন্যে রামধনুতে সাতটা আশ্চর্য রং। যে বানিয়েছে মহামূল্য সব সিমফনি কি রাগ-রাগিণীর ইন্দ্রজাল। আপনি Sagan-এর নতুন বইটা পড়েছেন, Aimes Vous Brahms? মানুষ মানুষকে তাই দিয়ে চিনবে। Brahms ভালবাসেন না Beethoven না কি Chopin? না, আলি আকবরের স্বরোদ? বেহাগ সব থেকে প্রিয়, না আশাবরী? আপনি,—হাসছেন?'

'আপনি সুন্দর কথা বলেন। অনেক গুণের মধ্যে এটাও বোধ হয় একটা গুণ। আপনি শুনেছি এ সমাজেও সব থেকে বেশী সম্ভ্রান্ত পোশাক-আশাকে। আর দেখলাম চতুর্দিকে কতোটা জমিয়ে নিলেন সকলের সঙ্গে। কতো পেগ, তাও মোটামুটি দেখেছি; মনে হয় আপনার সম্পর্ক এই সমাজের সঙ্গে মাছ আর জলের সম্পর্কের মতো। বলতে চান, এসব আপনার ভালো লাগে না?'

'আমার এই ছদ্মবেশটা খুব স্বাভাবিক। পৃথিবীতে যা ভালো লাগে, তা করাতেই কৃত্রিমতা, আড়ষ্টতা এসে যায়। যা ভালো লাগে না, তা অবলীলায় সাধিত হয় বলেই করা সহজ। ককটেল-পার্টি কি ডিনার-পার্টিতে আমার সাফল্য অবধারিত, কারণ মনটা তখন পালাতে চাইছে অন্ধকার কোনো নিঃশব্দতায়। আর যখন এমন কোনো জায়গায় পড়ি, যেখানে মনটা তার খোরাক পায়, তখন কিন্তু খুব বেশী উজ্জ্বল হতে পারি না। পেরেছি কি?'

'নিশ্চয়ই। সেণ্ট পার্সেণ্ট। তার মানে, অন্যদের মতো এখানেও আপনি বেশ একটু আনন্দ দিতে পারলেন, হয়তো নিজে আনন্দ পেলেন না বলেই। আপনার কথা বিশ্বাস করলে তাই ধরে নিতে হয়।'

'আমার কথাগুলো ছিল আমার স্বভাবের পক্ষে নিয়ম। আপনি কিন্তু ব্যতিক্রম। আপনি হচ্ছেন এই সমাজ আর অজানা অন্ধকারের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে। তাই ভালো লাগলো। ভুলবো না। আবারও দেখা হবে। আর একটু নেবেন?'

'না। ধন্যবাদ। আর না। এতেই আমার মাথা ঝিমঝিম করছে।'

তারপর অবশ্য ত্রিবেদীর অনুরোধে আর একটু খেতে হলো। রঞ্জিত বোস এবং অন্য বন্ধুরা সাধাসাধি করে আর একটু খাওয়ালো। আস্তে আস্তে শাশ্বতীর মাথার ভেতরে কোথাও একটা গিঁট খুলে গেলো। অল্প কথাতেই অনেক হাসি পেতে লাগলো তার। কথাগুলো যেন নিজেরাই ভ্রমরের মতো পাখায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে গুনগুন করতে লাগলো।

'আর খাবেন না। পরে শরীর খারাপ লাগবে। বড়ো তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছেন আপনি। এই সমাজের মধ্যমণি না হলেই কি নয়?' শাশ্বতীর হাতের গ্লাস সরিয়ে নিলো অরুণ, অরুণ চৌধুরী। 'কী হবে এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে? বরং যা আছেন তাই থাকুন। নিজের সুন্দর ব্যক্তিত্বকে হারাবেন না। প্রথম ধাপ হচ্ছে, সেই দিকে সচেতন থাকা।'

'আশ্চর্য, আপনি না বলে এ কথাগুলি আমার স্বামীরই বোধহয় বলে দেওয়া উচিত। কিন্তু উনি,—মানে সমর কোথায়?

'Draught of Oblivion, মিসেস সেইন। সমর এখন স্বামীর কর্তব্য ইত্যাদি মনে রেখে বসে নেই। চেয়ে দেখুন। আর, আপনি কি বলতে চাইলেন আমি অনধিকার চর্চা করছি? অস্বীকার করবেন না। সত্যিই আমি অনধিকারী। কিন্তু,—আপনাকে না থামিয়ে পারলাম না।'

ভোরবেলায় বিশ্রী মাথাধরা নিয়ে শাশ্বতীর ঘুম ভাঙলো। হাঁড়ির মতো মুখে সমরও মাথায় দু' হাত দিয়ে বসে ছিলো। বললো, 'কফির জন্যে বলে দিয়েছি। খুব কড়া কফি খাও, ছেড়ে যাবে।'

শাশ্বতী অল্প অল্প হাসছিলো, খানিকটা গত রাতের কথা ভেবে, আর খানিকটা নেশার মতো, স্বপ্নের মতো। সমর বললো, 'বেশ ভালোই তো উতরে গিয়েছিলে কাল। সাফল্য শতকরা হারে এক শো।

'না, নিপুণ চোখে ধরা পড়ে গিয়েছি, জানো?' গল্পটা বললো শাশ্বতী।

সমর খুব মন দিচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত বললো, 'ওটা বোধ হয় ওর একটা নতুন stunt। অকৃত্রিম মানুষ ইত্যাদি। একটু অদ্ভুত, জানো। কারও সঙ্গে ঠিকমত মেশে না। কারও বাড়িতে যায় না। শুধু পার্টি দেয় অনেক, আর সব পার্টিতেই যায় ঠিক। বোধ হয় একটু দাম্ভিক।'

'বোধ হয় আসলে সঙ্কুচিত। জনতার মধ্যে নিজেকে ঠিক ছদ্মবেশে চালানো যায়, কিন্তু স্পর্শকাতর স্বভাব নিয়ে দু-চারজনের মধ্যে মিশতে গেলেই মুশকিল। আসলে, বোধ হয়, সঙ্কোচেরই অন্য নাম অহংকার।'

আবার দেখা হলো ক্লাবে। ব্রিজের টেবিলে অরুণ ইচ্ছে ক'রে এসে শাশ্বতীর পার্টনার হয়ে বসলো। সমর আর বুলবুল অন্য দিকে। বুলবুলের স্বামী রঞ্জত বোস এই সময়ে টেনিসে যায়। কয়েকটা 'গেমে'র পর হাত থেকে তাস টেবিলে রেখে দিলো অরুণ। শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসবেন? ও-পাশের বারান্দা থেকে সোজা দেখতে পাবেন সূর্যাস্ত। এ সময়টার সমস্ত কাজ থেকে ছুটি নেওয়া উচিত।'

সমর টেবিল ছেড়ে উঠবে না, তা ওরা জানত। সমর ও-পাশ থেকে আর দুজনকে ডাক দিলো শূন্য চেয়ারগুলি ভর্তি করবার জন্যে। অরুণের পাশাপাশি শাশ্বতী এসে বাইরের বারান্দায় দাঁড়ালো।

'দেখেছেন, আকাশের রঙ। অপূর্ব নয় কি?'

শাশ্বতী সে কথার জবাব না দিয়ে বললো, 'আপনি তো চমৎকার ব্রিজ খেলেন।'

অরুণ অল্প হেসে বললো, 'আপনিও তো চমৎকার হৈচৈ করতে পারেন পার্টিতে। কিন্তু কী জানেন, আসলে আমার একটুও ভালো লাগে না এসব। আপনারও ভালো লাগবে না।'

'আপনি সব কিছুতেই এতো নিপুণ হয়েছেন, তবুও! ঠিক বুঝতে পারছি না। ভালো না লাগলে কেন ভালো করে আয়ত্ত করেছেন?'

'আমার ইচ্ছাগুলি, জানেন, ছটফট করে। ছুটোছুটি করতে চায়। সেই গল্পের ভূতের মতো। কোনো কাজে খাটানো হবার সুযোগ পেলে কিছুক্ষণ তারা আমায় শান্তি দেয়। অন্তত এতদিন তা ছাড়া কিছুতেই কোথাও স্বস্তি পেতাম না।'

'এখন কোনও তফাত হয়েছে নাকি?'

'আপনি তা নিয়ে ভাববেন না। আমি খুব অল্প বন্ধুত্বের মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকতে পারি। কিন্তু সেইটুকু বন্ধুত্বও পাওয়া যায় না। যার সঙ্গে রুচি মেলে না, তারই সাথে ঘনিষ্ঠতা করতে গিয়ে মৃত্যুর অধিক শাস্তি মেনে নিতে পারি না।'

'হ্যাঁ, শুনেছি আপনি কারও সঙ্গে মেশেন না। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি, ঠিক বুঝতে পেরেছি আপনাকে। আমি নিজেও এমন লোকের সঙ্গে মিশতে পারি না, যে আমার রুচিকে মর্যাদা দেবে না।'

'অথচ আপনি সমরকে বিয়ে করেছেন,' হেসে উঠলো অরুণ, 'এবং নতুন রুচিতে জীবনকে ঢালাই করছেন। এটা অন্যরকম হলো না?'

'বিয়ে?' শাশ্বতী অপ্রস্তুত হলো, 'দেখুন, বিয়ের আগে আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, আমাদের কোনও রুচি আছে। ঠিক যেমন, যতক্ষণ হাওয়া ঘিরে থাকে, তাকে অনুভব করা যায় না। হাওয়ার অভাব হলে তখন বুঝি, কী নেই।'

'আর তখনই ছুটে আসে এমন হাওয়া, যা দক্ষিণ হাওয়া, যা এক ঝলক হাওয়া, যা প্রবল ঝড়ের হাওয়া।'

'তবে বিয়ে যখন হয়েছে—' শাশ্বতী আগের কথায় ফিরে গেলো, 'তখন ও'র রুচিতেই আমার রুচি। মানিয়ে না চললে দীর্ঘ জীবনের যুগ্ম পদচারণা যে কঠিন হয়ে উঠবে।'

'তবুও নিজেকে হারাবেন না। হোক না একটু কঠিন। রুচিকে মেলাবার দায় তো দুজনের। মাঝামাঝি কোথাও রফা করুন। অনধিকারচর্চা করছি?'

'না। বন্ধুর মতো উপদেশ দিচ্ছেন।'

'ভাববেন না, উপদেশ দেবার কোনও

আঁধিকার জন্মার নন্দনে থেকে। নন্দনে শুধু নিজেকেই নতুন করে আবিষ্কার করায়। সেখানে কোনও আপোস দরকার হয় না, দরকার হয় না স্বভাবকে দুমড়ে পিটিয়ে অন্যের ইচ্ছেমতো গড়ে তোলবার। বন্ধুত্বে কোথাও সিমেন্ট লাগে না, সেইটুকুই মিরাকল্। তাই তো আপনাকে দেখেই মনে হলো, 'এতদিন কোথায় ছিলেন', মনে পড়ছে?'

'নাটোরের বনলতা সেন!—'

'দু দণ্ডের শান্তি দিয়েছিলো যে। জীবনানন্দ দাশ আপনার ভালো লাগে? কতো দিন যে বাংলা কবিতা পড়িনি, তবুও 'বনলতা সেন' মনে আছে। এবার বাংলা কবিতা পড়বো। আবার পড়বো রবীন্দ্রনাথের বইগুলো। আর পড়বো নতুন নতুন সব ইংরিজী কবিদের। বলুন, ওঁদের কাছে কি ঋণ?'

'হঠাৎ কবিতা পড়ার খেয়াল চলো?'

'কবিতা পড়ার দিন আসে। মেজাজ আসে। তখন মন উন্মুখ হয় কবিতাকে কেন্দ্র করে তুমুল একটা আলোচনার জন্যে। আপনি আলোচনা ভালোবাসেন? সাহিত্যের ছাত্রী, বলেন কী! আমি কিন্তু অর্থনীতি। তবুও দুঃসাহস করে যদি আলোচনা করি, খুব বেশী উচ্চস্তরে না গিয়ে, দুর্বোধ্য বুকনিতে কণ্টকিত না করে?'

'আপনি কি ভাবছেন, আমি আলোচনা না করে পাণ্ডিত্য ফলাবো? আর, পাণ্ডিত্য আমার নেইও।'

'বেশ তো। কবে আপনার ওখানে আসবো বলুন।'

'কে এসেছিল বললে? অরুণ চৌধুরী?' সমর হঠাৎ শিস দিয়ে উঠলো, 'এরই মধ্যে ওকে আঙুলের আগায় গেঁথে ফেললে? দ্রুত উন্নতি, অতি দ্রুত। ও তো কারও বাড়িতে যায় না! শুধু বুলবুল—'

'কী, থামলে কেন?'

'বলবো কিনা, ভাবছিলাম। বুলবুল প্রথম আসার পর কিছুদিন অরুণ ওদের ওখানেও যেত। তারপর ওদের হঠাৎ ছেড়ে দিলো। এখন তো এমন ভাব করে, বুলবুলকে চেনেই না। অথচ বুলবুল এতো মিশুক, এমন সামাজিক। রজত অবশ্য অতটা নয়, তবু বেশ আলাপী তো! কিন্তু কখনো অরুণের সঙ্গে ওকে আলাপ করতে দেখি না।'

'সবাইকে যে বেশীদিন ভালো লাগে, তা তো নয়। বরাবরের জন্যে ভালো লাগে, এমন লোক খুব কম আছে।'

'ভয় লাগিয়ে দিচ্ছো কিন্তু।' সমর স্ত্রীর গালে গাল ঘষে নিলো—'আই হোপ ইউ লাইক মি, ফর অলওয়েজ। আমি লোক খারাপ নই।'

দুপুরের আধঘুম ভেঙে সেদিন শাশ্বতীর টেলিফোন বেজে উঠলো। 'হ্যালো, আমি সমর। বিকেল চারটের তৈরী থেক। আজ পেরমার আমাদের নিয়ে কী এক অ্যামেরিকান নাচে যাবে বলেছে।'

'সে কি, তোমাকে যে বললাম, বিকেলে চৌধুরী আসবে।'

'ফাঁসিতে ঝোলাও চৌধুরীকে। দু-একদিন এসে বুড়ো আঙুল না চুষলে তার তোমার অ্যাডমায়ারার কী হল। এ দারুণ নাচ, বুঝলে! ক্যাবারে-র চেয়েও ইন্টারেস্টিং।'

'না-হয় আমি না-ই গেলাম। ওসব আমার খুব কিছু ভালো লাগে না।'

'এখনো লজ্জা পাও বুঝি? আচ্ছা, না-হয় পেরমার আর আমি যাবো। কিন্তু মিসেস পেরমার তোমাকে একটু নীচু চোখে দেখবে। চৌধুরী কি এতোটাই জরুরী?'

'বলেছিলাম, বাড়িতে থাকবো। কথা দিয়েছি, কথা না রাখা কেমন হবে?'

'অ্যাডমায়ারারদের সঙ্গে যে কথা না রাখাই দস্তুর।'

'চৌধুরীর সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলো কেন? ও তো বন্ধুই। তোমারও বন্ধু।'

'আমার বন্ধু? হাসালে। তুমি আসার আগে ওর সঙ্গে আমার গুণে-গেঁথে দশটা কথা হয়েছে কিনা সন্দেহ। এখনও তোমাদের মধ্যে আমি ঠিক খাপ খাই না। ওসব বাজে মেয়েলী ন্যাকামি আমার ভালো লাগে না। কী যে তোমার ভালো লাগে, জানি না। নাকি আরতিটুকুতেই সুখ পাও?'

'যদি আগে বলতে, আমি চৌধুরীকে কথা দিতাম না। ওকে এখন ফোন করেও তো পাবো না। অফিস ছেড়ে বাড়ি ফেরার পথে। হয়তো বাড়ি যাবেই না, সোজা এখানে আসবে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি চৌধুরীকে দেখো। আমিই পেরমারদের সঙ্গে যাচ্ছি। নেভার মাইন্ড, ডীয়ার, টেক ইট ঈজি।'

উত্তর জীবনে জওহরলাল অনেকবার একথা উল্লেখ করেছেন

"how much I owed to her for her splendid behavior."

কমলা নেহরু দাম্পত্যক্ষেত্রে অনমনীয়া ছিলেন কিন্তু সেই তেজস্বিনী স্বামীর জীবনে এনেছিলেন শান্তি ও সহধর্মিতা,

"She had not only put up with my vagaries but brought me comfort and solace when I needed them most."

নেহরুর আত্মজীবনীতে এক জায়গায় আছে কমলা একবার পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হলে উপস্থিত সাংবাদিকেরা তাঁকে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। সেইক্ষণে, যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি বললেন, "আমি আমার স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে অপরিসীম গর্ব ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। আশা করি দেশের লোক ঝাণ্ডা উঁচু রাখতে পারবে।"

নেহরু তাঁর সম্বন্ধে আরও বহু লিখেছেন কত মর্মস্পর্শী বেদনায় কমলাকে বর্ণনা করেছেন তার কিছুও পড়লে বোঝা যায় তাঁদের স্বল্পপরিসর বিবাহিত জীবনে কি গভীর যোগ রচনা হয়েছিল।

"একটির পর একটি কমলার শত রূপ আমার মনে আসতে লাগলো, তার ঐশ্বর্যময় ব্যক্তিত্বের শতরূপে। প্রায় বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে তার মনের ও আধ্যাত্মিক সত্তার অভিনবত্ব আমায় আশ্চর্য করে দিত। আমি তাকে কতভাবে জানতাম, তাকে বুঝতেও প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। সেই বোঝা আমার বিফল হয়নি কিন্তু তবু প্রায়ই ভাবতাম সত্যি কি আমি তাকে জানি বা বুঝি। তার মধ্যে যেন একটা অধরা রূপ ছিল। সে রূপ স্বর্গীয়, সত্য কিন্তু মর্ত্য নয়। স্পর্শ করা যায় না। কখনও কখনও তার দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিয়ে মনে হতো বুঝিবা অচেনা কেউ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

স্কুলের সামান্য পাঠ বাদ দিলে তার নিয়মানুযায়ী ধরাবাঁধা শিক্ষা সে রকম হয় নি। শিক্ষার গতানুগতিক ধারার মধ্য দিয়ে তার মন গড়ে ওঠেনি। সে আমাদের ঘরে সরলা বালিকার মতই এসেছিল। আধুনিক কালের সহজপ্রাপ্য কোন জটিলতা তার মনে আসেনি। তার বালিকাসুলভ সুকুমার সৌন্দর্যের পরিবর্তন কখনও পুরোপুরি হয়নি কিন্তু নারীত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে এসেছিল গভীরতা। এ গভীরতা আড়াল করে রাখত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন স্থির জলাশয়ের তলে ঝড় বয়ে চলেছে।"

আবার এক জায়গায় নেহরু বলেছেন "I have come across few persons who have produced such an impression of sincerity as she did."

অথচ কমলা কি জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন কি অসীম শ্রদ্ধা তার জন্য রাখা তাঁর অসামান্য স্বামীর মনে?

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের অবকাশ অত্যন্ত অল্প ছিল। জওহর বার বার কারাগার বরণ করেছেন, কমলা দীর্ঘ রোগশয্যায় শূন্য জীবন কাটিয়েছেন, তবু দু'একটি স্মৃতি কত মধুর। "আমার পিতার শেষ অসুখের ও মৃত্যুর ছায়ায় আমাদের আবার মিলন হয়েছিল। এবারে যেন নূতন করে জানাজানি, সঙ্গের সাথী সহকর্মী রূপে। কয়েক মাস পরে যখন আমরা সকন্যা সিংহল গিয়েছিলাম বেড়াতে তখন যেন আবার আবিষ্কার করলাম দুজনে দুজনকে। বোধ হয় যেন বিগত সব দিনের একত্র জীবন যাপন এই নূতন আর নিবিড় সম্পর্কেরই প্রস্তুতি ছিল।"

কিন্তু এত সুখ স্থায়ী হওয়া কমলার জন্য নয়। ১৯৩৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আবার জওহরলাল বন্দী হলেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখে কমলা উপরের ঘর থেকে স্বামীর জন্য কিছু জামা কাপড় আনতে গিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য জওহরলালও অনুসরণ করলেন। হঠাৎ কমলা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তিনি কি বুঝেছিলেন তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে এই শেষ দেখা?

১৯৩৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভোরের আলোর প্রথম স্পর্শে কমলা নেহরু দেহত্যাগ করেছিলেন বিদেশে—সুইজারল্যাণ্ডে। সুইজারল্যাণ্ডেই তাঁর নশ্বর দেহের শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

"Within a few minutes that fair body and that lovely face which used to smile so often and so well were reduced to ashes."

আজ যেমন করে তাঁর স্বামীর দেহাবশেষ আধারে অপেক্ষা করছে দিগন্তে মিলবার জন্য, সেদিন তাঁর দেহাবশেষের পাত্র পূর্ণ করে বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি জওহরলাল বেদনার্ত হৃদয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সে পাত্র আসবে স্বদেশের মাটিতে। সে দিনের শোক তাঁর ভুলবার নয়—

"a small urn contained the mortal remains of one who had been so vital, so bright and so full of life."

তার পরের পথটুকু আরও কঠিন। "কায়রো ছাড়বার পর, ঘন্টার পর ঘন্টা জনহীন মরুভূমির উপর দিয়ে উড়ে আসছিলাম। দারুণ নিঃসঙ্গতা আমাকে ঘিরে ফেললো। আমার জীবন শূন্য ও উদ্দেশ্যবিহীন মনে হল। আমি সেই ঘরে একা ফিরে চলেছি, যে ঘর আর ঘর নয়, গৃহ নয়। আমার পাশে একটি ঝুড়িতে রাখা একটি পাত্র। এই কমলার দেহের শেষ। আমাদের উজ্জ্বল স্বপ্ন সব ঠিক ভুলেই ভস্মে পরিণত হয়ে গেল। সে আর নেই, কমলা আর নেই, আমার মন যেন বার বার এ কথাই বলে চলেছে।"

আজ সমস্ত ভারতবর্ষ ঠিক ঐ শূন্যতা অনুভব করছে। সে জন নেই, যার অভাব পূর্ণ হবার নয়। তবে যদি পরকালে বিশ্বাস করি, আজ জওহরলালের অবিনশ্বর আত্মা তাঁর হারানো কমলাকে কাছে পেয়েছে। এ জীবনে কমলা যাঁর সান্নিধ্য পাবার সুখ উৎসর্গ করেছিলেন দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য, স্বামীর ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য সে কমলা হয়তো আজ নূতন করে বরণ করে নিয়েছেন তাঁর স্বামীকে। পড়ে আছে শোকার্ত দেশবাসী।

বিশ্ববিচিত্রা

আকাশমুখেই সমস্যার সমাধান

শহরের যেখানে-সেখানে একতলা দোতলা বাড়ি তুলে মূল্যবান জমি নষ্ট করাটা পশ্চিম জার্মানীতে অনেকেই সঙ্গত মনে করছে না। একদল লোক তো ক্ষেপেই গিয়েছে। তারা বলছে শহর এবং শহরের মানুষকে বাঁচাতে হলে এইসব বাড়ি ভেঙ্গে ফেলে মার্কিনী ছাঁচে আকাশচুম্বী সৌধ তৈরি করতে হবে। নগর পরিকল্পনায় ৭৭ বছরের অভিজ্ঞ বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক আর্নস্ট মে এদের মতে সায় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, যত্রতত্র ছোট ছোট বাড়ি তুলতে দিলে শহরের মূল্যবান জমি তো নষ্ট হবেই, মায় শহরের উপকণ্ঠগুলিও বেহাত হয়ে যাবে। বিভক্ত জার্মানী এখন ক্ষুদ্রকায়, সেখানে যদি এখন বসবাসের জন্যে কেবল ছোট ছোট বাড়ি ওঠে, তা হলে আর চাষের জমি থাকবে না।

তা ছাড়া কাজকর্ম আজকাল সবই শহর-কেন্দ্রিক। তাই কর্মক্ষেত্রের কাছে থাকাই সুবিধে। দূরে দূরে থেকে রোজ আসা-যাওয়া করা আজকাল এক ঝকমারি। সেজন্য মফঃস্বল থেকে যারা রোজ শহরে আসে, তাদের জন্য শহরেই থাকার ব্যবস্থা করাই ভালো। এতে যাতায়াতের হাঙ্গামা বাঁচবে এবং মফঃস্বলে ও শহরের উপকণ্ঠে চাষের জমি বৃদ্ধি পাবে।

পশ্চিম জার্মানীর সর্বত্রই এবং সব মহলেই এখন আকাশচুম্বী সৌধ তৈরি করার আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছে। পশ্চিম বের্লিনে এক লক্ষ মানুষ থাকার জন্যে যে দুটি সৌধ পরিকল্পনা করা হয়েছিল, পরিকল্পকরা এখন সে দুটি সৌধে আরও দুটি তলা যোগ করে আরও চার হাজার মানুষের থাকার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। পশ্চিম জার্মানীর অন্যান্য শহরেও একই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

বর্তমান আকাশচুম্বী সৌধ নির্মাণ আন্দোলন সফল হলে দুটি প্রয়োজন মিটবে। প্রথমত মানুষ কর্মক্ষেত্রের কাছেই থাকতে পারবে এবং দ্বিতীয়ত চাষের জমির সমস্যার সমাধান হবে। আজকের এই জনসমস্যা কন্টকিত পৃথিবীতে এই ধরনের সমাধান ছাড়া উপায়ই বা কি!

নীল নদকে বাগ মানানো

গত ১৩ই মে তারিখে নীল নদের জল-প্রবাহকে বাঁধে আটকাবার কাজ শুরু হয়েছে। এই দিন থেকে তার জলস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে একটি ছোট বহির্মুখ দিয়ে এবং এখন থেকেই নীল নদের গতিমুখ চিরতরে পরিবর্তিত হবে আসোয়ান প্রকল্পের

প্রথমে একটা কৃত্রিম মাথায় পরীক্ষা এবং পরে সত্যিকার মানুষের চিকিৎসা। পশ্চিম জার্মানীর বন-এ মুখ, দাঁত ও চোয়ালের রোগ বিষয়ে শিক্ষার আধুনিকতম বিশ্ববিদ্যালয়ে এইভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয়। এক বিশেষ ক্লাসে কৃত্রিম দাঁত লাগিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে দন্তরোগগ্রস্ত রোগীর স্বাভাবিক দাঁতের চিকিৎসা করে রোগ সারিয়ে তোলার চেষ্টাই করা হয়। ছবিতে এই বিভাগের প্রধান, ডাঃ ওভারডিয়েক নকল মাথায় একটি কঠিন অস্ত্রোপচার ব্যাপারে তাঁর এক ছাত্রীকে সাহায্য করছেন

হাইড্রলিক' ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে।

অত্যন্ত অনুকূল শর্তে সোভিয়েট ঋণ দান, নির্মাণ-যন্ত্রপাতি উপকরণ ও উপাদান সরবরাহ, বিরাট একদল সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ার কারিগর ও দক্ষ শ্রমিক প্রেরণ এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ সোভিয়েট সংস্থাগুলি কর্তৃক কতকগুলি বিশেষ ধরনের কার্য-সম্পাদন—এই সব কিছুর ফলেই, বিরাট জলহীন মরুভূমিকে সবুজ ক্ষেতে আর ফল-বাগিচায় পরিণত করার জন্যে মিশরী জনগণের নীল নদের জলকে কাজে লাগানোর যুগ যুগব্যাপী স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে।

নীল নদের ওপরে এই নির্মাণ-প্রকল্পের সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ ফল সম্পর্কে কিছু টেকনিক্যাল তথ্য এখানে দেওয়া যাচ্ছে।

আসোয়ান বাঁধের জলাশয়ে ১৩০ শত কোটি ঘনমিটার জল ধরবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাঁধ নির্মাণের আগে পর্যন্ত নীল নদের মাত্র ৪৫ থেকে ৫০ শত কোটি ঘনমিটার জলকে বছরে কাজে লাগানো যেত এবং বাদবাকি সমস্ত জলই ভূমধ্যসাগরে প্রবাহিত হয়ে নষ্ট হত। আসোয়ান বাঁধের এই জলাশয় সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ২,৮০,০০০ হেক্টার জমিতে (১ হেক্টার=প্রায় ২·৫ একর) নিয়মিতভাবে জলসেচ করবে এবং আরও বাড়তি ৫,২০,০০০ হেক্টার জমিতে জলসেচ করা যাবে। সেই সঙ্গে, প্রায় প্রতি বছরেই যে মহাবিধ্বংসী বন্যায় মিশরের জনগণ অসীম দুর্দশায় পতিত হয়, এই বাঁধ সেই বন্যাকেও প্রতিহত করবে।

এই বাঁধের বৈদ্যুতিক স্টেশনের মোট উৎপাদিত হবে এক হাজার কোটি কিলো-ওয়াট এবং প্রতি বছরে এখান থেকে উৎপাদিত হবে এক হাজার কোটি কিলো-ওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ। ৫ লক্ষ ভোল্টের এক ট্রান্সমিশন লাইন এখান থেকে কায়রোতে, আলেকজান্দ্রিয়ায়, সুয়েজে, পোর্ট সৈয়দ ও অন্যান্য শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে।

বালুময় ভিত্তির ওপরে বিরাট উঁচু আর ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এ ধরনের বাঁধ তৈরি করাটা বিশ্বে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। পরিস্রাবণ বন্ধ করার জন্যে, বাঁধের নিচে কয়েক স্তর পাথর কেটে তৈরি ৪০ থেকে ৫০ মিটার চওড়া একটা খাল থাকবে।

বাঁধের মতোই আরেকটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকীর্তি হল খাল ও জলপ্রবাহের ব্যবস্থাসহ বিজলী উৎপাদনের স্টেশন। এই স্টেশনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল—এটা শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যেই নির্মিত হচ্ছে না, অন্যান্য কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজেও একে লাগানো হবে। যেমন, এর ১২টা টার্বাইনের মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২১ লক্ষ কিলোওয়াট এবং এর ১২টি স্পিলওয়ে দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ৮৫০ ঘনমিটার জল নির্গত হবে।। টার্বাইনে ও স্পিলওয়েতে জল পরিচালিত হবে ৬টি সুড়ঙ্গের দ্বারা যার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য হবে ২৭০ মিটার এবং ব্যাস হবে ১৫ মিটার।

আসোয়ান বাঁধের কর্মীদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছে : ১ কোটি ২৩ লক্ষ ঘনমিটার পাথর কাটতে হয়েছে (৫০ লক্ষ ঘনমিটারের চেয়ে বেশি কাটতে হয়েছে শুধু সুড়ঙ্গের জন্যেই), পাথর জড়ো করতে হয়েছে ২ কোটি ৬০ লক্ষ ঘনমিটার এবং বালিয়াড়ি জমিয়ে তুলতে হয়েছে ১০ লক্ষ ঘনমিটার। মাটি আর পাথর কাটার কাজই শুধু হয়েছে মোট ৪ কোটি ঘনমিটার। এ ছাড়াও তাদের কংক্রিট ঢালতে হবে ১২ লক্ষ ঘনমিটার এবং উপকরণ তৈরি করতে হবে ৫০ হাজার টনেরও বেশি। এসব কাজের অনেকখানি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে।

॥ ১ ॥

শীতের সময় যখন সবে আমাদের খুলে পাটভাঙা তুষের শাল-শালো বার করে গায়ে জড়াচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই গ্রীষ্মের নিমন্ত্রণ এল। গ্রীষ্মকালে চেকোস্লোভাকিয়া যাবার নিমন্ত্রণ। ও দেশের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি জানাচ্ছেন আগামী গ্রীষ্মে ও দেশে গিয়ে ওদের অ্যাকাডেমিতে কিছু কাজ করে দেবার জন্য। এক বছরের নিমন্ত্রণ। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাইকে নিয়ে আসতে লিখেছেন। এ নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়ার কোন কথাই ওঠে না। শুধু আমার বর্তমান নিয়োগকর্তাদের চেকোস্লোভাক বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির দান করে জানিয়ে তাঁদের অনুমতি নিয়ে জাহাজে উঠে পড়া। কলকাতার কনকনানি শীতের হাওয়াতেও আমার মনে চেকোস্লোভাকিয়ার ফুলে ভরা গ্রীষ্মের উদয় হল। মনে হল যেন চলে গেছি ইতিমধ্যেই। 'রুডার' আর 'ডানডেলাইনের' সুবাস ভরা ফুরফুরে বাতাস এসে লাগছে আমার চুলে। 'তাতরা' পর্বতশ্রেণীর বুকে চূড়োর উপর থেকে দৃষ্টিপাত করছি নীচেকার ছায়ানিবিড় জলে ভরা হ্রদ আর সুশ্যামল বনভূমির উপর। আমার ঐ দোষ—এসেছে বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির কাজের নিমন্ত্রণ—কি ধরনের কাজ এখনও ঠিকমত না জানলেও কল্পনা করা শক্ত নয় যে, তা পাইন বনের নীচে ঘাসে ভরা মাঠে গোচারণ নয় এবং রুকস্যাক কাঁধে গিরি-কন্দরের মধ্য দিয়ে সর্পিল পথে আলোয় ভরা গিরিচূড়া উত্তরণও নয়। যাচ্ছি কাজে। এবং পরিসংখ্যান, পাঠ, গবেষণা—এইসব নিয়েই থাকব বেশীক্ষণ। তবুও কেন জানি না, বিদেশে যাওয়ার কথা ভাবলেই কাজ বাদ দিয়ে ছুটির কথাটাই প্রথমে মনে আসে। বিদেশে যাওয়া মানেই ছুটি—অবকাশ—বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা গ্রহণের সুবিধা। দৈনন্দিন নিয়মবদ্ধ জীবনের বাইরে কাজের শৃঙ্খলা এবং শৃঙ্খলের বাইরে যা আছে তাদের গ্রহণ করবার দুর্লভ সুযোগ। কাজের মানুষের কাছে জীবনের মূল্য যাচাই হয় নিশ্চয় কতখানি কাজ করলাম এবং কত ভারি কাজ করলাম তারই ভিত্তিতে। আমি চিরকেলে অকেজো; কাজ কতখানি করলাম ওটা আমার গণনার মধ্যেই আসে না। কাজের বাইরে যে বেকার অকাজগুলো ভিড় করে দাঁড়ায় সেগুলিই শেষ পর্যন্ত থেকে যায় মনের চারদিকে কুঠোর উপরতলায়—সেগুলি নিয়েই নাড়াচাড়া করি আমি। অন্যের কাছে হয়তো সেটা বাদ্দি মাল, অসার। আমার কাছে পরম সম্পদ।

জাহাজেও জায়গা পেয়ে যেতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু বেঁকে বসলেন আমার মালিক। খাতা খুলে এখানকার কাজের যা ফিরিস্তি দেখালেন তাতে করে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আমার যাওয়া হয় না। যেতে গেলে সেই বর্ষা কাটিয়ে অর্থাৎ ওদের দেশের গ্রীষ্মের বিদায়ের সময়। শেষে এই ব্যবস্থাই হল যে, স্ত্রী-কন্যা-পুত্র আগেই চলে যাবেন জাহাজে করে আর আমি মাস তিনেক পরে উড়োজাহাজে করে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হব।

চেকোস্লোভাকিয়ায় এর আগেও গিয়েছি। একবার পায়ে হেঁটে মাস দুই ঘুরে বেড়িয়েছিলুম ওদের পূর্বাংশের পাহাড়গুলোয়। সে সময় ওদের গ্রামাঞ্চলেই যাতায়াত করতে হত বেশী, আর গ্রামে গেলেই দেশের আসল লোকগুলোকে ঠিক চেনা যায় এ তো সবাই জানে। সে সময় ওদের মানুষ-গুলোর ধরন-ধারণে আচরণে চিন্তাধারায় কোথায় যেন আমাদের ভারতের সঙ্গে একটা মিল আছে বলে মনে হত। ওদের ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখেছিলুম একটা মস্ত মিল রয়েছে। আমাদেরই মতো চেকরাও বিদেশীর আক্রমণে সে স্বাধীনতা হারিয়েছিল, আমাদেরই মতো তিন শ বছরের মধ্যে আর সে স্বাধীনতার মুখ দেখেনি। তারপর সে কী অত্যাচার, সে কী নিষ্পেষণ! চেক দেশের পুরানো সংস্কৃতিকে মুছে, ভেঙে, ঘুচিয়ে দিয়ে বিদেশী শিক্ষা, বিদেশী ভাষা, বিদেশী চিন্তা, ভাব, সংস্কৃতি জোর করে অনুপ্রবিষ্ট করাবার চেষ্টা। ইতিমধ্যে ওদের রাজা রাজন্য জমিদারবর্গ অর্থাৎ সমাজের উপরতলার শ্রেণী ধ্বংস হয়ে গেল। মাঝের তলায় যে শ্রেণী সমাজের পৃষ্ঠদেশে বিচরণ করতেন তাঁদের কাছে চেক ভাষা, চেক সংগীত, চেক মনোভাব ছিল 'অপাংক্তেয়'। এসব দিক দিয়েও আমাদের দেশের অধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে মিল আছে। আবার এরই মধ্য দিয়ে ভেতর থেকে ফুটে বেরিয়েছে দেশাত্মবোধ, দেশ-প্রীতি, স্বাধীনতার তীব্র কামনা। নিজেদের কুড়ানো পয়সায় গড়েছে এরা প্রাহার জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, যা নিয়ে আজও এদের গর্বের অন্ত নেই। এই অন্ধকার যুগেই জন্মেছে 'মাখার মত জাতীয় কবি, যাঁর মূর্তির কাছে প্রতি

ছর বসন্তের প্রথম দিনে চেক দেশপ্রেমীরা তাদের প্রণতি জানায়। এ দিকেও অনেক মিল পাই। শেষে ১৯১৮ সালে যখন দেশ স্বাধীন হল তখন দেশ চালাবার ভার পড়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর। সেই সময়েই বেশ পরিষ্কার করে বোঝা গেল যে, বিদেশী শাসন এবং অধীনতার সুদীর্ঘ পর্ব এদের নিজস্ব সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্পকে নষ্ট করতে পারেনি। আমাদেরই মতো বৈদেশিক অত্যাচারের মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছিল তাদের। এইসব ঐতিহাসিক মিল একটা মস্ত কারণ কিনা জানি না; কিন্তু গ্রামে গিয়ে যখন চেকদের দেখতুম তখন আর তাদের সাহেব বলে মনে হত না। মনে হত আমাদেরই মত। বাইরের দিকে ভীতু-ভীতু অথচ ভিতরের দিকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল: নতুন স্বাধীনতালাভের ফলে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অসীম আশাপূর্ণ। মানুষগুলো কথা কইতে কইতে চোখ নামিয়ে ফেলত: আবার নতুন কিছু করবার কথা শুনলে, অজানা দেশের অজানা জীবন-যাত্রার কথা শুনতে শুনতে উৎসাহে আবেগে অস্থির হয়ে পড়ত। গ্রামের এইসব লোকদের মধ্যে বিচরণ করতে করতে, তাদের

হাসির ধরনে, তাদের কথা কওয়ার ভঙ্গিতে তাদের চোখের চাহনিতে মনে হত আমাদেরই নিজেদের লোকের মধ্যে এসে পড়েছি।

দেখতে দেখতে কেটে গেল শীতের কটা মাস। তারপর কলকাতার আকাশ যখন ফুটন্ত কেটলির মত হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত, ধুলোবালিতে সাদা হয়ে গেছে গাছের সবুজ পাতাগুলি তখন আমি একদিন ছেলেমেয়ে আর গৃহিণীকে তুলে দিয়ে এলুম ট্রেনে বোম্বাইয়ের পথে। বোম্বাই থেকে জাহাজে করে ইয়োরোপ। আমার অগ্রদূত হয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁরা।

রক্তাক্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়ে গেছে আজ ষোলো বছর কিন্তু ঠাণ্ডা যুদ্ধ লেগেই রয়েছে অনবরত দুই মহাশক্তির মধ্যে। ঠাণ্ডা যুদ্ধকে একেবারে ঠাণ্ডা হতে না দেওয়ার নিশ্চয় কিছু লাভ আছে কোনো না কোনো পক্ষের। কী যে লাভ তা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্যের পক্ষে বোঝা মুশকিল। কিন্তু এটা বুঝি যে, লাভ না থাকলে ঠাণ্ডা যুদ্ধটাকে এমনভাবে জিইয়ে রেখে বিশ্বের শান্তিকামী ছাপোষা মানুষগুলোকে সব সময় আসন্ন সর্বধ্বংসী যুদ্ধের ভয়ে কাবু করে রাখা হত না। এবারেও তাই আবার শোনা গেল, পূর্ব এবং পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে ঝগড়া এমন একটা জায়গায় এসে ঠেকেছে যে, বড় বড় সামরিক শক্তিরা দারুণভাবে তাল ঠুকছে আর অস্ত্র ঝন্‌ঝন্ করাতে আরম্ভ করেছে। সেই অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানিতে আমাদের মত নিরীহ লোকদের আত্মারাম তো খাঁচাছাড়া! আমি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলুম—এ এক আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো! দুগ্‌গা দুগ্‌গা বলে পাঠিয়ে দিলুম ঘরের মানুষগুলোকে বিদেশে আর ঠিক তখনই শুরু হয়ে গেল মহাযুদ্ধের ভয়! যাই হোক, ঠাণ্ডা যুদ্ধ থেকে থেকে গরম হয়ে যাবার ভয় দেখালেও মোটামুটি ঠাণ্ডা পথেই চলল। আমিও আমার উড়োজাহাজের টিকিট কাটার ব্যবস্থা করে ফেললুম। কলকাতায় তখন বর্ষার বর্ষণ শেষ হচ্ছে।

জার্মান কোম্পানী 'লুফটহানসা' সে সময় সবে মাত্র ভারতবর্ষে কারবার শুরু করেছে। আমার এজেন্ট বললেন—এতেই যান, বেশ সুবিধে। হামেশাই তো আর উড়োজাহাজে করে দুনিয়া টহল দিচ্ছি না যে, বুঝব কোন লাইনের কি সদ্‌গুণ, কি বদগুণ। কি করে আর জানব যে, কার সার্ভিস মধুর, কার সার্ভিস অম্ল, কাদের মাংসের রান্না সবচেয়ে সুস্বাদু, কাদের সুপটা অমৃততুল্য, কাদের স্যালাড অনির্বচনীয়, কাদের পুডিং জঘন্য, কাদের কফি নর্দমার জলের মত, কারা টাটকা ফল বেশী দেয়, কারা আলুভাজা দেয়, কারা মাছ-ভাত খাওয়ায়। এসব আমার কাছে অজানা তো বটেই, তা ছাড়া যেহেতু আমি সর্বভুক, নতুন ধরনের যে-কোন খাবারই দিক না, রোজকার ডাল ভাত চচ্চড়ির থেকে পৃথক হলেই আমি তা প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারি। কাজেই আমার কাছে সব লাইনই সমান। শুনেছিলুম, কোনো কোনো লাইনে ভি আই পি-দের এমনই ভয়ঙ্কর খাতির করে যে, সাধারণ যাত্রীদের দিকে নজরই দেওয়া হয় না। তাতেই বা আমার কি এসে যায়? ভি আই পি হলেও বা ভাবনার কথা ছিল—এত নজর দেয় কেন রে বাবা? কোনো মতলব আছে নাকি? তা যখন নই, যেহেতু আমি তুচ্ছ নগণ্য সেই হেতু আমার কাছে এয়ার ইণ্ডিয়া, কে এল এম, বি ও এ সি, লুফটহানসা সবই এক।

সামান্যতম সুটকেসের মধ্যে অল্প কিছু মাল গুছিয়ে উড়োজাহাজের মালসংকোচ কানুন যত দূর সম্ভব রক্ষা করে যেদিন বাড়ি থেকে বেরবার কথা সেদিন আপিসের হারানবাবু হাতে এক পোঁটলা নিয়ে এসে উপস্থিত।

—আপনি প্রাহায় যাচ্ছেন খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি এলুম দেখা করতে। আমার ভাইপো যে ওখানে পড়ে।

—বলেন কি? তা বেশ তো, ঠিকানা দিন। খবর নেবো খন।

—শুধু তো খবর নিলে হবে না। খবর দিতে হবে। জানেন তো, খবরের অপর নাম সন্দেশ। বাড়ির মেয়েরা কিছু মিষ্টি করে দিয়েছে, এগুলো ভাইপোকে পৌঁছে দেবেন, এই অনুরোধ।

বলে পোঁটলার মধ্য থেকে পাঁচ-সেরী একটা হাঁড়ি বার করলেন হারানবাবু। আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলুম। বললুম—হারানবাবু, আপনার ভাইপো কি ইয়োরোপে গিয়েছিলেন জাহাজে না উড়োজাহাজে?

—কেন বলুন তো? জাহাজেই গিয়েছিল।

—তাই হবে। জাহাজে প্রায় যত খুশি মাল নিয়ে যাওয়া যায়। আর উড়োজাহাজে কুল্লে আধ মন। কী কসুর করেছি যে, এই উড়োজাহাজে যাবো বলে। মাল আধ মনের এক চুল বেশী হলেই প্রচণ্ড খরচ।

হারানবাবু তাঁর সন্দেশের হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে একটা ঢোঁক গিললেন।

আমি বলে চললুম—ঐ দেখুন, তক্তার উপর এক বছর বাইরে থাকব বলে আমার চাকর রমেশ আমার বিদেশ বাসের জন্য কতরকম জিনিস সংগ্রহ করে এনেছিল। সব ফেলে যাচ্ছি।

তক্তার উপর স্তূপ করা আতপ চালের পুঁটলি, ভাজা মুগের ডাল, আমসত্ত্ব, বেলের মোরোব্বা, গরম মসলা, হলুদ, এক জোড়া বুট জুতো, কম্বল, আলোয়ান, তোয়ালে, আরো অনেক কিছু।

হারানবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। বাড়ির

মেয়েরা বয়ের ছেলের জন্যে মিষ্টি করেছেন কত কষ্ট করে, কত যত্ন করে। আমি বললুম—শুনুন হারানবাবু, বুঝতেই তো পারছেন ঐ সমস্ত সন্দেশ নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। ওজনের কথা ছেড়ে দিলুম, সুটকেসেই বা ধরবে কি করে? তা ছাড়া পথে আমি জার্মানিতে দু-তিন দিন থাকছি। আপনাদের সন্দেশ খারাপ হয়ে যাবে না তো?
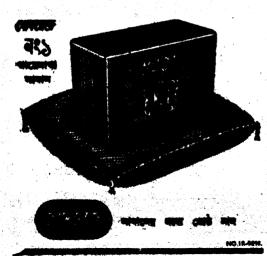
হারানবাবু বললেন—আজ্ঞে, সন্দেশ হলে কি আর সন্দেশ পাঠাচ্ছি? স্রেফ নারকেলের নাড়ু—শুকনো জিনিস—এক মাসেও খারাপ হবে না। ভাইপো চেখে চেখে খাবে আর পাঁচজনকে খাওয়াবে, তবে না?

আমি একটা টিন বার করে বললুম—দিন, এর মধ্যে ভরে ফেলুন যে ক'টা ধরে—বেশ ঠেসে ভরুন। ওটা সুটকেসের মধ্যে চেপেচুপে নেব। আপনার ভাইপো নিশ্চয় বাড়ির নাড়ু পেয়ে খুশী হবে। অত দূরে থেকে যখন আসছে—ওর বিশটাও যা দু গোটাও তা।

নাড়ু ভরা হতেই হারানবাবু পোঁটলা থেকে বার করলেন একটি পুঁথির ব্যাগ। বললেন—এটাও নেবেন নাকি? মেয়েরা বুনেছে।

বললুম—দিন।

ভরে ফেললুম সেটাকেও।

—আর একখানা ছোট্ট পকেট গীতাঞ্জলি ছিল।

—দিন ওটাও।

রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর সেরা বই। ওজন কিছুই নয়। বিদেশে পড়তে কত ভালো লাগবে ভাইপোর। ভরে ফেললুম সেটাকেও।

এইবার আমার গাড়িতে চড়বার সময় হল। দিন শেষ হয়ে আসার মোলায়েম আমেজ। বেলঘরিয়ার আপিস কারখানার ছুটি হচ্ছে। বর্ষা ফুরিয়ে এল—শরৎ-সন্ধ্যার প্রথম সঙ্কেত আকাশে। গাড়ি ছুটেছে, ফাঁকা রাস্তায় দমদমার পথে। একখানি মাঝারি আকারের সুটকেস, ভারী একখানা ওভারকোট আর ছোট্ট একখানা অ্যাটাচি সম্বল করে আমার পাড়ি দেওয়া শুরু হল দূর-দূরান্তরের দেশে। দমদমায় পৌঁছে সুটকেসটাকে ওজন করলুম। কপালের কি জোর—কাঁটায় কাঁটায় কুড়ি কিলোগ্রাম—একটুও বেশী নয়, একটুও কম নয়। অ্যাটাচিটা যত দূর সম্ভব হালকা রাখবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু মেয়েদের আত্মহাতিশয্যে প্রচুর ভারী ভারী জিনিস ভরে নিতে হয়েছিল বেরুবার ঠিক আগে। তার ফলে তার ওজন অন্তত সাত আট সের তো হয়েইছিল। সেটাকে আমার ভারী ওভারকোটের তলায় চট করে লুকিয়ে ফেলে হাসি-হাসি বোকা-বোকা মুখ করে বুকিং-ক্লার্কের ওজন মহিলার দিকে তাকালুম।

তিনি যেন বাঁর আমার বিস্তৃত মুখের চেহারা দেখেই আমার মাল পাস করে দিলেন। আটোচির দিকে দেখেও দেখলেন না। নতুন ব্যবসায় নেমেছে এমন কোম্পানীর খদ্দের হয়ে লাভ আছে— আমার এজেন্ট আমায় ঠিক উপদেশই দিয়েছিলেন। কত খাতির আমাদের! পুরোনো চাল্লু কোম্পানী হলে কি আর এত খাতির করত? ভি আই পি-দের নিয়েই ব্যস্ত থাকত হয়ত। লুফটহানসার কর্মচারী এগিয়ে এসে বললেন—মিস্টার গাঙ্গুলী, একবার যদি আমাদের কাউণ্টারের পাশে দাঁড়ান তা হলে একটা ছবি তুলে নিই। আমি প্রচুর আত্মতুষ্ট হয়ে পোজ দিয়ে দাঁড়ালুম। নিজেকে একটা কেউকেটা বলে মনে হতে থাকল। ফ্ল্যাশ লাইট এবং ক্লিক্ শব্দে আমার ছবি উঠে গেল।

আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন যেসব আত্মীয়েরা তাঁদের সঙ্গে কথা কইছি, সেই সময় লুফটহানসার মহিলা এগিয়ে এসে আমার হাতে একটি টিকিট দিয়ে বললেন—আপনার ডিনারের টিকিট, মিস্টার গাঙ্গুলী। আমরা মাইকে ডিনারের সময় জানালে দয়া করে রেস্তরাঁয় খেয়ে আসবেন।

আমি বললুম—সে কি? এত তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খাবো কি? এরোপ্লেনে খাবার দেবে না?

—খাবার দেবে। কিন্তু এরোপ্লেন ছাড়তে দু ঘণ্টা লেট। পৌঁছবার ঘণ্টা খানেক পরে ছাড়বে। আকাশে উঠে তবে ডিনার। অত দেরি করে ডিনার খেতে যদি আপনাদের অসুবিধা হয় তাই এই ব্যবস্থা।

বাড়ি থেকে বেরুবার আগে রমেশ বলেছিল—বাবু, ভাল করে পেট ভরে খেয়ে যান, অত দূরে যাচ্ছেন, কখন কোথায় খাবার জোটে কি না-জোটে তা ঠিক কি?

আমি বলেছিলুম—পাগল? জার্মান এরোপ্লেনে যাচ্ছি, এরোপ্লেনে উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ডিনার। খিদে বাঁচাতে হবে—এখন শুধু এক কাপ চা দাও।

এই বলে শুধু এক পেয়ালা চা খেয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম। সেই জার্মান ডিনারের এখন এই অবস্থা?

যাই হোক, মহিলার হাত থেকে ডিনারের টিকিট নিয়ে সময়মতো দমদম বিমানঘাঁটির রেস্তোরাঁয় ঢুকে শেষ ভারতীয় খাবার খেয়ে নিলুম। কতদিন এমন লঙ্কাপোড়া দেওয়া মাংসের কারি জুটবে না কে জানে? খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কপাল থেকে লঙ্কার ঘাম মুছতে মুছতে যেই বেরিয়ে এলুম অমনি শুনলুম—যান এইবার। ফ্রাঙ্কফুর্ট-গামী উড়োজাহাজ এখনই আসবে।

উড়োজাহাজের মাঠে তখন অন্ধকার। এখানে ওখানে বড় বড় আলো জেলে ক'টা উড়োজাহাজ নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের সারি সারি জানলাগুলি শুধু আলোর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। দর্শকের দল, তার মধ্যে আমার আত্মীয়বন্ধুরাও বেড়ার ওপাশে নিঃশব্দে এবং উৎসুক নেত্রে অপেক্ষা করছেন। এমন সময় একটা বড় জেট প্লেনের শব্দ পাওয়া গেল—

গোঁ গোঁ গোঁ বিষম আওয়াজ
আসছে রে ঐ উড়োজাহাজ—

মনে পড়ে গেল কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা। কলকাতায় যখন প্রথম কে এল এম কোম্পানীর ছোট্ট একখানি মনোপ্লেন এসে নামে তখন লিখছিলেন। তখনকার দিনের সেই খেলনার মত প্লেনের পাশে আজকের বিরাটবপু বোয়িং ৭০৭-এর কি তুলনা হয়? অথচ তখনকার দিনের কবিতার মধ্যে দিয়ে ছোট্ট এরোপ্লেনের যে গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনেছিলুম, আজকের দিনের এই দানবের গর্জনও ঐ একই কবিতার মধ্যে ধরা পড়ে রয়েছে। কিরণধন বেঁচে থাকলে তাঁকে বলতুম—ও যুগের সেই এরোপ্লেনগুলো পুরোনো হয়ে গেল, অচল হয়ে গেল, লোকে ভুলে গেল, অথচ আপনার সেই কতকালের সেই এরোপ্লেনের উপর লেখা কবিতা আজও দিব্যি টাটকা হয়ে বেঁচে রয়েছে।

আমাদের নেবার জন্যে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল। যে কজন যাত্রী ছিলুম, একের পর পর গাড়িতে গিয়ে উঠলুম। আমাদের নিয়ে গাড়িখানা হাজির হল আমাদের প্লেনের সিঁড়ির তলায়। তারপর সারি বেঁধে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে প্রবেশ করলুম আমরা এরোপ্লেনের গহ্বরে। ভিতরটা ঠাণ্ডা হবে ভেবেছিলুম, দেখলুম গরম। যাত্রীরা বেশীর ভাগই শার্ট পরে বসে আছেন। কারুরই গায়ে আমার মত গরম কোট নেই। টোকিও থেকে আসছে জাপানী যাত্রীতে প্লেন ভর্তি। দু দিকে দুজন জাপানী যাত্রী নিয়ে আমি ধপ করে একখানা মাঝের সীট-এ বসে পড়লুম। গরম হওয়া সত্ত্বেও গা থেকে গরম কোট খুলতে পারলুম না। এর বিশেষ একটা কারণও ছিল। কিছুদিন আগে মিতুর একটা চিঠি পেয়েছিলুম। মিতু লিখেছিল —বাবা, তুমি যদি জাহাজে আসো তা হলে এটা এনো, সেটা এনো, অমুক এনো, তমুক এনো। আর যদি উড়োজাহাজে আসো তাহলে তো বিশেষ কিছু আনতে পারবে না আমার জন্যে। শুধু কিছু দেশী ফল এনো বা তোমার সাথে ধরে। মিতুর জন্যে তাই ফল কিনেছিলুম। বেশী নয়, চারখানা মাঝারি সাইজের পেয়ারা—গাছে চড়ে পেড়ে খাবার আনন্দ না পাক, এরোপ্লেনে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ফল খাবার আনন্দ তো পাবে, এই ভেবে। পেয়ারা কিনে ভয় হল শুল্ক পরীক্ষকের। কে জানে কি নিয়ম এদের? কে যেন বলল, জীবাণু ছড়াবার ভয়ে মনসার চারা বা ফুলের তোড়া নিতে দেয় না এরোপ্লেনে। সুস্বাদু পেয়ারাকেও জীবাণু-বাহক শ্রেণীর মধ্যে ফেলে কিনা জানা ছিল না। এইসব ভেবে বাক্সর মধ্যে ফলগুলোকে ভরিনি। ভরে নিয়েছিলুম দু-পকেটে দুটো দুটো করে।

পেয়ারা ভরা কোট পরে দুই দশাসই জাপানী যাত্রীর মাঝে ধপ্ করে বসে পড়েছিলুম। পড়েই বুঝলুম, গেল এইবার।

শুল্কবাবুর, অন্যান্যবাবুর চোখে ধুলো দিয়ে পাকা পেয়ারাগুলোকে এরোপ্লেন পর্যন্ত এনে তুলেছি কোনোরকমে: এইবার দু দিকের চাপে পড়ে গেল বুঝি ফেঁসে। একবার ভাবলুম, কোটটা খুলেই ফেলি। খুলে উপরের তাকে তুলে রাখি। সাবধানে রাখব, যাতে পেয়ারাগুলো গড়িয়ে না পড়ে। উঠে কোট খুলতে যাবো এমন সময় দেখি, সামনে আলোর লেখা বেরিয়েছে—

'সীট-এর বেল্ট কোমরে বেঁধে ফেলুন'।

দু পাশের যাত্রীরা দু হাতে নিজেদের সীট-এর বেল্ট হাতড়াতে শুরু করে দিয়েছেন। কাজেই আর ওঠা হল না। কোন প্রকারে দু পাশের দুটো বেল্টের মুখ খুঁজে বার করে এটাকে ওটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গাঁট হয়ে নিজের সীট-এ বসে রইলুম। সঙ্গে সঙ্গে আবার আলোর রেখা বেরল—

'সিগারেট নিবিয়ে ফেলুন'।

উড়োজাহাজ এইবার ছাড়বে। হঠাৎ একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল। থরথর করে কেঁপে উঠল আমাদের বিরাট যন্ত্রটা। তারপরেই টের পেলুম এগিয়ে চলেছি। শব্দ এবং গতি ক্রমেই বেড়ে উঠছে। বাইরে তখন বোধ করি একটা শব্দের প্রলয় বয়ে চলেছে। তরল কাঁচের জানলার মধ্যে আমরা থাকার ফলে অস্পষ্ট আমাদের কানে আসছিল সে শব্দ। হঠাৎ টের পেলুম কাঁপুনি আর নেই, হাওয়ায় ভেসে চলেছে আমাদের আকাশযান। জানলা দিয়ে ফুটকি ফুটকি আলোর মালা দেখে বুঝলুম নীচে কলকাতা শহর, কিন্তু সে-ও কয়েক মুহূর্ত মাত্র। জানলা, আকাশ, বাইরের সমস্ত জগৎ দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে গেল। নানা দেশের কয়েকটি যাত্রীকে নিয়ে আমাদের ছোট্ট জগৎটি বাইরের পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

বেল্ট খুলে ফেলার নির্দেশ আসতেই আমি কোমরবন্ধখানা খুলে সাবধানে দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলুম। দেখলুম কাগজে মোড়া পেয়ারা চারটে ঠিকই আছে—একটুও চেপটে যায়নি। কাজেই আমি আর কোট খুললুম না। আমাদের কাছ দিয়ে যে জার্মান ঝি যাচ্ছিলেন তাঁকে ডেকে বললুম, এক গ্লাস ঠান্ডা জল দিতে। ঝাল মুরগির ঝোল খাওয়ার ফলে আমি তখন তেষ্টায় আইঢাই করছি। আমার দেখাদেখি বাঁ পাশের জাপানী ভদ্রলোকও জল চাইলেন।

ঝি বললেন—জল দেব, না, কমলালেবুর শরবত?

আমরা সমস্বরে বললুম—জল, ঠান্ডা জল।

ছোট্ট দুটি কাঁচের গ্লাস আধভরা অবস্থায় আমাদের হাতে এনে দিলেন জার্মান ঝি।

ঐটুকু জল দেখেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। গেলাসটা নিয়েই বললুম—আরো এক গ্লাস দয়া করে।

ঝি একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। শীতের দেশে চলেছি। শীতের দেশে একবারে যতটা ঠান্ডা জল খাওয়া সমীচীন ঠিক ততটাই তিনি দিয়েছেন। বুঝলেন কলকাতার যাত্রীগুলো এইরকম জল-পাগল। অগত্যা আর এক গ্লাস জল দিয়ে গেলেন।

ছত্রিশ হাজার ফিট উপর দিয়ে উড়ে চলেছে আমাদের জাহাজ। এভারেস্টের উপর দিয়ে উড়ে গেলে দেখতে পেতুম পায়ের তলায় আট হাজার ফিট নীচে তার চুড়ো! এভারেস্টের চুড়োতেও বরফের ঝড় হয়, কুয়াশা হয়, শুনেছি। কিন্তু এখানে মেঘ নেই, ঝড় নেই, দুলুনি নেই, কিছু নেই। মনেই হয় না, উড়ে চলেছি। বোঝাই যায় না কত জোরে চলেছে ব্যোমযান। অথচ যে প্রচণ্ড গতিতে নিজের দেশ ছেড়ে পরের দেশে এগিয়ে চলেছি, তাতে করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গরম দেশের মুদুমন্দ স্বপ্নময় পরিবেশ থেকে মন্ত্রবলে এসে পড়ব হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা দেশের ফিটফাট চঞ্চল অস্থির চলমান পরিবেশের মধ্যে। এই তো কিছুক্ষণ আগে দেখে এলুম বেলঘরিয়ার মাঠে শ্রাবণের শেষ বর্ষণ। আবার চোখ খুলতে না-খুলতে হয়তো দেখব, শেষ গ্রীষ্মের সোনালী রোদে রোমের আকাশ ছাওয়া। বেলঘরিয়ায় এইমাত্র দেখে এলুম ওখানকার অপরিচ্ছন্ন বস্তিগুলিকে ঘিরে জীর্ণবস্ত্র বাসিন্দারা গুজন করছে। আর ভোর হতে না-হতে দেখব দেশ বেড়ানোর মরসুমে রোম নগরীর হোটেল-বাড়ি ধনী সুবেশ টুরিস্টের ভিড়ে এমন ভরপুর যে, ধরিত্রীর কোলে কোথাও কোনো মলিনতা আছে বলে মনেই হবে না।

ঘুমের ছোঁয়া লাগতেই পাশের জাপানী যাত্রী কথা কইতে শুরু করলেন। সারা দিনের ধকলের পর একটু আরামের পরশ সবে পেয়েছি, ঠিক সেই সময় বকবকানি—কাল রাত্রে জানেন, হংকং-এর এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে আমাদের তুলেছিল। মস্ত জমকালো হোটেল—কিন্তু কী গোলমাল! একটুও ঘুমতে পারিনি মশায়। তার ফলে যা মাথা

গেলুম ট্রাম ধরে স্টেশনের দিকে আমার হোটেলের কাছে।

পরের দিন সকালে উঠেছি। সকাল-সকাল ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিয়ে রওনা বেরলুম। আমার প্লেন ছাড়বে বারটার সময়। বাস এ চড়তে হবে এয়ারপোর্টের কাছেই হাতে প্রচুর সময় ছিল। কালকের ডেমনস্ট্রেশন আর কানে-তালা-লাগানো গির্জের ঘণ্টার শব্দে বার্ট হাউস অঞ্চলের বিষণ্ণ ভাবটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছিলুম না। তাই আর একবার চললুম সেই দিকে।

ট্রামে করে দশ মিনিটের পথ। যখন পৌঁছলুম তখন দোকানপাটের দরজা সবে খুলতে আরম্ভ করেছে। দোকানের মেয়েরা ভিজে ঝাড়ন দিয়ে শার্সিগুলোকে চকচকে করে তুলছে। নতুন সূর্যের আলো এসে পড়েছে চত্বরের পশ্চিম দিকের দোকান-গুলিতে। শার্সির মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে সেই নবারুণ দোকানের টেবিলগুলিকে ভরে দিয়েছে কমলা রঙের আলোয়। শান্ত পরিবেশ। কালকের গোলমালের কোন চিহ্ন নেই। এই কথাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে যে, যারা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করে তারা শেষ অবধি হয়তো সক্ষম হয় না। সূর্যের আলোয় যেমন সব ধুয়ে যাচ্ছে তেমনি শুভবুদ্ধির আলোকে সব ধুয়ে যায়। শুভবুদ্ধিরই জয় হয়। কাছেই নদী। মাইন্‌স্ নদী। কোন অনাদি কাল থেকে এইভাবে বয়ে চলেছে কে জানে! আর এই শহরই কত দিনের পুরোনো। ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এই নদীর ধারে। শান্ত নদীর রূপ। মনে হয়—নাঃ, গোলমাল, মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ—এসব শেষ অবধি টেকে না। এই নদী যেমন একটানা স্রোতে বয়ে চলেছে তেমনিই অবাধ গতিতে বয়ে চলবে সমাজ সংসার দুনিয়া, আর আমাদের সবাইকার জীবন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আমস্টারডাম হয়ে প্রাহা। আমার আসবার খবর গৃহিণীকে টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলুম। ওঁদের তখন মোরেভিয়ার পাহাড় অঞ্চলে থাকবার কথা। প্রাহায় সময়মতো ফিরতে পারবেন কিনা জানা ছিল না। তার উপর আমার প্লেন সাড়ে চার ঘণ্টা দেরি করে পৌঁছল রাত দশটার সময়। আশা করি নি এয়ারোড্রোমে কেউ থাকবে। কিন্তু প্লেন থেকে নেমেই দেখতে পেলুম গৃহিণী এবং দুষান জ্বাবিতেল দূর থেকে হাত নেড়ে আমায় অভিবাদন জানাচ্ছেন। দুষান ভাবতে এসেছেন দুবার। ভাল বাংলা জানেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গ্রন্থ তর্জমা করেছেন চেক ভাষায়। তিনি যখন একবার আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলেন, সে সময় ক'দিনের মধ্যে সমস্ত 'গোরা' উপন্যাসটি অনুবাদ করে ফেলেছিলেন। আমরা তাঁর ক্ষমতা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলুম। দুষানের অনূদিত বই চেক বাজারে পড়তে পায় না—দেখতে দেখতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। দুষান তাঁর গাড়ি নিয়ে এসেছেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

পাসপোর্ট পরীক্ষাগারে গিয়ে ঢুকলুম। একজন কর্মচারী আমার পাসপোর্ট দেখে প্রশ্ন করলেন—কোথায় উঠবেন? আপনার ঠিকানা কি লিখব?

এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। তা ছাড়া কী জবাব দেব? জানিই না তো কোথায় উঠব! সত্যি কথাই বললুম—কোথায় উঠব তা তো জানি না।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমায় ছেড়ে দিলেন। বাইরে বেরিয়ে এসে দুষানের গাড়িতে চেপে চললুম প্রাহার পথে।

(ক্রমশ)

বেগম মেরী বিশ্বাস

বিমল মিত্র

॥ ২৩ ॥
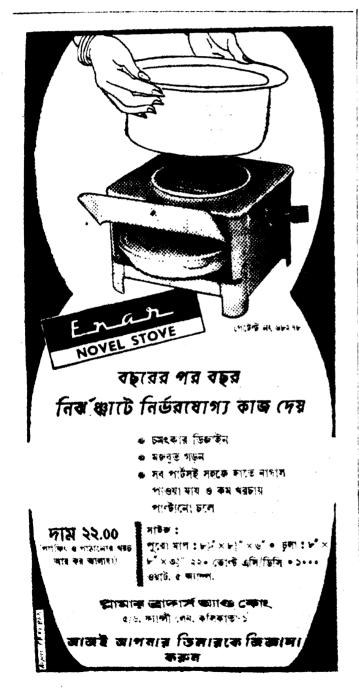
খানিক পরেই আবার এল গুলসন। চারদিকে তখন বেশ ব্যস্ততা। সমস্ত চেহেল-সুতুনে বেশ সাড়া পড়ে গেছে। সাজ সাজ রব উঠে গেছে মহালে মহালে। নানী-বেগমের ঘরেও খবরটা দিয়ে এসেছিল পীরালি খাঁ।

কলকাতার লড়াই ফতে করে এসেছে নবাব। সঙ্গে এনেছে হলওয়েল সাহেবকে। উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণবল্লভ, সবাইকে। তাদের কোথায় এনে রেখেছে?

পীরালি বললে—মতিঝিল-এ বেগম-সাহেবা! নেয়ামতের কাছে খবর পেয়েছি—

—চেহেল-সুতুনে আসবে না মির্জা?

—মালুম নেই বেগমসাহেবা!

কেউ জানে না নবাবের কী মর্জি। খোদাও বলতে পারে না নবাবের কী মতিগতি। কিন্তু তা না বলতে পারুক তৈরি থাকতেই হবে সকলকে। সকলকে সেজে-গুজে অন্দর গুলজার করবার জন্যে তৈরি থাকতে হবে। কিংবা হয়ত কারোর ডাক পড়বে। হয় তক্কি বেগম, নয় বব্বু বেগম, নয় গুলসন বেগম। যার ডাক পড়বে সে সেদিন বড় ভাগ্যবতী। তার ভাগ্য এক রাত্রের জন্যে ফিরে যাবে। নবাবকে যদি খুশী করতে পারে, তা সে যে-কোনও ভাবেই হোক, হয় গান শুনিয়ে, নয় বীণ বাজিয়ে, নয় তো বা নেচে, তার হাতে আকাশের চাঁদ নেমে আসতে পারে। সবই নির্ভর করছে নসীবের ওপর। চেহেল-সুতুনে যখন যার নসীব খুলেছে সে রাতা-রাতি মুর্শিদাবাদের মসনদ পেয়ে গেছে। আগে একবার পেয়েছিল ফৈজি বেগম। একটা মুঠোর মধ্যে ধরা যেত তার কোমরটা। তার একটা কথায় মুর্শিদাবাদের যে-কোনও মানুষের গর্দান যেত। আলিবর্দির আমলেও ফৈজির মুখের কথাই ছিল নবাবের মুখের কথা। ফৈজির জন্যে তাঞ্জাম তৈরি থাকবে দিনরাত। সে যেখানে খুশী যাবে, যেখানে খুশী বেড়াবে, তার জন্যে কাউকে কৈফিয়ৎ দেবার পরোয়া ছিল না তার। কিন্তু বড় বাড় বেড়েছিল সে। মুখের ওপর যাকে তাকে যা-তা বলতো। নবাবের মাকেই একদিন যা-তা বলে বসলো ফৈজি! সেদিন উঠতি নবাবজাদা সে অপমান আর সহ্য করেনি।

—ওই যে দেখছো উঠোনের ওপাশে ওই ঘরটা?

মরালী দেখেছিল সেটা। উঠোনের উল্টো দিকে একটা ছোট ঘর। দরজা নেই, জানালা নেই, ঘুলঘুলি নেই, কিছু নেই, চারদিক থেকে ইঁট দিয়ে থরে থরে গাঁথা। দেখলেই মনে হয় যেন চেহেল-সুতুনের একটা আর্তনাদ ওখানে বোবা হয়ে বন্দী হয়ে রয়েছে। জলে রোদে শীতে সে আর্তনাদ বছরের পর বছরের পরিক্রমায় নির্জীব নিষ্প্রাণ হয়ে পাথরে পরিণত হয়েছে।

—ওই-ই তো ফৈজি! নবাবজাদা রাগ করে একদিন ফৈজিকে ওইখানে রাজমিস্ত্রী ডেকে ইঁট দিয়ে চারদিক থেকে গেঁথে দিয়েছিল।

—কেন?

—নবাবের মা-তুলে কথা বলেছিল যে সে।

মরালী বললে—তা নবাবের মা'ও ওই রকম নাকি?

গুলসন বললে—সবাই-ই তো ওইরকম। বাদটা কে আছে? নানী-বেগমের মেয়েরা কেউ ভাল নয়, জানো। একটা করে জামাই কাটোয়ার লোক কারোর বাকি নেই। জামাইরা সব বাইরে বাইরে ষড়যন্ত্র করে বেড়াচ্ছে, কার কাছ থেকে টাকা মেরে নেওয়া যায় সেই চেষ্টা করছে, আর মেয়েরা বাড়ির ভেতর বসে ওই করছে! বড় জামাই নওয়াজেস্ মহম্মদ সাহেব তো কেবল এই মুর্শিদাবাদেই পড়ে থাকতো শ্বশুরের কাছে, আর মেয়ে পড়ে থাকতো ঢাকায়, সেখানকার দেওয়ানের সঙ্গে খুব লটঘটি চলতো—

—কে দেওয়ান?

—ওই যে কেষ্টবল্লভের বাবা রাজা রাজবল্লভ! যাকে কলকাতা থেকে ধরে নিয়ে এসেছে নবাব। সেই বড় মেয়েই তো হলো সবকিছুর মূল। তাকেই তো ধরে রেখেছে এখেনে। কারোর সঙ্গে কথা বলতে দেয় না, ঘরের বাইরে বেরোতে দেয় না,—নবাবজাদী হওয়ার এই তো দুখ!

গুলসন মেয়েটা অনেক রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে আসতো আর চুপি চুপি অনেক কথা গল্প করত! বোধ হয় নেশা করতো। নেশার ঘোরে আর চুপ করে থাকতে পারতো না। মরালীর বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে মরালীকেই জড়িয়ে ধরতো। মরালীকে আদর করতো। গালে মুখে ঠোঁটে চুমু খেত।

[illegible]

থাকতুম—

মরালী প্রথম প্রথম লজ্জায় কিছু বলতে পারত না। নতুন জায়গায় এসেছে, তখনও কারোর সঙ্গে জানাশোনা হয়নি, কেমন যেন ভয়-ভয় করত কিছু বলতে।

একদিন আর পারলে না, গুলসনকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। বললে—তুমি নেশা করেছ, আমার কাছ থেকে চলে যাও—

গুলসন কিছু কথা বললে না। গুম হয়ে মাথা নিচু করে রইল। তারপর বললে—ঠিক আছে, আমি আর তোমার কাছে আসব না—আমি চললুম—

অল্প আলোয় মরালী দেখলে গুলসনের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। মনে বড় কষ্ট হলো। এমন করে কষ্ট দেওয়া উচিত হয়নি মেয়েটাকে। কাছে গিয়ে বললে—তুমি কেঁদো না ভাই, আমি বুঝতে পারি নি—

গুলসন মরালীর হাতটা ছাড়িয়ে নিলে। তার বোধ হয় তখন চৈতন্য হয়েছে। একেবারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। বললে—তুমি ঠিক করেছ ভাই, আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিয়ে ভালোই করলে—আমি আর আসবো না তোমার কাছে—কথা দিচ্ছি আর আসবো না—

বলে চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু মরালী তবু ছাড়লে না। বললে—কিন্তু তুমি কাঁদছো কেন?

গুলসন বললে—তুমি যদি ভাই আমাদের কষ্টটা জানতে তো আজকে আমাকে এমন করে অপমান করতে পারতে না—তা অপমান করেছ ভালোই করেছ। আমার আগেই জানা উচিত ছিল—তুমি মুসলমান আর আমি হিন্দু মেয়ে—

মরালী বললে—ছি ছি, তুমিও শেষকালে আমাকে ভুল বুঝলে? আমি কি তাই বলেছি—?

গুলসন বললে—না ভাই, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। এই চেহেল-সুতুনের ভেতরে থেকে থেকে আমি একেবারে পাথর হয়ে গেছি। তাই ভালবাসার কাউকে পেলে একেবারে বর্তে যাই আমরা, কেউ ভালবাসলেও আমরা কৃতার্থ হয়ে যাই—কিন্তু তুমি আমায় ঠিক শিক্ষা দিয়েছ, আমি আর এমন কাজ কখ্খনো করবো না—

বলতে বলতে সেই যে ফস্ করে গুলসন চলে গিয়েছিল আর আসেনি। একদিন নানী বেগমের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে মরালী

চলতে গিয়ে ভুল-ভুলাইয়ার জন্যে আটকে গিয়েছিল মরালী। তারপর নবাব এসে পড়াতে আর কিছুই করা হয়নি। গুলসনও আগেকার মতন রাত্রে আর আসে না। সেই যে সে হাত করে চলে গেছে আর তার দেখা নেই। কেন যে অমন করে চলতে গেল!

সেদিন রাত্রে আস্তে আস্তে ঘর-থেকে বেরোল মরালী। কোথায় কোন্ মহালে গুলসন থাকে তা জানে না। তবু যদি তার দেখা পাওয়া যায়, গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসবে তার কাছে। বাইরে সেই রকমই ঝাপ্সা অন্ধকার. কোন্ কোণে টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে। পথ দেখে দেখে চলতে চলতে যদি কোথাও হঠাৎ কাউকে দেখতে পাওয়া যায়, তাকেই জিজ্ঞেস করবে গুলসনের কথা।

এবার চিনতে পারলে মরালী সেই ভুল-ভুলাইয়ার রাস্তাটা। সেটাকে এড়িয়ে আরো ভেতরে চলে গেল। অনেক হাসি, অনেক গান চলেছে কোথাও। মরালী সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগলো। চেহেল-সুতুন তো নয়, এও যেন একটা ছোটখাট হাথিয়াগড়। মাথার ওপর একটা ছাদ। আশে-পাশে বারান্দা-ঘর।

একটা ঘরের সামনে এসে চুপ করে দাঁড়াল মরালী। মনে হলো ভেতরে যেন আলো জ্বলছে। আলো যখন জ্বলছে তখন ভেতরে যে আছে সে নিশ্চয়ই জেগে আছে। মরালী অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে সে কে, তাহলে সে কী উত্তর দেবে?

আশে-পাশে চারদিকে চেয়ে দেখলে মরালী। বরকত আলি কি নজর মহম্মদরা যদি কেউ দেখতে পায় তাহলে হয়ত বিপদ হতে পারে।

মরালী আস্তে আস্তে দরজায় টোকা মারলে।

ভেতর থেকে মেয়েলি গলার সাড়া এল—কে?

আর তারপর দরজাটা খুলে গেল। মরালী ভেবেছিল দরজা খুলে হয়ত দেখবে গুলসনকে। কিন্তু এ অন্য আর একজন। যে দরজা খুলে দিলে সে চিনতে পারলে না মরালীকে। একজন বাঁদী।

—আপ কৌন্?

মরালী বললে—এ-ঘরে গুলসন বেগম থাকে?

ততক্ষণে ভেতর থেকে আর একজন বেরিয়ে এসেছে। বড় সুন্দর এর মুখখানা। কিন্তু বড় করুণ এর চেহারা। বেশি গয়না-গাঁটি গায়ে নেই। ফিকে জর্দা রংএর একটা ঘাগরা আর ফিকে সবুজ ওড়নী পরেছে গায়ে।

—তুমি কে?

কী বলবে মরালী বুঝতে পারলে না। কিন্তু মেয়েটির মুখখানা দেখে মনে হলো একে যেন সব কথা যেন খুলে বলা যায়।

—গুলসন বেগমকে আমি খুঁজতে এসেছিলাম। তার মহালটা কোন্ দিকে?

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে—তুমি কে? তুমি কি নয়া এসেছ এখানে?

মরালী তবু জবাব দিতে পারলে না।

মেয়েটি বললে—এসো, ভেতরে এসো তুমি, এত রাত্তিরে তুমি গুলসনকে খুঁজতে বেরিয়েছ কেন? ভয় কী? ভেতরে এসো—

মরালী ভয়ে-ভয়ে ভেতরে ঢুকলো। মাঝ-খানে একটা বিছানা। মখমলের চকচকে চাদর। পাশে একজোড়া জরিদার চটি। হাত

ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসালো। তারপর বাঁদীটাকে বললে—সিরিনা, তু যা ইঁহাসে—

বাঁদীটা চলে গেল। মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করলে—তোমাকে তো চেহেল-সতুনে আগে দেখিনি কখনও, তুমি কি নয়া এসেছ?

—হ্যাঁ!

—কতদিন এসেছ?

—অনেক দিন। ঠিক করতে পারছি না কতদিন। মনে হচ্ছে যেন কত বচ্ছর এখানে এসেছি। ঘরের মধ্যেই থাকি কি না দিনরাত!

মেয়েটি গলায় মিষ্টি সুর দিয়ে জিজ্ঞেস করলে—তোমার নাম কী?

—মরিয়ম বেগম।

—সাকিন?

—লস্করপুর। সেদিন গুলসনের ওপর খুব রাগ করেছিলুম বলে আর আসেনি আমার মহালে, তাই খুঁজতে বেরিয়েছি। এখানকার খোজারা আমাকে মোটে ঘরের বাইরে বেরোতে দেয় না। গুলসন লুকিয়ে লুকিয়ে আমার মহালে আসতো, কেউ জানতে পারত না। আজ ক'দিন থেকে মোটে আসছে না সে, তাই রাত্তিরে বেরিয়েছিলাম খুঁজতে—

—কিন্তু গুলসনকে তো এখন মিলবে না!

—মিলবে না? কেন?

—সে মতিঝিলে গেছে, সেখানে মহ্‌ফিল্ হচ্ছে.—

গুলসনের কথাটা মনে পড়লো। গুলসন বলেছিল যার মতিঝিলে ডাক পড়বে সে ভাগ্যবতী! এক রাত্রেই তার কপাল ফিরে যাবে! হয়ত শেষ পর্যন্ত গুলসনের কপাল ফিরলো!

—আপনি কে?

—আমি? আমার নাম লুৎফুন্নিসা বেগম!

মরালীর মাথায় যেন সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাঘাত হলো। নবাবের আসল বেগম। ভয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো মরালী। বললে—আমায় মাফ করবেন বেগমসায়েবা, আমি না-জেনে আপনার ঘরে ঢুকে পড়েছি, আমি নতুন মেয়ে, কিছুই জানতুম না—

লুৎফুন্নিসা একটু ম্লান হাসি হাসলো। বললে—বোস, তোমার কোনও গুনাহ্ হয়নি। তুমিও যা আমিও তাই—তুমি বোস—

তবু মরালীর বসতে কেমন সংকোচ হলো। বললে—আপনার কথা গুলসন আমাকে বলেছে, আমরা আপনার বাঁদী,—আপনার সঙ্গে কি আমাদের তুলনা!

লুৎফুন্নিসা বললে—কে বাঁদী আর কে মালকিন্ তা খোদাই জানে ভাই! গুলসন তোমাকে সব বাজে বাজে বলেছে! তুমি নতুন এসেছো তাই কিছুই জানো না এখনও, পরে সব জানতে পারবে। তা ছাড়া তুমি কেন আসতে গেলে এখানে? তুমি গলায় দড়ি দিতে পারলে না? যখন তোমাকে এরা এখানে নিয়ে আসছিল তুমি নদীতে ঝাঁপ দিতে পারলে না? জানো, তোমার মত কত বেগম আছে এখানে? জানো, তাদের কী অবস্থা?

বলতে বলতে লুৎফুন্নিসা একটু থামলে। তারপর আবার বলতে লাগলে—আর তা ছাড়া আমিই কি সাধ করে এখানে এসেছি? আমি কি চেয়েছিলুম এই নবাবের বেগম হতে? আমি গান গাইতে এসেছিলুম এই মুর্শিদাবাদে মুজরো নিয়ে। আমি দেহলীর নর্তকী। গান গাওয়া ছিল আমার পেশা। তারপর খোদার মর্জিতে এখানে এসে পড়েছি, আর বেরোতে পারিনি!

বলে হাসতে লাগলো লুৎফুন্নিসা বেগম ঠিক তেমনি করে।

তারপর বললে—যাক্ গে এসব কথা, তুমি নতুন এসেছো, তোমাকে মিছিমিছি ভয় পাইয়ে দেব না—তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

মরালী বললে—গুলসন আমাকে বলেছিল নানী-বেগমসাহেবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে!

—কী জন্যে নানী-বেগমের সঙ্গে দেখা করতে চাও?

মরালী বললে—শুনেছি তিনি খুব ভালো লোক—

—গুলসন বলেছে ভালো লোক?

—গুলসন আপনারও খুব প্রশংসা করেছে।

—আমার কথা থাক, তুমি এত রাত্তিরে নানী-বেগমের সঙ্গে দেখা করতে চাওই বা কেন? তিনি তো এখন কোরাণ পড়েন—

—তাও শুনেছি! কিন্তু রাত ছাড়া আর কী করেই বা দেখা করবো তাঁর সঙ্গে! দিনের বেলা নজর মহম্মদ যে আমার ঘরে নজর রাখে। কোথাও বেরোতে দেয় না। কারো ঘরে যেতে আমাকে বারণ করেছে। কারো সঙ্গে কথা বলতেও দেয় না। যে বাঁদীটা আসে সেও বোবা, কথা বলতে পারে না। আমি যে এরকম একলা থাকতে থাকতে মারা যাবো শেষকালে!

লুৎফুন্নিসা হাসতে হাসতে বললে—নতুন এসেছো তো, এখন একটু একটু অসুবিধে হবেই, তারপর আস্তে আস্তে সব গা-সওয়া হয়ে যাবে, তখন অন্য বেগমরা যেমন করে দিন কাটায় তুমিও তেমনি করে দিন কাটাবে! তা নানী-বেগমকে কিছু বলতে হবে?

মরালী বললে—শুধু একবার আমি তাঁর এখানকার সকলের সঙ্গে মিশতে পারি, কথা বলতে পারি—

লুৎফুন্নিসা বললে—আচ্ছা তুমি যাও, আমি নানী-বেগমকে তোমার কথা বলবো, তুমি কিছু ভেবো না—তুমি একলা মহালে ফিরে যেতে পারবে তো? সিরিনকে পাঠাবো তোমার সঙ্গে?

মরালী বললে—না, তার দরকার নেই, আমি যেতে পারবো একলা—

বলে লুৎফুন্নিসা বেগমকে মুসলমানী কায়দায় কুর্নিশ করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। এতক্ষণ যেন আড়ষ্ট হয়ে কথা বলছিল মরালী। কিন্তু তবু ভালো লাগলো। এ যেন গুলসনের মত নয়। অত গায়ে পড়ে আলাপ করতেও চাইলে না, আবার গায়ে পড়ে উপকার করতেও আগ্রহ দেখালে না। অথচ আলাপ-ব্যবহারে কোনও ত্রুটিও রাখলে না। নবাবের খাস বেগম, নবাব ফিরে এসেছে মুর্শিদাবাদে, তবু তো খাস-বেগমের কাছে একবার দেখাও করতে এল না। আর এত রাতে একা একা জেগেই বা বসে আছে কেন? কার জন্যে বসে আছে? এই খাস-বেগম থাকতে গুলসনকে ডেকে পাঠিয়েছে মতিঝিলে? গুলসনের কি আজ এক রাত্রেই কপাল ফিরে যাবে?

—বেগমসায়েবা!

পেছন থেকে ডাক শুনে মরালী মুখ ফেরালে। সেই বাঁদীটা। সিরিনা।

(সি-৬২১৬)

—বেগমসাহেবাকে একেলা দিয়েছেন!

মরালী আবার লুৎফুন্নিসার ঘরে ফিরে গেল। বেগমসাহেবা বললে—একটা কথা শোন—
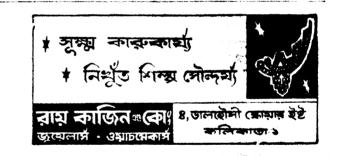
মরালী অবাক হয়ে গেছে। আবার কী জরুরী কথা বলবে তাকে!

—আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। তুমি নতুন নয়া এসেছো, রাত্তিরে এখানে দরওয়াজা বন্ধ করে শোবে।

মরালী বললে—তা তো শুই-ই!

—এখানকার কোনও বেগমও যদি দরওয়াজা খুলতে বলে তো খুলো না, জানো। কোনও বেগমকেও তোমার ঘরে রাত্তিরে শুতে দিও না। এখানকার বেগমরাও ভালো নয়, বিশ্বাস করে কোনও কথাই কাউকে বোল না। এখানকার ইটেরও কান আছে। এখানকার বেগমরা পুরুষদের চেয়েও খারাপ! যাও—

মরালী হতভম্ব হয়ে গেল কথাগুলো শুনে। তারপর যেমন এসেছিল তেমনি আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর রাস্তা চিনে চিনে নিজের মহালের কাছে আসতেই দেখলে নজর মহম্মদ ঘরের সামনের রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। নজর মহম্মদকে দেখেই বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো। যদি বলে!

কিন্তু না, কিছুই বললে না!

মরালী নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়েই যেন সাপ দেখে এক হাত পিছিয়ে এল। বেশ ফরসা টকটকে গায়ের রং, ছোট একটু দাড়ি, গোঁফ জোড়া পাকিয়ে দু'পাশে ছুঁচলো করে দেওয়া। চোস্ত-পাজামা, শেরওয়ানি পরা একজন লোক যেন এতক্ষণ মরালীর জন্যেই তার ঘরের ভেতরে অপেক্ষা করছিল।

মরালী ঘরে ঢুকতেই লোকটা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে কুর্নিশ করলে।

—বন্দেগী বেগমসাহেবা!

মরালী নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে বুকটা তার থর-থর করে কাঁপছে তখন।

—আমাকে চিনতে পারছেন না বেগমসাহেবা! মীর্জার সাদির সময় বেগমসাহেবাকে হাতিয়াগড়ের বজরার জানালাতে দেখেছিলুম। এমন খুবসুরৎ শকল জিন্দগীতে কখনও দেখিনি, তাই ভেবেছিলাম বসোরার গুলাব কি হাতিয়াগড়ের মরুভূমিতে মানায়! তাই তো ডিহিদারকে দিয়ে পরোয়ানা ভেজিয়ে চেহেল সুতুনে নিয়ে এসেছি রানীবিবিকে!

বলে লোকটা একটা বিজয়োল্লাসের চাপা হাসি হেসে উঠলো!

মরালী তখনও কী করবে বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছে না কে এ লোকটা! বাইরের অন্ধকারে নজর মহম্মদ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা কি রাত্তিরে তার ঘরেই থাকতে চায় নাকি!

—হাতিয়াগড়ের জমিনদার সাহাবের তবিয়ত্ কেমন আছে বেগমসাহেবা? খায়রিয়ত্ তো?

মরালীর মনে হলো এক থাপ্পড় কষে দেয় লোকটার গালের ওপর। কিন্তু ভয়ও করতে লাগলো। লোকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তখন একমনে দেখছে মরালীকে। যেন যাচাই করে নিচ্ছে। হয়ত সন্দেহ হচ্ছে ঠিক রানী-বিবি না অন্য কেউ। কিম্বা অনেকদিন আগে শোরের বিয়ের সময় দূর থেকে দেখা মুখটার সঙ্গে এ-মুখের মিল আছে কি না!

—বেগমসাহেবা বসুন না!

মরালীর মনে হলো আরো কাছে থেকে দেখতে চায় তাকে! তবু মরালী বসলো না।

লোকটা এবার নিজেই দাঁড়িয়ে উঠলো।

—বেগমসাহেবা না বসলে বান্দা তো বসে থাকতে পারে না।

কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে সোজা হয়ে ঠিক দাঁড়াতেও পারলে না। টলতে লাগলো। হয়ত মাতাল। মরালীর নাকে একটা কড়া গন্ধ এসে লাগলো। চারদিকে আতর, পান জর্দা খুশ্বু তেলের গন্ধ, তবু যেন মদের গন্ধটা সকলকে ছাপিয়ে উঠে নাকে এসে লাগলো।

—বেগমসাহেবা বুঝি টহল্ দিতে বেরিয়েছিলেন! এত রাতে টহল্ দিলে তবিয়ত খারাপ হবে বেগমসাহেবা!

হঠাৎ বলা-নেই কওয়া নেই নজর মহম্মদ ঘরে ঢুকে পড়লো। খোদাবন্দ্, নানী-বেগম—

নানী-বেগমের নাম শুনেই লোকটা যেন জ্ঞান ফিরে পেল। চমকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর চোখের পলক্ ফেলতে-না-ফেলতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। আর ঠিক তার পরেই এসে ঢুকলো লুৎফুন্নিসা বেগম। সঙ্গে আর একজন। এই-ই বোধহয় নানী-বেগম।

—মহালে কে এসেছিল বহেন্?

মরালী ঘটনার আকস্মিকতায় এমনিতেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এবার আরো বাক্-রোধ হয়ে এল তার।

নানী বেগম মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে করতে বললে—বেটি!

বড় আদরের সুর গলায় বেজে উঠলো নানী বেগমের। মরালীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

—কন্ আয়ি বেটি!

বেশ বয়েস হয়েছে। মরালীর মনে হলো যেন ঠিক তার ঠাকুমার মত। ঠাকুমাকে দেখেনি কখনও। খুব ছোটবেলায় আবছা-আবছা মনে পড়তো। নয়ান পিসিও কখনও যেন এমন করে আদর করেনি। নয়ান পিসি চুল বেঁধে দিয়েছে। সাজিমাটি দিয়ে গা ঘষে মেজে দিয়েছে। কিন্তু নানী-বেগমকে নয়ান পিসির চেয়েও দেখতে আরো সুন্দর। সাদা পাতলা পোশাক।

—ইয়া কৌন আয়ি বিটি? কৌন্ লায়া? কে তোমাকে নিয়ে এল এখানে মা?

মরালী নানী-বেগমের বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে অঝোরে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো। নানী বেগমও মরালীকে দুই হাতে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

মেহেদী নেসার বাইরের নবহৎখানার নিচে দাঁড়িয়ে যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে। তাঞ্জাম তৈরিই ছিল। নজর মহম্মদকে কাছে ডেকে বললে—খুব হুঁশিয়ার নজর মহম্মদ, বড়ি খুবসুরৎ জেনানা—লেকেন্—

নজর মহম্মদ হুকুম শোনবার অপেক্ষায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল।

—লেকেন্, নাচা গানা সব শেখাতে হবে। একদম্ আনাড়ী জেনানা, ভালো করে আদব-কায়দা এখনও শেখেনি, আমীর-ওমরাহদের কেমন করে কুর্নিশ করতে হয় তাই-ই জানে না এখনও। ওস্তাদজীকে হুকুম দিয়ে দেবে খুব জল্দি তালিম্ দিতে। মীর্জাকে খুশ্ করাতে হবে তো—বনের চিড়িয়াকে পিঞ্জরায় পুরলে কী হবে, তাকে তো বুলি শেখাতে হবে।

বলে তাড়াতাড়ি তাঞ্জামে উঠে পড়লো নেসার সাহেব।

মেহেদী নেসার চলে যেতেই পীরালি খাঁ আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। নজর মহম্মদ চলেই যাচ্ছিল, হঠাৎ পীরালিকে দেখে মুখ ফেরালো। বললে—সর্দার, শালা হারামীর বাচ্চা—

পীরালি গম্ভীর মানুষ। বললে—নানী-বেগমকে খবর দিলে কে? তুই?

নজর মহম্মদ বললে—জী সর্দার—নেসার সাহেব আজ আমার নামে নালিশ পেশ করেছে সর্দার, আমি নাকি বাইরের জওয়ানদের চেহেল-সুতুনের অন্দরে ঢোকাই মোহর নিয়ে। আমি নাকি ঘুষ নিই। তাই নানী-বেগমকে খবর দিতে দিলাম, খবর দিয়ে শালাকে বে-ইজ্জৎ করে দিলাম। খোজাদের সঙ্গে বেত্তমিজি করতে এসেছে।

আরো সব কত কী কথা রাগের মাথায় বলতে লাগলো নজর মহম্মদ। কলকাতার লড়াই ফতে করে এসে মাথা গরম হয়ে গেছে আমীর-ওমরাহদের। মাথা গরম করবে বাইরে গিয়ে করো। চেহেল-সুতুনের বাইরে। মতিঝিলে নেয়ামত্কে পেটো। চেহেল-সুতুন তোমার এক্তিয়ারে নয়। এখানে আমি খোজা সর্দার পীরালির নোকর। পীরালি খাঁ হুকুম করলে আমি হাঁ মাথা পেতে তামিল করবো। এতদিন এত নবাব এসেছে গেছে। এতদিন এত বেগম এসেছে গেছে, কেউ খোজাদের এক্তিয়ারে কখনও হাত দেয়নি। তুমি যে-ই হও, আমি খোজা। আমি তোমার চেহেল-সুতুন মর্জি হলে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলাতে পারি আবার বানাতেও পারি। কোন্ ফাঁক দিয়ে তোমার নুকসান করব তুমি জানতেও পারবে না। তোমার বনের চিড়িয়া আমার মর্জি হলে আমি আসমানে উড়িয়ে দিতে পারি। আমার মর্জি আমি মোহর নিই, তাতে তোমার কী? তুমি ঘুষ নাও না? জমিদার তালুকদার ডিহিদার ফৌজদার তাদের কাছ থেকে তুমি রিশ্-ওয়াত্ নাও না? হাজারী মনসবদার বানাতে তুমি ঘুষ নাও না? কেয়া সর্দার ঠিক বাত বলিনি?

পীরালি খাঁ বললে—বেশ করেছিস—

নজর মহম্মদের তখনও গোসা যায়নি। বললে—আমি মেহেদী নেসার সাহেবের দুশমনি ভাঙবো সর্দার, আমাদের এক্তিয়ারে হাত দিয়েছে, আমি শালাকে রেহাই দেব না।

পীরালি খাঁ ঠাণ্ডা মাথায় জিজ্ঞেস করলে—মতিঝিলে আজ কাকে পাঠালি?

নজর মহম্মদ বললে—গুলসন বেগমকে, বেচারী বহোত্ রোজ ধরে আমার খুসামোদ করছিল, কেবল বলছিল আমাকে একবার নবাবের সামনে পাঠিয়ে দাও নজর! তা দিলাম আজ পাঠিয়ে। যদি গুলসনের নসীব ফেরে তো ফিরুক না, আমার কী!

—বেশ করেছিস!

তারপর নজর মহম্মদ হঠাৎ নিচু গলা করে পীরালিকে বললে—সর্দার, আর একটা খবর, জুবেদার লেড়কা হবে!

পীরালীর চোখ দুটো গোল হয়ে উঠলো।

—কোন্ জুবেদা?

—মরিয়ম বেগমের বাঁদীটা!

—কে করলে? কোন্ বেল্লিক?

নজর মহম্মদ বললে—তালাস পাচ্ছি না।

—ওকে পড়েছিস?

—ও কী বলবে! ও তো বোবা! কোন্ তুর্‌কি-পাঠানরা বেইমানি করে গেছে!

—তাহলে লাটকে দে ওকে!

—দেব লাটকে?

—আলবৎ দিবি! নানী-বেগম যদি কিছু বলে তো বলিস পীরালি খাঁর হুকুম। আমাকে এত্তেলা দিলে যা বলবার আমি বলবো—

বলে পীরালি খাঁ নিজের কাজে চলে গেল।

ওদিকে তখন সারা রাত মহ্‌ফিল্‌ চলেছে মতিঝিলে। কলকাতার লড়াই ফতে করে এসে নবাবী ফৌজের লোকরা শহরে এসে ফুর্তির ফোয়ারা ছুটিয়েছে। কলকাতা থেকে যা পেরেছে লুটপাট করে এনেছে। কেউ লুঠেছে চাঁদি, কেউ লুঠেছে মেয়েমানুষ, কেউ লুঠেছে ফিরিঙ্গিদের জামা, জুতো। যে কিছু পায়নি, সেও একটা নগলেস কি একটা পালঙ্কের কলম নিয়ে এসেছে। কলকাতার কেল্লায় মানিকচাঁদকে একলা রেখে নবাব হলওয়েলকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছে মুর্শিদাবাদে। আর আছে কৃষ্ণবল্লভ, আর আমিচাঁদ। আমিচাঁদের বাড়িটাও লুঠপাট করতে গিয়েছিল নবাবী ফৌজের লোকেরা। কোটি-কোটি টাকার মালিক আমিচাঁদ

সাহেব। কিন্তু গিয়ে দেখলে কেউ বাড়িটাতে আগেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। বাড়ির ভেতরে একটা সিন্দুক ছিল। তার ভেতরে মোহর সোনা চাঁদি কেউ আগেই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার পাশেই আমিচাঁদের সেপাই জগমন্ত সিং-এর পোড়া দেহটা পড়ে আছে। আগাগোড়া পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেছে। চেনা যায়নি তাকে।

আগে ফুর্তি হোক, আগে মহ্‌ফিল্‌ হোক তারপরে বিচার হবে হলওয়েলের। ফিরিঙ্গিরা জাহাজ নিয়ে একেবারে ফলতার মোহানায় গিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। মেহেদী নেসার, ইয়ারজান, সফিউল্লা তারা সবাই নবাবকে বুঝিয়েছে এ-রাতটায় আর কোনও কাজ নয়, শুধু মহ্‌ফিল! নজর মহম্মদকে হুকুম করেছিল মেহেদী নেসার যে চেহেল-সুতুন থেকে ভাল বাঈজী পাঠিয়ে দিতে হবে মতিঝিলে। যে ভালো নাচতে পারবে, গাইতে পারবে, নবাবের দিল খুশ করতে পারবে—

তারপরে সেখান থেকে এসেছিল গুলসন বেগম।

তা গুলসন্‌ নেচেছে ভাল। এককালে হিন্দু মেয়ে ছিল বটে। কিন্তু চেহেল-সুতুনে এসে, আচ্ছা ওস্তাদের হাতে পড়ে নাচ-গান সব রপ্ত করে নিয়েছে। গুলসন একাই মহ্‌ফিল মশগুল করে দিয়েছে। মতি-ঝিল-এর মেঝের ওপর সাদা কিংখাবের চাদর পেতে দেওয়া হয়েছিল। চাদরের নিচেয় আবীর ছড়ানো ছিল। চাদরের ওপর নেচে নেচে পায়ের ঘা দিয়ে দিয়ে একটা আস্ত ফোটা পদ্মফুল এঁকে ফেলেছিল গুলসন। তারপর সেই আবীরের লালে-লাল কিংখাবের চাদরের ওপর মেহেদী নেসার একটা মোহর ফেলে দিয়েছিল। গুলসনের কেরামতি আছে বলতে হবে। নাচতে নাচতে কোমর বেঁকিয়ে ঠোঁট দিয়ে কামড়ে সেই মোহর তুলে নিয়ে নবাবের কপালের ওপর রেখে দিয়েছিল।

ভারি খুশী নবাব মীর্জা মহম্মদ!

অনেকদিন পরে নবাবের মুখে হাসি ফুটতে দেখে মেহেদী নেসারের মুখেও হাসি আর ধরেনি। নবাবের খুশীর জন্যেই তো মহ্‌ফিল। নবাব খুশী থাকলেই তো হিন্দুস্থান খুশী রইল। নবাব খুশী থাকলেই তো খোদাতালা খুশী থাকলো। আসলে দিন-দুনিয়ার নবাবই তো দিন-দুনিয়ার খোদাতালা!

—শোহনাল্লা, শোহনাল্লা—

শেষপর্যন্ত যখন নেয়ামত আলি সরাবের ভাঁড়ার খুলে উজাড় করে দিয়েছিল তখন কে-ই বা নবাব আর কে-ই বা বান্দা। তখন কে-ই বা বেগম আর কে-ই বা জারিয়া। তখন মতিঝিলের মহ্‌ফিলের ফুর্তির ফোয়ারায় নবাব-বান্দা-বাঁদী-বেগম সব একাকার হয়ে যায়!

কিন্তু বশির মিয়া শেষ পর্যন্ত সবটা দেখতে পায়নি। এ-সব মহ্‌ফিলের মধ্যে বশির মিয়ার মত ছুটকো লোকদের থাকবার এক্তিয়ার নেই। লুকিয়ে-লুকিয়ে নেয়ামতকে তোয়াজ করে যতটুকু ফাঁকি দিয়ে ভোগ করে নেওয়া যায় সেইটুকুই ফায়দা। জাফরির ফাঁক দিয়ে নবাব-আমীর-ওমরাহদের কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী বশির মিয়া বরাবর এমনি করেই ফাঁকি দিয়ে দেখে এসেছে। দুটো বিবি আছে বশিরের। কিন্তু দুটো বিবিই বশিরের কাছে পুরোন হয়ে এসেছে। আর নতুন বিবি রাখবার হিম্মৎ নেই। আজকাল বিবি পোষবার খরচা বেড়ে গেছে। বিবিদের খাঁই বেড়ে গেছে। বিবিরা একটু সুবিধে পেলেই বড়-বড় আমীর-ওমরাহ্‌ পাকড়াতে চায়। একটু খুবসুরৎ বিবি হলেই আমীর-ওমরাহদের নজর পড়ে যায় তার ওপর। আর একবার নজর পড়লে আর তাদের ঘরে পুরে রাখা দায়। সবাই চায় চেহেল-সুতুনে গিয়ে বেগম বনতে। একবার বেগম হতে পারলে আখের ভাল হয়ে যাবে। নসিবে থাকলে নবাবের নজরে পড়ে যেতেও পারে। তখন হিন্দুস্তানের বাদশাই বা কে আর সে-ই বা কে। তখন হিন্দুস্থানের মসনদে বসে খোদাতালাকেও শায়েস্তা করতে চাইবে!

যা হোক, সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা বশির মিয়া ভেবেছিল মতিঝিল-এর মহ্‌ফিলে হাথিয়াগড়ের রানীবিবির ডাক পড়বে। নতুন আমদানী বেগম। হয়ত মেহেদী নেসার সাহেব তাকেই এত্তেলা দেবে। তাই একবার দেখবার ইচ্ছে হয়েছিল নতুন আমদানীটা কেমন!

নেয়ামতকেও খোসামোদ করে অনেক কষ্টে ভজিয়ে রেখেছিল। বলেছিল—থোড়া মুঝে ভি দারু পিলাও নেয়ামত ভইয়া—আমিই তো রানীবিবিকে হাথিয়াগড় থেকে আনাবার ইন্তেজাম করেছি। আমিও থোড়া দেখবো নতুন আমদানিটা ক্যায়সী চিজ—

কিন্তু গুলসন্‌ বেগম আসাতে মনটা একটু ভেঙে গিয়েছিল বশির মিয়ার। এত কোশিস করেও কোনও নাফা হলো না। বরবাদ হয়ে গেল খোসামোদী। শেষ পর্যন্ত যখন ফুর্তির ফিকির টুটে গেল তখন যে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারী একটু ভাল করে নজর করে দেখবে তারও উপায় রাখলে না নেয়ামত আলি। তাড়াতাড়ি এসে হাঁকিয়ে দিলে। বললে—ভেগে যা এখান থেকে, ভেগে যা—

বশির মিয়া একটু রেগে গিয়েছিল। সবে মহ্‌ফিল জমেছে এখনি ভেগে যেতে বলছে?

—তাহলে দারু দিলি কেন? দারু পিয়ে তবিয়ৎ গরম হয়ে গেল, এখন ভাগা যায়?

—তুই ভাগ এখন, আমি বাত্‌ শুনতে চাই না, নেসার সাহেব এখন বে-সামাল হয়ে পড়বে—

—সে তো ভালোই, আমি তো তাই দেখতে এসেছি!

—দূর বেল্লিক, যদি নবাব ভি বে-সামাল হয়ে পড়ে?

—তাও দেখবো!

—দূর বেত্‌মিজ্‌! কেউ জানতে পারলে আমার নৌকরি খতম হয়ে যাবে যে—ভেগে যা—ভেগে যা—

শেষকালে একেবারে জোর করে তাড়িয়ে দিয়েছিল নেয়ামত মতিঝিল থেকে। মতি-ঝিলের ত্রিসীমানায় আর থাকতে দেয়নি বশিরকে। সেই যে মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছিল তা আর ঠাণ্ডা হলো না। সারা রাত ঘুমই হলো না। ভোর বেলাই উঠে পড়েছিল। আর ঠিক সেই সময়েই কান্ত এসে ডেকেছে।

—কী রে, এত সকালে? কখন এলি মোল্লা-হাটি থেকে?

কান্ত বললে—এই তো সোজা সেখান থেকে আসছি। এখনও খুলিতে যাইনি।

—তা সরখেলের সঙ্গে দেখা হলো? চিঠি পেলি?

কান্ত একটু দ্বিধা করতে লাগলো।

বশির আবার জিজ্ঞেস করলে—চিঠি পাসনি?

কান্ত বললে—না—

—না মানে? ডিহিদার কি ঝুট-খবর পাঠিয়েছে? সে যে জানিয়েছে হাতিয়াগড়ের রাজা মহারাজার সেরেস্তার লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়েছে? তুই উজবুক না কী? তার সঙ্গে মুলাকাত হলো তোর আর চিঠিটা সরাতে পারলি না? আমি আমার ফুপাকে কী জবাব দেব? তুই কোনও কম্মের নয়—একটা আস্ত পাঁঠা—
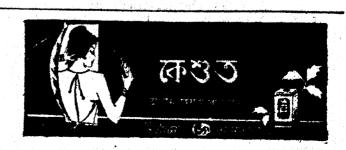
কান্ত অনেকক্ষণ পরে বললে—আমি এ-চাকরি করতে পারবো না ভাই—সেই কথা তোর কাছে বলতে এসেছি— (ক্রমশঃ)

বাসের তীব্র গতি টেরেজিন স্টাট-এর দিকে। জানালা কাচের, বাসের ছাদও। সুতরাং বাইরের আকাশ, আলো, মেঘ, মাটি—সবই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে। মন উদাস হয়ে যায়। আবার বাইরের দিকে চোখ মেলি। দিগন্তব্যাপী সবুজ ফসলের মাঠ। মাঝে মধ্যে গ্রাম, মানুষের ক্ষণিক কোলাহল, ট্রাক্টর আর যন্ত্রের সংযত আওয়াজ। যন্ত্র এখনও সেভাবে এদিকের গ্রামগুলিকে গ্রাস করতে পারে নি। জর্মানীর গ্রামাঞ্চল আর চেক দেশের গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। জর্মান খেত-খামার আর চাষীবাড়ি এত পরিপাটি, সাজানো গোছান যে, তার সবুজ মখমলের মত দিগন্তের দিকে তাকালে মনে হয় কোন ছবিতে দেখা কল্পনার রঙিন দেশের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমার জীবনের বেশ কিছু খণ্ডিত অংশ কেটেছে চাষীদের মাঝে। ওদের সুখ-দুঃখ, ওদের চোখের ভাষা, গ্রামের কাদামাটি, নুয়ে-পড়া-ফসলের ডাক—আমি সহজেই অনুভব করি। ওদের জীবনকে আমি জানি। কখনো-সখনো আত্মীয়তাও বোধ করি। সে যে-দেশেরই হোক না কেন! কিন্তু জর্মান চাষীবাড়িতে যখন মোরগ-ডাকা-ভোরের সঙ্গে মর্সেডেস্-বেন্‌ৎস্ গাড়ির মেশিনও আওয়াজ করতে থাকে—তখন কোথায় যেন একটা ব্যবধান অনুভব করি ওদের আর আমার মাঝে।

চেক-দেশের গ্রামের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে কেন জানি বারবার দেশের কথা মনে পড়ছিল। এলোমেলো বাড়ি-ঘর দোর, মাটি মাখা এবড়ো-খেবড়ো পাথরে মানুষগুলোর নিরহঙ্কার হাসির প্রাচুর্য, ঐশ্বর্যের গর্ব যেখানে অনুপস্থিত, সব যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল বাংলা দেশের মফস্বলের পথ। প্রবাসের অনেক পথ ভাঙতে গিয়ে বারবার একটা কথা প্রায়ই মনে হয়—অন্তরের কি কোন ভৌগলিক সীমারেখা আছে? এমন অনেকবার ঘটেছে, সেদিনও শেষ রাতে যখন এ দেশের পথ দিয়ে গাড়ি ছুটছিল, ছোট ছোট দূরের পাহাড়ের মাথায় ঝুলছিল একখণ্ড চাঁদ, তার সাদা-চাদর-বিছানো-আলোর শয্যায় ভাসতে ভাসতে বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল দেশের চেনা পথগুলির। মনে হচ্ছিল, এমন অনেক জ্যোৎস্না-রাত্রিতে ত আমি রাঁচি থেকে পুরুলিয়ার পথ ভেঙেছি বাসে। "এ পথে আমি যে গেছি বারবার"—রবিঠাকুরের গান এসে যায়। পথে বেরোলেই কেন জানি, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে কবির গানগুলি একের পর এক এসে যায় কণ্ঠে। কবিকে এমনভাবে আর কখনো কাছে পাওয়া যায় না, যেমনটি পথে বেরিয়ে। আর আমার একটা পরম সৌভাগ্য, এমন দিন গেছে, পথে বিপথে, বন্ধুদের অজস্র রবীন্দ্রনাথের গান শোনাতে হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তাই পথে বেরোলেই সেই বন্ধুদের অভাবটা বারবার অনুভব করতে হয়। বিশেষ করে এই বিদেশ-বিভুঁই-এ। যখন গানগুলি মুক্ত পাখির মত বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, অথচ আশে-পাশে তাকিয়ে দেখি সেই সব শ্রোতা-বন্ধুরা কেউ নেই। যাদের সঙ্গে আমার এক সাঁকো রচনা হত এই গানের মাধ্যমে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের গানের বেলাতেই বোধ হয়—এমন সাঁকোর একান্ত প্রয়োজন, যাকে বলে কবির ভাষাতে—"অঙ্গ-বিহীন আলিঙ্গনে সকল অঙ্গ ভরে।" এই আলিঙ্গন কখনো শ্রোতার সঙ্গে, কখনো প্রকৃতির সঙ্গে কখনো বা নিজের গভীরে ভুলে-যাওয়া-নিজেরই গোপন মানুষটির সঙ্গে। কিন্তু বাসের চারিদিকে তাকিয়ে আর কারো সঙ্গে এই গানের আলিঙ্গন সম্ভব হল না। বরং বারবার মনে হচ্ছিল—এই আকাশ, আলো, বাতাস আর কবির গান—কিছুক্ষণ বাদে সব

প্রাগে নাচের সন্ধ্যায় জর্জ আর মারিয়া।
ফটো : লেখক

একে একে নিবে যাবে। আর জন্ম নেবে এক ঘৃণিত ধারণা এই পৃথিবী আর মানুষের ওপর। কবি কেবল "সভ্যতার সংকট"-ই দেখে গিয়েছিলেন, তার বীভৎসরূপ দেখে যাওয়ার কোন সুযোগ ঘটে নি।

চোখে তখনও গত রাতের জড়তা। আলোর ঝাপটায় ধীরে ধীরে চোখ থেকে অন্ধকারের নেশা কেটে যেতে লাগল। আস্তে আস্তে পরিষ্কার ছবির মত গত সন্ধ্যার মনোরম সমাবেশের কথা মনে পড়ল। মাটির নীচে কী বিশাল প্রাসাদ! ঝলমলে কারুকার্যমণ্ডিত আলোর ঝাড়। বিশাল হলের মধ্যে অসংখ্য ছেলেমেয়ের নাচের আসর। এখানে নাকি পূর্বে রাজামহারাজদের আসর জমত। এখন

লিডিচে গ্রামের প্রবেশ পথ।

এখানে সাধারণ মানুষের নাচের সন্ধ্যা। এত সুন্দর কারুকার্য, যুদ্ধের এতটুকু স্পর্শ লাগেনি। তানপুরার তারে আঙুলের ছোঁয়া লাগলেই, তার ক্ষীণ ঝংকারও যেমন মনের ভেতর থেকে সুর বেরিয়ে আসতে চায়, তেমনি এত সুন্দর বিশাল নাচের হলের মধ্যে এসে দাঁড়ালেই, ভেতরের কোন ভালো-লাগা ভালোবাসা-আনন্দের ঢেউ এসে দু'পায়ে নাচের দোলা দিতে থাকে। তখন মনে হচ্ছিল —"আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানীর কোনো ভেদ নেই।" বিমলকে বললাম— "এমন হলে হবালদার সুরে কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়ে যেতে চাই। ভয় হচ্ছে—টুইস্ট দিয়ে না সব পণ্ড করে দেয়।" ঠিক তাই, হবালদার সুর আর নাচের দোলা কতক্ষণ? টুইস্টের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার গহবরে আর সব নাচ তলিয়ে গেল। ইচ্ছে ছিল কোন চেক মেয়ের সঙ্গে নাচি। কারণ, পেটের কথা যার করতে হলে, নাচের মুহূর্তই মোক্ষম। এ দেশের সাধারণ ছেলেমেয়েরা কীভাবে ওদের সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছে, তা জানার উদ্দেশ্য আমাকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। মুশকিল হল কে যে, জর্মান আর কে যে চেক—সে তফাৎ করা মুশকিল হয়ে পড়ল। দেখতে সব মেয়েরাই প্রায় একরকম। জাতিগতভাবে খুব একটা তফাৎ নেই। চেক মেয়েরাও জর্মান মেয়েদের মতই বেশ সুন্দরী। আর নাচের পোশাকে এরাও খুব কম যায় না। হঠাৎ বিমল বললে—খুঁজে পাওয়া গেছে পার্থক্য। জুতো! নাচের জুতোতে পার্থক্য ধরা পড়ল কম্যুনিস্ট আর ক্যাপিটালিস্ট দেশের মেয়েদের। চেক মেয়েদের নাচের জুতোর অবস্থা দেখে সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। এদেশের মেয়েদের কাছে নাচের

টেরোজিন KZ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী

পোশাক ও জুতো—এক পরম সম্পদ। কম্যুনিস্ট দেশের প্রাচুর্যের অভাব ওখানে আমার চোখে প্রকটভাবে ধরা পড়েছিল। কিন্তু হায়, জুতো আবিষ্কার হলেও, শেষ পর্যন্ত চেক মেয়ের সাথে আর নাচা হল না। দলের জর্মান মেয়েদের মনরক্ষা করতে গিয়ে চেকদের সঙ্গে নাচা হল না। ওদের কথাও সেভাবে জানা হল না। তাতে বেশ একটু বিরক্তিই বোধ করছিলাম। আর যেভাবে টুইস্টের হল্লা শুরু হল! শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যাটা বাঁচিয়ে দিল চেকোস্লোভাকিয়ার বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা Waldemar Motuska আর Eva Pilarova-র কণ্ঠের গান। Eva Pilarova-র কণ্ঠস্বর কোনদিন ভুলতে পারব না। একটা সামান্য মেয়ের খালি গলার সুরে এমন শক্তি, এত মাধুর্য, এত প্রাণ আর এমন বিদ্যুৎ থাকতে পারে—সেদিন Eva Pilarova-র কণ্ঠে চেক দেশের লোকগীতি না শুনলে [illegible] হত না। বাদ্যযন্ত্র বিহীন শুদ্ধ একটা কণ্ঠস্বর, তার সুর আর আবেগ এত বড় প্রাসাদটাকে ভেঙে ফেলার মত অসংখ্য বাদ্যযন্ত্র সংবলিত কান-ফাটানো হট্ মিউজিক আর [illegible] শত ছেলে-মেয়ের টুইস্ট নাচের উন্মাদনাকে মুহূর্তে স্তব্ধ করে দিল। সারা হলে একটা কণ্ঠের গানের সুর ছাড়া আর কোন টুঁ-শব্দ পর্যন্ত রইল না। যে যেখানে নাচছিল, সে সেখানেই ধীরে ধীরে মেঝেতে বসে পড়ল—হা-কার শুনতে লাগল একটা জগৎব্যাপী সুর। অতি বিষাক্ত সাপের চাইতেও বিষধর টুইস্ট নাচের ফণা যেন উপযুক্ত সাপুড়ের কাছে মাথা নত করল। আমি মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম—তোমার রাজ্যে এখনো গানেরই জয়। মেশিনগান অর টুইস্টের নয়। জগতের সকল আসুরিক মাদকতাকে ভাসিয়ে দিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকে যেন মানুষের গানের সুর।

যখন টেরেজিনে এসে নামলাম, তখন সূর্য রক্ত রাঙে খোলাটে প্রায়। বিকালের ক্লান্তিকর তির্যক আলো আদিগন্ত বিস্তৃত। বেদনার আলো ঢলে পড়েছে একটা বিশাল কবর ভূমির ওপর। তিরিশ হাজার মৃত মানুষের চলাও কবর। নাম নেই তাঁদের। রাশিয়ানদের দখলে আমার সঙ্গে সঙ্গেই KZ থেকে যাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, তাঁদেরই কবর এই বিরাট মাটিতে। বাস থেকে নেমেই এই কবর ভূমি। সারি সারি কবরের শ্বেতফলকগুলিকে দেখে মনে হল, এই মাত্র নীলাকাশে উড়ে বেড়ানো হাজার হাজার আনন্দিত কপোতের ঝাঁককে কে যেন অসংখ্য ছররা-গুলিতে মেরে ফেলে রেখেছে এই মাঠের ওপরে। এখানে আবার নতুন গাইড। সবাই বৃদ্ধ প্রায়। ইহুদি। এবং এঁরা সবাই এই KZ-এর মরণযজ্ঞ পার হয়ে এসেছে। তবে এঁদের জীবনের সব শেষ করে দেওয়া হয়েছে। কথা বলতে কণ্ঠস্বর কাঁপে, কিছু দেখাতে গেলেও হাত অসম্ভব রকম কাঁপে। এখনো চোখে মুখে একটা আতঙ্কের ভাব। প্রতি মুহূর্তে অত্যাচার, অনাহার আর মৃত্যু অপেক্ষা করছে, সেই বিভীষিকাময় দিনগুলির কাহিনী যখন এঁরা বর্ণনা করছিলেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিশাল এই মরণ-কারাগারের অলিগলি আর এক ফালি কোঠাঘরগুলি দেখাচ্ছিলেন, তখন মূক হয়ে গিয়েছিল কয়েক শত জর্মান যুবক-যুবতী। বিশেষ করে জর্মান মেয়েরা। কারো কারো চোখ ছল ছল করছে। একটি দুটি মেয়ে অকপটে করুণ কণ্ঠে বলে ফেলল—উঃ! এত বীভৎস। আর এই দুঃখ পাইভেলা একটা কথা বারবার

টেরেজিন শহরের কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের সম্মুখে ৩০ হাজার অজানা মৃতদেহের [illegible] কবরের সারি।

ফটো: লেখক

যারা ২৫ বৎসর পূর্বের সেই পাপ-জীবনের কথা ভুলে গিয়েছিল, সেই সব KZ-এর কর্মীদের আজকের সমাজ-জীবন থেকে তুলে এনে চলেছে ফ্রাঙ্কফুর্টে তাদের নিয়ে আউশ্‌ভিৎস্‌-বিচার।

করল—মারিয়া তোমাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাবো। তুমি চলো। এবার মারিয়ার দু চোখ বেয়ে জলের ফোঁটা গড়াতে শুরু করল। আর পশ্চিম বার্লিনের জোয়ান যুবক-যুবতীরা তখন মুগ্ধনেত্রে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। মারিয়ার চোখের জলের মূল্য ওরা কীভাবে পরিশোধ করবে, ঠিক করে উঠতে পারছিল না। কে যেন বলল মারিয়াকে ত কিছু উপহার দেওয়া হয় নি। খোল খোল সুটকেস। যার যত বাড়তি জিনিস আর চকোলেট-কফি-পেন আছে- সব জড়ো হতে লাগল জর্জের কাছে। সে প্রায় এক বোঝার সামিল। জর্জকে বলা হল—আমাদের সবার হয়ে মারিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে। জর্জ যেন একটু ইতস্তত করতে শুরু করে দিল। কিসের দ্বিধা ওর? অবশেষে সবার গালাগালি খেয়ে জর্জ এগিয়ে গেল মারিয়ার সামনে। মারিয়া চোখ তুলে তাকাল। ওঁর চোখ করুণ, কঠিন। এই ভাবে এত জিনিস নিতে ওঁর আপত্তি আছে। জর্জ বললে—এ আমাদের উপহার, তোমাকে নিতেই হবে। বেশ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ মূর্তির মত দুজন দুজনের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে, রাত্রির অন্ধকার, বাসের গর্জন, বাতাসের আলোড়ন। বাস এক্ষুণি সীমান্তে পৌঁছে যাবে। জর্জ আর মারিয়া—দুজন দুজনাকে চুমু খেল আস্তে। গালে। এটা ভ্রাতৃত্বের চুম্বন। তবু মারিয়ার গণ্ডদেশ বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। দুই পৃথিবীর দুটি চঞ্চল আত্মা এক জায়গায় এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। হয়ত দু দিনের। কিংবা মুহূর্তের। তবু একদিন স্পর্শ করেছিল দুই সমুদ্রের ঢেউয়ের আছাড় কোন এক বিন্দুতে। আর বাসটা এসে থামল সীমান্তে।

এই সীমান্তের প্রশ্ন তুলেছিল অনেকে পশ্চিম বার্লিনের পক্ষ থেকে। দৃষ্টান্ত ছিল KZ-এর দোষ খণ্ডন করবার জন্য। জর্জ বা আরো কেউ কেউ বলেছিল—দুটোকে এক করে দেখালেও আমরা KZ-এর কলংক থেকে রেহাই পাবো না। আর KZ আর বার্লিনের প্রাচীরের মধ্যে কোন তুলনাই চলতে পারে না। দুটোকেই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। পূর্ব বার্লিনের প্রাচীরের জন্য পৃথকভাবে আলোচনা চালাতে হবে। আর সেটা শুরু করতে হবে হের উলব্রিখ্‌ট্‌ থেকে। সেদিন এক রাজনৈতিক আলোচনায় পঃ জার্মানীর বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ সাংবাদিক এই প্রসঙ্গই উত্থাপন করেছিলেন যা বন্‌-সরকার কোন মতেই মানতে রাজী নন। ফলে আজ শুধু দুটো সরকারেরই অস্তিত্ব নয়—ধীরে ধীরে দুই পারের একই জাতি দুই জাতিতে পরিণত হতে চলেছে। ১লা মের উৎসব—দুই বার্লিনে দুই জাতের—তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত!

আর ঘুরে ফিরে সেই নাৎসীদের বিচার আজো চলেছে। চোর বাছতে গিয়ে প্রায় গ্রাম উজাড় হয়ে যাবার উপক্রম। জার্মানী আজ জ্বলছে। ফ্রাঙ্কফুর্টে আউশভিৎস্‌ (Auschwitz) বিচারের মধ্যে দিয়ে জার্মানীর আর এক অগ্নি পরীক্ষা হয়ে যাচ্ছে। জার্মানীর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার পত্র আসছে এই বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে। তাদের অভিযোগ এত বৎসর পর যখন জার্মানীর জীবনযাত্রা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে গেছে, তখন খুঁড়ে খুঁড়ে এই সাপ বেরকরবার কী কারণ থাকতে পারে? তাদের মধ্যে অনেক জনকের অভিযোগ—যেহেতু আমাদের কোন পুলিসের বড়কর্তা আত্মীয় নেই সেই জন্য আমাদের মত সাধারণ মানুষদের নিয়ে এত টানাটানি। আবার কেউ কেউ ক্ষুব্ধ—সরকার এই বিচার চালানোর মধ্যে দিয়ে জার্মানীর সম্মান অনেক নষ্ট করে ফেলেছেন। এই বিচারের ওপর

আমাদের কর্তব্য, মানুষের সামনে বারবার আয়না তুলে ধরা, যাতে সে তার মুখ দেখতে পায়।

স্বপ্নে নরকের দৃশ্য দেখা যায় কিনা জানি না। তবে এখনো আমি যখন KZ-এর ভিতরে একটা দিনের কথা ভাবি, তখন মনে হয় প্রতিদিন আমরা সুন্দরকে খুঁজি, অথচ কোন পাপ আমাদের প্রতি মুহূর্তে গ্রাস করে নেয়, সৃষ্টি হয় কুণ্ঠের দগদগে ঘার মত এমন নরকের। KZ-এর প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এত রক্ত আর অত্যাচারের দাগ। সেদিন এক ফালি অন্ধকার কুঠুরীগুলিতে ঘুরতে ঘুরতে সেই বিষাক্ত বাতাসের মধ্যে নিজের অনুভূতিগুলিকে যাচাই করছিলাম। আর এত বড় মারণ-যন্ত্রের বর্ণনা দেওয়াও এখানে সম্ভব নয়। KZ-এর ইতিহাস, তার নরক-বৈচিত্র্য তার নরহত্যা পদ্ধতি—অনেকেই জানেন। তবু এই লেখা লিখতে গিয়ে—এই কারাগারের কিছু কিছু অংশ না লিখে পারছি না।

কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা উঠলেই জর্মানরা বলে—এর উদ্ভাবক ব্রিটিশ, আমরা তাকে কেবল রূপ দিয়েছিলাম। হিটলার ভাল করেই জানত যে গণতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে কেবল বুটের নীচে দেশের আত্মাকে চেপে রেখে নিশ্চিন্ত নেই—চাই এমন একটি কারাগার। ১৯৩৩ সালে হাতে ক্ষমতা পেয়েই হিটলার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট আর স্বাধীন চেতনা সম্পন্ন মানুষদের KZ-এ পাঠাতে শুরু করল। এ কার্য সমাধান করত SS আর গেস্টাপো লোকেরা। পরে তা হ'ল প্রধানত ইহুদীদের জন্যে। ৩৫টি দেশের বন্দী পার হয়ে গেছে এই টেরেজিনের KZ-এর মধ্যে দিয়ে।

গেট দিয়ে ঢুকতেই গা'টা কেমন ছমছম করে উঠল। এগিয়ে গেলে প্রথমেই "রিসেপশান রুম"—সেখানে বন্দীদের প্রথমেই নগদ প্রাপ্তি ছিল বুটের লাথি নয়ত ঘুষি। তারপর মাথা কামানো। সেই সঙ্গে একটা করে নাম্বার। নাম মুছে গেল। কয়েদঘরের প্রাঙ্গনে ঢুকতেই লেখা আছে গেটে—Arbeit macht frei অর্থাৎ কর্মেই মুক্তি। আর সেই মুক্তি একবারে মৃত্যুতে। মৃত্যু ছিল না স্বাভাবিক মরণে, ফাঁসি বা গুলিতে। তিলে তিলে প্রতিদিন অর্ধাহারে, অনিদ্রায় আর অত্যাচারে কঙ্কালসার হয়ে যখন প্রায় মৃত্যুমুখে, তখন গ্যাস চেম্বারে। গ্যাস চেম্বারে সংকুলান না হলে, পাইকারী হারে গুলি, তাতেও যখন শেষ করতে পারত না—তখন বন্দীদের ওপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে শয়ে শয়ে মানুষকে মারা হত। সমস্যা হয়ে দাঁড়াত—মৃত দেহের স্তূপ পরিষ্কার করা নিয়ে। যে পরিমাণে মানুষ মারা হত, সে অনুপাতে চুল্লীতে মৃতদেহ পোড়াবার ব্যবস্থা ছিল না। শেষ পর্যন্ত বিশাল গর্ত করে তাতে পাইকারী হারে মৃতদেহ মাটি চাপা

দেওয়া হত। এক একটা অন্ধকার সেলে—যেখানে খুব জোর দুজন মানুষের শোবার ব্যবস্থা হতে পারে, সেখানে ৬০।৭০ জন মানুষকে পিটিয়ে ঢোকান হত। বন্দীরা সবাই দু'পা রাখবার জায়গাটুকু পর্যন্ত পেত না—সারা রাত এক পায়ে দাঁড়িয়ে, একে অন্যের ঘাড়ে চড়ে—একটা বিরাট স্তূপীকৃত মাংস পিণ্ডের মত পড়ে থাকত আর একটা ভোরের জন্যে। আর সবাই প্রতিটি মুহূর্ত গুনত—এই বুঝি তার মৃত্যুর ডাক এল। দিনের পর দিন রাতের পর রাত, মাসের পর মাস—এভাবেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেত এই সব বন্দীরা। খাবার দেওয়া হত—যত পচা আলু চালের সাথে সিদ্ধ করে সুপে তৈরি করে—তাতে আমার মনের বালাই ছিল না। আর যাকে এরা মারবেই—আগের থেকে ঠিক থাকতো, তার দেহ তৈরি করাই থাকত। এভাবে মেরে শেষ করতে না পেরে, শেষের দিকে টাইফয়েড আর কলেরার রোগ জীবাণু ঢুকিয়ে বেশ কিছু অংশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হল। মেয়েদের বিভাগ আলাদা।...... এই সমগ্র যজ্ঞের কর্মকর্তা ছিলেন Joeckel আর Roeke। এদের কুখ্যাতি আজ বিশ্বময়। মেয়েদের বিভাগ সুইমিং পুলের পাশেই ছিল বন্দীদের গুলি করে হত্যা করার বধ্যভূমি।

আমি ঘুরে ঘুরে KZ-এর এই বিষাক্ত হাওয়া ফুসফুসে ধারণ করতে পারছিলাম না আর। একেবারে বেরিয়ে এলাম ফটকের বাইরে। আঃ! আবার মুক্ত আলো, মুক্ত বাতাস, নির্জন পৃথিবী। শান্ত, ঋজু, দৃঢ় পপলার গাছের সারির মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। চোখ ফেটে জল আসতে চাইছিল। বুকে যন্ত্রণা। ছিঃ, ছিঃ! এই কি মানুষ? মানুষ পশুরও অধম হতে পারে! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বন্যপশু কখনো মানুষ হতে পারে না। যদি হতে পারত? তাহলে KZ দর্শনের পর লজ্জায় আবার পশু-জীবনে ফিরে যেতে চাইত। আর আমরা মানুষেরা আমাদের যত পাপ স্খালন করবার চেষ্টা করি বোবা পশুদের পশুত্বের নামে। মনুষ্য সমাজ জীবনে এক একটা সময় আসে যখন এই সব পাপীদের প্রেতাত্মা কীট হয়ে বেরিয়ে আসে আমাদের পৃথিবীর সুন্দর ইতিহাসের পাতাগুলি কেটে ধ্বংস করবার জন্যে। ১৯৫২ সালে ভিয়েনায় বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে ফ্রেদেরিক জোলিও কুরীর বক্তৃতার অংশ মনে পড়ে—"১৭০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু—মূল্য দিতে হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধকে। আর ২য় মহাযুদ্ধে মূল্য দিতে হল ৫ কোটি মানুষের প্রাণ। আর সম্পত্তি যা ধ্বংস হল, তার মূল্য ১০০০ মিলিয়ার্ড ডলার।" আর যাদের অর্থ লিপ্সার লকুলী দৃষ্টির সামনে জর্মানী যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হল, KZ তৈরি করল, সেই ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী ধনতন্ত্রের শিরোমণি আমেরিকার ধনিকগোষ্ঠীর লাভের পরিমাণ হয় মহাযুদ্ধে ৫, ৪ মিলিয়ার্ড ডলার থেকে উঠে দাঁড়াল ২২, ৬ মিলিয়ার্ড ডলারে। স্বাধীনতা গেল, শান্তি গেল, কতকগুলি দেশে দেশে এল কম্যুনিস্ট শাসন—আর হতভাগ্য জর্মানী! একটা জাতির দ্বিখণ্ডিত দেহ আজ ইউরোপের বধ্যভূমিতে। অনেকক্ষণ বিশাল কবর ভূমির পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে কাটিয়ে দিলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে! দু' চার জন লোকের এদিক-ওদিক আনাগোনা। দূরে ওরেনিয়েনবুর্গ শহর, আর তার পাশে এই KZ! অনেক কথা ভাবছিলাম এসব নিয়ে। এবার উঠে দাঁড়ালাম, ফিরতে হবে সঙ্গীদের কাছে।

আস্তে আস্তে আবার ফটকের দিকে চললাম। পথে এই শহরের দুটি মেয়ের সাথে পরিচয় হ'ল। ওদের কথা, ওদের জীবনে এই KZ-এর প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু হায়, এই করুণ মুহূর্তে নির্বাক অবস্থাতেই হাঁটিতে হ'ল। ওরা জর্মান, ইংরেজী বা ভারতীয় ভাষা জানে না, আমিও চেক আর রুশ ভাষা জানি না। তবু চোখ মুখ আর হাত-পা নেড়ে ভাবের আদান-প্রদান চলল। হাঁটতে হাঁটতে আবার KZ। কয়েকটা চত্বর পার হলেই ৫নং ওয়ার্ড। সেখানে সন্ধ্যার অন্ধকারে মশাল জ্বালিয়ে চলেছে চেক-জর্মান শোক-সমাবেশ। প্রথমে যাঁদের মেরে ফেলা হয়েছে অত্যাচার করে, গোপনে সংগ্রহ করা তাঁদের করুণ স্বরের টেপ থেকে একজন জর্মান অধ্যাপক আর একটি বাচ্চা ছেলের মৃত্যুর পূর্বের কথা বাজিয়ে শোনান হ'ল। তারপর শোক সংগীত। তিনজনে মিলে গান গাইছে ধীরে ধীরে—সে গান কী এক প্রাণের শক্তিতে ডানা মেলেছে অন্ধকারে। ওই গানগুলি শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল—এই জগতের সকল প্যাপ, সকল দুঃখ, সকল ভয় দূর করে দিতে সুরাশ্রিত এক সংস্কৃত শ্লোক যেন উচ্চারিত হচ্ছে। স্তব্ধ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। পাশে মেয়ে দুটি তখনও। ওদের আরো দুই বান্ধবীও এসে দল ভারী করেছে। ওরা সবাই পাশের দোকান থেকে টেরিজিনের স্মৃতিচিহ্ন কিনে আমার কোটে চাপিয়ে দিল। ওদের বাধা দিতেই দোকানের বুড়ী হেসে জর্মান ভাষায় বললে—ওরা খুব ভাল মেয়ে। এই পাশেই থাকে। তুমি জিনিস-গুলি নিলে ওরা খুব খুশী হবে। সে ত বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার হাতে যে আর কিছুই নেই ওদের দেবার মত, একমাত্র পশ্চিমের এই উজ্জ্বল কমলালেবুটা ছাড়া। ......বাস ছাড়ার মুহূর্তে ওরা সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। ওদের উপস্থিতি ছিল হাসি আর সহৃদয়তায় ভরা। পনেরো বিশটা বাস যখন এক সাথে গর্জন করে উঠল, তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করে দিয়েছে। বাসের জানলার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা বৃষ্টিতে ভিজছে আমাকে আর বিমলকে বিদায় দেবার জন্যে। "হায়রে হৃদয়,/তোমার সঞ্চয়/দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।/ নাই নাই, নাই যে সময়॥"

বিদায় চেকোস্লোভাকিয়া, বিদায় প্রাগ, লিডিসে, টেরেজিন—বিদায় মারিয়া, ইয়ান, বিদায় মেজিনোয়া, জেরা, হখেনা—আর হানা। তোমাদের হাসি-কান্না চিরস্থায়ী হোক। ডানা-কাটা-কাকের অন্ধকারে চাপা পড়ে থাক পৃথিবীর দুঃস্বপ্ন—এই পৈশাচিক কারাগার। কঠিন জ্বরের পর হঠাৎ গায়ে যেমন প্রচণ্ড ঘাম দিতে থাকে আরোগ্যের পূর্বে, এ দেশের শীতের শেষে কালো কালো গাছের শরীরে প্রচণ্ড ঘাম দিয়ে বেরিয়ে আসে হঠাৎ একদিন কোটি কোটি সবুজ কাঁচ পাতা বসন্তের ডাকে—সেদিন সঙ্গী জর্মান যুবযাত্রীদের দেখে মনে হচ্ছিল—ওদের মনেও নোতুন আলোর ঘাম দিতে শুরু করে দিয়েছে।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে বাস চলেছে পশ্চিম বার্লিনের পথে। ঘরে ফেরার ডাক। মনে আনন্দ। তবু সবাই স্তব্ধ। কারো মুখে কথা নেই। সবাই যেন KZ দেখে বোবা হয়ে গেছে। একটা শূন্যতায় ভরা মুহূর্ত। আর থাকতে না পেরে কে যেন বলল—একটু গান হোক। কে গান গাইবে, কী গান গাইবে? বাসের রেডিয়োটা চালিয়েও বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। মানাচ্ছে না এই মুহূর্তে। আবার স্তব্ধতা। আমি জানি, কোন গানটা ওরা সবাই গাইবে এখন, এবং জানেও। আস্তে আস্তে সসঙ্কোচে আমার গলা থেকেই বেরিয়ে এল পল রোবসনের গান—"জন ব্রাউনস্ বডি লাইজ মোল্ডিং ইন দ্য গ্রেভ, হিজ সোল গোজ মার্চিং অন। গ্লোরি গ্লোরি হ্যালেলুইয়া, হিজ সোল গোজ মার্চিং অন।" মুহূর্তে এক বিশাল কোরাস্ জেগে উঠল বাসে। গান ধরেছে ওরা—গ্লোরি গ্লোরি হ্যালেলুইয়া—এক মহান আত্মার মন্ত্র। রাত্রির অন্ধকার পথে বাসের সাথে ছুটে চলেছে একটা গান একটা মন্ত্র, আর অসংখ্য রক্তাক্ত মৃতদেহের আত্মা নোতুন আলোর জগতে।

সন্তোষকুমার ব্রহ্ম

২৫

শশাঙ্কের স্ত্রী সুজাতা সংসার ত্যাগ করবে বলে স্থির করেছে। অবশ্য ছাড়া ছাড়া ভাব তো তার অনেকদিন থেকেই। স্বামীই তাকে ছেড়ে দিক কি সে নিজেই ঘরসংসার ছেড়ে আসুক, দরকার তো সে আর করল না। যে মেয়ে বছর দশেক স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারে, সব রকম আমোদ-আহ্লাদ, ভোগসুখ থেকে আস্তে আস্তে সরে আসতে পারে, সে কি আর একটু সরে এসে বাপ ভাইয়ের সংসার থেকে বেরিয়ে কোন আশ্রম-টাশ্রমে গিয়ে বাস করতে পারে না?

সুজাতার বাবা বলেন, 'বাইরে যাবার তোর দরকারটা কি? এত বড় বাড়ি এতগুলি ঘর, তুই মন্দির কর, ঠাকুরঘর কর, যা তোর খুশি। বাড়িতে থেকে কি ধ্যানধারণা জপতপ করা যায় না?'

প্রশান্তবাবু পেশায় উকিল। কিন্তু মেয়ের কাছে তাঁর সব আর্গুমেন্ট বিফল হয়ে যায়। সুজাতা তো তর্ক করে না, শুধু মৃদু হেসে সব যুক্তিতর্ক অস্বীকার করে। অবশ্য সত্যিই বাইরে থেকে দেখতে গেলে অসুবিধার কিছু নেই। একখানা কেন তিনখানা ঘরও সুজাতা ব্যবহার করতে পারে। একতলা দোতলা মিলিয়ে বাড়িতে আটখানা ঘর। বাসিন্দার মধ্যে বাবা, দাদা-বউদি আর তাদের একটি বাচ্চা ছেলে। মা অনেক আগেই সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু সুজাতা কোণের দিকের একখানা ঘরই নিজের জন্যে বেছে নিয়েছে। ইচ্ছা করলে চব্বিশ ঘন্টা এই ঘরে সে পড়াশুনো, ধ্যান-ধারণা নিয়ে থাকতে পারে। সংসারের কোন গোলমাল চেঁচামেচি এখানে এসে পৌঁছায় না। কিন্তু বাইরের নিভৃতিই কি সব? সুজাতার দাদা প্রভাসও প্রতিষ্ঠাবান এডভোকেট। বয়স চল্লিশ হয়নি। কিন্তু এরই মধ্যে পসার বেড়ে উঠেছে। বিত্তবান মক্কেলের সংখ্যা তার কম নয়। স্ত্রী আর একটি ছেলে নিয়ে তার ছোট সংসার। বৃহৎ সংসারের অন্তর্গত এ সংসারকে যে সুখের সংসার করেই গড়ে তুলেছে। প্রভাসের ক্ষমতা এত সামান্য নয় কি মন এত সংকীর্ণ নয় যে, সেকালে স্বামী-ত্যক্তা সুহাসিনী বোনের স্থান হবে না। বিপত্নীক বাবাকে যেমন সহ করে প্রভাস তেমনি বোনকেও সে সুখে না পারুক স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে চায়।

কিন্তু সুজাতার মতিগতি ক্রমেই অন্য ধারা নিচ্ছে। দাদার সংসারে তার আর মন বসছে না।

প্রভাস অনেক রকম চেষ্টা করে দেখেছে। প্রথমে সে চেয়েছিল খোরপোষের মামলা করতে। প্রেস্টিজহানির ভয়ে বাবা অরাজী। সুজাতাও রাজী হয়নি। প্রভাস বলেছিল, 'কেন, আপত্তিটা কিসের? তোর তো আর উকিলের ফী লাগবে না।'

সুজাতা বলেছিল, 'উকিলের ফীটাই বুঝি সব? তুমি কি দুমুঠো খেতে দিতে পারবে না দাদা; আমার খোরাকির জন্যে এত ভাবছ?'

প্রভাস জবাব দিয়েছিল, 'তা নয়। তুই তো শুধু আমার দেওয়ার ওপর নির্ভর করছিস নে। নিজেও রোজগার করে আনছিস। সে জন্যে নয়। তুই তোর প্রাপ্য টাকা কেন ছাড়বি। তা ছাড়া আমি চাই শশাঙ্ক একটু জব্দ হোক। ও কেবল মেয়েদের পিছনে ছুটোছুটি করে, কিছুদিন উকিলমোক্তারের পিছনেও ঘুরুক।'

সুজাতা জবাব দিয়েছে, 'তাতে লাভ কি দাদা? তোমার সমব্যবসায়ীদের দুটো পয়সা হবে এই তো।'

প্রভাস আর কিছু বলেনি।

দাম্পত্য স্বামীকে জব্দ করবার চেষ্টা কি কম করেছে সুজাতা? শোধ কি কম নিয়েছে? কিন্তু সত্যিই শোধরাতে পেরেছে

(সি-৬৩২৯)

কিছু পারেনি। শবানেকের স্বভাব একটুও বদলায় নি। এই সেদিন পর্যন্ত মন্দিরার মত অল্পবয়সী একটি ছাত্রীর সঙ্গে সে চুড়ান্ত কেলেঙ্কারি করে ছেড়েছে। সবই কানে যায় সুজাতার। কানে যাতে তার যায় তার জন্যে দুই জন উপযাচক হয়ে তাকে মাঝে মাঝে ফোন করেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আজকাল আর জ্বলে ওঠে না সুজাতা। পাগলের মত যা তা কিছু একটা করে বসতে তার ইচ্ছা করে না। আজকাল তার সবই সয়। মনকে শাসন করে কখনো বা পীড়ন করে, নিগ্রহণ করে সুজাতা তাকে সহ্যগুণ শিখিয়েছে। সুজাতা বুঝতে পেরেছে সর্বংসহা হবার সাধনাই সবচেয়ে বড় সাধনা। এই সিদ্ধিই সর্বোত্তম সিদ্ধি।

এই নিরাসক্তি আর নিস্পৃহতার পথ তাকে চিনিয়ে দিয়েছে ধর্ম, আনুষ্ঠানিক ধর্ম।

ধর্মের কথা শুনলো দাদা ঠাট্টা করে, বউদিও ঠাট্টা করে। নন্দিতাও দাদার সঙ্গে সঙ্গে সহ অধর্মিণী হয়ে উঠেছে। তারও পুজো নেই, পার্বণ নেই, কোনরকম আচার অনুষ্ঠান সে মানে না। মা যতদিন ছিলেন প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী পুজো হত, পুঁথি পড়া হত।

> কোজাগরে পূর্ণিমা নিশি নির্মল গগন
> মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয় পবন।

মা তাকে পুঁথি পড়তে শিখিয়েছিলেন। সেই পয়ারে কত সুখস্মৃতি আজও ভেসে আসে।

কিন্তু এ বাড়িতে এখন আর সে সব কিছু হবার জো নেই। প্রশান্তবাবু আইনের বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে ধর্ম আর দর্শন নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। কিন্তু তা নিতান্তই তত্ত্বগত। আচার অনুষ্ঠান নিয়ে মাথা ঘামান না। প্রভাসও পুজোআর্চা ব্রত অনুষ্ঠান সব বন্ধ করে দিয়েছে। এসব কথায় সে হেসে বলে, 'কোন রিচুয়াল নেই, এই আমাদের একমাত্র রিচুয়াল। তোরাও নেতি নেতি করি ব্রহ্মকে জানতে চাস।'

সুজাতা লক্ষ্য করেছে এদিক থেকে তার স্বামীর সঙ্গে দাদার মিল আছে। দাদা চা সিগারেট ছাড়া অন্য কিছু ছোঁয় না, স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে মেশে না। সুজাতা জানে যে মতবাদে ঈশ্বর আর অধ্যাত্ম চিন্তাকে বাদ দিয়েছে দাদা সেই সাম্যবাদেও দীক্ষিত নয়। শুধু পুরোপুরি জড়বাদী। তারও কোন ধর্মে বিশ্বাস নেই, ধর্মানুষ্ঠান নেই। সে হিন্দু সমাজে বাস করে, কিন্তু হিন্দুধর্মের ধার ধারে না। স্বামী আর স্বামীর বন্ধুদের দেখেছে, দাদা আর দাদার বন্ধুদের দেখেছে সুজাতা। দেখতে সবাই একরকম নয়, কিন্তু মতে বিশ্বাসে চালচলনে সবাই প্রায় এক। এখনকার বুদ্ধিজীবীদের ধারাই নাকি এই। এখনকার বুদ্ধির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার কোন সম্পর্ক নেই। আছে কি নেই সুজাতা নিজে একটু যাচাই করে দেখতে চায়। নিশ্চয়ই সেটুকু সাধ্য তার আছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসবার পর নিজের চেষ্টায় সে বি-এ পাশ করেছে। এই পাশ-টাশ অবশ্য কিছুই নয়। ডিগ্রীকে সে চাকরির কাজে লাগায়নি। কর্পোরেশনের যে স্কুলে সে মাস্টারি করত সেই স্কুলেই রয়েছে। ছোট ছোট মেয়েদের আগেও যা পড়াত, এখনো তাই পড়ায়। সেই সাহিত্যপাঠ, সরল গণিত আর আদর্শ ভূবিদ্যা। কিন্তু পড়ে অন্য জিনিস, ভাবে অন্যরকম। বুদ্ধি কিছু বেড়েছে কি বাড়েনি তা সে জানে না, কিন্তু বোধের সীমা যে অনেকখানি ছাড়িয়েছে তা সুজাতা টের পায়।

প্রভাস ঠাট্টা করে বলে, নাইন্টিনথও নয়, দুলি তাই একেবারে এইটিনথ সেঞ্চুরি থেকে উঠে এসেছিস। তুই যে এই বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকের কেউ তা আর মনেই হয় না। আমি তো ভেবেই পাইনে প্রভাস দাশগুপ্তের বোন স্বামীর অত্যাচার মাথা পেতে নিয়ে শেষপর্যন্ত মালা জপ করবে আর তপতপস্যার শরণ নেবে।'

'মালা জপ আমি করিনে দাদা। আর তপ—'

'আরে ওই হল। না হয় একটু অলংকার দিয়েই বললাম। এককালে সাহিত্যটাহিত্য তো কিছু করেছি। এখনই না হয় জেলাস। মিসট্রেসের জ্বালায় কিছু পেরে উঠিনে। আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আমার বোন অন্য রকম হবে। সে পুরুষের অত্যাচারের প্রতিবাদ করবে। একবার ঘর বেঁধে যদি সুখ না হয় আর একবার ঘর বাঁধবে।'

নন্দিতা ছেলের গায়ের সোয়েটার বুনতে বুনতে স্বামীর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিল, তারপর মৃদু ধমক দিয়ে বলেছিল, 'তোমার যত অনাসৃষ্টি কথা। একবার বিয়ে হয়ে গেছে, ওকে এখন ফের কে বিয়ে করবে? তোমাদের কি সেই সমাজ? কজন পুরুষের সেই সাহস আছে শুনি? তারা বড় জোর ফষ্টি করবে, এখানে সেখানে বেড়াতে কি চা খেতে ডাকবে। কিন্তু সবাইয়ের সাক্ষাতে পরস্ত্রীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে পারে কেউ? আছে সেই স্ট্যামিনা?'

প্রভাস স্ত্রীর কথার কোন প্রতিবাদ না করে তেমনি আধা ঠাট্টার সুরে বলেছিল, 'আমার এত বন্ধুর সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিলাম। তাদের মধ্যে আইবুড়োর সংখ্যা কম ছিল না। তুইও দেখতে টেখতে খারাপ নস। তাদের কারো একজনকে ইলোপ করে নিয়ে যদি চলে গেলেও তো পারতিস। মামলা মোকদ্দমা হলে আমি তো ছিলাম।'

নন্দিতা হেসেছিল, 'বুলি, তোমার বাবা একবার তোমায় বিয়ে দিয়েছেন, সেটা সুবিধে হয়নি। তোমার দাদার আরো একবার দেওয়ার ইচ্ছে।'

প্রভাস ভ্রূ কুঁচকে বলেছিল, 'মানে তোমার ইচ্ছে নয়। তুমি লিপস্টিক পরো, আর বুলি পরে না। কিন্তু দুজনের মধ্যে আসলে কোন তফাৎ নেই। দুজনের ঠোঁটই একই কথা বলে। দুজনেই সমান রক্ষণশীলা।'

কিন্তু দাদা যতই ঠাট্টা করুক, যতই অনুকম্পার চোখে দেখুক প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি বলে তো একটা বস্তু আছে। প্রোগ্রেসিভ হব বলেই তো আর গায়ে পড়ে কারো প্রেমে পড়া যায় না। মরিয়া হয়ে বরং অনেকবার স্বামীকে খুন করতে গেছে সুজাতা কিন্তু অন্য কোন পুরুষকে ভালোবাসার কথা তার মনে হয়নি, তেমন আকাঙ্ক্ষাই জাগেনি। কাউকে দেখে মনে হয়নি এর কাছে যাই, এর কাছে গিয়ে বাস করি।

যাকে সে পেয়েছিল তাকেই প্রাণপণে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছে সুজাতা। স্বামী হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে দুঃখে, অপমানে সে যে কী করেছে আর না করেছে আজ ভাবলেও হাসি পায়। সেই দুঃসহ ক্রোধ, ঈর্ষা আর মত্ততার যুগ সে পার হয়ে এসেছে। কিন্তু যতদিন তার মধ্যে ছিল কী মর্মদাহী জ্বালাতেই না জ্বলেপুড়ে মরেছিল সুজাতা। সেই দগ্ধ দিন, দগ্ধ রাত্রি, দগ্ধ ক্ষতের স্মৃতি আজও মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ব্যভিচারী বিশ্বাসভঙ্গকারী স্বামীকে বশে আনবার জন্যে কী কান্ডই না করেছে সুজাতা। বাবার কাছে নালিশ করেছে, দাদার কাছে নালিশ করেছে, যদিও পুরুগায় ভদ্র ভাসুরদের কাছে, তাদের স্বামীর কীর্তি-কাহিনী অকপটে প্রকাশ করেছে। প্রতিবেশীর কাছে বলেছে, কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেছে। শুধু কি শোধ নেবার জন্যে? সুজাতা ভেবেছিল এইভাবেই সে স্বামীকে শোধরাতে পারবে। কঠিন, অতি কঠিন শাস্তি না দিলে এই মানুষটি ঠিক পথে

আসবে না। কিন্তু শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেই বোধ হয় সবচেয়ে বড় শাস্তি পেল সুজাতা। নিজেকেই সরে আসতে হল। তার স্বামীর রুচি বুদ্ধি ধরন ধারণ কিছুই বদলাল না। তার প্রণয়িনী তেমনি জুটতে লাগল। কখনো একজন কখনো একই সঙ্গে কয়েকজনের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা রেখেছে। তার অর্থ আছে, রূপ আছে, তার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি, গুণ-যোগ্যতাকে সে শুধু নারী বশীকরণের কাজে লাগিয়েছে। মেয়েরা তার কাছে আসবে না কেন। না এলে তার স্বামী থাকতে পারেনি। এগিয়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে নারী সম্ভোগের তার কত ধারা কত কৌশল। কারো সঙ্গে চিঠিতে, কারো সঙ্গে ফোনে, কারো সঙ্গে আলাপে, কারো সঙ্গে বেড়িয়ে, সে তার উপভোগের সাধ মিটিয়েছে। সুজাতা সব বুঝতে পারত—সব। বুঝতে পারত আর অন্তর্দাহে জ্বলত। সেই জ্বালা তাকে দিয়ে নানা কাজ করিয়েছে। বিচার বিবেচনাহীন অন্ধ নির্বোধ মূর্খ স্ত্রীলোকের মত কাজ করেছে সুজাতা আজ সে স্বীকার করে। সে তার স্বামীর অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট করেছে, বইপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে, দামী দামী ঘড়ি পেন ভেঙে চুরে ছত্রখান করে ফেলেছে, আবার সেই ভাঙা টুকরোগুলি জুড়তে বসতেও তার দেরি হয়নি। কিন্তু জোড়া শেষ পর্যন্ত লাগেনি।

অনেকের কিন্তু লাগে, অনেকে কিন্তু পারে। স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে জড়িত আছে জেনেও দিব্যি তার ঘর-সংসার করে যায়। হয়তো সুখে শান্তিতে করে না কিন্তু করে তো যায়, ছেড়ে তো আসে না। ক্রমে দুজনেরই বয়স বাড়ে, ছেলেমেয়ে হয়, ধীরে ধীরে একরকম মিটমাট বোঝাপড়া হয়ে যায়, সংসারে শান্তি আসে। কিন্তু সুজাতা সেই বয়সে এসে পৌঁছবার আগেই সব ছেড়ে চলে এল। পারল না, কিছুতেই সহ্য করতে পারল না। অনেকে পারে। সুজাতা নিজেই কতজনকে পারতে দেখেছে। কতজনের আরো কত কষ্টের কথা শুনেছে। সুজাতার দুই জা তাকে কত বুঝিয়েছে, তুই কী বোকা মেয়েরে সুজাতা। কেন অমন ছটফট করে মরিস। যতই বাইরের মেয়েদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করুক আর তো কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। সে সাহস হবে না ঠাকুরপোর। তুই যে আসনে বসে আছিস সেখান থেকে তোকে নামায় কে? তুই বরং এই সুযোগে আরো গয়নাগাটি করে নে, জিনিসপত্র, জমিজায়গা বাড়ি গাড়ি করে রাখ নিজের নামে। যে পাপ করবে সে প্রায়শ্চিত্ত করুক। যেই একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে তুই অমনি হাত পেতে বলবি টাকা দাও, গয়না দাও, গাড়ি দাও, বাড়ি দাও। হ্যাঁ, ঘুষ। ঘুষ চাইবি। ভালোবাসা না দিয়ে যাবে কোথায়। দুদিন যেতে দে সব তাকে উজাড় করে দিতেই হবে। কিন্তু তার আগে যেন নেশার ঘোরে ফতুর না হয়ে যায়। যেখানে যা আছে নিজের নামে লিখিয়ে নে। ভালো চাস তো আমাদের কথা শোন।'

শুনেছে, কিন্তু মনে রাখতে পারেনি সুজাতা। ভিতরের এক দুঃসহ জ্বালায় সব বিস্মৃত হয়েছে। স্ত্রীর আসন থেকে গৃহিণীর আসন থেকে কখন যে নেমে এসেছে নিজেও টের পায়নি সুজাতা। শেষ পর্যন্ত তাকে যেন এক রোগে ধরেছিল। মেয়ে আতঙ্কে পেয়ে বসেছিল তাকে। স্বামী যে কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বললে রাগ হত সুজাতার, বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে হেসে কথা বললে তার গায়ে জ্বালা ধরত। সহ্য করতে পারত না সুজাতা কিছুতেই সহ্য করতে পারত না সন্দেহের বিষে নিজেই সে পাগল হবার জো হয়েছিল।

বঞ্চনা প্রতারণা অপমানে লজ্জায় কী দুঃখ আর গ্লানির মধ্যে দিনগুলি তার কেটেছে আজ ভাবলে অবাক হয় সুজাতা। স্বামীর দিকে অগ্নিবর্ষী চোখে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে অকথ্য গালাগাল করতে করতে সুজাতা চীৎকার করে বলেছে, 'তুমি মরো, তুমি মরো, তুমি মরো।' শুধু

ওপর বরং তার কিছু বিমুখতাই ছিল। ও সব তো শশাঙ্কের সম্ভোগের উপকরণ, তার উপভোগের সহায়। যা শশাঙ্কের তা যেন সুজাতার নয়। রাজনীতির দিকে যাবার কোন উপলক্ষ ঘটেনি, তেমন সুযোগও আসেনি। বাবা দাদা, স্বামী তাঁদের বন্ধুরা—যাঁদের সংস্পর্শে এসেছে সুজাতা তাঁরা কেউ রাজনীতির মানুষ নন। অবলম্বন হিসাবে সুজাতা ধর্মকেই হাতের কাছে পেল আর দু হাতে তাকে তুলেও নিল।

পুজোর ছুটিতে কোর্ট বন্ধ হলে প্রশান্তবাবু প্রায়ই মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বেরোতেন। প্রভাস আর নন্দিতাও তাকে কম ডাকাডাকি করত না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যবর্তিনী কি পার্শ্ববর্তিনী না হয়ে সুজাতা বরং বুড়ো বাবার সেবা-শুশ্রূষার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠত। দাদা-বউদিরা যেতেন শিলং-এ, দার্জিলিং-এ, নৈনিতালে, ওয়ালটেয়ারে। আর বাবা তাকে নিয়ে ঘুরতেন সেই জগন্নাথের পুরী থেকে পশুপতিতে, কাশী, গয়া, মথুরা বৃন্দাবনের পথে পথে। প্রথম যৌবনে মাকে নিয়ে এই সব তীর্থে এসেছেন বাবা। প্রথম বয়স থেকেই ধর্মে মতি ছিল মার। তিনি নাকি বলতেন, 'যেখানে দেবদেবীর মন্দির আছে আমাকে সেখানে নিয়ে চল। আমি অযথা কোথাও যেতে চাইনে। শুধু দালান কোঠা পাহাড় পর্বত দেখে আমার লাভ কি। আমি ভগবানের মন্দির দেখতে চাই, তাঁর মূর্তি দেখতে চাই।'

সেই মন্দির আর মূর্তির কি অভাব আছে দেশে? ক্রোশে ক্রোশে গাঁয়ে গাঁয়ে শহরে শহরে মন্দির। নদীর ধারে ধারে পাহাড়ের কোলে কোলে পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় মন্দির। আর মন্দিরে মন্দিরে বিগ্রহ। আর তার দ্বারে দ্বারে অগণিত মানুষের ভিড়। এই গণমূর্তিই কি দেবমূর্তি? ভগবানের বাস কি একমাত্র ভক্তের হৃদয়ে? দাদা বলে, হৃদয়ে নয় উর্বর মস্তিষ্কে।

কিন্তু দাদা যাই বলুক, সুজাতা দেখেছে দাদা-বউদিদের মত অবিশ্বাসীর সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়, যাদের গোনা যায় না তারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। তারা এখনো মঠ-মন্দির মসজিদ গীর্জা আশ্রয় করে আছে। দাদা বলে, অশিক্ষার ফল, অজ্ঞানতার ফল। শিক্ষায় এই বিকার দূর হবে। যত তাড়াতাড়ি দূর হয় ততই মঙ্গল।

সুজাতা তর্ক করে না। তর্কে দাদার সঙ্গে পেরে ওঠে না বলে নয়, তর্কে তার প্রবৃত্তি হয় না। তর্কে লাভ কি, তর্কে শুধু তিক্ততা বাড়ে।

বাবার সঙ্গে অনেক তীর্থ দেখেছে সুজাতা, অনেক মন্দির আর অনেক বিগ্রহ। এতদিনে শিক্ষা হয়ে গেছে সুজাতার। সে কোন দেবতার কাছে আর কিছু চায় না। শুধু দু-চোখ ভরে চেয়ে দেখে আর ধুলোর ওপর মাথা লুটিয়ে দিয়ে বলে, 'আমাকে না চাইতে শেখাও।'

মার স্মৃতি বাবার বুকের মধ্যে। তীর্থের পথে পথে বাবার মুখে তা রূপকথার মত শোনায়। কলকাতায় যে মানুষ টাকা ছাড়া আর কিছু চেনেন না, শুধু মক্কেলের গাড়ির শব্দে উৎকর্ণ হয়ে থাকেন তিনি তীর্থস্থানে এলে অন্য মানুষ হয়ে যান। শাস্ত্রের কথা বলেন, পুরাণের কথা বলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার মায়ের কথা বলেন যা চির নতুন। মাকে নিয়ে কবে কোন ধর্মশালায় উঠেছিলেন, কবে কোন হনুমান তাঁর হাত থেকে পুজোর ফুলফল কেড়ে নিয়েছিল সেই সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ গল্প। তবু বাবার মুখে তা কী মধুর আর অপরূপই না হয়ে ওঠে। শুনতে শুনতে সুজাতার মন কেমন করতে থাকে। শুধু কি মার জন্যে? শুধু কি বিচ্ছেদকাতর স্মৃতিভারাতুর বাবার জন্যে? আরো একটি দম্পতীকে কি পাশাপাশি দেখে না, যারা কিছুতেই পাশাপাশি হতে পারল না, কাছাকাছি হতে পারল না?

ধর্মের দিকে যাঁরা সুজাতার মনকে টেনে এনেছেন বাবা তাঁদের একজন। বোধ হয় সবচেয়ে নিকটতম গুরু।

তবু বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথায় তিনিই সবচেয়ে বেশী বাধা দিলেন, 'কেন যাবি? তুই যা করতে চাস এখানে থেকে কি তা করা যায় না?'

'এখানে আমার মন টিকছে না বাবা।'

'কী নিষ্ঠুর মেয়ে তুই। আমাদের ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে থাকলে মন টিকবে? স্থির হয়ে থাকতে পারবি?'

এর জবাব দেওয়া সহজ নয়।

সুজাতা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তো একেবারে ছেড়ে যাচ্ছিনে বাবা। ওঁরা আমাকে সন্ন্যাস দেবেন না বাবা।'

প্রশান্তবাবু বললেন, 'বুদ্ধিমানের কাজই করবেন। তবে যাচ্ছিস কেন? কী করবি সেখানে গিয়ে?'

'এখানে যা করছি সেখানেও তাই করব। ওঁদের একটা স্কুল আছে। সেই স্কুলে পড়াব। আর ওঁদের সঙ্গে থাকব। শুধু মেয়েরাই সেখানে থাকে বাবা।'

'কিন্তু মেয়েদেরও ভিড়ও তো ভিড়। তুই পারবি ওই ভিড়ের মধ্যে থাকতে?'

'পারব বাবা।'

'কিন্তু আমি যে পারব না।'

বাবাই সবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়ে উঠলেন সুজাতার।

(ক্রমশ)

ভারতের অর্থনীতি

কলকাতা বন্দর

পূর্ব ভারতে শিল্পের বিকাশ তথা সারা দেশের বৈষয়িক উন্নয়নে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব কম নয়। ভারতের মোট আমদানী পণ্যের শতকরা ২৫ ভাগ ও রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৪০ ভাগের বেশী কলকাতা বন্দর দিয়ে আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। ১৯৬১-৬২ সালে কলকাতার শুল্ক অঞ্চলে আমদানী কর থেকে ৫৮ কোটি ৩০ লক্ষ, রপ্তানি শুল্ক থেকে ৭ কোটি ২০ লক্ষ এবং আবগারি থেকে ৭৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আয় করা হয়। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের প্রধান বন্দরগুলিতে মোট যে ৬,৬৮২টি জাহাজ এসেছিল তার ভিতর থেকে কলকাতা বন্দরে প্রবেশ করেছে ১২৩.৬৬ লক্ষ টনের ১,৭৮৬টি জাহাজ। [illegible] সালে ২০০ কোটি টাকা মূল্যের চা, পাট ও [illegible] বিদেশে রপ্তানি করে এখান থেকেই দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের [illegible] ভাগ উপার্জন করা হয়।

কলকাতা বন্দর যেমন তার পার্শ্ববর্তী সমগ্র অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করে থাকে তেমনি ঐ অঞ্চলের শিল্প ব্যবসায়ের উপর বন্দরটি নির্ভরশীল। কিন্তু কলকাতা বন্দরের পাট-শিল্প ছাড়া খুব কমই অন্য শিল্প বন্দরটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এর তাৎপর্য হচ্ছে কলকাতা বন্দরের উন্নয়ন, কোনো বিশেষ শিল্পের বিকাশ নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতের বৈষয়িক কর্ম ও রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের সাথে জড়িত। সেই রকম, ঐ বন্দরের উন্নতি না করলে বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলের আর্থিক ব্যবস্থা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে যাবে।

ইদানীং কয়েক বছর ধরে পলি জমে হুগলী নদীর গভীরতা নষ্ট হওয়ায় কলকাতা বন্দরের কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে। নদীটিকে পরিষ্কার ও নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য বিস্তৃত ব্যবস্থা করা হয়েছে; কিন্তু তাতে অবনতি রোধ হয়েছে মাত্র, সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হয়নি।

হুগলী নদীতে ক্রমে পলিমাটি জমে ওঠায় কলকাতা বন্দরের শ্বাসরুদ্ধ হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। ঐ বন্দরে যেসব জাহাজ প্রবেশ করে বা ছেড়ে চলে যায় সেগুলোর বোঝা কমিয়ে দিতে হলে এবং খাদ্যশস্য, কয়লা ও খনিজ ধাতু আদান-প্রদান করতে কলকাতার দক্ষিণে হলদিয়ায় একটা উপবন্দর স্থাপন করা দরকার। কলকাতা বন্দরে এখন যেসব সুযোগ সুবিধা আছে, পরিপূরক বন্দর নির্মাণ করলে সেগুলোর সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। কালক্রমে হলদিয়ার শিল্পোন্নয়নের একটা দৃঢ় ভিত্তি রচনা করা যাবে যাতে নতুন কর্মপ্রার্থীদের কলকাতার বদলে ঐ অঞ্চলে কাজের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে কলকাতার উপর চাপ কমিয়ে আনা যাবে। বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাই হলদিয়ার উন্নয়নের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। (তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা শেষ হবার আগেই যাতে হলদিয়া বন্দর অন্ততঃ আংশিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে উদ্দেশ্যে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করবার জন্য ১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাংক যে সুপারিশ করেছিল তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।)

পলিমাটি জমে হুগলী নদী অনেক আগেই বুজে যাওয়ায় কলকাতা বন্দরের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। নদীর অবনতির দরুন অতিরিক্ত যেসব খরচ করতে

হচ্ছে সেগুলো হলো : (১) নদী নাব্যতা রাখার জন্য বাড়তি ব্যয়; (২) বন্দরের পণ্য আদান-প্রদানের জন্য আগের চাইতে বেশী সংখ্যায় জাহাজের দরকার হয়েছে বলে অতিরিক্ত যে খরচ লাগছে; (৩) জোয়ারের আশায় বন্দরে জাহাজকে অপেক্ষা করতে বাড়তি যা সময় লাগে; (৪) বোঝা হালকা করবার জন্য অনেক জায়গায় জাহাজের থামার খরচ; (৫) কত জায়গায় অপ্রত্যাশিতভাবে দেরি হয়ে যাওয়া। অন্যান্য বন্দরে পণ্য না পাওয়া বা আগে নির্ধারিত কার্যসূচী পালন না করতে পারার দরুন খরচ; (৬) দ্রব্য আদান-প্রদানে আগের চেয়ে বেশী খরচ পড়ায় রপ্তানী পণ্য ও আমদানী দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি; প্রথমোক্ত কারণে রপ্তানী বাণিজ্যের হ্রাস।

১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ সালের ভেতর কয়েকটি ঋতুতে প্রতি বছর প্রায় দু ফুট করে হুগলী নদীর নাব্যতা কমে গেছে। নাব্যতা এক ইঞ্চি হ্রাস পেলে জাহাজকে যেহেতু ৫০ থেকে ৬০ টন বোঝা কমিয়ে দিতে হয়, ১৯৫৫ সাল থেকে হুগলীর ক্রমিক অবনতির ফলে ঐ নদীতে জাহাজের মাল বইবার ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি।

নদীর পলি পরিষ্কার করবার বাৎসরিক খরচ বেড়ে গিয়ে ১৯৫৪-৫৫ সালে ৫৩ লক্ষ টাকা থেকে ১৯৬০-৬১ সালে ৮৮ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। জিনিসপত্রের সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি ছাড়াও ঐ ৩৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য নদীর অবনতিই প্রধানত দায়ী।

নদী ব্যবহার করার জন্য যে মূল্য আদায় করা হয় তা পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যে ২৪০ লক্ষ থেকে ৩৫২ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ১১২ লক্ষ

টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই টাকা হুগলীর নাব্যতা বাজায় রাখা ও তার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, ঐ পরিমাণ অর্থ থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা সরাসরি খরচ লেগেছে নদীর পলি পরিষ্কার করতে। বাকী ৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অন্তত খানিকটার জন্য নদীর মজে যাওয়া পরোক্ষভাবে দায়ী।

যেসব মাল কলকাতা বন্দর দিয়ে যায় তার মধ্যে প্রধান একটা দ্রব্য হচ্ছে কয়লা। ১৯৬০-৬১ সালে ১৪ লক্ষ টন কয়লা রপ্তানি করা হয়। ভবিষ্যতে ২০ লক্ষ টন কলকাতা থেকে সমুদ্রপথে ভারতের অন্য কয়েকটি স্থানে পাঠাবার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৯৫৬-৫৭ সালে কলকাতা থেকে ২০ লক্ষ টন কয়লা পাঠাবার জন্য মোট ৩২৫ বার জাহাজ ছেড়েছিল। ঐ বছরের পর নদীর অবনতির কারণে প্রত্যেক জাহাজের মাল বইবার ক্ষমতা যদি শতকরা মাত্র ১০ ভাগ কমেছে ধরা যায়, তাহলে একই পরিমাণ কয়লা পাঠাতে আরো ৩৩টি জাহাজ দরকার হবে। কলকাতা বন্দরে এসে ঘুরে যেতে গড়ে ১৫দিন এবং একটি জাহাজ চালু রাখতে প্রতিদিন ৬,০০০ টাকা লাগে বলে পূর্বোক্ত কয়লা প্রেরণ করতে সবসুদ্ধ ৩০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত খরচ পড়ে যাবে। বন্দরে এসে ঘুরে যাওয়ার সময় যদি চেষ্টা করে কমিয়ে অর্ধেক অর্থাৎ ৭½ দিন করা যায় তবুও বাড়তি খরচ লাগবে ১৫ লক্ষ টাকার মতো।

যেসব মাল রপ্তানি করা হয়ে থাকে তার মধ্যে পরিমাণের দিক থেকে প্রধান হচ্ছে পাট ও চা; আমদানির ভেতর যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য। ১৯৫৭-৫৮ সালে কলকাতা বন্দরে ৩৯ লক্ষ টন আমদানী মাল নিয়ে ১,০৬২টি জাহাজ প্রবেশ করে; ২৬ লক্ষ টন রপ্তানি নিয়ে ৮২৬টি জাহাজ বন্দর ছেড়ে যায়। ১৯৬০-৬১ সালে জাহাজ করে সামান্য পরিমাণ মাল নিয়ে আসা ও পাঠানোর জন্য ১,২৬৮ বার বন্দরে প্রবেশ ও ১,০৫৩ বার বন্দর ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজন হতো। অতিরিক্ত ঐ খরচের বেশীর ভাগের কারণ আর কিছু নয়, হুগলী নদীর অবনতি। জাহাজ চালু রাখতে দৈনিক ৬,০০০ থেকে ৮,০০০ টাকা এবং বন্দরে এসে ঘুরে যেতে প্রায় ১০ দিন লেগে যাওয়ায় পূর্বোক্ত চারটি দ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করাতে বাড়তি খরচ পড়তো বছরে সবসুদ্ধ ৭০ থেকে ৮০ লক্ষ টাকার মতো। হিসাবের একই ভিত্তিতে পেট্রোলের জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হতো।

নদী আস্তে আস্তে বুজে যাওয়ায় একই পরিমাণের মাল বইতে বেশি সংখ্যায় যা জাহাজ লাগবে তার দরুন প্রতি বছর মোট প্রায় ১০৮ লক্ষ টাকা খরচ হবে। আগে যা ধরা হয়েছে সেই পলি পরিষ্কার করবার বাৎসরিক ব্যয় বাবত ৩০ লক্ষ টাকা ঐ পরিমাণ টাকার সঙ্গে যোগ করলে নদীর অবনতির জন্য বাড়তি মোট খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৮ বা মোটামুটি ১৪০ লক্ষ টাকায়। কলকাতা বন্দরের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশেষত ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে যদি ঐ খরচ এড়ানো যায় তবে তা সবদিক থেকে যুক্তি-সঙ্গত হবে সন্দেহ নেই। কলকাতা বন্দরের পরিপূরক হিসাবে ঐ নগর থেকে ৭০ মাইল দূরে হলদিয়ায় একটা গভীর সমুদ্রের বন্দর গড়ে তোলাও সমান জরুরী।

কলকাতা মেট্রোপলিটান পরিকল্পনা সংস্থা হিসাব করে দেখিয়েছে যে, আগামী পঁচিশ বছরে কলকাতা মেট্রোপলিটান জেলা অর্থাৎ প্রায় ৪০০ বর্গমাইল ব্যাপী হুগলী নদীর দুপাশের শহর অঞ্চলে শতকরা অন্তত ৫০ ভাগ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হবে। বছরে শতকরা ৬ হারে জনবহুল এই জেলায় আর্থিক উন্নয়ন করতে গেলে, এমন কি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের এখনকার মান বজায় রাখতে হলে সমগ্র অঞ্চলের পানীয় জল, রাস্তাঘাট, যানবাহন, জল নিষ্কাশন, স্বাস্থ্য-বিধান প্রভৃতি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। কলকাতা বন্দরকেও প্রতি বছর আরো ৪৫ লক্ষ টন দ্রব্য আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত করতে হবে। এ সমস্ত কারণে কলকাতা বন্দরের দ্রুত উন্নয়ন বিশেষ মনোযোগ ও প্রচেষ্টার অপেক্ষা রাখে।

শান্তিকুমার ঘোষ

জনসন অ্যাণ্ড জনসন-এর
সব চেয়ে মোলায়েম, সব চেয়ে মিহি বেবী পাউডার
শিশুর পক্ষে সেরা আপনার পক্ষেও সেরা
baby powder
শিশুদের উপযোগী সেরা প্রসাধন তৈরিতে ৭৫ বছরেরও বেশী অভিজ্ঞ
জনসন্স-এর
শিশুদের উপযোগী যাবতীয় প্রসাধন সামগ্রী পাবেন:
বেবী সোপ—বেবী ক্রীম—বেবী অয়েল—বেবী লোশন
জনসন অ্যাণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
০ ট্রেডমার্ক

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

বাদশানামায় সঙ্গীত

শাজাহানের আমলের নানা ঐতিহাসিক ঘটনা লিখে রেখে গেছেন আবদুল হামিদ লাহোরী তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ বাদশানামায়। তখনকার সঙ্গীতের কথা অবশ্য তিনি খুব কমই বলেছেন। মাত্র একটি অনুচ্ছেদে সেকালকার সঙ্গীতের সামান্য বর্ণনা তিনি করেছেন একটি ঘটনা উপলক্ষে। এই বর্ণনা-টুকুই এযুগে আমাদের কাছে খুব মূল্যবান প্রামাণিক তথ্য। এই কারণেই এই অনুচ্ছেদটির সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। এর সঙ্গে কিছু টীকা টিপ্পনীও যোজিত হল।

শাজাহান বাদশাহী তখতে বসবার এক বছর পরে তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কলাবন্তকে সম্মানিত করেন। ইনি হচ্ছেন লাল খাঁ। এঁর উল্লেখ আগের প্রবন্ধে করেছি। লাহোরী বলছেন—এই সময় লাল খাঁ কলাবন্ত ছিলেন হিন্দুস্তানী গায়কদের পুরোভাগে। বাদশা তাঁকে খেলাতের সঙ্গে খেতাব দিলেন—গুণসমুদ্র। ইনি তানসেনের পুত্র বিলাস খাঁর জামাতা। এঁর সময় উত্তীর্ণপ্রায় হয়েছে। এঁর শিষ্যেরা এঁর গাইবার রীতিনীতি চমৎকারভাবে আয়ত্ত করেছেন। ধ্রুপদ গানে এঁর মত দক্ষ আর কেউ নেই। এঁর চার পুত্র বর্তমান। লাল খাঁ যখন গান করেন তখন এঁরা তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন খুশহাল আর বিশ্রাম। পারদর্শিতার দিক থেকে এঁরা প্রায় সকলেই সমান। তবে বর্তমানে সঙ্গীতে সর্বদিক থেকে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি হচ্ছেন জগন্নাথ মহাকবিরায়।

পরবর্তীকালের উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, লাল খাঁ আশি থেকে নব্বই বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আর, জগন্নাথ বেঁচে ছিলেন প্রায় একশ বছর। দুজনেই জাহাঙ্গীরের আমলের গায়ক। জগন্নাথ নটরাগে অসামান্য পারদর্শী ছিলেন। স্বয়ং তানসেন নটরাগে এঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন,—বেঁচে থাকলে এই আমার আসন দখল করবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল। মহাকবিরায় জগন্নাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তাঁর ব্যক্তিত্ব ভাস্বর ছিল। জগন্নাথের কিছু পদ এখনো পাওয়া যায়। নানা কারণে এঁর ঘরানা তৈরি হয়নি তাই আজকের সঙ্গীতে তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত। শাজাহানের রাজত্বের প্রথম দিকে এই দুই কৃতী আচার্যের জীবনাবসান হয়।

এর পরে লাহোরী জানাচ্ছেন যে, যদিও আগেকার দিনে হিন্দুস্তানের গায়কেরা গীত, ছন্দ ধারু স্তোত্র (আস্তৎ)—এইসব নানা ধরনের সঙ্গীতে দক্ষ ছিলেন বর্তমানে এসব গানের চলন কর্ণাটকেই দেখা যায়। এখানকার লোকেরা দক্ষিণী রীতিতে গাওয়া এসব গান বুঝতে পারে না বলে তাদের আর মর্মগ্রহণ করতে পারে না। নিজামুদ্দীন আউলিয়ার শিষ্য আমীর খুসরো ছিলেন দিল্লীর অধিবাসী। তিনি চার রকমের গান গাইতেন। একটি হচ্ছে কওল। এটি "গীত"-এর আদর্শেই নিবদ্ধ। তবে এর সঙ্গে আরবী আর ফার্সী কবিতা নিপুণভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের গান একটি তালে গাওয়া হয় আবার বিভিন্ন তালে, এমনকি চার রকমের তালেও গাইতে দেখা যায়। আর এক ধরনের গানের নাম ফার্সী। এটি মূলত তারানা কিন্তু সঙ্গে ফার্সী কবিতাও থাকে।

...তে তালফের্ নেই। তারানা নামক গানে কাব্যাংশ নেই। এটিও কেবলমাত্র একরকমের তালেই পাওয়া হয়। খুসরো আর একরকমের গান রচনা করেছিলেন যা হিন্দুস্তানী ভাষায় রচিত। এই পর্যায়ের গানকে খিয়াল বলা হয়। আমীর নিজেও একবার খিয়াল গেয়েছিলেন।

মুঘল যুগের সঙ্গীত সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, কওল গোপাল নায়কের সঙ্গে দ্বন্দ্বে গীতের প্রতিপক্ষ হিসাবে রচিত হয়েছিল। ছন্দজাতীয় গান লাহোর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এটি প্রেমসঙ্গীত। তারানা জাতীয় গান ভারতে পূর্বে থেকে প্রচলিত ছিল এমন প্রমাণ আছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অর্থহীন শব্দে রচিত গানের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। আমীর খুসরো খেয়াল রচনা করেছিলেন এটা সত্যও হতে পারে। কারণ ব্যঙ্গপ্রবণ ভারতীয় তুর্কী কবির পক্ষে হিন্দুস্তানের ভাষা নিয়ে রসিকতা করা খুবই স্বাভাবিক। খুসরো হয়ত ভাবতে পারেন নি তামাসা করে তিনি যে গান গেয়েছিলেন

সজল রায় ও সুবীর সেন ঃ

গত ১৭ই থেকে ২৬শে মে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ দুজন তরুণ শিল্পী সজল রায় ও সুবীর সেনের ছবির একত্রে একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। সব সমেত ১৬ খানি ছবি নিয়ে এঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন, সবগুলিই তেলরঙা এবং সবগুলিই আধুনিক রীতিতে আঁকা।

আধুনিক হলেও শিল্পী দুজনের বৈশিষ্ট্য আছে। অন্য সব আধুনিকদের মত এঁরা দর্শকদের বোকা বানিয়ে নিজেদের আধুনিকত্ব জাহির করতে চান না। এঁদের ছবিতে exaggeration এবং distrotion আছে সত্যিকথা, কিন্তু তা একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটায় নি। এঁদের যে ক্ষমতা আছে তা দেখলেই বোঝা যায়। দুজনের কাজের মধ্যে প্রকৃতিগত এবং টেকনিকের দিক দিয়ে পার্থক্য আছে।

সজল রায় পাশ্চাত্যের কিউবিজমের দ্বারা খুব বেশী প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর রচনায় বলিষ্ঠতার ছাপ আছে কিন্তু সেই সংগে আর একটি যা জিনিস আছে তা দেখে আমরা শঙ্কিত হয়েছি—সেটি হচ্ছে ভয়ানক রসের আধিক্য। এর একমাত্র ব্যতিক্রম তাঁর ৮নং ছবিখানি। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের জীবন অবলম্বনে আঁকা তাঁর তিনখানি ছবি খুবই জোরালো; কিন্তু তাঁকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এ-জাতীয় ছবির আবেদন সাময়িক, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কমে গেলেই এগুলির মূল্য কমে আসবে। বীভৎস রসের প্রতি তাঁর অত্যধিক অনুরাগ ক্ষেত্রবিশেষে রুচিবিকৃতি ঘটিয়েছে যেমন তাঁর Dolorous Spring। সজলবাবুর কাছে সেজন্য আমাদের অনুরোধ তিনি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিন, জীবনকে পূর্ণভাবে দেখতে শিখুন। তাঁর ক্ষমতা আছে এবং সে ক্ষমতাকে তিনি সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগান।

সার্কাস শিল্পী ঃ সুবীর সেন

অপরদিকে সুবীর সেন টেকনিকের ব্যাপারে যথেষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। কিউবিজমের গোঁড়ামীকে তিনি অযথা প্রশ্রয় দেন নি, তাঁর ছবিতে, সেজন্য রেখা প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। [illegible] এই জাতীয় ছবির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য Dancing Baul, Circus এবং Well done। বাউল ছবিতে [illegible] অন্য দুটি ছবিতে [illegible] (laut) [illegible] উঠেছে উত্তেজনাময় মুহূর্তের রূপ দেবার জন্য। বর্ণপ্রয়োগেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আরো ভাল কাজ দেখতে পাব আশা রাখি।

"ভ্রম সংশোধন"

গত সপ্তাহে ছাপার ভুলের জন্য আমাদের বক্তব্য এক জায়গায় সুপরিস্ফুট হয় নি। সমালোচনার দ্বিতীয় স্তম্ভের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের পঙক্তিগুলি এইভাবে পড়তে হবে ঃ 'বর্তমান প্রদর্শনীতে যে কটি সত্যকারের উৎকৃষ্ট কাজ ছিল সেগুলি হ'ল গোপাল ঘোষের দুটি ল্যান্ডস্কেপ, সুধীর খাস্তগীরের 'কবি' ও বসন্ত (দ্বিতীয়টিই আমাদের বেশী ভাল লেগেছে), শ্যামলী টনের পল্লী প্রেমিকা,......'

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

ডস্টয়েভস্কির নামে গল্প

STANISLAW DYGAT নামক জনৈক পোলিশ লেখক ডস্টয়েভস্কি সম্পর্কে একটি গল্প লিখেছিলেন। তাঁর লেখাটি সম্ভবত খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, নয়ত তার তর্জমা পড়ার সৌভাগ্য হবার কথা নয়। DYGAT-এর খ্যাতি ঔপন্যাসিক হিসেবে, তবু তাঁর কৌতুকপ্রদ রচনাগুলিও নাকি পোলিশ-পাঠকের খুব প্রিয়। ওআরশ-এর রেডিয়ো, ফিল্ম এবং টেলিভিসন জগতে ইনি এখনও কাজ করেন; বয়স বছর পঞ্চাশ। প্রসঙ্গত আমরা তাঁর গল্পটির কথায় আসি।

গল্পের নাম : 'ডস্টয়েভস্কির জীবনের একটি অজ্ঞাত পৃষ্ঠা' গল্পটি খুবই ছোট এবং কৌতুকপ্রদ; কিন্তু গল্পের মধ্যে একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে।

একদিন রাত্রে ডস্টয়েভস্কি মোমের আলোয় পিঠ নুইয়ে বসে লিখছেন এমন সময় বাইরে কে দরজা নাড়ল। ডস্টয়েভস্কির চাকর-বাকর ছিল না, সাড়া দিয়ে দেখে আসবে এমন কেউ নেই। অগত্যা তিনিই সাড়া দিলেন : "ভেতরে আসুন।।"

আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। অদ্ভুত এক আলো এল ঘরে, আলোর সাথে জনৈক আগন্তুক। ভদ্রলোককে দেখতে মাঝারি গড়নের, মুখে দাড়ি, গায়ে একটা কালো কোট, পরনে ডুরে প্যান্ট। ওঁর গায়ের কালো কোটটা তেমন কিছু নতুন ধরনের নয়, তবে ওই কোটের আড়ালে যদি ডানা থাকে তবে অবশ্য অবাক হবারই কথা। এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছিল, ডানা দুটো দিয়েই আশ্চর্য আলো আসছে. আলো এসে ঘর ভরিয়ে দিয়েছে। ডস্টয়েভস্কির জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছিল, এ জগতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তিনি এই রকম অদ্ভুত এক আগন্তুককে অত রাত্রে নিজের ঘরে দেখেও অবাক হলেন না, এমন ভাব করলেন যেন তিনি আশ্চর্যজনক কিছুই দেখছেন না, হামেশাই এ-সব দেখে থাকেন।

'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট'-এর লেখক খুব সহজ গলায় বললেন, "বসুন। তা বলুন, আমি আপনার কোন উপকারে লাগতে পারি?"

আগন্তুক বোধ হয় মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন। ডস্টয়েভস্কি তাঁকে কি সাধারণ লোক ভেবে নিয়েছে? অনেকটা নাচ-শেখানো-মাস্টারের ভঙ্গিতে তিনি ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

"আমি—" আগন্তুক বললেন, "গ্যাব্রিয়েল, ঈশ্বরের দূত।...স্বর্গমর্ত্যের অধীশ্বরের দূত হয়ে আমি এখানে এসেছি।" বলতে বলতে গ্যাব্রিয়েলের ভাবভঙ্গী বেশ সহজ হয়ে গেল, মজা করে একটু চোখ টিপলেন, বললেন, "বুড়ো কর্তা তোমার সংগে একটু দেখা করতে চান, আমায় বলেছেন তোমায় নিয়ে যেতে।"

ডস্টয়েভস্কি উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের জামা ঠিক করে নিলেন; বললেন, "চলুন, আমি তৈরী।"

ঈশ্বরবুড়ো ডস্টয়েভস্কিকে দেখে নিজের দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন আস্তে আস্তে। বুদ্ধ যেন বেশ খানিকটা অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন। অস্বস্তি কাটাবার জন্যে যথাসাধ্য সহৃদয় গলায়, পিতার মতন স্নেহদ্রব স্বরে কথা বলতে লাগলেন। শেষে বললেন, "ডস্টয়েভস্কি, বৎস—, আমি তোমায় কেন ডেকেছি তাহলে বলি। আমরা তোমার প্রতিভার পরিণতি খুব নজর করে লক্ষ করছি...।"

ডস্টয়েভস্কি নীরবে মাথা নুইয়ে ধন্যবাদ জানালেন।

ঈশ্বর বললেন, "শুধু—, মানে কি করে যে কথাটা বলা যায় ভাবছি। আমাদের মনে হয়, তুমি আরও ভাল লেখা...মানে তোমার প্রতিভার আরও সুন্দর প্রকাশ সম্ভব...না, না, কিছু মনে করো না,...আমি বলছিলাম কি, বুঝলে ডস্টয়েভস্কি, যে জীবন আমি সৃষ্টি করেছি তুমি তার অন্ধকার দিকটাই কেন দেখছ; তুমি আমার সফলতাকে যেন উপেক্ষা করে যাচ্ছ। বৎস, আমি ছ' দিনে ঘোড়ের মতন কাজ করে এই সৃষ্টির কাজটি সেরেছি, তার মধ্যে এখানে-ওখানে কিছু খুঁতটুঁত......"

ঈশ্বর তারপর ডস্টয়েভস্কিকে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর বক্তব্য বোঝালেন। লেখকের বিবেকের কাছে তিনি আবেদন করলেন, বিশ্বাস এবং আশার মূল্য কোথায় তা বোঝালেন, বললেন—যে বাস্তব তিনি সৃষ্টি করেছেন সেখানে আনন্দ আছে, হালকা মনের সুখ, চিত্তজাত সুখও আছে; সরল ও স্নিগ্ধ, নির্মল ভালবাসা আছে।

ডস্টয়েভস্কি বাড়ি ফিরে এসে ঈশ্বরের সংগে যে-সব কথাবার্তা হয়েছিল গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন। ঈশ্বরের জন্যে তাঁর দুঃখ হচ্ছিল। বেচারী ঈশ্বর! সাধারণের মঙ্গলের যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন,-পারছেন না একা একা। তাঁকে সাহায্য করা দরকার। কেনই বা করব না? আমি করব। আমি তাঁর জন্যে সরল, নির্মল, অকলুষ ভালবাসার, বিশ্বাসের একটা উপন্যাস লিখব।

ডস্টয়েভস্কি এরপর যে উপন্যাস লিখতে বসলেন তার নাম 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ।'

যোগেন্দ্রনাথ

গত ৩১শে মে রবিবার খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৮২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। যোগেন্দ্রনাথ "শিশুভারতী"র দশ খণ্ড রচিত শিশু বিশ্বকোষ। সম্পাদক হিসাবে সাধারণের কাছে অতি পরিচিত হলেও তাঁর সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে রচিত বহু গ্রন্থ সুধী-জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' অথবা 'বঙ্গের মহিলা কবি' প্রভৃতি গ্রন্থের কথা হয়ত পুরাতন পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে।

যোগেন্দ্রনাথের পরলোকগমনে আমরা বেদনা অনুভব করছি। তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

ইংরেজী শব্দের বাংলা উচ্চারণ

মাননীয় বিদুর,

ছেলেবেলায় First Book পড়ার সময় থেকে এই ধারণা ছিল, ইংরেজী শব্দের মধ্যে 'ai' পাশাপাশি থাকলে উচ্চারণ a হয়। যেমন Rail, Mail ইত্যাদি। সাম্প্রতিক-বাংলা সাহিত্য কিন্তু এ-ধারণা পাল্টাতে সাধ্য করছে। রেল, ট্রেন ইত্যাদি শব্দকে রেইল, ট্রেইন ইত্যাদিরূপে উচ্চারণের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। জানি না কেন। Chambers Dictionary Rail, Train ইত্যাদির উচ্চারণ আছে Rāl Trān প্রভৃতি। 'Ai'-এর উচ্চারণ ā হয়, তার প্রমাণস্বরূপ Oxford Dictionary বলছেন ai=ā (Pain)।

সম্প্রতি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'উর্ণনাভ' পড়লাম। সেখানে এর চেয়েও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। Cake, যাকে আমরা 'কেক' শুনতে অভ্যস্ত, Rate শব্দে আমরা 'রেট' শুনেই এসেছি, দেখলাম 'কেইক, রেইট'রূপে। "থার্ড রেইট কবিতা" (পৃষ্ঠা ৬২)। Chambers ও Oxford Dictionary-তে যথাক্রমে Cake ও Rate শব্দের উচ্চারণ Cāke ও Rāte শব্দের এই বিকৃত উচ্চারণের পিছনে যুক্তি আছে কি না, জানি না, তবে অভিধানে যা পেয়েছি, জানালাম।

মীরা ঘোষ
দিল্লি

পুস্তক পরিচয়

প্রাচীন ইতিহাস : প্রাচ্য সংস্কৃতির গবেষণা

প্রাচীন প্যালেস্টাইন। শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ছয় টাকা।

ইতিহাস-রসিক, বাঙালী বিদগ্ধ পাঠকের কাছে শচীন্দ্রনাথের নতুন করে পরিচয় দেবার সম্ভবত প্রয়োজন নেই, কারণ ইতিমধ্যেই স্বনামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সুবিশাল প্রাচ্যভূমির সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধানে তাঁর নিষ্ঠা ও উদ্যম অকুণ্ঠভাবে প্রশংসনীয়। ইতিপূর্বে প্রাচীন ইরাক প্রাচীন মিশর এবং মহাচীনের ইতিকথা—তাঁর এই তিনখানি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, প্রাচীন প্যালেস্টাইন তাঁর সেই প্রাচ্য-গবেষণার নবতম সংযোজন। আলোচ্য গ্রন্থখানি পূর্বোক্ত গ্রন্থ তিনখানির শেষ দুটির ধারাবাহিক পরিশিষ্ট বিশেষ। পশ্চিম প্রাচ্যভূমির সুপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মানচিত্র যেন সম্পূর্ণ হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থখানিকে নিয়ে। তবে বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য এবং আয়োজন এক অর্থে স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। প্রায় তিন হাজার বছর ধরে আত্মরক্ষনার্থে ভাসমান, সঞ্চরণশীল যাযাবর ইহুদি সম্প্রদায় ইতিহাসে এক বেদনাদায়ক ও বিস্ময়কর জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত। স্থির, জাতির চিরস্বতন্ত্র ও রহস্যময় [illegible]ইতিহাস ও জীবনীশক্তি কি করে প্রাচীন প্যালেস্টাইনের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে তারই মূল্যায়ন এই গ্রন্থের উপজীব্য। [illegible] স্থানকালপাত্র নির্দিষ্ট নিরীক্ষণের [illegible] আলোচ্য গ্রন্থটি প্রাচ্য সংস্কৃতির [illegible] বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র স্বাদ এনে দিয়েছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক আদিমযুগের ভূমিকা থেকে শুরু করে সমাজ ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারাকে অনুসরণ করে, অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও অভ্যুত্থানের পঞ্জিকা উপস্থাপিত করে তিনি সাহিত্য ও ধর্মনীতি এবং জীবনের মূল্যবোধে এসে থেমেছেন—প্রবাসী ইহুদিগণের বাণিজ্য-অভিযান, কিংবদন্তী, তার ধর্মতত্ত্ব দর্শনচেতনা, স্বাধীনতার স্বপ্ন, তার 'সাম' বা সলুমোর' প্রজ্ঞা গীতিকা এবং ভারতীয় সামগাথা, বাইবেলের টেন কমেণ্ডমেণ্টস এবং মোজেসবিধি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নিকট-দূর অন্বয়ে যে আবদ্ধ এমন ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন। তাঁর আলোচনা হয়ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অসম্পূর্ণ নয়। একই সঙ্গে সত্য এবং নির্মোহ—ঐতিহাসিকের এই সার্থক দুটি লক্ষণ তাঁর লেখায় পরিস্ফুট। ইতিহাসের দৃষ্টিতে মহামূল্যবান কয়েকটি প্রাচীনতম শিলালিপির অনুচিত্র এই গ্রন্থের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। "প্রাচীন প্যালেস্টাইন" ইতিহাসের কতকগুলি রোমাঞ্চকর পৃষ্ঠার মত বাঙালী পাঠকের মনোযোগ বৃদ্ধি করবে, আশা করা যায়।

৫।১৩।৬২

কবিতা

আশ্বিনের ফেরিওলা। হরপ্রসাদ মিত্র। কবিতাপ্রকাশ। প্রাপ্তিস্থান, সিগনেট বুক শপ। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম ২·৫০।

মনে হয় দ্রুত আঙুল টিপে টিপে কেউ টাইপরাইটারে কবিতাগুলির অসংখ্য ছাপ ফেলে গিয়েছে—সমস্ত কবিতাগুলি এক বাস্তবতার ভিতর থেকে খইয়ের মত ঠিকরে ছিটকে পড়া। কবিতাগুলির গড়ন-গঠন, ধরন-ধারণ যদি [illegible] কোনো [illegible] পাঠককে খুব অনভ্যস্তভাবে কোনো এক-

কালের অমিয় চক্রবর্তীকে অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়, বিস্মিত হব না। অবশ্য ছাঁচে ফেলতে ফেলতে নিজস্ব একটা ধাঁচ যে কবির অনায়াস করায়ত্ত সে বিষয়ে আজ আর তিল মাত্র সন্দেহ নেই। গোটা কুড়িক বছর আগের কথা—যখন 'চুনী পান্নার কান্না' বা 'পৌত্তলিক' বর্তমান গ্রন্থকারকে খুব একটা উচ্চ উপাধি দিয়েছিল,—এবং তৎকালের সেই বিচ্ছুরিত রৌদ্রের এখন ফিকে বেলা— রৌদ্র বৈরাগ্য-আভায় হেলে পড়েছে। এখন যে কবিতা হবে, তার মধ্যে যদি জীবন-দর্শনের দর্পণ থাকে,—যদি অভিজ্ঞ চক্ষুর উপরে দৃশ্যস্রোত ভেসে যাবার লীলা থাকে—তবে তাকেই স্বাভাবিক বলে বিশ্বাস করা নির্ভুল হবে। বহুকাল পূর্বে হৃদয়ে একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়েছিল, তখন তাতে এমন কিছু সলিল ছিল না, এমন কিছু শোভা; এখন বহু দিন গত হওয়াতে সেখানে অগাধ সলিল, চতুর্দিকে বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া—আর এই হৃদয়ই কোন পরিপাটি কবির পরিপূর্ণ পরিচিতি।

'আশ্বিনের ফেরিওলা'র কবির এই পরিচিতি খুব বাহুল্য কথন নয়। লোহা, সিমেন্ট, স্ক্রু, কংক্রিটের নাগরিক চারিত্র তাঁর কবিতায়, বার-বারই দুপুরের নগরের কাক কা কা করে ক্রূর হাহাকারে আকাশের বুক বিদ্ধ করেছে। তবু নগরের কর্কশ গান ছাড়া যে পাহাড়, নদী, আকাশ, সমুদ্রের গান নেই এমন নয়,—ভ্রমণবিলাসী মন ক্ষুধা মেটাবার ছলে নিসর্গ দৃশ্যের ভিতরেও হারিয়ে যেতে পারে। বর্তমান কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা,—ছবি আর বোধের মিশেল, বহু আর স্বাদের রাসায়নিক মিশ্রণ। নিজেকে পড়ার উপযুক্ত 'চলচ্ছবি' 'আশ্বিনের ফেরিওয়ালা'। কোন এক ছবিওলা কার্পেটে অজস্র রঙিন ছবি ছড়িয়ে দিয়েছে পছন্দ করে তুলে নেবার জন্য, যে কোন একটি বেছে নিলেই হয়। বাংলা কবিতায় হরপ্রসাদের নিজস্ব আসনটি স্থানচ্যুত হবার কোন কারণ নেই। ফিকে চন্দনকাঠের উপর শিউলি ফুলের ছড়াছড়ি প্রচ্ছদপটটি আশ্বিন মাসের কথা মনে করায়।

৬০১।৬৩

লঘু প্রবন্ধ

চালচিত্র শ্রীকালিদাস রায়। [illegible] পাবলিশার্স। ১১, পঞ্চানন ঘোষ লেন কলিকাতা-৯। মূল্য চার টাকা।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীকালিদাস রায় সম্প্রতিক কালে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে যেসব লঘু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন তার অনেকগুলি এখানে গ্রথিত হয়েছে। "লঘু প্রবন্ধ" বললে রচনাগুলির সম্যক পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ, এগুলির ভংগী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লঘু হলেও বিষয়বস্তু মোটেই লঘু নয়, আর রচনাগুলিও সব সময় প্রবন্ধের আকৃতি নেয়নি; কোনোটা কথোপকথনের, কোনোটা বা গল্পের মতো।

সংবেদনশীল, প্রাজ্ঞ ও জীবনের বহুতর অভিজ্ঞতায় স্থিতধী লেখক বর্তমান বাংলা দেশ ও বাঙালী জীবনের দুঃখ-বেদনা, অভাব-অনটন, ফাঁকি-অসংগতি, ন্যাকামি - নির্বুদ্ধিতা, রক্ষণশীলতা-উন্নাসিকতা ইত্যাদি বিষয়ে যে-সব সরস আলোচনা করেছেন তা যেমনি সুখপাঠ্য তেমনি বেদনাবহ। চোখ থাকতেও যারা চক্ষুষ্মান নয় - দুঃখের বিষয়, আধুনিক বাংলা দেশে বেশীর ভাগ লোকই ঐ পর্যায়ের। তাদের চোখ এ লেখায় ফুটবে কিনা জানি না; তবে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন

প্রতিটি লোকই—প্রবীণ এবং অর্বাচীন—যে কবিশেখরের সঙ্গে প্রায় সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লেখকের রচনাভঙ্গীও বিষয়ানুগঃ তাঁর ব্যঙ্গের কশাঘাত এ-সকল রচনায় অনুপস্থিত হলেও তীক্ষ্ণ কৌতুকের এতে অভাব নেই। কোনো কোনো রচনার পরিমিত রসবোধ উচ্চাঙ্গের। ইংরেজী রচনাকে স্মরণ করায়। কিছু কিছু রচনার স্টাইল অবশ্য বড্ডই সাদামাঠা—ইংরেজীতে যাকে বলে পেডেস্ট্রিয়ান।

এ-সকল রচনাপাঠে শিক্ষিত ও সাক্ষর সকল বাঙালীই উপকৃত হবেন।

(৫৫।৬২)

উপন্যাস

অগ্নিজিতা। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রভাত প্রকাশন, ৩।২ কলেজ রো, কলিকাতা-১২। আড়াই টাকা।

আমার মনের কাছেই। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা পুস্তকালয়, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দু' টাকা।

একটি নিরীহ গরিব মেয়ে এবং জমিদার-পুত্রের করুণ প্রণয় কাহিনীকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এই প্রণয় কাহিনীর মধ্যে যথারীতি আর একটি মেয়ে শিখা আত্মপ্রকাশ করেছে কিন্তু সমরেশ-নন্দিতার মিলনের অন্তরায় হয়ে সে দাঁড়ায়নি, দাঁড়িয়েছেন সমরেশের পিতা দাম্ভিক জমিদার সত্যেন চ্যাটার্জি। দারিদ্র্যের যূপকাষ্ঠে নন্দিতার ভালোবাসা বলি হল। তার বিয়ে হল এমন একটি লম্পট চরিত্রের সঙ্গে যেখান থেকে একমাত্র ছেলেকে কোলে নিয়ে পালিয়ে আসতে হল শেষ পর্যন্ত। তার সমস্ত নিষ্ঠা এবং বেদনার ফলশ্রুতি এই ছেলেটি একদিন দেখা দেবে দেশ বিখ্যাত জ্ঞানতপস্বী তাপস ব্যানার্জী রূপে।

দ্বিতীয় উপন্যাসটির গল্পবস্তু একটু তরল রসের আশ্রয় নিয়েছে। "পদ্মশ্রী" বিনায়ক চ্যাটার্জি বিশ্বাস করেন তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপে জীবনের যে কোনো সমস্যারই সমাধান হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁর নির্বাচিত জামাই দেবদাস নিরীহ স্বপ্নপ্রিয় মানুষ, পিতাপুত্রীর দাপটে সে দেশান্তরী হল। তারপর তাকে ফিরিয়ে আনার হাস্যকর প্রচেষ্টায় ও সফলতায় উপন্যাসের সমাপ্তি। কাহিনী সংঘটনের মধ্যে বাস্তবতা অনেক স্থানেই বজায় থাকেনি। মূল চরিত্রের তুলনায় পার্শ্বচরিত্রগুলি কিছুটা সজীব। এই নবাগত লেখক ঘটনা চমৎকারিত্ব অপেক্ষা চরিত্রের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করলে ভবিষ্যতে উপকৃত হবেন।

৩৮০।৩৮১।৬৩

জীবনী

মিলারেপা—তিব্বতের প্রাণ গঙ্গা,—শ্রীবিভূপদ কীর্তি। লোকালিকা প্রকাশনী, ৬৪ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

মিলারেপার অলোকসামান্য জীবন-কাহিনী কয়েক বৎসর আগে কোনো পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ইহা জীবনীগ্রন্থরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাঙ্গালী সাধক শ্রীজ্ঞানঅতীশ দীপঙ্কর খ্রীষ্টীয় ১০৩৮ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে গমন করেন। এই অতীশ

মিলারেপার গুরু মারপার অন্যতম শিক্ষাদাতা নেরোপা। সেই সূত্রে মারপার মাধ্যমে মিলারেপাকে কেন্দ্র করিয়া তিব্বতের সাধনক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার বহুল প্রসার ঘটিয়াছিল। তিব্বতের এই যোগীরাজ মিলারেপার জীবন অনেক অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। ভারতবর্ষে হিন্দুদের কাছে রামায়ণ মহাভারতের যে স্থান, তিব্বতে আজ পর্যন্তও সকল শ্রেণীর জনগণের কাছে মিলারেপা-জীবনী ফেডাকুমেকাবুমের সেই স্থান অধিকার করিয়া আছে।

অসংখ্য তত্ত্ব এবং তথ্যপূর্ণ এই গ্রন্থখানি নিঃসন্দেহে লেখকের একখানি অনবদ্য কৃতি। রচনাশৈলীর প্রভাবে বইখানি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হইয়াছে। ভাষা সহজ এবং সাবলীল। গ্রন্থের প্রারম্ভে মিলারেপার ছবিখানি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

১২২।৬৩

ধর্ম

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী। স্বামী তেজসানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। মূল্য—তিন টাকা।

অমিয় বাণী। উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য—দুই টাকা।

লোকমাতা নিবেদিতা। শশি বাগচী। সুতপা প্রকাশনী, ৪-সি রজবআলি লেন, কলিকাতা-২৩। মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত "শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" অবলম্বনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী রচনা করে স্বামী তেজসানন্দ পাঠকদের সাধুবাদার্হ হলেন। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক দিব্যজীবন ক্রমপর্যায়ে সংকলিত। এই জীবনীপাঠে পাঠকরা যুগপৎ আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও আনন্দ বোধ করবেন।

৫০২।৬২

"অমিয় বাণী" নিরত পাঠ্য ধর্মগ্রন্থের মতই মূল্যবান। এই গ্রন্থে লেখক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীসারদা দেবী এবং পরমহংসদেবের ষোলজন সন্ন্যাসী শিষ্যের বাণী সংকলন করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের বাণী এই গ্রন্থে লভ্য।

২৯১।৬৩

ভগিনী নিবেদিতার একটি প্রামাণ্য জীবনী-চরিত "লোকমাতা নিবেদিতা।" ভারতের নবজাগরণে ভগিনী নিবেদিতার অমূল্য দানের কথাও নানা তথ্য ও ঘটনার ভিতর দিয়ে এই গ্রন্থে বিবৃত। নিবেদিতার জন্মশতবার্ষিকী আগতপ্রায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিবেদিতার জীবনীর সঙ্গে দেশবাসীর পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন খুব বেশী। সুললিত ভাষায় রচিত, তথ্যনিষ্ঠ এই জীবনীগ্রন্থের মূল্য সেদিক থেকে অত্যন্ত গভীর।

২৮৫।৬৩

বিবিধ

চীনের সামাজিক রূপান্তর—দু চাই ও উইনবার্গ চাই। অনুবাদক—রবীন্দ্রনাথ সরকার। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। ৬.০০।

কি বর্তমানের পটভূমিকায়, কি ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতবর্ষ তার বৃহত্তম প্রতিবেশী চীনের ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞানান্বেষণে অবহেলা করলে সেটা হবে নিদারুণ ভ্রম। চীনদেশ সম্পর্কে আমাদের দেশে ধারণা অবিশ্বাস্য-রকম স্বল্প। অসংখ্য জনসমাকীর্ণ এই, বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ইতিহাস কী স্বাক্ষর রেখে গেছে, সামাজিক রূপান্তর কোন কোন খাতে রয়েছে, চীনাদের জীবনচর্যা কী ফল প্রসব করেছে, এবং বর্তমানে মাওৎ সে-তুং-এর নয়া গণতন্ত্র তথা কম্যুনিজম-এর অভিঘাতে এই প্রাচীন দেশ ও জাতি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যৎ কী পথনির্দেশ দিতে পারে—এসকল বিষয় নিয়ে আজ আমাদের দেশে বিস্তৃত আলোচনা অবশ্য প্রয়োজন। প্রয়োজন সম্যকরূপে চীনচর্চার।

বর্তমান পুস্তক আমাদের চীনচর্চায় প্রভূত সাহায্য করবে। পুস্তকখানি চীনদেশের ভৌগোলিক পটভূমি থেকে শুরু করে সে-দেশের সামাজিক রাজনৈতিক রীতি-নীতি, চীনাদের ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সে দেশের সংস্কারবাদী ও বিপ্লববাদী আন্দোলন এবং সর্বশেষে মাওৎ সে তুংয়ী কম্যুনিজমের আস্ফালন নিয়ে আলোচনা করেছে। এ ধরনের পুস্তকের বহুল প্রচারের প্রয়োজন আছে।

৩১৩।৬০

HISTORY AND CULTURE OF BENGAL — By A. K. Sur, M.A. Chuckervertti, Chatterjee & Co. Ltd., 15, College Square, Calcutta. Price Rs. Seven.

বাঙ্গালীর ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে এ-পর্যন্ত অতি সামান্য আলোচনাই হয়েছে। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় এ বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন তা অজস্র চরিতার্থতার ব্যাপ্ত হয়নি। অনুতাপের কথা। ডক্টর সুরের প্রচেষ্টা তাই নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

তবে, দ্বিশতাধিক দুশ' পৃষ্ঠার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে একেবারে আজকের দিন পর্যন্ত বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির সম্যক পরিচয়দান শুধু অসম্ভব নয়, অবাস্তব। ডক্টর সুরের বই, তাই হ্যান্ডবুক পর্যায়েই থেকে গেছে। লেখককে অনুরোধ, তিনি একখানি বিস্তৃততর পুস্তক রচনায় ব্রতী হোন।

১০৭।৬৪

রঙ্গজগৎ

শ্রীনেহরুর স্মৃতির প্রতি

চলচ্চিত্র শিল্পমহলের শ্রদ্ধাঞ্জলি

"ভারতের মুক্তিসংগ্রামের বীর সেনাপতি, স্বাধীন ও নূতন ভারতের অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ রচয়িতা পরমপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। শোকস্তব্ধ সমগ্র জাতির সহিত একত্রে এই দিনে পশ্চিম বাংলার চলচ্চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পঞ্চদশ সহস্র নরনারী ভগিনী ইন্দিরা ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিকতম সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে। .. শিল্পকলায় ভারতের অসামান্য ঐতিহ্য নবযুগে নূতনতর আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠুক—নেহরুজীর এই ইচ্ছাই তাঁহাকে চলচ্চিত্র শিল্পের অকৃত্রিম সুহৃদ ও গুণগ্রাহী হিসাবে আমাদের নিকটের মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল। এই সেদিনও ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বোম্বাইতে তিনি যে অমর আশীর্বাণী চলচ্চিত্রশিল্পের জন্য দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের দীর্ঘকালের পাথেয় হইয়া থাকিবে।"

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এক শোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষ হতে শ্রীনেহরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয় এবং উপরোক্ত শোক-প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। শ্রীদেবকীকুমার বসু শোক-প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ও শ্রীসত্যজিৎ রায় সমর্থন করেন এবং সমবেত সকলে এক মিনিটকাল নতশিরে নীরবে দাঁড়িয়ে শোক-প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে আয়োজিত শোকসভায় শ্রীনেহরুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করছেন কানন দেবী — ফটো-দেশ

এই শোকসভা আহ্বান করেছিলেন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন, অভিনেতৃ সংঘ, মহিলা শিল্পী-মহল, বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন, সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল, সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলিকাতার মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীনেহরুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শ্রীমতী সুচিত্রা সেন। পরে মহিলা শিল্পী মহলের পক্ষ হতে শ্রীনেহরুর প্রতিকৃতিতে রক্তগোলাপ ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন শ্রীমতী সরযূ দেবী। শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক অনুষ্ঠানের সূচনায় গীতার শ্লোক পাঠ করেন এবং উদ্বোধন-সংগীত পরিবেশন করেন। পরিশেষে তিনি শ্রীনেহরুর উদ্দেশে রচিত একটি গান গেয়ে শোনান। এই শোক-বাসরে প্রথম বক্তা ছিলেন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, সংস্কৃতির পূজারী জওহরলাল চলচ্চিত্রের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্যা তাঁর মনকে পীড়িত করত। বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্রের গৌরববৃদ্ধিতে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। চলচ্চিত্রের লক্ষ্য কী, এবং কোন্ আদর্শে ও বিশ্বাসে চিত্রনির্মাতাদের পরিচালিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁর শেষ উপদেশ আমরা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। শ্রীসুশীল মজুমদার (সভাপতি, সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল), শ্রীমধু বসু (সভাপতি, সিনে টেকনিশিয়ান্স অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) এবং শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় (সাধারণ সম্পাদক, বেঙ্গল

শোকসভায় উপস্থিত চলচ্চিত্রশিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে (বাঁ-দিক থেকে) [illegible] — [illegible]

শোকসভায় (উপরে, বাঁ-দিক থেকে) অজয় কর, সত্যজিৎ রায়, বিকাশ রায়, অমিয় মুখোপাধ্যায়, দিলীপ সরকার (নীচে) দেবনারায়ণ গুপ্ত, অনুপকুমার, তরুণ মজুমদার ও মুকুল দত্তকে দেখা যাচ্ছে ফটো-দেশ

মোশান পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন) তাঁদের সময়োচিত ভাষণে শ্রীনেহরুর আদর্শকে অনুসরণ করার সংকল্প প্রকাশ করেন। কলাকুশলীদের কথা শ্রীনেহরু যে বিশেষভাবে বলে গিয়েছেন, শ্রীমধু বসু তাঁর ভাষণে সে কথা উল্লেখ করেন।

অভিনেতৃ সংঘের সভাপতি শ্রীপাহাড়ী সান্যাল বলেন যে মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণে আজ আমরা এখানে সমবেত, তাঁর জন্য শোক নয়, তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে জনে-প্রাণে গ্রহণ করার সংকল্পই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর সহ-সভাপতি শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ তাঁর ভাষণে শ্রীনেহরুর আদর্শ বাস্তবে রূপায়ণের শপথ গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান।

মহিলা শিল্পী মহলের পক্ষ থেকে শ্রীমতী কানন দেবী তাঁর ভাষণে বলেন, শ্রীনেহরু ছিলেন দেশের প্রাণ। তিনি নেই। কীভাবে প্রাণ ছাড়া আমরা এগোতে পারব জানি না। শ্রীনেহরু কী নিয়ে গেলেন জানি না, কিন্তু যা তিনি আমাদের দিয়েছেন তা অনেক। তাঁর সেই বিরাট দানই আমাদের কাছে একমাত্র সত্য।

অনুষ্ঠান-সভাপতি শ্রীচিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বলেন, শ্রীনেহরুর আশিস আমাদের উপর বর্ষিত হোক, এই প্রার্থনা। এই অনাড়ম্বর ও ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের বহু বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজক, শিল্পী ও কলাকুশলী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমেহবুব খাঁর পরলোকগমনে চলচ্চিত্রলোক শোকাচ্ছন্ন

বোম্বাইয়ের নানাবতী হাসপাতালে গত ২৮শে মে শ্রীমেহবুব খাঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার পর তাঁর মৃতদেহ মেরিন ড্রাইভস্থিত বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার (২৯শে মে) বেলা এগারোটায় তাঁর অন্তিম যাত্রা শুরু হয়। প্রখ্যাত চিত্রপ্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী এবং চলচ্চিত্রলোকের শত শত ব্যক্তি শবানুগমন করেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। বুধবার (২৭শে মে) প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নিকট প্রেরণের জন্য একটি শোক-বাণীতে নিজ নাম স্বাক্ষর করেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শোক-বাণী প্রেরণ করেন। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায় এক বাণীতে বলেন, সারা দেশ যখন শ্রীনেহরুর মৃত্যুতে শোকাভিভূত, এমনি সময়ে চলচ্চিত্রশিল্পমহল শ্রীমেহবুব খাঁর পরলোকগমনে আর একটি গভীর আঘাত পেলেন। প্রখ্যাত চিত্রপ্রযোজক ও প্রবীণ চিত্রপরিচালকরূপে এবং চলচ্চিত্রলোকের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে তিনি চলচ্চিত্রশিল্পকে নতুন মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। শ্রীমেহবুব খাঁর মৃত্যু-সংবাদ কলকাতা পৌঁছার পর স্থানীয় সকল চিত্রপরিবেশক সংস্থার কার্যালয় বন্ধ রাখা হয়।

দিল্লিতে 'সন অব ইণ্ডিয়া' ছবির বিশেষ প্রদর্শনীর সময় ইন্দিরা গান্ধী ও মেহবুব খাঁ

১৯০৬ সালে বোম্বাইয়ের অনতিদূরে বিলমোরায় শ্রীমেহবুব খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সালে শ্রীমেহবুব খাঁ "পদ্মশ্রী" উপাধিতে ভূষিত হন।

শোকসভায় সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে (বাঁ-দিক থেকে, সামনে) [illegible] মুখোপাধ্যায়, [illegible] রায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, [illegible] দেবী কানন দেবী (পিছনে) [illegible] রায় চৌধুরী, [illegible] [illegible]

চিত্র-সমালোচনা

ছদ্মবেশী রাজকুমার

ছায়াছবির আপাত উপভোগ্যতার একটি শর্ত হলো এই যে, যুক্তির নিকষে তার সব কিছু উপকরণ ও পরিস্থিতি যাচাই করা চলবে না। প্রসন্নমনে তাদের এই শর্ত যারা মেনে নেবেন তাদের কাছে "কষ্টিপাথর" (এ কে জি প্রোডাকশন্স) ছবিটি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য মনে হবে। এক ধনীপুত্র এবং রঙ্গমঞ্চের এক নবাগতা সাধারণ অভিনেত্রীর মধ্যে প্রণয় সম্পর্কিত এক ভিত্তিহীন গুজব কেন্দ্র করেই এই ছবির কাহিনীর বিস্তার। গুজবের ভিত্তি গড়ে উঠতে অবশ্য

সময় লাগে না। বিলেতফেরত নায়ক ছদ্ম-পরিচয়ে কেমন করে তার মনের কষ্টিপাথর নায়িকাকে পরীক্ষা করে দেয় ও তার মন জয় করে তা নিয়েই ছবির প্রেমোপাখ্যান গড়ে উঠেছে। নায়িকা থিয়েটারে চাকুরী বজায়

রাখার জন্য মিথ্যা গুজবটির আশ্রয় কী ভাবে নেয় এবং তার মালিকরা থিয়েটার বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ধনী নায়কের আর্থিক সাহায্য পাবার জন্য নায়িকাকে কতখানি তোষামোদ করে ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলে তার মধ্যেই রয়েছে ছবির রঙ্গরসের উপকরণ।

জ্যোতির্ময় রায় রচিত কাহিনীর ভিত্তিতে যে চিত্রনাট্যটি ছবিতে পরিবেশিত তার

দুটি সুর। একটি লঘু, অপরটি গম্ভীর। লঘু সুরে চিত্রনাট্যটি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ এর প্রতিটি মুহূর্ত দর্শকরা স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দাবেগের মধ্য দিয়ে উপভোগ করেন। গম্ভীর সুরে বিন্যস্ত চিত্রনাট্যের অনেক মুহূর্ত গতানুগতিক ও কৃত্রিম। নায়িকার অভাবের সংসারের দুঃখ-কষ্ট এবং ছদ্মপরিচয়ধারী নায়কের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর নায়িকার মনের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি মামুলী পরিস্থিতি নতুন করে দর্শকের মনকে আলোড়িত করবে কিনা বলা শক্ত। ছবিতে অগণিত

দীপ্তি ফিল্মস-এর "মহালগ্ন" (পরিচালনা: কনক মুখোপাধ্যায়) ছবিতে কল্যাণী ঘোষ

সাধারণ মানুষের জীবনধারার স্বরূপ এবং রংগমঞ্চের বাস্তব ও বাস্তবজগতের স্বপ্ন নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়াস রয়েছে। বলা বাহুল্য, এই বক্তব্যপ্রিয়তা ছবিতে ছন্দোপতন ঘটিয়েছে, এবং কৃত্রিম মনন-শীলতার স্পর্শ এনে দিয়েছে। থিয়েটার পরিচালকদের অসহায়তা এবং অর্থসংগ্রহের চেষ্টাকে উপলক্ষ করে যে কৌতুক সৃষ্টি করা হয়েছে তার অন্তরালে একটি অস্পষ্ট করুণ রস অনুভব করা যায়। ছবির এই অংশ কৌতুকে করুণ করে তোলার কাজে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সাধারণভাবে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের প্রয়োগ-কর্ম স্বচ্ছন্দ, একাধিক দৃশ্যে আবেগসমৃদ্ধ। কয়েকটি সুন্দর রসমুহূর্ত রচনায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে বসন্ত চৌধুরী ও সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় মনোগ্রাহী। শিল্পপতি নায়ক বসন্ত চৌধুরীর ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী চমৎকার ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। প্রণয়ীরূপেও তাঁর অভিনয় ও অভিব্যক্তি প্রশংসনীয়। সন্ধ্যা রায় নায়িকার চরিত্রের সাধ ও স্বপ্ন, এবং প্রণয়াভিলাষ সুন্দর ফুটিয়েছেন।

কমল মিত্র, জহর রায় ও অনুপকুমারের চিত্তগ্রাহী অভিনয় আকর্ষণীয়। থিয়েটার বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের বিফল চেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত সফল প্রয়াসের মধ্যে তাঁরা শুধু রংগরসেরই সঞ্চার করেন নি, চরিত্রাঙ্কনের কৃতিত্বও দেখিয়েছেন।

দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে মনোজ্ঞ অভিনয় করেছেন বিজন ভট্টাচার্য ও লিলি চক্রবর্তী। রবি ঘোষের কৌতুকাভিনয় প্রেক্ষাগৃহে হাসির বন্যা বইয়ে দেয়। অন্যান্য ভূমিকায় ভাল অভিনয় করেছেন তরুণকুমার, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, বীরেশ্বর সেন, সাধনা রায় চৌধুরী, গঙ্গাপদ বসু, প্রেমাংশু বসু, জয়শ্রী সেন, অরুণ চৌধুরী, পারিজাত বসু, প্রভৃতি।

সংগীত পরিচালনা করেছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছবির একাধিক গানের সুর চিত্তাকর্ষক। যেমন, "ওগো একবার দেখা দাও" এবং "ওগো বন্ধু আমার"। অন্য গানের সুর বৈশিষ্ট্যহীন। তবে সেই গানগুলিও সুগীত। কিন্তু আবহ-সুররচনায় সুরকার সব ক্ষেত্রে কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে পারেন নি। ছবির শুরুতে তবলা লহরার অর্থ দুর্বোধ্য। নায়িকার প্রথম মঞ্চাভিনয়ে যখন বিপত্তি ঘটে এবং দর্শকরা চিৎকার শুরু করে তখন কৌতুকব্যঞ্জক আবহসুর ব্যবহার খুবই অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। ওই দৃশ্যের অন্তর্লীন করুণ ভাবটি (পঙ্গু পিতাকে বাঁচানো ও ছোট ভাইকে মানুষ করে তোলার জন্য নায়িকার অর্থ রোজগারের প্রথম প্রয়াসের প্রথম দিনের শোচনীয় ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে) আবহসংগীতে মূর্ত হয়ে উঠল কই?

বিজয় ঘোষের আলোকচিত্রগ্রহণ প্রশংসনীয়। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগে

ওঙ্কার এণ্টারপ্রাইজেজ-এর 'মন্তর মন্তর' (পরিচালনা: রাধাকান্ত) ছবিতে মহীপাল

কৃতকার্যতা দেখিয়েছেন রবীন দাস (সম্পাদনা) ও কার্তিক বসু (শিল্পনির্দেশ)। শব্দগ্রহণ আরও সুষ্ঠু হতে পারত।

বিরহ-মিলন কথা

এক ধরনের চিত্রকাহিনী দেখতে পাই যার উৎপত্তি প্রেমে, পরিণতি মিলনে। চিত্রনাট্যে শাখা-প্রশাখার মত উপকাহিনী আর বা কিছু থাকে তার উদ্দেশ্য ওই প্রণয়োপাখ্যানকেই পল্লবিত করা। হিমালয় পিকচার্স-এর "অভিনন্দনা"-তে অনুরূপ এক আখ্যানবস্তু পরিবেশিত।

এই ছবির নায়ক-নায়িকার প্রেম-কোরক সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটেছে অনেক দেরিতে। একটি কণ্টক নির্মূল হতে বিলম্ব ঘটেছে। সে হল নায়িকার দিদির অতীত পরিচয় সম্পর্কে নায়কের অভিভাবকের ভ্রান্ত

চিত্রমন্দিরের 'সন্ধ্যাদীপের শিখা' (পরি চালনা: হরিদাস ভট্টাচার্য) ছবির তিনজন বিশিষ্ট শিল্পী: বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

অভিনয় করেছেন কমল মিত্র, ভারতী দেবী, পদ্মা দেবী, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অমর মল্লিক ও নবাগতা কুমকুম।

সংগীত এই ছবির এক বিশেষ আকর্ষণ। পরিচালনা করেছেন গোপেন মল্লিক। ছবির আধুনিক গানের সুর সুন্দর। একাধিক রাগপ্রধান গান আবিষ্ট হয়ে শুনতে হয়। আবহ-সংগীত যথাযথ।

দীনেন গুপ্তের আলোকচিত্রগ্রহণ এ ছবির এক বিশিষ্ট সম্পদ। তাঁর ক্যামেরার কাজের কুশলতা ছবির বহু দৃশ্যেই লক্ষণীয়। চমৎকার দৃশ্যরচনা ও আলো-আঁধারের সমবিন্যাসের ভিতর দিয়ে ছবিটিকে তিনি দৃষ্টিমোহন করে তুলেছেন।

"প্রণাম"

অল্প দৈর্ঘ্যের। অনধিক ছয়শত ফুট। একটি চিত্রের নাম "প্রণাম"। শ্রীনেহরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে চিত্রটি নির্মাণ করেছেন আশিস মুখোপাধ্যায়। আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে এই ছবির সম্পূর্ণ শুটিং সম্পন্ন হয়। স্থির চিত্রের ভিত্তিতে নির্মিত এই ছবিতে অল্প অবকাশে শ্রীনেহরুর কর্মজীবনের আদর্শের কথা দর্শকদের জানানো হয়েছে।

স্থির চিত্রে গ্রথিত এই অল্পদৈর্ঘ্যের ছবিটি চলচ্চিত্রের গতি পেয়েছে। স্থিরচিত্রের মৌনতা ও নিশ্চলতা ভেদ করে জননেতা যেন প্রাণময় পুরুষরূপে তাঁর বাণী নিয়ে এই ছবিতে শরীরী হয়ে উঠেছেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, অনুভূতিময় নেপথ্য ভাষণের সঙ্গে এবং সংগীত ও রবীন্দ্রনাথের গানের কলির ঐকতানে অদ্ভুতভাবে ছবিতে স্থির-চিত্রগুলি সাজানো হয়েছে। ছবিতে চমৎকার ক্লোজ-আপের ভিতর দিয়ে শ্রীনেহরুর বেদনা ভারাক্রান্ত দুটি নয়ন নিরুচ্চার ভাষায় কখনও উদ্ভাসিত, কখনও বা তাঁর অপ্রতিহত প্রাণবেগ দৃপ্ত ভঙ্গিতে প্রকাশমান। স্থিরচিত্রের এমন অপরূপ ব্যবহার যার মধ্যে ভাব ও গতি সমন্বয়ে সন্নিবিষ্ট—এর আগে প্রামাণিক চিত্রে কমই দেখা গেছে। "প্রণাম" প্রামাণিক-চিত্রকার আশিস মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অতি উঁচুদরের ফটোগ্রাফি ও চিত্রসম্পাদনা ব্যতীত এই ছবি এমন শিল্পশোভন হতে পারত না। এর জন্য সাধুবাদ পাবেন যথাক্রমে দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মণি অধিকারী। নেপথ্য ভাষণে কণ্ঠদান করেছেন কাজী সব্যসাচী।

নৃত্যশিল্পী রঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়

* সাংস্কৃতিকী *

নৃত্যশিল্পী কুমারী রঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে নৃত্য প্রদর্শন করে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় এন সি ইউ এস আই-এর তত্ত্বাবধানে এবং ইউ এন ই এস সি ও ও সি ও এস ই সি-র সহযোগিতায় গঠিত দলের সহিত ইউরোপে নৃত্য প্রদর্শন করতে যান। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্য শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় অন্যান্য কয়জন ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে নির্বাচিত হয়েছিলেন। দলটি লেবানন, ইটালি, সুইজারলাণ্ড, অস্ট্রিয়া, জার্মেনী, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। রঞ্জনার ভারতীয় নৃত্য, বিশেষ করে ময়ূর নৃত্য ও বাংলা দেশের লোকনৃত্য রসিকজনকে মুগ্ধ করে। রঞ্জনা প্রথমে তাঁর জননী কল্পপুরের নৃত্যবিতানের অধ্যক্ষা শ্রীমতী শোভা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এবং পরে পদ্মশ্রী শ্রীশম্ভু মহারাজের নিকট নৃত্য শিক্ষা করেন।

সম্প্রতি **রবিতীর্থের** রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে 'গীতাঞ্জলি' গীতালেখ্য পরিবেশিত হয়। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন সুচিত্রা মিত্র ও দ্বিজেন চৌধুরী। একক ও দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করেন সুচিত্রা মিত্র, পূর্বা সিংহ, দেবযানী সেন, সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা দত্ত, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম বসু, অমর রায় ও অশোক গুহ। সংগতে ও যন্ত্রসংগীতে সহায়তা করেন রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী ভট্টাচার্য, চাঁদু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল নাগ ও রথীন চৌধুরী।

আগামী ১৩ ও ১৪ই জুন সন্ধ্যায় **সাউথ এণ্ড ক্লাবের** (প্রতাপাদিত্য ও বাড়ুলি নওল রোড) উদ্যোগে সংঘ-প্রাঙ্গণে বাৎসরিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দিনের কর্মসূচী: সুধা গুপ্তের পরিচালনায় রবীন্দ্রসংগীত এবং শিশু-সভ্যগণ কর্তৃক কবিগুরুর কৌতুক-নাট্যাভিনয়। দ্বিতীয় দিন সুভাস সেনগুপ্তের পরিচালনায় শ্রীকিরণ মৈত্রের "নাটক নয়" অভিনয়।

শ্রীনেহরুর জীবনীচিত্র

কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্মস ডিভিসন শ্রীজওহরলাল নেহরুর জীবনীর ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং একটি অল্পদৈর্ঘ্যের প্রামাণিক চিত্র তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেল। পূর্ণাঙ্গ চিত্রটিতে শৈশবকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শ্রীনেহরুর জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি সন্নিবিষ্ট থাকবে। শ্রীনেহরুর অন্তিম যাত্রা নিয়ে ফিল্মস ডিভিসন ইতিমধ্যেই দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র তৈরি করেছেন। ১৯৫৭ সালে ফিল্মস ডিভিসন শ্রীনেহরুর প্রাত্যহিক জীবনের কর্মব্যস্ততা নিয়ে একটি অল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণ করেছিলেন।

মুক্তী ফিল্মস্ম্যারণ্ এণ্টারপ্রাইজ-এর "দুই পর্ব" (পরিচালনা: বিন্দু বর্ধন) ছবিতে জ্যোৎস্না বিশ্বাস, জহর গাংগুলী ও নবাগত সুমন মুখোপাধ্যায়। ফটো—দেশ

ফিল্ম ফেডারেশনের অস্থায়ী সভাপতি

শ্রীনেহরুর মৃত্যুর পর ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীঅজিত বসু সংস্থার সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানা গেল। আগামী ১৭ই জুন বোম্বাইয়ে ফেডারেশনের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। ততদিন শ্রীবসু ফেডারেশনের সভাপতির কার্যভার সম্পন্ন করবেন।

শৌখিন নাট্যমঞ্চে অভিনয় প্রয়াস

রঙ্গসভার "আমাদের শহর"

দক্ষিণ কলকাতার সুখ্যাত নাট্যসংস্থা রঙ্গসভা সম্প্রতি নিউ এম্পায়ার মঞ্চে আমেরিকার বিখ্যাত নাট্যকার থর্নটন ওয়াইল্ডারের পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত "আওয়ার টাউন" নাটকের বাংলা নাট্যরূপ "আমাদের শহর" অভিনয় করলেন।

রঙ্গসভার "আমাদের শহর"-কে শৌখিন মঞ্চের একটি অভিনব ও অসাধারণ নাট্য-প্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। প্রথমেই উল্লেখ্য, এই ইংরেজী নাটকটি বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক থেকে স্বতন্ত্র। বলা চলে, নাট্যরচনার এক বিস্ময়কর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই নাটক আমেরিকার একটি ছোট শহর গ্রোভার্স কর্নারের সাধারণ মানুষদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ ও দুঃখের পাঁচালী। ওই শহরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে কেমন মানুষের জীবনের কয়েকটি সহজ ও নিভৃত মুহূর্তের একটি চিত্রকল্প নাটকটিতে গড়ে তোলা হয়েছে। জীবন, প্রেম ও মৃত্যু—এই তিনটি অপ্রতিরোধ্য সত্য মানুষকে বিশ্বাস ও বাসনা এবং বেদনা ও বিস্ময়ের ছন্দে যেন আন্দোলিত করে চলেছে। মানুষের অস্তিত্বের এই নিগূঢ় সত্য উদ্ঘাটনের অনেক অনেক আবেগের স্পর্শ আছে, কিন্তু স্থূল ও কৃত্রিম নাটকীয়তার প্রচণ্ড জোয়ার নেই এই নাটকে। জীবন যা ও যেমন, ঠিক তাই তেমনভাবে এতে অংকিত। এবং জীবনের অতিরিক্ত এতে আছে জীবনদর্শন। মৃত্যুর পরে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের কতটুকু অবশেষ থাকে তারও ইঙ্গিত রয়েছে নাটকের শেষে। নাটকের ঘটনা ও তার চরিত্রদের মনের কথা বলে যায় সূত্রধার।

মূল মর্মরস ও বক্তব্য অবিকৃত রেখে নাটকটি মঞ্চে পরিবেশন করার এক প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন রঙ্গসভার শিল্পগোষ্ঠী। এই নাটকে নতুন ধরনের যে প্রয়োগকলা দেখা গেছে তা অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। এই মননধর্মী নাটকটিকে দর্শকদের কাছে প্রীতি করার সুখভোগ্য করে তোলার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন নাট্যপরিচালক ক্ষিতীশ ঘোষ।

নাটকের সূত্রধারের ভূমিকায় দিলীপ রায়ের চমৎকার অভিনয় স্মরণীয়। অন্যান্য দিকের ভূমিকায় সুঅভিনয় করেছেন সীতা মুখোপাধ্যায়, দুলাল চট্টোপাধ্যায়, ভোলা বসু, শোভন দে, সৌরীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্না দত্ত, দীপিত ভট্টাচার্য, সুতপা ভট্টাচার্য, পূরবী রায়, রূপালী রায়, অজিত মজুমদার, সুপ্রিয় সরকার, মাধব চট্টোপাধ্যায়, আশিস মুখোপাধ্যায়, কালিদাস দাস, ফণী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

আবহসংগীত (অচিন্ত্য মজুমদার রচিত) ও আলোকসম্পাত (রঞ্জিত মিত্র) খুবই প্রশংসনীয় হয়।

পরলোকে কমল দে

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের দরদী অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ছায়াছবির শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক শ্রীকমল দে আর ইহজগতে নেই। গত ২৬শে মে রাত্রি দেড় ঘটিকায় সামান্য রোগভোগের পর তিনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯।

শিল্পরসিক এবং নাট্যাভিনয় ও সংগীত-চর্চার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তিনি কলকাতার সংস্কৃতি-জগতে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর স্থাপিত মেটালাইট কারখানায় বছরে একাধিকবার নাট্যাভিনয় ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হত। প্রতি বছর বিশ্বকর্মা পূজার দিন তাঁর কারখানায় অভূতপূর্ব শিল্পী-সমাবেশ দেখা যেত। এবং বিশিষ্ট চিত্রপ্রযোজক ও চিত্রপরিচালকরাও এই উৎসবে যোগ দিতেন। তিনি যেন চিত্রজগতেরই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীদে-র মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে বুধবার সকালে তাঁর বাসভবনে এবং কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে বহু প্রখ্যাত শিল্পী, চিত্রপ্রযোজক ও কলাকুশলী মৃতের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান শ্রীঅরুণ দেকে রেখে গিয়েছেন।

আপনি কি চুল ওঠার পাল্লায় পড়েছেন?

বিপদের সঙ্কেত এইসব লক্ষণ থেকেই বুঝতে পারবেন

মাথায় খুস্কি হওয়া
প্রায়ই অনেকের মাথায় খুস্কি দেখা দেয়, কখনোই তা অবহেলা করা উচিৎ নয়।

চুল পাতলা হওয়া
অভাবে।

অকালে টাক পড়া
যেমন চুলওঠার কবলথেকে অনেক ক্ষেত্রেই রেহাই পাওয়া যেত ---

যদি চুল উঠ্‌তে বা পাত্‌লা হ'তে শুরু ক'রে থাকে তবে আজ থেকেই পিওর সিলভি-ক্রিন ব্যবহার করতে আরম্ভ করুন। চুলের গঠনের জন্যে যে আঠারোটি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয় পিওর সিলভিক্রিনে আছে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস। মাথার চামড়াতে মালিশ ক'রে দিলেই পিওর সিলভিক্রিন চুলের গোড়ায় গিয়ে জোগায় চুলের জীবনদায়ী সেই স্বাভাবিক খাদ্য যার দরুন সে স্থায়ী স্বাস্থ্যের শক্তিতে পুনর্জীবীত হয়।

"অল্ আবাউট হেয়ার" (All About Hair) এই নামের বিনামূল্যে চিত্রিত এক পুস্তিকা যদি আপনি চান তো লিখুন ডিপার্টমেন্ট E-1. সিলভিক্রিন অ্যাডভাইসরি সার্ভিস, পোষ্ট ব্যাগ-১০০২২, বোম্বাই-১

পিওর সিলভিক্রিন
চুলের যেকোনো দুর্যোগে দুর্ভোগে চিকিৎসার উপযুক্ত পরিচর্যার নির্যাস।

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং
সারাদিন চুল পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ক'রে রাখে। চুলওঠা রোধ করার পক্ষে যথেষ্ট পিওর সিলভিক্রিন এতে থাকে।

Silvikrin

সিলভিক্রিন — সুস্থ চুলের সঠিক উপায়

SP.1.P.6,64

খেলার মাঠে

একলব্য

শত কাজের মধ্যেও পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর যে খেলাধুলো করার একটি পৃথক মন ছিল, ভারতের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল—আগের সপ্তাহেই সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। রাষ্ট্র-তরণীর হাল ধরেও কিভাবে তিনি খেলাধুলোর নানা পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছেন, কিভাবে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়েছেন, সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

সুখের কথা, জওহরলাল নেহরুর লোকান্তরের পর এখন যিনি রাষ্ট্র-তরণীর হাল ধরেছেন, তিনিও খেলাধুলোর পরম উৎসাহী। শুধু উৎসাহীই নন, অতীতে নিজেও খেলাধুলো করেছেন। যৌবনে হকি খেলেছেন, নিয়মিত সাঁতার কেটেছেন। দিল্লীর হকি মাঠে তাঁর উপস্থিতি মোটেই বিরল ঘটনা নয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবেই তিনি শুধু হকি মাঠে উপস্থিত হন না। অতীতের হকি খেলোয়াড়—খেলা থেকে রূপ-রস-আনন্দ গ্রহণ করতেই মাঠে এসে থাকেন। সাঁতার তাঁর অন্যতম প্রিয় স্পোর্টস। এই সেদিনও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী হিসাবে কন্যাকুমারীতে গিয়ে নাকি এক সুইমিং পরে ঘণ্টাখানেক সাঁতার কেটে এসেছেন। যোগব্যায়ামও কর্মযোগী শাস্ত্রীজীর নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৫৯ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পর যোগাভ্যাস ছেড়ে দিয়েছেন।

রাইফেল শুটিং-এ শাস্ত্রীজীর অপরিসীম আগ্রহ। গত মার্চ মাসে তিনি প্রধানত ঐজন্যই কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি। লবণ হ্রদের পুনরুদ্ধৃত মাঠে জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতিত্ব করা এবং ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভার অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করাই গত মার্চ মাসে শাস্ত্রীজীর কলকাতায় আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতি হিসাবে সেদিন শাস্ত্রীজী দুটি-একটি কথায় রাইফেল শুটিং-এর গুরুত্বের উপর যে জোর দিয়েছিলেন, আজ বিশেষভাবেই তা স্মরণীয়। বলেছিলেন—"শুধু শহরে নয়, জেলায় জেলায় রাইফেল ক্লাব গড়ে তুলতে

১৯৬০ সালে দিল্লীতে জাতীয় রাইফেল শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু লক্ষ্যবিদ্ধ করছেন। —ফটো—দেশ

হবে। রাইফেল ও রাইফেল চালনার গুলী সংগ্রহ করা যে কষ্টকর এবং অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য সে বিষয়ে সরকার অবহিত আছেন এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য ও দেশের ছেলেমেয়েদের রাইফেল চালনায় সুপটু ও দক্ষ করে গড়ে তোলবার জন্য জাতীয় সরকার এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।"

আজ শাস্ত্রীজী নেহরুজীর শূন্য আসনের উত্তরাধিকারীই শুধু নন, তাঁর স্বপ্ন পূরণের সমর্থ প্রতিনিধি। সুতরাং ভারতের খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও যে ক্রীড়াপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী নেহরুর নীতিতে অবিচল থেকে খেলাধুলোর উন্নতির জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

*

তেহরানে ভারত ও ইরানের প্রাক-অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায় ভারতের ৩—০ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজয়, ভারতের ফুটবল উৎসাহীদের কাছে বড় রকমের দুঃসংবাদ। বলা বাহুল্য, এই পরাজয় টোকিও অলিম্পিকের মূল আসরে ভারতের খেলার সম্ভাবনাকে সংশয়পূর্ণ

১৯৬০ সালের জাতীয় রাইফেল শ্যুটিং চ্যাম্পিয়ন হরিচরণ সাউয়ের প্রেসিডেণ্ট ট্রফি গ্রহণের সময় প্রধানমন্ত্রী নেহরু, শ্রী সাউকে করতালি দ্বারা অভিনন্দন জানাচ্ছেন। —ফটো—দেশ

করে তুলেছে। আগামী ২১শে জুন কলকাতায় ভারত ও ইরানের ফিরতি খেলায় যদি ভারত অন্ততঃ ৪—০ গোলে ইরানকে পরাজিত করতে না পারে তবে টোকিও যাবার অধিকার পাবে না।

অবশ্য তেহেরানের ফলাফলে অর্থাৎ ৩—০ গোলে ভারত যদি ফিরতি খেলায় ইরানকে হারাতে পারে তবে দুই দেশের মধ্যে একটি অতিরিক্ত খেলার ব্যবস্থা হবে। ১৫ মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলানো সত্ত্বেও যদি সেই অতিরিক্ত খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হয় তবে টসের সাহায্যে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হবে।

কিন্তু এ কথাগুলোকে 'গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল'-এর মত শোনাচ্ছে। যে দল ৩—০ গোলে শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করেছে তারা ফিরতি খেলায় ৪—০ গোলে বিজয়ী হবে এটা বর্তমান অবস্থায় আশা করা প্রায় দুরাশার পর্যায়ে পড়ে। অবশ্য ভারতীয় দলের ম্যানেজার উইং কমাণ্ডার কল্যাণ গাঙ্গুলী ও কোচ শ্রী এস এ রহিম খেলার শেষে বলেছেন, তেহেরানের অনভ্যস্ত আবহাওয়াই ভারতীয় দলের বিপর্যয়ের কারণ।'

শ্রী গাঙ্গুলী ও শ্রী রহিমের বক্তব্যের মধ্যে যুক্তি থাকলেও বর্তমান অবস্থায় সে যুক্তি গ্রহণ করতে কারো মনই সাড়া দেবে না।

অবশ্য খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফলের অভাব নেই। কয়েক বছর আগেই এই কলকাতার মাঠে এক সাধারণ শক্তির চাইনিজ দলের কাছে মোহনবাগানকে শোচনীয়ভাবে, বোধ হয় ৮—১ গোলে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু পরের খেলায় সেই চাইনিজ দলই আই এফ এ একাদশের কাছে হেরে গিয়েছিল শোচনীয়ভাবে। মোহনবাগানের চেয়ে আই এফ এ দল যে শক্তিশালী ছিল, তা মোটেই নয়। তবু মোহনবাগানের ঐ বিপর্যয় ঘটেছিল। খেলায় এ ধরনের বিপর্যয় ঘটে থাকে। সুতরাং কলকাতায় ইরানকে যে ভারতের কাছে হার স্বীকার করতে হবে না, এ কথা কে বলতে পারে? তবে সংশয় গোলের সংখ্যা নিয়ে। গোল অ্যাভারেজে যেখানে খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসার ব্যবস্থা সেখানে ভারতকে অন্ততঃ ৪—০ গোলে জিততে হবে। এবং সেইটেই বর্তমান অবস্থায় প্রায় দুরাশার পর্যায়ে পড়েছে।

১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিক থেকে শুরু করে সুদেশবুর অলিম্পিকের প্রীতি অনুষ্ঠানের মূল প্রতিযোগিতায় ভারত ফুটবলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এর মধ্যে ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যুগোস্লাভিয়ার কাছে শোচনীয় পরাজয় ছাড়া লণ্ডন, মেলবোর্ন ও রোম অলিম্পিকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রীড়াধারা বিদেশী

সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে। মেলবোর্নে তো ভারত চতুর্থ স্থানই দখল করেছিল। রোমে লীগ প্রথার খেলায় ভারতকে ফ্রান্স, হাংগেরী ও পেরুর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। তিনটিই পৃথিবীর শক্তিশালী ফুটবল দল। ফ্রান্সের সংগে ভারতের খেলা ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। হাংগেরীর কাছে ২—১ গোলে ও পেরুর কাছে ৩—১ গোলে ভারত পরাজয় স্বীকার করে। পুরোভাগের খেলোয়াড়দের স্থির লক্ষ্যের অভাব এবং গোলরক্ষক থঙ্গরাজের ব্যর্থতার জন্যই এই দুটি খেলায় ভারতকে হার স্বীকার করতে হয়। কিন্তু অন্যান্য বিভাগে ভারত শক্তিশালী হাংগেরী ও পেরুর সংগে প্রায় সমানতালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ৪ বছর পরে সেই ভারতকে শক্তিহীন ইরানের কাছে এমন শোচনীয়ভাবে হার স্বীকার করতে হবে, এটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

শুধু কি ইরানের কাছে পরাজয়? এর আগে প্রাক-অলিম্পিকের প্রথম ধাপে ভারত ৫—৩ ও ৭—০ গোলে সিংহলকে পরাজিত করেছে। লেবানন প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করায় দ্বিতীয় ধাপে খেলা খেলতে হয়নি।

সিংহল ফুটবলের এক শক্তিহীন দল। সিংহলকে পরাজিত করলেও দুই দেশের প্রথম খেলায় কিভাবে সিংহল ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি গোল করেছিল সেটাই আশ্চর্যের কথা। তেহেরানে প্রাক-অলিম্পিক ফুটবলের আগে তেলআভিভে এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলাতেও ভারতকে ইসরাইলের কাছে ২—০ গোলে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

ভারতের ফুটবল-মান উন্নত হয়েছে বলে ফুটবল পরিচালকদের একটা গর্ব আছে। এই কি উন্নত মানের পরিচয়? সিংহল এবং ইরানের মত শক্তিহীন দলের সংগে খেলাতেই যদি এই ফলাফল হয় তবে বিশ্বের শক্তিশালী দলের সংগে ভারতের খেলার ফলাফল কি হবে?

ফুটবল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন আর মানের মর্যাদায় মিছে আত্মপ্রসাদ লাভ না করে আত্মানুসন্ধানের চেষ্টা করেন।

তেলআভিভে এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলায় অবশ্য ভারত রানার্সের সম্মান পেয়েছে। চারিটি দেশের মধ্যে লীগ প্রথায় আয়োজিত এশিয়ান 'সকারে' ইসরাইল পেয়েছে চ্যাম্পিয়নশিপের সম্মান।

এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলার বিশদ বিবরণ এখনো আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। কিন্তু যেটুকু বিবরণ এসেছে তাতে ভারতের খেলা সম্পর্কে উৎসাহিত হবার কোন কারণ ঘটেনি। প্রাক-অলিম্পিক ফুটবল খেলার অবশ্য গ্রহণের তোড়জোড় হিসাবে কলকাতায় অলিম্পিক কোচিং

গত মার্চ মাসে জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁকে নবম ক্লাবের শুটিং রেঞ্জে শাস্ত্রীজীকে রাইফেল চালনা সম্পর্কে সরকারের নীতি ঘোষণা করতে দেখা যাচ্ছে —ফটো দেশ

ক্যাম্প পরিচালনার পর আশা করা গিয়েছিল, ভারত এর চেয়ে অনেক ভাল খেলবে।

এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতা এবং ইরানের সংগে প্রাক-অলিম্পিক খেলায় কষ্টিপাথরে ভারতের ক্রীড়াধারার গলদ আজ স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠেছে। ভারতীয় ফুটবলের কর্ণধারদের আরও স্মরণ রাখা

দিল্লীর জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় ফাইন্যাল খেলার শেষে অতীত দিনের হকি খেলোয়াড় [illegible] বিজয়ী রেল দলের অধিনায়কের হাতে বিজয়ীর পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন

[illegible] অংশ গ্রহণ করতে পারছে না। তৃতীয়ত, খেলা চলার পথে প্রতিদিনই হোঁচট খাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পরলোকগমনেও খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। কেন কিছু দিন খেলাও বন্ধ রাখতে হয়েছে। চতুর্থ কারণ, এবং সেইটাই সবচেয়ে বড় কারণ যে, কোন ক্লাবই আত্মবিশ্বাস বজায় রেখে খেলতে পারছে না। খেলায় যোগাযোগের অভাব, সামঞ্জস্যের অভাব, নৈপুণ্যগত উৎকর্ষ অনুপস্থিত। তাই মনে হয়, ময়দানের ফুটবল জমে উঠতে আরও কিছু সময় লাগবে।

জুনের ৯ তারিখ পর্যন্ত খেলায় ১৫টি ক্লাবের মধ্যে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং ইস্টার্ন রেল অপরাজিত আছে, আর বাটা, জর্জ টেলিগ্রাফ ও পোর্ট কমিশনার্স এখন পর্যন্ত কোন খেলায় জিততে পারেনি।

গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানকে পাঁচটি খেলার মধ্যে ইস্টার্ন রেল ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের কাছে একটি করে পয়েন্ট হারিয়ে মোট দুটি পয়েন্ট নষ্ট করতে হয়েছে। চারটি খেলায় ইস্টবেঙ্গল নষ্ট করেছে ইস্টার্ন রেলের কাছে একটি পয়েন্ট।

শক্তিশালী দল বলে অভিহিত গতবারের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী বি এন রেল দলের খেলা এবারে বেশ নৈরাশ্যজনক। ছয়টি খেলার মধ্যে ইতিমধ্যেই রেল দলকে দুটি খেলায় পরাজয় স্বীকার করে ৪ পয়েন্ট এবং আরও দুটি খেলা ড্র করে আর দু' পয়েন্ট মোট ৬ পয়েন্ট হারাতে হয়েছে। এখন পর্যন্ত অপরাজিত থাকলেও ইস্টার্ন রেলও ৭টি খেলায় ৪ পয়েন্ট নষ্ট করেছে। এরিয়ানের কাছে পরাজয় সত্ত্বেও পাঁচটি খেলায় ৪ পয়েন্ট নষ্ট করায় মহমেডান স্পোর্টিং দলও তাদের পূর্বের পরিচয় দিতে পারেনি। নীচের দিকের ক্লাবগুলির মধ্যে এবারে উয়াড়ী ও বালী প্রতিভায় খেলায় কিছুটা নৈপুণ্যের ছাপ আছে। দুঃখের পরিচয় না দিলেও, এমন নয়। তবে লীগের জন্য বহু অপ্রত্যাশিত ফলাফল অপেক্ষা করে আছে। তার জন্য আমাদেরও অপেক্ষা করতে হবে আরো মাসখানেক।

উচিত, খেলাধূলার উন্নতি করবার জন্য কোন দেশই আজ বসে নেই। সব দেশেই প্রস্তুতির পর্যাপ্ত পরিচয়। আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্রেও অবশ্য প্রস্তুতির পরিচয় আছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনের সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয়, অন্যান্য দেশে যেখানে বিমান যুগের অগ্রগতি, আমাদের দেশে সেখানে গো-যানের ক্রীড়াচ্ছবি।

নীচে এশিয়ান ফুটবল প্রতিযোগিতার সব খেলার ফলাফল ও লীগ টেবল দেওয়া হল।

ইসরাইল—১ : হংকং—০
ইসরাইল—২ : ভারত—০
ইসরাইল—২ : দক্ষিণ কোরিয়া—১
ভারত—২ : দক্ষিণ কোরিয়া—০
ভারত—৩ : হংকং—১
দক্ষিণ কোরিয়া—১ : হংকং—০

লীগ টেবল

	খেঃ	জঃ	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ইসরাইল	৩	৩	০	০	৫	১	৬
ভারত	৩	২	০	১	৫	৩	৪
দঃ কোরিয়া	৩	১	০	২	২	৪	২
হংকং	৩	০	০	৩	১	৫	০

ওয়াটারপ্রুফ ক্যাজুয়াল (১২) ৬.৯৫
বরষার
পথে
ভরসা
বৃষ্টি ধোয়া পথে সমস্যা শুকনো
পায়ে চলা। এই সমস্যার সমাধান
বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো। এই ধরনের
জুতোয় প্রয়োজন উৎকৃষ্ট রবার,
বাটার জুতোয় তা পাবেন।
আরামের জন্য জালি কাপড়ের
লাইনিং। সোল আর হিল-এ
এমন নকশার কৌশল যা পারতপক্ষে
হড়কাবে না। তাছাড়া, রকমারি রঙ...
জলে ভিজুক, কাদা লাগুক,
একবার ধুলেই কেনার প্রথম
দিনের মতো আনকোরা, ছিমছাম।
Bata

দেশী সংবাদ

১লা জুন—ভারত সরকার চীনাবাদাম, সরিষা বীজ, তিসি বীজ, ধনিয়া, অড়হর, মুগ প্রভৃতি চৌদ্দটি পণ্যের ক্ষেত্রে ফাটকা কারবার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। অবিলম্বে সারা দেশব্যাপী এই নিষেধাজ্ঞা বলবত হইবে।

কলিকাতার চালের বাজারের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। কারণ ধান আটক অভিযান সত্ত্বেও মফস্বল হইতে মহানগরীতে চাল আমদানি বাড়ে নাই। এদিকে এক শ্রেণীর রেশন দোকান হইতে কালোবাজারে চাল পাচারের অভিযোগ উঠিয়াছে।

২রা জুন—শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ সর্বসম্মতিক্রমে সংসদীয় কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ ও নূতন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নামের তালিকা পেশ করিবার জন্য অনুরোধ জানান।

রাজ্য সরকারের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ব্যুরোর এক সাম্প্রতিক সার্ভেতে প্রকাশ, কলিকাতার মোট জনসংখ্যা ৫৫ লক্ষ। ইহার মধ্যে চাকুরিজীবী মাত্র ২১ লক্ষ। ২২ লক্ষ লোক আদৌ লেখাপড়া জানে না। প্রতি শতে ৬৯ জন মাত্র বাংলা ভাষাভাষী। কলিকাতার প্রতি একশ জনে মাত্র ৩৯ জন নারী।

৩রা জুন—কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন এবং এই টাকার কোন হিসাব নাই। গত ২৫শে এপ্রিল কংগ্রেস সদস্যা কুমারী শান্তা বশিষ্ঠ এই অভিযোগ করিয়াছিলেন। আজ রাজ্যসভার প্রশ্নোত্তরের সময় জনসংঘের শ্রী এ বি বাজপেয়ী এই প্রশ্নটি পুনরায় তোলেন।

খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার জন্য শাস্তিদানের ব্যবস্থাগুলি আরও কঠোর করার কথা আজ লোকসভায় প্রায় সব সদস্যই বলেন। খাদ্যে ভেজাল দেওয়া বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

৪ঠা জুন—দেশের মূল্য পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক বলিয়া উল্লেখ করিয়া অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী আজ বলেন, এই শোচনীয় অবস্থা হইতে বাঁচিতে হইলে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য এবং খুচরা বণ্টনের ক্ষেত্রেও কঠোর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই।

বর্ধমান জেলার বিভিন্ন অংশ হইতে জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ গতকাল পর্যন্ত চাউল এবং ধান মিলিয়া দুই লক্ষ মণ আটক করিয়াছেন। বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলা শাসকের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে এই তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

৫ই জুন—কেন্দ্রীয় পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমহাবীর ত্যাগী আজ লোকসভায় বলেন যে, মানা উদ্বাস্তু শিবিরে আজ পর্যন্ত ৪৬ জন উদ্বাস্তু আন্ত্রিক রোগে মারা গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ৩১। গরম, শ্রান্তি ও পুষ্টির অভাবে এই সকল মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া তদন্তে জানা গিয়াছে।

ওড়িষার বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ আলু ও সরিষার তৈল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে এবং যদিও কোথাও পাওয়া যায়, ক্রেতাদের নিকট হইতে অত্যন্ত চড়া দাম আদায় করা হইতেছে।

৬ই জুন—প্রতিরক্ষা দপ্তর হইতে আজ এক ইস্তাহার মারফত ঘোষণা করা হয় যে, শ্রীচ্যবনের সফরের ফলে ১৯৬৫ সালের আর্থিক বৎসরের জন্য ভারতকে সামরিক সাহায্যদানের মার্কিন পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণভাবে মতৈক্য ঘটিয়াছে।

গত ছয় দিনে গয়া জেলায় সর্দিগর্মিতে পাঁচটি শিশুসহ নয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে। বিহারের অধিকাংশ জেলা তাপপ্রবাহের কবলে পড়িয়াছে। তাপমাত্রা ১১৬·৫ ফাঃ পর্যন্ত ওঠে।

৭ই জুন—ব্যাঙ্ক অফ চায়নার খাতাপত্র দীর্ঘ দুই বৎসর যাবত পরীক্ষা করিয়া কেন্দ্রীয় পুলিস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন পিকিংপন্থী নেতা এই ব্যাঙ্ক মারফতে অন্তত ৫০ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন।

গত ২রা জুন নিরাপত্তা বাহিনীর সহিত সংঘর্ষ ঘটিবার পর নাগা বিদ্রোহীরা পাঁচটি মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে। বিদ্রোহীরা ব্রহ্ম সীমান্তবর্তী চিন পাহাড়ের জঙ্গলে পলাইয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১লা জুন—মার্কিন প্রতিনিধি সভার প্রতিরক্ষা বরাদ্দ সাব-কমিটির সদস্য শ্রী টি মেলভিন লারড গতকাল এক বেতার সাক্ষাৎকারে বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামে আঘাত হানার প্রস্তুতি চালাইতেছে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান আজ ভারতের নূতন নেতৃত্বের উদ্দেশে এক আবেদন করিয়া বলেন যে, দুই পক্ষেরই বিশেষ করিয়া ভারতের নূতন নেতাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া পাক-ভারত সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

২রা জুন—ওয়াশিংটন মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানের আন্তর্জাতিক শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর একটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপনের খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী এশীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও শিল্পীয় উন্নয়নে সাহায্য করা হইবে।

কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিডেল ক্যাস্ট্রো অভিযোগ করেন যে, বিমান হইতে কিউবার অভ্যন্তরে কিছু অজ্ঞাত দ্রব্য ফেলা হইয়াছে। সম্ভবত মার্কিন সরকার কিউবার বিরুদ্ধে জীবাণু-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে।

৩রা জুন—কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট চুং হী পারাকের পদত্যাগ দাবি করিয়া ১০ হাজার ছাত্রের এক বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর প্রেসিডেন্ট আজ রাত্রে রাজধানীতে সামরিক আইন জারি করিয়াছেন।

তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ইসমেত ইনোনু আজ ইস্তাম্বুলে আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউটের সাধারণ পরিষদের ত্রয়োদশ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। শ্রীইনোনু বলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অন্য সব স্বাধীনতার ভিত্তি।

৪ঠা জুন—"ভারতের সঙ্গে শান্তি ও ঐক্য স্থাপনের জন্য পাকিস্তান নূতন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছে"—আজ [illegible] জাতীয় পরিষদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী[illegible] আলি ভুট্টো এই উক্তি করেন।

আন্তর্জাতিক প্রেস ইনস্টিটিউটের [illegible] কার্যক্রমের পরিচালক শ্রীটম হপকিনস[illegible] বলেন যে, আফ্রিকান সাংবাদিকতা[illegible] কম্যুনিস্ট তৎপরতা ক্রমেই বাড়িতেছে। গত [illegible] বৎসরে আফ্রিকায় মতাদর্শের লড়াই তীব্রতর হইয়াছে।

৫ই জুন—ভারত ও পাকিস্তানের ম[illegible] ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বই শোভন সম্পর্ক। কিন্তু এ[illegible] সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করি[illegible] প্রেসিডেন্ট আয়ুব ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানে[illegible] সম্পর্কের ব্যাপারে কাজ চালাইবার মত কো[illegible] রকম চুক্তি করিতে ব্যগ্র।

বর্তমানে অবলুপ্ত মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ওয়েলেনস্কি এখন লণ্ডনে আছেন। তিনি ভারতকে কমনওয়েলথ হইতে বাহির করিয়া দিতে চান। লণ্ডনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তিনি তাঁহার নূত[illegible] কমনওয়েলথ পরিকল্পনা জানাইয়াছেন।

৬ই জুন—গ্রীক প্রতিরক্ষা দপ্তর হইতে বল[illegible] হয় যে, তুরস্কের দিক হইতে সাইপ্রাসে আক্রম[illegible] আশংকায় গ্রীসকেও স্থল, বিমান নৌ-বাহিনীসহ প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে। সকল সংবাদ বৃটিশ ও মার্কিন দূতকে জানা[illegible] হইয়াছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ লণ্ডনে বলেন যে, লাওস সমস্যা সম্পর্কে ৬টি রাষ্ট্রের বৈঠক করিবার জন্য পোল্যাণ্ড যে প্রস্তাব করিয়াছেন, বৃটিশ সরকার তাহা নীতিগতভাবে মানিয়া লইয়াছেন এবং সে কথা সোভিয়েট ইউনিয়নকে জানাইয়া দিয়াছেন।

৭ই জুন—পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো আজ ভারতের নূতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, পাকিস্তান ভারত-পাকিস্তান সম[illegible] সমাধান করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া যাইবে এ[illegible] এই উপ-মহাদেশের শান্তি ও ঐক্যের জন্য [illegible] করিবে।

পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, গতকাল পূর্ব-পাকিস্তানের চর-অঞ্চলের উপর দিয়া এক প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত হইবার ফলে ২০ জন লোক পদ্মা নদীর জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা — ৪০ পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক —২০ টাকা, ষাণ্মাসিক—১০ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২ টাকা ষাণ্মাসিক— ১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক — ৫ টাকা ৫০ পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা - ১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩ ও ২৩—৪৫৪১ স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

"সত্যিকারের রসোত্তীর্ণ সঙ্গীত ভাষা ও দেশাচার, রাজনৈতিক
ও সামাজিক গণ্ডীর সীমা পেরিয়ে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের
হৃদয়ে পৌঁছুতে পারে। আর সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে
সে-সঙ্গীত পৌঁছে দিতে ফিলিপ্স রেডিও অদ্বিতীয়।"
বিলায়েত খাঁ
বাইরে ইনি সুপরিচিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চিত্রপ্রদর্শনী—	... ...	৭৩৯
শ্রীমেবাসে—	... ...	৭৪২
আলোচনা—	... ...	৭৪৩
সাহিত্য সংবাদ—	বিদুর	৭৪৫
পুস্তক পরিচয়—	... ...	৭৪৭
রঙ্গজগৎ—	... ...	৭৪৯
খেলার মাঠে—	একলব্য	৭৫৭
ফুটবলের আইনকানুন—	মুকুল	৭৬৩
সাপ্তাহিক সংবাদ—	... ...	৭৬৪

প্রচ্ছদ : শ্রীঅশোক দাশ

(সি-৬৭৫৫)

বৈদেশিকী

পিতার বা পিতৃতুল্য ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে "তাঁর আদর্শই আমাদের আদর্শ", "তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করাই হবে আমাদের নীতি", "তাঁর আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত করাই হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য" ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হয়ে ওঠে; যদিও নূতন কর্তাদের প্রথম পদক্ষেপেই পিতার ইচ্ছা বা পিতৃদত্ত নির্দেশ লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। কামানের গাড়িতে তাঁর শবযাত্রা নিশ্চয়ই গান্ধীজীর অভিলষিত ছিল না। সারা ভারতে জওহরলালজীর ভস্মবিসর্জন যেভাবে অনুষ্ঠিত হল, তার সঙ্গেও তাঁর উইলে প্রকাশিত ইচ্ছার কোনো সঙ্গতি নেই।

আসলে শ্রাদ্ধাদি কর্মের কোনো পারলৌকিক ফলাফল—অর্থাৎ যাঁর শ্রাদ্ধ, তাঁর কোনো লাভালাভ আছে কিনা, সেটা বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু তার যে ইহলৌকিক লাভালাভ—অর্থাৎ যাঁরা শ্রাদ্ধ করেন, তাঁদের পক্ষে লাভালাভ যে আছে, সেটা প্রত্যক্ষ করা যায়। "লাভালাভ" কথাটিকে শুধু নিচু অর্থে নেওয়ার দরকার নেই। লাভ উৎকৃষ্ট হতে পারে, নিকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু উৎকৃষ্টই হোক বা নিকৃষ্টই হোক, সেটা [illegible] বা ইচ্ছার চেয়ে জীবিতদের প্রবৃত্তি এবং তন্নিহিত প্রয়োজনের উপর বেশী নির্ভর করবে।

মৃত নেতার "আদর্শের" প্রতি আনুগত্য স্বীকার, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণের "প্রতিজ্ঞা", তাঁর "আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত করার" সংকল্প ঘোষণা—এগুলির মূল্যও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি হিসাবে ততটা নয়, যতটা বর্তমানে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজেদের আশ্বাসদান হিসাবে। যিনি আমাদের সকলকে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন, তাঁর যাওয়াতে আমরা যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাইনি, স্থূল বন্ধন-সূত্রের পরিবর্তে একটা সূক্ষ্ম সূত্রে যে আমরা এখনও একত্র বাঁধা আছি—ঐক্য এবং সম্মিলিত এই [illegible] নিজেদের দেওয়ার জন্যেই এইসব [illegible] ও সংকল্পের উচ্চারণ। এগুলি [illegible] এগুলি [illegible] আবার এগুলিকে ভবিষ্যৎ কর্মের ভিত্তি বলে ধরে নেওয়াও যায় না. [illegible] স্বাধীনতার [illegible] গান্ধীজীর নাম নিয়েও আমরা [illegible] প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। সেগুলি পালিত হয়েছে বলা যায় না, কিন্তু সবাইকেই আমরা গান্ধীর সন্তান বলে নিজেদের মধ্যে একটা ভাবের সৃষ্টি করে সেই ভাবটাকে কিছু কাজে লাগানো গিয়েছিল। আসলে কিন্তু কোনো নেতাই তাঁর আরব্ধ কর্মের ভার তাঁর পরবর্তীদের উপর দিয়ে যেতে পারেন না, কাউকে নিজের "উত্তরাধিকারী" বলে ঘোষণা করলেও, না।

কারণ, পরবর্তীরা যেখান থেকে হাত লাগাবেন, সেখান থেকে কাজ তাঁদের প্রকৃতি অনুযায়ী রূপ গ্রহণ করতে থাকবে। যে ক্ষেত্রে নেতা তাঁর আরব্ধ কর্মের মধ্যে খুব একটা তীব্র গতিবেগ সঞ্চারিত করে দিয়ে যেতে পারেন, সে ক্ষেত্রে কিছুকাল একটা ধারাবাহিকতার অনুভূতি সম্ভব। কিন্তু তাও কিছুকাল মাত্র এবং যতদিন বাহ্যিক পরিবেশে বিশেষ কোনো উলট-পালট না ঘটে।

কিন্তু সেরূপ পরিস্থিতি কদাচিৎ দীর্ঘস্থায়ী হতে দেখা যায়। বরং দেখা যায় বাহ্যিক পরিবেশ সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং একএকটা যুগ আসে, যখন মানুষকে নিত্য-নূতন [illegible] পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়। [illegible] কোনো [illegible] প্রতি আনুগত্য এবং কতকগুলি [illegible] প্রতি নিষ্ঠা অবশ্যই রাখতে হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুসারে কার্যের ধারা বা পলিসিরও প্রয়োজনমত পরিবর্তন বা সংস্কার আবশ্যক হয়। প্রকৃতপক্ষে জওহরলালজীও যে সকল বিষয়ে বা কোনো বিষয়েই একই পলিসি বরাবর অনুসরণ করে এসেছেন, তা নয়। সাধারণত পলিটিক্সে অবস্থানুযায়ী পলিসির পরিবর্তন করা একটা দক্ষতার লক্ষণ হলেও সেটা স্বীকার করা পলিটিসিয়ানদের মধ্যে একটা লজ্জার ব্যাপার বলে পরিগণিত হয়। (অবশ্য এ কথা কেবল পলিটিসিয়ানদের প্রতিই প্রযোজ্য নয়, ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতিও এটা প্রযোজ্য এবং যেখানে পলিটিক্যাল মত বা ইডিওলজি ধর্মবিশ্বাসের স্থান নিয়েছে, সেখানে তো কথাই নেই।) খোলনলচে বদলে যাবার পরেও হুঁকোর পরিবর্তন স্বীকার করা হয় না [illegible] তা নয়,—একে অপরের বিপরীত। পৃথিবীর সর্বত্র এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, আমাদের দেশেও আছে।

অতীতে জওহরলালজী যেমন তাঁর কোনো কোনো পলিসি পরিবর্তন করেছেন, তেমনি তিনি বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতেও করতেন। করতে হত; কারণ, দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে কোনো পলিসিই চিরকাল অপরিবর্তনীয় থাকতে পারে না। ভারতের নূতন গভর্নমেণ্টকেও অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন পলিসি পরিবর্তন করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পলিসির [illegible] করতে হবে। সর্বোপরি [illegible] গভর্নমেণ্টের স্টাইল বদলে যাবে। কারণ, জওহরলালজীর কর্তৃত্বের যে স্টাইল ছিল এবং এখন যাঁদের হাতে কর্তৃত্ব এলো তাঁদের যে স্টাইল হবে, এ দুটো দু রকমের, দু জাতের।

*

জওহরলালজীর মতো নূতন প্রধানমন্ত্রী

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার নিজের হাতে রেখেছেন। এটাই পাকাপাকি বন্দোবস্ত না-ও হতে পারে, তবে পররাষ্ট্র দপ্তরের অন্তর্জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ নূতন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সেদিক দিয়ে এই ব্যবস্থা ভালোই হয়েছে। অবশ্য লালবাহাদুরজীর পক্ষে এই পরিচয় লাভ জওহরলালজী জীবিত থাকতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। জওহরলালজী অসুস্থ হওয়ার পরে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন "দপ্তরবিহীন" মন্ত্রিরূপে এলেন, তখন থেকেই পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব কিছু কিছু করে তাঁকে বহন করতে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে দায়িত্ব হস্তান্তর জওহরলালজী নিজেই আরম্ভ করে যান।

পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে লালবাহাদুরজী কতটা সফলতা লাভ করবেন বা অন্য কাউকে এই দায়িত্ব দিলে বেশী সফলতা লাভের সম্ভাবনা ছিল কিনা—এই ধরনের প্রশ্ন এখন তুলে লাভ নেই। আসলে পররাষ্ট্র সচিবের যোগ্যতার কোনো বাঁধাধরা মাপকাঠি নেই। কী ধরনের লোক কোন্ সময়ে সবচেয়ে বেশী সফলতা অর্জন করবেন, সেটা সেই সময় এবং সেই সময়ের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। সব লোক সব রকম সময় বা সব রকম অবস্থার পক্ষে উপযোগী নয়। ইতিহাসে পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁরা যদি ভিন্ন রকম কালে বা অবস্থায় পড়তেন, তা হলে হয়ত তাঁরা অখ্যাত থেকে যেতেন, এমন কি, অকর্মণ্য বলে তাঁদের ভাগ্যে নিন্দালাভও ঘটতে পারত।

বলা বাহুল্য, পররাষ্ট্র নীতির সফলতা কেবল আন্তর্জাতিক অনুকূল পরিস্থিতির উপরও নির্ভর করে না, অনেকাংশে পররাষ্ট্র নীতি দেশের অভ্যন্তর শক্তিরই প্রতিচ্ছবি। কোনো কোনো সময়ে দেখা যায়, কোনো দেশের অভ্যন্তর অবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব থাকলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা সম্ভব হয়, যখন শৃঙ্খলার অভাব থাকলেও প্রাণশক্তির প্রাচুর্য থাকে এবং তার স্রোত চলে। স্রোতের জলে ময়লা পড়লেও তা জমতে পায় না। সাজানো-গোছানো দোকানের চেয়ে খোলা জলের স্রোতস্বিনীর বারতা কেবল প্রাণের নয়, ঐশ্বর্যের আশ্বাসও ঢের বেশী বহন করে।

১২-৬-৬৪

নরক এবং স্বর্গ

নরক আর স্বর্গ—এই দুটি মনোরম জায়গা আমরা এ পর্যন্ত কেউ-ই দেখিনি। যদিও সাহিত্যের কল্যাণে, পটের ছবিতে নরকের সেই ভয়াবহ রঙীন দৃশ্যাবলী আপনারা অনেকেই দেখে থাকবেন। এবং আরো বিবিধ সূত্রে এদের কিছু কিছু পরোক্ষ পরিচয় মিলেছে, কিন্তু পঞ্চভূতের বন্ধনে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও সুযোগ নেই। দেহান্তের জন্যেই আপাতত প্রতীক্ষা করতে হবে, নাস্তিকের কী গতি হবে সেটা আমি সঠিক অবগত নই।

মহাজনেরা নরক এবং স্বর্গের বিবরণ দিয়েছেন (যেমন ধরুন দান্তে)—তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণে আমার মতো দীন ব্যক্তিও যদি কিছু সাহিত্য চর্চার প্রয়াস করি, ধীমান পাঠক নিজগুণে মার্জনা করবেন। আমার আর একটি বিনীত নিবেদন: "এই নরক এবং স্বর্গের বর্ণনা সম্পূর্ণই কাল্পনিক—ইহার সহিত বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নাই।"

নরক নিয়ে মাইকেল অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, আমি তাঁর নকল করতে চাই না। আমার বর্ণনা খুব সংক্ষিপ্ত। গ্রামের পর গ্রাম আগুনে পুড়ে ছাই; নিরীহ প্রতিবেশীর বাস্তু মাটি জ্বালা; যথাসর্বস্ব নির্বিচারে লুণ্ঠন; নারীর মর্যাদা শয়তানের বিদ্রূপ; আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক পান্ডিমোনিয়ামে অনাবশ্যক; তাড়া খাওয়া জন্তুর মতো পলায়নপর মনুষ্যনামিক একদল প্রাণী—কিন্তু স্বরপ্রান্তেও নরকের প্রতিহারীর কাছে নিষ্কৃতি নেই; শেষ তাম্রখণ্ড এবং শেষ তরুণী কন্যা-বধূর বিনিময়ে এক বস্ত্রে দ্বিখণ্ডিত সীমান্ত অতিক্রমণ।

এ নরক কোনো মহাকবির কাব্যে নেই; তাঁরা ত্রিকালদর্শী হতে পারেন, কিন্তু তাঁদের কল্পনাও এতদূর পর্যন্ত এগোতে সাহস পায়নি। আমিও আর জের টানতে চাই না—এর ওপর যবনিকা এইখানেই থাকুক।

জলের আর এক নাম জীবন

প্রাণরক্ষা ও প্রাণত্যাগের একমাত্র জলাশয়

বরং স্বর্গের রূপটাই ভালো করে দেখা যাক।

কল্পনা করুন—কারণ আগেই বলেছি, এর সবটাই কাল্পনিক—একটি বিরাট প্রান্তরের মধ্যখানে হাজার হাজার তাঁবু, হাজার হাজার লোক। এরা কারা? নরক থেকে পলাতকের দল—"Fugitive from devil's prison!" এরা আপাতত স্বর্গাশ্রিত।

সেই স্বর্গ এখন এই মাঠের ভেতর। এমন মাঠ—যেখানকার নিষ্ঠুর, রুক্ষ পাথুরে মাটিতে একটি গাছ পর্যন্ত গজাতে চায় না। নির্মেঘ আকাশে হিংস্র সূর্য উদয়ের সঙ্গে

সংগেই আগ্নেয় হয়ে ওঠে। বেলা বাড়ে, মাটিতে যেন আগুনের শিখা লক্‌ লক্‌ করতে থাকে. তাঁবুর ভেতরে কল্পনাতীত উত্তাপে শিশু আর বৃদ্ধের দল হাঁপানির মতো শ্বাস টানতে টানতে ছটফট করে মরে যায়।

তৃষ্ণার জল? কয়েকটি পাইপের মুখে কৃপণ বর্ষণ। ভোর পাঁচটায় লাইন দিলে হয়তো বেলা এগারোটায় এক কলসী জল মেলে, তাই দিয়ে একটি পরিবারের রন্ধন ও তৃষাহরণ। স্নানের জন্যে একটি পুকুর আছে কিছু দূরে। কিন্তু তার জলে নামা প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠেছে—পায়ে পায়ে ঠেকে শিশুর মৃতদেহ, বৃদ্ধের করোটি। কাঁথায় জড়িয়ে মড়া নিয়ে এসে তার কাদায় পুঁতে দেওয়া হয়। পোড়াবে কে? কাঠ কিনতে পয়সা লাগে না?

পয়সা? পরিবার প্রতি মাসে ষোলো টাকা বরাদ্দ। তাতে করে কোনো মতে দু'বেলা চাল সেদ্ধই করা চলে. অন্য প্রসঙ্গ অবান্তর। অসুখ, মৃত্যু—প্রতিমুহূর্তের সংগী। ডাক্তার আছেন প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য, ওষুধ নেই বললেই চলে।

ধরুন, স্বর্গে এক দেবশিশু আসছে। আসন্নপ্রসবা জননীকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলুন। না—কোনো প্রসূতিসদনে নয়, দূরে ওই যে মরা-মরা গাছের চারদিকে কাপড়ে ঘেরা জায়গাটি দেখছেন, ওইটিই সেই পুণ্যভূমি। ওইখানেই ডাক্তার ধাত্রী আছেন, শিশুর জন্ম হলে এবং জননী একটু সুস্থ হলেই (কিছু জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে) তাদের আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অবশ্য শিশুটির বেশি দুর্ভাবনা নেই, দুপুরের রোদ আর একটু চড়া হলেই এই ভবযন্ত্রণা অথবা দিব্যযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে সে।

জীবিকা? হ্যাঁ, আছে জীবিকা। রেল লাইন তৈরী করতে হবে দুরন্ত রোদে—দুর্গম অঞ্চলে পাথর ভাঙতে হবে।

'আমরা জেলে। আমাদের জাল দিন, মাছ ধরবার ব্যবস্থা করে দিন।'

'প্রভিশন নেই, দুঃখিত। পাথর ভাঙো।'

'আমরা কুমোর। একটু বন্দোবস্ত করে দিলেই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারি।'

'কোনো স্কীম নেই। খোয়া সাজাও।'

'দেখুন, আমি শিক্ষক। তার ওপর বয়েস হয়েছে, এখন এ-সব ম্যানুয়েল লেবার পারব কেন? কথা ছিল, শিক্ষকতার কাজ দেবেন আমাদের। যদি দয়া করে—'

'ওসব পরে—আপাতত কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই। এখন যান—রেল লাইনে কাজ করুন।'

'আমরা এখানে থাকতে পারছি না। বেরিয়ে যেতে দিন দূরের শহরে গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করি।'

প্রাচীন মিশরের ক্রীতদাস — স্বাধীন ভারতের ক্রীতদাস

স্নাপ করবেন, হুকুম নেই। তারের বাইরে যেতে পারবেন না।'
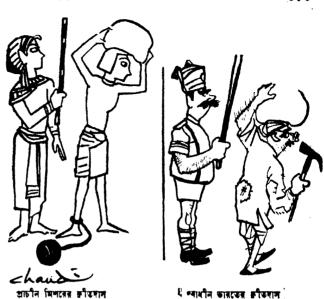
কল্পনায় স্বর্গের এই ছবিটা আঁকতে আঁকতে কলম থেমে গেল। দেখলুম, এখানেও কোনো মহাকাবির সংগে আমার মিলছে না।

এই স্বর্গীয় সমস্যা নিশ্চয় নিদারুণ—সদিচ্ছা এবং চেষ্টারও নিশ্চয় অভাব নেই—তবু কল্পনায় একটি প্রশ্ন জাগল। আর কি জায়গা ছিল না? সেই যেখান থেকে অনাহূতে অবাঞ্ছিতের বিতাড়ন চেষ্টা চলছে, সেই যেখানে দিগন্ত ছোঁয়া শ্যামল নির্জন, যেখানে স্নিগ্ধ বনভূমি, যেখানে নিবিড় নীল মেঘ আর উদার বিস্তৃত নদীর রূপোলী জলধারা—সেখানে কি এদের অনেকেরই দুঃখমোচন হত না?

উত্তর আসে: উঁহু, ও প্রশ্ন আর তুলো না। স্বর্গীয় সংহতি নষ্ট হবে।

স্বর্গীয় সংহতি!

কল্পনায় নরক-স্বর্গের ছবি আঁকতে গিয়ে দুটোই একাকার হয়ে গেল। তখন মনে হল, আমরাও কি সত্য, না একদল অশক্ত ক্লীব দুঃস্বপ্নের ছায়ামূর্তি—অবান্তরের ছায়াপথেই ভেসে চলেছি?

সাংবাদিকের চোখে মানুষ নেহরু

শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সাংবাদিক জীবনে বহু মনীষী, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনেতার সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে, তাঁদের সংস্রবে গিয়েছি, তাঁদের সঙ্গে কথা ব'লেছি, তাঁদের অনেকের সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেও পেরেছি। সাংবাদিক জীবনের স্মৃতির পাতা ওল্টাতে পিছনে ফেলে আসা অনেক দিনের অনেক স্মৃতি এসে মনের মধ্যে ভিড় করে, অনেক ভুলে যাওয়া কথা নতুন ক'রে মনে পড়ে। বিগত দিনগুলির অনেক স্মৃতি যেমন মধুর, অনেক স্মৃতি আবার তেমনি দুঃখের স্পর্শে মলিন ও বেদনাবিধুর। তার মধ্যে কয়েকটি দিনের ঘটনা আজও উজ্জ্বল ও ভাস্বর হ'য়ে আছে জীবনে, সে দিনগুলোর স্মৃতি জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না, ভুলতে চাই ও না। মানুষ জওহরলালকে দেখেছি আমি একজন সাংবাদিক হিসেবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যাবার সৌভাগ্য হ'য়েছে আমার—আমি তাঁকে দেখেছি, একজন সহৃদয় মানুষের অন্তরের আবেগে কম্পিত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠতে দেখেছি তাঁর মধ্যে। সাধারণ মানুষকে তিনি কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন ব্যক্তিগত জীবনে আমি তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছি। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে জওহরলালকে আরও কাছে থেকে দেখা সম্ভব হ'য়েছে সেকালের সাংবাদিকদের পক্ষে।

সাল ও তারিখ আজ ঠিক ঠিক মনে নেই কিন্তু ঘটনাগুলো আজও স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল হ'য়ে মনের মধ্যে ভাসছে।

সাংবাদিক হিসেবে তখন আমার সবে হাতেখড়ি, কিন্তু সৌভাগ্য বলতে হবে আমার সেই সাংবাদিক জীবনের প্রারম্ভ-কালেই আমি সুযোগ পেয়েছিলাম সিমলায় অনুষ্ঠিত "ওয়াভেল সম্মেলনের" সংবাদ যোগাড় ক'রে আনার। অবশ্য আমি ছিলাম আরও তিন-চারজন সাংবাদিকের সঙ্গে এবং তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন আমার চেয়ে বয়সে বড়, অভিজ্ঞতায় তো বটেই—সবাই তাঁরা প্রবীণ সাংবাদিক। সত্যি কথা বলতে কি, আমি ছিলাম তাঁদের সাহায্যকারী মাত্র, সাংবাদিকের পূর্ণ মর্যাদা বলতে গেলে তখনও আমি লাভ করিনি।

সম্মেলন প্রায় শেষ হ'য়ে আসছে। আমরা সবাই অপেক্ষা ক'রে আছি কবে বলা হবে "সব শেষ"। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চ'লছে এবং ভারতকে সেই শরিক করার প্রচেষ্টায় ইংরাজ সরকার এই সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। পণ্ডিত নেহরু তো বটেই, কংগ্রেসের অন্যান্য বড় বড় নেতারাও ফ্যাসিজিমের বিরুদ্ধে এই লড়াইতে অংশ গ্রহণ ক'রতে রাজী ছিলেন—কিন্তু এক শর্তে, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে। রাজাজী—লিয়াকৎ ফর্মুলা নিয়ে বহু আলোচনা হ'ল সম্মেলনে, কিন্তু ফল কিছুই হ'ল না। সরকারীভাবেও কোনও কথা বলা হচ্ছে না সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে। সাংবাদিকরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সেদিন রাত্রে লণ্ডন বি-বি-সি থেকে ঘোষণা করা হ'ল সম্মেলনের নিষ্ফল পরিণতি—কি কি ব্যাপারে মতানৈক্য হ'য়েছে, সে সব কিছুই বলা হ'ল বিস্তারিতভাবে। ভারতীয় সাংবাদিকরা অবাক হ'লেন, হয়তো তাঁদের মনে খানিকটা ক্ষোভের বাষ্পও জমা হ'য়েছিল, কারণ ভারতীয় সাংবাদিকরা কেউ তখনো কোনও সংবাদ পাঠাননি সম্মেলনের পরিসমাপ্তি সম্পর্কে।

আমার তখন অল্প বয়স, মনের উৎসাহ এবং সাহস দুই-ই অপরিসীম। পরদিন খুব সকালে উঠেই গেলাম নেহরু যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়িতে। তখনও সূর্যের আলো ভালো ক'রে ফোটেনি, সিমলা শহর তখনও ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। দেখলাম, নেহরুর ঘরে আলো জ্বলছে। সাহস ক'রে ঢুকে গেলাম কাউকে কিছু না ব'লেই। দেখলাম নেহরু তখন দাড়ি কামাচ্ছেন—বললাম আমার পরিচয়। কিন্তু এ কি মূর্তি। সোজা দরজা দেখিয়ে রাগত স্বরেই বললেন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে।

দুরু দুরু বক্ষে বেরিয়ে এলাম, দুঃখভরা মন নিয়ে সোজা চ'লে এলাম আমাদের ক্যাম্পে। চুপ ক'রে বসেছিলাম ঘরের

কলকাতার দৈনিক পত্রের বিশিষ্ট সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনারত নেহরু

মধ্যে। এমনিভাবে কতক্ষণ কাটলো জানি না, হঠাৎ দেখি নেহরুজীর একান্ত সচিব খোঁজ ক'রছেন। সকালবেলা কে গিয়েছিল পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা ক'রতে। আমার সহকর্মীদের কাউকেই আমি এ সম্পর্কে কিছু বলিনি। তাঁরা তো অবাক। কে যাবে এত ভোরে পণ্ডিতজীকে বিরক্ত করতে। মনে সাহস সঞ্চয় ক'রে বেরিয়ে এলাম। হেসে বললেন নেহরুর একান্ত সচিব—"চলুন, পণ্ডিতজী ব'সে আছেন আপনার অপেক্ষায়।" আশ্চর্য লাগলো। বললাম তাঁকে "আমাকে কিন্তু উনি ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।" চললাম তাঁর সঙ্গে আবার সেই ঘরে যে ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছিলাম প্রায় দু ঘণ্টা পূর্বে। সামনে বসা সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি। হেসে সেদিন অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন নেহরু আমাকে, জানতে চেয়েছিলেন—কবে যোগ দিয়েছি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে 'কেন এসেছি এই কাজে, সকালবেলায় যে ক্রোধ দেখে গিয়েছি এখন তার বাষ্পও টের পেলাম না। এখন একেবারে ভিন্ন মূর্তি। জীবনে এই প্রথম নেহরুজীর সঙ্গে মুখোমুখি ব'সে কথা

বললাম। তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—এই লাইনে যখন এসেছি তাঁর দাড়ি কামানো আর স্নান সাঙ্গ হওয়ার পূর্বে তাঁকে যেন কখনও জ্বালাতন না করি।

করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিলাম তাঁর কাছে। জিজ্ঞেস ক'রলেন, কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। বি-বি-সি আগের রাত্রে সম্মেলনের পরিণতি সম্পর্কে যে সংবাদ ঘোষণা করেছে তা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন—সকালে তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি, তাই তোমাকে বলবো—কেন এই সম্মেলন নিষ্ফল হ'চ্ছে। প্রায় ১৫ মিনিট তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন. তাঁর প্রতিটি কথা প্রতিটি শব্দ আমি টুকে নিলাম।

সেদিনকার সবচাইতে বড় খবর তখন আমার ক্ষুদ্র নোট বইতে লিপিবদ্ধ করা রয়েছে। কিন্তু বিহ্বল চিত্তে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবছিলাম এই মানুষটির কথা, কত মহৎ কত কোমল হৃদয় ও উদার তিনি. সকালবেলায় অন্যায় করেছিলাম আমিই, না বলে কয়ে কোনওরকম অনুমতি না নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে আমিই তো অপরাধ করেছিলাম। কি প্রয়োজন ছিল তাঁর আমাকে ডেকে পাঠাবার। তাঁর বিরাট ও উদার মনের যে পরিচয় আমি সেদিন পেয়েছিলাম তা জীবনে কোনদিন ভুলবো না। "সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থেকে সকাল-বেলা কে এসেছিল তাকে ডেকে নিয়ে এসো" —একান্ত সচিবের উপরে এই ছিল তাঁর আদেশ। এই উদারতা. মানুষের প্রতি এই প্রগাঢ় ভালোবাসা এই হচ্ছে আসল নেহরু। ইনিই যে সকালবেলা [illegible] অনুমতি [illegible] পূর্বে [illegible] দাড়ি কামিয়ে নিয়েছেন [illegible] এই [illegible] কথা। [illegible] এই [illegible] শান্ত ও অনিন্দ্যনীয় [illegible] আছে।

স্মৃতির মণিকোঠায় এমনি আরও কয়েকটি ছায়া এসে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে। ১৯৪৬ সাল—পণ্ডিত নেহরু গিয়েছেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পরিদর্শনে। তখনও তিনি প্রধানমন্ত্রী হননি, ভাইসরয়ের উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিয়েছেন। নেহরুর এই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পরিদর্শন ঘটনাবহুল এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়েও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এককালের বিখ্যাত কংগ্রেসী নেতা আবদুল কোয়ায়ুম খাঁ মুসলিম লীগের তরফ থেকে নেহরু এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তখন প্রবল আন্দোলন চালাচ্ছেন। পণ্ডিতজী যখন পেশোয়ারে বিমানপোত থেকে অবতরণ করলেন তখনই এক বিশাল মুসলিম জনতা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে শুরু করল,

তারপর নেহরুর বিরুদ্ধে ওদের তরফ থেকে বিভিন্ন স্থানে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হ'তে লাগলো। সেদিন সন্ধ্যাকালে ওরেকজাই থেকে নেহরুজী পেশোয়ারে ফিরে গেলেন, আমরা কয়েকজন সাংবাদিক ইচ্ছা করেই পিছিয়ে পড়েছিলাম। তখন আমরা জানতাম না কী ভয়ংকর বিপদ নেহরুর সামনে অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ বাদে আমরা রওনা হ'লাম এবং কয়েক মাইল যেতে না যেতেই আমাদের গাড়ি আটক করা হ'ল। সামনে এক উত্তেজিত জনতা, তাদের সবার চোখে-মুখে দুরন্ত রোষের রক্তিম আভা। ক্রোধান্ধ নেকড়ের মতো নিষ্ঠুর ও হিংস্র হ'য়ে উঠেছে তারা। তাদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে এসে পুস্তু ভাষায় বললো—যার মর্মার্থ হ'ল—"তোমাদের নেহরুকে আমরা আক্রমণ করেছিলাম। ভাগ্য ভালো, সামান্য আঘাত পেয়েই তোমাদের এই হিন্দু নেতা জীবন নিয়ে চলে যেতে পেরেছে। আবার যদি সে কখনো আমাদের দেশে আসে তাহ'লে তাকে আর জান নিয়ে ফিরে যেতে হবে না।" কোনরকমে তাদের এড়িয়ে গিয়ে ওখানকার সৈন্যবাহিনীর জনৈক অফিসারের কাছে জানতে চাইলাম, পণ্ডিতজীর আঘাতটা কি ধরনের। যখন শুনলাম তিনি খুব সামান্য আঘাত পেয়েছেন তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হ'লাম। কিন্তু মুশকিল হ'ল আমাদের যাওয়া নিয়ে, আমাদের বলা হ'ল একটা কনভয় না এলে আমাদের যেতে দেওয়া হবে না। চার ঘণ্টা নষ্ট হ'ল ওখানে। খবর অবশ্য পাঠালাম। কিন্তু যে ঘটনা এখন আমি উল্লেখ করতে যাচ্ছি তার সাথে এ ঘটনার বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই।

যখন সন্ধ্যার পরে আমরা পেশোয়ারে গিয়ে পৌঁছলাম তখন দেখলাম নেহরু যে বাড়িতে রয়েছেন স্বর্গত ডাঃ খান সাহেবের সেই বাড়ির বারান্দায় পায়চারি করছেন। পিছিয়ে পড়া সাংবাদিকদের দেখতে পেয়েই তিনি ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—"তোমরা কোথায় ছিলে, শিগগীর চলো। পণ্ডিতজী তোমাদের না দেখে অস্থির হ'য়ে পড়েছেন।"

এই স্নেহ, সাংবাদিকদের জন্যে এই অসীম উৎকণ্ঠা,—এ কি কখনও ভুলতে পারা যায়, জীবনে কখনও ভোলা সম্ভব।'

পেশোয়ারে ফিরে এসেই পণ্ডিতজী খোঁজ নিয়েছিলেন যারা তাঁর সঙ্গে ছিল তারা সবাই ফিরে এসেছে কিনা। যখন শুনলেন চারজন সাংবাদিক তখনও পর্যন্ত ফেরেনি তিনি ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। কোথায় তারা—খোঁজ করো।

চারদিকে খবর গেল...কিন্তু কোন জায়গা থেকে সাংবাদিকদের কোনও খবর পাওয়া গেল না। পণ্ডিতজী অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়েছেন—দুশ্চিন্তায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত।

যখন আমরা গিয়ে পণ্ডিতজীর সামনে উপস্থিত হলাম প্রথমে তাঁর কাছ থেকে পেলাম ভর্ৎসনা। কিন্তু আমরা সবাই জানি এই ভর্ৎসনার পিছনে রয়েছে কতখানি স্নেহ ও দরদ। আমরা ধন্য হ'য়ে গেলাম। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনলেন তিনি আমাদের কাছ থেকে—কি ক'রে আমরা পিছিয়ে পড়েছিলাম এবং পথে কি ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের জন্যে চায়ের বন্দোবস্ত করতে তিনি ভুললেন না।

নেহরু সম্বন্ধে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ না ক'রে পারছি না। প্রধানমন্ত্রী-রূপে তিনি যাচ্ছেন কোচিন বন্দর থেকে বম্বে আই এন এস "দিল্লী"তে, সঙ্গে তাঁর সাংবাদিকরূপে ছিলাম আমি আর ছিলেন পি-টি-আই'র শ্রীপরশুরাম। পরশুরাম এখন রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে নিয়মিতভাবে খবর পাঠাচ্ছেন ভারতের একটি দৈনিক কাগজে।

তিন দিনের সমুদ্র সফর শেষ হ'য়ে আসছে। আমাদের যুদ্ধজাহাজগুলো একটির পর একটি এসে আমাদের জাহাজের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে—সেইদিকে মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রী নেহরু। ফটোগ্রাফার চোপরা ছবি তুলছেন। হঠাৎ রাগতস্বরে নেহরুজী বললেন, শ্রী চোপরাকে ঃ "আমার ছবি তুলছেন কেন? আমাকে তো সব সময়ই পাবেন। সুন্দর জাহাজগুলোর ছবি তুলুন আর ক্যামেরায় ধরে রাখুন ঐ নৌসেনাদের।" চোপরা তাড়াতাড়ি ক'রে ক্যামেরা ঘুরিয়ে নিলেন।

আর এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা বম্বে পৌঁছে যাব। আমি আর পরশুরাম এগিয়ে গেলাম পণ্ডিতজীর দিকে। হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কেমন লাগলো এই দিনগুলিতে ভ্রমণ?" এই প্রশ্ন তো আমাদেরই করার কথা, আমরা অবাক হ'লাম। একটু ভেবে নেহরুজী বললেন ঃ "সত্য কথা বলতে কি, এই ছোট্ট পরিসর-টুকুর মধ্যে আমি সারা ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করলাম, এখানে সবগুলি প্রদেশের ছেলেরা কেমন মিলে মিশে কাজ করছে—একাত্ম হয়ে গেছে। এই তো ভারতবর্ষের সত্যি-কারের চেহারা।" একটু থেমে আবার তিনি বললেন ঃ "এই তিন দিনে আমার "ভারত আবিষ্কার"-এ তিনটি নতুন অধ্যায় যোগ হ'ল।"

এই মানুষ নেহরু। তাঁকে কাছে থেকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা বলে ধন্য হ'তে পেরেছি—সেই ক্ষণিকের অপরিম্লান আনন্দের স্মৃতিতে সমস্ত অন্তর পূর্ণ হ'য়ে আছে আমার। কয়েকটি ঘটনা—হয়তো বা একান্তই অকিঞ্চিৎকর, হয়তো অতি ক্ষুদ্র—আমার মনকে ভরিয়ে রেখেছে। সেই হবে আমার অমূল্য সম্পদ, আমার জীবনপথে চলার পাথেয়।

তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাচ্ছে বলে। কোন একটাও যেন পুরোপুরি রূপ পাচ্ছে না। দূর দিগন্তের অস্পষ্ট সীমারেখা ধীরে ধীরে বৃত্তাকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

'কত স্পীডে যাচ্ছে?' চোখ বুজে হঠাৎ মিঃ বোস জিজ্ঞেস করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ দত্ত সাড়া দিলেন, 'পঁচাত্তর কিলোমিটার!' ভয়ে তাঁর গলা কাঁপছে।

অনাদির হাসি পেল। ভাবল, ও'র যত কিছু আনন্দ এখন ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

কথা শেষ। শুধু শব্দ। হাওয়া, পথ আর শব্দ। অনাদি লক্ষ করছিল, গাড়ি যখন চকিতে কোন বড় গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তখন একান্ত পরিচিত এক শব্দের উপস্থিতি জানান দিয়ে যাচ্ছে। সে শব্দ প্রবল ঝড়-জলের শব্দ। অনাদির ভাল লাগছিল। সে ভাবল, এখন চোখ বুজে শৈশব কি ছেলেবেলার কোন একটা ঝড়ের কথা স্মরণ করতে পারে। কথাটা ভেবে আবার হাসি পেল তার।

'অন্য গাড়িটা কোথায়?' চোখ বুজেই মিঃ বোস জিজ্ঞেস করলেন।

দত্ত নিরুত্তর। অতএব অনাদিকেই বলতে হল, 'আমাদের আগেই বেরিয়ে গেছে।'

'সবকিছু ঠিক তো?'

'আজ্ঞে।'

দত্তদম্পতি সামনের দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে। অনাদির খারাপ লাগছিল: এতে ড্রাইভারকে নার্ভাস করে দেওয়া হচ্ছে। অত ভয় নিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসা উচিত হয়নি। অনাদি বিরক্তিভরে বাইরের দিকে তাকাল। সূর্যের অবয়ব পূর্ণ হচ্ছে। কুয়াশা আরো কিছুটা ফিকে। দূরে-অদূরের গাছের পাতাগুলো যেন ধোয়া-মোছা চকচকে। পাতা বা ফলের গায়-গায় বুঝি এখনো কিছু কুয়াশা। রাস্তা বুঝিবা চাকচিক্যময়। দু'পাশের ক্ষেত রিক্ত। অনাদি ভাবল, বৈরাগ্য বুঝি এই!

তাদের মত আজ অনেকে চলেছে। আশে-পাশে শুধু গতি—গতি, গতির আরাধনা চলেছে। ডান পাশের একটা স্কুল-বোর্ডিং-এর বারান্দা থেকে চাদর গায় দুটো ছেলে তাদের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল। অনাদিও এর প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে থেমে গেল। সহসা অপ্রস্তুতের মত গাড়ির ভিতরে তাকাল। ইন্দ্রাণী তার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে। সে-ও হেসে ফেলল। ততক্ষণে গাড়ি অনেকটা চলে এসেছে।

পশ্চিম দিক শুধু নীলাভ সাদা। আর কিছু নেই। অনাদি সেদিকে তাকিয়ে যেন কিছুটা তৃপ্তি পেল। গাড়িখানা অসম্ভব ঝাকুনি দিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে মাটির রাস্তা থেকে নীচে সমতল জমিটার দিকে নামতে লাগল। ইতস্তত কিছু লোক সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা কি হিন্দী ছায়াছবির গান স্বরবিকৃতিসহ গীত হচ্ছিল। শুনে অনাদি শঙ্কিত হল। ভাবল, এখানে এই; তারপর!' গাড়ি সমতল ভূমিতে নামল। ধীরে ধীরে দক্ষিণে ঐ বিস্তৃত উঁচু টিবিটার দিকে এগোতে লাগল। আর একটু এগোতে অনাদি তাদের অন্য গাড়িখানা দেখতে পেল। গাড়িটা একটা নালার কাছ ঘেঁষে রাখা হয়েছে উত্তর দিকে মুখ করে। মার্টিনের ঠাকুর-চাকর দুটো এখনো গাড়ি থেকে মালপত্তর সব নামাচ্ছে। ওদের ড্রাইভার রতন ওদের সাহায্য করছে। তার পাশে ওরাও বোধহয় একটু এসেছে। এ গাড়িটাও ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নেমে মাটির ওপর দাঁড়াতে অনাদির কেমন কষ্ট-কষ্ট লাগছিল। এক-টানা এতক্ষণ বসে থেকে ও এত দ্রুতবেগে ছুটে আসার ফলে দেহের ভারসাম্য যেন হারিয়ে ফেলেছে। একটুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ভাবল, হাত ছড়িয়ে, গা বেঁকিয়ে 'আঃ' করে একটা শব্দ করে শরীরের আড় ভাঙবে কি না। কিন্তু পারল না। ওটা বাড়ির চার-দেওয়ালের মধ্যেকার ব্যাপার—এখানে সম্ভব না। তাই নিপুণ ভদ্রভাবে দুই ঠোঁ-র ওপর হাত-পার পেশী শক্ত করে উঁচু হয়ে দাঁড়াল। একটুক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে তারপর পা ছড়িয়ে সহজভাবে দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরাল। আয়েশ করে একটা টান দিল। এর পর চারিদিকে একবার ভাল করে তাকাল। দেখল, এবড়ো-খেবড়ো ঢালু পথ দিয়ে তাদের মত লোকজন নিয়ে আরো এক-আধখানা করে গাড়ি কাঁপতে কাঁপতে সমতল ভূমিতে নেমে আসছে। জমিটা বেশ বড়। এধারে ওধারে দু-চারটে চা সিগারেট-এর দোকান বসেছে। আরো কোটাকতক সাজগোজ করছে দেখে গেছে। অনাদি একটু ছোট্ট করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হঠাৎ অন্য সবার জন্য সচেতন হয়ে উঠল। ফিরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে তাকাল। ওরা সবাই কিছু দূরে নালার পারে দাঁড়িয়ে কি নিয়ে যেন আলোচনা করছে। অনাদি সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গুটি গুটি ওদের দিকে এগিয়ে গেল।

কাছাকাছি যেতে মিঃ বোস বলে উঠলেন, 'এই যে রায়, ঐ জায়গাটা তোমার কেমন লাগে!' বলে আঙুল দিয়ে উঁচু টিবিটার গা ঘেঁষে একটুকরো সমতল জমি দেখাল। লক্ষ করল অনাদি মিঃ বোস তাকে শুধু 'রায় ও তুমি' বলে সম্বোধন করছে। হঠাৎ

কল্পনা করে অনাদির হাসি পেল; লজ্জা-বোধ করল সে। অনাদি একবার তাড়াতাড়ি চারিদিক তাকাল সত্যি কেউ আছে কি না। উত্তর দিকের প্রান্তরটায় লোক গিসগিস করছে। চিৎকার হচ্ছে, ধূলো উঠছে। অনাদি যেন তাকাতে পারছে না। পশ্চিম দিগন্ত এখনো জলে-আকাশে ধূসর, অস্পষ্ট।

মিঃ দত্ত ধীরে ধীরে পায়চারি করছেন। এখন পর্যন্ত একবারের তরেও বসেননি। অত দামী স্যুট পরে এখানে আসা উচিত হয়নি। কিন্তু এক সময় না এক সময় তাঁকে বসতে হবেই। ওঁর বর্তমান অবস্থা দেখে অনাদির হাসি পেল: কি করুণ অবস্থা!

সে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে খুব ভাল করেছে। ঐ দিকটায় ইন্দ্রাণী ওরা ওদের মেয়েলী কাজ নিয়ে পড়েছে। কি নিয়ে যেন ওরা খুব হাসছে। ইন্দ্রাণীকে খুব খুশী দেখাচ্ছে। সকালের বিষণ্ণতার চিহ্ন কোথাও নেই। দেখে অনাদির ভাল লাগল। মিঃ দে স মল্লিকাল ওরা তিনজনে মিলে ত্রিপল খাটানোর কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে। ...ক, একটা তবু—বসবার ... া হল।

ইন্দ্রাণী দু হাতে ... পিরিচ নিয়ে এগিয়ে আসছে। অনাদি তার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। সে মিঃ দত্তকে আগে এক পেয়ালা চা দিয়ে তারপর অনাদির কাছে এসে দাঁড়াল। তার হাতে পিরিচ পেয়ালা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'চল একটু ঘুরে আসি।'

'এরি মধ্যে চা হয়ে গেল?'

'একবার ঘড়ির দিকে তাকাও দেখি।'

অনাদি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেকি!'

'বেলা কি কম হয়েছে। চল, ঘুরে আসি।'

'ওদের তুমি সাহায্য করবে না?'

'সব তৈরী। বাকী যা আছে, তা ঠাকুর-চাকর মিলে করবে এখন।'

চা খেয়ে অনাদি দাঁড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরতে লাগল: —ভীষণভাবে। চারিদিক একেবারে অন্ধকার দেখল। তাড়াতাড়ি অনাদি বলল, 'আমায় একটু ধর তো।'

'কি হল?'

কোন কথা না বলে স্থির দাঁড়িয়ে রইল অনাদি। ইন্দ্রাণী আলতোভাবে এসে তার হাত ধরল। আস্তে আস্তে দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে লাগল অনাদির। তারপর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মাথার ভেতর কেমন কনকনে একটা ঠান্ডা স্রোত অনুভব করতে লাগল।

'কি, হয়েছে কি?'

'কি রকম সব অন্ধকার অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল।'

'ঠায় এতক্ষণ রোদে বসে থাকার জন্য। বরং তুমি ঐ জায়গায় গিয়ে বস।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। ঠিক আছে। চল।'

ভগ্নস্তূপের ওপর এসে অনাদি অবাক হল। অনেক আগেক লোক এখানে! অসমতল স্থানটার এ-ঢিবি ও ভগ্ন থামের পাশে এক-একটি দল রান্না নিয়ে বসে গেছে। আশ্চর্য, নীচ থেকে সে এতটা অনুমান করতে পারেনি।

'এটা একটা জমিদারের বাড়ি ছিল, না?'

'কে বলল তোমায়?'

'উষাদি। মানে মিসেস বোস।'

অনাদি কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে এগোতে লাগল।

'উনিও হয়তো আমার মত শুনেছেন কারো কাছে।' অনাদি কোন কথা বলছেনা দেখে ইন্দ্রাণী বলল।

'একদিন ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে জিজ্ঞেস করব। আমার ধারণা ছিল, এটা একটা ফোর্ট। ইংরেজরা তৈরি করেছিল।'

'দেখলে তাই মনে হয়।'

'আমার অনুমান মাত্র, সঠিক জানি না।'

'আমিও আমার মনে হওয়ার কথা বলেছি।' ইন্দ্রাণী অনাদির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল। তারপর গালে টোল ফেলে দুষ্টুর মত হাসল।

'আর কতটা এগোবে?'

'আঁ!' অনাদি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি বলল, 'তা হলে ফিরে চল।'

'এখুনি?'

'তবে?'

'হঠাৎ এত কি ভাবছিলে?'

অনাদি ম্লান একটু হাসল। বলল, 'গুছিয়ে বলবার মত কিছু নয়। থাকগে, ঐ জায়গাটায় গিয়ে বসি।' বলে তারা একটা শানবাঁধান ভগ্ন চত্বরে গিয়ে বসল।

পেছনে একটু দূরে মাদুর বিছিয়ে তিনটি ছেলে একটি মেয়ে তাস খেলছে। ওরই পাশে গুটি কয় ছেলেমেয়ে অদ্ভুত নীরবে রান্না করছে। এ জায়গাটা অপেক্ষাকৃত আশ্চর্যজনকভাবে নির্জন। আরো একটু পেছনে কয়েকটা খাদ পেরিয়ে একটু নীচু জায়গায় একটা চৌকো মত উঁচু গম্বুজ। তার গায়ে বসানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে কয়েকটি ছেলে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে। দেখে অনাদি একটু হাসল। ভাবল বলবে কিনা, 'দুর্গ প্রহরীর পর্যবেক্ষণাগার।' কিন্তু

অস্বচ্ছতা এখন রক্তিমতায় আচ্ছন্ন। বিরাট প্রান্তরটা মত্ত-উৎসব শেষে ক্লান্তিতে ধুকোতে শুরু করেছে। ভাঙন শুরু হয়েছে সব কিছুতে। শেষ রোদের আলোতে মনে হয় সর্বত্র রাশি রাশি ধুলো উড়ছে। এদিকে একে একে গাড়ি বোঝাই করে রওনা দিতে শুরু করেছে। শেষবারের মত মিসেস বোস এক পাত্র করে চা সামনে ধরলেন। মিঃ বোস ও মিঃ দত্ত ত্রিপলের ওপর পা ছড়িয়ে বসে। সবার চোখে ক্লান্তির ছাপ। মনিলালরা সবকিছু গোছগাছ করে গাড়িতে ওঠাচ্ছে। ইন্দ্রাণী চারিদিক ঘুরে-ফিরে দেখছে কোথাও কিছু পড়ে রইল কিনা। আবার যেন কনকনে ঠাণ্ডা অনুভব হচ্ছে। হাওয়াও কেমন ভিজে ভিজে।

মনিলাল গাড়ি হর্ন দিল। মিঃ বোস ও মিঃ দত্ত উঠে দাঁড়ালেন। ত্রিপল ভাঁজ করা হল। তারা ধীরে ধীরে নালা ঘুরে গাড়ির দিকে চলল।

গাড়িতে উঠতে যাওয়ার আগে ইন্দ্রাণী অনাদিকে আস্তে করে বলল, 'ঐদিকে তাকিয়ে দেখ।' অনাদি তাকাল। দেখল, পশ্চিম দিগন্তে জলের সমতল হতে অনেকটা জায়গা জুড়ে যেন একটা বিরাট বর্ণ স্তূপ উঠেছে। মনে হয় গলিত লোহা এবার একটু একটু করে জমাট বাঁধতে যাচ্ছে। তার প্রতিফলনে সামনেকার কিছুটা জল রক্তবর্ণ। যেন কেউ মুঠো মুঠো খুন-খারাবি রং ছড়িয়ে দিয়েছে। আর ঠিক তখনই ওপরে—আকাশে দ্বিতীয় বন্ধনীর মত একটা সূক্ষ্ম রেখা কাঁপতে কাঁপতে ক্রমশ স্থূল হয়ে আসছে। অনাদি বুঝতে পারল:—বেলে হাঁস। কোথায় যেন সে পড়েছিল: 'সন্ধ্যাকে ওরা ওদের ডানায় করে যেন নিয়ে আসে।' অনাদি চেপে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অনাদি সকালে চাপ চাপ শুভ্র নিরুচ্চার কুয়াশা দেখতে চেয়েছিল। সেই কুয়াশা নিঃশব্দে ক্রমশ যেন গাঢ় হয়ে আসছে। মনিলালের পাশে বসে এখন সে-সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ইন্দ্রাণী এখনো সেই দিগন্তের দিকে তাকিয়ে। ও হয়তো দেখছে বিরাট আকাশ, আর তার নীলরঙ বুকে নিয়ে সমুদ্র কি উচ্ছল! ওরই কাছে কোথাও তারা পরস্পরকে নিবিড় করে পাবে। —কিন্তু ও কি আমাকে ভুল বুঝল! ছোট ভাই শিবপুরে পড়ছে, ঘরে মা উন্মাদ, আর আমি—' অনাদি আর যেন ইন্দ্রাণীর দিকে তাকাতে পারছে না। সোজা রাস্তার দিকে তাকাল। হেড লাইট পুরো জেলে মনিলাল চাপ চাপ নিরুচ্চার কুয়াশা কেটে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। চারপাশের দৃশ্য কুয়াশার একেবারে অন্তরালে। অনাদির মনে হল—মনে হল সে যেন একটা মসৃণ সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে তীব্র বেগে সামনে ধূসর অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাগান বিলাস

"The Agricultural Society, of which I am myself a member, consists of a number of gentlemen who consult together to encourage agriculture by the introduction of foreign seeds & plants and the improvement of the existing modes of cultivation and your Highness will not fail to perceive that, as the land is the original source of all wealth, this society which has for its object to increase the quantity & improve the quality of its produce, is highly deserving of consideration & patronage."

—Lord William Bentinck, in a letter to the Punjab Keshari Ranjit Singh.

এখন যেখানে সরকারী পশুশালা, শোনা যায়, সেখানে মীরজাফর-প্রণয়িনী মণিবেগম থাকতেন। জাফর খাঁর কলকাতায় বাগানবাড়ি ছিল, আজকাল যেখানে রয়্যাল এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটির বাগান, সেখানে। পরে এই তেষট্টি বিঘা জমি ওয়ারেন হেস্টিংসের হাতে আসে। বেলভেডিয়ার রাজপ্রাসাদের পাশের বীথির নাম ডুয়েল অ্যাভিনু। হেস্টিংস আর কৌন্সিলের সদস্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় এখানে। বর্তমানের খিদিরপুর হাউস সেকালে কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য বারওয়েল সাহেবের বাটী ছিল। সেকালের বেলভেডিয়ার রাজারাজড়াদের আবাসস্থল ছিল। ছোটলাটের বাড়িতে জাতীয় গ্রন্থাগার বসেছে এখন, জাফর খাঁর আবাস জুড়ে রচনা করা হয়েছে কলকাতার একমাত্র ফুল-ফলের বাগান। শহরে এমন দ্রষ্টব্য স্থান আর দ্বিতীয় নেই। বহুদিন ধরে শুনে আসছিলাম এই বাগানের কথা—তখনো দেখা হয়নি কিংবা হয়তো বিশ্বাস জন্মায় নি যে, কলকাতার বুকে এমন এক স্বপ্নরাজ্য সংরচিত আছে। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত হতো। দিল্লিতে বুদ্ধজয়ন্তী পার্ক দেখে এসেছি—উঁচুনিচু জায়গায় যেখানে যেমন সেখানে তেমনভাবেই ফুলের শয্যা পেতে দেওয়া হয়েছে, ইতস্তত ফোয়ারা হয়েছে বসানো, জীবনকে মাধুর্যময় করে তোলার প্রয়াস সেখানে সর্বত্র, প্রতিদিন সহস্র সহস্র মেয়ে-পুরুষ যুবা-বৃদ্ধের কলরবে মুখর হয়ে ওঠে বুদ্ধজয়ন্তী পার্ক। দিল্লিতে এই বাগানবিলাস মানুষের জীবনের সৌন্দর্যের প্রতি টানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ছোটখাটো পার্কের মেনটেনান্স দেখলে অবাক হতে হয়। পার্কের ভিতরে ঘুগনি-দানা কিংবা মুমফলি বিক্রি হয় না, রাস্তার মোড়ে ফুচকা খাবার লাইন অথবা ওড়িয়াদের বিন্তি খেলা সেই সব সুসজ্জিত পার্কে কল্পনার অতীত। পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের অনেকেই এই কয়েক বছরে বাড়ি গাড়ি করে ফেলেছে, বাংলা দেশের চণ্ডীমণ্ডপ কলকাতার পার্কে-পার্কে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন শয়তানি এবং খুন-জখমের খোঁয়াড়ের মতন। কিছু কিছু পার্ক আছে কলকাতায়, যেখানে সন্ধ্যার পর কোনো ভদ্রসন্তানের সান্ধ্যভ্রমণ চলে না—নতুন ব্রীদিংস্পেসের দুরাশা ত্যাগ করে এই সব পার্ক আর খোলা ক্ষেত সুরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় না? বুদ্ধজয়ন্তী পার্কে পেটুনিয়া-বেডের পাশে শতাধিক শিশুকে খেলা করতে দেখেছি—ফুলের গায়ে হাত বাড়াতে দেখিনি একজনকেও—সেদিন ঘণ্টাখানেকের উপর দূর থেকে ঐসব শিশুদের শৃঙ্খলাময় খেলা দেখেছিলাম। দেখে অবাক হয়েছিলাম, ঐ দুরন্ত শিশুগণের মধ্যে এই বিবেচনা সহজাত মনে হয়েছিল সেদিন।

আলিপুর রোডের উপরেই বাগানে ঢোকার মূল ফটক, সেখানে ছায়াদায়িনী কিছু কিছু গাছ আর লতাপাতা আমন্ত্রণ করে আমাদের। ডিসেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত বাগানের মুখে বোগেনভিলার নানা রঙের বিপ্লব ছড়িয়ে থাকে, তার ফাঁদের ঠিক পিছনে জলের রেখা—সেখানে নানা-জাতের জলপদ্ম আর টাইফা মিনিমা ফুটে রয়েছে। বাঁদিকে ঘুরেই ছেলেদের খেলা-ধুলো করার জন্য একটি মাঠ তৈরি করা দেখলাম—সেখানে ইতস্তত ঢেঁকি, স্লিপ আর হাইজাম্পের জন্য বালু-ঢাকা জমি। ছাড়িয়ে গেলে ক্যাকটাসের বাগান, কম করেও ছেচল্লিশ রকমের ক্যাকটাস সেই বাগানে হাজির আছে। জলাশয় আর বাগানের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের বাঁদরলাঠির গাছ। সোসাইটির সেক্রেটারী পার্সি ল্যাংকাস্টার সায়েব এই হাইব্রিড তৈরি করেছিলেন এক সময়। সে হিসেবে এই বিশেষ বাঁদরলাঠির নাম হয়েছে তাঁরই নামে—কেসিয়া ল্যাংকাস্টারী। এই পথ ধরে চলতে চলতে আমরা ঢালু জমিতে এসে পেঁছিলাম—ব্রিজ পার হয়ে পেঁছিলাম রকারিতে, তার পেছনে আবার মোজেইক বোগেনভিলার রাশ। সেখান থেকে আমাদের চোখ পড়ল ডানদিকের মাঠে যেখানে নানা ধরনের জবা আর ইউক্যালিপটাসের সারি, তার পিছনে পুকুর ভর্তি ফুটে রয়েছে লালকমল-নীলকমল—পূর্ব দিকে স্বারভাঙ্গা হাউস,

সেখানে বিচিত্র রকমের অর্কিড আর ছায়া-জায়িনী লতাপাতার ঝোপ। লনের এদিক থেকে ওদিক যেতে বাঁ-হাতে পড়বে সাঁড-বেড—এছাড়াও সেখানে কলম বাঁধা হয়, টবে পোঁতে দেওয়া হয় গাছপালা—নার্সারির নানান কাজকর্ম হয়। ইতস্তত নানা রঙের প্যামেরিয়া আর ভিক্টোরিয়ান ওরিজিনের ক্রোটনের সারি দেখে এসে পৌঁছলাম সোসাইটির অফিস আর মিটিং ঘরে। অফিসের সামনে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরীর একটি আবক্ষ মর্মরমূর্তি।

শ্রীরামপুরে ছিল কেরীসাহেবের বাগান। আমরা তাঁর ছেলেকে লেখা একটি চিঠিতে দেখি, কিভাবে যবদ্বীপ থেকে জাহাজে করে গাছপালা পাঠানো যাবে—সে-সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন। সেই সব গাছ কেরী তাঁর শ্রীরামপুরের বাগানে স্থাপন করেছিলেন। হুগলী নদীর প্লাবনে ১৮১৪ সনে শ্রীরামপুরের গাছের সমূহ ক্ষতি হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তখন বাংলা দেশ জুড়ে নীল চাষে ব্যস্ত। কেরীর আন্তরিক বাসনা ছিল, কৃষিপ্রধান বাংলা দেশের সর্বত্র যাতে উন্নত ধরনের চাষবাদ শুরু হয়। শুধুমাত্র গবেষণার কাজে আবদ্ধ থেকে নয়, সর্বসাধারণের মধ্যে কৃষিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ-প্রীতি সঞ্চারিত করার জন্য তিনি একটি অনুষ্ঠানপত্র বিলি করেন। এই কোয়েশ্চেনেয়ারের মাধ্যমে তিনি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর আশা করেন : কোন্ কোন্ অঞ্চলে কি ধরনের শস্য উৎপন্ন হয়—চাষের যন্ত্রপাতি কি কি—জমিতে সার দেওয়ার কি ব্যবস্থা—একই জমিকে দো-ফসলা করা যায় কি উপায়ে—এই সব। কলকাতার টাউন হলে এই 'কৃষিসমাজের' প্রথম সভা বসে ১৮২০ খ্রীঃ। উপস্থিত সাতজনের মধ্যে ছিলেন সেদিন রাজা বৈদ্যনাথ রায় আর রামকমল সেন। বড়লাট হেস্টিংস ও তাঁর পত্নী এই সমাজের পেট্রন হন। সে-বছর অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় সভা ডাকা হয়। উপস্থিত সদস্যের মধ্যে মার্শম্যান, পামার, কিড আর রাধাকান্ত দেব, হরিমোহন ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুরই প্রধান। এক দু'বছর বাদে মুদ্রিত কার্যবিবরণীতে পাওয়া যাচ্ছে যে, সমাজ ব্যারাকপুরে গভর্নমেন্ট উদ্যানের সংলগ্ন টিটাগড়ে কিছু জমি নিয়ে চলে যান। প্রথমে সমাজের নাম ছিল 'এগ্রিকালচারাল সোসাইটি' পরে 'হর্টিকালচারাল' কথাটি যুক্ত হয়। ১৮২৯ সনের ২১শে অগাস্ট উইলিয়াম কেরী একটি চিঠিতে সমাজের সভাপতি-পদ গ্রহণে সম্মতি পাঠান। ডাঃ রক্সবার্গ ছিলেন শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনের অধ্যক্ষ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সংগৃহীত প্রায় তিন হাজারের উপর বৃক্ষের পরিচয় সহ এক অতিমহৎ পুস্তক কেরী তিন খণ্ডে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশ করেন।

কৃষিসমাজের নিজের প্রকাশনী শুরু হয় ১৮৩৮ সন থেকে। পত্রাকারে আলোচনা হয় কৃষিতত্ত্ব এবং ব্যবহারিক নানাবিধ সমস্যা। রাধাকান্ত দেব শ্রীহট্ট, রাজসাহী, দিনাজপুরে ও ২৪ পরগনা জেলার কৃষির অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত সারগর্ভ ও তথ্যপূর্ণ রচনা প্রকাশ করেন। পূর্ণিয়া জেলার কৃষি-বিষয়ক শব্দসমূহ (ইংরেজী অর্থ সমেত) প্রকাশ করা হয়। সাত বছর টিটাগড়ে অবস্থানের পর, আলিপুরে বজবজ রোডের জংশনে সমাজ উঠে আসে। আকার জমিতে আখ, রেশম, তামাক, তুলা ইত্যাদি উৎপাদন এবং গবেষণামূলক কাজ সমান্তরালভাবে করা হতে থাকে। সমাজের কাজকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে বিলাতের ডিরেক্টর সভা এককালীন বহু সহস্র টাকা এবং দশ সহস্র নিয়মিত বার্ষিক মুদ্রা দান করেন। ১৮৩৮ সাল থেকে সমাজ ক্রমে ক্রমে ২৫ একর জমি ভোগ করে বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সেখানে ৪০ বছর অবস্থিতির পর এখনকার ১নং আলিপুরের জমিতে উঠে যায় সমাজ। ১৯০০ সাল পর্যন্ত হেয়ার স্ট্রীট আর স্ট্র্যান্ড রোডের মোড়ে মেটকাফ হলে সমাজের অফিস ছিল। তখন সদস্য হিসাবে ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রুস্তমজী কাওয়াসজী, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ। বাংলা দেশের ভিতরে বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলীতে এবং লক্ষ্ণৌ, মীরাট, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, দানাপুর এমনকি, সিঙ্গাপুরেও সমাজের শাখা খোলা হয়। আমরা এখন একটি তালিকা রচনা করবো, তার পূর্বে 'প্লান্ট ইনট্রোডাকশান' এই শব্দটি দু-এক কথায় পরিষ্কার করে নিতে চাই। বিদেশী কৃষিবীজ আমাদের এই ট্রপিক্যাল আবহাওয়ায় কিভাবে সার্থক চাষাবাদ হতে পারে সেই পর্যায়ের সমস্ত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই 'ইনট্রোডাকশান'-এর সঙ্গে যুক্ত। তখনকার দিনে কৃষি বিজ্ঞানের পৃথক কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই সমাজ সরকারকে কৃষির উন্নয়নে সরাসরি সাহায্য করতো। সমাজ মরিসাস থেকে আখ, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীনদেশ এবং ম্যানিলা থেকে তুলার বীজ, ইজিপ্ট মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, হাভানা থেকে তামাকের বীজ আনালো। উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে বীজ এনে পাটনায় ফুলকপির চাষ শুরু হল। বিলাত থেকে বীজ এনে নৈনিতাল আর শিলং-এ আলুর চাষ করা হল। গিনি ঘাস, রাইনা আর লুসার্ন ঘাসের বীজ আনা হল বিদেশ থেকে। ১৮৫২ সালে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রতিষেধক সিঙ্কোনার চাষ শুরু করল সমাজ বোটানিক গার্ডেনে। সমাজের এগ্রি-কালচারাল কমিটি এইসব কার্যক্রমে নিযুক্ত ছিলো। এছাড়া হর্টিকালচারল কমিটি ফ্লোরিডা থেকে আঙ্গুর, জাভা, থেকে লেবু, চীন দেশ থেকে বীজহীন লিচুর আমদানী করলো। গত পঞ্চাশ বছর ধরে ফ্লোরিকালচার এবং আর্বোরিকালচারের প্রতি কলকাতার মানুষের উৎসাহ দ্বিগুণ হয়েছে। এগ্রিকালচারাল এক্সটেনশনের দায়িত্ব সমাজের কাঁধ থেকে অধিক পরিমাণে অন্যত্র ন্যস্ত হওয়ার দরুন ফুলের বাগানে যাবার যথেষ্ট অবসর সমাজ এখন উপভোগ করছে। ক্যানাফুল, জবা, রঙ্গণ, ফুরুষ বাঁদরলাঠি এবং পাতাবাহারের হাইব্রিড্ তৈরি করছে সমাজ তার নার্সারিতে বসে।

বর্তমানে সোসাইটির হর্টিকালচারিস্ট এবং সেক্রেটারী ডক্টর তরুণ বসুর সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি তাঁদের লাইব্রেরি দেখালেন—সেখানে সমস্তই এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার ও বটানির বই আর থরে থরে সাজানো সোসাইটির প্রাক্তন অ্যানুয়াল প্রসিডিংস। তিনি বললেন, পার্সি ল্যাংকাস্টার যখন অধ্যক্ষ তখনই সোসাইটির নামের আগে 'রয়াল' কথাটি যুক্ত হয়েছিলো। শুধোলাম, আগের মতো ট্রানজাকশন বের হয় কিনা সোসাইটির? তিনি আমাকে কয়েকটি 'গার্ডেন নিউজ' সীট এনে দেখালেন। শুধোলাম আপনাদের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া উচিত যাতে করে এই অঞ্চলে গাছপালার বাংলা নামকরণ হয়—যেমন হয়েছে 'পান্থপাদপ'—আপনাদের দাঁতভাঙা লাটিন নামের আবেদন উচ্চশিক্ষিতের কাছেও নেই। কথাচ্ছলে তাঁকে বললাম, আমাদের এক বিদেশিনী বন্ধুপত্নী ফরাসী ভাষায় 'পথের পাঁচালী' অনুবাদ করছেন—তিনি যে কি অবস্থা দুর্দশায় কালাতিপাত করছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। এমন কি সংশয় হচ্ছে কেবলমাত্র সিনোনিমাস ইংরাজী শব্দের অভাবে তাঁর হয়তো অনুবাদ কিছুতেই অগ্রসর হতে পারবে না।

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে এক অবাঙালী ব্যবসাদার একটি প্লান নিয়ে গেলেন ডক্টর বসুকে। শুধোলাম, এটা কি? ওঁর বাড়ি আর বাগানের প্ল্যান। এর জন্যে ফীজ্ নেন না আপনি? নিজে নেই না—সোসাইটির ফান্ডে জমা পড়ে। ডক্টর বসুর কথায় বাস্তবিক আনন্দিত হলাম। উইলিয়াম কেরী এবং পার্সি ল্যাংকাস্টারের উত্তরাধিকারীকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললাম না। তাঁকে অনুরোধ জানিয়ে এলাম এই বাগানের 'একটি ইতিহাস' রচনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কাজ বর্জন করে তাঁকে সাহিত্যের কাজে নামাতে অন্তরের অনুমোদন পেলাম না। বিশেষত এঁরই প্রয়াসে 'বিড়লা ল্যাবোরেটরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে সম্প্রতি। মাত্র কয়েক বছরের কাজে আর সার্থক প্রদর্শনীর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান কলকাতার মানুষের অন্তর আত্মীয় হয়ে উঠেছে এখন।

প্রতিষ্ঠা সংগ্রাম

শান্তিপ্রিয় বসু ও শতদল দাশগুপ্ত

ব্যবহারিক উন্নতির প্রথম সোপান নগরীকরণ। ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নগরীকরণ হয়েছে, কারণ নগরীকরণ শিল্পোন্নয়নেরই ফলশ্রুতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়ে স্ব স্ব দেশে শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। কোথাও এই প্রচেষ্টা সচেতন পরিকল্পনা-সঞ্জাত, কোথাও সচেতন পরিকল্পনা অনুপস্থিত। তথাপি এ কথা বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র শিল্পোন্নয়নের এক নতুন ধারা প্রবহমান। এবং এর ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে সর্বত্রই নগরীকরণ হচ্ছে।

এই নগরীকরণের ফলে একটি গ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজ ধীরে ধীরে নগর-কেন্দ্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়। গ্রামীণ জীবনের কৃষি-কেন্দ্রিক অর্থনীতি শিল্প-কেন্দ্রিক অর্থনীতিতে পরিবর্তিত হয়। এর ফলে সমাজে এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সূচিত হয়। পরিবার, গোষ্ঠী এবং স্বগ্রাম-কেন্দ্রিক সমাজ রূপান্তরিত হয় আত্ম-কেন্দ্রিক সমাজে। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সহযোগিতা লোপ পায়। মানুষ একাকী নিঃসঙ্গভাবে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ভারতবর্ষও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-গুলির মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নে সচেষ্ট। দেশের বিভিন্ন স্থানে ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনা, মোটর তৈরির কারখানা নির্মাণ, টেলিফোন যন্ত্র উৎপাদনের জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি এই শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রধান অঙ্গস্বরূপ। এই শিল্পোন্নয়নের ফলস্বরূপ নগরীকরণও সংঘটিত হচ্ছে। কৃষি-কেন্দ্রিক গ্রামগুলিও ধীরে ধীরে শিল্প-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। এর ফলে, বৃহত্তর সমাজ ধীরে ধীরে গ্রাম-কেন্দ্রিক জীবন থেকে নগর-কেন্দ্রিক জীবনের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

একটি কৃষি-কেন্দ্রিক গ্রামীণ সমাজের শিল্পোন্নত নগর-কেন্দ্রিক সমাজে রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্য ক্ষেত্রেও বহুবিধ পরিবর্তন সূচিত হয়। একটি ক্ষুদ্র সামাজিক গোষ্ঠী যে গোষ্ঠীতে সকলে সকলের পরিচিত এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, বৃহত্তর নাগরিক সমষ্টিগত সমাজে রূপান্তরিত হয়, যে সমাজে মানুষ পরস্পরের অপরিচিত, নিঃসঙ্গ, নির্জন। সোরোকিন, জিমারম্যান-এর ন্যায় বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীগণ গ্রামীণ সমাজ এবং নগর-কেন্দ্রিক সমাজের পারস্পরিক বিভিন্নতা সম্বন্ধে বহু তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। টোনিয়েস-এর মতে গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য হল গোষ্ঠী-কেন্দ্রিকতা। এবং নগর-কেন্দ্রিক সমাজ গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক নয়, সমষ্টিমূলক। গ্রামীণ সমাজে একাধিক মানুষ পারস্পরিক আদানপ্রদান, সহযোগিতা ও সহানুভূতির ভিত্তিতে একটি গোষ্ঠী সৃষ্টি করে। কিন্তু নগর-কেন্দ্রিক সমাজ একটি জনসমষ্টি মাত্র। একটি উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে একাধিক বিচ্ছিন্ন মানুষের সমষ্টি, গোষ্ঠী নয়। গ্রামীণ সমাজ মানসিক নৈকট্য ও নৈতিক একাত্মতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নগর-কেন্দ্রিক সমাজ যান্ত্রিক নৈকট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। রেডফিল্ড-এর "Folk urban continuum সূত্রানুযায়ী একটি লোক-কেন্দ্রিক আদিম সমাজ একটি ক্রমানুসারিক নিয়মে নগর-কেন্দ্রিক শিল্পোন্নত সমাজে রূপান্তরিত হয়। টালকট পার্সনস্ গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক সমাজ এবং সমষ্টিমূলক সমাজের মানবিক সম্পর্কের বিভিন্নতা সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, নগর-কেন্দ্রিক সমাজে মানুষ সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। কিন্তু গ্রামীণ সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠা আরোপিত হয়। একটি লোক-কেন্দ্রিক সমাজে প্রতিটি মানুষের সামাজিক অবস্থান সেই সমাজ দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। তার পারিবারিক ঐতিহ্য, আর্থিক সম্পদ, মানসিক উৎকর্ষ, নৈতিক পবিত্রতা ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজ তাকে একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠা (status) দেয়। ব্যক্তিগতভাবে সেই ব্যক্তির নিজস্ব কিছুই করবার থাকে না। নিজস্ব সামাজিক অবস্থান নিরূপণ করাবার দায়িত্ব তার নয়, সমাজের। তার কার্যধারা, তার পারিবারিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে সমাজ তার সামাজিক অবস্থান স্বীকার করে নেয়। এবং সমাজ তার উপর যে অবস্থান, প্রতিষ্ঠা আরোপ করে, তাকে তা স্বীকার করে নিতে হয়। ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে এই আরোপিত সামাজিক অবস্থানের সুন্দর নিদর্শন দেখা যায়। বর্ণপ্রথা কিংবা জাতিপ্রথা ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য। জন্মলগ্নেই প্রতিটি মানুষের বর্ণগত (কিংবা জাতিগত) অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। শূদ্র পরিবারে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তার বর্ণগত অবস্থান সমগ্র জীবনের জন্য শূদ্রই হয়। আপন কর্মধারার মাধ্যমে কখনই সে উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে পারে না। এবং তার নির্দিষ্ট বর্ণগত অবস্থান দ্বারাই সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তার সামাজিক সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয়। কোন বর্ণ এবং কোন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তার সামাজিক, বৈবাহিক এবং ব্যবহারিক আদান প্রদান অনুষ্ঠিত হবে, ইত্যাদি তার জন্মলগ্নে আরোপিত বর্ণগত অবস্থানের মাপকাঠিতে স্থিরীকৃত হবে। অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজের বৈশিষ্ট্য হল আরোপিত অবস্থান কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠা। গ্রামীণ সমাজের সামাজিক সঞ্চলন অনুপস্থিত। কিন্তু একটি নগরকেন্দ্রিক সমাজে বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান। এই সমাজে ব্যক্তিগত কর্মোদ্যম এবং সাফল্যের মাপকাঠিতেই

সামাজিক অবস্থান স্থিরীকৃত হয়। বর্ণগত অবস্থান, পারিবারিক ঐতিহ্য ইত্যাদি এই সমাজে মুখ্য নয়, গৌণ। প্রধান হল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, কর্মোদ্যম এবং সাফল্য। এই সমাজে পারিবারিক এবং গোষ্ঠি-কেন্দ্রিক সমাজের পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ সামাজিক প্রতিষ্ঠা মানসে নিঃসঙ্গ সংগ্রামে লিপ্ত। এই সমাজে দুর্বার সামাজিক সঞ্চলন বিদ্যমান। এই সমাজে যে কোনও ব্যক্তি কঠিন কর্মসংগ্রামে লিপ্ত হয়ে সমাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে। কিন্তু গ্রামীণ সমাজে তা সম্ভব নয়। এ সমাজে সামাজিক অবস্থান নির্দিষ্ট, নিশ্চল। যে সমাজে সামাজিক সঞ্চলন স্থাপিত সেই সমাজে আপন কর্মসাফল্য এবং কৃতকার্যতার মাধ্যমে যে কোনও ব্যক্তি সমাজে উচ্চতর প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে। এই কর্মসাফল্য জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রে হতে পারে, আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া কিংবা ব্রিটেনের মত শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ব্যাপক সামাজিক সঞ্চলন বিদ্যমান। এদেশে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে রাজসিক ঐশ্বর্যের চিন্তা করা নেহাতই অলীক স্বপ্নবিলাস নয়। আপন কর্ম-

সাফল্যের দ্বারা জীর্ণ কুটিরবাসীর রাজপ্রাসাদে আরোহণ খুবই সম্ভব।

সামাজিক সঞ্চলন উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য-স্বরূপ। সমাজের উন্নতির সহায়ক এইরূপ কর্মের যে প্রণেতা তাকে যথোচিত পুরস্কৃত করলেই—সেই সমাজ দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। সমাজের প্রতিটি মানুষ সুকর্মের মাধ্যমে আপন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার উন্নতি মানসে কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হয় এবং প্রতিটি মানুষের এই প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সামাজিক অগ্রগতির সূচনা হয়। শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আজ আর্থিক ও ব্যবহারিক উন্নতির শীর্ষবিন্দুতে। কারণ সে দেশে কর্মী নির্বাচন কেবলমাত্র কর্মক্ষমতার মাপকাঠিতেই নিরূপিত হয়। একথা যে কোন শিল্পোন্নত দেশ সম্বন্ধেই সত্য। এর ফল স্বরূপ এই সব দেশে ব্যক্তিগত কর্মোদ্যম ও কর্মক্ষমতার বিকাশ হয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তি আপন কর্মক্ষমতার উপর আস্থা স্থাপন করে সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠা অর্জনে সচেষ্ট। তার এই প্রচেষ্টায় তার জাতি, ধর্ম, গোষ্ঠী কোনও রকম অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি। কর্মোন্নয়নের জন্য প্রতিটি ব্যক্তি তার গৃহ, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং গোষ্ঠীর বন্ধন ছিন্ন করতে প্রস্তুত। তাই শিল্পোন্নয়নের অনুভূতি নিঃসঙ্গ মানুষ।

এই নিঃসঙ্গ নাগরিক সর্ব সামাজিক সম্পর্ক। তার কর্মক্ষমতা অসীম। কর্ম প্রচেষ্টা দুর্বার। এবং কর্ম সাফল্য আকাশ-চুম্বী। কিন্তু আপন গোষ্ঠী থেকে সে বিচ্ছিন্ন। আপন মানসিক নিশ্চিন্ততার জন্য সে পরিবার-নির্ভর কিংবা গোষ্ঠী নির্ভর নয়। এই মানসিক নিঃসঙ্গতার ফলস্বরূপ সে বৃহত্তর সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উন্মুখ। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের সংগ্রামে সে একক, সঙ্গীহীন। তার পরিবার কিংবা গোষ্ঠী তাকে এই বৃহত্তর সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য কোনও সাহায্যই করতে পারে না। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠা মানসে নিঃসঙ্গ মানুষ কতগুলি প্রতিষ্ঠা চিহ্ন (Status Symbol) অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। তার পরিবার এবং গোষ্ঠী তার ওপর যে প্রতিষ্ঠা আরোপ করতো সেই প্রতিষ্ঠা হারিয়ে নিঃসঙ্গ মানুষ বৃহত্তর সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রতিনিয়ত সচেষ্ট। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে সেই প্রতিষ্ঠা চিহ্নগুলি আহরণ করবার জন্য সদা উদ্বিগ্ন। বর্তমানে আমেরিকায় এই প্রতিষ্ঠা-চিহ্ন অর্জন করবার এক দুর্দম প্রতিযোগিতা লক্ষ করা যায়। বহু মুদ্রা ব্যয়ে একজন ধনী আমেরিকান 'ক্যাডিল্যাক' গাড়ি ক্রয় করে যদিও তুলনামূলকভাবে কম দামী গাড়িতেই তার আপন প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে। সে **"কান্ট্রি ক্লাবে"** যায় কেবলমাত্র ক্লাবে যাবার উদ্দেশ্যে নয়, প্রধান লক্ষ্য হল প্রতিষ্ঠা অর্জন। কারণ, ক্লাব সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। অতীত সভ্যতার নানাপ্রকার নিদর্শন ক্রয় করবার জন্য বহুমুদ্রা একজন আমেরিকান ব্যয় করে কোনও ঐতিহাসিক কৌতূহল এবং বিলাস চরিতার্থ করবার জন্য নয়, প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য। কারণ এই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি (antiques) প্রতিষ্ঠা-চিহ্ন হিসাবে স্বীকৃত। অর্থাৎ যে কোনও জিনিস, যাকে বৃহত্তর সমাজের মানুষ
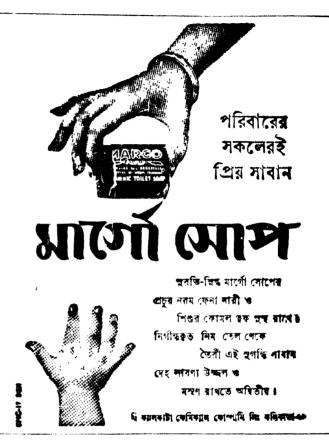
মূল্য দেয়, সে সেই জিনিস সংগ্রহ করতে উন্মুখ। কারণ, এই প্রতিষ্ঠা চিহ্নগুলি তার সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের সহায়স্বরূপ। এবং যে কোনও দেশে, যে দেশে নগরীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে, মানুষের এই প্রতিষ্ঠা চিহ্ন অর্জনের প্রবণতা লক্ষণীয়।

আমাদের দেশও ধীরে ধীরে নগরীকরণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এবং ফলস্বরূপ নগর জীবনের সমস্ত চিহ্নগুলি আস্তে আস্তে দৃশ্যমান হচ্ছে। এই নগরীকরণের ফলস্বরূপ একান্নবর্তী পরিবার ক্রমান্বয়ে অদৃশ্য হচ্ছে। পরিবার কেন্দ্রিক মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হচ্ছে। গোষ্ঠীর স্থানে সমষ্টি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মানুষও নিঃসঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতর হচ্ছে। তার ফলস্বরূপ বৃহত্তর সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য আমাদের দেশেও প্রতিষ্ঠা-চিহ্ন অর্জন প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা বিশেষভাবে দৃশ্যমান। মধ্যবিত্ত মানুষও গ্রাম থেকে চলে আসছে কলকাতা কিংবা অন্য কোনও শহরে। গ্রামীণ-জীবনের পারস্পরিক গোষ্ঠী কেন্দ্রিক সম্পর্কের পরিবর্তে শহর জীবনের আত্ম-কেন্দ্রিক সম্পর্কের বিকাশ লাভ হচ্ছে। গ্রাম জীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠা হারিয়ে নগর জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য মধ্যবিত্ত মানুষ উন্মুখ। তাই প্রতিষ্ঠা-চিহ্ন অর্জনের চরম আকাঙ্ক্ষা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রচেষ্টা। শিক্ষা, খাদ্য, ধর্ম, স্বাস্থ্য, বিবাহ, পোশাক, পরিচ্ছদ, ভ্রমণ, আনন্দ বিলাস প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র একটা কিছু অর্জন করতে চায়। এই প্রবন্ধে যে তালিকাটি ব্যবহার করা হচ্ছে তা থেকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই কি ধরনের প্রতিষ্ঠা-চিহ্ন অর্জনের চেষ্টা চলছে, তা দেখান হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠা চিহ্নগুলিকে উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ওল্ড আলীপুর, ওল্ড বালীগঞ্জ রোড, এবং এলগিন রোড, চৌরঙ্গী রোড, পার্কস্ট্রীট এবং সারকুলার রোড সীমাবদ্ধ অঞ্চলে বাসস্থান হওয়াটা একটা উচ্চ প্রতিষ্ঠা চিহ্ন হিসাবে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে খিদিরপুর, কাশীপুর, চিৎপুর ইত্যাদি অঞ্চলে বাস-স্থানের প্রতিষ্ঠা চিহ্ন নিম্নমানের। কিন্ডারগার্টেন, নার্সারীতে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া কিশোর এবং যুবকদের মিশনারী স্কুল এবং কলেজে শিক্ষা দেওয়া, এবং বয়ঃপ্রাপ্তদের আমেরিকা কিংবা ইংলণ্ডে উচ্চশিক্ষা লাভ করা ইত্যাদি উচ্চ প্রতিষ্ঠা মানের পরিচায়ক। পক্ষান্তরে দেশী স্কুলে শিশু এবং কিশোরদের শিক্ষা দেওয়া, নানা-রূপ পলিটেকনিক, টাইপিং, স্টেনোগ্রাফি ইত্যাদি ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করা নিম্ন-মানের পরিচায়ক। বাড়িতে রুম-কুলার ব্যবহার করা এবং তালপাতার হাতপাখা ব্যবহার করা যথাক্রমে উচ্চমান এবং নিম্ন-মানের পরিচায়ক। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য নানারূপ সামগ্রীরও সামাজিক উচ্চমান এবং নিম্নমান আছে। দামী ক্যামেরা, রেফ্রিজারেটার, রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ রেকর্ডার রেডিওগ্রাম ইত্যাদি উচ্চমান বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা-চিহ্ন। স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রেও উচ্চ এবং নিম্নমান বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা-চিহ্ন বর্তমান। বত্রিশ কিংবা চৌষট্টি টাকার ফি বিশিষ্ট স্পেশালিস্ট চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ, কিংবা চৌরঙ্গী-আলীপুর অঞ্চলে অবস্থিত নার্সিং হোম-এর ব্যবহার উচ্চমান বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠা-চিহ্ন। দুই কিংবা চার টাকা ফি বিশিষ্ট সাধারণ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ,

প্রতিষ্ঠা চিহ্ন	বাসস্থান	শিক্ষা	ধর্ম	তাপ নিয়ন্ত্রণ	ব্যবহারিক দ্রব্য	যান-বাহন	স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা
উচ্চ	ওল্ড আলিপুর এবং বালীগঞ্জ অঞ্চল। এবং এলগিন রোড, চৌরঙ্গী রোড, পার্ক স্ট্রীট এবং সারকুলার রোড সীমাবদ্ধ অঞ্চল।	শিশুদের জন্য কিন্ডার গার্টেন ও নার্সারী স্কুল। কিশোর এবং যুবকদের জন্য মিশনারী স্কুল এবং কলেজ। বয়ঃপ্রাপ্তদের জন্য বিদেশী ডিগ্রী।	কালচারাল ইন্সটিটিউট মারফৎ বক্তৃতা শ্রবণ। বিখ্যাত গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ।	বাড়ীতে, অফিসে রুমকুলার ব্যবহার করা।	দামী ক্যামেরা। টেপ রেকর্ডার। রেডিওগ্রাম। রেকর্ড প্লেয়ার। রেফ্রিজারেটার ইত্যাদি।	দামী পোশাক পরিহিত সোফেয়ার সম্বলিত দামী গাড়ী স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই ব্যবহার করেন। শিশুরা গাড়ীতে স্কুলে যায়।	বত্রিশ কিংবা চৌষট্টি টাকা ফি বিশিষ্ট স্পেশালিস্ট চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ। চৌরঙ্গী, আলিপুর অঞ্চলে অবস্থিত নার্সিং-হোম ব্যবহার।
মধ্য	নিউ আলিপুর এবং বালীগঞ্জ অঞ্চল	দেশে আণ্ডার-গ্রাজুয়েট শিক্ষা এবং স্কলারশিপের টাকায় বিদেশ গমন এবং বিদেশী ডিগ্রী অর্জন। শিশুদের জন্য দেশী স্কুল।	সময়ে সময়ে বেলুড় কিংবা দক্ষিণেশ্বরে দেবী দর্শন। সাধারণ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ।	বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করা।	কম দামী রেফ্রিজারেটার। মাঝারী দামের ক্যামেরা এবং রেডিও।	কম দামী গাড়ী (কিংবা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড)। ড্রাইভার নেই। পরিবারের কর্তাই ব্যবহার করেন। শিশুরা ট্রাম-বাসে স্কুলে যায়।	ষোল কিংবা বত্রিশ টাকা ফি বিশিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ। হাসপাতালে কেবিন কিংবা পেয়িং বেড ব্যবহার। মাঝারি ধরনের নার্সিং হোম ব্যবহার।
নিম্ন	খিদিরপুর কাশীপুর ভবানীপুর চিৎপুর ইত্যাদি অঞ্চল।	শিশুদের জন্য নিম্নমানের দেশী স্কুল। যুবকদের জন্য পলিটেকনিক, টাইপিং, স্টেনো-গ্রাফি ইত্যাদি ব্যবহারিক শিক্ষা।	গঙ্গা স্নান। কালীঘাটে কালীমন্দিরে দেবী দর্শন।	তালপাতার পাখা ব্যবহার।	কম দামী রেডিও কিংবা ট্রানজিস্টার সেট।	বাস-ট্রামের ব্যবহার।	দুই কিংবা চার টাকা ফি বিশিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ। সাধারণ হাসপাতালে ফ্রি বেড ব্যবহার।

আমার প্রতিবেশিনী বন্ধু ক্যাথরিনকে ভারি ব্যস্ত দেখা দেখা যাচ্ছে কদিন থেকে। জানলায় দাঁড়িয়ে প্রায়ই লক্ষ করছিলাম সে এই বেরুচ্ছে, এই ফিরছে, আবার বেরুচ্ছে, আবার ফিরছে। কখনো গাড়িতে, কখনো হেঁটে, কখনো স্বামীর সঙ্গে, কখনো একা। একাই বেশী। মার্কিন মহিলারা আজকাল 'আমরা ভাই বড়ো পরিবার' এই কথাটা বলতে খুব ভালোবাসছে, আর মার্কিন পুরুষেরা ঘন ঘন সন্তান উৎপাদন করাটাকে খুব গৌরবের বলে মনে করছে। সুতরাং মা ষষ্ঠীর কৃপা কারো কারো উপর নিতান্ত মন্দ হচ্ছে না। ক্যাথরিনের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, চোদ্দমাস ষোলোমাস অন্তর অন্তর পাঁচটি সন্তানের মাতৃত্ব লাভ করে একটু দম নিচ্ছিলো। স্বামী আইনজীবী। নিউইয়র্ক শহরের হৃৎপিণ্ড মধ্য মানহাটানের উপর চমৎকার একটি মূল্যবান অ্যাপার্টমেণ্টে বাস করে, স্বামী স্ত্রী দুজনের দুখানা মস্ত স্থলজাহাজ সব সময় রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্যাথরিন পার্কিংয়ের অসুবিধের জন্য গাড়িটা ব্যবহারই করতে পারে না প্রায়, তার স্বামী অবিশ্যি তাঁরটা নিয়ে রোজই কাজে বেরোন। ক্যাথরিনের গাড়িটা এতোদিন তুষারাবৃত ছিলো, এখন ধুলোর আস্তরণে ঢাকা। যত্ন নেই। যত্ন করার কথা ভাবে না, নতুন কেনার কথা ভাবে। সব মার্কিনরাই তাই।

সকাল বেলা পথে দেখা হয়ে গেল। সম্ভাষণের পালা শেষ হলেই হাত ধরে বললো, 'লক্ষ্মীটি আমার একটা উপকার করবে?'

তৎপর হয়ে বললুম, 'নিশ্চয়ই।'

'কদিন ধরে যে আমার কী যাচ্ছে।'

'সত্যি কী হয়েছে বলো তো? সব সময়েই তোমাকে যেন বড়ো বিব্রত বলে মনে হচ্ছে।'

'ঠিক ধরেছো। দেখছো তো গাছে গাছে কেমন ফুল ফুটেছে, পাতা ধরেছে? পথে পথে বাগান সাজানো হচ্ছে, গরমকাল না আসতেই কেমন গরম পড়ে গেছে?'

তা অবিশ্যি দেখছি, অবাক হয়েই দেখছি। এই সেদিনের শির বার-করা শুকনো শীর্ণডালে কী সুন্দর কচিপাতার কলোরোল উঠেছে, তির তির করছে হাওয়ায়, কোনো কোনো গাছ আবার পাতার আগেই আপাদ মস্তক ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে, একটি ছোটখাটো রাজত্বের সমান সেণ্ট্রাল পার্ক অরণ্য হয়ে উঠেছে এরি মধ্যে। অর্থাৎ মার্কিন মুলুকে বসন্ত সমাগত। শীতের দেশের মতো এমন প্রত্যক্ষ বসন্ত আর কোথায়? এমন অতর্কিতে একদিন সব লাবণ্যের জোয়ার নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে যে একটা শিশুও অবাক আনন্দে তাকিয়ে ভাবে এ কী হলো? কদিন থেকেই এই বৃষ্টি এই কুয়াসাভরা নিউইয়র্ক শহর একেবারে ঝক ঝক করছিলো, রোদে সূর্যের তাপ প্রখর হয়ে উঠছিলো, আকাশ গভীর নীল। মাঝে মাঝে একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে ঠান্ডাটা ফিরে ফিরে আসছিলো বটে কিন্তু নতুন ঋতুর নতুন উদামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছিলো না। আর এই নতুনকে আমন্ত্রণ জানাতে লোকজনেরা তাদের বাড়িঘর রং করছিলো, গৃহিণীরা মোটা পর্দার বদলে হালকা পর্দার আমদানি করছিলেন, পুরনো আসবাব বদলে অথবা পালিস লাগিয়ে নতুন করে তুলছিলেন, বদলে যাচ্ছিলো আলোর ঢাকনা, বালাবের শাড়ি, মেঝের কার্পেট; জড়ো হচ্ছিলো সিল্ক, সাটিন, কুশনের স্তূপ; লিভিংরুমের জানালার বাগান আবার সবুজ ছায়াতে স্নিগ্ধ হয়ে উঠছিলো। মোছা হচ্ছিলো জানালার কাচ, দরজার কাঠ, সারাদিন এইসব স্ত্রী-পুরুষের ব্যস্ত উর্ধাঙ্গ দেখতে দেখতে ঘরে বসে প্রায় হয়রান হয়ে উঠছিলাম।

এদিকে দোকানের শো-কেসগুলোও

সেজেগুজে সমবেত ফ্যাশান প্রদর্শনে প্রায় উন্মত্ত। কার থেকে যে কে বেশী নতুন পরিকল্পনার পরিচয় দিয়ে প্রতিযোগিতায় জয়ী হবে তা নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। জলের দামে বিক্রি করে দিয়েছে সব শীতের পোশাক, পুরোনো বছরের আসবাবপত্র। এখন সব নতুন, সব আধুনিক। নিউইয়র্ক-টাইমস পত্রিকাটি আরো স্ফীত হয়ে উঠেছে সেইসব বিজ্ঞাপন বুকে নিয়ে। এমনিতেই রোববারের পত্রিকাটি বহন করা দুঃসাধ্য, এখন তার ওজন দ্বিগুণ। একটি সদ্য আগত ভারতীয় যুবক ভারি বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলো একদিন। নতুন এসেছে, সকালবেলা কাগজ কিনতে বেরিয়ে এক ভদ্রলোককে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখের পাইপটা বাঁকা করে কামড়ে (এখানে এসেই পাইপ কিনেছে) পকেট থেকে ব্যাগের মুখ খুলে খুব কায়দা করে বললো, 'দিন তো একখানা।' ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে বললেন 'কী দেব?' ছেলেটি তাঁর বগলের কাগজের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললো, 'একখানা নিউইয়র্ক-টাইমস। কতো দাম?'

'নিউইয়র্ক-টাইমস! আমি কোথা থেকে দেব? আমি তো কিনে নিয়ে এলাম এক্ষুনি, আমার তো মাত্র একখানাই কাগজ। আপনি কী বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'একখানা? ও।' লজ্জায় লাল হলো সে, ঢোক গিলে কথা পালটিয়ে বললো, 'আজ্ঞে, আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম কোথায় গেলে কিনতে পাওয়া যাবে।'

'ঐ তো, দু ব্লক দূরে, পথের ধারে রাখা আছে, নিয়ে আসুন পয়সা দিয়ে।' হন হন করে মুখের সাদা চামড়ায় বকোচ্ছ্বাস তুলে চলে গেলেন ভদ্রলোক। যুবকটির মুখের পাইপ আলগা হয়ে গেছে ততক্ষণে। ছি ছি। সে ভেবেছিলো পাঁজা নিয়ে হকার চলেছে বিক্রি করতে।

কিন্তু এই সবের সঙ্গে আমার বন্ধুর মত্ত থাকার পারম্পর্যটা আমি মেলাতে না পেরে তাকিয়েছিলাম। সে বললো 'একটা উপহার দিতে চাই তোমাকে। বলো নেবে?'

'উপহার! আবার উপহার কিসের?' আমি একেবারে গদগদ হয়ে উঠলুম।

'জানো, ভেবেছিলাম এই বসন্তে স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে মস্ত একটা পার্টি দেব' চোখের দৃষ্টি করুণ হলো এখানে, 'যা দেখছি তা আর হবার নয়।'

'কী হয়েছে?'

'ঘর বাড়িই সাজিয়ে উঠতে পারলুম না।'

'তোমার ঘর-বাড়ি? তার চেয়ে সাজানো বাড়ি আমি তো খুব কম দেখেছি।'

'বাজে। সব পুরোনো আসবাবে ঠাসা। আমার দেখলে রাগ হয়। লিভিংরুমের বড়ো বসবার কৌচটা মনে আছে তোমার?'

'কেন থাকবে না?'

'ওটা তোমার কেমন লাগে?'

'চমৎকার।'

'আর আমার কালো কাচের দোতলা কফি টেবলটা?'

'সেটাও খুব ভালো।'

'ভালো? তা হলে তোমার অপছন্দ হচ্ছে না।'

'অপছন্দ হবার জিনিস নাকি?'

'তবে ও দুটো তুমি নাও। ও দুটোই আমি তোমাকে উপহার দিতে চাইছি।'

কথা শুনে আমি হতভম্ব। আমার জন্য সে বন্ধুটি এই উপহার ভেবে রেখেছে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। থাকি হোটেল অ্যাপার্টমেন্টে তাদের গছের ফার্নিচার নিয়ে আমি এক ফাঁস, দুচারটে সরালে বাঁচি। তার উপর এই উপহার আমি রাখবো কোথায়? বন্ধু হাতে চাপ দিল 'তা হলে আজই পাঠিয়ে দি, কেমন?'

স্তম্ভিত হয়ে বললাম, 'তুমি তো জানো আমি এখানে প্রবাসীমাত্র, আজ আছি কাল নেই। এ নিয়ে আমি কোথায় রাখবো বল?'

'কেন, তোমার লম্বা করিডোরটায় পেতে রাখবে, তারপর যখন চলে যাবে ফেলে দেবে, নয়তো আবার কাউকে দিয়ে দেবে।'

'তার চেয়ে তুমিই আর কাউকে দাও না, অমন সুন্দর জিনিসটা লোকেরা শখ করে নিয়ে নেবে।'

'তা হলেই হয়েছে' চুড়ো চুল উঁচিয়ে মাথা নাড়লো বন্ধু 'এ বছর এই ফ্যাশান যে আর কেউ পছন্দ করছে না।'

'কতো দামী জিনিস, সামান্য একটা ফ্যাশানের জন্য নষ্ট করবে তা বলে?'

'নষ্ট করতে চাই না বলেই তো দিতে চাই কাউকে। লোক পাচ্ছি কই? বেশী তো পুরোনো হয়নি, এই তো সেবার আমাদের বিয়ের তারিখে আমার স্বামী কিনে আনলেন, এইটাই ছিলো তখন সবচেয়ে আধুনিক। ঢাকনার কাপড় আর কুশানগুলো তো গেল বসন্তে বদলেছি। কিন্তু এখন আর একেবারেই মানাচ্ছে না ঘরে।'

আমি চুপ করে থাকলাম। কী বলবো। আমরা কি এটা কল্পনাও করতে পারি যে বসন্তে বসন্তে নতুন ফার্নিচার কিনে নতুন করে ঘর সাজাবো? জীবনে যদি একবার মেরে-কেটে কিনি তা হলে পাঁচ বছরে একবার তার পালিশ করাতে হলেই চিন্তা ওঠে টাকা পাবো কোথায়। তা ছাড়া অর্থসামর্থ্যের কথা বাদ দিলেও আমাদের পুরোনো জিনিসের উপর একটা স্বাভাবিক মমত্ববোধও আমাদের কম বাধা নয়। এদেশে সেই মমতা জিনিসটারই বড়ো অভাব। আমরা বলতে ভালোবাসি এটা আমাকে অমুকে দিয়েছিলো, অথবা অমুকে উপলক্ষ্যে কেনা, অথবা এটার বয়েস এতো! এই স্মৃতি-রোমন্থনও আমাদের জীবনের একটা মধুর অংশ। সেই সেন্টিমেন্টটাই এরা বোঝে না

আমার মনে হয় না। শুধু কি জিনিসপত্রের বেলায়ই এরকম, বাড়িঘর বিক্রি করতে আর নতুন কিনে উঠে যেতেও এদের জুড়ি নেই। হয়তো তারই চরম ফল গিয়ে স্বামী-স্ত্রী বদলে পরিণত হয়েছে। ডিভোর্সের সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে কই?

সেদিন দুপুরটা ভারি সুন্দর হলো। ঠাণ্ডা কমে গিয়ে তাপমাত্রা একলাফে পাঁচাত্তরে উঠে গেল। এ দেশের আবহাওয়ার এই অস্থিরতা নতুন নয়, লোকজনেরাও সেই তালে তাল দিতে জানে। অমনি তাদের পোশাক বদলে গেল, দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ, মাঠে ময়দানে, বনে উপবনে, সমুদ্রের ধারে

ছুটলো সানন্দে নিতে। মেয়েরা ছোটো আর আঁটো জাঙিয়া পরে পড়ে থাকলো উপুড় হয়ে, বা চিৎ হয়ে শুলো তারা একটু করে কাপড় বাঁধলো বুকে, ননীর মতো শরীর জ্বলতে লাগলো প্রখর সূর্যের তাপে, দুপাশের ফাঁকে লোশনের শিশি, [illegible] মাঝে মাঝে, মাথার কাছে পেপসি-কোলা, কোকাকোলার বোতল। পাশে পাশে ছেলেরা শুয়েছে পৌনে ষোলো আনি প্রকৃতির শিশু হয়ে।

এদিকে ফুলের দোকানগুলো বেরিয়ে এসেছে ফুটপাতের উপরে। রাশি রাশি টিউলিপ, গুচ্ছে গুচ্ছে ড্যাফোডিল আর জমাট রক্তের মতো জেরানিয়াম ফুলের রংয়ের সঙ্গে গাঢ় সবুজ হালকা সবুজ, কালচে সবুজ, হলদে সবুজ সব পাতা বাহারের গাছ থরে থরে সাজানো। জায়গাটা একেবারে আলো হয়ে আছে রংয়ের সমারোহে। শুধু ফুলের রংয়েই নয় ওয়াশিংটন স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেই দেখা যাবে গ্রীনিচ গ্রামের ছবি আঁকিয়েরাও রংয়ের বন্যা বইয়ে দিয়েছে পথে। তারাও তাদের রং তুলি নিয়ে বসে গেছে ফুটপাতের ধার ঘেঁষে। অজস্র ছবি সাজানো আছে তাদের বিক্রির জন্য, কেউ কেউ ইজেল খাড়া করে আঁকছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, সেখানেই বিকিকিনি হচ্ছে, স্বল্প মাশুলে দশ মিনিটে কোনো আর্টিস্ট তৈরি করে দিচ্ছে পোর্ট্রেইট, যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী প্রৌঢ় বৃদ্ধ সব নিজের নিজের প্রতিকৃতি দেখার আকর্ষণে আঁকাতে বসে গেছে টুল পেতে। লোক দাঁড়িয়ে গেছে দেখতে। কতো যে পোজ দিচ্ছে এক একজন। কেউ সহাস্য, কেউ গম্ভীর, কারো হাতে বই, কেউ বা গালে হাত, এক অভিনব ব্যাপার। ওয়াশিংটন স্কোয়ারের এই মেলার ভিড়ে এলোমেলো চুলে, উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে বাসী দাড়ি গালে কবিতার বই হাতে নিয়ে বীট কবিরাও ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। তাদের পরনের প্যান্ট সরু থেকে আরো সরু হয়ে আঁকড়ে ধরেছে নিম্নাঙ্গ, ঊর্ধাঙ্গে বুক খোলা হাত কাটা ময়লা শার্ট, (ইচ্ছাকৃত) পায়ে ক্যানভাসের ফিতে-ছেঁড়া ময়লা জুতো (ইচ্ছাকৃত)। মেয়েবীটও আছে সঙ্গে সঙ্গে। তাদের পায়ের মোজা কালো, মাথার চুল লম্বা, হাঁটু ঢাকা ফ্রক, ঠোঁটে গালে রং নেই। আর তারি মধ্যে বীটপ্রধান কবি ভারত-ফেরতা অ্যালেন গীনসবার্গকেও দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। মস্ত বড়ো দাড়ি নিয়ে শান্ত মুখে শান্ত পায়ে নরম গলায় হরিনাম গাইতে-গাইতে চলেছে রাস্তা দিয়ে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। মুখে নয় মনপ্রাণেই দেখে হয় ভারতীয় সাধু হয়ে গেছে সে।

শীতভাঙা পাহাড়ে কলরবের মতো হঠাৎ পোশাকের বদলটাও দেখবার যোগ্য। এই মেয়েরাও যে দেহে আপাদমস্তক দুর্ভেদ্য মোটা কোটের অন্তরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত ছিলো, সেখান থেকে যেন জেগে ঘোষণা

করে সারা শরীরে উন্মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে সগর্বে। দেহের খাঁজে-খাঁজে ছাঁটা আঁটো পাতলা হাফ প্যান্ট আর একটি হাতকাটা ছোট ব্লাউস পরে সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে প্রেমিকের বাহুলগ্ন হয়ে। ঝাপটা হাওয়ায় উড়িয়ে নিতে চাইছে নকল চুলের পাড়া, দুহাতে চেপে ধরে হেসে উঠছে জলতরঙ্গের মতো। দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাগ থেকে আয়না বার করে দেখে নিচ্ছে চোখের পল্লবের নকল পালক ঠিক-মতো আঁটা আছে কিনা, চলতে চলন্ত প্রেমিকের চুম্বনের সংঘর্ষে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ঠোঁটে আলতো করে বুলিয়ে নিচ্ছে নতুন রং।

রেস্তোরাঁগুলোও ঘরের মধ্যে বসে নেই,

যার যার দোকানের অংশের ফুটপাতটুকুতে বাগান ঘিরিয়ে রঙিন রঙিন বেতের চেয়ার টেবিল পেতে কাফে সাজিয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে স্ত্রী-পুরুষ আসছে সেখানে, আকাশের আচ্ছাদনের তলায় বসে খাচ্ছে, পান করছে, হাসছে, আলিঙ্গনাবদ্ধ হচ্ছে, চুমু খাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে, আর একদল আসছে কলরব করতে-করতে, একটা ফুর্তির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে চারদিকে। দিনের আলো মুছে যেতে না যেতেই দপ করে জ্বলে উঠছে বৈদ্যুতিক আলোর ফোয়ারা, দিনের চেয়েও আমোদ জমে উঠছে বেশী। তারপর রাত একটু বেড়ে উঠলে নক্ষত্রের মতো মিটি মিটি আলোজ্বলা রাস্তা থেকে কয়েক সিঁড়ি নিচের নাইট-ক্লাবগুলো প্রচন্ডবেগে জ্যাজ বাজিয়ে উন্দাম করে তুলছে রক্ত। মদ্য এবং খাদ্যের সঙ্গে স্ত্রীলোকের বস্ত্র উন্মোচন দেখাচ্ছে তারা। গুটি-গুটি লোক জমছে সেখানে। যেসব মেয়েরা শরীর দেখাবে, স্টেজে এসে তারা হাস্যে লাস্যে আভাসে ইঙ্গিতে প্রথমে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করছে দর্শকদের, লজ্জার অভিনয় করে করে একটা একটা আবরণ ছুড়ে দিচ্ছে দূরে। এমন ভাব করছে যেন সেই আবরণ সে স্বেচ্ছায় খুলছে না, অন্য একজন খুলে নিচ্ছে জোর করে। এইসব অভিনয় যে যতো ভালো করতে পারবে তার ততো আদর। সেই ক্লাবের ততো নাম। কিন্তু যাদের ক্ষিপ্ত করার জন্য এই আপ্রাণ চেষ্টা, সেইসব দর্শকদের মুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না তাদের ভিতরে খুব একটা আলোড়ন চলেছে এইসব নগ্ন স্ত্রীলোক দেখতে-দেখতে। বিরস ভাবে বসে বসে মদ খাচ্ছে, সিগারেট টানছে, এমন কি কেউ কেউ তাকিয়েও নেই, মুখ ফিরিয়ে গল্প করছে কারো সঙ্গে। তবু ডলার খরচ করে এসেছে তারা, কিসের আশায় এসেছে হয়তো নিজেরাও জানে না। অথবা উপভোগের সামগ্রী যতো অনায়াসলভ্য হচ্ছে, উপভোগের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে সেই পরিমাণে, এই জগৎ-সংসারে উত্তেজিত হবার আর কিছুই নেই তাদের, কামের উন্মাদনাতেও নয়।

সেই পঁচাত্তর ডিগ্রির তাপমাত্রা দেখে আমরাও বেরিয়ে পড়েছিলাম ঘুরতে। নিউইয়র্কের নবতম চিত্রশালা হান্টিংডন গ্যালারি অব মডার্ন আর্টটা দেখা হয়ে গেল। পাঁচতলা জুড়ে গ্যালারি, লিফটে প্রথম পাঁচতলায় উঠে ধাপে ধাপে দেখতে হয়। সেখানেই প্রায় বিকেল হলো। ওয়াশিংটন স্কোয়ার হয়ে কোনো বন্ধুর বাড়ির ডিনার খেয়ে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। বাড়ি এসে অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখলাম চাঁদ এসে লুটিয়ে আছে কার্পেটের উপর, খাটের মাথায়। এতো ভালো লাগলো! আলো না-জ্বেলে জানালায় এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকেই আমার বন্ধুর যাওয়া আসা চোখে পড়ে। কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম বিদেশ নয়, দেশে আছি, এ আমার কলকাতার শোবার ঘর। বৃথা কল্পনা। প্রবল গর্জন তুলে একটি ডেম্পস্টার এসে দাঁড়ালো নীচে, সর্বনাশের মতো তার ভীষণ লাল আলো দুটো সামনে পিছনে অনবরত জ্বলতে লাগলো আর নিবতে লাগলো। এই ডেম্পস্টার গাড়িগুলো দেখলেই আমার ভয় লাগে। কী বিশাল চেহারা, পিছনের দিকে হাঙরের মত খোলা মুখে যা দিয়ে দেয়া হবে তাই সে বৈদ্যুতিক অগ্নিকুন্ডের সাহায্যে ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে নিয়ে নেবে জঠরে। শহরের সব আবর্জনা তুলতে আসে এই গাড়ি। যতক্ষণ তোলা হয় ততক্ষণ ভয়ংকর গর্জনে পাড়া আলোড়িত করে রাখে। ভাবলাম এই রাত্রে এখানে ডেম্পস্টার কেন? কার কী অনাবশ্যক বস্তু গ্রাস করতে এসেছে? লাফিয়ে নেমে এলো নিগ্রো ড্রাইভার, তার পরনে সরু প্যান্ট, গায়ে গেঞ্জি, হাতের পেশী ফুলিয়ে এগিয়ে গেল সে এ পাড়ার মস্ত সম্মানিত অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটির দরজায়। এই অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটিরই একটি মস্ত অ্যাপার্টমেণ্টে আমার বন্ধুর বসবাস। তার স্বামীকে এগিয়ে আসতে দেখে একটু ঝুঁকে তাকালাম। নিগ্রো ড্রাইভারটি আর বন্ধুর স্বামী দুজনে মিলে দেখলাম টেনে আনছে সেই বসবার অপূর্ব আসনটি: ম্যাট্রেসসুদ্ধ সেটা ঠেলে দিয়ে দিল ডেম্পস্টারের অগ্নিকুন্ডে, প্রচন্ড আওয়াজ তুলে দৈত্যের মতো নতুন ঝকঝকে কোচটাকে মুহূর্তে দুমড়ে মুচড়ে গিলে হজম করে নিল সেই বস্তু-বিধ্বংসীযান। আমার বুকটা কড়কড় করে উঠলো। জিনিসটা আমার নয়, তবু একটা কষ্ট অনুভব করলাম, জিনিসটার প্রাণ নেই তবু মনে হলো যাদের আরাম আয়াসের জন্য অনেকদিন ধরে এই সুদৃশ্য কাষ্ঠাসনটি তার নরম স্প্রীংআঁটা গদি নিয়ে সব সময়ে নিজেকে বিকিয়ে রেখেছে সেই কাঠের শরীরের পরতে পরতে যেন একটা যন্ত্রণার তরঙ্গ বয়ে গেল। একদিন যে বৃক্ষমাতা মাটি থেকে রস আহরণ করে তাকে লালন করেছিল সে যেন আর্তনাদ করে উঠলো।

অটোমেটিক দরজা দিয়ে আমার বন্ধুটিও এসে বাইরে ফুটপাতে দাঁড়ালো, পরনে হাফ-ট্রাউজারস, গায়ে হাফশার্ট, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। এতদিনে আপদ চুকোতে পেরে আয়াসের সঙ্গে লাল ঠোঁট গোল করে ধোঁয়া ছাড়ছিল সে। আমাকে দেখতে পেয়ে খুশী গলায় বলল, 'জানো, এই ডেম্পস্টার ডাকবার বুদ্ধিটা আমার তোমার সঙ্গে কথা বলার পরেই মনে হল। উঃ বাঁচলাম। এ পাড়ায় দেখছি অনেকেই তাই করেছে। কাল দেখ, কী সুন্দর একটা হাইড বেড কিনে আনি।'

অনসূয়া দেবী

বেগম মেরী বিশ্বাস

বিমল মিত্র

॥ ২৪ ॥

সেদিন কান্তর কথাটা শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিল বশির মিয়া! দুনিয়ায় এমন আহাম্মক কেউ আছে নাকি যে নিজামতি নোকরি ছেড়ে দিতে চায়। সারা হিন্দুস্তান থেকে লোক এসে ভিড় করে মুর্শিদাবাদের দরবারে। এমন দেশ কোথায় পাবে হিন্দুস্তানে? এমন সস্তা-গণ্ডার দেশ? তবু সব নিমক-হারামের বাচ্চা, নিজামতের নোকরি করবে আর নিজামতকেই গালাগালি দেবে!

কান্ত বললে—না ভাই, এ-নোকরিতে মনে শান্তি পাচ্ছি না—

—শান্তি? টাকা থাকলেই তো শান্তি ঝাপ-ঝাপ করে আসবে! তুই তলব পাচ্ছিস না? আলবৎ পাচ্ছিস তলব পাচ্ছিস, আর ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিস। আজ হাতিয়াগড় কাল মোরশিদাবাদ পরশু বেতিয়া। কত দেশ বেড়াতে পাচ্ছিস—তা তোর তকলিফটা কী? কী কষ্ট হচ্ছে তোর?

কান্ত বললে—আমার আর ভাল লাগছে না ভাই—

—কাম করতে তো ভাল লাগবেই না। বেশ নবাবের মত পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করবার নোকরি কে তোকে দেবে? আর নোকরি করবি না তো খাবি কী?

সে কথাটা সত্যি বটে! কিন্তু এ কাজ ছাড়া কি আর কোনও রকমের চাকরি নেই? নিজামতে কি সবাই এই ধরনের চাকরি করছে? সেরেস্তার চাকরি নেই? কাছারির চাকরি নেই? খালসা-দেওয়ানজির দফ্তরের চাকরি নেই? তার জন্যেই ঠিক বেছে বেছে কেবল এই চাকরি?

—আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন তুই ঘরে যা, আরাম করগে যা। এখন তোর মাথা গরম আছে, পরে বাত বলবো তোর সঙ্গে। তুই এই সহজ কামটা করতে পারলি না, আর তুই করবি খালসা-দেওয়ানজির দফ্তরের কাম? সে-কাম তো আরো কড়া রে—সেখানে কেবল দফ্তরে বসে বসে হিসেব লিখতে হবে—সে যে আরো শক্ত কাম—

সেদিন তখন আর বেশিক্ষণ কথা হলো না। মোল্লাহাটির মধুসূদন কর্মকারের দোকান থেকে ভোর বেলাই বেরিয়ে এসেছিল কান্ত। বেশ ভোর। শেষ রাতই বলা যায়।

বড় বিশ্বাস করেছিল তাকে সরখেল মশাই। আহা, চাল-ডাল কিনে নিজের হাতে রান্না করে খাইয়েছিল। তার কাছ থেকে চিঠি চুরি করতে কেমন যেন মায়া হয়েছিল কান্তর। বিশেষ করে চিঠিটা পড়বার পর আর সেটা নিতে সাহস হয় নি। চিঠিটা দেখবার পর যদি মরালীর ওপর অত্যাচার আরো বেড়ে যায়। যদি সবাই জানতে পারে হাতিয়াগড়ের রাজা নিজের রানীবিবিকে না-পাঠিয়ে তার বদলে তার নফরের মেয়েকে পাঠিয়েছে তাহলে তো দুজনেরই ক্ষতি হবে। শোভারাম বিশ্বাস মশাইকেও গিয়ে চিহিলদারের লোক জিজ্ঞেস করবে তোমার মেয়ে কোথায় বলো! হাতিয়াগড়ের রাজা-সাহেবকে গিয়েও বলবে তোমার বউরানী কোথায় বলো! তার চেয়ে যা হয়ে গেছে তা গেছে। নতুন করে আবার কেন সে তাদের বিপদ ডেকে আনে।

সমস্ত রাস্তাটাই সে ভেবেছে কেবল। মোল্লাহাটি থেকে বেরিয়ে নৌকো করতে হয়েছে। গহনার নৌকো। নৌকোর মাঝিটা ছিল বুড়ো। এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল—কলকাতার খবর কিছু রাখেন নাকি বাবু?

—কলকাতার কীসের খবর?

মাঝি বলেছিল—শুনলাম নাকি আমাদের নবাবের সঙ্গে ফিরিঙ্গিদের লড়াই হয়েছিল?

—হ্যাঁ শুনেছি, হয়েছিল। তা তোমরা কোথায় শুনলে?

কান্ত মাঝির মুখের দিকে চাইলে। একটু দাড়ি রয়েছে। আধ ঘণ্টা অন্তর-অন্তর নামাজ পড়ে কেবল। মাটির হাঁড়িতে রাখা পান্তা ভাত একটু নুন লঙ্কা দিয়ে খেয়ে সারা দিন রাত নৌকো চালায়। বুড়ো মাঝি আর তার জোয়ান ছেলে। ওরা জলের মানুষ, জলের ওপরেই সারা জীবন কাটিয়ে দেয় ওরা। কিন্তু ডাঙার খবরের ওপর আগ্রহ আছে। আজ এখানে কাল ওখানে করে করে দু মাস এক বছর পরে একদিন হয়ত নিজের দেশে গিয়ে হাজির হয়। বিবির জন্যে জাহাঙ্গীরাবাদের শাড়ি কিম্বা মেয়ের জন্যে বহরমপুরের খাড়ু কিনে নিয়ে যায়। একদিন কি দুদিন বাড়িতে থেকেই আবার পাড়ি দেয় নদীতে। যখন ফরাসডাঙায় যায় তখন সেখানকার খবর শোনে। তারপর যখন আবার কলকাতায় যায় তখন সেখানকার খবর শোনে। আবার যখন মুর্শিদাবাদে আসে তখন শোনে নবাবের খবর। এই রকম করেই এক দেশ থেকে আর এক দেশে খবর আনা-নেওয়া করে।

এদের কাছে থেকে কান্তর একবার মনে হয়েছিল এদের সঙ্গে জলে-জলে ভেসে বেড়ালে কেমন হয়। কোনও আর ভাবনা থাকে না তাহলে। ফিরিঙ্গিদের চাকরিও তার টিঁকলো না, নবাবের চাকরিও তার টিঁকবে না। তার চেয়ে এই-ই ভাল।

মাঝির কথায় কিন্তু কান্ত অবাক হয়ে

গিয়েছিল। মাঝিটা বলেছিল—ডাঙায় যেমন বাঘ আছে বাবু, জলেও তেমনি কুমীর আছে, কোথাও স্বস্তি নেই গো বাবু, কোথাও শান্তি নেই—

বশির মিয়ার সঙ্গে দেখা করে সোজা সারাফত আলির খুশবু তেলের দোকানে এসে পড়লো। বাদশা সকাল-সকালই উঠেছে। বাদশা দেখতে পেয়েছে। বললে—কোথায় ছিলেন কান্তবাবু?

—কেন? কেউ খুঁজছিল নাকি আমাকে?

—আবার কে খুঁজবে! মালিক খুঁজছিল! আমাকে পুছছিল—কান্তবাবু কোন্ রোজ আসবে—

—এখন মিয়াসায়েব উঠেছেন?

—না বাবু, এখন তো মালিকের মাঝ-রাত!

সকাল বেলার দিকে চক্-বাজার ঠাণ্ডা থাকে। দোকান-পাট দেরি করে খোলে। তখন গঙ্গা থেকে ভারিরা বাঁকে করে হাঁড়ি ভর্তি জল দিয়ে যায় বাড়িতে বাড়িতে। মুরগীগুলো ছোর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু যত বেলা বাড়ে তত কাজকর্ম বাড়তে থাকে। তখন কাছারিতে আসতে শুরু করে ভিন-দেশি মানুষ। মামলার তদ্বিরে কাজির কাছারিতে এসে ধর্না দেয়। কাছারির কাছেও আসে আবার রাজধানীর দোকান-পসরা থেকে মাল-পত্র খরিদ করে নিয়ে যায়। ভাল শাড়ি কেনে, চক্-বাজারের কামারের দোকান থেকে ভাল হাত-খুন্তি কেনে। কিন্তু রাত্তির বেলাতেই চক-বাজারের আসল শোভা। তখন নবাবের হাতীর দল রাস্তা কাঁপিয়ে চান করে ফেরে গঙ্গা থেকে। তখন চেহেল-সতুন থেকে দু'একটা তাঞ্জাম বেরোয়। তখন গনৎকাররা রাস্তার ধারে পাঁজি-পুঁথি-খড়ি নিয়ে বসে যায় ভাগ্য-গণনা করতে। তখন সারাফাত আলি দোকানের সামনে গিয়ে বসে। আগরবাতি জ্বেলে দেয়, গড়গড়ার মাথায় কল্কে বসিয়ে দিয়ে যায় বাদশা। তখন ভুড়ুক ভুড়ুক করে ধোঁয়া ছাড়ে সারাফাত আলি। তখন আফিমের মৌতাত জমে ওঠে।

নজর মহম্মদ এ-কদিন রোজ এসেছে। এত বড় যে একটা লড়াই হয়ে গেল ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে তাতে মুর্শিদাবাদের কিছুই ইতর-বিশেষ হয়নি। দোকানের কেনা-বেচা খদ্দেরের আনা-গোনাও কোনও তফাৎ-ফারাক হয়নি। নজর মহম্মদ যেমন আগেও আসতো তেমনিই রোজ এসেছে। লড়াই হচ্ছে, সে তো নবাবের সঙ্গে ফিরিঙ্গিদের, তাতে তোমার আমার কী? একদিন এসে বলেছিল—সেই বাবু কে গেল মিয়াসায়েব?

বোধহয় জোহরের মোহ লেগে গিয়েছিল নজর মহম্মদের।

মিয়াসাহেব বলেছিল—সে বাবু বাইরে

কামে গেছে—। তা চেহেল-সতুনের খবর কী নজর মহম্মদ?

—খবর মিয়াসায়েব খুব জবর!

—ক্যায়সা?

নজর মহম্মদ গলাটা নিচু করে বললে—জুবেদার লেড়কা হবে—

—তোবা! তোবা! সারাফাত আলি জিভ্ আর তালু দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করলে। অর্থাৎ হায়-হায়—

—পীরালি খাঁকে বলেছি। পীরালি বলেছে লট্‌কে দিতে——দেব লট্‌কে—

সারাফাত আলির লাল চোখ দুটো আরও লাল হয়ে উঠলো আতঙ্কে। বললে—সাচ-সাচ লট্‌কে দিবি?

—হরগিজ্ লট্‌কে দেব। বেগমদের সায়েস্তা করতে জুবেদাকে না লট্‌কালে আর চলছে না মিয়াসায়েব! কাল তো গুলেসন্ বেগমকে পাঠিয়েছিলাম মতিঝিল-এ। আমার কী! যদি নবাবকে খুশ্ করে নিজের নসীব ফিরিয়ে নিতে পারে তো নিক্ না। কাল তো খুব মেহ্ফিল হয়েছে সারি রাত। মেহেদী নেসার সাহেব, ইয়ারজান সাহেব, সফিউল্লা সাহেব একেবারে বজ্ঞেদিল হয়ে ফূর্তি করেছে। গুলেসনা খুব নেচেছে, খুব ইনাম পেয়েছে নেসার সাহেবের কাছ থেকে। খুব খুশী হয়েছে বেগমসাহেবা।

সারাফাত আলি মৌতাতের মধ্যেও কান পেতে শুনছিল। জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

—তারপর মিয়াসায়েব রাত তখন অনেক, মেহেদী নেসার সাহেব আমার চেহেল-সতুনে এসে হাজির। বললে মতিঝিলে মহ্ফিল হলো, হাথিয়াগড়ের রানীবিবিকে দেখবো! আমি নেসার সাহেবকে নিয়ে মরিয়ম বেগমের ঘরে গেলুম। দেখি ঘর ফাঁকা, কেউ নেই। মেহেদী নেসার সাহেব ঘরে বসে রইল—

—মরিয়ম বেগম কাঁহা চলি গয়ি?

—মিয়াসায়েব, মরিয়ম বিবি গিয়েছিল লুৎফুন্নিসা বেগমসাহেবার কাছে। আমি সব নজর রেখেছিলাম, কিন্তু নেসার সাহেবকে কিছু বলিনি। কিন্তু ওই মেহেদী নেসার শালা আমার নামে কাছারিতে নালিশ পেশ করেছে—আমি নাকি ঘুষ নিয়ে বাইরের আদমিকে চেহেল-সতুনের ভেতরে নিয়ে যাই। আমি ভাবতুম দেখি নেসার সাহেব কী করে! যেই মরিয়ম বেগম ঘরে এসেছে, নেসার সাহেব হেসে হেসে বাত বলতে শুরু করেছে। আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে লুৎফুন্নিসা বেগমসাহেবাকে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছি যে নেসার সাহেব মরিয়ম বিবির ঘরে ঢুকেছে। খবর দিতেই লুৎফুন্নিসা বেগমসাহেবা একেবারে নানী-বেগমকে নিয়ে বরাবর এসে হাজির। একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে নেসার সাহেবকে!

—তারপর?

মৌতাতের মধ্যেও সারাফাত আলির টনটনে কৌতূহল জেগে উঠলো—ঠিক কিয়া! উস্‌কা বাদ? তারপর?

—তারপর নেসার সাহেব নানী-বেগমকে দেখেই ঘর থেকে ছুটে ভেগে গেল। বাইরে সাহেবের তাঞ্জাম দাঁড়িয়ে ছিল। তাতে ওঠবার আগে আমাকে বলে গেল রানী-বিবিকে মতিঝিলে আজ পাঠাতে হবে না, অন্য কাউকে পাঠিয়ে দে। বনের চিড়িয়াকে পহেলে নাচা-গানা শিখ্‌লাতে হবে, তবে তো বুলি বলবে! আমি শুনে মনে মনে হাসলুম মিয়াসাহেব। ভাবলুম আমিও খোজা নজর মহম্মদ, আমি তোমার মত বহোত্ আমীর-ওমরাহ্ দেখিছি, আমার নামে নালিশ পেশ করা! তা মিয়াসায়েব, আমিও একটা মতলোব ঠিক করেছি—

—কী? ক্যা মতলব?

—ঠিক করেছি আমিও নানী-বেগমের দরবারে নালিশ পেশ করবো নেসার সাহেবের নামে!

—কী নালিশ?

—বলবো মরিয়ম বেগম লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলির লেড়কী নয় ও হাথিয়াগড়ের জমিদারের দোসরা তরফের বিবি—ছোট রানীবিবি—

সারাফাত আলি অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—এখনও নানী-বেগমের মালুম হয়নি যে ও রানীবিবি?

—না মিয়াসাহেব, আভি তক্ মালুম নেহি। সব-কুছ নেসার সাহেবের বদমাসি। নানী বেগমের কাছে কোরাণ ছুঁয়ে কসম্ খেয়েছে নেসার সাহেব যে ও হাথিয়াগড়ের রানীবিবি নয়।

হাতিয়াগড়ের বড়ি রানীবিবি যে মরালী-বেগমের কাছে চিঠি লিখেছিল—

— তু তুই এক কাজ কর নজর।

সারাফাত্ আলি গড়গড়ার নলে দু'বার দম টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—তুই এক কাম কর, সকলকে আমার আরক পিলিয়ে দে। আরো বেশি করে আরক পিলিয়ে দে। ওই মরালী-বেগম, লুৎফুন্নিসা বেগম কাউকে ভি ছাড়িস নি। চেহেল-সতুন ভেঙে গুঁড়িয়ে দে, গোরস্থান বানিয়ে দে—

নজর মহম্মদ বললে—নেহি মিয়াসাহেব, এ কভি নেহি হো সকতা। চেহেল-সতুন চলে গেলে আমরা কী খাবো মিয়াসাহেব, নোকরি কে দেবে? আমরা কোথায় যাবো?

সারাফাত আলি বললে—তোরা মরে যাবি, আমরা ভি মরে যাবো, নবাব, বাদশা, আমীর-ওমরাহ্ সবাই মরে যাবে. আবার নয়া দুনিয়া বনবে চেহেল-সতুনের গোরস্থানের ওপর—

—আপনার বড় গোসা মিয়াসাহেব চেহেল-সতুনের ওপর!

—না রে নজর, নয়া দুনিয়া হলে ইনসানের ভাল হবে, মানুষের ভালো হবে। তাই জন্যেই তো বলছি। চেহেল-সতুন থাকলে ইনসানের ভালো হবে না। সারা
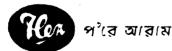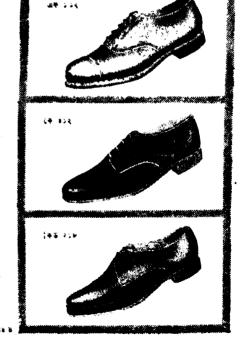
হিন্দুস্থানটাকে আজ বাদ্‌শা চেহেল-সুতুন বানিয়ে ফেলেছে। চক্‌-বাজারের মানুষরা মরে যাচ্ছে রে নজর। খেতে পাচ্ছে না গরীব লোকেরা, দু'মুঠো ভিক্ষে দিলে তাদের কোনও ফায়দা হবে না, তাতে কেবল ফকির ভিখিরির দল বেড়ে যাবে রে নজর—আসলি ফায়দা হবে না হিন্দুস্থানের—

নজর মহম্মদ এত কথা বুঝতে পারে না। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সারাফাত আলির মুখের দিকে। তার কাছে এসব আজব কথা। চেহেল-সুতুনের ভেতরে সে বরাবর দেখে এসেছে স্বচ্ছলতা। সে দেখেছে টাকা-মোহর আর মেয়েমানুষের ছড়াছড়ি। দারিদ্র্য কাকে বলে তা তাকে দেখতে হয়নি কখনও। বুড়ো মিয়াসাহেবের কথা শুনে সে যেন ঘাবড়ে গেল।

—এ কী আজব বাত বলছেন মিয়াসাহেব? নয়া-দুনিয়া কী করে বনবে? নবাব তো দুনিয়ার মালিক, নবাব তো খোদাতাল্লা—

সারাফাত আলি হেসে উঠলো দাঁত বার করে। বললে—খোদাতাল্লা হলো ফিরিঙ্গিরা—

—ফিরিঙ্গিরা?

—হ্যাঁ রে, ফিরিঙ্গিরা। খোদাতাল্লাই ফিরিঙ্গি বাচ্চাদের পাঠিয়ে দিয়েছে হিন্দুস্থানে চেহেল-সুতুন ভাঙবে বলে, দুনিয়া থেকে এই চেহেল-সুতুন বিলকুল বরবাদ করবে বলে।

বলে সারাফাত আলি আরো জোরে হাসতে লাগলো।

পেছনের ঘরের মেঝের ওপর কান্ত শুয়ে শুয়ে সব শুনছিল। সারা-রাত মাঝিদের সঙ্গে গল্প-গাছা করেছে, অনেকখানি রাস্তা হেঁটেছে, তারপর বশির মিয়ার কাছে গিয়ে দেখা করেছে। আর তারপর খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আসলে ঘুমটাই ভাল ছিল না তার। তন্দ্রার মধ্যে মনে হচ্ছিল কার গলা যেন শুনতে পাচ্ছে। আস্তে আস্তে তন্দ্রাটা কেটে যেতেই স্পষ্ট শুনতে পাওয়া গেল। সারাফাত আলির গলা। বোধহয় খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলছে মিয়াসাহেব। কিন্তু তারপরেই বুঝতে পারলে খদ্দের আর কেউ নয়, নজর মহম্মদ। বুঝতে পেরেই উঠে বসলো। বুঝলো মরালীকে নিয়েই কথা হচ্ছে। মরালীকে মেহেদী নেসার সাহেব দেখতে এসেছিল। তারপর নানী-বেগম আসাতে বেঁচে গেছে সে।

তারপর আরো কথা শোনবার জন্যে কান পেতে রইল।

নজর মহম্মদ বললে—চেহেল-সুতুন কখনও বরবাদ হতে পারে মিয়াসাহেব?

সারাফাত আলি বললে—চেহেল-সুতুন তো চেহেল-সুতুন, হিন্দুস্থানের বাদ্‌শা ভি বরবাদ হতে পারে—। তোরাই তো বাদশাকে বাদ্‌শা বানিয়েছিস, তোরাই ফিন্‌ মর্জি হলে বাদশাকে হটিয়ে দিতে পারিস! যে-বাদশা চেহেল-সুতুন বানায় সে-বাদশাকে তোরা কেন রেখেছিস্‌? তাকে হটিয়ে দে। না হটাতে পারিস তো বাদশার চেহেল-সুতুন হটিয়ে দে!

নজর মহম্মদ আর বোধহয় শুনতে পারলে না। তার বোধহয় ভয়-ভয় করতে লাগলো। হিন্দুস্থানের মোগল-পাঠান নবাব-বাদশার নিমক খেয়ে-খেয়ে যার হাড়-মাংস সমস্ত কিছু বেড়ে উঠেছে, তার এসব কথা শুনলে তো ভয় করবেই।

—আমি তাহলে আসি মিয়াসাহেব, আদাব—

আর সঙ্গে সঙ্গে কান্ত এসে হাজির হয়েছে সামনে।

—আরে কান্তবাবু? তুই কখন লৌট এলি?

নজর মহম্মদও ফিরতে গিয়ে কান্তকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো। এই বাবুজীকে চেহেল-সুতুনে নিয়ে গেলেই একটা মোহর দেবে সারাফাত আলি। এক কথায় দিয়ে এক-মোহরের মালিক হওয়া যাবে। অত সহজে এ-বাবুজীকে এড়ানো যায় না।

—আজ ভি চেহেল-সুতুন যায়েঙ্গে জনাব?

সারাফাত আলি জিজ্ঞেস করলে—কখন এলি রে তুই কান্তবাবু? আমার তো মালুম পড়েনি—

কান্ত সে-কথার উত্তর না-দিয়ে বললে—আমি আর ও-নোকরি করবো না মিয়াসাহেব। আমার আর ভাল লাগছে না। আমার আর ভাল লাগছে না ও-নোকরি করতে!

—তা না-করিস ছেড়ে দে। আমি তো তোকে বলেই দিয়েছি আমি তোকে খিলাবো। লেকিন্‌ চেহেল-সুতুন পে যানে হোগা, ওই যা তোকে বলেছি সব করতে হবে!

নজর মহম্মদ আবার জিজ্ঞেস করলে—আজ ভি যাইয়ে গা জনাব?

সারাফাত আলি বললে—হ্যাঁ রে বাবা, যাবে, যাবে! তোকেও তো বলেছি মোহর মিলে গা—

কথা আদায় করে নিয়ে নজর মহম্মদ চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ রাস্তার দিকে একটা হই-হই হল্লা উঠলো। চক্‌-বাজারের সমস্ত লোক হই-হই করে ভিড় করে উঠলো কাকে ঘিরে। ক্যা হুয়া? কী হয়েছে? সকলের মুখেই এক কথা। চক-বাজারের দোকানদাররা পর্যন্ত ছুটে গিয়ে হাজির হলো রাস্তার মধ্যে। একটা বুড়ো মানুষ মাথায় করে সরাব নিয়ে
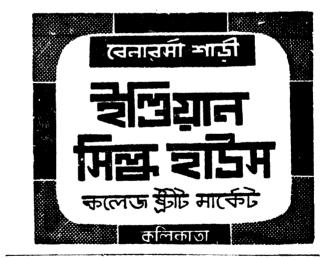
যাচ্ছিল। মাটির হাঁড়িতে সরাব ছিল। পাশ দিয়ে নবাবের হাতীর দল পিলখানায় যাচ্ছিল, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে বুড়োকে। জায়গাটা গন্ধে ভুর-ভুর করছে একেবারে।

কান্ত কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চারদিকে মানুষের ভিড়। ভেতর দিকে ঢোকা দায়।

—কী হয়েছে লোকটার?

—আরে মশাই, মিয়াসায়েব আর একটু হলে হাতীর পায়ের তলায় চাপা পড়তো। খোদা বাঁচিয়ে দিয়েছে—

—লোকটা কে?

—ইব্রাহিম খাঁ।

—কে ইব্রাহিম খাঁ?

—আরে ইব্রাহিম খাঁকে চেনেন না জনাব? মতিঝিল-এ সরাবখানায় কাম করে। সত্তর বছরের বুড়ো মিয়াসায়েব!

ততক্ষণে অন্য লোকেরা বেশ মজা পেয়ে গিয়েছে। খাঁটি সরাব। নবাব-নবাবজাদাদের খাবার জন্যে সরাবখানায় নিয়ে যাচ্ছিল। খুব দামী মাল। চক-বাজারের ভাঁটিখানায় যে-সরাব বিক্রি হয় এ তা নয়। এর অনেক কিম্মৎ। রাস্তায় পড়ে গিয়ে সরাব চারদিকে ছত্রাকার হয়ে গিয়েছিল। ভাঙা হাঁড়ির টুকরোর মধ্যে যেটুকু এখানে ওখানে পড়েছিল তাই নিয়েই কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল তখন। হাঁড়ির কানাগুলো যারা পেয়েছে তারা তা চেটে চেটে খাচ্ছে। আহা, খাসা মাল। খাস্ খোরাসান্ ইস্তানবুল থেকে আমদানী! বেগম-বাদশা-নবাবদের জন্যে বাছাই করা আঙুরের রস দিয়ে বানানো। বঢ়িয়া চিজ্। লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাটির ওপর। তখনও যদি কিছু পড়ে থাকে তলানি। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ তখনও কাৎরাচ্ছে। সে দিকে কারো নজর নেই।

নজর মহম্মদও দেখছিল। বললে—খুদে দারু পিয়েছে—

হাতীর দল যেমন যাচ্ছিল তেমনি সোজা চলে গেছে পিলখানায়। নবাবের হাতী। ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই ফতে করে এসেছে, কে মরলো কে বেঁচে রইল তা দেখবার দায় নেই তাদের। নবাবের নিজামতে মানুষের চেয়ে হাতীর কদর বেশি। মানুষ মরে মরুক, কিন্তু একটা হাতীর অনেক দাম।

হঠাৎ হৈ-হৈ করে কোতোয়ালের লোক এসে হাজির। ভিড় হটাও ভিড় হটাও। লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করতে সুরু করেছে তারা। বড়ে-আদমি লোকদের তাঞ্জামের রাস্তা ছাড়ো। নবাব-বাদসাদের ঘোড়া যেতে পারবে না, হাতী যেতে পারবে না, পাল্কি যেতে পারবে না। হটো, হারামজাদ—

কোতোয়ালের লোকদের এরা ভারি ভয় করে। ঊর্ধ্বশ্বাসে যে যেদিকে পারলে দৌড়তে লাগলো। নজর মহম্মদ এক ফাঁকে কান্তর হাতটা ধরলে। বলে—চলিয়ে জনাব—ইধার আইয়ে, এবার মারপিট সুরু হবে—

কিন্তু ইব্রাহিম খাঁ তখনও কাৎরাচ্ছে। হয় পা ভেঙে গেছে নয়তো বুকের পাঁজরা ফাঁক হয়ে গেছে। তার দিকে কেউ দেখছে না।

কান্ত কাছে গিয়ে ইব্রাহিম খাঁর মুখখানা নিচু হয়ে দেখলে। তারপর পেছন থেকে তার পিঠেও একটা লাঠির চোট এসে পড়লো।

নজর মহম্মদ দূর থেকে দেখছিল। সেখান থেকেই হাঁকলে—ইধার আইয়ে বাবুজী, ভাগ যাইয়ে—

কান্তর মনে হলো পিঠটা যেন তার ভেঙে গেছে। কিন্তু ইব্রাহিম খাঁর চোটটা বোধ হয় আরো বেশি। সে তখনও কাতরাচ্ছে।

কান্ত নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলে—হাঁটতে পারবে খাঁ সাহেব? হেঁটে যেতে পারবে?

ইব্রাহিম খাঁ উত্তর দিতে পারলে না। কান্ত আর দেরি করলে না। কোতোয়ালের

সেপাইরা তখন পাগলের মত যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই পিটছে।

কান্ত তাড়াতাড়ি ইব্রাহিমকে পাঁজা-কোলা করে তুললো। সত্তর বছরের বুড়ো হলে কী হবে, একেবারে ফাঁপা। শুকনো ক'খানা হাড় শুধু শরীরে, আর কিছু নেই। কোনওরকমে তুলে নিয়েই সারাফাত আলির দোকানে এসে নামিয়ে দিলে।

বললে—মিয়াসাহেব, এখনও মরেনি লোকটা, একটু জল দেব মুখে—যদি বেঁচে যায়—

বাদশা এল। কান্ত বললে—একটু জল আনো তো—

সারাফাত আলি মুখে কিছু বললে না। কিন্তু মুখের ভাব-দেখে মনে হলো খুশী হয়নি। নবাব নিজামতের কোনও লোকের ওপরই সে খুশী নয়। জিজ্ঞেস করলে—এ কোন্ হায় ?

কান্ত বললে—শুনেলাম, মতিঝিলে সরাবখানায় খেদমদগারের কাজ করে, ইব্রাহিম খাঁ—

সারাফাত আলি কিছু বললে না। শুধু জোরে শব্দ করে করে গড়গড়ার নলে তাম্বাকুর ধোঁয়া টানতে লাগলো।

বখতিয়ার খিলিজির পর থেকে নবাব আলীবর্দী খাঁ পর্যন্ত ইতিহাসের একটা গতিপথ আছে। সে-গতিপথে অনেক অত্যাচার অনাচার অবিচার ঘটলেও মুর্শিদকুলি খাঁর পর থেকে দেশে একটা শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা হয়েছিল। সে চেষ্টায় খানিকটা এসেছে মোগল-পাঠানদের নিজেদের লড়াই-মারামারি থেকে। আর খানিকটা এসেছিল দেশের মানুষের আত্ম-রক্ষার তাগিদ থেকে। ১৫৪০ খৃঃ সের শাহ যখন হিন্দুস্থানের বাদশা হুমায়ুনকে হারিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন তখন ফার্মান জারি করলেন—হিন্দু প্রজারা ঠিক সময়ে খাজনা দিতে না পারলে নবাবদের মর্জি হলে সেই প্রজাদের মুখে তাঁরা থুতু দেবেন, এবং প্রজারা ইসলাম-ধর্মের মাহাত্ম্য প্রমাণ করবার জন্যে ভক্তি সহকারে সেই থুতু গিলবেন।

মহামতি আকবর, যিনি জিজিয়া করের প্রবর্তন করেছিলেন হিন্দুদের জন্যে, এই আইন পরে তুলে নিয়েছিলেন বটে এবং তুলে নিয়ে কোটি-কোটি প্রজার আশীর্বাদও কুড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু থুতু যে একবার খেলে সে তো আর কস্মিনকালেও জাতে উঠতে পারলো না। যে একদিন ছিল পরমেশ্বর দাস সে-ই হয়ত একদিন রাতা-রাতি হয়ে গেল মৈনুদ্দিন খাঁ। সের শা'র পরে অনেক দেওয়ান এলেন বাঙলা দেশে। মুনিম খাঁ, টোডরমল একে একে আশলী জমায় অনেক আকবরশাহী টাকা আদায় করে দিল্লীর খাজনা-খানায় পাঠালেন। কিন্তু পাশাপাশি আবার প্রতাপাদিত্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ওদিকে পুরী থেকে নোয়াখালি পর্যন্ত আর এদিকে নবদ্বীপের দক্ষিণে কাঞ্চননগর আর চন্দ্রদল পর্যন্ত অধিকার করে নিলেন।

হয়ত এই-ই নিয়ম। হয়ত এমনিই হয়ে থাকে।

হয়ত অন্ধকারের পাশেই আলো থাকে। অত্যাচারের পাশেই থাকে ন্যায়-বিচার। একদিকে ইতিহাস যখন অত্যাচারের কলঙ্কে পঙ্কিল হয়ে উঠেছে, তখনই আর একদিকে উদয় হয়েছে তথাগত বুদ্ধদেবের, চৈতন্যদেবের, আর শংকরাচার্যের। কিন্তু মুর্শিদকুলি খাঁর চেহেল-সুতুনের মধ্যে তখনও সেই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার। তার এ পাশেও আলো নেই, ওপাশেও হতাশা। ওর ভেতরে দিন-রাত, ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্য, সংস্কার-কুসংস্কার সব একাকার। ওখানে তখন পৃথিবী তার আদিম অবয়ব নিয়ে নিশ্চল দারুভূত হয়ে আছে। বুদ্ধদেবের নির্বাণ-মন্ত্র ওখানে পৌঁছতে পারেনি, চৈতন্যদেবের আচণ্ডাল-প্রীতি কোনও রেখাপাত করেনি, শংকরাচার্যের ব্রাহ্মণ্য বাণী ওদের কাছে গিয়ে বোবা হয়ে গেছে।

তাই যেদিন বোবা জমেদার শরীরটা নিয়ে চেহেল-সুতুনের ভেতরে টানা-হ্যাঁচড়া চললো সেদিন কারো কাছে সে-ঘটনা নতুন মনে হয়নি। এ আর এমন কী! এ তো সহজ! এ তো স্বাভাবিক। আদিযুগে থেকে তো এমনিই হয়ে আসছে। আবার অনাদিকাল ধরেও এমনিই চলবে! ও নিয়ে অত বিচলিত হচ্ছো কেন? যে-বাচ্চার বাপের ঠিক নেই, সেই বাচ্চাকে যে পেটে ধরেছে তার শাস্তি হবে না? তার শাস্তি যদি না হয় তো চেহেল-সুতুন যে অনাসৃষ্টিতে ভরে যাবে!

চেহেল-সুতুনের চবুতরের আরো পূবে যেখানে ধোবিখানা, সেই দিকটাতে সকাল থেকেই ছুতোর মিস্ত্রীদের কাজ চলছিল। একটা উঁচু লম্বা কাঠের কাঠগড়া। দুপাশে দুটো কাঠের খুঁটি। তার মাথায় শক্ত দুটো হাতল। ওদিকটায় বেশি কেউ যায় না। রাতের বেলায় জায়গাটা খাঁ খাঁ করে। লাল পাথরে বাঁধানো জায়গাটার ওপর দিনের বেলা কিছু ঘাগরা-ওড়নী-কাঁচুলি কেচে শুকোতে দেয় ধোপারা। যখন তাও দেয় না তখন খিলেনের ভেতর থেকে পোষা পায়রার ঝাঁক এসে ওইখানে বসে পাখা চুলকোয়। পেখম তোলে। দানা খায়।

কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই যেন চাপা-চাপা কান্না-ঘুষো চলেছে। চেহেল-সতুনের মহালে-মহালে ফিস্-ফিস্ গুজ-গুজ।

—কে? কাকে লটকাবে বললি?

বাঁদীরা বেগমদের কাছে খবরটা দিয়ে তারিফ পাবার আশা করে।

—ওমা, তাই নাকি? বোবা মাগীর পেটে-পেটে এত? কে করলে রে? মানুষটা কে?

সবাই যেন বেশ খুশী-খুশী। সবাই-ই ডুবে ডুবে জল খায়, তবু যে-ধরা পড়েছে তার ওপরেই যেন সকলের বিষ-নজর। নাগর তো আমাদের ঘরেও আসে বাছা, ঘরে এসে রাত কাটায়, কিন্তু এমন করে ধরা তো পড়ি না। কতদিন ন্যাকড়া জড়ানো রক্ত-মাখানো ডেলাটা চেহেল-সতুনের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে চুপি চুপি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ভোরবেলা কাক-চিল-শকুনির ভিড় হবার আগে পর্যন্ত কেউ-ই টের পায়নি। আর টের পেলেও পীরালি খাঁর হাতে কিছু গুঁজে দিলেই সব ধামা চাপা পড়ে গেছে। কেউ জানতে পারেনি কোন্ বেগমের ঘর থেকে তা ফেলা হয়েছে, আর কে-ই বা দায়ী!

—বেগমসাহেবা, চলো চলো, দেখবে চলো জুবেদাকে ধরে এনেছে—

ওও তো একটা কাজ। সারাদিন-রাত্তির খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়েও তো সময় কাটে না কারো। কত আরক খাবে, কত রাত জাগবে, কত গান গাইবে, কত নাচ নাচবে। তবু যে ওদের সময় ফুরোতে চায় না। তক্কি বেগম জাফরিটার আড়ালে গিয়ে দেখছে। বব্বু বেগম গিয়ে দেখছে, গুল-সন বেগম গিয়ে দেখছে। সবাই জড়ো হয়েছে আড়ালে। সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে। জাফরির ফাঁক দিয়ে বাইরের সব জিনিস স্পষ্ট দেখা যাবে, কিন্তু বাইরের লোক ভেতরের কিছুই দেখতে পাবে না।

পীরালি খাঁ তদারকি করছিল কাঠগড়ার কাজে। ওদিক থেকে চারজন খোজা জুবেদাকে ধরে নিয়ে এল হিড়-হিড় করে। বাঁদীটার কাপড় জামা কাঁচুলি সব খুলে নিয়েছে। উদোম চেহারা একেবারে। আহা, আসতে কী চায়। কথাও বলতে পারে না, চেঁচিয়ে কাঁদতেও পারে না; শুধু গলা দিয়ে এক-রকম গোঁ-গোঁ আওয়াজ বেরোচ্ছে। আর নজর মহম্মদ বরকত আলি ওরা চাবুক নিয়ে শাসাচ্ছে—

টানতে টানতে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে একেবারে সোজা কাঠগড়াটার সামনে নিয়ে এল। তারপর একজন ধরলে জুবেদার পা দুটো, আর একজন ঘাড়টা। ধরে ঝুলিয়ে দিলে। পা দুটো ওপরের হাতলের সঙ্গে বেঁধে মাটির দিকে মাথাটা ঝুলিয়ে দিলে।

সমস্ত চেহেল-সতুনের যেন আনন্দে একেবারে দম বন্ধ হয়ে পড়বার অবস্থা।

তারপর নিচেয় গর্ত করে, হাত দুটো মাটিতে পুঁতে জম্পেশ করে কাঠের খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলে। যেন হাত না নাড়তে পারে।

ভয়ে আতঙ্কে বোবা বাঁদীটা গোঁ গোঁ করে গোঙাতে লাগলো প্রাণপণ!

বেশ চলছিল সব। চারদিকে বেশ মজা দেখবার ভিড় জমেছিল। এমনি করেই পাপীর শাস্তি হয়ে থাকে চেহেল-সতুনে। পাপের ভাঁড়ারের মধ্যে পাপীকে প্রশ্রয় দেওয়ার রীতি নেই। তাই এমনি করেই পাপীর শাস্তি চিরকাল ধরে এখানে চলে আসছে। যেদিন থেকে পৃথিবীতে সূর্যোদয় সুরু হয়েছে সেই দিন থেকেই এই রেওয়াজ। জাফরির ফাঁক দিয়ে যারা এ-দৃশ্য দেখছে, তাদের কাছে এ কিছু নতুন নয়। এমনি করে তিন দিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা হবে জুবেদাকে। এক কণা রুটি দেওয়া হবে না, এক ফোঁটা জল দেওয়া হবে না, এক মুঠো করুণাও কেউ দেবে না। তিন দিন পরেও যদি জুবেদা বেঁচে থাকে তো তখন...

হয়ত এমনি করেই আরো অনেকক্ষণ ধরে মজা দেখতো চেহেল-সতুনের মানুষরা।

কিন্তু হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটলো।

ওদিক থেকে পাগলের মত ছুটতে-ছুটতে এসেছে মরিয়ম বেগমসাহেবা।

পীরালি খাঁ দেখতে পেয়েই ইঙ্গিত করলে নজর মহম্মদকে। আর নজর মহম্মদও ইঙ্গিতটা বুঝলো। বোঝবার সঙ্গে সঙ্গে মরিয়ম বেগমসাহেবার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে।

—আমার বাঁদী। আমার বাঁদীকে তোমরা ও কী করছো? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওকে—

মরালীর চিৎকারটা আর্তনাদ হয়ে যেন সমস্ত চেহেল-সুতুনটা একেবারে কাঁপিয়ে তুললো। সকলের মনে হলো যেন এতদিন পরে বোবা চেহেল-সুতুনটারও মুখে কথা ফুটলো। মরিয়ম-বেগম যেন চেহেল্‌-সুতুনের সকলের হয়ে এই প্রথম এক প্রবল প্রতিবাদ পেশ করলো।

জাফরির ফাঁকে তক্কি বেগম পাশের বাঁদীকে জিজ্ঞেস করলে—উও কৌন্‌?

বাঁদী বললে—কোই নয়ী বেগমসাহেবা হোংগী—

বব্বু বেগমও অবাক হয়ে গেছে। আগে কখনও মরিয়ম বেগমকে দেখেনি। সেও জিজ্ঞেস করলে তার বাঁদীকে—উও কৌন্‌?

জাফরির ফাঁকে ফাঁকে যত বেগমসাহেবা ছিল সকলের মুখেই ওই একই জিজ্ঞাসা। উও কৌন্‌? এত সাহস তো এতদিন কারোর হয়নি। এর আগেও কত বেগমসাহেবার কত বাঁদীর ঠিক এমনি করেই শাস্তি হয়েছে, কিন্তু আগে তো কই এমন করে কেউ প্রতিবাদ করতে ঝাঁপিয়ে পড়েনি এখানে!

কাঠগড়ার ওপর তখনও উলঙ্গ বাঁদীটার পাপী দেহ ঝুলছে আর মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করে গোঙাচ্ছে।

—খোল, ওকে খুলে দাও, ওর পায়ের দড়ি খুলে দাও—ও মরে যাবে যে—

পীরালি খাঁ নজর মহম্মদকে আর একবার চোখ টিপে ইঙ্গিত করলে। নজর মহম্মদও আর দেরি করলে না। মরালী কাঠগড়ার ওপর উঠে নিজেই বাঁদীটার পায়ের দড়ি খুলে দেখতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই নজর মহম্মদ মরিয়ম বেগমসাহেবার একটা হাত ধরে ফেলেছে।

মরালী এক-ঝটকায় সঙ্গে সঙ্গে নজর মহম্মদের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছে।

—তোমরা ভেবেছ কী? বোবা মেয়েমানুষ পেয়ে ভেবেছ যা খুশী তাই করবে? সরে যাও এখান থেকে, সরে যাও—

এবার নজর মহম্মদের সঙ্গে বরকত আলিও এল মরিয়ম বেগমকে সামলাতে।

মরালী এবার যেন একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

—নানী বেগমসাহেবা—নানী বেগমসাহেবা—

চেহেল-সুতুন যেন তোলপাড় হয়ে যাবে মরিয়ম বেগমের চিৎকারে। নজর মহম্মদ তাড়াতাড়ি এসে মরালীর মুখটা চাপা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হাতিয়াগড়ের শোভারাম বিশ্বাসের মেয়ে অমন অনেক নজর মহম্মদকে দেখেছে। একদিন মরালীর ভয়ে সমস্ত হাতিয়াগড়ের মানুষ কাঁপতো। সেই মরালীকে অত সহজে কাবু করা সম্ভব নয়। মরালী নজর মহম্মদের হাতটা দাঁত দিয়ে জোরে কামড়ে ধরলে। কামড়াতেই নজর মহম্মদ 'গিয়া' 'গিয়া' বলে চেঁচিয়ে উঠে হাত ছেড়ে দিয়েছে।

এবার পীরালি খাঁ আর দেরি করলে না। নিজেই এগিয়ে এসে মরিয়ম বেগমকে ধরতে গেল।

কিন্তু তার আগেই নানী বেগম এসে হাজির হয়েছে। সঙ্গে লুৎফুন্নিসা বেগম।

নানী বেগম শান্ত গলায় ডাকলে—পীরালি খাঁ—

পীরালি সঙ্গে সঙ্গে নানী বেগমের দিকে মুখ করে তিনবার কুর্নিশ করে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো।

—মরিয়ম বেগমসাহেবাকো ছোড় দো—

—বেগমসাহেবা, জুবেদাকে কাঠগড়ায় লটকে দিয়েছি, খোজার সাহেবের হুকুমে—মরিয়ম বেগমসাহেবা বাধা দিচ্ছে—

মরালী দৌড়ে নানী-বেগমের কাছে এসে দাঁড়াল।

বললে—ও যে মরে যাবে নানী-বেগমসাহেবা, ও মেয়েমানুষ বলে কি ওর এই হেনস্থা, ওকে কেউ দেখবে না—ওকে ছেড়ে দিতে বলুন না আপনি—

নানী বেগম মরালীর দিকে চাইলো। তারপর শান্ত গলায় বললে—তুমি মা ওদের ব্যাপারে কেন মাথা ঘামাচ্ছ? ওদের কাজ ওরা করুক, ওতে বাধা দিতে নেই—

—কিন্তু ও যে বোবা! ও যে কথা বলতে পারে না।

—কিন্তু যা নিয়ম তা তো মানবেই ওরা। ওদের কাজ ওরা করবেই!

মরালী বললে—নানী বেগমসাহেবা, আপনি আমার মায়ের মতন, আপনি জুবেদারও মায়ের মতন, আপনার চোখের সামনে এত বড় অন্যায়টা ঘটবে আর আপনি কিছু বলবেন না ওদের? নিয়মটাই বড় হবে আপনার কাছে? মায়া-দয়াটা কিছু নয়? আপনার নিজের পেটের মেয়ের বেলায় যদি ওমনি হতো, তাহলে? আপনি তা চোখ দিয়ে দেখতে পারতেন?

নানী বেগম প্রথমে কিছু বললে না। তারপর বললে—তুমি মা নতুন এসেছ এখানে তাই অত বিচলিত হয়ে উঠেছ, আর কিছুদিন থাকলেই সব বুঝতে পারবে—

মরালী বললে—সে যখন বুঝতে পারবো তখন বুঝবো, এখন ওকে ছেড়ে দিতে বলুন আপনি—ও গোঁ গোঁ করছে, ও নির্ঘাৎ মরে যাবে, আর বাঁচবে না—

নানী বেগম শান্ত গলায় বললে—তুমি মা ও সব কথা ভেবো না, তুমি এখান থেকে চলে যাও, আমিও চলে যাচ্ছি, চেহেল-সুতুনের নিয়ম ওরা মানবেই, ও কেউ ঠেকাতে পারবে না—

—কিন্তু তাহলে আপনি আছেন কী করতে? আপনি তাহলে কোরাণ পড়েন

কী করছে? বেগমসাহেব কি এই সব কথা জেনে গেছে?

এবার লুৎফুন্নিসা বেগম এগিয়ে এল। বললে—বেহেন, এ [illegible] মতিঝিলের [illegible] কেঁদো না বহেন [illegible]—

বলে মরালীর চোখের জল নিজের ওড়না দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগলো।

ওদিকে নানী বেগম মহম্মদ নেসার সাহেবকে কখন গিয়ে খবর দিয়ে এসেছিল। হঠাৎ এরই মধ্যিখানে মেহেদী নেসার সাহেব আসতেই সব আবহাওয়া যেন থম-থমে হয়ে এল। শুধু ঝুলে থাকা উজ্জ্বল বাতিটার গলা থেকে যেরকম সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া আর সব কিছু নিস্তব্ধ!

—বেগমসাহেবা!

নানী বেগম নেসার সাহেবের দিকে চেয়ে রইল।

মেহেদী নেসার তেমনি মাথা নিচু করে বললে—বেগমসাহেবা, নবাব মীর্জা মহম্মদ মরিয়ম বেগমসাহেবাকে মতিঝিলে এত্তেলা দিয়েছে—

কথাটা শেষ হবার আগেই মরালী চিৎকার করে উঠলো—আমি মতিঝিলে যাবো না নানী বেগমসাহেবা, আমি মতিঝিলে যাবো না—

নেসার সাহেব বললে—নবাবের হুকুম যে এটা মরিয়ম বেগমসাহেবা!

—আমি যাবো না, আমি কিছুতেই যাবো না মতিঝিলে—বলে মরালী হঠাৎ নানী বেগমকে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে প্রাণপণে। আর কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য!

বললে—আপনার পায়ে পড়ি নানী-বেগমসাহেবা, আমি আপনার মেয়ের মতন—

—কিন্তু মীর্জা যে তোমাকে ডেকেছে মা, না গেলে সে যে গোসা করবে! সে যে খুব রাগী মানুষ! মরিয়ম বেগমের নাম করে খবর ডেকেছে, এখন না-গেলে নবাবের অপমান হবে। না মা মরিয়ম, তোমার কোনও ভয় নেই, আমি বলছি তুমি যাও—

হঠাৎ মরালী নানী বেগমের মুখের ওপর মুখ রেখে বললে—কিন্তু মা, আমি তো মরিয়ম বেগম নই—

—মরিয়ম বেগম নও? লস্করপুরের তালুকদার আলিমুদ্দিন সাহেবের মেয়ে নও—

মরালী বললে—না মা, আমি হাতিয়াগড়ের জমিদারের ছোট বউ, আমি আজ সত্যি কথাই বলি আমি হাতিয়াগড়ের রানীবিবি!

কথাটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা চেহেল-সুতুনে বিদ্যুৎ চমকে গেল। নানী-বেগম অবাক হয়ে মেহেদী-নেসার সাহেবের দিকে চেয়ে বললে—হাতিয়াগড়ের রানী-বিবি!

কিন্তু মেহেদী নেসার তখন সেখান থেকে নিঃশব্দে সরে গেছে। নানী-বেগমের হঠাৎ মনে পড়লো বহুদিন আগে হাতিয়াগড়ের বড়রানীবিবি তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে একটা খত দিয়েছিল। তখন নেসার বলেছিল সে সব মিথ্যে কথা। শেষকালে সেই খতের কথাই সত্যি হলো!

নানী বেগম মরালীকে বুকের মধ্যে আরো জোরে জড়িয়ে ধরলে।

লুৎফুন্নিসা বেগমও তখন মরালীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো—বহেন, তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি কেঁদো না বহেন—

ওদিকে কাঠগড়ার ওপরে বোবা জুবেদা তখনও গোঁ গোঁ করে গোঙাচ্ছে, আর তার মুখ দিয়ে গল্ গল্ করে সাদা সাদা ফেণা বেরোচ্ছে।

সারাফত আলির খুশবু তেলের দোকানেও তখন সকাল হয়েছে। ইব্রাহিম খাঁকে সারা রাত হাওয়া করেছে কান্ত। বুড়ো মানুষ। কিন্তু টাকার জন্যে সরাবের হাঁড়া বয়ে নিয়ে যেতে হয় ভাটিখানা থেকে। ইস্তাম্বুল খোরাসান, দিল্লী থেকে কিস্মৎদার দারু মুর্শিদাবাদের ঘাটে আসে নৌকায় করে। সেই হাঁড়া বয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হয় মাথায় করে। বয়ে নিয়ে গিয়ে মতিঝিলের সরাবখানায় রাখতে হয়। মতিঝিলের ঠাণ্ডা ঘরের ভেতর সেই সরাব জমা হয় নবাবের জন্যে। মহ্ফিলের দিন সবাই সেই সরাব খায়। শুধু নবাব সরাব খায় না। কিন্তু নবাব না খেলেও সাকরেদেরা খায়, নবাবের ইয়াররা খায়। মেহেদী নেসার, ইয়ারজান, সফিউল্লা সাহেব খায়।

—তা তোমার তো খুব মেহনত্ হয়। তুমি কত তলব পাও ইব্রাহিম?

ইব্রাহিম খাঁ সারা রাত ঘুমিয়ে তখন একটু সেরে উঠেছিল। বললে—তিন টাকা হুজুর!

তিন টাকা মাত্তর! কিন্তু দিনের আলোয় ইব্রাহিম খাঁর মুখের দিকে চেয়ে কান্ত আরো কিছু যেন কী যেন দেখতে লাগলো। বড় চেনা-চেনা লাগলো যেন মুখখানা।

ইব্রাহিম খাঁও দেখলে কান্তকে। কান্তকে যেন এতক্ষণে চিনতে পারলে।

কান্তও বললে—আচ্ছা ইব্রাহিম, তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি-দেখেছি মনে হচ্ছে বলো তো?

ইব্রাহিম খাঁ হঠাৎ কথা-বলা-বলি হেড়ে-ফুড়ে উঠে বসলো।

—উঠছো কেন? শুয়ে থাকো, শোও—শোও—

কিন্তু তখন আর কে তার কথা শোনে। বুড়ো উঠে একেবারে পালাবার জন্যে বাইরে চলে যায় আর কি! কান্তও বুড়োর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন হঠাৎ উঠে পড়বার কী হলো!

কিন্তু দরজার কাছে আসতেই দিনের আলোয় মুখখানা দেখে স্পষ্ট চিনতে পারলে কান্ত।

—আরে, তুমি সেই সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাই না?

বুড়ো হঠাৎ নিজের মুখখানা দু হাতে ঢেকে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। বলতে লাগলো—না না, আমি ইব্রাহিম খাঁ, আমি ইব্রাহিম খাঁ—

কিন্তু পালাবার আগেই কান্ত পুরোকায়স্থ মশাই-এর হাতখানা জোরে ধরে ফেলেছে। ধরে ফেলতেই পুরোকায়স্থ-মশাই একেবারে ছেলেমানুষের মত হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললে।

(ক্রমশঃ)

অবস্লুহো ছড়িয়ে পড়েছে। স্বয়ং-সেব দোকানের মধ্যে মুদির দোকান, ওষুধের দোকান, কাগজ-কলমের দোকান দেখেছি, রেস্টুরেণ্ট দেখেছি। আমরা থাকতে থাকতে প্রাহায় ট্রাম পর্যন্ত স্বয়ং-সেব হয়ে গেল। ট্রামে শুধু একজন ড্রাইভার। ওঠবার জায়গায় একটা পয়সা ফেলবার বাক্স—টিকিট কাটা, টিকিট চেক কিছু নেই। প্রথম দিন ভাড়া হাতে নিয়ে বসে আছি, কনডাকটারই আসে না। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, ট্রাম থেকে নামবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে, ব্যস্ত হয়ে উঠেছি টিকিট কেনবার জন্যে, এদিক-ওদিক খুঁজতে শুরু করলুম কনডাকটারকে—কোথাও তার টিকিটি দেখতে পেলুম না। আমার নিঃসহায় অবস্থা দেখে এক ভদ্রলোক আমার হাত ধরে বাক্সটার কাছে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেন তবে বুঝি।

এমনি এদের সামো-অবস্লুহো। যেমন দোকানে তেমনি রেস্তরাঁয়, তেমনি ট্রামে এবং বাসে। সুষ্ঠুভাবে লেন দেন হয়ে যায়—কোন গোল নেই, কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

মিতু তাক থেকে একখানা মুখ-মোছা-তোয়ালে তুলে নিয়ে ঝুড়িতে রেখে বলল—তুমি কিছু কিনবে নাকি বাবা? আমি বললুম—আমার তো সব কিছুই কিনতে ইচ্ছে করছে—কী চমৎকার সাজিয়েছে! কিন্তু অত পয়সা পাবো কোথা? তার চেয়ে থাক। দোকান তো রইল, যখন যা দরকার পড়বে কিনে নিয়ে যাবো। মিতু বললে—কিন্তু সামো-অবস্লুহো ছাড়া অন্য কোনো দোকান থেকে কিনো না বাবা। আমি বললুম—কখখনো নয়।

আবার বেরিয়ে এলুম প্রাহার রাস্তায়! এর আগের বারে যখন প্রাহায় এসেছিলুম, তার সঙ্গে এবারে অনেক তফাত। দোকান-গুলোর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কেনবার জিনিস অনেক বেড়েছে—আগে তো প্রায় কিছুই ছিল না। বাচ্ছাগুলোর চেহারা দূরে থেকে চোখে পড়ে—মোটা-সোটা, লাল গাল। আগের চেয়ে খেতে পায় নিশ্চয় অনেক ভালো। যুদ্ধের ফলে যা হাল হয়েছিল দেশের—বাচ্ছাগুলো সব টিংটিংয়ে হয়ে গিয়েছিল। যে কোনো দেশের যে কোনো সমাজের যে কোন গোষ্ঠীর অবস্থা কেমন তা চট্ করে বোঝবার সব চেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে তাদের বাচ্ছাগুলোর দিকে তাকানো। এক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যায় অবস্থাটা। এদের দ্রুত উন্নতিটা দেখবার মতো। শিল্প-প্রধান দেশের ঐ এক সুবিধে। চট করে উন্নতি এনে ফেলতে পারে। চট করে জীবন-যাত্রার মান উঁচু করে ফেলতে পারে। তার উপর,
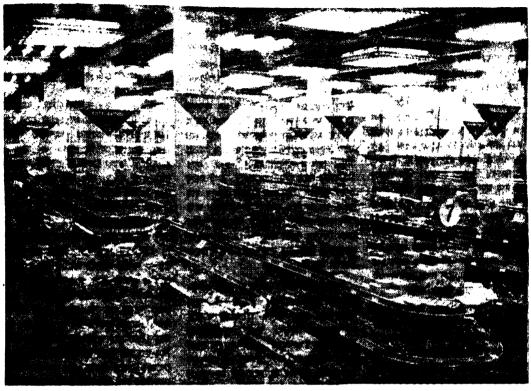
'সামো-অবুন্দুহা' দোকান

শুধু তো এরা শিল্প-প্রধান দেশ নয়, সোশালিস্ট দেশ—পশ্চিম ইয়োরোপের চেয়েও এক কাঠি দড়—যুদ্ধ টুদ্ধ যদি না হয়, এদের দ্রুত অগ্রগতি রোখে কে?

দোকান থেকে বেরিয়ে এগলুম রাস্তা ধরে। কিছু দূর এগিয়েই একটা প্রকাণ্ড চত্বর—পাঁচ সাতটা বড় বড় রাস্তা এসে মিলেছে। আগে এর কি একটা নাম ছিল, এখন দেখলুম নাম দিয়েছে 'অক্টোবর বিপ্লব চত্বর'। এর মানে এ নয় যে এখানে অক্টোবর বিপ্লব ঘটেছিল। অক্টোবর বিপ্লবকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে এই ব্যবস্থা। ব্রিটিশ আমলে আমরা যেমন ব্রিটিশ শাসনকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে ব্রিটিশ শাসকদের নামে নামে রাজধানীর রাস্তা করতুম; আবার স্বাধীনতা পাবার পর সেই রাস্তাগুলির নাম মুছে আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে স্মরণীয় করে রেখেছি জাতীয় নেতাদের নামে রাস্তা করে—ক্লাইভ স্ট্রীট কেটে করেছি নেতাজী সুভাষ রোড, হ্যারিসন রোড মুছে করেছি মহাত্মা গান্ধী রোড এরাও সেই পথে গিয়েছে। বিপ্লবকে ভুলতে দিতে চাইছে না। চৌরাস্তার নামগুলো যে বিপ্লবে ভরা এটা যতই প্রাহায় থাকতে লাগলুম ততই চোখে পড়তে লাগল। 'রেভলুচ্নী ট্রীডা' অর্থাৎ বিপ্লব স্ট্রীট একটা বেশ বড় রাস্তা যেখানে চেকোস্লোভাক এয়ার লাইনের মস্ত আপিস। ৯ই মে যুদ্ধের শেষে প্রাহার উদ্ধার হয়েছিল—কাজেই ৯ই মে স্ট্রীট। এ ছাড়া জাতীয় বীরদের রাস্তা, 'ডুকলা'র বীরদের রাস্তা—এই সবের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ক্রমে। শেষে এরা একটা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করল বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে—তার নাম দিয়ে দিল ১৭ই নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়। ১৭ই নভেম্বর কোন সালে যেন প্রাহায় ছাত্রদের উপর গুলি চালিয়ে জার্মান কর্তৃপক্ষ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সব বন্ধ করে দিয়েছিল—সেই দিনটিকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়াস।

শহরে নতুন এসে আমার অভ্যাস প্রথমেই দোকান বাজার দেখা। দোকানগুলো দেখতে দেখতে শহরের একটা রূপ গেঁথে যায় মনের মধ্যে—হতে পারে সেটা বাইরেকার রূপ—কিন্তু অনেক দিন পরে সেইটাই শেষ অবধি থেকে যায় স্মৃতিতে। নানা দেশের নানা শহর তো দেখে বেড়িয়েছি জীবনে। কোথাও অল্প দিন থেকেছি, কোথাও বেশী দিন। যখনই একটা কোনো বিশেষ শহরের কথা ভাবি, প্রথমেই চোখের সামনে ভেসে আসে যে ছবিটা সেটা হচ্ছে তার দোকান পল্লী—সারি সারি দোকান—এক এক শহরে এক এক রকমে সাজানো। তারপর মনে জাগে তার ট্রাম বাস মাটির নীচের ট্রেন, যানবাহন। তারপর হয়তো বাড়ি ঘরের চেহারাটা এবং সব শেষে সেখানে যে সব মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এদের মধ্যে আবার হয়তো বারো আনা মানুষকে ভুলেই মেরে দিয়েছি। কিন্তু দোকানগুলো ঠিক মনে থাকে। এবারে দেখলুম প্রাহার দোকানের জগতে একটা মস্ত ওলট-পালট এসে গেছে।

আগেকার দিনে দোকানগুলো ছিল লোকের নামে বা দোকানের নিজস্ব নামে। যেমন ধরা যাক একটা বিখ্যাত জুতোর দোকান ছিল, তার নাম ছিল 'প্যাপেশ'—কর্তারই নাম। একটা মিষ্টির দোকান ছিল প্রাহার পুরোনো পল্লীতে, দূর থেকে ট্রামে করে লোকে আসত সেখানে আইস ক্রীম খেতে। কর্তার নামে দোকানের নাম ছিল 'আন্টনিন সিরান'। দোকানদার নিজস্ব নামে বা কোনো শখের নামে ব্যবসা করত। নামটা ক্রমে ব্যবসারই একটা অংগ হয়ে যেত। হয়তো করলে কাগজ-কলমের দোকান; ছেলেপুলেরা খাতা কিনতে আসে; তাদের বাঁধবার জন্যে দিলে আইসক্রীম বিক্রি করা শুরু করে। বাপ-মায়ের জন্যে হয়তো দোকানের এক কোণে লেমনেড, ছুঁচ, সুতো বোতাম রইল। খদ্দেররা জানত অমুক লোকের দোকানে অমুক অমুক জিনিস ভালো পাওয়া যায়। যেমন 'কালো'র দোকানের চা অথবা 'দিলখুসা'র চপ। এই ধরনের দোকানের গুণও ছিল,

দোষও ছিল। যে দোকান খদ্দেরকে যত বেশী খুশী করতে পারত তার তত বেশী নাম হত। লোকে জানত অমুক জিনিস সব চেয়ে ভালো। সব চেয়ে সস্তা পেতে গেলে অমুক দোকানে যেতে হয়। এর ফলে দোকানদারি করেও যেমন তৃপ্তি ছিল, ভালো জিনিস কিনেও তেমনি তৃপ্তি। দোষের মধ্যে, যাঁরা ভাল দোকানের খোঁজ পেত না, তাদের পক্ষে ভাল জিনিস উপযুক্ত মূল্যে খরিদ করাও সম্ভব হত না। এক একটা জিনিসের জন্যে এক একটা পাড়ার খ্যাতি ছিল। পাঁচটা জিনিস ভালো ভাবে কিনতে গেলে পাঁচ পাড়ায় ঘুরতে হত মানুষকে। মানুষের হাতে যখন প্রচুর সময় থাকে, তাস পিটে, ম্যাচ দেখে, হাওয়া খেয়েও পুরো অবসর কাটিয়ে ওঠা যায় না, তখনু বেশ বসিয়ে রসিয়ে দোকান বাজার করায় মস্ত আনন্দ। কোনো লোভনীয় জিনিস দু-পয়সা কম দরে কেনার জন্যে চার আনা বাস ভাড়া খরচ হলে গায়ে তো লাগেই না, বরং মনে হয় মস্ত সাশ্রয় হল।

কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার কপালে আজ দুদণ্ড বসে সময় নষ্ট করবার ফুরসত নেই। দোর্দণ্ড বেগে লেগেছে সবাই দেশটাকে গড়ে তুলতে। ঘাস পেটাবার, আড্ডা দেবার অবসর কারো নেই। দোকানে দোকানে ঘুরে দর দস্তুর করে বাছাই করে জিনিস কিনে ঘরে তুলতে, এ বিলাসিতা আর সাজে না। এই জন্যেই বোধ করি দোকানগুলোকে এরা একেবারে ঢেলে সাজিয়েছে। মানুষের নামের বা শৌখিন নামের কোনো দোকান আর নেই। ব্যবহার্য যত কিছু দ্রব্য হতে পারে তাদের নানা ভাগে ভাগ করা হয়েছে,—যেমন ওষুধ-পত্র, কাগজ-কলম, খাদ্য-দ্রব্য, আধা-রাঁধা খাবার, জুতো, কাপড়-চোপড়, সেলাই ও বোনার জিনিস ইত্যাদি। এই সব জিনিস যে দোকানে পাওয়া যায় তাদের নাম যথাক্রমে দ্রগারিয়ে, পাপিরনিৎসভি পোলাভিনি, পলটভারি, অবুভ, অডিয়েভী, গালেণ্টারিয়ে ইত্যাদি প্রত্যেক পাড়াতেই এই সব ক'রকম দোকান আছে। সব জিনিসই নিজের পাড়ায় পাওয়া যাবে—অন্য পাড়ায় যেতে হবে না। অন্য পাড়ায় গেলে যে আরো ভাল বা আরো সস্তা জিনিস পাওয়া যাবে তা-ও নয়। জিনিসের নামে দোকানের নাম। তাই দেখে ঢুকে যান। জানলায় প্রত্যেক দ্রব্যের দাম লেখা, তা সে স্বয়ং-সেব দোকানই হোক আর দোকানদার-সেবিত বিপণীই হোক। দাম দেখে জিনিস পছন্দ করুন। তামাম দেশের প্রত্যেকটি জিনিসের দাম বাঁধা। এক পয়সাও ঠকবেন না।

কিছুদিন পরে একদিন এক মিষ্টির দোকানে ঢুকেছিলুম। প্রাহার যে প্রধান সড়ক তার থেকে লম্বভাবে বেরিয়ে এসেছে ভজিচ্কোভা রাস্তা। সেই রাস্তায় ট্রামের লাইনের ধারে একটানা এক বারান্দার শেষে দোকানটি। প্রাহায় যতবার এসেছি এ দোকানে একবার না একবার না খেয়ে যাই নি। আগে কি নাম ছিল মনে নেই, এবারে আজকালকার পর্যায়নিয়মানুযায়ী—'ৎসুক্রান' অর্থাৎ মিষ্টির দোকান। জানলায় দাঁড়িয়ে মিষ্টি-গুলো দেখলুম। মিষ্টির চেহারা সব বদলে গেছে। মিষ্টির রকম অজস্র হলেও আগেকার দিনে যেমন মিষ্টির মধ্যে দোকানের একটা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যেত তা আর নেই। অন্য সব ৎসুক্রানিতে যা, এখানেও বেশীর ভাগ তাই, সামান্য দু-চারটে ছাড়া। ঐ টুকু বৈশিষ্ট্য এখনও দেখলুম আছে। দোকানে ঢুকেই দেখি সেই পঁচিশ বছর আগে যে বুড়িকে দেখেছিলুম সেই একই বুড়ি চোখে চশমা এঁটে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আগেরই মত কটমট করে চেয়ে এক থোকা দোকানের বিল হাতে করে প্রত্যেক খদ্দেরের হাতে একটা করে গুঁজে দিচ্ছেন। এই হচ্ছে এ দোকানের নিয়ম। ঢোকবার একটিই দরজা—সেখানে ঐ বুড়ি। তাঁর হাত থেকে একটি করে বিলের কাগজ নিয়ে তবে ঢুকতে হয়। ঐ হচ্ছে দোকানে ঢোকবার টিকিট বা আমন্ত্রণ পত্র। তারপর সেই কাগজের টুকরোটি বাঁ হাতে উঁচিয়ে ধরে ডান হাতের আঙুল দিয়ে মিষ্টি দেখিয়ে দিতে হবে। মিষ্টি ভরা কাঁচের তাকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ঝি-রা। তাঁরা চকচকে থালায় করে আপনার পছন্দ-করা মিষ্টিগুলি সাজিয়ে দিয়ে আপনার হাত থেকে বিলের কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে মিষ্টির দামটা লিখে দেবেন। তারপর চলে যান চা-কফি-লেমনেডের জায়গায়। সেখানকার ঝিও বিল-কাগজের উপর চা কফি বা লেমনেড যা খেতে চান তার দামটা লিখে দেবেন। খাওয়া শেষ হলে চলে যান আর একটা দরজার কাছে —সেটা হচ্ছে বেরবার দরজা। সেখানে আর এক গিন্নি বসে আছেন পয়সার বাক্স নিয়ে। তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেই তিনি বিলের কাগজটা আর একবার আপনার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে দামগুলো যোগ করে ফেলবেন। দামটা চুকিয়ে দিলে তবে আপনি বেরতে পারবেন দোকান থেকে। নইলে রইলেন। বিলের কাগজ হারিয়ে ফেললেই বিপদ। ঐ বুড়িকে ঠিক ঐখানে দাঁড়িয়ে ঐ রকম কড়া মেজাজে কাগজ বিলি করতে দেখে এসেছি পঁচিশ বছর আগে। প্রথমে হয়তো ইনি এই দোকানের অধিকারিণী ছিলেন। এখন অধিকার হারিয়ে নিশ্চয় হয়েছেন রাষ্ট্রের চাকরানী। কিন্তু তাতেও এঁর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। দোকানের যে দরজার সামনে ইনি দাঁড়াতেন এখনও সেইখানেই দাঁড়াচ্ছেন। আগেও যেমন বেঁটে ছিলেন, যেমন পাকা-চুল ছিল এখনও তেমনি আছে। জার্মানরা যখন প্রাহা দখল করে নেয়, সব কিছু তছনচ করে ওলোট-পালোট করে দেয়, তখনও মনে হয় এই বৃদ্ধাকে এঁর স্থান থেকে কেউ নড়াতে পারেনি। তারপর এত বড় যুদ্ধ গেল। যুদ্ধের পর বিপ্লব। কে কোথায় ছটকে পড়ল, এই বুড়ি কিন্তু ঠিক নিজের জায়গায় আছেন। মিষ্টি খেয়ে ফেরবার সময় সেই আদিকালের বুড়ির দিকে বেশ করে আর একবার তাকিয়ে নিয়েছিলুম। এত বড় ঝাপটার মধ্যেও এই বৃদ্ধার স্থৈর্য মনকে মুগ্ধ না করে পারেনি। (ক্রমশ)
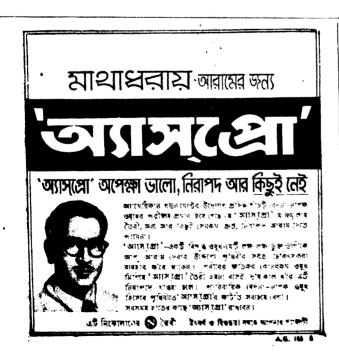
॥ ১৬ ॥

বাড়িতে থেকে কি ধর্মসাধনা চলে না সুজাতার? বাবা দাদা বউদি এমন কি সাত আট বছরের ভাইপো বাবলুরও সেই জিজ্ঞাসা, 'পিসীমণি তুমি কোথায় যাবে? তুমি যেতে পারবে না। তোমাকে যেতে দেবই না।'

হয়তো ওর মা শিখিয়ে দিয়েছে। হয়তো ওর বাবা। হয়তো বা নিজের বুদ্ধিতেই এগিয়ে এসেছে বাবলু।

এক মুহূর্তের জন্যে সুজাতার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনে হয় আলাদা ধর্ম চর্চার কী দরকার। বাবার সেবা-শুশ্রূষায়, দাদা বউদির সংগে আলাপ-আলোচনায় তর্কবিতর্কে হাসি-ঠাট্টায় আর ওই বাবলুকে নিজের ছেলের মত ভালোবেসে, তাকে আদর করে তার দুটি কাঁচ কোমল হাতের আদর পেয়ে দিব্যি দিন-গুলি কাটিয়ে দিতে পারে সুজাতা। তাদের মত মেয়েরা তো এইভাবেই কাটায়। যার স্বামীর সংগে বনিবনাও হয় না, সে বাপ ভাইয়ের সংগে বনিয়ে নেয়। তাছাড়া এই পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে তো আরো একটু কর্মক্ষেত্র আছে সুজাতার। পাড়ার কর্পোরেশন স্কুলটায় সে ছোট ছোট মেয়েদের পড়ায়। পড়াতে তার খারাপ লাগে না। মেয়েরা তাকে ভালোও বাসে। একটা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার পক্ষে এই অবলম্বন কি কিছু কম? না সংখ্যায় না গুরুত্বে এদের অল্প বলা চলে না। তবু তো সুজাতার মন ভরে না। তবু যেন সব কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এঁরা তো তার পর নয়। বাবা একবার তাকে গোত্রান্তরিত করেছিলেন। সুজাতা আবার তার নিজের গোত্রে ফিরে এসেছে। কিন্তু নিজের জায়গাটি ফিরে পেয়েছে কি? বাইরে থেকে দেখতে গেলে পেয়েছে। কিন্তু ভিতর থেকে অনুভব করতে গেলে পায় নি। এ সংসার তার নিজের নয়। এখানে সে বাহুল্য। নিতান্তই অতিরিক্ত একজন। বাবার কাছে, দাদার সে স্নেহ পায়, প্রশ্রয় পায়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু পায় কিনা খুবই সন্দেহ আছে সুজাতার। বউদি তাকে কখনো মনে করেন জেদী, কখনো মনে করেন বোকা। একেবারে বোকা। নইলে স্বামীর দুটো একটা বাতিক আছে বলে কেউ অমন করে নিজের বাড়িঘর বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে আসে? চোরের ওপর রাগ করে কেউ মাটিতে ভাত খায়? সুজাতার জায়েরা যা বলেন বউদিও সেই কথা বলেন। ছোট বড়ো সবাই বলে স্বামীর কাছ থেকে আলাদা থেকে সুজাতা সুবুদ্ধির পরিচয় দেয় নি। তার মানিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। সয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মেয়েরা তো সহ্য করবার জন্যেই এসেছে। কিন্তু তারা তো জানে না একটি বিকৃত রুচির মানুষকে নিয়ে দিনের পর দিন বিশেষ করে রাতের পর রাত কাটানো কী কঠিন। যে সুজাতাকে ভালো-বাসে না, কি ভালোবাসার ভান করে, তার হাত থেকে আদর-সোহাগ শাড়ি-গয়না নেওয়া একই ছাদের নিচে তার সংগে বাস করা যে কী অসহনীয় তা সুজাতার বাবাও বোঝেন না, দাদাও বোঝেন না। যাঁরা তার একান্ত আপন তাঁরাই যদি না বোঝেন বাইরের কেউ বুঝবে এমন আশা সুজাতা কী করে করতে পারে?

বাইরের জ্ঞাতিকুটুম্ব যারা এ বাড়িতে এসে সুজাতাকে দেখে গেছে তারা সবাই মুখে সহানুভূতি জানালেও, তার শাশুড়ির চরিত্রহীনতার নিন্দা করে গেলেও আড়ালে গিয়ে সুজাতারও নিন্দা করেছে সেটুকু বুঝবার মত বয়স কি তার হয়নি?

সবচেয়ে বড় নিন্দা, বড় লজ্জার কথাও

সুজাতার কানে গেছে। মেয়েমানুষ হয়ে সুজাতা তার স্বামীকে খুন করতে গিয়েছিল, প্রায় খুন করে ফেলেছিল একটুর জন্যে পারে নি। কী করে যেন এই অপবাদ হাওয়ায় হাওয়ায় তার বাপের বাড়ি পর্যন্ত ভেসে এসেছে। শ্বশুরের বাড়ির লোকই রটিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের শশাংক নিজেই এই অপবাদ রটনায় সাহায্য করেছে। নিজের আচরণ সমর্থন করার জন্যে, নিজের ভালোমানুষিতা জাহির করবার জন্যে শশাংক নিজে আত্মীয় বন্ধু-মহলে বলে বেড়িয়েছে সুজাতা তাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল। স্ত্রীকে জেলে কি পাগলা-গারদে না পাঠিয়ে তাই তাকে বাপের বাড়িতে ফেরৎ পাঠিয়েছে শশাংক। নির্লজ্জ কাপুরুষ। নিজের স্ত্রীর নামে এই অপবাদ রটাতে তার দ্বিধা হয় নি। তখন তার নিজের কুকীর্তিগুলি সাফাই গাওয়া দরকার ছিল।

অপবাদ ছাড়া কী। স্বামীর অনাচার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সুজাতা অবশ্য মাঝে মাঝে চীৎকার করে বলে উঠেছে, 'তোমাকে খুন করব, গুলী করে মারব, বিষ খাইয়ে মারব।' বলেছে সুজাতা স্বীকার করে, সে বলেছে। বাড়ির ঝি-চাকর সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছে। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করেছে সুজাতা। কিন্তু তার আগে কি বুক ফেটে যায় নি? স্বামী হত্যার কথা সুজাতা মুখেও বলেছে আবার মনে মনে কখনো কল্পনা কামনাও করেছে। কিন্তু সেই বলা সেই চাওয়াটাই কি সব? রাগ হলে বউদি কি মাঝে মাঝে বলে না, 'তুই মর। তুই মর।' কিন্তু সত্যিই কি আর ছেলের মৃত্যুকামনা করে বউদি?

শশাংক কি একবারও ভেবে দেখেছে কোন জ্বালায় এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সুজাতা? একবারও কি তার মুখের দিকে তাকিয়েছে শশাংক? তার উন্মথিত মনকে বুঝবার চেষ্টা করেছে? স্ত্রীকে ভালোবেসে—ভালোবেসে না হোক একটু সহানুভূতি, একটু মমতার সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে নিজের স্বভাবচরিত্র রুচি প্রবৃত্তি বদলাবার কি চেষ্টা করেছে শশাংক? কিছুই করে নি। উল্টো তার নামে বদনাম রটিয়েছে—সুজাতা, বিপজ্জনক খুনী স্বভাবের স্ত্রীলোক। ওর মনের মধ্যে অস্বাভাবিক অপরাধ প্রবণতা জট পাকিয়ে আছে। সেই জট মমতা দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে খুলবার চেষ্টা করে নি শশাংক বরং তাকে আরো পাকিয়ে পাকিয়ে জটিল করে তুলেছে।

আশ্চর্য, বাবাও শুনে সব বিশ্বাস করেছেন। গোপনে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছেন, 'দরকার নেই ওসব খুনখারাবি, কেলেংকারি কান্ডের ভিতর গিয়ে। তুই আমার কাছেই থাক। সবাইর সব সুখ সয় না। ভগবান একজনকে সব সুখ দেন না।'

তারপর ওপর থেকে ভগবানের মতই ভরসা দিয়ে বলেছেন, 'তুই ভাবিসনে, মরবার আগে আমি তোর ব্যবস্থা করে যাব। আমি শুধু ছেলের ভরসায় থাকব না।'

ব্যবস্থা মানে আর্থিক ব্যবস্থা। যেন অর্থটাই সব। যেন সুজাতা মূর্খ নিরক্ষরা অসহায় অক্ষম। যেন বাকি জীবনের জন্যে দু মুঠো ভাতের ব্যবস্থা সে নিজেই করে নিতে পারবে না।

অর্থ সাহায্য শশাংকও তাকে করতে চেয়েছিল। কিছুদিন বাদে দেড়শ কি দুশো টাকা মাসোহারা দেবার প্রস্তাব করেছিল।

কিন্তু সুজাতা বলে দিয়েছে, 'এক পয়সাও না।'

শুনে সুজাতাকে সেদিন বোকা খেয়ালী জেদী বলে গাল দিয়েছিল বউদি। দুঃখে রাগে মুখ ভার করে থেকেছিল অনেক দিন। লোকসানটা যেন তারই। কিন্তু বউদি কী করে বুঝবে যার সব পাওয়ার কথা ছিল সে অমন ছিঁটেফোঁটা নিয়ে খুশি থাকতে পারে না। যে দু পায়ে সব ঠেলে এসেছে সে হাত পেতে কোন লজ্জায় করুণাকণা ভিক্ষা করবে?

বরং যেদিন সুজাতা শুনল স্বামী তার নামে ফৌজদারী মামলা না এনে যেখানে-

সেখানে দজ্জাল খুনী মেয়েমানুষ বলে তার নামে কুৎসা রটাচ্ছে সেদিন এক দুঃসাহসের কাজ করে বসেছিল সুজাতা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘষে ঘষে সিঁথির-সিঁদুর তুলে ফেলেছিল। দাঁতে দাঁত ঘষে মনে মনে বলেছিল 'খুন করলাম। তোমাকে সত্যিই খুন করলাম।'

বাবা দেখে খুশি হন নি। বলেছিলেন, 'একী ব্যাপার? ছি ছি ছি। সিঁদুর পরছিস না কেন?'

অতিআধুনিকা বউদি, ঠানদির মত আঁতকে উঠে বলেছিলেন, 'ছি ছি ছি, একী অলক্ষুণে কান্ড। সধবার সিঁথির সিঁদুর কি তুলতে আছে? কল্যাণ-অকল্যাণের কথা থাক কিন্তু বড়ো বিশ্রী দেখায়। তুমি আবার সিঁদুর পরো বলছি।'

শুধু দাদা বলেছিল, 'বেশ করেছিস। এমনি করেই প্রতিবাদ করতে হয়। বিয়ে করবার পরেও সে যদি অবিবাহিতের মত চলতে পারে, ম্যারেড লাইফের কোন সাইনটি না রেখে তুই বা পারবিনে কেন? যে সিঁদুরের কোন মূল্য নেই তা কেন পরতে যাবি? দূর-দূর।'

সিঁদুর পরতে এমনিতেও অসুবিধে বোধ করত সুজাতা। যার জন্যে সিঁদুর সে যদি কাছে না থাকে, কাছে না রাখে, পরিচিত-অপরিচিত অনেকেরই সকৌতুক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে হয়। সে সব প্রশ্নের জবাব কি সব সময় দেওয়া চলে, নাকি দিতে কারো ইচ্ছে হয়? তার চেয়ে অপরিচিত অথবা পরিচিত কেউ যদি ভাবে সুজাতা এখনো কুমারী আছে তার সেই ভ্রান্ত ধারণায় বরং নিরাপদে থাকা যায়। সিঁথির লাল রেখার ওপর কারো কারো উৎসুক অগ্রণী সন্দিগ্ধ দৃষ্টি সংকোচকে লক্ষ করতে বরং মন্দ লাগে না।

একবার সিঁদুর তুলে ফেলে দ্বিতীয়বার আর তা পরতে পারে নি সুজাতা। লজ্জায় সংকোচে আঙুল যেন অসাড় হয়ে গেছে।

সিঁদুর পরেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে এক যুক্তিহীন অপরাধ বোধও তার মনকে অশান্ত করে তুলেছে। এক অসহনীয় আশংকা আর অস্বস্তিতে ভরে দিয়েছে।

এতে কি সত্যিই অকল্যাণ হবে শশাংকের? সত্যিই কি কোন দুর্ঘটনা ঘটবে? অপঘাত মৃত্যুর আশংকায় তার মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে? বেনেপুকুর থেকে কোন ফোন এলে সুজাতা দুরু দুরু বুকে পাংশু মুখে অপেক্ষা করেছে। কিছু ঘটেনি শুনে নিশ্চিন্ত হয়েছে। এই মানসিক উদ্বেগ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তবু ফের সিঁদুর পরতে পারে নি।

এক দুঃসহ অপরাধবোধ আর গ্লানি তার মনকে ভরে রেখেছে। সত্যিই কি সুজাতা তার স্বামীর মৃত্যু কামনা করেছিল? কি

এখনও করে? সুযোগ পেলে সুজাতা কি তাকে সত্যিই হত্যা করত?

ভায়েরা মল্লিকার সংগে তার স্বামীর ঘনিষ্ঠতার কথা সরস কৌতুকের সংগে যখন তার কানে তুলে দিলেন সুজাতা ঠিক একই ভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। মনের মধ্যে ঠিক একই রকম বিক্ষোভ উত্তেজনা, সেই নিষ্ফল জিঘাংসা আর প্রতিশোধ স্পৃহা তার মনকে পরম বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। সুজাতার মনে হয়েছিল স্বস্তি সুস্থতা সে বোধ হয় আর ফিরে পাবে না।

তার সেই অস্থিরতা দেখে বউদি বারবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'তোমার কী হয়েছে বল, ? শরীর খারাপ করেছে?'

'না।'

'তবে।'

তবে যে কী সে কথা কাউকে আর বলা হয় না। যে স্বামীর সংগে দীর্ঘদিন সে সম্পর্ক ছেদ করে এসেছে এখনো তার নিত্য-নতুন অনাচারের কথা শুনলে সুজাতার মন ঠিক আগের মতই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সুজাতার মনে হয় স্বামীর কাছ থেকে সরে এসে সে তাকে স্বেচ্ছাচারের পূর্ণ সুযোগ দিয়ে এসেছে। শশাঙ্কের কোন পরিবর্তন হয় নি, লজ্জা হয়নি, অনুতাপ আসেনি, সুজাতার ওপর বিন্দুমাত্র মমত্ব জাগেনি, সে তার আগের পথেই চলেছে। এখন আর তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। অবাধে সে তার সাধ মিটিয়ে চলেছে। যে ঘরে সুজাতা থাকত সে ঘরে নিত্য নতুন মেয়ে এসে বাস করছে। এই অনুমান তার মনে এখনো জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তাকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দেয় না।

ভায়েরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'চলে আয়, দূরে থেকে আর নিজের সর্বনাশ করিসনে। যে টুকু বাকি আছে এখন যদি আসিস সে-টুকু অন্তত রাখতে পারবি।'

কিন্তু কে কাকে রক্ষা করবে? সুজাতার কি আর সেই শক্তি আছে? যে স্ত্রীকে প্রলয়ংকরী সংহারকারিণী বলে চিনে রেখেছে শশাঙ্ক, আত্মীয়স্বজনের কাছে অপবাদ রটিয়ে দিয়েছে তাকে সে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে কেন? আর ঢুকেই বা কী করবে সুজাতা? সেই অগ্নিদাহ আর মৃত্যুজ্বালা। সেই দুঃখ আর গ্লানির পুনরাবৃত্তি সুজাতা আর চায় না। চায় না। তবু ও সব খবর কানে এলে তার মনের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায়। তার নিত্য কর্মপদ্ধতি বিপর্যস্ত হয়। পড়াশুনো ধ্যান-ধারণায় কিছুতেই আর সে মন দিতে পারে না। এখনো আত্মসংযম আসেনি সুজাতার। এই সংসারে থেকে বোধ হয় আসবেও না। আরো দূরে সরে যেতে হবে। এমন পরিবেশ এমন নিভৃত নির্জন জায়গা বেছে নিতে হবে যেখানে তার স্বামীর নামগন্ধ গিয়ে পৌঁছবে না, তার কীর্তি-কাহিনীর কোন সংবাদ প্রচারিত হবে না। সেই জায়গায় সুজাতা নিশ্চিন্ত মনে প্রশান্তচিত্তে নিজের সাধনার পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

তাছাড়া চিত্তবিক্ষোভ শুধু এক রকমের নয়। বিক্ষোভের হেতু শুধু যে একটিই তাও মনে করা ভুল। চোখের সামনে দাদা বউদির সুখের সংসার নিত্য দেখে সুজাতা। তাদের দাম্পত্যলীলা আদর সোহাগ মান অভিমান, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে হইচই, আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ পান ভোজন সবই তো চোখে পড়ে সুজাতার, সবই তো কানে যায়। এদের আনন্দ উৎসবে, আত্মীয় বন্ধুদের আদর আপ্যায়নে সুজাতাকেও এগিয়ে যেতে হয়। না গেলে নিজের মনই খুঁত খুঁত করে। লজ্জা হয়। সে তো এই বাড়িরই মেয়ে। আর এখন তো শুধু মেয়েই। বধূত্ব সে বিসর্জন দিয়ে এসেছে। মেয়ে হিসাবে, বোন হিসাবে যে টুকু তার কর্তব্য সেটুকু না করতে পারলে তার নিজেরই অস্বস্তির সীমা থাকে না। অথচ এ সব কাজে সত্যিই আর তেমন কোন আগ্রহ বোধ করে না সুজাতা। তবু যেতে হয়। দাদা বউদির তাসের আসরে গিয়ে বসতে হয়, কোন কোন দিন সিনেমা থিয়েটারেও দাদা তাকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানেই যাক সুজাতা আনন্দ পায় না। তার মনে হয় সে এদের মধ্যে বড্ড বেমানান। এদের মধ্যে তার স্থান নেই। সুজাতার মনে হয় সবাই তাকে এখানে অনুকম্পা করে। সংসারে সে এখন যা পায় তা যেন আর দাবির জোরে পায় না, অধিকারের জোরে পায় না, দুর্ভাগ্যের সান্ত্বনা হিসাবে পায়। কিন্তু এই প্রাপ্তিতে কি আর মন ভরে? হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে ভরে যায় না। সুজাতা এমন কিছু পেতে
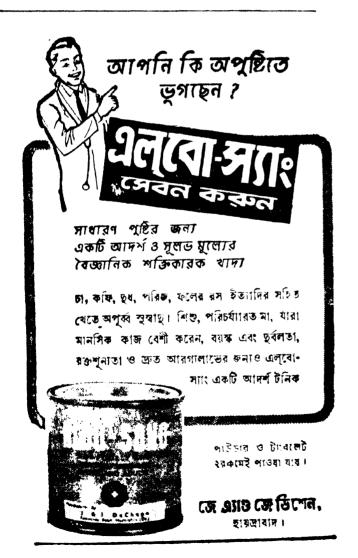
চায় যাতে তার সব না পাওয়া প্রাপ্তিতে পরিণত হয়, সব শূন্যতা ভরে ওঠে। মনের সব হাহাকারের অবসান হয়। কিন্তু সেই প্রাপ্তি এখানে কোথায়।

প্রাপ্তি নেই। কিন্তু দিনরাত এই ভোগ-সম্ভোগে ভরা সংসারের মধ্যে বাস করে বলে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাটুকু আছে। সেই তৃষ্ণা সহজে মরতে চায় না। সে কোন্ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা? নিশ্চয়ই কোন মহৎ আকাঙ্ক্ষা নয়। ঘুমোবার আগে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সুজাতা তার আচার আচরণের বিচার করে। হিসাব করে দেখে কতখানি এগিয়েছে। পথরেখা মোটেই চোখে পড়ে না। মনে হয় সে এগোয়নি, এগোতে পারেনি। শুধু চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। এখনো কত মান অভিমান, ছোট ছোট ঈর্ষা হিংসার কাঁটা তার মনকে ক্ষতবিক্ষত করে।

সুজাতার সামনেই দাদা আর বৌদি যখন দাম্পত্য আলাপ জুড়ে দেয় আর সেই আলাপের ভিতর থেকে তাদের এক পরম অন্তরঙ্গ রহস্য—মধুর সম্পর্কের আভাস আসতে থাকে, সুজাতার মন অস্বস্তিতে ভরে উঠে। কখনো মনে হয় ন্যাকামি, কখনো মনে হয় অশোভন নির্লজ্জতা, কখনো বা অকারণে ওদের নিষ্ঠুর বলেও মনে হয় সুজাতার। পরে বুঝতে পারে তার এই বিরূপতার মূলে কী আছে। ঈর্ষা আর হিংসা ছাড়া কিছু নয়। নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না সুজাতা। ছি ছি ছি এখনো তার মন এতখানি তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার মধ্যে ডুবে আছে। এখনো সে এই হীনতা সংকীর্ণতার ওপরে উঠতে পারল না! অথচ সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গীতা উপনিষদের পাঠ শুনছে।

দাদার সঙ্গে বউদিকে দেখলে তার হিংসা হয়। বাবলুকে আদর করা নিয়ে যখন দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় সুজাতা সেখান থেকে সরে যায়। দাদা বউদির এই বাৎসল্যকে সে কিছুতেই স্বাভাবিক প্রসন্নতায় গ্রহণ করতে পারে না। লজ্জায় আর অনুশোচনায় মরে যায় সুজাতা। ছি ছি ছি, ছি ছি ছি। এই কি তার ধর্মপথে অগ্রগমন। এই কি তার রিপুজয়ের সাধনা!

ছেলেকে নাওয়ানো খাওয়ানো স্কুলে পাঠানো, স্কুল থেকে সময় মত না ফিরলে উৎকণ্ঠায় সময় কাটে বউদির। সুজাতা মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখে। কোন কোন সময় ভারি বাড়াবাড়ি মনে হয়। ছেলে যেন আর কারো হয় না শুধু ওদেরই হয়েছে। বউদির এই অতি বাৎসল্য, স্নেহাধিক্য অসহ্য লাগে সুজাতার। নন্দিতা যদি কখনো বলে, 'বাবলুর মাথাটা একটু আঁচড়ে দাওতো।' সুজাতার মুখ থেকে বেরিয়ে যায় 'তুমিই আঁচড়াও। আমার সিঁথি করা ওর পছন্দ হবে না বউদি।' নন্দিতা একটু গম্ভীর হয়ে যায় তারপর মুখে হাসি টেনে বলে, 'পছন্দ মত করে দিলে হবে না কেন। কারো মন জোগাতে তো আর শিখলে না। শুধু নিজের মন নিয়েই পড়ে রইলে।'

সুজাতা তাড়াতাড়ি সরে যায় সেখান থেকে। পাছে আরো কথা কাটাকাটি হয়। সুজাতার মুখ থেকে পাছে আরো বেশি রূঢ় কথা বেরিয়ে পড়ে।

সরে যায় কিন্তু জ্বালা অত তাড়াতাড়ি যায় না। অনেকক্ষণ ধরে বিদ্বেষে বিক্ষোভে জ্বলতে থাকে। তারপর অনুশোচনার জ্বালা শুরু হয়। ছি ছি ছি, এই তার ধর্মসাধনা? এই তার অগ্রগমন। না, এখানে যেমন অগ্রগতি আছে, তেমনি পশ্চাৎ গতিরও বিরাম নেই। এখান থেকে যদি সরে যেতে না পারে সুজাতা তা হলে জীবনভোর সে এমনি এক-পা এগোবে আর এক-পা পিছোবে। একটি সিঁড়ি উঠবে আবার আর একটি সিঁড়ি নামবে। চঞ্চল বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে কিছুতেই নিজের উপলব্ধির আসনটিতে স্থির হয়ে বসতে পারবে না। যদি ইষ্ট বস্তুকে চায় এখান থেকে সরে যেতেই হবে সুজাতাকে।

কিন্তু যাবে কোথায়। সত্যি সত্যিই তো বনে-জঙ্গলে গুহাগহ্বরে গিয়ে বাস করতে পারে না। পুরুষ হলে যা পারত—ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে—মেয়ে হয়ে সে সাধ মেটাবার জো নেই। অনেক অসুবিধে আছে। বাবার সঙ্গে ছোট বড় অনেক সাধু মহান্তের আশ্রম ঘুরে দেখেছে সুজাতা। কোথাও বাস করবার মত স্পৃহা বোধ করেনি। বরং অনেক জায়গায় রীতি-নীতি দেখে তার অরুচি ধরেছে। দাদা যতই তাকে আঠের শতকে কি আরো দুশো বছর আগে মধ্যযুগে ঠেলে দিক সুজাতা তো সত্যিই সেকালের নয়। এ যুগেরই রুচি শিক্ষায় শাসিত মার্জিত তার মন। সেও সাধুদের উদ্ভট অহেতুক কৃচ্ছ্রতার অর্থ গ্রহণ করতে পারেনি, অনেক আশ্রমকে কতকগুলি নিরর্থক শাসন অনুশাসন বিধিনিষেধ ভরা জেলখানা বলে তার মনে হয়েছে। নিষেধের দেয়াল যেমন আছে তার ছিদ্রপথেরও তেমনি অভাব নেই। কোন

কোন আশ্রমকে মনে হয়েছে ছোট ছোট রাজ্য কি জমিদারির। আর শিষ্যশিষ্যারা সেখানে প্রজাপুঞ্জ। আইন যেমন আছে আইনের ফাঁকও তেমনি আছে। আইন-জীবীর মেয়ে সুজাতা, আইনজীবীর বোন। আইনের ফাঁক যে কী বস্তু তা সে কিছু কিছু জানে। অপরাধীদের মত বেশী নিরপরাধ পক্ষে প্রমাণ করতে পারেন ওঁরা তত ওঁদের যশ তত ওঁদের অর্থ। তেমনি অনেক আশ্রমে আইন বিধিনিষেধ শুধু শিষ্যদের জন্যে গুরুদের জন্যে আইনের ফাঁক। তবু এসব দেখেও দাদার মত ধর্মকে সুজাতা অগ্রাহ্য করতে পারেনি। মানতে পারেনি ধর্ম গাঁজা আফিম চণ্ডু চরসের সগোত্র। অর্থের অপব্যবহার হয় বলে, কেউ কি অর্থকে বাদ দিয়ে চলে? সুজাতা নানা ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে যত আবিলতা যত কলুষতা দেখেছে ততই সে যেন ধর্মের বিশুদ্ধ রূপকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করেছে।

দক্ষিণ শহরতলীতে যে কল্যাণ আশ্রম আছে প্রথম প্রথম দাদার সঙ্গে সেই আশ্রমে গিয়েছে সুজাতা। ঘুরে ঘুরে দেখেছে, কখনো বা বসে বসে শুনেছে স্বামী শুদ্ধানন্দের কথা। কল্যাণ শুধু নামে নয়, কল্যাণ ওঁদের কর্মে আচরণে, মনে ভাবনায়। তা ছাড়া অমন প্রশান্ত সৌম্যদর্শন রূপবান পুরুষ খুব কমই দেখেছে সুজাতা। তার স্বামীও রূপবান। কিন্তু সেই রূপের সঙ্গে কোথায় যেন অশান্ত চঞ্চলতা, আসক্তির আবিলতা জড়িয়ে আছে। সে রূপও একদিন সুজাতাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু সে মোহের পরিণাম যে কী তা তো সুজাতা দেখল। সে রূপ নিজের সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু নিজের মধ্যে নিজে পরিতৃপ্ত নয়। তার তৃপ্তির জন্য আর একটি আধারের দরকার। শুধু একটি নয়, অসংখ্য। সেই রূপ তৃষ্ণার সীমা নেই, পরিমাণ নেই। কিন্তু গেরুয়া পরিহিত স্বামীজীর মধ্যে যে রূপ সুজাতা দেখতে পেয়েছে সে যেন পাহাড় পর্বতের রূপ। সে রূপ নিজের সম্বন্ধে অচেতন, সে রূপ দর্শনে মনে কোন অশান্তির উদয় হয় না। পঞ্চাশের ওপর বয়স হয়েছে। কিন্তু প্রৌঢ়ত্ব দেহকে কিছুমাত্র বিকৃত করেনি। মাথার চুল গোঁফ দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। পেকেছে কিনা বোঝা যায় না। পাকলেও যে তাঁর সৌন্দর্যের কোন হানি হত মনে হয় না সুজাতার। তাঁর সৌন্দর্য শুধু কান্তিতে নয় বরং কর্মে। এই যোগীকে কখনো পদ্মাসনে দেখেনি সুজাতা। বাবা যেমন চেয়ার টেবিল সামনে নিয়ে কাজ করেন ওঁকেও তেমনি কর্মরত দেখেছে। আশ্রম তো নয় যেন এক অফিসঘর। টেবিলের ওপরে রাশ রাশ ফাইল। এপাশে ওপাশে দুজন স্টেনো টাইপিস্ট। শুদ্ধানন্দ বিশুদ্ধ ইংরেজীতে ডিক্টেশন দিচ্ছেন। কখনো বা নিজেও ওঁকে লিখতে দেখেছে সুজাতা। কল্যাণ শুধু আশ্রমের নামই নয়, দেশময় কল্যাণকর্মের সঙ্গে এ আশ্রম সংযুক্ত। এঁদের বাইরের কোন বিভূতি নেই, এঁরা ভস্মও গায়ে মাখেন না, তাবিজ কবচ বিতরণ করেন না। এঁদের কর্মীরা সব কর্মব্যস্ত। সে কর্মে অলৌকিকতা কিছু নেই, সবই লৌকিক সবই লোককল্যাণের। স্কুল কলেজ হাস-পাতাল সেবাশ্রম মহিলাশ্রমে এঁদের কর্মীরা নিযুক্ত। যাঁরা বাইরের তাঁরা মাইনে নেন। যাঁরা চালান তাঁরা কিছুই নেন না। তাঁরা শুধু দেবার জন্যে এসেছেন।

সুজাতার নিজের সাহস ছিল না সাধ্য ছিল না শুদ্ধানন্দের কাছে যায়। তাঁর সামনের চেয়ারে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারে কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই বাবার সঙ্গে ওঁর আলাপ তিনি যখন স্বামীজী হননি শুধু ব্রহ্মচারী মাত্র। তখন থেকে ঘনিষ্ঠতা। আইন আদালতের কিছু কিছু কাজও সুজাতার বাবা দিয়েছেন করে ওঁদের। সুজাতার মন শান্ত হয় সেজন্যে বাবাই তাকে ওঁর কাছে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর থেকে সুজাতা নিজেই আসে।

প্রথম দিন নিজের কথা প্রথমে বলতে শুরু করেছিল সুজাতা শুদ্ধানন্দ তাকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিয়েছিলেন, 'আমি জানি, আমি সব শুনেছি।' কর্মব্যস্ত সন্ন্যাসী নিজের কাজে মন দিয়েছিলেন। তাঁর রূঢ়তায় সুজাতা একটু দুঃখ পেয়েছিল। শুনলেও কি শোনাতে ইচ্ছা করে না। তাঁর হয়তো শুনবার দরকার নেই, কিন্তু সুজাতার যে বলা বড়ো দরকার।

হয়তো সঙ্গে সঙ্গে সে কথা তাঁর মনে হয়েছিল। পরমুহূর্তে তিনি ফাইল থেকে মুখ তুলে প্রসন্ন হেসে বলেছিলেন, "তুমি বুঝি আরো কিছু বলতে চাও। আচ্ছা আর একদিন শুনব।'

তারপর শুধু একদিন নয়, একাধিক দিন নিজের কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে সুজাতা। নিজের সমস্ত যন্ত্রণা, অপরাধ আর অনুশোচনার কথা তাঁর কাছে প্রকাশ করেছে। লজ্জা, সংকোচ মাঝে মাঝে এসে যে বাধা না দিয়েছে তা নয়, কিন্তু সেই সংকোচকে অতিক্রম করেছে সুজাতা। সন্ন্যাসী নিতান্ত নিস্পৃহভাবে নিজের কাজ করতে করতে শুনেছেন। যেন গাছের কাছে কথা বলছে সুজাতা, যেন পাহাড়ের কাছে বলছে, যেন গর্জমান জলপ্রপাতের কাছে আত্মনিবেদন করছে। সেই প্রপাতের শব্দে আর কিছুই কানে যাচ্ছে না। নিজের কথা নিজেও শুনতে পাচ্ছে না সুজাতা। যেন বলা শুধু বলবার জন্যেই।

সুজাতা বলেছিল 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি যেন পাগল হয়ে যাব।'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'কেন পাগল হবার কী আছে। তুমি তো শুধু একা নও, অমন আশংকা আমাদের সবাইরই হয়। শুধু আশংকা কেন। কতবার আমরা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাই। সুস্থতার সীমা ডিঙিয়ে যাই, কিন্তু আবার ফিরেও আসি। সেইটাই বড়ো কথা। সেই ফিরে আসবার পথ খোলা রাখতে হবে।'

সুজাতা উপমার আশ্রয় নিয়ে বলেছে, 'আমার মনে হয় আমার মন কাদাজলের মত, ঘোলা-জলের মত। সেই জলের তলে কী যে হচ্ছে না হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। আমার কিছুই দেখবার জো নেই।'

শুদ্ধানন্দ আবার কথা শোনান। 'ও তোমার ভুল ধারণা। তুমি বেশি কবিত্ব করে কথা বলছ। আমাদের মন যেমন আবিল হয়, তেমনি নির্মলও হয়। আমরা ফুল দেখি, তারা দেখি, শিশুর মুখের হাসি দেখি। শুধু চোখ দিয়ে দেখিনে মন দিয়ে দেখি। মন কখনো সমল, কখনো নির্মল। কখনো স্ববশ, কখনো রিপুর বশ। নির্মলতাকে স্থায়ী করবার সাধনাই সাধনা।'

তিনি সুজাতাকে কোন দীক্ষার কথা বলেন নি বলেছেন, 'যখন সময় হবে, তখন নিজেই নিজের পথ ঠিক করে নিতে পারবে।'

কিন্তু এই সংসারে থেকে এই পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে বাস করে নিজের মনের সেই প্রশান্তি সেই স্থায়ী নির্মলতা আনতে পারছে না সুজাতা।

শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হয়েছেন। কল্যাণ আশ্রমেই মহিলা বিভাগে সুজাতার থাকবার ব্যবস্থা তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা। ইচ্ছা করলে সে যে কোন দিন চলে আসতে পারবে। কিন্তু চলে আসবার কথা এখন ভাবছে না সুজাতা। এখন চলে যাওয়ার জন্যেই সে ব্যাকুল।

(ক্রমশ)

ঘরেবাইরে

শ্রীমতী

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

নূতন মন্ত্রিসভায় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী-রূপে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর যোগদান ভারতবর্ষের নারীসমাজের গৌরব। নেহের্ পরিবার আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের, স্বাধীনতার উত্তরকালের ইতিহাসও রচনা করেছেন। পণ্ডিত জওহর-লাল নেহের্র মৃত্যুতে যে দেশজোড়া শূন্যতা ও শোক আজ বিরাজ করছে তা অভাবনীয়, পৃথিবীতে বিরল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহের্র একমাত্র সন্তান শ্রীমতী ইন্দিরা। যদিও তাঁর বহু সময় কেটেছে কারাগারে তবু সেই কারাগার থেকেও বালিকা ইন্দিরাকে তাঁর বিশাল জ্ঞান ও উপলব্ধির অংশ চিঠিতে পৌঁছে দিতেন। তাঁর "Letters to his daughter" পরে Glimpses of world History নামে প্রকাশিত হয়। একটি চিঠিতে পিতা কন্যাকে লিখেছিলেন, "Our age is an age of disillusion: of doubt and uncertainty and questioning—

—আমরা বহু প্রাচীন প্রথা ও প্রত্যয়ে আর বিশ্বাস করি না। আমরা সেগুলি স্বীকার করি না, এশিয়াতে, ইয়োরোপে বা আমেরিকায় কোথাও নয়। তাই আমরা নূতন পথের সন্ধান করি। কখনও বা জগতের দুঃখ অবিচার, পাশবিকতা আমাদের পীড়া দেয়। মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে, আমরা পথ খুঁজে পাই না। তা সত্ত্বেও যদি আমরা জীবনের নিরানন্দ রূপই দেখি তাহলে ইতিহাসের শিক্ষা বিফল হবে। কারণ ইতিহাস শেখায় মানুষের ক্রমোন্নতি, ক্রমবিকাশ আর অগ্রগতির অপরিসীম সম্ভাবনা"—

অগ্রগতির এই অপরিসীম সম্ভাবনার আদর্শেই শ্রীমতী ইন্দিরার শৈশব কেটেছে। তাঁর যখন চার বছর বয়স, তখন মতিলাল নেহের্র বিচার চলছিল। তিনি পিতামহের কোলে আগাগোড়া বসে ছিলেন। জওহরলাল যেবার প্রথম কারাবরণ করেন, শিশু ইন্দিরা তাঁর খেলাঘরের টুলের উপর দাঁড়িয়ে সমবেত পুতুলমন্ডলীকে বলেছিলেন, যাও আমার বাবার মত তোমরাও কারাবরণ কর!

মানুষের প্রতি এই অগাধ বিশ্বাসেই বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নেহের্ পরিবারে কারও মনে কোন তিক্ততা আসেনি। অগাধ ঐশ্বর্যের আরাম অনায়াসে পিছনে ফেলে স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষ পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বন্ধুর পথ দুর্গম যাত্রা তবু ভয়হীন, ভাবনাহীন।

দুর্গম পথের কঠিন, নিষ্ঠুর মুহূর্তে কমলা নেহের্ যখন অসুস্থ তখন গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে ইন্দিরা পড়তে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতনে বালিকা বয়সে ইন্দিরা যে আনন্দ পেয়েছিলেন তার কথায় বলেছেনঃ

"আমার উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অসীম। বাড়িতে আমার পিতামাতাকে বন্দী করবার জন্য প্রায়ই পুলিশ আসতো, আমি কখনও নিরুদ্বেগ বা নিঃশঙ্ক হতে পারতাম না। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পেয়েছিলাম। আমি ভাবতাম কবিতা ও জীবন বুঝি ভিন্ন, রবীন্দ্রনাথ দেখালেন সকল কলা একসূত্রে বাঁধা।"

শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ছাড়া শ্রীমতী গান্ধী সুইজারল্যান্ড ও অক্সফোর্ডে শিক্ষা লাভ করেন। অল্পবয়সেই তিনি রাজনীতি শুরু করেন। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে সাহায্য করবার জন্য তিনি বালক-

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
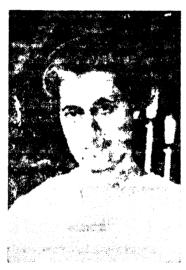
বালিকাদের নিয়ে "বানর সেনা" গঠন করেন। ২১ বছর বয়সে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ১৩ মাস কারাবরণ করেছিলেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র অনেক সময় পল্লী অঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে প্রসার লাভ করতো। ১৯৪২ সালে তিনি ও তাঁর স্বামী দ্বিতীয়বার কারাবরণ করেন। ১৯৫৯ সালে নাগপুরে অধিবেশনে তিনি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

রাজনীতির সঙ্গে গভীর যোগ, পিতার কর্মময় জীবনের অংশ গ্রহণ সব সত্ত্বেও শ্রীমতী গান্ধী সমাজকল্যাণের সকল ক্ষেত্রে পরম আগ্রহে আপন অকুণ্ঠ সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। ছোট ছেলেমেয়েদের কল্যাণের প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য। তাঁর অসংখ্য কাজের মধ্যেও তিনি ভোলেন না ছোট ছেলেরাই দেশের ভবিষ্যৎ। জওহরলালজীও ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সদাপ্রস্তুত ছিলেন। ইন্দিরার এই কল্যাণস্পৃহা তারই ধারাবহ। প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাকে তিনি বলেছিলেন "Dear to Sight (প্রিয়দর্শিনী) but dearer still when sight is denied" কারাবাসের সময় তাকে চোখে দেখতে পেতেন না তাই আশীর্বাদ করেছিলেন। সে আশীর্বাদ হচ্ছে :

"They can be of the air and of the mind and spirit such as a good fairy might have bestowed on you—Something that even the high walls of prison cannot stop."

সেই আত্মার আশীর্বাদ, অথবা স্বর্গীয় করুণার মত তাঁর প্রিয়দর্শিনীকে আজও পরিব্যাপ্ত করে রাখবে। জগতের লোক দেখবে ভারতীয় মেয়ে অগ্রগতিতে অসামান্যা।

গ্রীষ্মের প্রসাধন

যাঁরা সাজ-সজ্জায় অনেক সময় আর অর্থ ব্যয় করতে পারেন তাঁদের কথা বলছি না, বলছি কর্মব্যস্ত গৃহিণীর কথা, দশটা পাঁচটা যে মেয়ে চাকরি করে তার কথা, আর প্রসাধনের পয়সা সাবধানে যাকে খরচ করতে হয় তার কথা। দারুণ গ্রীষ্মের নির্মম স্পর্শ থেকে যদি নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে চান, হয়তো পারবেন না কিন্তু সামান্য একটু অবসর পেলে চট করে সাধারণ সহজসাধ্য একটু পরিচর্যায় রূপকে রুক্ষতা থেকে রক্ষা করতে পারেন।

বরফ আর ঠাণ্ডাজলের কথা আগেও আমরা বলেছি। দু'-চার টুকরো বরফ জলে ভাসিয়ে, মোটা তোয়ালের ছেঁড়া টুকরো তাতে ডুবিয়ে, মুখে, গলায়, হাতে ভাল করে লাগান। যদি স্নান করে বা মুখ-হাত ধোবার পর লাগান তবে আরও আরাম পাবেন। মুখের লোমকূপ যাদের বড় বেশী স্পষ্ট, ঠাণ্ডায় বিশেষ উপকার পাবেন। ক্লান্ত চোখের পাতা যদি বরফ জলে ডোবানো তোয়ালের টুকরো দিয়ে কয়েক মিনিট ঢেকে রাখেন তবে দৃষ্টি স্নিগ্ধ হবে। আরও একটি কাজ করে দেখবেন? হাতের কব্জির উপর একটুকরো বরফ রাখুন, পা মুছে ফেলুন বরফ জলে। বেশী সময় নষ্ট হবে না অথচ এই "এয়ার কণ্ডিশনিং" আপনাকে অনেকক্ষণ সতেজ রাখবে।

স্নানের সময়টা কাটবার চেষ্টা করবেন না। সংসার দু'-চার মিনিট অপেক্ষা করতে পারে। প্রচুর ঠাণ্ডা জল ব্যবহার করে বরং ঠাণ্ডা হয়ে বের হলে কাজকর্ম সব চটপট সারতে ইচ্ছা হবে। গ্রীষ্মের সময় পা অনেক সময়ই সবচেয়ে কষ্ট করে, বিশেষ যাদের বাইরে চলাফেরা করতে হয়। নখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে, মলিন কর্কশ হয়ে ওঠে পায়ের ত্বক। একবার ঈষদুষ্ণ জলে ধুয়ে ময়লা উঠে গেলে খুব ভাল করে ঠাণ্ডা জলে বারে বারে ধুয়ে

জালির কাজের কান

ফেলুন। এবার মুখে মাখবার কোল্ডক্রীম থেকে সামান্য একটু পায়ের জন্য খরচ করুন। ভাল করে ঘষে ঘষে "ম্যাসাজ" করবেন। পা বেচারার তো এই সজ্জার অভ্যাস নেই, কাজেই দেখবেন দু'-চার দিনেই কতটা সুফল হয়।

কর্মব্যস্ত হাত দুখানাকেও সম্ভব হলে একটু যত্ন করবেন, দিনের বেলায় যদি সময় না পান রাত্রে শোবার আগে একটু কোল্ডক্রীম মালিশ করে মুছে ফেলবেন। আঙুলের গ্রন্থির (Knuckles) উপর ভাল করে লাগাবেন আর লাগাবেন নখের চারপাশে।

শাড়ির বাহার

সাজের সরঞ্জাম গ্রীষ্মের খররৌদ্রে যত সাধারণ হবে ততই অসাধারণ রুচিজ্ঞানের পরিচয় দেবে। নেহাত নিরুপায় না হলে গরমে কেউ রেশমী শাড়ি পরে না। উৎসব বাড়িতে যে রেশম-জরি-জড়োয়ার উৎকট সমাবেশ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে সেটাও কিন্তু ঐ উপায়হীনতারই আর এক দিক। এ'রা মানানসই পোশাকের ব্যাপারে একেবারে অসহায়! সুতির বাজারে তো আজকাল রকমারি ফ্যাশনের ছড়াছড়ি। জয়পুরের বাঁধনি, নাগপুরের চান্দেরি, রাজস্থানের কোটা, শোলাপুরের চৌখুপী শাড়ি থেকে নিয়ে বেনারসের সুতির সঙ্গে জরির বাহার যা চান তাই পাবেন। লক্ষ্ণৌ-এর চিকন আর দক্ষিণ ভারতের ভেঙ্কটগিরি, ইন্দোরের মাহেশ্বরী সবই আজ শৌখীন সজ্জার জন্য সহযোগিতা করছে। কিন্তু আমি বলবো যেখানে যা থাকুক আমাদের ধনেখালি, জামদানি আর টাঙ্গাইল সবার উপরে টেক্কা দিয়েছে। টাঙ্গাইল শাড়ি আবার যেন নূতন আভিজাত্যে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চলেছে। স্বল্পমূল্যে চান তারও বাহার আছে, আবার সান্ধ্য সাজের আসর আলো করা শোভাও খুঁজলে পাবেন বহু রকম। ঘরে ধরে নিত্য ব্যবহার করতে আরাম, দেহ-সৌষ্ঠব ঘিরে কমনীয়তা আনতে অদ্বিতীয়। বাংলার বাইরেও তাই আজ টাঙ্গাইল শাড়ির দারুন আদর।

অলংকারে রুচির পরিচয়

গহনার বাহার সুতিশাড়ির সঙ্গে সাবধানে পছন্দ করবেন। সোনালী জরি বেশী না থাকলে রুপোর গহনা, কাঁচের পুঁতির মালা অল্পবয়সী মেয়েদের ভালই দেখায়। তবে একটি বড় গহনা, অনেক গহনা পরার চেয়ে ভাল মানায়। যাঁরা গলার গহনা ভালবাসেন তাঁরা মালার সঙ্গে বড় পেন্ডেণ্ট পরতে পারেন। যাঁদের কানের গহনার উপর বেশী ঝোঁক তাঁরা রুপোর কানের বড় কান বা ঝুমকো পরলে ভাল দেখাবে। নকল হীরে চুনির চেয়ে রুপোর গহনা বেশী সুন্দর বলে **মনে হয় না কি? সবার শেষে সম্ভব হলে রাখবেন একটু টাটকা ফুল মাথায় দেবার জন্য। গ্রীষ্মের সব সাজের সেরা ফুল—বেলা, চামেলি বা যুঁই-এর মালা। এমন কি মালা না হলে কোন সুগন্ধ ফুলের গুচ্ছ বা একটি গন্ধরাজ বা গোলাপ গুঁজে দেবেন।**

টুকিটাকি

আজকের বাজারে জিনিসপত্রের দামের যা অবস্থা হয়েছে তাতে গৃহিণীর হিসাবের অসুবিধার অংশই যেন সবচেয়ে বেশী। পুষ্টিকর অথচ মুখরোচক খাদ্য পরিবেশন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। আমিষ জাতীয় খাদ্যই সবচেয়ে মহার্ঘ। অথচ সামান্য আমিষের পরিমাণ খাদ্যে না থাকলে চলবে কেন? ডিম আমিষ হিসাবে প্রশস্ত। তবে গ্রীষ্মে ডিম তাজা কি পচা চিনে কেনা মুশকিল। ডিম কতটা তাজা তার একটা পরীক্ষা সবাই করতে পারেন। ১ ভাগ রান্নার লবন এবং দুভাগ জল মিশিয়ে নেবেন। যদি ঐ জলে ডিম ডুবে তলায় চলে যায় এবং সমান্তরাল ভাবে শুয়ে থাকে তবে ঐ ডিম তাজা। ১ ঘণ্টা থেকে ৩৬ ঘণ্টা পর্যন্ত বয়স হতে পারে, তার চেয়ে বেশী নয়। যদি ডিম **কেবল মাত্র জলের তলায় যায় ও মোটা দিকটি**

রুপোর কান আর মাথার ফুল

উপরের দিকে ভাসবার ভাব হয় তবে ডিম অন্ততঃ দু'-তিন দিনের পুরোনো। ডিমের মোটা দিকটি যদি একেবারেই উপরের দিকে ভেসে ওঠে তবে সে ডিম অনেক পুরোনো।

ডিম বহু দিন অবধি তাজা রাখার একটি উপায় সম্বন্ধে শুনেছিলাম, পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয় নি। এতে নাকি মাসের পর মাস টাটকা ডিমের মত স্বাদ থাকে। ডাক্তারখানায় সোডিয়াম সিলিকেট কিনতে পাওয়া যায়। এই সোডিয়াম সিলিকেট আধ কিলোগ্রাম একটি বালতিতে রেখে চার-পাঁচ কিলোগ্রাম জল ঢালুন ও খুব ভাল করে মেশান। একটি পাত্রে ডিম সাজান। পাথরের মুখ বন্ধ পাত্র ভাল। এবার ঐ জল আস্তে আস্তে ডিমের উপর ঢালুন। সব ডিম যেন ঢেকে যায়। মুখ বন্ধ করে দিলে ডিম জলের বাইরে ভেসে থাকবে না। অবশ্য জল সম্বন্ধে সতর্ক হবেন। একেবারে বিশুদ্ধ জল না বৃষ্টির জল ব্যবহার করবেন। এবার পাত্রটি একটু ঠান্ডা জায়গায় রেখে দেবেন।

সাধারণভাবে ডিম রাখতেও ঠান্ডা, অন্ধকার কোণে রাখবেন। যাঁরা রেফ্রিজারেটারে রাখেন তাঁরা ডিম বের করেই রান্না করবেন না। অল্পক্ষণ রেখে দেবেন যাতে জমাভাব কমে যায়। ডিম খুব বেশীক্ষণ রান্না না করাই ভাল। অল্প উত্তাপে যা তৈরি হয় তাতে খাদ্যগুণ বেশী থাকে। রান্নার হাঙ্গামাও কম হয়, সময় বাঁচে।

কিম্ববিচিত্রা

নেহর্-চরিত্রের অন্য দিক

ভারতের অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস যে মানুষটি রচনা করে গেলেন, নানা ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিকের বড়ো চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। যে পরিচয় নিতান্ত সাধারণ মানুষেরই অঙ্গাঙ্গী। অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মতোই ক্রোধ, অভিমান, ঠাট্টাতামাসা পরিহাসপ্রিয়তা, আবার শিশুর মতোই কৌতূহলের বহু ঘটনাই তাঁর জীবন-কাহিনীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

নেহরুর অহংকার বলতে ছিল না এবং নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কেও সচেতনতার পরিচয় তাঁর আচরণে পাওয়া যেত না। তাই তিনি রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে ভাঙা বেঞ্চে বসে চা পান করতে একটুকুও অস্বস্তি বোধ করেননি। বছর তিরিশ আগের কথা। কংগ্রেসের এক জরুরী বৈঠকে নাসিকে গিয়েছেন। অধিবেশন থেকে ফেরার পথে কালেক্টরির অনতিদূরে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান দেখে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন। অসংকোচে সেই দোকানের ভাঙা বেঞ্চে বসে তিনি দিব্যি চা পান করলেন। সঙ্গীদের কেউ সে দৃশ্যটি ধরে রাখার জন্য একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। আজ সেই চাওলার দোকানে ছবিটি অমূল্য এক স্মারক হয়ে রয়েছে। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের মুখ্য রিপোর্টার শ্রীমণীন্দ্র ভট্টাচার্যও এমনি একটি কাহিনী প্রকাশ করেছেন। একবার নেহরুকে তিনি এক ট্রেনের কামরায় পাকড়াও করেন। পণ্ডিতজী তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। মণীন্দ্রবাবু এবং তাঁর সঙ্গী রিপোর্টার ভদ্রলোক সে-অবস্থায় কোন প্রশ্ন করা উচিত হবে কিনা ভাবছেন, এমন সময় পণ্ডিতজীই নীরবতা ভেঙে বললেন: "একটা সিগারেট দিন ত। আমার পুঁজি শেষ হয়ে গিয়েছে।" মণীন্দ্রবাবুর কাছে ছিল পাসিং শো আর তাই তিনি ইতঃস্তত করছিলেন। শেষে সাহস করে পকেট থেকে পাসিং শো'র প্যাকেট বের করে অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, "এটা ভাল ব্র্যান্ড নয়, আপনার চলবে ত?" ওতে আর কি হয়েছে, বলে পণ্ডিতজী সেই সিগারেটই ধরালেন। এক সময় পণ্ডিতজী, যাকে বলে 'চেইন স্মোকার' ছিলেন, কিন্তু কোন সভা সমিতিতে অথবা জনসাধারণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় ধূমপানে তিনি বিরত থাকতেন।

পণ্ডিতজী অনেক সময়ে তাঁর মেজাজ ঠিক রাখতে পারতেন না। একবার তিনি সপরিবারে বাঙ্গালোর গিয়েছেন কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণ করতে। বিশ্রাম নামেই, আসলে তাঁর এনগেজমেণ্টের অন্ত ছিল না। একদিন একটা এনগেজমেণ্ট সারার পর ফিরতি পথে একটা দোকান উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। পণ্ডিতজী তখন অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। বারবার অনুরোধ করতে তিনি রেগে বলে ওঠেন: "একটা বড় তলোয়ার নিয়ে আমার মাথাটা তোমরা কেটে ফেল।" ওই পর্যন্তই এবং শেষে তিনি অনুরোধ রক্ষা করেন।

আনন্দবাজার পত্রিকার দিল্লীর প্রতিনিধি শ্রীশৈলেন চ্যাটার্জি আর একটি ঘটনার কথা বলেন। বোম্বাইয়ের পথে কল্যাণ স্টেশনে নেমে তিনি কাগজে এইচ জি ওয়েলসের মৃত্যুর খবর পড়ে পাশের কামরার যাত্রী পণ্ডিত নেহরুর কাছ থেকে একটি শোকবার্তা নেবার ঝোঁক হয় তাঁর। নেহরুর কামরার দিকে এগোতেই ইলেকট্রিক ট্রেন ছেড়ে দিল। শ্রী চ্যাটার্জি কোনক্রমে নেহেরুর কামরার পাদানিতে উঠে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে যেতে লাগলেন। চলন্ত ট্রেনের হ্যাণ্ডেল ধরে ওইভাবে যেতে দেখে নেহেরু রাগে ফেটে পড়ে বললেন: "লোকে কেবলই আমাকে বিরক্ত করে। তুমিও এসে গিয়েছ? নেমে যাও।"

লাল গোলাপ হাতে পণ্ডিত নেহেরু

বললেই এমন ভঙ্গী করলেন যেন ধাক্কা দিয়েই চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দেবেন। সে সময়ে নেহরুর এক অনুচর চায়ের ট্রে নিয়ে এলেন। ইশারায় তিনি জানালেন, কোন ভয় নেই। আর সত্যিই একটু পরই নেহরুর রাগ পড়ে গেল এবং শ্রী চ্যাটার্জিকে ভিতরে প্রবেশ করার জন্য দরজা খুলে দিতে বললেন। শ্রী চ্যাটার্জিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন : "চা খান। এত সকালে কেন, ব্যাপারটা কী?" শ্রী চ্যাটার্জি কাগজে প্রকাশিত খবরটি দেখাতেই নেহরু নিজের হাতে শোকবার্তা লিখে দিলেন।

১৯৪৬ সনে কংগ্রেসের মীরাট অধিবেশনে সভাপতি আচার্য কৃপালনি বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন যে পণ্ডিত নেহরু স্বর্গত শ্যামলাল বর্মার একটি আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে আগে এনিয়ে কোন আলোচনা হয় নি এবং তাঁকে জানানোও হয় নি। ঘোষণা শোনামাত্রই ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বলে উঠলেন : "কে আপনাকে বলেছে? আমি পারবো না।" অল্পক্ষণ পর শ্রীমতী কমলা চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে ধীরভাবে ঘোষণা করলেন যে, পণ্ডিতজী এটা করবেন, তিনি যা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। নেহরুই শেষ পর্যন্ত প্রতিমূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেন।
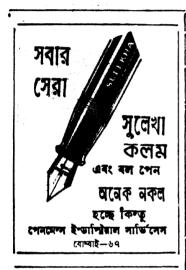
বছর কয়েক আগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দিল্লীতে একদিন দুপুরবেলা নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে যান। আলাপ-আলোচনা শেষ হতে ডাঃ রায় এসে বঙ্গ ভবনের গাড়িতে ওঠেন। চালক বীর সিং স্যুইচ দিতে গাড়িতে শাঁ শাঁ শব্দই হতে লাগলো কিন্তু স্টার্ট নিল না। নেহরু জিগ্যেস করলেন গাড়ি ঠেলতে হবে কিনা। বীর সিং জানালে যে, না ঠেললে স্টার্ট নেবে না। নেহরু তখন নিজেই গাড়ির পিছনে গিয়ে ঠেলতে লাগলেন। ডাঃ রায় হাঁ হাঁ করে উঠলেন এবং সিকিউরিটির লোকেরাও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এসে নেহরুকে নিরস্ত করে নিজেরা হাত লাগালেন। নেহরু তাঁদের পিছন পিছন এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং গাড়ি স্টার্ট নিতে হাত তুলে ডাঃ রায়কে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ফিরে এলেন।

নেহরু নিজের ফটো খুব ভালবাসতেন। কেউ তাঁকে কোন ফটো পাঠালে তিনি তার মধ্যে থেকে বেছে সবচেয়ে ভালটি নিজের টেবিলের উপর রেখে দিতেন। একবার লোকসভার এক কম্যুনিস্ট মহিলা সদস্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে আলোচনা অন্তে চলে যাবার সময় টেবিলে রাখা নেহরুর ফটোটি দেখতে থাকেন। নেহরু সেটা লক্ষ্য করে বলেন : "ছবিটা ভালোই তোলা হয়েছে, না?" মহিলা সদস্য সায় দিয়ে চলে গেলেন এবং বাড়ি ফেরার ঘণ্টা দুই পরই নেহরুর সই করা সেই ফটোটি তাঁর কাছে পৌঁছে যায়।

সকলের সুবিধে অসুবিধের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকতো। শেখ আবদুল্লা কারাগারে থাকলেও নেহরু তাঁর পুত্রদের বিলেতে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করে দেন এবং খরচটা তিনি দেন তাঁর ব্যক্তিগত উপার্জন থেকে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কাশ্মীর যাবার সময় সঙ্গে ওভারকোট নেই দেখে তিনি নিজেরটি দিয়ে দেন। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন (তখন উপ-রাষ্ট্রপতি) আগে বিদেশে গেলে কাউকে সঙ্গে নিতেন না। একবার তিনি বিদেশে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফিরে আসার পর ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে দেখা হতে নেহরু অনুরোধ করেন, অতঃপর বিদেশে গেলে সঙ্গে যেন কাউকে নিয়ে যান। উপরাষ্ট্রপতি ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকেন। কোনক্রমেই তাঁকে রাজি করাতে না পেরে শেষে নেহরু বলেন : "জওহরলাল নেহরুর অনুরোধ আপনি ঠেলতে পারেন, কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে।" ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের পক্ষে সে-অনুরোধ না-রাখা সম্ভব হয় নি।

১৯৪০ সনে বোম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে। মৌলানা আজাদ এবং বোম্বাই প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভুলাভাই দেশাই বক্তৃতা করছেন। পণ্ডিত নেহরু মঞ্চের একপাশে বসে টেলিপ্রিণ্টারে আসা খবরাবলি এক মনে দেখে যাচ্ছেন। শেষে নেহরুর বক্তৃতার সময় আসতে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। নেহরু জানান, বৃষ্টির জন্য কেউ যেন আসন ত্যাগ না করেন, সকলেই যেন বসে থাকেন। ঠিক সেই সময়ে এক ব্যক্তি তাঁর মাথার ওপর ছাতা ধরতে নেহরু শ্রোতাদের লক্ষ্য করে হেসে বলে উঠেন : "ছাতাটা আমার জন্য নয়, এ ভদ্রলোক মাইকটা রক্ষা করার চেষ্টা করছেন।" বিপুল সংখ্যক শ্রোতা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে বসে থেকে বক্তৃতা শোনে তাঁরই সঙ্গে জলে ভিজে।

হাস্য পরিহাসেও নেহরু কম যেতেন না। এবং তার প্রশস্ত সময় ছিল প্রাতরাশের টেবিলে। সে-সময়ে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁদের মতে নেহরু যাকে বলে 'লেগ-পুল' করা, তাতে যে কত বড় ওস্তাদ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যেত। তখন তিনি সব ব্যবধান ভুলে যেতেন এবং সে-সময়ে অন্য কেউ তাঁকে নিয়ে লেগ-পুল' করলেও ছোটদের মতোই তিনি তা উপভোগ করতেন।

একদিন প্রাতঃরাশের সময় পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন নেহরুর ভাগ্নীরা। বাইরের লোকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু-পটুনায়ক। শ্রীপটুনায়ক জাকর্তায় ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করে সোজা ফিরেছেন দিল্লীতে। রুটিতে কামড় দিয়ে শ্রীপটুনায়ককে নেহরু প্রশ্ন করলেন : "ডাঃ সুকর্ণ কি বলেন?" শ্রীপটুনায়ক জানালেন : "ডাঃ সুকর্ণ বলেছেন নেহরুকে গিয়ে বলো, কতদিন আর একা থাকবেন। এবার যেন একটা বিয়ে করে ফেলেন। আর বললেন, তাঁকে বলো, ইন্দোনেশিয়ার কুমারী মেয়েদের সকলেই তাঁকে পছন্দ করে—তিনি নিজে এসে যে কোন একটিকে পছন্দ করে নিতে পারেন।"

শুনে পণ্ডিতজীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

ভারতের অর্থনীতি

শ্রমিকের মজুরি ও তার প্রকৃত মূল্য

আমাদের দেশে শ্রমিকদের মজুরি এত কম যে, তা থেকে তাদের কোনোমতে কেবল গ্রাসাচ্ছাদন করা চলে। তার উপর অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটলে অর্থাৎ জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় বেড়ে গেলে শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সরকারের আয়নীতির দিক থেকেও সমস্যা দেখা দেয়। সেরকম অবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির সমান অনুপাতে শ্রমিকদের মজুরি বাড়িয়ে দিলে কাজ করবার উৎসাহ এবং [illegible] উৎপাদন কমে যেতে পারে।

জীবনযাত্রার মূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের মজুরির পরিবর্তন না ঘটলে মূল্য বৃদ্ধির সময় তাদের প্রকৃত মজুরি কমে আসে। আমাদের দেশে ১৯৪৮-৪৯ সালে কারখানা শ্রমিকদের ভেতর কেবল শতকরা ৪১ ভাগের মজুরি জীবনযাত্রা মূল্য সূচকের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অর্থাৎ ঐ বছর কারখানা শ্রমিকদের প্রায় তিনের পাঁচ ভাগ লোকের মজুরির সঙ্গে তাদের ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য সূচকের বিশেষ কোনো সম্বন্ধ ছিল না। দেশের শ্রমিক-বাহিনীর এই বড়ো অংশের সত্যকার মজুরি উঁচু রাখতে হলে সবচেয়ে আগে ভোগ-দ্রব্যের মূল্যস্থিতির প্রয়োজন। প্রথমে [illegible] বাড়তে দিয়ে পরে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণের জন্য মজুরি বৃদ্ধি করার চাইতে গোড়া থেকেই মূল্যস্থিতি বজায় রাখা দেশের আর্থিক স্থিতির দিক থেকে বাঞ্ছনীয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনার আগে শ্রমিকদের সত্যকার মজুরি তাদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার মজুরির চাইতে কম ছিল। শুধু ১৯৫৩ সালে কারখানা শ্রমিকরা যুদ্ধপূর্ব মজুরির সমান মজুরি অর্জন করতে সমর্থ হয় (ঐ বছর তাদের মজুরির [illegible] বৃদ্ধি জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি পূরণ করতে পারে)।

প্রথম যোজনাকালে মূল্য পরিস্থিতি শ্রমিকদের পক্ষে মোটামুটি অনুকূল ছিল। ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন পাশ হওয়ায় এবং শ্রমিক সংঘ আন্দোলন শক্তিশালী ও ব্যাপক হওয়ায় শ্রমিকদের, বিশেষ করে খনিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরির টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫১ ও ১৯৫৫ সালের ভেতর মজুরির টাকা বেড়েছে কারখানা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শতকরা ১৫ ভাগ এবং খনির শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৪ ভাগ। অন্যদিকে, সর্বভারতীয় ভোগ-দ্রব্যের মূল্যসূচক (১৯৫১=১০০) ১৯৫২ ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে কমে যায় এবং ১৯৫৩ ও ১৯৫৬ সালে আরম্ভ সালের মূল্যের সমান থাকে। মজুরি বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাসের ফলে ঐ সময়ের ভেতর শ্রমিকদের সত্যকার মজুরি গেছে বেড়ে।

ভোগদ্রব্যের মূল্য, প্রতি শ্রমিকের বার্ষিক টাকায় মজুরি* ও সত্যকার মজুরিঃ কারখানা ও খনি (১৯৫১=১০০)

বছর	সর্বভারতীয় ভোগ দ্রব্যের মূল্য সূচক (১৯৫১=১০০)	টাকায় মজুরি		সত্যকার মজুরি	
		কারখানা	খনি	কারখানা	খনি
১৯৫২	৯৮	১০৭	১০৬	১০৯	১০৮
১৯৫৩	১০১	১০৮	১০৬	১০৭	১০৫
১৯৫৪	৯৬	১০৮	১০৮	১১২	১১৩
১৯৫৫	৯১	১১৩	১১০	১২৪	১২১
১৯৫৬	১০০	১১৫	১৪৪	১১৫	১৪৪
১৯৫৭	১০৬	১২১	১৬০	১১৪	১৫১
১৯৫৮	১১১	১১৯	১৭১	১০৮	১৫৪
১৯৫৯	১১৫	১২২	১৪৩	১০৬	১৫৯
১৯৬০	১১৮	১৩০	১৯০	১১০	১৬১
১৯৬১	১২০	১৩৮	১৯৮	১১৫	১৬৫

*মূল মজুরি সুবিধা না রেখাতে, বার্ষিক বোনাস—এ সবই টাকায় মজুরির অন্তর্ভুক্ত। উৎস : রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া বুলেটিন এপ্রিল, ১৯৬৪। [মন্তব্য : প্রথমে প্রত্যেক রাজ্যে বর্তমান মজুরি ও আরম্ভ সালের মজুরির অনুপাতের গড় (গড় করবার সময় রাজ্যটির সেই সেই শিল্পে আরম্ভ সালের মজুরি বাবত মোট খরচকে ভার বা ওয়েট হিসাবে ধরা হয়েছে) থেকে টাকায় মজুরির সূচক নির্ণয় করা হয়েছে। ঐ রাজ্যগুলিতে আরম্ভ সালের মজুরির দরুন মোট ব্যয়কে আবার ভার হিসাবে নিয়ে পূর্বোক্ত বিভিন্ন রাজ্যের মজুরি সূচকের গড় থেকে সর্বভারতীয় মজুরী সূচক পাওয়া গেছে। সবশেষে, সারা ভারতের টাকায় মজুরি সূচককে সর্বভারতীয় ভোগদ্রব্যের মূল্যসূচক দিয়ে ভাগ করে নির্ণয় করা হয়েছে প্রত্যেক শ্রমিকের সত্যকার মজুরির সূচক। অবশ্য সারা ভারতের ভোগসামগ্রীর ঐ সূচক সমগ্র দেশের মূল্য পরিবর্তনের নির্দেশক নয়, যে সাতাশটি কেন্দ্রের মূল্যের ভিত্তিতে ঐ সূচক তৈরি করা হয়েছে, সেগুলি সঠিকভাবে সারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে না।]

দ্বিতীয় যোজনাকালেও প্রত্যেক শ্রমিকের বার্ষিক গড় টাকায় মজুরি বাড়তে থাকে। কিন্তু ১৯৫৬ ও ১৯৬০ সালের ভেতর ভোগদ্রব্যের মূল্যসূচক শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম চার বছর কারখানা শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কমে আসে। ১৯৬১ সালে শ্রমিকদের ১৯৫৬ সালের প্রকৃত মজুরি উদ্ধার সম্ভব হয় (১৯৬১তে যেখানে ভোগদ্রব্যের মূল্যসূচক শতকরা ১·৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, শ্রমিকদের টাকায় মজুরি সেখানে বেড়েছে শতকরা ৬·২ ভাগ)।

প্রথম যোজনাকালে কারখানা শ্রমিকরা জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৩·৪ ভাগ পেত, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় তাদের অংশ সামান্য বেড়ে ১৯৬১ সালে শতকরা ৪·৪ হয়েছে। ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের ভেতর মাথাপিছু জাতীয় আয় যেখানে শতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধি পায় প্রত্যেক কারখানা শ্রমিকের বার্ষিক গড় টাকায় মজুরি সেখানে শতকরা ৩৮ ভাগ বেড়েছে। অবশ্য প্রত্যেক শ্রমিকের পোষ্যের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং শহর ও শিল্পাঞ্চলে জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় নাগরিকদের তুলনায় কারখানা শ্রমিকদের সত্যকার অবস্থার বেশি উন্নতি সম্ভবত হয়নি।

যে সব শিল্পে আগে মজুরি অপেক্ষাকৃত কম ছিল সেগুলিতে প্রতি শ্রমিকের টাকায় মজুরি বেশ খানিকটা বেড়েছে। ১৯৫১ ও ১৯৬১ সালের ভেতর কয়লাখনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের টাকায় মজুরি সূচক শতকরা ১১৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু রবার, ছাপাখানা, মূল ধাতু, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যন্ত্র উৎপাদন শিল্পে রত শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে শতকরা ৩০ ভাগেরও কম।

শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বিবেচনা করবার সময় তাদের কল্যাণের জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হয়। ১৯৪৮ সালে শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আইন প্রণীত হয়। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসের ভেতর মাসিক ৪০০ টাকা বা তার কম আয়ের ২০ লক্ষ কর্মীকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। চিকিৎসার সুবিধা ছাড়াও পূর্বোক্ত ব্যবস্থায় অসুস্থতা, অঙ্গহানি, পোষ্য পালন ও মাতৃত্বের জন্য অর্থসাহায্য করা হয়। ১৯৫২ সালে কর্মীদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের আইন পাশ করা হয়েছে; ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে ৫০০ টাকা বা তার কম মাসিক আয়ের ৩৬ লক্ষ লোক প্রভিডেণ্ট সঞ্চয় ব্যবস্থার অধীনে আসে। শ্রমিকদের সত্যকার মজুরি ও তাদের কল্যাণের দিক থেকে দেখলে এইসব সুবিধাগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

শান্তিকুমার ঘোষ

চিত্রপ্রদর্শনী

পার্থসারথী (রঙীন লিথো) শিল্পী : নন্দলাল বসু
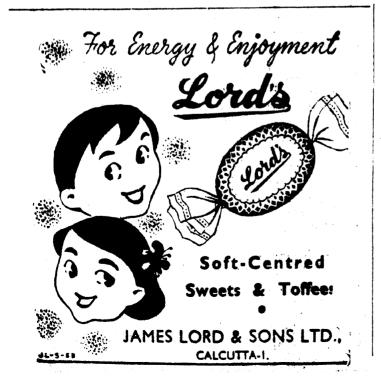
'প্রিণ্ট' প্রদর্শনী

কিছুদিন আগে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সহায়তায় সংগৃহীত কতকগুলি প্রিণ্টের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীতে সব সমেত ২৫ খানি প্রিণ্ট ছিল। এর মধ্যে ১৭ খানি 'ওরিজিন্যাল' লিথো বা উডকাট, বাকিগুলি সাধারণ 'অফসেট' বা 'হাফটোন' রিপ্রোডাকশান। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন আচার্য নন্দলাল, রমেন্দ্রনাথ, হরেন দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কে সি এস পানিকর, চুনীলাল দত্তগুপ্ত ও আরো অনেকে। নন্দলালের বিখ্যাত ছবি 'পার্থসারথীর' রঙীন লিথোগ্রাফ প্রতিলিপি দেখানো হয়েছিল। প্রতিলিপি কে করেছিলেন উল্লেখ নেই, তবে আমার নিজের বিশ্বাস রমেন্দ্রনাথ নিজেই করেছিলেন। কেননা এক সময় তিনি নন্দলালের অনেকগুলি ছবির উডকাট বা লিথোগ্রাফ রিপ্রোডাকশান করেছিলেন—এখন সেগুলি কোথায় আছে জানি না। আমাদের দেশে গ্রাফিক আর্টে যাঁরা সর্বপ্রথম আগ্রহী হয়েছিলেন এবং এ বিষয়ে পরে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রমেন্দ্রনাথের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান প্রদর্শনীতে এঁর যে দুখানি উঁচু দরের কাজ স্থান পেয়েছিল সে দুখানি হ'ল 'আলপনা' (রঙীন লিথো) ও ভুবন ডাঙ্গা (ঐ)। হরেন দাশের কয়েকটি উডকাটে আলোছায়ার বৈপরীত্য বেশ প্রীতিপ্রদ হয়েছে। শিল্পী যে পাশ্চাত্যের উড এনগ্রেভিং দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তা বেশ বোঝা গেল কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের শিল্পীরা যদি জাপানের দিকে তাকাতেন তাহলে অনেক বেশী লাভবান হতেন। অন্যান্য প্রিণ্টের মধ্যে চুনীলাল দত্তগুপ্তের 'মা ও ছেলে' (রঙীন লিথো) দেবব্রত (?)র 'গঙ্গা' (ঐ) এবং পানিকরের 'মালাবারের দৃশ্য' (লিথো অফসেট) উল্লেখযোগ্য। সমর ঘোষের 'শান্তির আশ্রয়' (লিথো অফসেট) ও সমর দাশগুপ্তের 'উৎসব' (ঐ) ছবি হিসাবে নিকৃষ্ট, প্রিণ্ট হিসাবে যাই হোক না কেন। রবীন্দ্রনাথের সাধারণ হাফটোন প্রতিলিপি দুটি স্থান না পেলেই ভালো ছিল কেননা এ-জাতীয় প্রিণ্ট আদৌ দুর্লভ নয়। প্রিণ্ট নির্বাচনের ব্যাপারে আর একটু নজর দিলে প্রদর্শনীটি উচ্চস্তরের হ'ত।
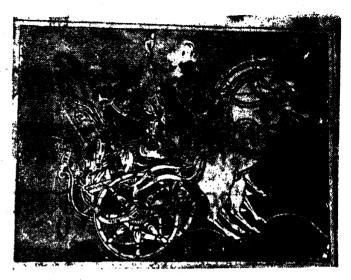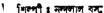
নক্সা প্রদর্শনী

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Directorate of Industries একটি হাতের কাজের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন ক্যালকাটা ইনফর্মেশান সেণ্টারে। গত এক বছরে বাংলা দেশের বিভিন্ন কুটীর শিল্প কেন্দ্রে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদন হয়েছে তার থেকে বাছাই করা নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। সুন্দর সুন্দর ডিজাইন সম্বলিত বহু রকমের নিত্যব্যবহার্য জিনিস স্থান পেয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। বাংলা দেশের নিজস্ব তাঁতের শাড়ী (সুতি ও সিল্ক), পেতলের জিনিস এবং বাঁশ থেকে তৈরি করা জিনিস (টেবল ম্যাট, টেবল ল্যাম্প ইত্যাদি) ছিল এই প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ। এ ছাড়া ছিল নানা রকমের সিরামিকের জিনিসপত্র, হাতির দাঁতের খেলনা, মাটির পুতুল, চামড়ার ব্যাগ, মোষের শিং-এর দরজার হাতল; ঝিনুকের ছুরি প্রভৃতি অসংখ্য ছোটখাটো জিনিস। প্রত্যেকটি জিনিসেরই নক্সা পরিকল্পনায় যথেষ্ট সুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বেশীর ভাগ জিনিসই বিক্রয়ের জন্য হাজির করা হয়েছিল, যে দাম ধরা হয়েছিল তাও বেশী নয়। আশা করা যায় এ সমস্ত জিনিসের বিক্রয় ক্রমশ বাড়বে।

আলপনা (রঙীন লিথো) —রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

চাল, তেল, মাছ বাজার হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"আলোচাক্তে 'নিয়মভঙ্গে'র নিয়মটা ব্যবসায়ীরা ঠিকই পালন করছেন!!"

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে বলিয়াছেন—স্বাধীন, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত এবং যুদ্ধহীন শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর যে-স্বপ্ন গান্ধী ও জওহরলাল দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা সার্থক করিয়া তোলাই তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু যে-হারে পথঘাট, বন্দর, স্টেডিয়াম জওহরলালজীর নামে রাখার প্রস্তাবের হিড়িক পড়েছে, তাতে মনে হয়, নামের কেবলাম্-এর বাইরে আমরা কিছু ভাবতেই পারিছনে।"

নামের প্রসঙ্গে অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"কলকাতার কোন এক মার্কেটের 'নেহরু মার্কেট' নামকরণ করার প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে না হলে, জনসাধারণ প্রায় সমস্ত বাজার মার্কেটের নাম রেখেছেন 'গলা কাটা', সুতরাং এই স্থানে আর নূতন করে নেহরুজীর দ্বিতীয় অন্ত্যেষ্টির কী প্রয়োজন!"

কোন এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত অন্য একটি প্রস্তাবের প্রতিও আমাদের অন্য এক সহযাত্রী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, তাহাতে, শান্তিনিকেতনের প্রখ্যাত "আম্রকুঞ্জের" নাম পরিবর্তন করিয়া "নেহরু কুঞ্জ" রাখার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সহযাত্রী বলেন—"প্রস্তাবক হয়ত জানেন না যে, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ যাঁর কণ্ঠে সোচ্চার হতো, তাঁর নাম—শ্রীজওহরলাল নেহরু, হয়ত তিনি এ-কথাও জানেন না যে, আম্রকুঞ্জের বদলে উত্তরায়ণে সমাবর্তন উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে নেহরুজী ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, বিরক্ত হয়েছিলেন, বলেছিলেন—লেট্ আস্ গো ব্যাক্ টু ম্যাঙ্গো গ্রোভ। মহাপুরুষদের নামে অনুরূপ নামকরণের প্রথা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে, তা স্বীকার করি; তবু বলব—ধীরে, কাফুর ধীরে!!"

একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পড়িলাম—প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইবার অব্যবহিত পরেই শ্রী শাস্ত্রী দ্রব্যমূল্য সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। শাসন কর্তৃত্ব হাতে পাইয়াই তিনি যে সেদিকে দৃষ্টি দিয়াছেন, সেটি তাঁহার প্রখর বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক। —"হতেই হবে, তিনি যে মূলত শ্রীশাস্ত্রী নন, শ্রীবাস্তব"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পরে শ্রী চু-এন লাই শাস্ত্রীজীকে নাকি একটি অভিনন্দন-বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। "খুবই আনন্দের কথা, তবে শুধু কথায় যে চিঁড়ে ভিজে না, আশা করি শাস্ত্রীজী বাংলার এই প্রবাদটি সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল।"—বলেন বিশুখুড়ো।

সংবাদে প্রকাশ, স্বনাম খ্যাত ডা রাম-মনোহর লোহিয়া নাকি নেহরুজীর মৃত্যুর পর আমেরিকার সাংবাদিকদের বলিয়াছেন যে, যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ভারত দিশাহারা নৌকোর মতো ভেসে চলেছে, নেহরু থাকুন বা না থাকুন, ভারত ভেসেই যাবে। শ্যামলাল বলে—"কিন্তু ভাসতেই বা দিচ্ছেন কেন, এতো আর আংরেজী হটাও নয়; বিদেশে দেশের নেতার দোষ কীর্তন না করে, দেশে এসে হাল ধরতে না পারলেও নৌকোর গুণ তো টানতে পারেন!!"

কলকাতা পৌর পিতাদের সভার বিবরণ হইতে জানা গেল—ভূগর্ভস্থ পয়ঃ-প্রণালী হইতে এক বালতি ময়লা অপসারণের খরচ দুই টাকা।—"স্বীকার করতেই হয় খরচটা বেশি, কিন্তু সভা সমিতিতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কর্দম নিক্ষেপের গুরুত্বও তো কম নয়"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

মফস্বলের এক সংবাদে শুনিলাম, কোন একটি ইলিশ মাছের পেটে নাকি ভাঁজ করা একটি গেঞ্জি পাওয়া গিয়াছে।—"হিমঘরের শীতে নিজেকে বাঁচাবার জন্যই বুঝি এই ব্যবস্থা, ইলিশের বুদ্ধি আছে বটে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

নিউইয়র্কে মোটর কারের জন্য একটি অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার করা হইয়াছে; কখন তেল নিতে হইবে, কখন গাড়ি মেরামতের দরকার এসব নাকি সেই যন্ত্রই "বলিয়া" দেয়—"ঠিক এইরূপ একটি যন্ত্র কলকাতার ট্যাক্সিতে বসিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার কানে হবু প্যাসেঞ্জারের আহ্বান পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা যায় না কি?"—প্রশ্ন করেন সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ নাকি বলিয়াছেন যে শিক্ষকদের ন্যায্য মর্যাদা দিতে হইবে।—"অতি উত্তম কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে ন্যায্য পাওনাটার ব্যবস্থাও যদি করা হয়, তা হলেই বুঝি হয় সর্বাঙ্গসুন্দর"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

একটি সংবাদে শুনিলাম,—অ্যাড্রেস (ঠিকানা) লেখা শিক্ষা দেওয়ার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু সেই সঙ্গে অ্যাড্রেস অর্থাৎ ভাষণ লেখা বা দেওয়ার শিক্ষা থেকে যেন ছেলেদের বঞ্চিত করা না হয়, কেননা ভবিষ্যতে তো তাঁরাই আমাদের ভরসা এবং ভাষণই তাঁদের একমাত্র সম্বল!!"

এক সংবাদে প্রকাশ, ১৯৬৮ সালের মধ্যেই আমেরিকার মহাকাশযান চন্দ্র 'হিট' করিতে সক্ষম হইবে।—"অবশ্য যদি চন্দ্র ইতিমধ্যে তাদের হিট্ না করে বসে"—বলেন সহযাত্রী।

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

আধুনিক মানুষ

ভীরু স্বভাবের লোক আমি, একবার নিতান্ত বিপদে পড়েও মোটর-বাইকের পেছনে চড়ে মাত্র মাইল চারেক রাস্তা যেতেও সাহস করিনি। এককালে নৌকোয় চড়েছি অল্পস্বল্প, কিন্তু এমনই কপাল, একদা কাশীতে বর্ষাকালের গঙ্গায় নৌকোর চড়ে শেষে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছি; সেই থেকে আমার নৌকো-ভীতি প্রবল। তবু বারকয়েক স্টীমারে চড়ে গঙ্গাপাড়ি দিয়েছি। মোটর-বাইক এবং নৌকো ছাড়া আরও একটি যানের সম্পর্কে আমার বিশেষ ভয় আছে, সে যান আকাশ-যান। উড়োজাহাজে হাজার হাজার লোক নিয়মিত যাতায়াত করছে, এ সত্য সবাই জানে, আমিও জানি—তবু ভয় ঘোচে নি। মনে হয় না, ওই যান্ত্রিক পক্ষীর পিঠে চড়তে আমার কোনোদিন সাহস হবে।

Andrzej Kijowski নামক এক তরুণ পোলিশ সাহিত্য সমালোচকের ছোট্ট একটি লেখা পড়ে আমার ওপরের কথাগুলি এলোমেলোভাবে ভাবতে হল। Kijowski তার লেখায় আধুনিক সমাজে মানুষের আচরণ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বোঝাতে বিমানযাত্রার একটি তুলনা দিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, উড়োজাহাজে উঠে লোকে যখন কোথাও যায়, তখন তার মনে নানা রকমের খুঁতখুঁতুনি থাকে। একটু বেশী রকম ভীরু স্বভাবের লোক হলে হয়ত সে দু-পাঁচটা আপত্তি তুলতে পারে—কিন্তু কেউ তার কথায় কান দেয় না। শেষাবধি বেচারীর কপালে সেই উড়োজাহাজী ভ্রমণ। বিমানের খোলের মধ্যে যতক্ষণ, ততক্ষণ নানা দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ, ভয়, বুক ধড়ফড়ানি; মনে হয়—আহা যদি রেল-কামরায় চড়ে যেতে পেতুম, তবে কি স্বস্তিই না পেতুম! কিন্তু তখন তো আর উপায় কি, চড়েছি যখন বিমানে, তখন যা হয় কপালে হবে। যে লোকগুলো খুব সাহস দিয়ে উড়োজাহাজে চড়িয়ে দিয়েছিল, তাদের ওপর রাগও হয়। ক্রমে ক্রমে সবই যেন একটু সয়ে আসে; শেষে যথাস্থানে অবতরণ। অবতরণের পর স্বস্তি। সামান্য পরে এমন কথাও মনে হয়, উড়ো-যাত্রাটা কিন্তু মন্দ হল না। উদ্বেগ ভোগ করেছি যথেষ্ট, কিন্তু মোটামুটি বেশ আরামেই আসা গেল। না, এরোপ্লেনে চড়া এমন কিছু মারাত্মক নয়। বলা বাহুল্য, তখনকার মতন স্বস্তি পেলে এবং খুশী হলেও পরে আবার যখন উড়োজাহাজে চড়তে হবে, এই লোকটির মনে সেই পুরোনো ভয় এবং উদ্বেগ না জেগে পারবে না।

Kijowski-র তাই বক্তব্য: আধুনিক সমাজে মানুষের আচরণ ভীরু স্বভাবের হাওয়াই-যাত্রীর মতন। সে ভয় পায় অবস্থা রাখতে পারে না, কাজ এবং দায়িত্ব থেকে সরে থাকার চেষ্টা করে, পারে না, শেষে সম্মত হয়। কাজ শেষ হলে আবার যখন তাকে বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়, তখন তার আচরণে পুরোনো প্রতিক্রিয়াগুলিই দেখা দেয়। অর্থাৎ এই অবস্থাটিই চাকার মতন ঘুরে ঘুরে আসছে। লেখক মনে করেন, এর দ্বারা প্রমাণ হয়, আধুনিক মানুষ এই সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কোনো কাজ করছে না, কাজটা করার পর সে বোধবুদ্ধি দিয়ে কর্তব্যের সমর্থন করছে। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত পরে আসছে।

লেখক বলেছেন, আধুনিক সমাজে মানুষের এই সন্দেহপরায়ণ ভীরু স্বভাবের ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, তারা প্রয়োজনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার পদ্ধতিতেই প্রথমত নিজেদের সমর্পণ করছে, মানিয়ে নেবার অভ্যাসবশে মানিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে। পরে সে এই নতুন অবস্থা ক্রমে ক্রমে স্বীকার করে নেয়, সত্য বলে মেনে নিতে শেখে, এবং এই নতুন অবস্থার মধ্যেই নিজের মুক্তির সুযোগ খুঁজে নেবার চেষ্টা করে।

Kijowski-র মূল বক্তব্য হল: "Reality has to be accepted in its given form, it is inescapable". এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা শেষে তিনি বলেছেন, আধুনিক সমাজ এবং জীবনকে বুঝে তবে তাকে গ্রহণ করার প্রশ্ন ওঠে না, কেননা, সে সুযোগ আমাদের নেই; যেহেতু বাস্তব যা আছে, যে চেহারায় আছে তাকে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে (এবং এই বাস্তব থেকে সরে যাবার উপায় নেই বলেই—), যেহেতু আমরা একে গ্রহণ করি। প্রশ্ন হল, মানুষ এই নতুন অবস্থার মধ্যে কেমন করে নিজেকে উপলব্ধি করে নিতে পারবে।

Kijowski-র এই ব্যাখ্যা আধুনিক মানুষের আচরণ সম্পর্কে হলেও মূলত তিনি সাহিত্য বিষয়ে বলতে গিয়েই কথাগুলি বলেছেন। পোলিশ উপন্যাসের যেটা বড় বাজার, সেখানে মানুষ আগেভাগেই শ্রমিক শ্রেণীর হয়ে কিংবা রাজনৈতিক টিকা নিয়ে এই যুগটাকে ঝটপট বুঝে নিয়ে তারস্বরে চেঁচার বলে শুনেছি। সম্ভবত মার্কস-লেনিন করে যাঁরা সেখানে বিস্তর হইচই করে গেছেন, তাঁদের দুটির সাধারণ দিকগুলির কথা এ যুগের কিছু তরুণ লেখক খোলাখুলি বলবার চেষ্টা করছেন। আলোচ্য লেখকের বক্তব্য থেকে আপাতত যেন তাই মনে হচ্ছে।

আমার বক্তব্য, বাস্তব যে অপ্রতিরোধ্য, এ-যুক্তি মেনে নিলেও এমন মনে করার কোনো কারণ নেই, হাওয়াই-সফর সারবার আগে আমি হাওয়াই-যাত্রার ভাল-মন্দ খোঁজখবর নেব না, বা নিয়েও সে সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত আগেভাগে করতে পারব না। সিদ্ধান্ত বলতে মনস্থির বোঝায়, স্নায়ুর কিছু গোলযোগ সেখানে থাকতে পারে, নাও পারে। দ্বিতীয়ত, সে ভীরু, তার ভয় একবার দুবার, তারপর এরোপ্লেনের সিঁড়িতে ওঠা নামা তার অভ্যাস হয়ে যায়। আর না হয়, আমার মতন সে ও-পথে কোনোদিন মাড়াতে চাইবে না।

Kijowski-র মূল বক্তব্যের ব্যাপারে আমার তেমন খুঁতখুঁতুনি নেই, কিন্তু এ-কথা ধরে নিতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে, মানুষ এখানে নাচার। যে বাস্তবের কথা লেখক মনে করেছেন, সেটা কোন্ জাতের, তা আমাদের জানা দরকার। যেমন কি না হাওয়াই-জাহাজ অতি বাস্তব এবং আধুনিক যান হওয়া সত্ত্বেও বহু মানুষ তাকে এড়িয়ে দিব্যি বাঁচতে পারে। এই বাস্তবটা আমাদের কাছে অতি প্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু ধরে নেওয়া যাক, কোনো একটা আধুনিক ওষুধের কথা, যেমন পেনিসিলিন। এক সময় পেনিসিলিন নিতেও অনেকের গায়ে ঘাম জমত, বুক শুকিয়ে আসত, এমন কি, পেনিসিলিনের প্রতিক্রিয়া আজও গল্পকথা মাত্র নয়, তবু অধিকাংশ মানুষই এখন এতে অভ্যস্ত। ফলে ভয়ের ঘোর কেটেছে। বাস্তবে পেনিসিলিনটা মানুষের কাছে যত প্রয়োজন, হাওয়াই জাহাজ নিশ্চয় ততটা নয়। .... বাস্তবের ব্যাপারে সম্ভবত একটা কথা বলা যায়, তার কিছু কিছু আমাদের জীবনে অতি প্রত্যক্ষ, কিছু কিছু পরোক্ষ। মানুষ অতি প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনাগুলিকে এড়াতে পারে না। কিন্তু পরোক্ষগুলিকে সে অনুভব না-ও করতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে একেবারে

জোর করে এমন কথা বলা যায় না—বাস্তবে মারেই মুখ হাঁ করে মানুষকে গিলে নিচ্ছে।

আলোচ্য লেখক, আমার ধারণা, যা বলতে চেয়েছেন, তা আরও সহজ করে বোঝা যায়। সমাজ, জীবন ও পারিপার্শ্বিক থেকে কেউ লাফ মেরে পালিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারে না। যে সমাজে বাস, যে জীবন মানুষ ধারণ করে এবং যে পারিপার্শ্বিকে তার অবস্থান—তাকে সত্যিই কে আর কবে প্রথম থেকেই বিচার-বিবেচনা করে নিয়ে, সিদ্ধান্তে এসে তবে গ্রহণ করে। এখানে গ্রহণটা বাধ্য-বাধক। বস্তুত কেউ যদি কখনও কোনো সিদ্ধান্তে না আসে, তবুও এই সংসারে তাকে বেঁচে থাকতে হবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত। তবে কিছু মানুষ নিশ্চয় আছে, যারা এই অবস্থায় পড়ে ভেসে থাকতে চায় না। সে-সব ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমরা একটা অর্থ বা তাৎপর্য খোঁজবার চেষ্টা করি এ-জীবনেই। আধুনিক মানুষের দ্বিধা বা ভীরুতা, কিংবা সংশয় কেবলমাত্র এই কারণে নয় যে, সে হাওয়াই-জাহাজকে বিশ্বাস করতে পারছে না, বরং সে এই হাওয়া এবং আবহাওয়াতেই বা কি ভরসা পাচ্ছে, তাও জানার বিষয় বইকি।

একটি বিশিষ্ট উপন্যাস ও অন্যান্য কাহিনী

দুই অরণ্য : সমরেশ বসু : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯ : ৬-০০ টাকা।

'সবুজ বন, দূরান্তে কৃষ্ণ নীল। আর নীল বন ছাওয়া বুরু, দীঘু বলে পাহাড়। দীঘু থাকে সমতলে, গ্রামে, শহরে বনের বাইরে। বনে আসে ঠিকাদার নামে, গাছ কাটে, গাড়ি বোঝাই করে চলে যায়। বনে আসে শিকারী নামে, পশু মারে চলে যায়। বনে আসে, বসত করে হাত্-তে দোকান পসার সাজিয়ে, মরবার সময় হলে চলে যায়। কারণ বনের বাইরে, সমতলে শহরে ও গ্রামে তার স্বজনেরা থাকে।'

বনের মানুষ, পাহাড় আর অরণ্যের সন্তান, মুন্ডাদের জীবন জুড়ে এখনও অরণ্যের প্রভাব, যদিও বাইরের সভ্যতা তার শুভাশুভের পসরা নিয়ে অরণ্যের গভীরে এগিয়ে আসছে। অরণ্যচারী সরল সহজ মানুষগুলির জীবনে জটিলতার ছায়া ফেলেছে।

দুই অরণ্যের এই হলো পটভূমি। আরণ্যক জীবনের প্রতিনিধি উপন্যাসের নায়ক চেকো ক্যারকাটা অরণ্যচারী মুন্ডার ছেলে। তার জীবনের স্বপ্ন ফরেস্ট গার্ডের চাকরি, সরকারী তকমা। সরকারী তকমা পরে সরকারী কর্মচারীদের সংস্পর্শে এসে কিন্তু তার আরণ্যক জীবনের সরল বিশ্বাস আর মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধের ভিত নড়ে উঠল। চেকোর মানসিক যন্ত্রণা আর অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপটি পুরোপুরি উপলব্ধি করেছেন ব্লক স্কুলের হরকিষণ মাস্টার। হরকিষণ অন্যান্য দীখুদের (বহিরাগত) মত অরণ্যকে কেবল জীবিকার প্রয়োজন হিসেবেই দেখেন নি। অরণ্যের মানুষদের তিনি দেখেছেন সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিতে। মানুষ করার দৃষ্টিতে নয়।

অরণ্যের জীবনকে তার মানুষ আর সমাজব্যবস্থাকে ভালবেসেছিল আর একজন। মিশনারিদের কাছে প্রতিপালিত ইংরেজ আলফ্রেড। আরণ্যক মানুষ আর তাদের জীবনযাত্রাকে ভালবেসে ফরেস্ট অফিসারের বড় চাকরি, স্ত্রী-পুত্র-সমাজ সব ছেড়ে এখন সে মুন্ডানী মেয়ে নিয়ে অরণ্যে সংসার পেতেছে। আরণ্যক জীবন তার কাছে মোহিনী মায়া। অরণ্যের ধমনীতে মিশে গেছে আলফ্রেড। কিন্তু হরকিষণ মাস্টারের কাছে অরণ্য এক জীবন্ত সত্তা। তার শুভাশুভ মাস্টারকে বিচলিত করে। তাঁর অরণ্যপ্রেমে নিষ্ক্রিয়তা নেই।

সমরেশ বসু তাঁর স্বাভাবিক নৈপুণ্যে অরণ্যক জীবনের ছবিটি তুলে ধরেছেন 'দুই অরণ্য' উপন্যাসে। মুন্ডাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনাও পটভূমির প্রয়োজনে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে উপন্যাসে। পটভূমি অকারণে কোথাও কাহিনীকে অতিক্রম করে নি। কিন্তু পরিবেশকে স্বাভাবিক করতে গিয়ে অত বেশী মুন্ডা শব্দ প্রয়োগের সত্যিই কি খুব প্রয়োজন ছিল? সব মিলিয়ে আরণ্যক জীবনের পটভূমিকায় দুই অরণ্য একটি বিশিষ্ট উপন্যাস, বাঙলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। নিজস্ব পরিবেশে অরণ্যের মানুষদের বিচিত্র জীবনের এমন নিখুঁত চিত্র বাঙলা সাহিত্যের পাঠকদের চোখে এর আগে কেউ তুলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। ১৩৪।৬৪

সেদিন রাত্রে—সুকুমার বিশ্বাস। আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১২। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

গ্রন্থকার যে-কোনো সমালোচকের ধন্যবাদ অর্জন করবেন। কারণ প্রারম্ভেই এই গ্রন্থের সমালোচনা তিনি নিজেই জুড়ে দিয়েছেন তাঁর কাছে লিখিত শ্রীঅন্নদাশংকর রায়ের এক পত্রে। পত্রটি শুধু এই পুস্তকেরই নয়—সাম্প্রতিক কালের এই ধরনের অনেক পুস্তকেরই সমালোচনা হিসাবে প্রযোজ্য। যথা—অন্নদাশংকর লিখছেন : তোমার লেখা এখনও সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের সন্ধিসীমায়। এমন কোন বেদনা নেই তোমার যা তুমি প্রকাশ করতে ব্যাকুল যা তুমি অপরের হৃদয়ে সঞ্চার করে দিতে চাও বলে লেখনী ধরেছ।...মানুষের দেহ ও দেহগত দুর্বলতা তোমাকে আবিষ্ট করেছে। মানবিক দুর্বলতা যদিও সত্য তবু সেই সত্যকে অবলম্বন করে উঁচুদরের আর্ট হয় না।...সাহিত্যের ইতিহাসে যে সব Scandal চিরস্থায়ী হয়েছে তাদের কোথাও না কোথাও সৌন্দর্যের ছাপ আছে। প্রেম নিয়ে যদি লিখতে চাও তো আরো গভীরে যাও। নীচে নেমে যাওয়াটা তো ঠিক গভীরে যাওয়া নয়।

অন্নদাশংকরের সঙ্গে একমত হয়ে এই সমালোচকও বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, লেখক শুধু সংবাদই পরিবেশন করেছেন—সাহিত্য নয়। ৩৮৯।৬৩

কত ঘাট কত ঘটনা—বিশ্ববন্ধু সান্যাল। জ্ঞানতীর্থ, ১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম : তিন টাকা।

এখানেও গ্রন্থকার যা দিয়েছেন তা নিছকই সংবাদ। মাটির হাকিম অর্থাৎ সাব-রেজিস্ট্রার মহিমবাবুর অভিজ্ঞতার

একাধিক ঘটনার সংযোগে। তবু মাঝে মাঝে চরিত্রচিত্রণের দৃষ্টান্ত আছে। বেদনা সৃষ্টির প্রয়াস আছে। সহানুভূতিও কিছু কিছু আছে। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে লেখক রিপোর্টারেরই কাজ করেছেন। অনেক ঘটনাই বিবৃত করেছেন মাটির হাকিম মহিমবাবু। কিন্তু সেই ঘটনার পাত্র-পাত্রী যদি অপরের বেদনা বা অনুভূতি আকর্ষণ করতে না পারে তাহলে তারা শুধু সংবাদেরই উপাদান হয়ে বিরাজ করবে।

১২৫।৬৩

এম এল পম্পা—শ্রীপারাবত। আনন্দধারা প্রকাশন। ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। মূল্য সাত টাকা।

যে দেশে এত নদ-নদী মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত তা সাহিত্যের অপাংক্তেয় হয়ে থাকে আর বিচিত্র কী। এদেশের নদনদী আমাদের বহু গল্প-কবিতা-উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। তরণীর কর্ণধারদের নিয়েও রচিত হয়েছে কত কথা, কত কাহিনী।

এম এল **পম্পা একটি মোটর লঞ্চ,** গঙ্গার বুকে ভেসে বেড়ায়। তার সারেঙ, সুখানি লস্করই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। পার্শ্বচরিত্র কিছু আছে এই লঞ্চের গণ্ডি ছাড়িয়ে। তাদের কারো প্রত্যাখ্যান সারেঙ রাজেনকে বিচ্যুত করতে পারেনি তার আদর্শ থেকে। মোটর লঞ্চই তার সব চেয়ে আপন। এই জীবিকা প্রধানত বেছে নিয়েছে যারা তারা আজ আর এই দেশের লোক নয়। এই দেশের লোক এসব কাজে আসতে চায়না সম্মানহানির ভয়ে। এই নিয়ে রাজেনের পরিতাপের অন্ত নেই। কারো রূপের আকর্ষণ এড়াবার জন্যে লস্কর হয়ে নবকুমার জীবন থেকে পলায়ন করে আশ্রয় নিয়েছে এই মোটর লঞ্চের কাজে। আদর্শবাদী বলে সে নিজকে জাহির করেনা। সে মদ খায়। জুয়া খেলে, কপট আনন্দে সে তার অন্তরের বেদনাকে লুকিয়ে রাখে। যার রূপের আকর্ষণ থেকে সে দূরে থাকতে চেয়েছে বসন্তব্যাধিতে রূপহীনা হয়ে সেই তার হৃদয় হরণ করল। লঞ্চে আরও কয়েকজন আছে বিভিন্ন চরিত্রের। আছে বসন্ত—যন্ত্রচালনা করেও যার মন কবিতার দিকে ধায়। আছে দারিদ্র্যহীন দুর্বলচরিত্র হরেন। আছে বহু পত্নীগর্বিত করিম মিঞা।

এম এল পম্পা ঘটনাবহুল উপন্যাস নয়।

কয়েকটি সীমিত চরিত্রের বিশ্লেষণেই কাহিনী গড়ে উঠেছে। লেখক দরদ ও সহানুভূতি মিশিয়ে চরিত্র-চিত্রণ করেছেন বলেই চরিত্রগুলি পাঠকের মনে রেখাপাত করে। তবে সারেঙ বা সুখানির কাজ সওদাগরি আপিসের জীবিকার চেয়ে অধিকতর অর্থকরী, লেখকের এই প্রতিপাদ্যের সঙ্গে অনেকেই একমত হতে পারবেন না। বইতে আরো দু-একটি প্রতিপাদ্য আছে। সেগুলি বর্জন করলেও উপন্যাসের অঙ্গহানি হত না। একটি ঐতিহাসিক প্রমাদ উল্লেখ করা প্রয়োজন। রিভার পাইলটদের অসন্তোষ সাম্প্রতিক ঘটনা। তারও বহু পূর্বে বেলাভিডিয়ার চটকলের বিলুপ্তি ঘটে। অথচ প্রথম ঘটনার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কাহিনীর শেষ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে বেলাভিডিয়ার চটকলের জেটি থেকে। এই ত্রুটি গৌণ হলেও পরিহার করা যেত। অবশ্য শিল্পের বিচারে এই অসংগতি উপেক্ষা করা চলে। বসন্তের কবি-মন বোঝাবার জন্যে একাধিক গদ্য কবিতারও কোনো প্রয়োজন ছিলনা। বোধ হয় এই বাহুল্য বর্জন করলে উপন্যাসটি আরো সুখপাঠ্য হত। নবকুমার চরিত্রটি সার্থক-সৃষ্টি।

৩৮৬।৬৩

রঙ্গজগৎ

স্বাগত

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের নতুন অভিভাবিকা হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে চলচ্চিত্রসেবীরা আন্তরিক স্বাগত জানাবেন। শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রীমতী ইন্দিরার অনুরাগের কথা কারো অবিদিত নয়। ভারতের চলচ্চিত্র শ্রীমতী ইন্দিরার অভিভাবকত্বে সার্থকতা ও সমৃদ্ধির পথটি খুঁজে পাবে আমরা তাই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি।

সম্প্রতিকালে ভারতের চলচ্চিত্রশিল্পের উপর দিয়ে অনেক দুর্যোগ বয়ে গেছে। এই শিল্পের সমস্যার আজও শেষ নেই। সংকটকালে চলচ্চিত্রশিল্প সরকারের সহযোগিতা ও সাহায্য একেবারেই পায়নি এমন কথা বলব না। কিন্তু প্রত্যাশিত আনুকূল্য এই শিল্পের উপর প্রতিনিয়ত বর্ষিত হয়েছে এ-কথা বলবারও উপায় নেই। বরঞ্চ সংকটমুহূর্তে নতুন শুল্কের প্রবর্তন অথবা নির্দিষ্ট করভারের দরুণ এই শিল্পের দুরবস্থা আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

চলচ্চিত্রসেবীদের মনে আজ এই আশ্বাস জেগেছে যে, নতুন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা এই শিল্পের সমস্যা সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করবেন। শিল্প ও সংস্কৃতির সংকট রোধ করার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন এই দৃঢ় বিশ্বাস চলচ্চিত্রলোকের রয়েছে। শুধু নেহরু-তনয়া রূপেই শ্রীমতী ইন্দিরা দেশবাসীর কাছে সুপরিচিত নন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেশবাসী অনেকবারই পেয়েছেন। তা ছাড়া পিতার আদর্শকেই তিনি বরণ করে নিয়েছেন। তাই কল্যাণকর কোন পরিকল্পনার সুষ্ঠু ও বাস্তব রূপ দেওয়ার কাজে তিনি যে অনমনীয় সংকল্পের পরিচয় দেবেন এই আশা চলচ্চিত্রমহল আজ পরম স্বস্তির সঙ্গে পোষণ করছেন।

আসল কথা, চলচ্চিত্রের সমস্যাকে সঠিক অনুধাবন করতে হলে যে উদার ও সংস্কৃতিপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, শ্রীমতী ইন্দিরার তা আছে। এবং ভগিনীর স্নেহ ও অনুকম্পা নিয়েই তিনি চলচ্চিত্রশিল্পের দুঃস্থ প্রযোজক ও কলাকুশলীদের দুর্গতিমোচনে অগ্রসর হবেন এই বিশ্বাস চলচ্চিত্রমহলকে আজ আশ্বস্ত করে তুলেছে। এবং চলচ্চিত্রসেবীদের মনে এই ভরসা জেগেছে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্ণধার যখন শ্রীমতী ইন্দিরার হাতে, তখন সরকারের দরবারে চলচ্চিত্র আর উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে না।

ডি এম প্রোডাকশন্স-এর "বাক্সবদল" (পরিচালনা নিতাই দত্ত) ছবিতে অপর্ণা দাশগুপ্ত। ফটো—দেশ

ছায়াচিত্রে নেহরু-জীবনের অন্তিম অধ্যায়

শ্রীনেহরুর পরলোকগমনের পর ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিসন স্বর্গত নেতার মৃত্যু ও চিতাভস্ম বিসর্জন সম্পর্কে একাধিক সংবাদচিত্র নির্মাণ করেছেন। ফিল্মস ডিভিসনের সর্বাধুনিক তথ্যচিত্রের নাম "অন্তিম অধ্যায়"।

দুই রীলের এই তথ্যচিত্রে মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে নেহরুর জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা, তাঁর অন্তিম যাত্রা, ত্রিবেণী সংগমে তাঁর পূতাস্থি বিসর্জন প্রভৃতি দেখানো হয়েছে। পরিশেষে দিল্লিতে তাঁর স্মৃতিজড়িত বাসভবন এবং যে ঘরে তিনি থাকতেন ও বসে কাজ করতেন, তা-ও দেখানো হয়েছে। সুরচিত নেপথ্য-ভাষণের সঙ্গে এই চিত্রে শ্রীনেহরুর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও তাঁর নেতৃত্বের পরিচয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

ফিল্মস ডিভিসনের সব কয়টি অল্পদৈর্ঘ্যের নেহরু-চিত্র দর্শকের মন আবেগে আপ্লুত করে তুলেছে। ছবিতে ব্যবহৃত আবহ সুরের করুণ মূর্ছনা এবং ভক্তিগীতির কলি দর্শকের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। এ ধরনের স্মৃতিচিত্রে সংগীতের ভূমিকা যে অনেক বড়, তারই প্রমাণ রয়েছে ছবিটিতে।

আশিস মুখোপাধ্যায় কৃত স্বরপ্রক্ষেপ

এলো ওয়ার্ল্ড থিয়েটার টেলিভিশন চিত্র পর্যায়ের একটি অংশ উপহার দিচ্ছেন সত্যজিৎ রায়—সংলাপহীন পনেরো মিনিটের গল্প; ওই চিত্রাংশের দৃশ্যগ্রহণকালে জনৈক শিশুশিল্পীকে নির্দেশ দিচ্ছেন শ্রী রায়। ফটো—দেশ

প্রণাম" ছবিটিতেও (গত সপ্তাহে এই চিত্রের আলোচনায় সংগীতের কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করা হয়নি) সংগীতের সুন্দর, পরিমিত ব্যবহার হয়েছে। সংগীত রচনা করেছেন দক্ষিণীর শিল্পিবৃন্দ। রবীন্দ্রনাথের গানের সুর তাঁরা ব্যবহার করেছেন। এবং রবীন্দ্রনাথের গানের কলি ছবির বিশেষ মুহূর্তে ব্যবহৃত। ছবির শেষে "পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই" গান দর্শকের চক্ষু অশ্রুসিক্ত করে তোলে।

ফিল্মস ডিভিসনের "অন্তিম অধ্যায়" ছবিতেও নেপথ্য-সংগায়িকার কণ্ঠে হরিনাম-গানের কলি ধ্বনিত। এই গান দর্শকমনে ভক্তি ও নিরুচ্চার বেদনার ভাব জাগিয়ে তোলে।

নেহেরুজীর স্বপ্ন

নেহেরুজীর পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক যাদুরত্নাকর এ সি সরকার সম্প্রতি 'নেহেরুজীর স্বপ্ন' নামক একটি নূতন যাদুর খেলা আবিষ্কার করে তাঁর বর্তমান অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

নেহেরুজীর বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শের কথাই এই যাদুর খেলাটির মুখ্য উপজীব্য বিষয়।

এ-সপ্তাহে একটি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটি হল নয়া সংসারের শহর ঔর স্বপনা।

কে এ আব্বাস পরিচালিত "শহর ঔর সপনা" এ-বছর রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছে। ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলীপরাজ ও সুরেখা। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে আছেন নানা পালসিকর, মনোমোহন কৃষ্ণ, ডেভিড ও আনোয়ার হোসেন। জে পি কৌশিক সংগীত পরিচালক।

একই অঙ্গে এত রূপ

নবগঠিত চিত্রপরিবেশন সংস্থা দিবাকর চিত্রমের পরিবেশনায় এইচ এস দাশগুপ্ত প্রোডাকশন্স-এর "একই অঙ্গে এত রূপ" ছবিটি অনতিবিলম্বে মুক্তি পাবে। অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাহ করেছেন হরিসাধন দাশগুপ্ত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী ও দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত ছবির মুখ্য শিল্পী। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ সুরকার।

শুভা—দেবতার গ্রাস

দিবাকর চিত্রমের পরিবেশনায় মুক্তি-প্রতীক্ষিত দ্বিতীয় ছবিটি হল সাজ-ও-আওয়াজের "শুভা—দেবতার গ্রাস"। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও কবিতা অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন চিত্র-পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। শর্মিলা ঠাকুর, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অনুভা গুপ্ত, লিলি চক্রবর্তী, রবি ঘোষ, গীতা দে প্রমুখ শিল্পীরা ছবির বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে রয়েছেন। সংগীত পরিচালনায় আছেন ভি বালসারা।

অগ্নিসাক্ষী

সুন্দরম-এর দ্বিতীয় চিত্রপ্রয়াস "অগ্নি-সাক্ষী"। মন্মথ রায় এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন উমাপ্রসাদ মৈত্র। শ্যামল মিত্র সুরকার।

দুই পর্ব

বিনু বর্ধনের পরিচালনায় মুভী ফিনান্সিয়ারস্ এণ্টারপ্রাইজের "দুই পর্ব" ছবিটির চিত্রগ্রহণ নিয়মিত এগিয়ে চলেছে। জহর গাঙ্গুলী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত-বরন, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, অপর্ণা দেবী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও নবাগত সুমন মুখোপাধ্যায় ছবির প্রধান শিল্পী। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় চিত্রকাহিনী ও চিত্রনাট্যের রচয়িতা। সুধীন দাশগুপ্ত সুরকার।

রাজা রামমোহন

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের "রাজা রামমোহন" ছবির নিয়মিত শুটিং এগিয়ে চলেছে। "ভগিনী নিবেদিতা"-খ্যাত বিজয় বসু ছবিটি পরিচালনা করছেন। নাম-ভূমিকার শিল্পী বসন্ত চৌধুরী। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় রয়েছেন কমল মিত্র, ছায়া দেবী, বাসবী নন্দী, ছন্দা দেবী, নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও শিশুশিল্পী তিলক।

সন্ধানী প্রোডাকশন্স-এর "অয়নান্ত" (পরিচালনা: সন্ধানী) ছবিতে সুপ্রিয়া চৌধুরী।

বহুরূপীর নতুন নাট্যোপহার

গত ১২ই জানুয়ারী নিউ এম্পায়ারে বহুরূপীর সাতদিনব্যাপী নাট্যোৎসব শুরু হয়। এই উৎসবে বহুরূপী সম্প্রদায় দুটি নতুন নাটক উপহার দেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' এবং সফোক্লিসের 'রাজা ঈদিপাস'।

বলা নিষ্প্রয়োজন, 'রাজা' ও 'রাজা ঈদিপাস' বহুরূপীর বহু অভিনন্দিত নাট্য-প্রযোজনায় দুটি স্মরণীয় সংযোজন। এবং এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ্য, "রাজা" মঞ্চস্থ করে বহুরূপী বিদগ্ধ দর্শকদের কাছে ধন্যবাদার্হ হলেন। রবীন্দ্রনাথের "রাজা" মঞ্চস্থ করা কঠিন নয়, কঠিন হল এই রূপক-নাটক অভিনয় করা। কারণ অভিনয় যদি অনুভূতিদীপ্ত না হয়, তবে এই নাটকের মর্মগত বক্তব্য দর্শকের চেতনায় সুব্যক্ত করে তোলা অসম্ভব। এই নাটকের অভিনয় হবে 'আগে কহ আর'-এর মত একটি নিবিড় জিজ্ঞাসার নিশ্চিন্ত উত্তর। বহুরূপীর 'রাজা'—অভিনয়ে আমরা তা পেয়েছি। এই নাট্যাভিনয় মূল নাটকের অন্তঃপ্রবাহী রস ও ভাবসংকট দর্শকের অনুভূতির অন্দরে এনে উপস্থিত করেছে। এই অভিনয়-সিদ্ধি বিস্ময়কর। বহুরূপীর কাছ থেকে যা আমরা আবার পেলাম।

মনন ও অনুধাবনের ভিতর দিয়ে 'রাজা' নাটকের চিরন্তন সত্যকথা উপলব্ধি করতে হয়। এই নাটকের ছন্দ ও রস আহরণ করতে গেলে বাঁধা আমোদ-পিপাসু দর্শকের চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। কারণ তথাকথিত স্থূল নাট্যক্রিয়া অথবা প্রমোদন-উপকরণ এতে অনুপস্থিত। বাইরের আলোর অনেক উপচারের মধ্যে নিজের চিরকালের চাওয়ার বস্তু মানুষ কেমন করে হারায়, এবং অন্ধকারের একনিষ্ঠ আত্মোপলব্ধির মধ্যে তা কী-করে অন্তরে ফিরে পায়, এবং রিক্ততার মধ্যে তার জীবনের পূর্ণতা কেমন করে রূপ নেয়—'রাজা' নাটকের রাণী, সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা ও কাঞ্চীরাজের চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাই প্রকাশ পেয়েছে। ভ্রান্তি থেকে সত্যোপলব্ধিতে রাণীর উত্তরণের কথাই 'রাজা' নাটকের মূল বক্তব্য উদ্ঘাটিত। সত্যের এই স্বরূপ উদ্ঘাটনের মধ্যে আমোদ নেই, আছে অনুভবের আনন্দ। এই আনন্দ বহুরূপীর নাট্যাভিনয়ে পূর্ণমাত্রায় লভ্য।

নাটকটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শককে আবিষ্ট করে রাখে। নাটকের মর্মকথা দর্শকের অন্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার কাজে নাট্যনির্দেশক শম্ভু মিত্র অপূর্ব কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। নেপথ্যে গীত 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে' গানের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নাটকের মূল সুর, ছন্দ ও সত্যকে তিনি বিধৃত রেখেছেন। কিছু দৃশ্য যেমন

রাজ্যের প্রজাদের নিয়ে গঠিত) বাদ দিলে নাটকটি আরও ঘনবদ্ধ হতে পারত কি না, সে প্রশ্ন অবশ্য উঠতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নাট্যপ্রযোজনা কোন মুহূর্তে ক্লান্তিকর মনে হয় না। রানীর অন্ধকার ঘর, নেপথ্য থেকে রাজার বাণী, রাজপথ দিয়ে নগরবাসীদের উৎসবযাত্রা এবং বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে রানীর বন্ধজীবন অবসানের দৃশ্যব্যঞ্জনা উপস্থাপনে নাট্যনির্দেশক যে প্রয়োগ-সিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা মুগ্ধকর।

অভিনয় এই নাট্যপ্রযোজনায় কত বড় ভূমিকা নিয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে। প্রধান চরিত্রে (রানী) তৃপ্তি মিত্রর অভিনয় ভোলবার নয়। এই চরিত্রের বিভ্রম, অপূর্ণতা এবং অভীপ্সা তিনি আশ্চর্য অনুভূতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। চরিত্রটির অন্তর্লোকের পরিচয় তিনি অনায়াসে ব্যক্ত করেছেন। এমন উঁচুদরের মঞ্চাভিনয় বিরল, এবং অবিস্মরণীয়। নেপথ্য থেকে রাজার কথা শান্ত, গম্ভীর স্বরে বলেছেন শম্ভু মিত্র। এ-ছাড়া নাটকে অতি মনোগ্রাহী অভিনয় করেছেন কুমার রায় (ঠাকুরদা) ও সুরঙ্গমা (লতিকা বসু)। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন অমর গাঙ্গুলী কাঞ্চীরাজ), অরুণ মুখোপাধ্যায় (সুবর্ণ), গঙ্গাপদ বসু, সুনীল সরকার (বিরূপাক্ষ ও অবন্তীরাজ), শান্তি দাস, আরতি মৈত্র, শোভেন মজুমদার, হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় ও অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। আবহসঙ্গীত পরিবেশনানুগ এবং এর ব্যবহার পরিমিত।

'রাজা ঈদিপাস'-এর মত নাটক অভিনয় করার মত সাহস বুঝি বহুরূপী গোষ্ঠীরই আছে। এই নাটকের রস করুণ এবং ভয়ানক। নির্মম নিয়তির হাতের ক্রীড়নক এক অসহায় ও প্রচণ্ড শক্তিমান পুরুষের কাহিনী নিয়ে রচিত এই গ্রীক নাটক। দয়াহীনা ভাগ্যদেবীর ক্রূর ছলনায় বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় প্রাচীন ইতিকথার ঈদিপাসের জীবনের মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি যুগে যুগে অনেক নাট্যকার ও কাহিনীকারের কল্পনাকে প্রভাবিত করেছে। নিষ্ঠুর ভবিতব্য অপ্রতিরোধ্য কৌশলে ঈদিপাসকে দিয়ে যে অদ্ভূত ও ভয়ঙ্কর কাজ করিয়েছে তার মধ্যেই নাটকের আখ্যানবস্তু গ্রথিত। অদৃষ্টের ক্রূর ছলনা যেদিন বুঝতে পারল ঈদিপাস সেদিন সে কাঁটা সজোরে বার বার বিদ্ধ করল তার দুই চোখে। অন্ধ হয়ে সে জানল, সে অন্ধকারের মানুষ।

বহুরূপীর নাট্যাভিনয়ে ঈদিপাসের জীবনের এই মর্মন্তুদ বিধিলিপি দর্শককে শিহরিত করে। এক প্রচণ্ড নাট্যকৌতূহলে তাকে স্তব্ধ করে রাখে। গ্রীক নাটকের এই বাংলা নাট্যরূপ ও পরিচালনায় (শম্ভু মিত্র কৃত) প্রধান গুণ এর দুর্বার নাট্যাবেগ। শুরু থেকে ধীরে ধীরে নাটকটি এক অনিবার্য পরিণতির দিকে যত এগোতে থাকে, দর্শকের কৌতূহলও যেন তত গভীর হতে থাকে। শেষ মুহূর্তে যখন মর্মান্তিক মুহূর্তটি উপস্থিত হয় এবং অদৃষ্টের নিদারুণ রহস্যের উন্মোচন ঘটে তখন দর্শক এক অদ্ভূত ও ভয়াবহ জীবনলীলার সাক্ষী রূপে নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন মঞ্চের দিকে। নাটকের গতি প্রচণ্ড। এর আবেদন দুঃসহ, কিন্তু দুর্নিবার।

ঈদিপাসের ভূমিকায় শম্ভু মিত্র অসাধারণ অভিনয় করেছেন। ভাগ্যবিড়ম্বিত একটি চরিত্রের স্বগত হাহাকার তাঁর অভিনয়ে অদ্ভূতভাবে ফুটে উঠেছে। এই চরিত্রের মর্মজ্বালা ও অসহায়তা তিনি অবলীলায় তাঁর অভিব্যক্তি ও বাচনভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। মঞ্চে এই অভিনয় তুলনারহিত। নায়িকার চরিত্রে তৃপ্তি মিত্রর আশ্চর্য সংবেদনশীল অভিনয় ভোলবার নয়। চরিত্রটির ট্র্যাজেডি শেষ দৃশ্যে তিনি নিমেষের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে মনোজ্ঞ অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন অমর গাঙ্গুলী, বলাই গুপ্ত, কালীপ্রসাদ ঘোষ, কুমার রায়, শান্তি দাস, দেবতোষ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু ও বিশ্বনাথ মিত্র।

আবহসঙ্গীত ভাববাহী। দুটি নাটকেই

উড়িষ্যার ছায়াবাণী প্রযোজিত "অমরা বাট" (পরিচালনা : অমর গাঙ্গুলী) চিত্রে গীতা দত্ত ও ঝর্ণা দাস।

ডি-লুক্স ফিল্মস-এর নতুন প্রয়াস "না" র নিয়মিত শুটিং আরম্ভ হয়েছে। পরে বর নামের পরিবর্তন হতে পারে। রাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনীর ত্তিতে চিত্রনাট্য তৈরী। নায়ক-নায়িকার মকায় আছেন ধর্মেন্দ্র ও শর্মিলা ঠাকুর। মোহন সায়গল ছবিটির পরিচালক। রোশন সংগীত পরিচালক।

পরিচালক কে এ আব্বাস এবং 'শেহর ঔর সপ্না' ছবির নায়ক-নায়িকা দিলীপরাজ ও সুরেখা কার্লোভিভ্যারি চলচ্চিত্র উৎসবে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেল। ওই উৎসবে "শেহর ঔর সপ্না" ভারতের প্রতি-যোগী চিত্র হিসাবে দেখানো হবে। ৪ঠা জুলাই উৎসব শুরু হচ্ছে।

* পাঠকের চোখে *

কেন্দ্রীয় অ্যাওয়ার্ড কমিটির বিচার

মহাশয়,

বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসো-সিয়েশন-এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীঅশোক-কুমার সরকার যে সময়োচিত মন্তব্য করেছেন, তা "দেশ" পত্রিকার 'রঙ্গজগৎ' বিভাগে লক্ষ করলাম। এই সাহসী মন্তব্যের জন্য আমরা সকলে শ্রীসরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমাদের মনঃক্ষোভের গোপন কথাটি তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সকলের সামনে প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হলে আমরা বাধিত হতাম।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দিতে গিয়ে ভারত সরকার প্রতিটি চলচ্চিত্রের মান সঠিক নির্ধারণ করেন কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এ ব্যাপারেও যদি 'রাজনীতির খেলা' এবং 'প্রাদেশিকতা' সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে, তা হলে আমাদের গভীর দুঃখ পেতে হয়। আমার বিনীত আবেদন, এর প্রতিকারের জন্য সমস্ত সাংবাদিকদের একতাবদ্ধ হওয়ার চরম লগ্ন আজ উপস্থিত। যাই হোক, যাঁরা চলচ্চিত্রকে ভালোবাসেন কিংবা যাঁরা সার্থক শিল্পকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে সদা উৎসাহশীল, তাঁরা সকলেই শ্রীঅশোককুমার সরকার এবং "দেশ" পত্রিকার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

ধনানী বাহুবলীন্দ্র,
তমলুক।

মুকুল

ফুটবলের আইনকানুনের সংক্ষিপ্তসারে এই সপ্তাহে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অপরাধগুলি সন্নিবেশ করা হচ্ছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে খেলার মধ্যে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের ঘটনা ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের চেয়ে খুব বিরল নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অপরাধে ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেওয়া হয়। আবার আইনের বিধান অনুযায়ী বহু রেফারী যথাযথভাবে ডিরেক্ট ও ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। রেফারীদের বিচার-বিবেচনার উপরই সঠিক সিদ্ধান্ত নির্ভর করে।

কিক-অফ, গোল-কিক এবং অফসাইডের জন্য দেওয়া কিক সব সময়ই ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক, অর্থাৎ এ-সব কিক থেকে সরাসরি গোল হয় না—এটা প্রায় সবারই জানা কথা। সুতরাং এইসব কিকের নির্দেশ দেবার সময় রেফারীর কোন সংকেত দেবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক করবার সংকেত দেবার সময় রেফারীকে বাঁশী বাজাবার আগে একখানি বাহু মাথার উপরে তুলে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের সংকেত জানাতে হয়।

ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অপরাধ

(১) বল ধরা অবস্থায় ড্রপ না দিয়ে গোল-কিপারের নিজ পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে ৪ পায়ের বেশী যাওয়া; (আইন—১২)

(২) গোলকিপারের হাতে বল থাকা অবস্থায় সেই বলে কিক করা বা কিক করার চেষ্টা করা; (আইন—১২)

(৩) বল নাগালের বাইরে অথচ বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ন্যায়সংগত চার্জ করা; (আইন—১২)

(৪) নিজে বল না খেলে দেহের যে-কোন অংশ দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের খেলার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা; (আইন—১২)

(৫) স্বপক্ষ খেলোয়াড়কে আঘাত করা; (আইন—১২)

(৬) স্বপক্ষ খেলোয়াড়ের উপর ভর দিয়ে বল হেড করা; (আইন—১২)

(৭) পেনাল্টি-কিক সামনের দিকে না মারা; (আইন—১৪)

(৮) অফসাইডে থেকে খেলায় অংশ গ্রহণ বা প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি করা কিংবা কোন সুযোগ নেওয়া; (আইন—১১)

(৯) বিপজ্জনকভাবে খেলা; (আইন—১২)

(১০) গোলকিপার বল ধরে নেই কিংবা প্রতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি করেন নি, এই অবস্থায় তাঁর গোল-এরিয়ার মধ্যে তাঁকে ন্যায়সংগত চার্জ করা; (আইন—১২)

(১১) গোলকিপার কর্তৃক বিপক্ষের পায়ে বল ছুড়ে দেওয়া, বিপক্ষকে ব্যঙ্গ করা, কিংবা বলের উপর বেশী সময় পড়ে থাকা; (আইন—১২)

(১২) অভদ্রোচিত আচরণ করা (রেফারী কিংবা খেলোয়াড়কে গালাগালি ইত্যাদি); (আইন—১২)

(১৩) কথায় বা কাজে রেফারীর সিদ্ধান্তে ভিন্নমত পোষণ করা; (আইন—১২)

(১৪) বার বার খেলার নিয়মভঙ্গ করা; (আইন—১২)

(১৫) কিক-অফ, ফ্রি-কিক, পেনাল্টি-কিক, কর্নার-কিক, গোল-কিক ও থ্রো-ইন নিয়মিত করার পর আর কারো স্পর্শের আগে 'কিকার' বা প্লেয়ারের দ্বিতীয়বার বল স্পর্শ করা; (আইন—৮, ১৩, ১৪, ১৭, ১৬ ও ১৫)

(১৬) কথায় বিপক্ষ খেলোয়াড়কে বিভ্রান্ত করা; (আইন—১২)

বিঃ দ্রঃ—কিক-অফ এবং গোল-কিক ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অন্তর্ভুক্ত।

(চিঠিপত্র)

শ্রীবিমলকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, স্টাটিস্টিক্যাল অফিস, দক্ষিণ-পূর্ব রেল, ক্যানিং স্ট্রীট, কলকাতা।

প্রশ্ন—ফুটবল খেলায় গোলকিপার নিজ গোল এরিয়ার মধ্যে গোলের মুখে বল ধরেছেন, সেই অবস্থায় প্রতিপক্ষের কোন খেলোয়াড় যদি ঐ গোলকিপারের বুকে বুক বাধিয়ে গোলের মধ্যে ঠেলে দেন, তবে কি আইনসম্মত গোল হবে?

উত্তর—না, আইনসম্মত গোল হবে না। কোন খেলোয়াড়ের বুকে বুক বাধিয়ে ঠেলে দেওয়া আইনসম্মত চার্জ নয়—পুশিং। আইনসম্মত চার্জ হচ্ছে—অতিমাত্রায় দৈহিক শক্তি প্রয়োগ না করে কাঁধ দিয়ে চার্জ করা। সুতরাং ঐ ক্ষেত্রে যে খেলোয়াড় গোল-কিপারকে বুক দিয়ে ঠেলে দেবেন, তাঁর বিরুদ্ধে ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দিতে হবে।

শ্রীমনোজিৎ ভট্টাচার্য, বালিন্দর, বর্ধমান।

প্রশ্ন—আমাদের এখানকার খেলার একটি ঘটনা বলছি এবং আপনার মতামতের জন্য চিঠি লিখছি।

আমাদের প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে খেলায় আমরা ২—১ গোলে পিছিয়ে ছিলাম। এমন সময় আমাদের রাইট-আউট বল নিয়ে ছুটে পাস দিলে বলটি আউটে চলে যায়। কিন্তু একজন দর্শক বলটা হাত দিয়ে ঠেলে মাঠের মধ্যে দিলে সেই বল গোল হয়। লাইন্সম্যান আগে বল আউট হবার সংকেত দেননি, রেফারী গোলের নির্দেশ দিলে লাইন্সম্যান বলেন, বল আগেই মাঠের বাইরে গিয়েছিল। ফলে রেফারী গোল নাকচ করে দেন। খেলার উপর ওখানেই যবনিকা পড়ে এবং আমরা প্রতিবাদ করি।

এখন প্রশ্ন, রেফারী এভাবে গোল নাকচ করতে পারেন কিনা এবং আমাদের প্রতিবাদ যুক্তিযুক্ত কিনা?

উত্তর—নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করলেই আপনি এর উত্তর পেতেন। আমার কাছে চিঠি লেখার প্রয়োজন ছিল না।

চিঠিতে আপনিই তো লিখেছেন, আপনাদের রাইট-আউটের পাস-করা বল মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং একজন দর্শক সে বলকে ঠেলে মাঠের মধ্যে দিয়েছিলেন। সুতরাং বল তো সেখানেই 'ডেড' হয়ে গিয়েছিল। সে বলে গোল হয় কি করে?

লাইন্সম্যান হয়তো মনে করেছিলেন, রেফারী ঘটনাটি দেখেছেন। তাই তিনি বল আউট হবার নির্দেশ দেননি। রেফারীর গোলের নির্দেশ দেবার সিদ্ধান্তে মনে করবার কারণ আছে—তিনি ঘটনাটি দেখেননি। পরে লাইন্সম্যানের নির্দেশে রেফারী ভুল সংশোধন করেছেন। রেফারীর এ ভুল সংশোধনের অধিকার আছে।

যাই হোক, রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রতিবাদ চলে না। খেলার পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

ব্লাউজের রাজ্য
ব্লাউজ মিউজিয়াম

মেয়েদের যাবতীয় পোশাকের
অর্ডার নেওয়া হয়

আরতী

স্নো ও পাউডার

শ্রেষ্ঠ প্রসাধন ও অংগরাগ

দারুণ গ্রীষ্মে আপনাকে দেবে
স্নিগ্ধ সজীবতা

আরতী প্রোডাক্টস্,
কলিকাতা-৩৬

ধবল আরোগ্য

LEUCODERMA CURE

বিস্ময়কর নবআবিষ্কৃত ঔষধ দ্বারা শরীরের যে কোন স্থানের শ্বেত দাগ, অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, বাত, পক্ষাঘাত, একজিমা ও সোরাইসিস রোগ দ্রুত-নিরাময় করা হইতেছে। সাক্ষাতে অথবা পত্রে বিবরণ জানুন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর, প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোনঃ ৬৭-২০৫৯। শাখা—৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র

বর্ষার জন্যে তৈরী থাকতে দরকার

অ্যাঞ্জিয়ার্স ইমালশন

আসন্ন বর্ষায় সুস্থ থাকাটাই একটা সমস্যা। আর্দ্রতা বৃদ্ধির ফলে সর্দি-কাশি, গলাব্যথা, হজমের গোলমাল ইত্যাদির একটা ঢেউ বয়ে যায়। আপনি কিন্তু অ্যাঞ্জিয়ার্স ইমালশন খেয়ে বর্ষার জন্যে তৈরী থাকতে পারেন। খেতে সুস্বাদু অ্যাঞ্জিয়ার্স দেহকে চাঙ্গা করে, আপনার প্রতিরোধশক্তি গ'ড়ে তোলে ও সারাবছর আপনাকে সুস্থ রাখে!

অ্যাঞ্জিয়ার্স ইমালশন শ্লেষ্মা তরল করে ও বুকের ভার লাঘব করে। একটি চমৎকার টনিক, এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যে দুর্বলতা দেখা দেয়, তা দূর করতে এটি সাহায্য করে।

অ্যাঞ্জিয়ার্স

নিরাময় অপেক্ষা প্রতিষেধক শ্রেয়!

সোল ডিস্ট্রিবিউটার্স : হারবার্টসন লিমিটেড, গ্রিভেন্স হাউস, ৫, ডালহৌসি স্ট্রীট, কলিকাতা-১

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রী পি. কে. রায়

আপনি কি চুল ওঠার পাল্লায় পড়েছেন?

বিপদের সঙ্কেত এইসব লক্ষণ থেকেই বুঝতে পারবেন

মাথায় খুস্কি হওয়া
প্রায়ই অনেকের মাথায় খুস্কি দেখা দেয়, কখনোই তা অবহেলা করা উচিৎ নয়।

চুল পাত্‌লা হওয়া
চুল ক্রমে ক্রমে উঠে যাচ্ছে তার গোড়ার প্রাণশক্তি যোগাবার মূলতত্ত্বের অভাবে।

অকালে টাক পড়া
এমন দুরবস্থার কবলথেকে অনেক ক্ষেত্রেই রেহাই পাওয়া যেত ---

যদি চুল উঠ্‌তে বা পাত্‌লা হ'তে শুরু করে থাকে তবে আজ থেকেই পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করতে আরম্ভ করুন। চুলের গঠনের জন্যে যে আঠারোটি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয় পিওর সিলভিক্রিনে আছে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস। মাথার তালুতে মালিশ ক'রে দিলেই পিওর সিলভিক্রিন চুলের গোড়ায় গিয়ে জোগায় চুলের জীবনদায়ী সেই স্বাভাবিক খাদ্য যার দরুন সে স্থায়ী স্বাস্থ্যের শক্তিতে পুনর্জীবীত হয়।

"অল্ অ্যাবাউট হেয়ার" (All About Hair) এই নামের বিনামূল্যে চিত্রিত এক পুস্তিকা যদি আপনি চান তো লিখুন ডিপার্টমেন্ট E-1. সিল্‌ভিক্রিন অ্যাডভাইসরি সার্ভিস, পোষ্ট ব্যাগ-১০০২২, বোম্বাই-১

পিওর সিলভিক্রিন
চুলের যেকোনো দুর্যোগে দুর্ভোগে চিকিৎসায় উপযুক্ত পরিচর্যার নির্যাস।

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং
সারাদিন চুল পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ক'রে রাখে। চুলওঠা রোধ করার পক্ষে মুখেই পিওর সিলভিক্রিন এতে থাকে।

Silvikrin

সিলভিক্রিন — সুস্থ চুলের সঠিক উপায়

SPIP|6|64

৩১ বর্ষ ॥ ৩৪ সংখ্যা ॥ ৪০ পয়সা
শনিবার, ১৩ আষাঢ়, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ
Saturday, 27th June, 1964

সরকারী খাদ্যনীতি

বৈষ্ণব কবিতায় বলেছে, তিল তুলসী দিয়ে তোমার পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছি, দয়া করে আমায় ত্যাগ করো না। কথাটা অবশ্য ভক্তপ্রাণ বৈষ্ণবের, দাতাও ইহকালের সুখসুবিধার ভিখারী নয়। এ-কালে আমাদের মতন সাধারণ মানুষের ভক্তি যেমনই থাকুক, জীবনের নিত্য প্রয়োজনগুলোর প্রতি উদাসীন হওয়া সম্ভব নয়: এমন কথাও ভুলে থাকা চলে না যে, আমাদের ক্ষুধা আছে, সংসার প্রতিপালন আছে, রোগ আছে, দুঃখশোক রয়েছে। তবু দেখা যায়, আমরা উপায়-হীন প্রার্থীর মতন যেন সব কিছু রাষ্ট্রের পায়ে সঁপে দিয়ে বসে আছি। অন্তত এ-কথা অস্বীকার করা যায় না, খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা ইত্যাদি—জীবনের চাহিদাগুলির অভাব মোচনের জন্যে আমরা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী।

রাষ্ট্র একটা জটিল যন্ত্র যে তাতে সন্দেহ নেই; তার হাতে কেবলমাত্র ক্ষমতা আছে তা নয়, অনেক রুদ্ধঘরের চাবিও আছে। তথাপি রাষ্ট্রকে দশভুজার মতন সর্বকর্মে মঙ্গলা ও পরিত্রাতা মনে করা সুবুদ্ধির কাজ নয়। তার হাত হয়ত দশেরও অধিক, কিন্তু দশের অধিক হাত থাকলেই তাকে সর্ববিষয় পারদর্শী মনে করার কারণ নেই; রাক্ষসরাজ রাবণ দশ-মুখ বিশ হাত নিয়েও অহিত কিছু কম করেন নি।

একটা কথা উঠেছে, দেশে খাদ্যশস্য নিয়ে যে-রকম বর্গীর কান্ড চলছে তাতে হয়ত অচিরেই সরকারকে খাদ্যশস্য সম্পর্কে একটা কঠিন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, আর সে-ব্যবস্থা হবে সরকারী নিয়ন্ত্রণগোছের।

দেখা যাচ্ছে, সরকার এবং খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা জোরালো বিরোধ বেধেছে। এই বিরোধ অনেক আগেই বাধা উচিত ছিল। খাদ্যসংকট বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ত আজকের ঘটনা নয়। আর সরকারও কিছু কম সাবধানবাণী শোনান নি বণিককুলকে। তবে এ অবস্থা কেন আজ? সোজা কথা, অধর্ম ধর্মের বাণী শুনতে নারাজ।

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী সম্প্রতি সারা ভারত খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী সমিতি সঙ্ঘের ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে এক আলোচনা করেন। তাতে তিনি বলেছেন, এবারের শস্য উৎপাদন ভাল, বিশেষ করে চালের উৎপাদন গত বছরের চেয়ে ভাল ত বটেই, এমনকি ১৯৬১ সালের চেয়েও সামান্য ভাল (১৯৬১-কে উৎপাদনের ভাল বছর ধরা হয়)। অথচ, দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন ভাল হওয়া সত্ত্বেও মূল্যমান ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে; গত জানুয়ারীতে যা ছিল ১২০, এখন তা ১৩০—১৩২-এ দাঁড়িয়েছে, এবং আরও বাড়তে চলেছে।

ব্যবসায়ী সমিতি সঙ্ঘ অবশ্য সরকারী হিসেব মেনে নেন নি; তাঁদের বক্তব্যঃ প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেশ কম। উৎপাদন কম বলেই মূল্য-বৃদ্ধি ঘটছে।

সরকারী হিসেব ও বক্তব্য এবং ব্যবসায়ী সমিতি সঙ্ঘের হিসেব ও বক্তব্য পরস্পরের বিরোধী। আমাদের হাতেও এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই যাতে এক পক্ষকে অনায়াসে দোষী সাব্যস্ত করতে পারি। এসব হিসেবপত্রের মধ্যে ঢুকলে তল পাওয়া ভার। সরকারও যেমন খাতাপত্রে অনেক আজগুবি হিসেব রাখেন, এক বলেন হয় অন্য, (যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উড়িষ্যার চাল পাবার ব্যাপার), তেমনি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ও দাম বাড়াবার বেলায় সব সময়েই শূন্য ভাঁড়ার দেখিয়ে থাকেন, এটা ব্যবসায়ী রেওয়াজ।

আপাতত মোটামুটি যা বোঝা যায় তাতে দেখি, দ্রব্যমূল্য স্ফীতির বহরটা দিনে দিনে এমনই বেড়ে গেছে যে, ভারতের সর্বত্রই একটা অসহিষ্ণুতার ভাব এসেছে; টানাপোড়েনের সাধারণ জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে, সরকারী প্রশাসনের ওপর মানুষ বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ। এর পরিণাম অদূর ভবিষ্যতে কি হতে পারে, তারই কিছুটা দুশ্চিন্তা যেন সরকারের মধ্যে দেখা দিয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরা যাক; স্বরাষ্ট্র দপ্তর এক গোপন রিপোর্ট দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নাকি সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছেন, অবিলম্বে রাজ্যের খাদ্যা-বস্থার প্রতি নজর রাখুন, নয়ত অচিরে রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হবে। মনে হয়, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের সর্ব প্রান্ত থেকেই এই ধরনের এক সাবধান-বাণী সরকারের কানে যাচ্ছে। সম্ভবত তারই কল্যাণে সরকার অনেকটা যেন স্বার্থবশে ও গা বাঁচাতে এবং জন-সাধারণের কাছে নির্দোষ রূপে প্রতিপন্ন হতে ব্যবসায়ীদের ওপর হুমকি দিচ্ছেন। সরকার এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই জোরালো সাম্প্রতিক লড়াই 'ঠাণ্ডা' না 'গরম' কে বলবে!

সরকার বনাম ব্যবসায়ীদের এই প্রচ্ছন্ন যুদ্ধের পরিণাম কি হবে তার আভাস দেওয়া উচিত হবে না। তবে আমরা এখন পর্যন্ত খুব আশ্বস্ত হতে পারছি না। কে জানে, আগামী ২৪শে জুন থেকে নয়াদিল্লিতে যে রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন হতে যাচ্ছে তার প্রস্তাবনা পর্বে মাটি কিছু নরম করে নেওয়া হচ্ছে কি না! যদি ব্যবসায়ীরা এই পর্বে কিছুটা ঢিলেঢালা হন, হয়ত আসন্ন সম্মেলনে খাদ্যশস্যের সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় অস্পষ্ট প্রস্তাবটি আর বিবেচনা করা হবে না। বা সাময়িকভাবে তার ওপর যবনিকা পড়বে।

খাদ্যশস্যের সরকারী নিয়ন্ত্রণকে আপাতদৃষ্টিতে উপযুক্ত মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, সরকার নামক যন্ত্রটিকে যেসব জটিল যন্ত্র মারফত চলতে হয় সেখানে নানা গলদ, ফলে যন্ত্রটি চলতে শুরু করলে তার পরিণাম সুখকর হবে কি না তাতে সন্দেহ হয়। দুর্নীতি ও দায়িত্বহীনতার যে ঘুণ ধরে গেছে আমাদের প্রশাসনে, তাতে এমন আশা করা অসম্ভব, সরকার অন্নপূর্ণার ভূমিকা নিলে আমাদের ঘরে ঘরে অন্ন থাকবে।

তা ছাড়া নীতিগতভাবেও আমরা মনে করি, অসাধু ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে না পেরে সরকারকে বিকল্প পথ অনুসরণ করতে হচ্ছে, এর চেয়ে লজ্জার আর কি থাকতে পারে! চাল গম ইত্যাদি খাদ্য-শস্য জাতীয়করণ করলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? আমাদের অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির কি হবে? সেখানে মুনাফাবাজদের আটকাচ্ছে কে?

বস্তুত, সরকারী মতি যদি অনমনীয়, দৃঢ় ও যথাযথ হয় তবে এ-সব প্রশ্ন ওঠে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কথাই ধরা যাক, আজকের খাদ্যসংকটের সূচনা অতর্কিতে নয়, কিন্তু সমাধান বিষয়ে তাঁদের প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক। রাজ্য সরকার সম্প্রতি খাদ্য সংকট সমাধানে কিছুটা তৎপর। এই তৎপরতার ফলে কলকাতা ও বৃহত্তর এলাকায় ৬৫ লক্ষ লোক চাল গম পাচ্ছে, খোলা বাজারেও কয়েক দিন যাবৎ সরু চালের আবির্ভাব শুরু হয়েছে, মুদিখানার ঝাঁপ শেষ পর্যন্ত তিনদিন বন্ধ থাকে নি, এবং তেলের আগমনবার্তা যদিও শোনা যায় নি, তবু আশা করা যায় হয়ত কিঞ্চিৎ তৈল প্রদীপ জ্বালাবার জন্য জুটতে পারে শীঘ্র। আমরা নিরন্ধকারকেই ভয় করি, যদি দেখি সরকারী শুভবুদ্ধির প্রদীপটি জ্বলতে শুরু করেছে তাহলে বারে বারে আশা করি নিজগুণেই সেটি জ্বলুক।

নেহরুর প্রিয় কবিতা

রবার্ট ফ্রস্ট : Stopping by woods on a snowy evening

(১)

এই বন কার মনে হয় আমি জানি
যদিও কাছেই গাঁয়ে তার ঘরখানি
দেখবে না সে তো, থমকে বনের মাঝে
দেখছি আমি যে তুষারের আবরণী।

(২)

অবাক লাগছে ছোট্ট ঘোড়ার কাছে
কেন দাঁড়িয়েছি, গোলাঘরও নেই কাছে,
তুষারস্তব্ধ হ্রদ আর শুধু বন
তমিস্রতম বৎসরান্ত সাঁঝে।

(৩)

ঘণ্টাঘণ্টি দুলিয়ে ঝনন্ ঝন
প্রশ্ন জানায় ভুল করেনি তো মন?
আর যে শব্দ বাজছে আমার কানে
সে শুধু তুষার এবং মৃদু পবন।

(৪)

ঘন কালো বন যদিও মনকে টানে
প্রতিশ্রুতি যে রয়েছে অন্যখানে
বহু পথ আরো তারপর ঘুম প্রাণে
বহু পথ আরো তারপর ঘুম প্রাণে।

অনুবাদ : জগন্নাথ চক্রবর্তী

নকল মুক্তো ব্যবসায়ী হলে

সুনীল বসু

কারো কারো আজীবন নিষ্ফলতা, জলস্রোতে যায়,
অনেকে পারে না লাফে, পার হতে প্রেমের পাঁচিল।
পরাভবে হয়ে যায় অবশেষে উটের শামিল
অন্তদিনে তারা যায় হানিমুনে দূরে নায়েগ্রায়।

বিমান-বিধ্বস্ত রূপ আমি আজ, দগ্ধ সর্বদেহে
রাষ্ট্রদূত অফিসের নই কোন পদস্থ চাকুরে;
নকল মুক্তো-বিক্রেতা, যত বেপাড়ায় ঘুরে ঘুরে—
পারস্য যুবতীর ছানি কাটি চক্ষের সন্দেহে।

ভেবেছি অনেক আমি, চমরী গাইয়ের শুভ্র লোমে
অদ্ভুত ব্যবসা হয়, নক্ষত্রের খড়ি নীল স্লেটে
সিংহ ভালুক কেমন আঁকে রোজ ছক্ কেটে কেটে,
কাউকে শেখানো গেলে আয় হত মেঘের রেশমে।

প্রেম ছাড়া, বহু বস্তু ছিল আরও, বিমান-চালক—
হওয়া যেত চুনি-হীরে ব্যবসায়ী, নম্র মসনদে
বসে, পাখির চালানে যেত স্নান করা, নীল হ্রদে;
সুবিখ্যাত দর্জি হলে, ঢাকা যেত নগ্ন গাত্রত্বক।

আজীবন কারও যায়, জাহান্নামে, অথবা নিলামে
অথচ সুদৃঢ় চিত্ত মুষ্টিযোদ্ধা, হৃদয়ে নিরেট
জন্মদিনে উপহার দিয়ে হাসে দুর্লভ টি-সেট,
আমি শুধু খরস্রোতে ভেসে যাই ঝড়ার ঝিলামে॥

বৈদেশিকী

কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগ দেবার জন্যে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী শীগ্গিরই লণ্ডন যাত্রা করবেন। এই সম্মেলনের দিনস্থির যখন হয় তখন পণ্ডিত নেহরু জীবিত এবং তিনি লণ্ডন যাবার জন্যে প্রস্তুত হতেও শুরু করেন। তারপর অকস্মাৎ মৃত্যুর আঘাতে সব ওলট-পালট হয়ে গেল।

আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন করতেই হবে। সেই নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টির হেরে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। অনেকেরই ধারণা যে, আগামী নির্বাচনের উপর দৃষ্টি রেখে গবর্নমেন্টের প্রেস্টিজ বাড়াবার চেষ্টাতেই সার অ্যালেক হিউম এই সময়ে লণ্ডনে এই কমনওয়েলথ সমারোহের ব্যবস্থা করছেন। এই সন্দেহ, সমূলক হোক বা অমূলক হোক, দু'তিন মাসের মধ্যে বৃটেনে গবর্নমেন্ট পরিবর্তনের সম্ভাবনা যেখানে রয়েছে সেখানে ইলেকশনের পরে যিনি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হবেন—তিনি শ্রীহ্যারল্ড উইলসনই হোন বা সার অ্যালেক হিউমই থেকে যান—তার জন্যেই এই কনফারেন্স আহ্বানের কাজটা রেখে দিলে বোধহয় ভালো হোত। অবশ্য এই ব্যাপারে পুরোপুরি দায়িত্ব কেবল কনফারেন্সের আহ্বায়ক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীরই নয়; যাঁরা আমন্ত্রণ স্বীকার করেন তাঁদেরও দায়িত্বের কিছু অংশ আছে, কারণ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী অন্য কমনওয়েলথ মন্ত্রীদের মতামত নিয়েই সম্মেলনের তারিখ ঠিক করেন।

কমনওয়েলথ সম্পর্কীয় ব্যাপারে কনজারভেটিভ এবং লেবার পার্টির পলিসির মধ্যে এখনো কিছু পার্থক্য আছে এই বিশ্বাস অনেকের মনে আছে বলেই ঐ প্রশ্ন তোলা। তা না হলে ইলেকশনের সময়ের কাছাকাছি কেন, ইলেকশনের সময়ে কনফারেন্স হলেই বা কী? অবশ্য কারো কারো মতে কমনওয়েলথ জিনিসটার মধ্যেই এখন কোনো সার বস্তু নেই—এটা এখন একটা ভ্রান্তিমাত্র। কেউ কেউ বলেন ইলুশন, কেউ কেউ বা বলেন ফার্স। তবে ইলুশন বা ফার্সও যতদিন ধরে থাকা যায় ততদিন তার ফল আছে—সেটা সুফলই হোক বা কুফলই হোক। বলা বাহুল্য সত্যকে সত্য বলে ধরে নিয়ে চলা এবং ইলুশন বা ভ্রান্তিকে সত্য বলে ধরে নিয়ে চলা এবং ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলে জেনেও বাইরে তাকে সত্য বলে মানার ভান করে চলার ফল বিভিন্ন রকম হবে।

যাই হোক, কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনের অন্য ফলাফল যাই হোক বা না হোক একদিক দিয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে আসন্ন কনফারেন্সের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, এই কনফারেন্সে প্রথম বিদেশ ভারতের নূতন প্রধানমন্ত্রীকে দেখবে এবং তিনিও প্রথম বিদেশকে দেখবেন। পণ্ডিত নেহরু যতদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ততদিন বিদেশ তাঁকে যখন দেখত তখন তাঁকেই বেশী দেখত। তিনি যেন বিদেশের চোখে ভারতবর্ষকে খানিকটা আড়াল করে রেখে ছিলেন। বিদেশ

নেহরুজীকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বা প্রতিনিধিরূপে যতটা দেখত তার চেয়ে ভারতকে "নেহরুর ভারত" বলে বেশী দেখত। অথবা ঐরকম দেখার একটা ফ্যাশন হয়ে গিয়েছিল।

"গান্ধীর ভারতবর্ষ" বলেও একটা কথা চলিত ছিল কিন্তু তার অর্থ ছিল অন্য রকম। "গান্ধীর ভারতবর্ষ" যখন বলা হোত তখন গান্ধীজীকে "চিরন্তন" ভারতবর্ষের প্রতিনিধি মনে করেই ঐরূপ বলা হোত কিন্তু "নেহরুর ভারতবর্ষ" যাঁরা বলতেন তাঁরা নেহরুজীর ভারতবর্ষের উপর নিরঙ্কুশ শাসনক্ষমতার কথা মনে করে অথবা তাকে "নূতন" ভারতবর্ষের "নির্মাতা" বলে মনে করে অথবা এই দুই ভাবের সংমিশ্রণ করে ঐরূপ বলতেন।

"গান্ধীর ভারতবর্ষ" বা "নেহরুর ভারতবর্ষ" প্রভৃতি বাক্যের চল যাঁরা করেছিলেন তাঁরা "শাস্ত্রীর ভারতবর্ষ" বলবেন না। অন্ততপক্ষে আপাতত নয়। লালবাহাদুরজীকে "চিরন্তন" ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলে বা "নূতন" ভারতের "নির্মাতা" বা নিরঙ্কুশ কর্তা বলে কেউ মনে করবে না। কোনো গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রী যে অর্থে সেই দেশের প্রতিনিধি, কেবল সেই অর্থেই লালবাহাদুরজীকে বিদেশ ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলে দেখবে এবং তাঁর সেই প্রতিনিধিত্বেরই প্রথম পরিচয় বিদেশ পাবে এই আসন্ন কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের রঙ্গমঞ্চে।

এটা নয় যে, শ্রীলালবাহাদুরকে বিদেশী রাজনৈতিক নেতারা কেউ জানেন না। ইতিমধ্যে পৃথিবীর অনেক রাজনৈতিক নেতা দিল্লিতে লালবাহাদুরজীর সঙ্গে পরিচয় করে গেছেন এবং বলা বাহুল্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা দিল্লি থেকে তাঁদের স্ব স্ব গবর্নমেন্টের কাছে লালবাহাদুরজীর সম্বন্ধে যা কিছু খবরাখবর দেওয়া সম্ভব দিয়েছে এবং দিচ্ছেন। কিন্তু আজকালকার দিনে রাজনৈতিক সফলতা কেবল ঘরের কাজের উপর নির্ভর করে না, রঙ্গমঞ্চের ঘটনার উপরও নির্ভর করে, কারণ "ইতরজন" রঙ্গমঞ্চে যা ঘটে তাই কেবল দেখতে পায় এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারীকেও "ইতরজনকে" মুগ্ধ করে তাদের "প্রতিনিধি" হয়েই কর্তৃত্ব চালাতে হয়। এই সব কনফারেন্স হচ্ছে সেই রঙ্গমঞ্চ। অবশ্য লণ্ডনের এই কনফারেন্সে কেবল কমনওয়েলথ-এর প্রধানরাই উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু সেখানকার কোন্ ভূমিকা কী রকম স্টাইলে প্রকাশ পায় সেটা পৃথিবীর অন্যেরাও দূর থেকে লক্ষ্য করবে।

লালবাহাদুরজীর ভীত হবার কোনো কারণ নেই—যদি তিনি সর্বদা স্মরণ রাখেন যে, তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন, পণ্ডিতজীর স্থান পূরণ করতে আসেননি। গান্ধীজী ভারতের ছিলেন বলে পণ্ডিতজীর যেমন সুবিধা হয়েছে—গান্ধীজীর জীবন ভারতবর্ষকে যে প্রেস্টিজ দিয়েছে সেই প্রেস্টিজের অংশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহরুজীর যেমন কাজে লেগেছিল, তেমনি নেহরু-সেযাপন্টে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে লালবাহাদুরজীরও সুবিধা আছে। তিনি নেহরুজীর স্থান নিতে বা নেহরুজীর অনুকরণ করতে আসেননি, তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন, এই কথা যদি তিনি মনে রাখেন তবে তিনি নেহরুজীর সঙ্গে নিজের তুলনা করতে যাবেন না এবং অন্যদেরও সেই তুলনা করার বেশি অবসর দেবেন না।

তুলনা অবশ্য লোকে করবে, তার জন্যে কেউ কেউ হয়ত লালবাহাদুরজীর আসনের পিছনে নেহরুজীর ছায়ামূর্তি কল্পনা করে নেবে, কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ চলবে না যদি লালবাহাদুরজী নিজেকে একান্তভাবে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলেই মনে করে চলতে পারেন। তাঁকে মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নেহরু তিনি নন, দ্বিতীয় নেহরু হবার জন্যে তিনি নির্বাচিতও হননি, তিনি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সেদিক দিয়ে তাঁর পদের দায়িত্ব ও মর্যাদার উৎস ভারতবর্ষ। সেদিক দিয়ে ভারতবর্ষ যা দিতে পারে তাই তাঁর হবে, সেদিক দিয়ে ভারতবর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যা দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের মধ্যেও হবে না।

দুটি জিনিসের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে যাতে লালবাহাদুরজীর মনে বল দেবে। বিজ্ঞান জগতে ২৬ বছরের যুবক শ্রীজয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকরের যে-যশোলাভ ঘটল তাতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হয়ে এখন বিদেশে যেতে মনে একটা বিশেষ আনন্দ বোধ হবে। দেশের স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিকগণ কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ দেখান নি তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে কাজ চলছে, কোনো কোনো ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বিদেশেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজও করছেন জানি, কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে ভারতীয়ের নাম শ্রীমান জয়ন্ত নারলিকরের কাজের দ্বারা যেমন ঘোষিত হ'ল এমন অনেকদিন হয়নি। আজ জওহরলালজী বেঁচে থাকলে তাঁর কী আনন্দই না হোত!

দ্বিতীয়ত, পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী কাইরনের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শক্তির যে জয় দেখা গেল তাতে ভারত গৌরববোধ করতে পারে। কাইরন এবং "দাশ" কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ হয়ত আরো সুষ্ঠু পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারতেন, কিন্তু একটু আধটু ভুল ত্রুটি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা ঠিক পথই নিয়েছেন। লালবাহাদুরজীর প্রধানমন্ত্রী হবার পরে গণতান্ত্রিকতায় ভারতবর্ষের সাবালকত্ব, অন্ততপক্ষে প্রায়-সাবালকত্ব, প্রমাণিত হয়েছে। এই ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব এবং গৌরব সম্পর্কে সচেতন থাকলে লালবাহাদুরজীর সাহসের অভাব হবে না।

২২।৬।৬৪
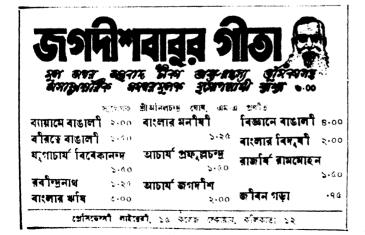
'কলেজ রহস্য'

সরকারী টাকার অব্যবস্থায় কয়েকটা কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে—খবরটা পড়েই ফোন করলুম অধ্যাপককে।

তাকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না। অধ্যাপকিনী জানালেন, একটু আগেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেছে সে।

নিশ্চয় চাকরির খোঁজে বেরিয়েছে, শেয়ার-মার্কেটেই ধাওয়া করেছে কিনা কে বলবে!

জনপ্রিয় অধ্যাপক (১)
গান জানেন স্যার?

এর মধ্যে আবার আমার গৃহিণী এসে সর্ষের তেলের জন্যে ঘ্যানঘ্যান করছিলেন, তাঁকে সেদ্ধ ভাতের হাইজিনিক তত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়ে, আমি কলেজগুলোর কথাই চিন্তা করতে লাগলুম।

এখানেও সেই ডায়ার্কি—তার মানে ইয়ার্কি একটু আছেই। কিছুক্ষণ মন্দ লাগে না, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই ধৈর্য রাখা মুশকিল হয়।

ব্যাপারটা প্রণিধান করুন। সরকার বললেন, কলেজ তো নয়, এক একটি ভেড়ার গোয়াল। পড়াশুনো ছাড়া সব হয়। অতএব দেড় হাজার (দেড় হাজারই তো?) লিমিট। ডেফিসিট যা হবে আমরা দেব।

'সাধু ভক্তে'। অ-স্পনসর্ড কলেজের আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু গোল বাধল হিসেবে। কলেজ হিসেব পাঠায়, সরকারী অডিটের সেটা পছন্দ হয় না; অতএব টানা-হ্যাঁচড়া করতে করতে টাকা বেরোয় সাত আট মাস পরে।

ধরুন, কলকাতার একটা বড়ো কলেজে স্টাফ স্যালারি মাসে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। ক্রমিক ছাত্র-নিয়ন্ত্রণের ফলে ফী কালেকশন থেকে অর্ধেকও ওঠে না, তা-ও ছেলে-মেয়েদের কাছে বাকি পড়ে। কিন্তু স্টাফের মাইনে তো মাসে মাসেই মিটিয়ে দিতে হয়। অগত্যা প্রথমে রিজার্ভ ফান্ডে হাত পড়ল, তারপর প্রভিডেন্ট ফান্ড, ততঃ ধার-দেনা, অতঃপর—

অতঃপর এতদিন কোনোমতে চালিয়ে এখন সম্পূর্ণ ডেড লক। হয় সরকারী টাকা নিয়মিত এবং দ্রুততর গতিতে আসুক, নইলে এইখানেই আমরা ঝাঁপ বন্ধ করব।

সরকারী টাকা কিভাবে আসে, আমার ঠিক জানা নেই—সে টাকা আমি কখনো পাইনি। তবে অনুমান করি, পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কও সরকারী ব্যাপার এবং একবার সেখান থেকে পঞ্চাশ টাকা তুলতে গিয়ে আমাকে যে একান্নটা সই দিতে হয়েছিল—সে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাটি আমার অবিস্মরণীয়। আমার কোনো আত্মীয় বিলের কী খুঁটিনাটির জন্যে আজ সাত বছরেও তাঁর টি-এর তিন শো তেরো টাকা আদায় করতে পারেননি, এখনো সরকারী দপ্তরে যাওয়া-আসা এবং করেসপন্ডেন্স চালিয়ে যাচ্ছেন। কর্মযোগী লোক!

অতএব আট মাসে টাকা পেলে তো কলেজগুলোর ভাগ্য ভালো। তাঁরা মিথ্যেই অভিমান করছেন।

জনপ্রিয় অধ্যাপক (২)
—পরীক্ষার আগে কিছু সাজেস্‌সান

কলেজের কর্তারা আর একটি বিকল্প প্রস্তাব দিচ্ছেন। সরকার টাকা যদি না-ই দিতে পারেন, তাঁরা অবাধ ছাত্র ভর্তির অনুমতি দিন।

অবাধ ছাত্র ভর্তি! আহা—সে মনোরম দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না।

মনশ্চক্ষে একটি ক্লাস-রুম প্রত্যক্ষ করুন। যে ঘরে এক শো ছাত্র বসতে পারে, সেখানে শ দুই হাজির আছে। পার্সেন্টেজ নিয়ে কিছু পালাবার পরেও যারা রইল, তারা যেন এয়ার টাইট প্যাকিং বাক্সে ঠাসা। জনপ্রিয় অধ্যাপকের ক্লাস হলে এরই মধ্যে আবার কিছু দাঁড়িয়েও রয়েছে। কর্তৃপক্ষকে নালিশ জানানো বৃথা,

জনপ্রিয় অধ্যাপক (৩)
অধ্যাপকের বাড়ি গিয়ে পার্সেন্টেজ আদায়

তাঁরা তৎক্ষণাৎ বলেন, 'ট্রান্সফার নাও।'

জনপ্রিয় অধ্যাপক অবশ্য দুরকম আছেন। এক দলের অধ্যাপক ক্লাসে বক্তৃতা করেন, ছাত্রেরা স্তব্ধ হয়ে শোনে; অপর দলের ক্লাসে ছাত্রেরা ভ্যারাইটি পারফর্ম্যান্স করে—অধ্যাপক মুগ্ধ চিত্তে দেখেন এবং শোনেন।

(বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, একদা আমিও মাস কয়েক অধ্যাপনার চেষ্টা করেছিলুম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আমার জনপ্রিয়তা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে—কিন্তু সেসব কথা এখন থাক।) বিশেষভাবে এই দুই নম্বর জনপ্রিয়দের ক্লাসে স্থানাভাব ঘটলে ছাত্রদের ক্ষুব্ধ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং একবার কলকাতার কোনো কলেজে অধ্যাপকের চেয়ারের পেছনে ছোট সাইজের একটি 'অ্যাটম বম' ফাটিয়ে, সে ভদ্রলোককে ধরাশায়ী করে—বেশ একটি 'লাউড প্রোটেস্ট'ও জানানো হয়েছিল।

আর ল্যাবরেটরী? সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তাকে 'টেস্ট টিউব' মনে করতে বলার রসিকতাটাকে কি নিছক গল্প বলে ভেবেছেন নাকি? কশন-মানি এবং বেশী মাইনের জন্যে পাইকারী হারে ভর্তি—তারপর? একটি বুনসেন্‌স্ বার্নারে একসঙ্গে ক'জন ছাত্রকে কাজ করতে হয়—জানেন কি? জানেন না? না জানলেই সুখে থাকবেন।

অবাধ ছাত্র ভর্তি আবার চালু হলে এক দিক থেকে সুবিধেই হবে—সন্দেহ নেই। তখন এক শো জনের ক্লাসে তিন শো ছাত্র স্বচ্ছন্দে ভর্তি হতে পারবে, বেতনের তৈলধারা (সরিষাজাত দুর্লভ হলে কি হয়) অজস্র ধারায় উৎসারিত হবে এবং তৈলনিষিক্ত হয়ে কলেজের গাড়ী গড়গড়িয়ে এগিয়ে যেতে থাকবে। আর মুগ্ধ বিমুঢ় 'জনপ্রিয়' অধ্যাপক নিজের চেয়ারটিতে বসে ক্লাসসুদ্ধ ছেলের হুলাহুলা নাচ এবং রক-এন-রোল দেখতে দেখতে অকস্মাৎ একটি বোমার শব্দে ভূপতিত হবেন।

ছাত্রের বদলে বেঞ্চিকেও অনেক সময় পড়াতে হয়

ছাত্র-নিয়ন্ত্রণ নিশ্চয় দরকার। কিন্তু কলেজ চালাবেন বেসরকারী কর্তারা আর টাকা দেবেন সরকার- এই দ্বৈত-শাসনতন্ত্রে যা ঘটবার তাই ঘটছে। দুই আর দুইয়ে চার-ই হয়—ছয় হয় না।

সরকার চান, বিদ্যার ফসল হোক, অথচ জমিতে তাঁরা ঠিকমত সার দেবেন না; আর সেই জমিকে যাঁরা সদ্ব্যবহার করতে জানেন, তাঁরা করবেন কাঁটা গাছের চাষ! খাসা!

কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন, সমস্ত কলেজগুলোই সরকার নিয়ে নিন।

আমি বলি, এই প্রস্তাবই সবচেয়ে ভালো; কারণ, সম্প্রতি দেখছি, সরকার যাতে হাত দেন তা-ই উধাও হয়ে যায়। চাল-তেল-মাছ—সব সেই সরকারী ইন্দ্রজালে ভ্যানিশ—পি সি সরকারের ইন্দ্রজালের চাইতেও তা দুর্ধর্ষ!

সুতরাং সরকার হস্তক্ষেপ করলেই কলেজ রাতারাতি অদৃশ্য—ছাত্রের দল চকিতে দিগ্বিলয়ে বিলীন, মুহূর্তে সব সমস্যার সমাধান। তারপর কলেজ ডুব দেবে কালো বাজারে, অধ্যাপকেরা পড়ানোর ব্ল্যাক-মার্কেটে পাঁচ গুণ (নাকি তের বেশী?) উপার্জন করবেন, উচ্চারণ করবেন স্বস্তিমন্ত্রঃ ওঁ সহনাববতু সহ নৌ ভুনক্তু—ইত্যাদি ইত্যাদি। আর কি চান?

মহামানব কেনারাম ও ক

বনফুল

কেনারামকে বিধুভূষণ বারণ করেছিল। বলেছিল, তোমার বাড়ির বারান্দায় রোজ 'ক' এসে বসছে কেন। ওকে বেশী আসকারা দিও না। ওরা সাংঘাতিক জাত!

সকলেই জানে কেনারাম উদার-হৃদয় লোক। একটা উঁচুদরের হাসি মুখে ফুটিয়ে সে বললে—তুমি জাত তুলে কথা কও কেন। আমাদের জাতের মধ্যেই কত সাংঘাতিক লোক আছে তা জান? বিধুভূষণ হাত জোড় করে বলেছিল, ভাই তুমি মহাপুরুষ তা জানি। কিন্তু 'ক'-কেও জানি, তাই বন্ধু হিসাবে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি নতুন বিয়ে করেছ, বউটিও সুন্দরী! একথা শুনে কেনারামের নাকটা কুঁচকে থরথর করে কাঁপতে লাগল। বিধুভূষণের মতো লোক যে এতদূর অশ্লীল হতে পারে তা তার কল্পনাতীত ছিল, তাই চট করে তার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না। নাকটাই ঘৃণা প্রকাশ করবার জন্যে থরথর করে কাঁপতে লাগল। বিধুভূষণ চলে গেল মুচকি হেসে।

দিন পনেরো পরে বিধুভূষণের নজরে পড়ল 'ক' কেনারামের বারান্দা থেকে বৈঠকখানায় ঢুকেছে। কেনারামের দামী সোফায় বসে ছুঁচলো দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে তাই করছে শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে বিশ্রম্ভালাপ। বিধুভূষণের মনে হল—এই রে সেরেছে। বিধুভূষণও ঢুকে পড়ল বৈঠকখানায়। ঢুকে দেখল, 'ক' পান চিবুচ্ছে চবর চবর করে আর বলছে—আপনার বউ যে এমন সুন্দর পান সাজতে পারে তা কে জানত! অপূর্ব, অদ্ভুত। এ যেন পান নয়, গজল।

বিধুভূষণ আবার মনে মনে বলল—এই রে সেরেছে।

কেনারাম বিধুভূষণকে দেখিয়ে বলল—আমার বন্ধু বিধু আপনাকে ভয় করে। ওর মনের গঠন এমন বিশ্রী যে সন্দেহ কিছুতে ঘুচতে চায় না ওর প্রাণ থেকে।

বিধুভূষণ হেসে বললে—আমি মহাপুরুষও নই, পাথরও নই। আমি রক্ত-মাংসের সাধারণ মানুষ। তাই ভয়ও করি, সন্দেহ ঘুচতে চায় না। রাগ দুঃখ সবই আছে আমার।

'ক' দুলে দুলে হেসে হেসে বলতে লাগল—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ। মনে প্রেম জাগান, প্রেম জাগলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। হেঁ হেঁ হেঁ...প্রেমই আসল চিজ। এ শুনে বিগলিত কেনারাম কুণ্ডুর মুখভাব মাখন-মাখানো পাঁউরুটির মতো হয়ে গেল। বিধুভূষণ আর একবার মনে মনে ভাবল—এই রে, সেরেছে!

দিন দশেক পরে কেনারামের সঙ্গে আবার দেখা হল বিধুভূষণের। রাস্তার মোড়ে। কেনারামের হাতে একটি খাসির রাং।

কেনারাম। এই যে বিধুভূষণ। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আজ রাত্রে আমার বাড়িতে খেও। আমার বউ কোর্মা রাঁধবে, আর 'ক' করবে "সামী" কাবাব।

বিধুভূষণ। কি রকম? হঠাৎ এ-সব কেন?

কেনারাম। ভাই বিধু, 'ক' যে কত ভালো, তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। সে আমার স্ত্রীকে একটা দামী শাল উপহার দিয়েছে, আমি মানা করলাম, তবু শুনল না। তুমি যদি আজ এস, তাহলে দেখবে কি রকম দামী শাল আর কি চমৎকার তার কাজ। সে বললে, এটা আমার প্রেমের উপহার, তুমি আমাকে বাধা দিও না। আমি আর বাধা দিতে পারলাম না।

বিধুভূষণ। দেখ কেনারাম, তুমি যে একজন মহামানব, তা আগে জানতাম, কিন্তু তুমি যে নপুংসক, এটা আমার জানা ছিল

না। ক একজন নারী-ধর্ষণকারী গুণ্ডা, এ-কথা কি তোমার জানা নেই? থানার দারোগা সাহেবের কাছে গেলেই সব জানতে পারবে। তিনি প্রমাণ পেলে ওকে গ্রেপ্তার করতেন, কিন্তু পুরো প্রমাণ পান নি। কিন্তু তাঁর ঘোর সন্দেহ—

কেনারাম। দেখ বিধু, আমার পিসতুতো শালার মাসতুতো ভাই একবার নারীধর্ষণ করেছিল, কিন্তু তাই বলে আমি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করতে পারিনি। কখনও পারব না। চাঁদে কলঙ্ক আছে, সূর্যেও স্পট আছে, ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিও না। ভালো দিকটা দেখ—

বিধুভূষণ। তুমি দেখ, আমি চললাম।

কেনারাম। রাত্রে তুমি খেতে আসবে কি?

বিধুভূষণ। না।

আরও মাসখানেক পরে। কেনারাম বাড়ি ছিল না। হঠাৎ সে বাড়ি ফিরে দেখে 'ক' এসেছে। 'ক'-য়ের ছড়িটি বৈঠকখানা ঘরের কোণে ঠেসান রয়েছে, কিন্তু 'ক' নেই। কেনারাম অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যা দেখল, তাতে তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। 'ক' তার শয়নকক্ষে ব'সে তার স্ত্রীর থুতনি ধরে আদর করছে। অন্য কেউ হলে চেঁচামেচি করত, জুতোপেটা করত, লাঠালাঠি করত। কিন্তু কেনারাম মহামানব। এ-সব কিছুই না ক'রে সে আবেগগদগদকণ্ঠে প্রতিবাদ করল শুধু।

বলল, ভাই ক, তোমার এ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করি আমি। পুঁটিবালা আমার বিবাহিতা পত্নী, তার গায়ে এভাবে হাত দেওয়া বেআইনী। এ-কাজ তুমি আর কোরো না। ভেবে দেখ, এটা কি সঙ্গত?

এর উত্তরে ক যা বলল, তাতে হকচকিয়ে যেতে হ'ল মহামানবকে।

ক বলল, বন্ধু কেনারাম, কয়েকটা ভুল সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে পুঁটিবালাকে তুমি বিয়ে করেছ, তা মানি। কিন্তু ওই নজিরেই যে তুমি পুঁটিবালাকে চিরকাল দখল ক'রে থাকবে, এটা আমি মানব না। আধুনিক সভ্যসমাজের মহামানবেরা কেউ এ-কথা মানবে না। তুমিও একজন মহামানব, তোমাকে এ-কথাটা চিন্তা ক'রে দেখতে অনুরোধ করি। এ-সব ব্যাপারে পুঁটিবালার মতই তোমাকে মানতে হবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার যুগ এটা!

যে অবস্থায় রয়েছে তা অবর্ণনীয়
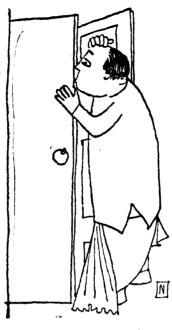
এই বলে নাটকীয় ভঙ্গিতে ক বেরিয়ে গেল। পুঁটিবালা পিছন ফিরে ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শুধু। বারংবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও সে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করল না।

অন্য কেউ হলে চুলের ঝুঁটি ধরে চাবকাত তাকে। কিন্তু কেনারাম মহামানব। ভ্রূ কুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তার আর গত্যন্তর ছিল না। তাই রইল সে।

আরও মাস দুই পরে। সেদিনও কেনারাম বাড়িতে ছিল না। ফিরে এসে দেখল ক এসেছে। বস্তুত ক রোজই আসত। প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে আসা বন্ধ করেনি। লাঠিটি যথারীতি বৈঠকখানার কোণে ঠেসান আছে। সেদিন কিন্তু কেনারাম বাড়িতে ঢুকে যা দেখল, তাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়তে হল তাকে। সে দেখল ক শুধু যে তার শয়নকক্ষে রয়েছে তাই নয়, বিছানায় উঠে বসেছে এবং সে আর পুঁটি যে অবস্থায় রয়েছে, তা অবর্ণনীয়।

কেনারাম বলল, ভাই ক, তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, তোমাকে আপনজন ব'লে বুকে টেনে নিতে চেয়েছিলাম, এই কি তার প্রতিদান?

কেনারামের মনে হল 'ক' এ-কথা শুনে যেন মরমে মরে গেল। তার মনে হল, তার অন্তরে অনুশোচনার মেঘ দেখা দিয়েছে। যা আপাতদৃষ্টিতে হাসি ব'লে মনে হচ্ছে, তা হাসি নয়, লজ্জা।

এই উপলব্ধি হওয়ামাত্র তার সব রাগ জল হয়ে গেল। মহামানবসুলভ আনন্দে সে যে লোকে গিয়ে হাজির হল, তা ভূগোলে নেই।

পরদিন পুঁটিবালা অন্তর্ধান করলো। 'ক'-কেও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

এর পরের ঘটনা বিধুভূষণের মুখে একদিন শুনেছিলাম।

বিধুভূষণ বলল, কেনারাম তার যথা-সর্বস্ব বিক্রি করে চৌমাথার কাছে এক-টুকরো জমি কিনেছে। সে জমির উপর সে একটি উঁচু মর্মরবেদী বানাবে, আর সেই মর্মরবেদীতে উঠে সে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা তারস্বরে হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজীতে যে বাণীটি ঘোষণা করবে, তার সারমর্ম হচ্ছে—'অপরের দোষ দেখিয়া নিজের দোষের কথা ভুলিও না। 'ক' চরিত্রহীন গুন্ডা, কিন্তু আমি এ-কথা ভুলিতে পারি না যে, আমার পিসতুতো শালার মাসতুতো ভাইও তাই। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, সূর্যেও স্পট আছে। গোলাপে কণ্টক আছে, পঙ্কজিনীর জন্ম পঙ্কে। অপরের বীভৎস আচরণ দেখিলে বারবার এই কথাই আওড়াইবে যে, আমরাও বীভৎস। তাহা হইলেই শান্তি পাইবে, সমস্যারও সমাধান হইয়া যাইবে! লোকে যদি তোমাকে 'ঘর জ্বালানে পর ভোলানে' বলে বলুক। লোকের কথায় কান দিও না। সত্যকে আশ্রয় কর।' এই এখন ঠিক করেছে কেনারাম। মহামানবদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।

অনেকদিন পরে কেনারামের একটি ডায়েরী পেয়েছিলাম। একটি অদ্ভুত খবর ছিল তাতে। ডায়েরীতে কেনারাম লিখেছে—আমি মহামানব। কিন্তু হায় আমাকে কেউ পোঁছে না। কিন্তু আমি ছাড়বার পাত্র নই। আমি যে মহামানব, তা আমি প্রমাণ করেই ছাড়ব। দেখি, লোকে আমাকে পোঁছে কি না।

কেনারাম এখনও পাগলাগারদের বাইরেই আছে।

শিখা অনির্বাণ

অজিতকুমার দাশ

লণ্ডন ৯ জুন ১৯৬৪

শ্রাকের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আশংকার শেষ হয়েছে। সংকটের বিহ্বলতা কেটেছে, কিন্তু সংশয় রয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন রুদ্ধ থাকার পর যে সুদীর্ঘ নিশ্বাসটা পড়ল, লালবাহাদুরকে প্রধান মন্ত্রিত্বের জন্য দলীয় মনোনয়নে সেটা ঠিক কিসের জানি না; তবে স্বস্তির নয়।

এই হল নেহরু-উত্তর ভারতবর্ষের প্রথম নায়কত্ব সম্পর্কে ভারত-বন্ধু পশ্চিমীদের বর্তমান মনোভাব। দু-কথায় প্রকাশ করতে হলে এই মনোভাবটিকে বলতে হয় 'দোলাচল মনোভাব।

ভুবনেশ্বরে প্রধানমন্ত্রীর প্রথম স্ট্রোকের পর প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর রোগ-ভোগের খবর নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। একটুও খবর যেন বাদ না যায়, একটুও ভুল না হয়, সংবাদ দেরিও না হয়; এই ছিল একমাত্র সাধনা। তারপর মাত্র চার মাস কাটার পর বহু সহস্র মাইল দূরে বিদেশে গিয়ে পশ্চিম-জার্মানীর রাজধানী বন শহরে পেলাম তাঁর মৃত্যুর সংবাদ। বড়ো অপ্রত্যাশিতভাবে পেলাম।

ভোরে বেরিয়েছি। গাড়িতে ওঠা মাত্র আমার জার্মান ছাত্র পথপ্রদর্শক বলল, একটু আগে রেডিওতে বলেছে নেহরুজীর আবার স্ট্রোক হয়েছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন। একি কথা! ছুটলাম আমাদের দূতাবাসে। তখন ওঁরা দূতাবাস বন্ধ করছেন। খবর এসেছে, সবশেষ হয়ে গেছে।

তারপরের কথা লেখা নিষ্প্রয়োজন। তবে একটা কথা কদিন পরে আজ মনে পড়ছে। বন শহরে সেদিন আবিষ্কার করলাম নেহরুর তিরোধানের শোক যতটা ভারতীয়, প্রায় ঠিক ততটাই বিশ্বজনীন। বিদেশের অপরিচিত জার্মানিদের সাহায্য ও সহযোগেই ওই শোক সহ্য করা সম্ভব হল।

ভারতীয় দূতাবাসে মৃত্যুসংবাদ ছাড়া অন্য কোনও বিবরণ তখনও আসেনি। ছুটে আসি নিজের সহকর্মীদের কাছে, ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল-এর বন অফিসে। ঝড়ের গতিতে লণ্ডন-ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে টেলিটাইপে খবর আসছে। এসেছিল আগে নেহরু অসুস্থ, স্ট্রোক হয়েছে অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন। সাতজন ডাক্তার পরামর্শ করে চিকিৎসা করছেন। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে অবস্থা আশঙ্কাজনক......।

এতদূর পর্যন্ত পর পর প্রেস টেলিগ্রামে সব দিল্লি থেকে আমার সহকর্মীরা পাঠাচ্ছেন। দিল্লি থেকে, যেমন কলিকাতা থেকেও, লণ্ডনের সঙ্গে রেডিও টেলিপ্রিণ্টার যোগ। বহু লাইন। কিন্তু খবর পাঠাবার লোক ও প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। দিল্লি থেকে ভারতীয় দূতাবাসগুলিকেও খবর দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং সব লাইন একত্রে ঝড়ের গতিতে চললেও প্রেস টেলিগ্রাফে দেরি হয়ে যাচ্ছিল।

মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাই দিল্লি লণ্ডনকে ফোন করল। মৃত্যুর শোকের বর্ণনা দিতে গিয়ে লণ্ডন বলছে—টেলিফোনে যখন নেহরুর মৃত্যু সংবাদ দিল্লি বলল তখন দিল্লীর টেলিফোন অফিসে যে মহিলা অপারেটর লাইন ধরে বসেছিলেন তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। "কি বললেন, আমাদের নেহরু? মারা গেছেন?" তারপরই মৃত্যুর খবরের মাঝে সেই মহিলা কেঁদে ভেঙে পড়লেন।

সেদিন যে কতলোক কেঁদেছিল, কে তার খবর রেখেছে। নেহরুর মৃত্যুর খবর নিয়ে যত জার্মান কাগজ বেরিয়েছে প্রায় প্রত্যেকের বড় বড় অক্ষরে লেখা শিরোনামা একই! "World mourus Nehru।" নেহরুর জন্য পৃথিবী শোকাকুল। কিংবা World without Nehru—পৃথিবী আজ নেহরুহীন।

নেহরুর দিল্লিতে মৃত্যু ঘটলেও ভারতের

লণ্ডনে রয়াল অ্যালবার্ট হলে আয়োজিত শোকসভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আছেন অধ্যাপক আরনল্ড টয়েনবী, মিঃ হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, প্রধানমন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম, ডাঃ জীবরাজ মেহতা

বাইরে কোথাও কোনো সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বিশ্রাম ছিল না। এই নেহরু বিহীন পৃথিবীর রূপটা প্রত্যক্ষ জানতে, শঙ্কা ও শোকের পরিমাপ করতে তাঁরা বেরিয়ে পড়েছিলেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট অফিসের কর্মীদের শুধু রাষ্ট্রীয় নেতা বা রাজনীতিকদের সংগে যোগাযোগ করেই মন ভরল না। একটি রিপোর্টার বেরিয়ে পড়লেন "man in the street" অর্থাৎ অতি নগণ্য জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য। শুনেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু আজ মারা গেছেন?" প্রশ্ন শুধু ওই একটিই। উত্তরের নমুনা প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক। "ওমা, কি হবে! বিশ্বশান্তি আর থাকবে না।" "কি বললেন? আমাদের নেহরু? ওই হল। ভারতের নেহরু আমাদেরও। পৃথিবীতে সৎ, আদর্শবাদী লোকের এমনিতেই অভাব। একজন ছিলেন, তিনিও গেলেন।" নেহরুর মৃত্যুতে এই হল বিদেশে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া।

বুদ্ধিজীবী বা রাজনৈতিক মহলে, বিশেষ করে সংবাদপত্রে কিন্তু নেহরুর মৃত্যুতে শোকের সংগে আরেকটা মনোভাব মিশেছিল। নেহরুর পর ভারতবর্ষের কি হবে। যাঁরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিদেশী ভারত-বন্ধু কিংবা সমালোচকদের সংগে সামান্য যোগাযোগ রাখেন তাঁরা জানেন যে, নেহরুজীর মৃত্যু, এমনকি অসুস্থতারও বহুদিন আগে থেকেই নেহরুর পরে কার হাতে ক্ষমতা আসবে এই আলোচনা একটা প্রায় নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যাঁরা সত্যিই ভাল চান তাঁরা যেমন খবর নিয়েই ভাবতেন এবং জিজ্ঞাসা করতে নেহরুর উত্তরাধিকারী কে হবে! তেমনি যাঁরা ভারতের রাজনৈতিক শাসনতান্ত্রিক স্থায়িত্বে, ভারতীয় গণতন্ত্রের জয়যাত্রায়, স্বৈরাচারী একনায়কত্বের সম্ভাবনার অভাবে উদ্বেগে করতেন বা করেন তাঁরাও এই প্রশ্ন করতেন। অনেকে বলেছেন, নেহরু এ কি করছেন! তাঁর একজন রাজনৈতিক "উত্তরাধিকারী" তৈরি করে যাচ্ছেন না কেন। নেহরুর পর কে ক্ষমতায় আসবেন, এই নিয়ে কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের নিউ দিল্লির সংবাদদাতা মিঃ হ্যানজেনতো "after nehru who?" বলে একটা বই-ই লিখে ফেলেছিলেন।

এই আলোচনা নেহরুর মৃত্যুতে নতুন করে জেগে উঠল। শোকের সংগে সংগে এল আশঙ্কা। আশঙ্কাগুলি এইরকমঃ নেহরুর অবর্তমানে কঠিনহস্তে ভারতের ঐক্য রক্ষা করার লোক আর রইল না, এইবারে দেশটা ভেঙে পড়বে। হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা আবার লাগল বলে। এবারে রক্তগঙ্গা বইবে। কম্যুনিস্টদের পোয়াবারো হল নাকি? কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের আর কোন কী? কংগ্রেসের মধ্যে প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে এই কাড়াকাড়ি শুরু হল বলে। প্রধানমন্ত্রী কে হবেন? মোরারজী? ইন্দিরা গান্ধী? গুলজারিলাল নন্দ? কৃষ্ণমেনন? না লাল বাহাদুর শাস্ত্রী?

নেহরুজীর মৃত্যুর আগেই [illegible] একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী অথচ [illegible] পরে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে [illegible] সবাইকে একই উত্তর দিয়েছি—[illegible] গেলে আর একজন নেহরু [illegible] ঠিক। তবে নেতা একজন [illegible] নেহরুর ব্যক্তিত্ব, আদর্শবাদ, [illegible] বিদেশে প্রভাব এসব দিক থেকে [illegible] কাছাকাছি আসার মতো এখনও কেউ নেই, এ যুগে হবেও না। কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নেই। পৃথিবীর বৃহত্তম [illegible] ভারতবর্ষে চালু। [illegible] বাসীরা গণতান্ত্রিক আদর্শে শুধু [illegible] নয়, তারা সদা-সতর্ক, সজাগ। [illegible] সংবাদপত্রের স্বাধীনতার তুলনা [illegible] সরকারের সমালোচনাতে, কোনও [illegible] উপমন্ত্রীর খুঁত আবিষ্কারে [illegible] যোগে যেমন সংবাদপত্রের তেমন [illegible] সদস্যদের তুলনা নেই। মহাত্মাজী [illegible] থাকতে শুনেছিলাম, তাঁর অবর্তমানে দেশে হিন্দু-মুসলমান লড়াই আর থামবে না! কই তাতো হয়নি। ভুবনেশ্বরে [illegible] ভেবেছিলাম, নেহরু মঞ্চে উপস্থিত না থাকলে অত জরুরী একটা অধিবেশন সফলই জমবে না, হয়তো [illegible] হবে। জমেছিল, গভীর রাত পর্যন্ত চলেছিল। নেহরুর দিকে বারবার না তাকিয়েও যে তাঁর দলের [illegible] সভায় সমান আগ্রহে যোগ দিতে পারেন তা প্রত্যক্ষ দেখে এসেছি। নেহরুর পর কে নেতা হবেন তা নেহরুর বর্তমানেই ঠিক হবে না। কোনও গণতন্ত্রই রাজনৈতিক "উত্তরাধিকার"এ বিশ্বাস করে না। নেতা নির্বাচন করে। পশ্চিম দেশে দ্বিতীয় যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মৃত্যুতে কেউ অধিকার [illegible]

দিন লালবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন লালবাহাদুর বাড়ির বাচ্চাদের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছেন। সাংবাদিককে দেখে হেসে বললেন, আমার যে উচ্চতা, তাতে বড়োরা আমার সঙ্গে খেলতে চায় না। ছোটরাই আমাকে সমান সমান ভেবে খেলতে আসে!

সর্বকিছুর উর্ধে যে জিনিসটা বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে নিশ্চিন্ত করেছে সেটা ওই ব্রিটিশের হেডলাইনের ভাষায় হল "Sastri likely to continue Nehru policy" শাস্ত্রীজী নেহরুর নীতিই অনুসরণ করবেন।

কিন্তু ভারত বা তার নেতা সম্পর্কে কেবল আশা থাকবে আশঙ্কা থাবে না, এই বা কি করে হতে পারে। লণ্ডনের অবজার্ভার তাই তার নিউদিল্লির বিশেষ সংবাদদাতার কাছ থেকে পাওয়া শাস্ত্রীর মনেনয়নের ইতিকথা ছাপল। শাস্ত্রীর মনোনয়নে গণতন্ত্রের চাইতে, শাস্ত্রীর নিজের গুণের চাইতে, লালবাহাদুরের চাইতে বাহাদুরী বেশী কংগ্রেস সভাপতি কামরাজের। কামরাজই আরও কিছুদিন প্রধানমন্ত্রী তৈরী করবে। সুতরং অবজারভার-এর সংবাদদাতা মিঃ সিসিল ডানের মতে লালবাহাদুর শাস্ত্রী "Stop gap Prime Minister"। অর্থাৎ কাজ চালানোর জন্য সাময়িকভাবে কামরাজের আশীর্বাদের অধিকারী হয়ে কামরাজেরই কামনায় নির্বাচিত। এর পরে শাস্ত্রী সম্পর্কে অনেক প্রশংসিত আছে। তবে লেখার আসল সুর হল শাস্ত্রী বেশীদিন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না।

ভারতবন্ধু (ম্যাঞ্চেস্টার) গার্ডিয়ানই অবশ্য লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ঠিক মূল্যায়ন করেছে। লালবাহাদুর—

"A tiny figure. Little bird of a man. A sparrow,

"ছোট্ট একটি লোক। যেন একটা পাখির মত, একটা চড়ুই পাখি।" অথচ সংবাদদাতা প্যাট্রিক কীটলী লিখেছেন—

"They say that Lal Bahadur Sastri is not a man of vision; that he produces no original ideas. Perhaps not. But that is not what India needs at this time. She needs a strong man; and she has got one. A man who is decisive, who will take the decisions which an ailing Nehru avoided. On Kashmir, the stagnating Five Year Plan, the crisis in food grains and all the rest... A kind man. A tough but just man and a very strong man indeed."

"অনেকে বলেন, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দৃষ্টি বেশীদূর পর্যন্ত পৌছায় না। নতুন কোনও কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর নেই। সম্ভবত নেই। কিন্তু এখন যে ভারতবর্ষের এই সব প্রয়োজন নেই। ভারতের প্রয়োজন একটি শক্ত লোকের। তেমন লোক ভারত পেয়েছে। এমন লোক পেয়েছে যে বিচার করতে জানে। এবং এমন সব বিষয় সিদ্ধান্ত নেবে, যা নেহরুর অসুস্থতার জন্য ঝুলে ছিল। যেমন কাশ্মীরের ব্যাপার। ঢিমে-তেতালায় চলা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাপারে, খাদ্যসংকট এবং আরও অনেক ব্যাপারে। এই লোকটি সুহৃদয়। শক্ত কিন্তু খাঁটি। আর সত্যিকারেরই কঠোর হস্তে কাজ করার লোক।"

সম্ভবত এই গুণগুলির দৃষ্টান্ত হিসাবেই ওপরের মন্তব্য ছাপা হওয়ার কয়েকদিন পরে, লালবাহাদুরের নিজের মন্ত্রিসভার নাম প্রকাশিত হওয়ায় এবং মোরারজী জগজীবনরামের নাম না থাকায় গার্ডিয়ান লেখে, "Lalbahadur drops two ex-rivals" "লালবাহাদুর তাঁর দুই প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বীকে মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ দিয়ে দিলেন।" কিন্তু সত্যি কথা কি তাই? যে পুরোনো মন্ত্রিসভা ছিল সেটাকেই তো লালবাহাদুর নিজের করে নিলেন। শুধু নতুন নিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে। মোরারজী, জগজীবনরামকে বাদ দিয়েছিলেন নেহরু, লালবাহাদুর সেই পুরোনো চাকা ভেঙে না দিয়ে লালবাহাদুর বিচক্ষণতাই দেখিয়েছেন। আসল কথা হচ্ছে, নেহরুবিহীন ভারত শান্তি, সংহতি ও ঐক্য বজায় রেখে, কোন রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক সংকট অথবা বড়ো একটা বিস্ফোরণ ছাড়াই ভবিষ্যতের দিকে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে নতুন পদক্ষেপ করবে, এমন কথা অনেকেরই বিশ্বাস হচ্ছে না।

এই অবিশ্বাসকে দৃঢ় প্রত্যয়ের দিকে পথ পরিবর্তন করার দায়িত্ব ভারতের জনসাধারণের। বিদেশে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে এমনকি কোনও কোনও ভারতীয় দূতাবাসের দায়িত্বশীল কর্মচারীদের মধ্যেও "ওমা কি হবে" এই ধরনের যে একটা মনোভাব দেখেছি তাও অত্যন্ত বিপজ্জনক। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দলের নেতা বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে রাতারাতি ম্যাকমিলানকে
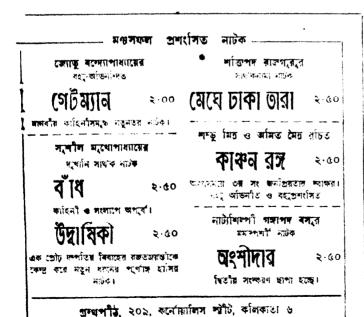
পাশ কাটিয়ে লর্ড হিউমের প্রধানমন্ত্রী হওয়াতে. অথবা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য লড়াই, দলীয় মনোনয়নটুকু শুধু পাওয়ার জন্য রিপাবলিকান দলের রকফেলার গোল্ড ওয়াটার কাদা ছোড়া-ছুড়িতে যারা অশোভন কিছু দেখে না, একটা একান্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচনে লালবাহাদুর, মোরারজী, জগজীবনরামের একত্রে আসরে নামাতে তাদের ফিট হয় কেন? লালবাহাদুর "stop gap" অর্থাৎ কাজ চালানো গোছের বা সাময়িকভাবে নির্বাচিত নেতা, অন্য নেতা আসবে। এসব বলে এই ধরনের কথায় ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চিত হয়ে মাথা নাড়েন কেন? স্বৈরাচারী সরকার ছাড়া কোথাও একজন নেতা একচ্ছত্র ক্ষমতায় কায়েমী থাকে না।

আসল কথা আজ দেশে বিদেশে এই সত্যের স্বীকৃতি দরকার যে, নেহরুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নেহরুর নৈতিক নেতৃত্ব, তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মৃত্যু ঘটেনি। চিতা নিবলেও আলো নেবেনি।

নেহরুর মৃত্যুর ঠিক পরেই জার্মান রেডিওতে আইরিশ রাজনৈতিক ভাষ্যকার কেভিন ডেভলিন নেহরুর পরবর্তী ভারত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নেহরুর কয়েকটি কথাই স্মরণ করিয়ে দেন। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর নেহরু যা বলেছিলেন, আজ নেহরুর মৃত্যুর পর সেই কথাই বলা হয়।

"The light has gone out of our ives and there is darkness every vhere...

"The light has gone out, I said; nd yet I was wrong. For the ght that shone in this country as no ordinary light... That ght represented something more han the immediate present; it epresented the living, the eternal ruths, reminding us of the right ath, drawing us from the error, aking this ancient country to reedom."

"আলো নিবে গেছে। চারিদিকে অন্ধকার।

"আমি বলেছি, আলো নিবে গেছে, কিন্তু আমি ভুল বলেছি। কারণ দেশে যে আলো জ্বলছিল, সেটাতো সাধারণ আলো নয়। সেই আলো বর্তমানকে অতিক্রম করে চলে; সেটা জীবনের, শাশ্বত সত্যের প্রতীক। সে আলো সর্বদাই আমাদের সৎ পথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, ভুল থেকে রক্ষা করেছে; এই প্রাচীন দেশকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে দিয়েছে।"

রাত্রি যত তিমিরই মনে হোক, সেই দীপ্ত দীপের আলোই আমাদের পথ দেখাবে। সে শিখা অনির্বাণ।

আমূলে আপনার শিশুর স্বাস্থ্যকর
বৃদ্ধির জন্য একটি সুষম খাদ্য
আমূলে আছে—প্রোটিন—শরীরের পেশী গড়ে তোলে। কার্বোহাইড্রেট ও চর্বি—
শক্তি ও ওজন বৃদ্ধির জন্য। ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস—শক্ত দাঁত ও হাড়ের
জন্য। আয়রণ—সুস্থ রক্ত দেয় ও অ্যানীমিয়া প্রতিরোধ করে। ভিটামিন এ—দৃষ্টি
শক্তিকে উজ্জ্বল ও ত্বককে মসৃণ করে। ভিটামিন বী১—স্নায়ুকে মজবুত ও
হৃদযন্ত্রের পেশীকে সবল করে। ভিটামিন বী২—সাতে মুখমণ্ডলের জন্য অত্যাবশ্যক।
ভিটামিন বী৬—মাংসপেশীর শিথিলতা দূর করতে উপকারী। ভিটামিন
সী—রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ ও স্কার্ভি রোগ নিবারণ করে। ভিটামিন ডী—
রিকেট রোগ নিবারণ করে, হাড় ও দাঁত শক্ত করে। নিয়াসিনামাইড—
হজমশক্তি বাড়ায়। আপনার শিশুর জন্য উপকারী!
টাটকা দুধের তৈরী আমূল দুগ্ধজাত খাদ্যে
আপনার শিশুর প্রয়োজনীয় সাতটি
ভিটামিন আছে।

অগ্নিকোণে অশান্তি

সিন্দবাদ

বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাবে না। বিদেশী টুরিস্ট তাঁর হোটেলের কামরায় সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পাবেন, দরজার তলার ফোকর দিয়ে সেদিনকার খবরের কাগজখানা একেবারে নিয়ম-মাফিক তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেল টিপলে বেয়ারা ছুটে আসবে। ফরমাশ দিলে বিছানায় বসেই ব্রেকফাস্ট পাওয়া যাবে। কল খুললে জল পেতে তাঁর কিছু অসুবিধে হবে না। দাড়ি কামিয়ে, গায়ের উপরে ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে, পায়ে হাল্কা চটি গলিয়ে তিনি যদি তাঁর ঘরের সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান, তাহলে তাঁর চোখে পড়বে, রাস্তা দিয়ে, ঠিক আগের মতই, বইছে গতিশীল জনস্রোত। বড়রা অফিসে কিংবা কারখানায় যাচ্ছে, বাচ্চারা ইশকুলে। মোটর-স্কুটার-সাইকেল ছুটছে। বাস-স্টপে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। যাত্রীরা উঠছে-নামছে। কোথাও কোনও ছন্দ-পতন ঘটেনি।

দুপুরের গরমে টুরিস্ট হয়ত রাস্তায় বেরুতে চাইবেন না। চাই কী, পূর্বদেশীয় প্রথা অনুযায়ী, বিছানার উপরে তিনি তখন একটু গড়িয়েও নিতে পারেন। বিকেলে যখন শহর জুড়ে ছায়া নামবে, ঝিরঝিরে হাওয়া দেবে, পথে বেরিয়ে তখন ভালই লাগবে তাঁর। সন্ধ্যার পরে জ্বলে উঠবে আলোর মালা। সিনেমা-হাউসে, রেস্তরাঁয়, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস-এর সামনে নানা নিয়নের লাইন জ্বলবে-নিভবে। দেখা যাবে, বিস্তর লোক আসছে, যাচ্ছে, সওদা করছে, হাসছে, গল্প করছে। নানান রকমের লোক। কারও গায়ের রঙ সাদা, কারও হলুদ, কারও কালো।

রাত বাড়বে। রাস্তার ভিড় ধীরে ধীরে কম আসবে। উটকো দু-চারটে মাতালের প্রলাপ শোনা যাবে ইতস্তত। আর বড় রাস্তার আশেপাশে যে-সব গলিতে আলোর চাইতে অন্ধকারের দাপটই বেশী, সেখানে আবছায়া বাড়িগুলির দরজায় হয়ত এমন কিছু মেয়ের দেখা মিলবে, চেহারা দেখে যাদের বয়স আন্দাজ করা যায় না; যাদের পোশাক হয়ত শস্তা, কিন্তু প্রসাধনের চটক কিছু কম নয়। ভিনদেশী পথিক দেখলে তারা হয়ত গায়ে পড়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করতে পারে।

বিদেশী টুরিস্টের মনে হবে, ফরাসীরা যাকে আদর করে বলত "প্রাচ্যদেশীয় প্যারী", সেই সায়গন একেবারে আগের মতই আছে। তার কোথাও কিছু পাল্টায়নি।

অথচ পরদিন সকালেই আবার কাগজ খুলে হয়ত চমকে উঠবেন তিনি। হয়ত দেখতে পাবেন, মোটা মোটা হরফে তার প্রথম পৃষ্ঠাতেই এই খবর ছাপা হয়েছে যে, আগের রাত্রে (নিশ্চিন্ত চিত্তে তিনি যখন রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময়ে) সায়গনেরই আর-এক প্রান্তে একটা রেস্তোরাঁয় বোমা ফেলা হয়েছে। হতাহতের সংখ্যা নেহাত কম নয়, এবং তাদের মধ্যে বেশির ভাগই বিদেশী।

বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু সায়গন সত্যিই পাল্টে গিয়েছে।

*

শুধু সায়গন কেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামের সর্বত্র এই এক অবস্থা। শুধু দক্ষিণ ভিয়েতনাম কেন, লাওসের অবস্থাও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। পাল্লা ঝুঁকেছে কমিউনিস্টদের দিকে। নিরপেক্ষ লাওসে মাত্র কিছুকাল আগে দক্ষিণপন্থীরা একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দিয়েছিল। নিরপেক্ষ প্রধান-মন্ত্রী সুভানা ফুমা বন্দী হয়েছিলেন তাদের হাতে। কিন্তু এত করেও কট্টর দক্ষিণপন্থীরা শেষ পর্যন্ত সুবিধে করে উঠতে পারেনি। তারপর কয়েকটা দিন যেতে-না-যেতেই পাথেট লাও বাহিনী আবার ক্ষমতার পাল্লা একেবারে উল্টে দেয়। অতি-দক্ষিণ থেকে কাঁটা ঘুরে গেল অতি-বাঁয়ে। নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী সুভানা ফুমা অবশ্য কমিউনিস্ট-দের সেই অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা এখন একটু সামলে উঠেছেন। প্রথম দিকে দিন কয়েক শুধু মার খেতে খেতে পিছনে হটতেই ব্যস্ত ছিলেন লাওসের নিরপেক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ কং লী; ইদানীং তাঁর বাহিনী আবার পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু কমিউনিস্টদের যে তাতে খুব একটা কিছু দুর্ভাবনার কারণ ঘটেছে, এমন কথা অন্তত এখনই বলা যায় না।

সায়গন-হ্রদে রেলপথের পাশে

বাকী রইল কাম্বোডিয়া। সেখানে অবশ্য যুদ্ধ চলছে না, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতি কাম্বোডিয়া ইদানীং আদৌ প্রসন্ন নয়। পাল্লা সেখানেও পিকিংয়ের দিকে ঝুঁকেছে। গতিক দেখে পশ্চিমী শক্তিগুলির পক্ষে তাই একটু চিন্তিত হওয়াই স্বাভাবিক।

ভিয়েত কং বাহিনীর সৈন্য

চিন্তা সবচাইতে ওয়াশিংটনেরই বেশী। কেননা, এককালে যা ছিল ফরাসী এলাকা, এবং পরে যেখানে আলাদা-আলাদা চারটি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, সেই ইন্দোচীনের সর্বত্র যাতে না কমিউনিস্ট প্রভুত্বের প্রসার ঘটে, তার জন্যে বাইরে থেকে যা-কিছু সাহায্য দেওয়া দরকার, তা প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিচ্ছে। টাকা ঢালা হচ্ছে জলের মত। দারিদ্র্য দূর করার জন্যে টাকা, নতুন-নতুন কল-কারখানা গড়বার জন্যে টাকা, রাস্তাঘাট বানাবার জন্যে টাকা, কমিউনিস্টদের রুখবার জন্যে টাকা। মুশকিল এই যে, কমিউনিস্টদের অগ্রগতি রোখা যাচ্ছে না। আজ থেকে প্রায় বছর দশেক আগে যাঁকে দেখে ইংরেজ কথাসাহিত্যিক গ্রাহাম গ্রীনের মনে হয়েছিল, "ওয়াইজ, কাইন্ড, জাস্ট...... কেপেবল্ অব ইনস্পায়ারিং লভ", উত্তর-ভিয়েতনামের সেই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রনায়ক হো চি মিন-এর প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ সাহায্যে পুষ্ট হয়ে কমিউনিস্টরা এখন ইন্দোচীনের অন্যান্য অঞ্চলেও জোর-কদমে এগিয়ে আসছে। তাদের যুদ্ধটা অবশ্য সর্বত্রই কিছু গোলা-বারুদের নয়। [illegible] সাফল্য কোথাও কূটনৈতিক, কোথাও প্রত্যক্ষ অভিযানের,

আবার কোথাও-বা চোরাগোপ্তা হামলায়। সন্দেহ নেই যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলটিতে তারা একটা বড় রকমের চাপের সৃষ্টি করেছে। ঠিকমতন তার মোকাবিলা করতে না-পারলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে—অন্তত এশিয়ার এই এলাকাটিতে—মুখরক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

*

দক্ষিণ ভিয়েতনামের কথাই ধরা যাক। কমিউনিস্ট গেরিলাদের চোরাগোপ্তা হামলা যে সেখানে কী ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করেছে, শুধু একটি রেলপথের গতিক দেখেই তা বোঝা যাবে।

বিদেশী পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছেঃ পৃথিবীর সবচাইতে বিপজ্জনক রেলপথ। তা দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গন থেকে যে রেলপথটি উত্তরে হুয়ে পর্যন্ত চলে গিয়েছে, তার যে-কোনও একটি ট্রেনে উঠলেই মালুম হবে যে, বিপদের বর্ণনায় কোনও আতিশয্য নেই। দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে

ভিং কং গেরিলা, আংগার

ছ শো মাইল; সায়গন-হুয়ে রেলপথে এক্সপ্রেস-ট্রেনে চলে দৈনিক দুটি, লোকাল ট্রেনের সংখ্যা চুয়ান্ন। এই ট্রেন কখানাকে ঠিকমতন চালু রাখতে দক্ষিণ ভিয়েতনামের কর্তৃপক্ষকে এখন হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছে। অথচ একে চালু না-রেখেও উপায় নেই। একে ত এটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার একটি প্রধান সূত্র: তার উপরে আবার গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কাছে এই রেলপথই হচ্ছে সরকারী ক্ষমতার প্রতীক। প্রতীকটি যদি বিদায় নেয়, সরকারের উপর গ্রামীণ মানুষদের আস্থা তাহলে অনেকটাই টলে যাবে।

ভিয়েত কং গেরিলারা ঠিক তাই চায়। সুতরাং ব্যাপকভাবে চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে এই রেলপথকে তারা পঙ্গু করে দেবার চেষ্টায় আছে। লাইনের উপর তারা মাইন পেতে রাখে, ডিনামাইট দিয়ে তারা বগি উড়িয়ে দেয়, দু পাশের ঘন জঙ্গল থেকে ট্রেনের কামরার উপরে তারা ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি চালায়।

পথ যেখানে এত বেশী বিপদসংকুল, পদে-পদে যেখানে দুর্ঘটনার ভয়, ট্রেনের পক্ষে সেখানে লেট হওয়াই স্বাভাবিক। লেট হয়: এক্সপ্রেস-ট্রেনগুলি সময়মত যাত্রা করে বটে, কিন্তু সময়মত পৌঁছতে পারে না। কখনও-বা তারা নির্দিষ্ট সময়ের তিরিশ ঘণ্টা পরে পৌঁছয়, কখনও-বা ষাট ঘণ্টা পরে। সায়গন থেকে হুয়ে, এই ছ শো তিরিশ মাইল পথ সাঁইত্রিশ ঘণ্টা বাইশ মিনিটে পাড়ি দেবার কথা। কিন্তু গত কয়েক মাসের মধ্যে একটি ট্রেনও সম্ভবত যথাসময়ে শেষ-সীমানায় পৌঁছতে পারেনি। কোনও-

কোনও ট্রেন আদৌ পারেনি। মাঝপথেই তারা গেরিলাদের হাতে ঘায়েল হয়েছে। লাইনের দু পাশে, জংলা জলভূমির মধ্যে, তাদের বিধ্বস্ত শবদেহ দেখতে পাওয়া যায়।

বিদেশী এক পত্রিকার প্রতিনিধি সম্প্রতি এই রেলপথের একটি ট্রেনে উঠে সায়গন থেকে হুয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। ট্রেন কি সময়মত হুয়েতে গিয়ে পৌঁছবে? জনৈক সহযাত্রীকে এই প্রশ্ন করতে সে নাকি জবাব দিয়েছিল, "ঘণ্টা ষাটেক দেরিতে যদি পৌঁছই ত জানবেন যে, মোটামুটি সময়মতই পৌঁছানো গেল।"

সায়গন থেকে যাত্রা শুরু হল। ঘণ্টা দুয়েক পরেই দেখা গেল, লাইনের দু পাশে জঙ্গলে এলাকা আরম্ভ হয়েছে। ঘন জঙ্গল; গাছের ডালপালা এগিয়ে এসে ট্রেনের জানলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কিন্তু নিসর্গ-শোভা দেখে মুগ্ধ হবার উপায় নেই। যাত্রীরা জানে, ওই জঙ্গলের মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভিয়েত কং গেরিলা। যে-কোনও মুহূর্তে তারা হামলা চালাতে পারে।

চালিয়েছিলও। বিদেশী সাংবাদিক শুনতে পেয়েছিলেন, হঠাৎ গর্জে উঠেছে বন্দুক। দেখতে পেয়েছিলেন, গুলিবৃষ্টি প্রায় শিলাবৃষ্টির মতই ট্রেনের উপরে এসে আছড়ে পড়ছে। যাত্রীরা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেঝের উপর সটান শুয়ে পড়ল। ট্রেনের রক্ষী-বাহিনী পাল্টা গুলি চালাল; ট্রেনের উপরে চক্কর মারতে লাগল একটি মার্কিন বিমান। ট্রেন যদি আটকে যায়, আর যাত্রীদের লুঠ করবার জন্যে জঙ্গল থেকে যদি গেরিলা-বাহিনী বেরিয়ে আসে, ওই বিমান তাহলে ছোঁ মেরে নীচে নেমে আসবে, আকাশ থেকে গেরিলাদের উপরে গুলি চালাবে।

প্রত্যহ এই এক কাণ্ড চলছে। কমিউনিস্টদের হামলা চলছে শুধু একটি রেলপথের উপরে নয়; হাটে-মাঠে-অরণ্যে-পাহাড়ে-গ্রামে-শহরে—সর্বত্র। সামনা-সামনি তারা লড়ছে না। অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সে-আক্রমণ কখন কোথায় দেখা দেবে, কীভাবে দেখা দেবে,

বিমানবাহী জাহাজ কিটি হক

আগে থেকে তার আঁচ পাবার উপায় নেই। দূরের কোনও গ্রামেও তারা আক্রমণ চালাতে পারে; আবার সায়গনের কোনও সিনেমা-হলেও তারা বোমা ফাটিয়ে সরে পড়তে পারে।

বিদেশী এক পর্যবেক্ষক বলেছিলেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে যুদ্ধ চলছে, তার সবচাইতে বড় অসুবিধে এই যে, সেখানে কোনও যুদ্ধক্ষেত্র নেই। কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলা যায় যে, সেখানে যে-কোনও জায়গাতেই যে-কোনও সময়ে যুদ্ধ বাধতে পারে। তা যে বাধে না, এমনও নয়।

*

লাওসের অবস্থাও সমান অনিশ্চিত। কমিউনিস্টরা এত দ্রুত সেখানে আক্রমণ চালিয়েছিল যে, প্রথমটায় তাদের আগে ঠেকানো যায়নি। ঠেকানো যে এখনও বিশেষ যাচ্ছে, এমন নয়। তবে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। ওদিকে, লাওসের আকাশেও এখন চক্কর দিয়ে ফিরছে মার্কিন জেট বিমান। বিমান-বাহী জাহাজ কিটি হক থেকে উড়ে আসছে তারা; দক্ষিণ ভিয়েতনামের আকাশ পেরিয়ে লাওসের উপরে এসে দেখা দিচ্ছে।

নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী সুভানা ফুমা ভেবেছিলেন, এতে ভালই হবে। প্রথমত, কমিউনিস্টরা কোথায় কতটা এগিয়ে আসছে, বিমান থেকে সেটা বুঝতে পারা যাবে; দ্বিতীয়ত, এইভাবে যদি হাওয়াই চক্করের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে কমিউনিস্টরা কিছুটা ভয়ও পেতে পারে।

কমিউনিস্টরা কিন্তু প্রথমটায় বিশেষ ভয় পায়নি। বরং বিমানবিধ্বংসী কামান চালিয়ে দু-দুটি বিমানকে তারা ধরাশায়ী করেছে। দ্বিতীয় বিমানটি নাকি প্রায় তিন হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তার চালক অবশ্য মারা যাননি, কিংবা কমিউনিস্টদের হাতে বন্দীও হননি। বিমান বিকল হয়ে যাবার পরে তিনি প্যারাস্যুট নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে পড়েন। পরে তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে। যেখান থেকে উদ্ধার [illegible] হয়েছে, সেই অঞ্চলে এলাকায় মানুষের চাইতে বাঘের সংখ্যা অনেক বেশী।

. যাই হক, কমিউনিস্টদের হাতে দু-দুখানি বিমান ধ্বংস হবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থির করে যে, এবারে আর শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, পাল্টা-মারের ব্যবস্থা করা হবে। তাই করা হল। প্যাথেট লাও ঘাঁটির উপরে মার্কিন বিমান থেকে ব্যাপকভাবে বোমা ফেলা হল।

তাতে কমিউনিস্টরা বিশেষ ভয় পেল কিনা, বলা শক্ত, তবে সুভানা ফুমা খুশী হলেন না। প্যাথেট লাও ঘাঁটির উপরে যে আক্রমণ চালানো হবে, সে-কথা নাকি আগে তাঁকে জানানো হয়নি। মার্কিন রাষ্ট্রদূত লেনার্ড আংগারকে ডেকে এনে তিনি জানালেন যে, আক্রমণ যদি [illegible] অবিলম্বে বন্ধ করা হয়, তাহলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেবেন।

বিমান পাঠানো বন্ধ রইল। কিন্তু মাত্র কয়েক দিনের জন্য। আংগারের সঙ্গে আবার আলোচনা হল সুভানা ফুমার। দুজনের মধ্যে কী কথাবার্তা হল, তা কেউ জানে না। তবে তার পরেই দেখা গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণ-বিমান আবার লাওসের আকাশে চক্কর দিয়ে ফিরছে।

একটা কথা অবশ্য সবাই জানে। সেটা এই যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলটির যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, এখানে-ওখানে হামলা চালিয়ে কিংবা পাল্টা-মার দিয়ে তার সমাধান হবে না। আলোচনার পথ সবাইকে আসতেই হবে। কিন্তু, আলোচনার টেবিলে গিয়ে বসবার আগে, যে যার দখলকে যতটা সম্ভব বাড়িয়ে রাখতে চায়।

*

লাওসে আপাতত দখল বাড়িয়ে রাখবার খেলাই চলছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে চলছে গোপন শত্রুকে খুঁজে বার করবার খেলা। তাকে প্রতিরোধ করবার খেলা। বড় ভয়ঙ্কর সেই খেলা। সে-খেলায় মৃত্যু কখন কোন্ বেশে কোথায় দেখা দেবে, তা কেউ জানে না। মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে দূর গ্রামাঞ্চলের কোনও জলা জঙ্গলভূমিতে; আবার শহরের কোনও রেস্তোরাঁর মধ্যেও সেনার খোঁয়াড় সন্নিকটে হঠাৎ অবশ্য হয়ে যেতে পারে।

সায়গনের কথা দিয়ে এই লেখা শুরু করেছিলাম। সায়গনের প্রসঙ্গেই আবার ফিরে যাই। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু জীবন যে সেখানে কতটা অনিশ্চিত, একটিমাত্র ঘটনা থেকেই তা মালুম হবে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরি ক্যাবট লজের গাড়িটিকে নাকি বুলেট-প্রুফ করবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সকাল বেলায় তিনি যখন বাড়ি থেকে বেরোন, তখন তাঁর সঙ্গে থাকে একজন বডিগার্ড। সেই সঙ্গে একটা পিস্তলও থাকে।

প্যাথেট লাও বাহিনীর ঘাঁটি

চিত্রপ্রদর্শনী

এচিং ও লিথো

সম্প্রতি আকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ শিল্পী জীবেন্দ্রকুমার সেনের কতকগুলি এচিং ও লিথোগ্রাফের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। শিল্পী এ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেছেন পোল্যাণ্ডে এবং ছবিগুলি বেশীর ভাগই সেখানে আঁকা। এর আগে তাঁর দুটি প্রদর্শনী হয়েছিল, একটি কলকাতায় ১৯৫৭

নামাজ (এচিং, অ্যাকোয়া টিণ্ট)
—জীবেন্দ্রকুমার সেন

সালে ও অপরটি পোল্যাণ্ডে ১৯৬০ সালে। এটি তাঁর তৃতীয় প্রদর্শনী।

আমাদের দেশে গ্রাফিক আর্টের চর্চা খুব বেশী হয়নি। শ্রীমুকুল দে, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পরে লিথো ও এচিং নিয়ে খুব কম শিল্পীই মাথা ঘামিয়েছেন। যাঁরা ঘামিয়েছেন তাঁরা অসাধারণ (outstanding) কিছু সৃষ্টি করতে পারেন নি। দিল্লি ও বোম্বাইয়ের অনেককে শিল্পীকে সম্প্রতি উঁচুতে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে বটে, কিন্তু তাঁদের কাজের সঙ্গে আমাদের যেটুকু পরিচয় আছে তাতে বলতে পারি, তাঁরা নিতান্তই সাধারণ স্তরের শিল্পী। এইসব শিল্পীদের কাছে টেকনিকের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শিল্পরসের সাক্ষাৎ মেলে না।

শিল্পী জীবেন্দ্রকুমার সেনের কাজে কোথাও ফাঁকি নেই। টেকনিকে যে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা তা কাজগুলি একটু নিরীক্ষণ করলেই বোঝা যায়। কিন্তু টেকনিকের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে তিনি বাহবা

খণ্ট (রঙীন লিথো) —জীবেন্দ্রকুমার সেন

নেবার চেষ্টা করেননি। তিনি চেয়েছেন শিল্প সৃষ্টি করতে এবং তিনি যে সত্যকারের শিল্পী সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই। দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতকে তিনি কোথাও অস্বীকার করেন নি, তিনি চেয়েছেন ছবির মাধ্যমে আবেগ (emotion) সৃষ্টি করতে। ফর্ম নিয়ে তিনি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি তা নয় (৩, ৬, ৮, ১০, ১৯), কিন্তু সে পরীক্ষা কোথাও পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছায় নি। তাঁর 'বাদশা বেগম', "নামাজ" "পলিটিক্যাল সিম্ফনি" প্রভৃতি ছবিতে তিনি পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর যে দেখবার চোখ ও কল্পনা-প্রবণ মন আছে সে পরিচয় মেলে প্রায় প্রতিটি ছবিতেই। তাঁর অনেকগুলি ছবিই আমাদের ভাল লেগেছে, তবু বিশেষ করে ভাল লেগেছে "বাদশা বেগম" (লিথো), 'বংশীবাদক' (রঙীন লিথো), "দম্পতি" (ঐ), পদ্ম (এচিং), ক্যাকটাস (এচিং, অ্যাকোয়া টিন্ট), "নামাজ" (ঐ) ও "নিঃসঙ্গ পাখি" (ঐ)। কয়েকটি ক্ষেত্রে (১৩, ১৪, ১৫) এচিং এর প্রতিলিপি উল্টে করে ছাপায় সাদার জায়গায় কালো ও কালোর জায়গায় সাদা হওয়ায় বেশ একটা সুন্দর 'এফেক্ট' সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর একটি ছবিতে (২২) ক্যান্ডিনস্কীর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। তাঁর কিউবিক ছবিখানি (৭) খুব সার্থক হয়েছে বলে মনে হল না।

শিল্পী এচিং ও লিথোয় একজন দক্ষ কারিগর। তাঁর প্রতিভা আছে এবং আমরা আশা করব সে প্রতিভার সমাদর হবে।

ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটি ঃ

গত ১৩ই জুন "ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটি" নামে একটি নবগঠিত শিল্পী সংঘের আর্ট গ্যালারীর উদ্বোধন হল পি ৫৪২ রাজা বসন্ত রায় রোডে। একতলার একটি মাঝারি ও একটি ছোট ঘর নিয়ে গ্যালারীটি সাজানো হয়েছে। বর্তমানে একটি প্রদর্শনী এক মাস চলবে, পরে যদি জনসাধারণের কাছ থেকে সাড়া মেলে তাহলে প্রদর্শনীর স্থায়িত্বকাল আরো কমিয়ে দেওয়া হবে। গ্যালারীটি রবিবার ছাড়া সব দিনই খোলা থাকবে বেলা ৩টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

কলকাতায় প্রয়োজনের তুলনায় আর্ট গ্যালারীর সংখ্যাল্পতার কথা বিবেচনা করে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ আর্ট গ্যালারীটি খুলেছেন। এঁরা আশা করেন ক্রমাগত প্রদর্শনী মারফত এঁরা জনসাধারণকে শিল্প সচেতন করে তুলতে পারবেন। এঁরা আরো আশা করেন যে-সমস্ত শিল্পী আর্থিক ও অন্যান্য কারণে নিজেদের ছবি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করতে পারছেন না, তাঁদের এঁরা প্রদর্শনীর সুযোগ করে দিতে পারবেন। একটি ছাপানো প্রচারপত্রে এঁরা শিল্পানুরাগী জনসাধারণ এবং শিল্পক্রেতাদের কাছে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

এঁদের উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই, কিন্তু সে উদ্দেশ্য কতদূর সফল হবে বলা শক্ত। প্রথমবারের প্রদর্শনীতে যে সমস্ত ছবি টাঙানো হয়েছে, দেখলাম তার বেশীর ভাগই আধুনিক। সাধারণ দর্শক এ সমস্ত ছবি দেখে ছবির প্রতি আগ্রহী হবো দূরের কথা ছবি সম্বন্ধে আতঙ্ক নিয়ে ঘরে ফিরে যাবেন। দু-একজন আর্ট সমঝদার ছাড়া এসব ছবি কেউ কিনবেন বলেও মনে হয় না। কাজেই এ জাতীয় প্রদর্শনী থেকে শিল্প, শিল্পী ও দর্শক কারোরই কোন উপকার হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রায় জন বারো শিল্পীর পাঁচ পঁচিশখানি ছবি টাঙানো হয়েছিল। শিল্পী বা ছবির সঠিক সংখ্যা জানা বলতে পারলাম না। তার কারণ কোন ছাপানো ক্যাটালগ আমরা পাই-

কেশচর্চা —প্রণতি ব্যানার্জি

রাজহাঁস —অশোক দাশগুপ্ত

নি।) এর মধ্যে প্রায় কুড়িটি ছবি আধুনিক বাকীগুলি অনাধুনিক। আধুনিক ছবিগুলি সবই আকারে বড় এবং তেলরঙে আঁকা। দৃষ্টিগ্রাহ্য জগত এইসব ছবিতে বিকৃত রূপ নিয়ে উপস্থিত, সে বিকৃতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চক্ষুর পীড়াদায়ক। দু-একটি ক্ষেত্রে এই বিকৃতি রসোপলব্ধির অন্তরায় হয়নি কিন্তু সেগুলি নিতান্তই ব্যতিক্রম। এরকম ছবির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য প্রণতি ব্যানার্জির "কেশ-চর্চা"। দেশী ভাব ও বিদেশী টেকনিকের এমন সার্থক সংমিশ্রণ কদাচিৎ চোখে পড়ে। এর পরেই উল্লেখযোগ্য সমীর সেনের "লিপিকা"। কিন্তু এই শিল্পী সম্বন্ধে আমরা আগে আলোচনা করেছি কাজেই এখানে তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলবার দরকার নেই। শুধু এটুকু বলা দরকার, তাঁর অন্য কাজ আমাদের আশা মেটাতে পারেনি।

যে ছবিগুলিতে দৃশ্যমান জগত সহজবোধ্য আকারে নিয়ে উপস্থিত তাদের আমরা "অনাধুনিক" নামে অভিহিত করেছি। ছবি-গুলি সবই আকারে ছোট এবং প্রায় সবগুলিই জলরঙে আঁকা। এর মধ্যে একখানি ছবিই উল্লেখযোগ্য—সেটি হচ্ছে অশোক দাশগুপ্তের "রাজহাঁস"। সামান্য কয়েকটি রেখায় রাজহাঁসের যে রূপটিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা অনবদ্য।

পরিশেষে ইয়ং আর্টিস্টস সোসাইটিকে একটি কথা আমরা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিই। এই কলকাতায় গত কয়েক বছরে বেশ কটি আর্ট গ্যালারীর জন্ম ও মৃত্যু হয়েছে। কোনটিই দীর্ঘায়ু হতে পারেনি। তার কারণ, কর্তৃপক্ষ সাধারণ (এবং শিক্ষিত) দর্শকের রুচিকে আমল দেন নি। আশা করি সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না।

চিত্র সমালোচনা

মহাশয়,

শিল্পী প্রকাশবাবুর শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে যে আলোচনা উঠেছে সে সম্পর্কে আমার দু-একটি বক্তব্য আছে। প্রথমে পূর্বালোচনা তুলে ধরছি শেষে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

১। সমালোচক মহাশয় :—প্রকাশবাবুর শিল্প কর্মের সঙ্গে ২০০০ বছরের ভারতীয় শিল্পের যোগ নাই, ভারতশিল্পে সরাসরি দৃশ্যগ্রাহ্য জগতকে অস্বীকার করা হয় নি।

২। প্রকাশবাবু তাঁর শিল্পকর্মকে ভারতীয় বলতে চান।

৩। শ্যামলবাবুর প্রশ্ন : কেন প্রকাশবাবুর শিল্প ভারতীয় নয়। ভারতীয় শিল্পে কি Evolution ও Mutation সম্ভব নয়? রবীন্দ্রনাথ, রামকিংকর তবে কি? অজন্তা শিল্প Pictorial anatomy-কে অস্বীকার করা হয়েছে—শিল্প কর্মে Abstraction আনার জন্য। আর্ট সচল, আর্ট কি deductive logic?

৪। সমালোচক : শ্যামলবাবু ভারতীয় ও ভারত শিল্পে গোলমাল করেছেন, তাঁর মতে জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে Evolution ও Mutation সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ও রামকিংকরের শিল্প ভারতীয় নয়। অজন্তা আর্ট সম্বন্ধে শ্যামলবাবুর উক্তি ভুল। ভারত-শিল্পের চরম প্রকাশ হয়ে গেছে।

আমার বক্তব্য

১। শ্যামলবাবু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বিপর্যস্ত রীতিতে যে Evolution-এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন তাতে ভারতীয় ও ভারতশিল্পে তার গোলমাল আছে বলে মনে হয় না। থাকলে এ প্রশ্ন আসত না। জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে Evolution সম্ভব—সমালোচকের এ উক্তির মর্ম গ্রহণ হল না। Evolution ও Mutation উভয়ই 'Divergence from the Ancestral type' তবে mutation হচ্ছে—"a very great sudden......" গুহামানব থেকে আজকের মানুষ, প্রাক-বিদ্যাসাগরীয় গদ্যরীতি ও শেষের কবিতার গদ্যরীতি—evolution। আর্টের ক্ষেত্রে রামকিংকর ও রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে evolution ও mutation। এ'রা ভারতীয় আর্টএর ক্ষেত্রে extraneous নন।

২। অজন্তা আর্ট অতি বিতর্কমূলক অধ্যায়, তবুও শ্যামলবাবু এ সম্বন্ধে কোনও নতুন কথা বলেন নি। ভুলও বলেন নি। হ্যাভেল প্রমুখ মনীষিগণের মতবাদের সারাংশ বলেই আমার স্মরণ ও বোধ হয়। সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে তাহা গ্রহণীয় নাও হতে পারে।

৩। **Exaggeration, distortion** ও

Abstraction এক, একথা শ্যামলবাবু তো বলেন নি। Abstraction করার খাতিরে তা করা হয় বলেছেন, অর্থাৎ means, not the end Exaggeration ও distortionএর তফাত ethical মূলগত নয়।

৪। আমার ধারণা ভারতীয় শিল্প সচল ভারতীয় গণমানসের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। সব বহমান শিল্পই তাই। তবে evolution ও mutation (সৎ অর্থে) সম্ভব। ২000 বছর আগেও মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন আছে, খৃঃ অষ্টাদশ শতকের পরেও ভারতীয় শিল্প আছে—এরা কেন সমালোচক মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টিলাভে বঞ্চিত বুঝি না। ২000 বছর ভারতীয় শিল্পের কয়েকটি গৌরবময় অধ্যায় মাত্র—part; not whole। কেবল ২000 বছরই ভারতীয় আর্ট—ইহা formalism।

৫। আধুনিক চিত্রের গতিপ্রকৃতি একেবারে নতুন। ইহা অত্যন্ত subjective, সমাজ ও শিল্পমানসের interaction-এর unconventional প্রকাশই ইহার মুখ্য উপজীব্য। আধুনিক চিত্রকলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধিগত বিপ্লবাশ্রয়ী।

আসল কথা subjective realityকে সংবেদনশীলতার সঙ্গে বর্তমান শিল্পীমানসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না হলেই তা objective criticism হতে বাধ্য। বিদগ্ধ পাঠকের হাতে এ কথার সত্য নিরূপণের ভার তুলে দিলাম।

আমার শেষ বিনীত অনুরোধ যে, শিল্পিজন যেন স্বকালচ্যুত স্বধর্মচ্যুত না হন। আমরা কোন কবরের উপর দাঁড়িয়ে নেই।

বিনীত—
রতীন রায়
কলিকাতা—৩০

সবিনয় নিবেদন,

৩১শে মে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একজন শিল্পীর সম্বন্ধে শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত পত্রটি পড়ে বিশেষ মর্মাহত হলাম।

পত্রটিতে শিল্পীর নাম উল্লেখ না করে যে-সব উক্তি প্রকাশ পেয়েছে, তা শিল্পী শ্রীপ্রকাশ কর্মকার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হবার যথেষ্ট প্রমাণ রাখে। কারণ, আপনার পত্রিকায় সমালোচকের উত্তরে প্রকাশবাবু হার্বার্ট রীড কৃত কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করেছিলেন।

তাঁর মত একজন প্রবীণ ঐতিহাসিক কলা-সমালোচক যে সকল ছবি সম্বন্ধে 'বিজাতীয়' বা 'অনুকরণ' শব্দসমূহ প্রয়োগ করলেন, তা ভেবে আমরা বিমূঢ় হয়েছি।

তিনি রীড কৃত যে লাইন কয়টি লিখেছেন, তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করলে মনে হয়, non-representational art-এর মধ্যে যে ধরনের ভণ্ডামি প্রকাশ পাচ্ছে—সে বিষয়েরই পুনরুক্তি। কিন্তু প্রকাশবাবুর ছবি সম্পূর্ণ figurative। Two dimentional flatnss-এর মধ্যে সুন্দর লাইনের খেলা, আকৃতির decorative ঢঙ ও রঙের বৈশিষ্ট্য—এ সবই ভারতীয় চিত্রকলার আভিজাত্য তাঁর ছবিতে বর্তমান। প্রকাশবাবুর ছবি সমকালীন হয়েও মানসিকতার পরিবেশ সত্যই স্বদেশের শিল্পকলার ঐতিহ্যের ধারক।

হার্বার্ট রীড আধুনিক চিত্রকলার ভাষ্যকার। তিনি আধুনিক চিত্রকলার বিভিন্ন ধারাকে সমর্থন করেই সমালোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় নানারূপ উক্তি করেছেন।

শ্রীঅর্ধেন্দুবাবুর কাছে আমাদের বিনীত প্রশ্ন—তিনি কি আধুনিক চিত্রকলাকে সমর্থন করেন? যদি না করেন, তা হলে 'বিজাতীয়' রীড কৃত ঐ কয়টি লাইনের স্থান তাঁর পত্রে সম্পূর্ণ অর্থহীন। ইতি—

কানাই দাস,
কলিকাতা-১।

(৩)

প্রাহায় পৌঁছে আমার প্রথম ও প্রধান করণীয় ছিল চেক্ বিজ্ঞান আকাদেমির সঙ্গে যোগাযোগ করে আমার কাজের ব্যবস্থা করে ফেলা। বিজ্ঞানের নানা শাখায় যত কিছু গবেষণা হয় তাদের মধ্যে একটা সংগতি আনা বিজ্ঞান আকাদেমির একটি প্রধান কাজ। এ কাজের যেমন গুরুত্ব তেমনি দায়িত্ব। সত্যি কথা বলতে কি, দেশের বৈজ্ঞানিক প্রগতির চরম দায়িত্ব আকাদেমির। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা সাধারণত ঐ শাখার কোনো এক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করেন। এমনি নানা সংস্থা আছে। তাদের সবার উপরে এই বিজ্ঞান আকাদেমি। ভ্লাটাভা নদীর ধারে যেখানে এ দেশের বিখ্যাত সুন্দর এবং প্রকাণ্ড জাতীয় রঙ্গমঞ্চ তার ঠিক উল্টো দিকে বিজ্ঞান আকাদেমির অফিস। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম আমার আগমনবার্তা জানাতে। ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় জানতে পারলুম যে, আমি যে সংস্থায় কাজ করব তার অধিকর্তা এখন জেনিভায়। তাঁর ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে। এই সুযোগে এ কদিনের মধ্যে আমি বরং প্রাহার বাইরে কোথাও ঘুরে আসতে পারি।

—এই এলেন, এরই মধ্যে কাজ আরম্ভ করবেন কি একটু অভ্যস্ত হয়ে নিন আমাদের আবহাওয়ায়! এই বলে আমাকে খুব খুশী করে বিজ্ঞান আকাদেমি বিদায় দিলেন।

আমি বাড়ি ফিরে এসে ঠিক করলুম, বোহেমিয়ার উত্তরাংশে ক্রকনশে পাহাড়ের নীচে কটা দিন কাটিয়ে আসব। আর সেই মতো আমিই প্রস্তাব করলাম। আমি ছুটির মধ্যে বসে না থেকে ভূতত্ত্বের কিছু কিছু বিজ্ঞানীরা শুরু করে দিয়েছিল। পাহাড় অঞ্চলে বেড়ে মাঝে মাঝে 'ফিল্ড ওয়ার্ক' করতে। ও দেশে বসে থাকা মুশকিল, বসে থাকা সাজেই না। আমার শখ ভূতত্ত্ব পড়ার, এ কথা সেই এরা জানত। অমনি ব্যবস্থা হয়ে গেল আপনি। ঠিক হয়ে গেল ভূতত্ত্ব সংস্থার একটি দলের সঙ্গে আমি যাব ফিল্ড ওয়ার্ক করতে। যে ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে কাজ করিয়ে নেবার ভার নিয়েছিলেন তিনি উক্ত সংস্থার একজন কর্মী —নাম ভ্লাদিমির। আমার সঙ্গে আলাপ হতেই আমি নাম দিয়ে দিলুম—ভোলাবাবু। সেই নামেই তিনি এখনও পরিচিত। তাঁর স্ত্রী লীডা দেবীও এ নিয়ে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন নি। ভোলাবাবু বললেন—চলে আসুন আপনারা আমাদের গ্রামে ক্রকনশে পাহাড়ের তলায়। সেখানে এবং পাহাড়ের উপরে দু জায়গাতেই আমাদের ক্যাম্প হয়েছে। আপনারা থাকবেন পাহাড়ের নীচে আর অমি ঘুরবে আমাদের সঙ্গে মোটর বাইকে। এ ব্যবস্থা আমাদের মনঃপূত হল।

পরদিন ট্রেনে করে সন্ধ্যার সময় গিয়ে পৌঁছলাম পাহাড়তলীর স্টেশনে। ভোলাবাবু বলেছিলেন, তিনি প্রাহা থেকে মোটর বাইক-এ করে আসছেন এবং আমাদের আগেই এসে পৌঁছবেন। স্টেশনে থাকবেন তিনি। সেখান থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন গ্রামে তাঁদের বাড়িতে। কিন্তু দেখলুম, ভোলাবাবু বা তাঁর মোটর বাইক কারুরই কোনো চিহ্ন নেই। জায়গাটা আমাদের অচেনা। অমি একবার এসেছিল, তাই চেনে খানিকটা। স্টেশন থেকে বেশ কিছু দূরে গ্রাম। অমি বললে, ও ঠিক নিয়ে যেতে পারবে। লোকে তাড়াহুড়ো করে কোথাও আসবার সময় এটা ওটা ভুলে ফেলে আসে; আমাদের হয়েছিল ঠিক উল্টো। আমরা তাড়াহুড়োর জিনিস বাছাবাছির সময় না পেয়ে তিনখানা বাড়তি সুটকেস নিয়ে এসেছিলুম। এ ছাড়া রুকস্যাক, থলি এবং আরো কত কি ছিল। প্রত্যেকে পিঠে একখানা করে রুকস্যাক বেঁধে দু হাতে সুটকেস ব্যাগ প্রভৃতি বাগিয়ে বেরিয়ে পড়লুম স্টেশন থেকে। কিছুদূর এগিয়েই দেখা গেল রাস্তা আর রাস্তা নেই— অজগরের মত ধীরে ধীরে রেলের লাইনের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। অমি স্বীকার করলে যে তার রাস্তার গোলমাল হয়েছে। আমরা বললুম— আচ্ছা বেশ, গ্রামটা কোন্ দিকে মনে আছে? অমি তখন আমাদের নিয়ে খানিকটা পিছন ফিরে গেল। তারপর একটা টিলার উপর উঠে আঙুল দিয়ে দূরে দেখিয়ে বললে—

ঐদিকে! তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। টিলার নীচে বহুদূরবিস্তৃত এক উপত্যকা তার এক দিকে একটা ছোট পাহাড় আর অন্য দিকে পাহাড়েরই মত উঁচু কয়লার গুঁড়োর স্তূপ, কয়লার খনির ক্ষেত্রে যা থাকে। খুব সম্ভবত গ্রামটা কয়লাগুঁড়োর পাহাড়েরই আড়ালে—কারণ, গ্রামের কোনো আলো আমাদের চোখে পড়ল না এবং সেই ঘনায়মান কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারে গ্রাম যে কত দূর তারও আন্দাজ পেলুম না। তবে একটা রাস্তা পাওয়া গেল। লামি বললে—এইটেই বোধ হয় গ্রামে যাবার রাস্তা।

অনিশ্চিত পথ। অনির্দিষ্ট যাত্রা। চারটি প্রাণী—একজনের পিছনে আর একজন, মাথা নীচু করে গুটি গুটি এগোচ্ছি। দু পা এগিয়েছি, দেখি একদল লোক হল্লা করতে করতে আমাদের দিকে আসছে। মদ খেয়েছে। আমাদের লক্ষ করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে শুনলুম—বিদেশী লোক। কে এরা?

একজন এগিয়ে এল। কম বয়েসী একটি ছেলে—মুখে হালকা হালকা সোনালী গোঁফ দাড়ি। কদিন কামায়নি কে জানে? দু পায়ে দাঁড়াতে পারছে না—টলছে। মাতাল দেখে লামি আর লামির মা হন হন করে দূরে সরে পড়লেন। মাতাল ছেলেটি আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে—কোথায় চলেছ তোমরা?

বললুম—গ্রামে যাচ্ছি।

—তবে কোন্ গ্রামে?

এই সেরেছে। গ্রামের নাম তো জানা নেই। দু একবার শুনেছিলুম বটে, কিন্তু চেক গ্রামের নামগুলো এমন শক্ত যে, মুখস্থ না করে নিলে মনে থাকবার কথা নয়। অসহায়ভাবে মিতুর দিকে তাকালুম। —কিরে মিতু, গ্রামের নাম জানিস?

মিতু ঘাড় নেড়ে বললে—না।

আমি তখন অন্ধকারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললুম—ও........ই নীচের দিকে।

ছেলেটি বোধ হয় ভাবলে, আমরা সত্যিই কোনো থাকবার জায়গা ঠিক করে আসিনি। সন্ধ্যের সময় খুঁজে দেখছি, কোথায় থাকা যায়। সে বললে—কোথায় ঘুরে মরবে? চল আমার বাসায়। সেখানে থাকবে।

আমি বললুম—আমাদের এক বন্ধু আছেন নীচের গ্রামে। অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্যে।

—নাম কি?

নাম বললুম। ছেলেটি বললে—ও নামে তো তিন চার ঘর আছে। হয়তো আরো বেশী। দাও তোমার সুটকেসটা। আমি বয়ে নিয়ে যাবো।

কথা কওয়ার ফলে পিছিয়ে পড়েছিলুম। দূর থেকে গৃহিণীর তাগিদ কানে এল—মাতালকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসো।

লোকটা এমনভাবে কথা কয়ে উঠল যে,

মনে হল, আমাদের বাংলা কথা বুঝেছে। বললে—ভয় নেই। ভয় পেও না, আমি তোমাদের ঠিক পৌঁছে দেব। বলে ভারি স্যুটকেসটা আমার হাত থেকে প্রায় কেড়েই নিল। আমি চেঁচিয়ে গৃহিণীকে বললুম—মাতাল হলেও লোকটা ভাল। এ ভাল মাতাল।

খানিক হেঁটে আমরা কয়লা-খনির সদর দরজার কাছে এসে পৌঁছলুম। সেখান থেকে ডান-হাতি একটা সুঁড়ি রাস্তা গেছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নীচে উপত্যকার দিকে নেমে। মনে হল, সেইটেই গ্রামে যাবার শর্টকাট পথ। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করতে সে বললে—এইটেই গ্রামে যাবার রাস্তা বটে, কিন্তু দাঁড়ান, হয়তো পাকা রাস্তা দিয়ে আপনাদের গ্রামে পৌঁছে দিতে পারব। দেখি একটা গাড়ি পাওয়া যায় কিনা। 'পানি' (অর্থাৎ শ্রীমতী) আসুন তো একবার আমার সঙ্গে। এই বলে গৃহিণীকে সঙ্গে করে কয়লাখনির আফিসে টেলিফোন করতে ঢুকল।

আমাদেরই কপাল খারাপ—গাড়ি নিয়ে কর্তারা একটু আগেই শহরে বেরিয়েছেন, ফিরতে দেরি হবে। টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে কয়লাখনির আফিস থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটি বললে—কোনো ভয় নেই, আমি ঠিক পৌঁছে দেব তোমাদের। বলে দু হাতে দুটো ভারি ভারি স্যুটকেস নিয়ে রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। পা দুটো যে ভেঙে ভেঙে পড়ছে সে দিকে খেয়ালই নেই।

আমরা হাঁ হাঁ করে আপত্তি করে বললুম। প্রথমত, অচেনা লোক নিয়ে এত মাল বওয়াই কি করে? দ্বিতীয়ত, অন্ধকারের মধ্যে এই মাতাল কোথায় নিয়ে যায় তার ঠিক কি? বললুম—আপনি কেন কষ্ট করবেন? রাস্তাটা কোন্ দিকে বলে দিন, আমরা ঠিক যেতে পারব।

—না, না, অন্ধকারে কোথায় যাবেন এত মালপত্র নিয়ে? কোথায় হোঁচট খেয়ে পড়েন তারই ঠিক কি? 'তুমি' থেকে এতক্ষণে আমরা 'আপনি'তে উঠলুম। মাতাল হলে কি হয়, আমাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান দেখলুম বেশ টনটনে। আমাদের ইতস্তত ভাব বোধ হয় বুঝল খানিকটা। পকেট থেকে চকোলেট বার করে বললে—এই নিন চকোলেট। ভয় পাবেন না। বলে মস্ত এক প্যাকেট চকোলেট আমাদের হাতে গুঁজে দিলে। —এই নিন আর একটা চকোলেট। এই নিন আরেকটা। ভরসা দেবার উৎসাহে এবং মাতাল-সুলভ উদারতায় তিন প্যাকেট চকোলেট তিনজনকে দান করে ফেলল। আমরা মহা অপ্রস্তুতে পড়লুম। বর্তমান চেকোশ্লোভাকিয়ায় চকোলেটের দাম সাংঘাতিক। মাঝারি সাইজের এক প্যাকেট চকোলেট দশ বারো মুদ্রার কম নয়। আর এই অচেনা লোকটা আমাদের তিনটে বড় বড় প্যাকেট খয়রাত করে ফেলল। ফিরিয়ে দিতে গেলুম —কে শোনে কার কথা। ভারি ব্যাগ দুটো দু হাতে তুলে নিয়ে টলতে টলতে এগুল অন্ধকারের মধ্যে। আমরা চললুম তার পিছু পিছু।

পায়ে চলা এবড়োখেবড়ো রাস্তা। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে ভিজে সপসপ্ করছে। আধ-ভাঙা একটুখানি চাঁদের মুখ কখনো দেখা যাচ্ছে, কখনো বা যাচ্ছে না। টর্চ আমাদের একখানা আছে বটে কিন্তু ব্যাটারি নেই। ভারি মাল নিয়ে পিছল পথে সাবধানে চলতে হচ্ছে, কখন না পিছলে পড়ে যাই। মাতালের কিন্তু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সার্কাসের দড়ির উপর দিয়ে যারা মাতালের অভিনয় করতে করতে হাঁটে ঠিক সেই রকম। রাস্তার মাঝখানে ব্যাগ দুটো নামিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল। আমরাও থামলুম একটু জিরোতে। ছেলেটি বললে—ভয় পাবেন না, ঠিক পৌঁছে দেব আমি।

গৃহিণী হেসে বললেন—কোথায় পৌঁছে দেবেন? বাড়ি চেনেন আপনি?

—গ্রামের মাঝখানে পৌঁছই আগে। তারপর খুঁজে বার করতে কতক্ষণ? দেখুন না, আপনাদের শর্ট কাট দিয়ে নিয়ে যাই। তারপর মাল দুটো এক হেঁচকায় মাটি থেকে তুলে নিয়ে আমার দিকে ফিরে বললে—মহাশয়, কোথা থেকে আসছেন বলুন তো? ঘর কোথায়?

বুঝলুম, দেশ জানতে চাইছেন। বললুম—কেন, ইন্ডিয়া!

—আরে না, তা কখনো হয়? বলে সিগারেটে একটা গভীর টান দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল। আমার কথা বিশ্বাসই করল না। ভাবলে, ঠাট্টা করছি। এইভাবে চলতে চলতে পাহাড়ের ঢালুটা পার হয়ে ক্রমে আমরা সমতল জমিতে নামলুম। পিছনে গুঁড়ো কয়লার প্রকাণ্ড আকাশচুম্বী পাহাড়—খনি থেকে কয়লা তোলবার পর যা

থাক যার তা জমা করতে করতে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সামনে গ্রামের আলো চোখে পড়তে লাগল। ছেলেটি বললে—এই রাস্তা দিয়ে সোজা গেলেই গ্রামের চৌরাস্তা পাবো। এই বলতেই লামি দেখি একটা নতুন রাস্তা আবিষ্কার করে হনহন করে চলতে শুরু করেছে।

ছেলেটি বলে উঠল—আরে জ্যোচ্না, যান কোথা?

আর জ্যোচ্না! জ্যোচ্না অর্থাৎ কুমারী লামি ততক্ষণে বেশ কিছুদূরে এগিয়ে গেছেন এবং তারপর শুনলুম আমাদের ডাকছেন—পেয়েছি। এই রাস্তা। এদিকে চলে এস সবাই।

আমরা যেতে যাই, মাতাল বাধা দেয়: বলে—জ্যোচ্না কি জানে? আমাদের গ্রাম আমি জানি। ডাকো জ্যোচ্নাকে, আমি ঠিক নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।

কিন্তু লামি ততক্ষণে স্থিরনিশ্চিত যে সে ঠিক রাস্তা ধরেছে। সে ফিরল না। দূরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল। আমরা দোটানার মধ্যে পড়ে দাঁড়িয়ে রইলুম খানিকক্ষণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতলো লামিই। রাগে মুখখানা তুলে নিয়ে মাতাল বললে—চলুন, দেখাই যাক জ্যোচ্না কোন্ দিকে নিয়ে যেতে চান।

লামির পথ ধরে চলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এক নিঃঝুম বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালুম। লামি বললে—এই বাড়ি। দেখে মনে হল, বাড়িতে কেউ নেই। কে জানে, আজ সবাই বাইরে বেরিয়েছে কিনা? কিন্তু তা নয়, এখানকার লোকেরা রাতে বাড়ির মধ্যে চুপচাপ থাকতে ভালবাসে—বাইরে কোনো শব্দ কানে আসে না। সেই ঘণ্টা টিপলুম, অমনি ভোলাবাবুর বোন এসে দরজা খুলে দিলেন। পিছনে ভোলাবাবুর বাবা।

মাতাল ছেলেটিকে দেখে ভোলাবাবুর বাবা বললেন—আরে, তুমি কোথা থেকে?

ছেলেটি বললে—এঁরা হারিয়েছিলেন দিশে-হারা হয়ে, তাই পৌঁছে দিয়ে গেলুম।

আমরা বললুম ছেলেটির দয়ার কথা। জানালুম, আমরা কত কৃতজ্ঞ।

ভোলাবাবুর বাবা আমাদের মালপত্র ভিতরে টেনে নিতে নিতে বললেন—আসুন সবাই। ছেলেটিকে বললেন—তুমিও এসো।

ছেলেটি রাজী হল না। বললে—আমার কর্তব্য শেষ। এখন আমি চললুম। এ অবস্থায় আজ আর নয়। আর এক দিন আলাপ করা যাবে। বলে চলে যেতে যেতে ভোলাবাবুর বাবাকে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—এঁরা কোথাকার লোক?

ভোলাবাবুর বাবা বললেন — কেন, ইণ্ডিয়ার।

—আঁ! বলে সে আমাদের দিকে আর একবার বড় চোখ করে তাকিয়ে মাথা-টাথা

চুলকে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল টলতে টলতে।

আমরা ভোলাবাবুর বাবাকে বললুম—একে আপনি চেনেন?

—চিনি বইকি। খনি-মজুর—এই তো ক মাস আগে কাজের উৎকর্ষের জন্যে মস্ত একটা প্রাইজ পেয়েছে। সেদিন আমরা সবাই ওকে অভিনন্দন দিলুম। ছেলেটি ভাল, অনেক গুণ আছে, তবে ঐ—হঠাৎ এক-এক দিন কি খেয়াল চাপে, মদ খেয়ে বদ্ধ হয়ে যায়। তবে অভদ্রতা কোনোদিন করেনি।

আমরা বললুম—আমাদের সঙ্গে তো অতি ভালো ব্যবহার করেছেন। উনি নিজে থেকে মাল বয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন তাই, নইলে অন্ধকারে মাঠের মধ্য দিয়ে আমরা কিছুতেই আসতে পারতুম না।

ভোলাবাবুর বাবা বললেন—ছেলেটির বাবা ছিল আমার সমসাময়িক। আমরা একসঙ্গে খনিতে কাজ করতুম। তখনকার দিনে কী ছিল আমাদের অবস্থা! খনির কুলি মানে মজুর সমাজের মধ্যেও সবচেয়ে নগণ্য। তখনকার দিনের কথা দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়ে। ঐ ছেলেটির বাবা কয়লা-খনির ছাদ পড়ে মারা যায়। তারপর অনেক দিন দুঃখে কষ্টে কাটিয়েছে ওদের পরিবার আর আজকে ঐ ছেলের রোজগারে—দেখে আসবেন ওদের বাড়ি, অবাক হবেন দেখে।

আমরা বললুম—উনি তো ও'র বাসাতেই আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন।

ভোলাবাবুর বাবা নিজে খনি-মজুর ছিলেন। দেশে বিপ্লব হবার পর খনি-মজুরদের অবস্থা একেবারে ফিরে যায়। আগেকার দিনের সঙ্গে কোনোরকম তুলনার কথা ভাবাই যায় না। এখন যা হয়েছে তা অবিশ্বাস্য রকমের ভাল। বয়েস হওয়ার কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন কয়েক বছর হল। উনি সমেত বেশ বড় একটা বাড়ির দোতলাটা নিয়ে আছেন। অনেকগুলি ঘর। নীচের তলায় মেয়ে-জামাই থাকে। পেনসন পান। সচ্ছল অবস্থা। মাঝে মাঝে প্রায়ই খুচরো কাজের জন্যে ডাক আসে—তখন রোজগার হয় আরো বেশী। নিজে লেখা-পড়া নিয়ে আছেন এখন। বাড়ি-ভরা বই। বয়েস-কালে সরস্বতীর প্রসাদে পণ্ডিত ছিলেন, এখন সুদে সুদ্ধ পুষিয়ে নিচ্ছেন। ছেলে বুদ্ধিমান, বিদ্যাচর্চা করেছে, তার ফলে আজ ভূতত্ত্ব সংস্থার কাজ করে। তবে মজা আছে। ভোলাবাবু বিজ্ঞানচর্চা করেছেন, ভূতত্ত্ব সংস্থার গবেষণায় লিপ্ত, কিন্তু রোজগারের কথা যদি ভাবা যায়, তা হলে ঐ মাতাল ছেলেটি, যে খনি-মজুর, তার রোজগার ভোলাবাবুর থেকে অনেক বেশী। ভোলাবাবুর পকেট তিন প্যাকেট চকোলেট পকেট থেকে বার করে অচেনা পথিকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া অত সহজ হত না।

ভোলাবাবুর মা ও বোন আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন রান্নাঘরে। রান্নাঘরের গরমে এসে বেশ আরাম পেলুম। ভোলাবাবুর মা বললেন, তাঁর ছেলে একটু আগে মোটর বাইকে করে বাড়ি পৌঁছেছেন। পৌঁছেই আমরা এসেছি কিনা খোঁজ নিয়ে ছুটেছেন স্টেশনে। খুব সম্ভবত আমরা শর্টকাটে এসেছি বলেই পথে মোলাকাত হয়নি।

আমাদের পৌঁছতে রাত হয়ে গিয়েছিল। খাবার সময় উতরে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। এ সময় কারুর বাড়িতে গরম খাবার থাকবার কথা নয়—বড় জোর পাঁউরুটি আর চীজ আশা করা যেতে পারে। কিন্তু
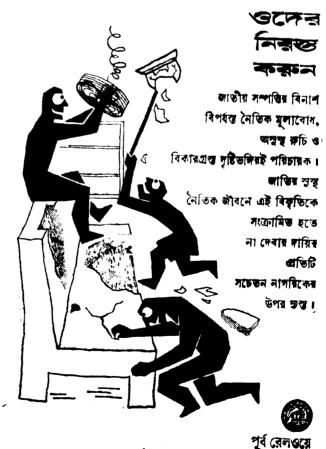
ভোলাবাবুর মা কোথা থেকে জানি না গরম সুপ, মাংসের ঝোল প্রভৃতি চর্বচোষ্য এনে হাজির করলেন।

ভোলাবাবুর মোটর বাইকের শব্দ পাওয়া গেল। আমাদের না পেয়ে ফিরে আসছেন। আমাঘরে ঢুকেই বললেন—আপনাদের পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে রাস্তায় দেখা। তাতেই দেরি। ধরে দিয়ে গেল আমাকে তার এক বন্ধুর বাড়ি। এখন তো দোকান সব বন্ধ, কাজেই বন্ধুর কাছ থেকে এই দেখুন এই চকোলেটটা আদায় করে আমার হাত দিয়ে আপনাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। এই বলে ভোলাবাবু মস্ত এক প্যাকেট চকোলেট রাখলেন টেবিলের উপর।

আমরা অবাক হয়ে বললুম—সে কি, আমরা তো তিন প্যাকেট চকোলেট পেয়ে গেছি ইতিমধ্যেই।

—তিন প্যাকেটের জন্যেই তো মুশকিল। আপনারা চারজন—তার উপর সাগরপারের অতিথি। ছেলেটি ভারি অস্বস্তি বোধ করছিল। ভাগ্যিস আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এবার বাড়ি গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমবে।

(ক্রমশ)

বেগম মেরী বিশ্বাস

বিমল মিত্র

॥ ২৫ ॥

সচ্চরিত্র পুরোকায়স্থকে দেখে কান্ত সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই বুড়ো মানুষটার যে এমন দশা হবে তা কল্পনাও করতে পারেনি। তার-সংসার গেছে, বউ-ছেলে-মেয়ে গেছে। গাঁয়ের লোকও তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, তার ব্যবসাও গেছে। কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছে। না-খেয়ে দিন কাটিয়েছে, ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে মন কেমন করেছে। রাতের অন্ধকারে গ্রামে গিয়ে তাদের দেখতে চেয়েছে। কিন্তু লোকের ভয়ে আবার চলে এসেছে সেখান থেকে। তারপর এখানে এসে মতিঝিলের নেয়ামত খাঁকে ধরে এই চাকরি পেয়েছে। বুড়ো বয়েসে এই খাটুনির চাকরি করবার ক্ষমতাও নেই শরীরে, অথচ না করেও উপায় নেই। দুটো খেতে তো হবে।

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—তা তোমাকে কী কী কাজ করতে হয়?

সচ্চরিত্র বললে—বাবাজী, কাজের কি আর অন্ত আছে? মদের গন্ধে আমার বমি আসে, কিন্তু নাকে কাপড় দিয়ে সেই মদের মধ্যেই কাটাতে হয়। মদের জাহাজ এলে সেই মদ মাথায় করে বয়ে আনতে হয়, ভাঁটিখানায় রাখতে হয়, রেখে আবার তদারকি করতে হয়। আবার মদের টান পড়লে খবর দিতে হয় যোগানের জন্যে—অপচো-নষ্ট হলে আমাকেই আবার তার জবাবদিহি করতে হয়—

মতিঝিলের পুরোনো যারা খেদমদগার তাদের সবাইকে মেহেদী নেসার সাহেব তাড়িয়ে দিয়ে বরখাস্ত করে দিয়েছে। ঘোসিটি বেগমের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও আর জায়গা নেই মতিঝিলে। বড় সাধ করে ঘোসিটি বেগম তৈরি করেছিল মতিঝিল। একদিন তার আশা ছিল মুর্শিদাবাদের মসনদ তারই দখলে যাবে। মীর্জার ভাই এক্রামউদ্দৌলাকে নবাব করার স্বপ্ন দেখতো ঘোসিটি। কিন্তু তাও চলে গেল। নিজের পেটে ছেলে হলো না বলে মীর্জার ভাইকে পুষ্যি নিয়েছিল। কিন্তু সে-ও মারা গেল। স্বামীও চলে গেল। তাতেও নবাবজাদীর তত দুঃখ ছিল না। দেওয়ান রাজবল্লভ ছিল ডান হাত। হুসেনকুলিও ছিল ঘোসিটির আর একজন সাকরেদ। শেষ পর্যন্ত ছিল নজর আলি।

—নবাবজাদীদের কেলেংকারী কাণ্ড তুমি তো জানো নিশ্চয়ই বাবাজী! শুনেছও তো কিছু কিছু—

কান্ত বললে—কিছু কিছু শুনেছি, সমস্ত জানি না—

—ও না-জানাই ভাল বাবাজী। সাধে কি আর এ চাকরি করতে ভাল্লাগে না। ও-সব রাজা-বাদশার কেচ্ছা-কীর্তি এখন দেখে দেখে আমার চোখ পচে যাচ্ছে—

—এখনও দেখছেন নাকি আপনি? এখনও হয়?

—তা হবে না? এই কালই তো হলো বাবাজী! চেহেল-সুতুন থেকে গুলসন বলে এক বেগমকে নাচাতে নিয়ে গেছলো মতিঝিলে। আমি তো ভেতরে যেতে পারিনে, আমার যাবার হুকুমই নেই। আমি সমস্ত রাত ধরে জেগেছি। আমি হলাম মদের ভাঁড়ারি, আমার তো ঘুমোলে চলে না। ভেতরে ঘুঙুরের শব্দ শুনছি আর মাতালদের চেঁচানি শুনছি আমার ভাঁড়ারে বসে বসে—চোখ দুটো ঘুমে ঢুলে আসছে, কখন তলব পড়ে তার তো ঠিক নেই। হঠাৎ বশির মিয়া......

বশির মিয়ার নাম শুনেই কান্ত চমকে উঠলো।

—বশির মিয়াকেও আপনি চেনেন নাকি?

—বশির মিয়াকে চিনবো না? ওর পিসে-মশাই হলো মেহের আলি মনসুর সাহেব। মেহেদী নেশার সাহেবের আসল সাগরেদ বাবাজী! আমাকে এসে চুপি চুপি বললে—আমাকে একটু দারু পিলাও ইব্রাহিম! তা আমি বুড়ো মানুষ, আমি হলাম চাকরস্য চাকর। আমি আর কী করবো, আমি ঢালতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ নেয়ামত খাঁ এসে হাজির, দেখতে পেয়েই আমাকে যা-নয়-তাই বলে মুখ খারাপ করে গালাগাল দিতে লাগলো—

—আর বশির মিয়া?

—বশির মিয়া তো ততক্ষণে সেখান থেকে চম্পট দিয়েছে। ওদিকে তখন নেশার তুফান উঠেছে মতিঝিলের ভেতরে। মেহেদী নেসার

সাহেবের আঙ্গুর নেশা হলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না কি না। অথচ আজ যে আমার এই দুর্দশা এ সব তো ওই নেসার সাহেবের জন্যেই। ওই ইয়ারজান, সফিউল্লা সাহেব, ওরাই তো আমার মুখে ম্লেচ্ছ-মাংস পুরে দিয়েছিল, নইলে কি আর আজ আমার জাত যায়! নইলে কি আর আজ আমাকে মতিঝিলের ভাঁটিখানার খেদ্‌মদগারের কাজ করতে হয়? নইলে কি বাবাজী আমি আজ লজ্জায় মুখ ঢেকে বেড়াই? তা তুমি এখানে কী করতে? আর বিয়ে-থা করেছ নাকি?

কান্ত মন দিয়ে সব শুনছিল। বললে—না।

—তা আর কী করেই বা করবে? আর আমি থাকলে না-হয় একবার চেষ্টা করে দেখতুম! ওদিকে খবর শুনেছ তো? সেই পাগলাটা, যার সঙ্গে শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর মেয়ের বিয়ে জোর করে দিয়ে দিলে, সেও তো সংসার করতে পারলে না। সেই মেয়েও শুনেছি পালিয়েছে বাড়ি থেকে! অথচ তোমার সঙ্গে বিয়েটা হলে এমন ঝঞ্ঝাটও হতো না। তোমরা দুটিতে সুখী হতে, আমাকেও আর এই ইব্রাহিম খাঁ হতে হতো না।

কান্ত হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, আপনাদের মতিঝিলে কোনও চাকরি খালি আছে?

—চাকরি? কেন? তোমার সেই সাহেব-কোম্পানির সোরার গদীর চাকরির কী হলো? সেটা নেই? লড়াই-এর সময় বুঝি গদি-টদি ফেলে সাহেবরা পালিয়েছে? নিজামতের চাকরিতে এই একটা সুবিধে বাবাজী, তাড়া থাকে না বটে, কিন্তু চাকরিটা পাকা! এ সহজে যায় না কারো—

—আমাকে একটা চাকরি দিতে পারেন আপনি, আপনাদের মতিঝিলে?

—তা এখন তুমি কী করছো?

—কিছুই করছি না, সে না-করারই মত, একটা চাকরি খুঁজছি—যে-কোনও চাকরি, খেরাঘুরির চাকরি না। বসে বসে খাতা-লেখার কি হিসেব-পত্তোর দেখাশোনার কাজ পেলেই ভালো হয়।

সচ্চরিত্র বললে—আমি নেয়ামত মিয়াকে বলে তোমায় জানাবো। নেয়ামত নেসার সাহেবের খুব পেয়ারের লোক! তা তোমার কোথায় পাবো? কোথায় তোমায় খবর দেব?

কান্ত বললে—এই এখানেই পাবেন আমাকে, এই সারাফত আলির খুশবু তেলের দোকানের পেছনেই আমি থাকি—

সচ্চরিত্র বললে—তা তুমি যেন আবার কাউকে বলে দিও না বাবাজী যে আমাকে তুমি দেখেছ। কাউকে বোল না। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াই, বড় লজ্জা করে বাবাজী। আমি ঈশ্বর কালীবর ঘটকের পৌত্র, ঈশ্বর ইন্দিবর ঘটকের পুত্র, ও-সব

কথা ভুলতেই চেষ্টা করি! মনে রেখে তো কোনও লাভ নেই, কী বলো বাবাজী? মনে করলেই কেবল কষ্ট—

তারপর একটু থেমে বলতে লাগলো—তাই বাবাজী, মরে তো যেতামই, তুমি তবু তুলে এনে সেবা করলে বলে একটু গতরে শক্তি পেলুম। কবে এমনি করেই বেঘোরে প্রাণটা যাবে। বাপ-পিতেমো'র নামও কেউ করবে না—মরে গেলে পিণ্ডি দিতেও কেউ থাকবে না—

বাইরে তখনও কেউ জাগেনি। সারাফাত আলির তখনও জাগবার সময় হয়নি। চেহেল-সতুনের নহবৎখানায় তখন ইনসাফ মিয়া টোড়িতে সুর ধরেছে।

সচ্চরিত্র সেই দিকে চোখ পড়তেই বললে—সুর তো বেশ মিঠে সুরেই বাজাচ্ছে মিয়া-সাহেব, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে যে ছুঁচোর কেত্তন চলেছে তা তো বাইরের লোক কেউ টের পাচ্ছে না। কাল তো চেহেল-সুতুনের মধ্যে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেছে বাবাজী!

কান্ত উদগ্রীব হয়ে উঠলো। বললে—চেহেল-সুতুনের ভেতরেও আপনি যান না কি?

—না, ভেতরে আর কী করে যাবো! কিন্তু চেহেল-সুতুনের খবর তো মতি-ঝিলেও ভেসে ভেসে আসে।

—কী হয়েছে কাল? বলুন না!

—নেয়ামত মিয়ার কাছে শুনেছিলাম কাণ্ডটা! নজর মহম্মদ হঠাৎ দিনের বেলা এসে নেসার সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেল দেখে আমি নেয়ামতকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা কী! শুনে তো আমার চোখ কপালে উঠলো বাবাজী। পাপের কি আর শেষ আছে চেহেল-সুতুনে! আহা!

কান্ত আবার বললে—কী হয়েছে তাই বলুন না!

সচ্চরিত্র বললে—তোমরা বিয়ে-থা করোনি, ওসব তোমাদের না-শোনাই ভালো বাবাজী। মরিয়ম বেগম বলে একজন নতুন বেগমসাহেবা এসেছিল চেহেল-সুতুনে। মরিয়ম বেগম হচ্ছে গিয়ে লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলির মেয়ে। লস্করপুরের তালুকদার কাশিম আলিকে একদিন ওই নেসার সাহেবই চর লাগিয়ে খুন করেছে, তা কেউ জানে না। তারপর তার তালুকদারিও গেছে, সবই গেছে, কিন্তু একটা মেয়ে ছিল, সেই মেয়ের নামই হলো গিয়ে মরিয়ম বেগম। নেসার সাহেবের লোক তাকে ধরে নিয়ে এসে পুরেছিল চেহেল-সুতুনে। ওসব ওই বশির মিঞাটার কাজ। শুনলাম, নাকি কোন্ হিন্দু ছোঁড়াকে দিয়ে তাকে এখানে আনিয়েছিল। আজকাল টাকা পেলে কারো কিছু করতে তো আটকায় না। টাকার জন্যে আজকাল লোকে মানুষই বলো খুন করে ফেলছে—টাকার এমনই গুণ বাবাজী—

—তা তারপর কী হলো বলুন।

মজুরিয়া বললে—আমার তো সব শোনা কথা বাবাজী, ঠিক-ঠিক বলতে পারিনে। আমি তো নিজের চোখে দেখিনি কিছু। শুনলাম কাল না কি একজন বাঁদীকে ধরে খোজারা খুব শাস্তি দিচ্ছিল—সে নাকি অন্তঃসত্ত্বা ছিল—তার নাম জুবেদা, ওই মরিয়ম বেগমেরই বাঁদী!

—কী শাস্তি দিচ্ছিল?

—তাকে একেবারে ন্যাংটো করে পা দুটো ওপরে বেঁধে মাটিতে হাত দুটো পুঁতে দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছিল। বাঁদীটা আবার বোবা, মুখে কথা বলতে পারে না। তাই না জানতে পেরে মরিয়ম বেগম একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল খোজাদের ওপর! খোজারা হলো চেহেল-সুতুনের কর্তা। নানী-বেগমই বলো আর লুৎফুন্নিসা বেগমই বলো, ওরা তো আসল মালিক নয়। আসল মালিক হলো খোজারা! তাদের কাজে বাধা দেওয়া! সে একেবারে হৈ-চৈ কাণ্ড চেহেল-সুতুনের ভেতরে। নানী-বেগম চীৎকার শুনে নিজে দৌড়ে এসেছে। নজর মহম্মদ করেছে কি, মতিঝিলে এসে নেসার সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেছে। কিন্তু মজাটা কি হলো জানো বাবাজী— মরিয়ম বেগম সেইখানে সকলের সামনে ফাঁস করে দিয়েছে যে, সে আসলে লস্করপুরের তালুকদার কাশেম আলির মেয়ে নয়, তার আসল পরিচয়টা বলে দিয়েছে। আসল পরিচয়টা বলে দিতেই নেসার সাহেবের মুখ চুন! নেসার সাহেব আর সেখানে দাঁড়ায়নি, সোজা মুখে চুন কালি মেখে পালিয়ে চলে এসেছে মতিঝিলে। এসে ঢোক-ঢোক করে কেবল মদ গিলেছে আর নেয়ামতকে গালাগাল দিয়েছে—

কান্ত শুনতে শুনতে শিউরে উঠলো। জিজ্ঞেস করলে—মরিয়ম বেগমের আসল পরিচয়টা কী বলেছে?

—আরে, আসলে না কি ও লস্করপুরের তালুকদারের মেয়েই নয়—

—মেয়ে নয় তো কে ও? কী বললে?

—আরে, ও হলো গিয়ে সেই হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই ছিল, যেখানে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম গো, ও না কি সেই ছোটমশাই-এর দ্বিতীয়পক্ষের বউ রানীবিবি! হারামজাদারা কি না তাকে নিয়ে এসে চেহেল-সুতুনে পুরেছে। ছি ছি ছি, ওদের কি কোনওকালে ভাল হবে বাবাজী! নরকেও ওদের ঠাঁই হবে না, এই তোমাকে বলে রাখলাম। যাই বাবাজী, আজকে এখন গিয়ে আমাকে আবার নমাজ পড়তে হবে—

কান্ত তবু ছাড়লে না। বললে—তারপর কী হলো বলুন!

—তারপর আর কী হবে! তারপর নানী-বেগম মরিয়ম বেগমকে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে চলে গেল। চেহেল-সুতুনের সব বেগমরা জানতো একরকম, এখন সব দোষটা নেসার সাহেবের ঘাড়ে এসে পড়লো। তাই তো রেগে গিয়ে ভাড়া-ভাড়া মদ গিলেছে। তারপর শুনলুম না কি জুবেদাকে ছেড়ে দিয়েছে, হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে হুকুম করেছে নানী-বেগম। খোজাদের অপমানের একশেষ। এর পর কি আর তারা ছেড়ে কথা বলবে বলতে চাও?

—সে কথা থাক, হাতিয়াগড়ের রানীবিবির কী হলো বলুন? তার কোনও ক্ষতি হয়নি তো?

—এখন কী ক্ষতি হবে! কিন্তু খোজারা কি এ অপমানের পর আর ছেড়ে কথা বলবে ভেবেছ? তারা তো মুশকিলে ফেলতে চাইবেই। এর আগেও তো কত বাঁদীকে ঝুলিয়ে রেখে তিন দিন তিন রাত ধরে না-খাইয়ে-খাইয়ে ওই রকম করে মেরে ফেলেছে ওরা, তাতে তো কারোর কিছু আপত্তি ওঠেনি! তোমার এমন কী সতীপণা করবার দরকার পড়েছিল শুনি? তুমি বাছা, যখন একবার চেহেল-সুতুনে ঢুকেছ তখন জাত-জন্ম তো সবই খুইয়েছ আমার মতন, তার ওপর আবার সতীপণা দেখাতে গেলে কেন? কী বলো, আমি কিছু অন্যায় বলেছি বাবাজী?

কান্ত কী আর বলবে। কথাগুলো শুনতে শুনতে সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল।

সচ্চরিত্র বলতে লাগলো—এই যে আমি আমার কথাই ধরো না. আমি তো অতবড় নামজাদা ঘটক বংশের সন্তান. আমার পিতামহ হলেন ঈশ্বর ইন্দিবর ঘটক, আমার পিতা ঈশ্বর কালীবর ঘটক, সে-সব কথা কি আমি এখন মনে রেখেছি? সে-কথা আমি কাউকে বলি? বরং পাছে কেউ চিনতে পারে বলে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে থাকি, এই দাড়ি রেখেছি, এখন কি আর ঘটকালি করি আমি কারো? না করবো? সে-সব কথা আমি ভুলেই গেছি বাবাজী। আমি গাঁয়ে গেলে গাঁয়ের লোক আমায় তাড়িয়ে দেয়, আমার গায়ে থুতু দেয়। তা তো দেবেই! দেবে না? কী বলো তুমি? তারা তো অন্যায় কিছু করে না। তা আমি কি তাতে আপত্তি করছি? আপত্তি করবো কার কাছে বাবাজী? কে আমার আপত্তি শুনেছে? যেমন যুগ পড়েছে, তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েই চলতে হবে তো? তাই বাবাজী, আমি ভাটিখানায় বসে চুপ করে নাকে কাপড়চাপা দিয়ে কাজ করি, আর তিন-সন্ধ্যা নমাজ পড়ি। কী আর করবো বলো? আমার নিজের মনে তো কোনও পাপ নেই। তবে শুধু ওই ম্লেচ্ছ-মাংসটা এখনও খেতে পারিনি বাবাজী। ওটা খেতে কেমন যেন গা-বমি-বমি করে এখনও—এমনি করেই যে-কদিন বেঁচে থাকি, কাটিয়ে দিতে পারলেই বিদেয় নেব! কিন্তু এও তোমাকে বলে রাখলাম বাবাজী, দিন কাল বড় খারাপ পড়েছে, খুব সাবধানে থাকবে!

—তাহলে আমার একটা চাকরির কিছু চেষ্টা করবেন?

সচ্চরিত্র বললে—আমার যদি পরামর্শ নাও তো বলি এ-জায়গায় তুমি চাকরি কোর না বাবাজী। তাহলে আমার মত তোমারও ইহকাল-পরকাল দুই-ই যাবে!

—না ঘটকমশাই, সে যা-হয় হবে, আপনি আমার একটা চাকরি দেখুন। নিজামতের চাকরিই আমায় করতে হবে।

—কেন বাপু? নিজামতের চাকরির ওপর তোমার লোভ কেন এত? এর থেকে জমিদারি সেরেস্তার চাকরি একটা কোথাও জুটিয়ে নিলেই পারো। তাতে আয় কম হলেও ধর্মটা থাকে।

কান্ত বললে—সে আপনি বুঝবেন না ঠিক, মতিঝিলের চাকরি হলেই আমার ভাল হয়।

—কেন?

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ বুঝতে পারলে না কান্ত বাবাজীর এত আগ্রহ কেন মতি-ঝিলের চাকরির ওপর।

তারপর বললে—ঠিক আছে, এখন যাই বাবাজী, আমার নমাজের দেরি হয়ে গেল—

সারাফাত আলির দোকানের সামনে তখনও লোকজনের চলাচল শুরু হয়নি। সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ মশাই একা সেই রাস্তায় নেমে হন-হন করে এগিয়ে চললো। মাটির হাঁড়াটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, সব মদ রাস্তার ধুলোর ওপর পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। একটু-একটু খোঁড়াচ্ছে যেন। কান্তর মনে হলো হাতির পায়ের তলায় চাপা পড়লে আর বাঁচতো না লোকটা।

আস্তে আস্তে সচ্চরিত্র অনেক দূরে অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও কান্ত সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই তো একটু দূরে চেহেল-সুতুন। সেই তারই ভেতরে এখন হয়ত ভীষণ তোলপাড় চলছে। কেন বলতে গেল মরালী নিজের পরিচয়টা? মিথ্যে করে হোক, সত্যি করে হোক, কারো নাম বলবার দরকারটা কী ছিল? যদি এখন হাথিয়াগড়ে খবর যায়! যদি খোঁজ পড়ে রানীবিবিকে তারা না-পাঠিয়ে মরালীকে পাঠিয়েছে, তাহলে? অথচ, কেউ জানতে না-পারলে হয়ত একদিন পালিয়ে যেতে পারতো চেহেল-সুতুন থেকে।

মনে হলো এখনি যদি একবার গিয়ে সাবধান করে দিয়ে আসতে পারতো মরালীকে।

হঠাৎ পেছনে আওয়াজ হতেই কান্ত ফিরে দেখলে। সারাফাত আলি সাহেব জেগে উঠে দোকানে এসেছে।

—কী রে কান্তবাবু, সে-লোকটা কেমন আছে? সেই ইব্রাহিম খাঁ? বেটা মরেছে না জিন্দা আছে?

কান্ত বললে—মতিঝিলে চলে গেছে।

—তাহলে জিন্দা আছে? দারু পিয়ে পিয়ে কলিজায় ওদের কড়া পড়ে গেছে, ওরা কখনও মরে? ঝুট-মুট তুই কালকে চেহেল-সুতুনে গেলি না। নজর মহম্মদ এসে রাত্তিরে ডেকে-ডেকে ফিরে গেল।

কান্ত জিজ্ঞেস করলে—আজ নজর মহম্মদ আসবে?

সারাফত আলি বললে—ক্যা মালুম, ও-লোককা মর্জি! আজ এলে যাবি তুই?

—হাঁ মিয়াসায়েব, আজকে যাবোই। কালকে ইব্রাহিম খাঁর কাছে যা শুনলুম

তাতে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছি—কালকে না কি মানীবিবি নিজের আসল পরিচয় সকলের সামনে বলে দিয়েছে। সব জানা-জানি হয়ে গিয়েছে। নেসার সাহেবকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে নানী-বেগম, খোজা সর্দার পীরালি খাঁ খুব চটে গেছে, মানীবিবির ওপর। এখন কী হবে বুঝতে পারছি না! এখন যদি কিছু সর্বনাশ হয়!

সারাফত আলি বললে—কুছ নেই হোগা! মোহর পেলেই সব ফয়শলা হয়ে যাবে। এক মোহরে কাম না হয় দো মোহর দেঙ্গে, দো মোহরে কাম না হলে তিন মোহর দেঙ্গে। মোহর দিলে সব ঠাণ্ডা। সবাই খুশী। হিন্দুস্থানের বাদশা ভি মোহর পেলে সব ভুলে যায়, তো নজর মহম্মদ। নজর মহম্মদের বাপ পর্যন্ত মোহর পেলে কবর থেকে হাত বাড়াবে। তুই কিছু ভাবিসনি কান্তবাবু।

রাস্তায় কে যেন গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। গানের সুরটা কানে আসতেই কান্ত সচেতন হয়ে উঠেছে। উদ্ধব দাস না।

আমি রবো না ভব-ভবনে
শুন হে শিব শ্রবণে!

কান্ত এক লাফে রাস্তায় নামলো। তারপর চিৎকার করে ডাকতে লাগলো—দাসমশাই, ও দাসমশাই—

উদ্ধব দাস পাগলা-কছমের লোক। যেন শুনতেই পায়নি। বেশ গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে। কান্ত দৌড়িয়ে কাছে যেতেই উদ্ধব দাস পেছন ফিরলো।

কান্ত বললে—তোমাকেই তো আমি খুঁজছিলাম দাসমশাই—

কিন্তু কথাটা বলেই কেমন যেন সন্দেহ হলো। জিজ্ঞেস করলে—আপনি উদ্ধব দাস না?

—উদ্ধব দাস?

লোকটাও অবাক হয়ে গেছে। বেশ আপন মনেই গান গাইতে গাইতে আসছিল। হঠাৎ অচেনা লোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বললে—আমি উদ্ধব দাস কেন হতে যাবো বাবা, আমি তো পরমেশ্বর দাস।

—কিন্তু এ-গান তো উদ্ধব দাসেরই বাঁধা। উদ্ধব দাসই তো এ-গান গায়।

লোকটা বললে—তা হতে পারে বাবা, গানটা একদিন এক মাঝির গলায় শুনেছিলাম, তাই মুখস্থ করে নিয়েছি। ভণিতাতে তো ভক্ত হরিদাসের নাম আছে।

কান্ত মনে মনে হতাশ হয়ে গেল। উদ্ধব দাসের সঙ্গে এখন দেখা হলে খুব ভালো হতো। উদ্ধব দাসকে দেখা হলে বলা যেত যে তারই বউ চেহেল-সুতুনে আছে। তার বড় বিপদ! অথচ আশ্চর্য! যার বউ, যে বিয়ে করলো তার মাথা ব্যথা নেই, সে কেমন আরামে গান গেয়ে গেয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, আর কোথাকার কে কান্ত, তাই নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সে কেন ভাবছে এত! মরালীর কী হলো না হলো তা নিয়ে তার এত দুশ্চিন্তা কেন? মরালী তার কে? তার সঙ্গে তো তার কোনও সম্পর্ক নেই!

তারপর মনে হলো—সে ভাববে না তো কে ভাববে! কে আর জানে আসল খবরটা। আসলে মরালীকে এই চেহেল-সুতুনে নিয়ে আসার জন্যে সে নিজেই তো দায়ী। কান্ত নিজেই তো এনে এখানে এই পাপের রাজ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে তাকে।

যে লোকটা গান গাইছিল, সে আবার গান গাইতে গাইতে চলে গেল। কান্ত আবার সারাফত আলির দোকানের দিকে ফিরে এল।

চেহেল-সুতুনের ইতিহাসে যা কখনও হয়নি, সেদিন যেন তাই-ই হয়েছিল। সেদিনকার চেহেল-সুতুনের নিয়মকানুনে যেন হঠাৎ ভাঁটা পড়লো। অনেক দিন পরে যখন অনেক কিছু বদলে গিয়েছিল, মুর্শিদাবাদের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছিল, তখনকার দিনের কথা আর কারোর মনে থাক আর না থাক, কান্তও তখন নেই, আর মরালী তো মেরী বিবয়াস হয়ে গেছে, সেই সময়কার সব কাহিনী একে একে সংগ্রহ করে রেখে গেছে উদ্ধব দাস। সমস্ত কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখে গেছে পুঁথির পাতায়। মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার, কলকাতা, পলাশী, সমস্ত যেন উদ্ধব দাস নিজের চোখে দেখেছে। লর্ড ক্লাইভের বাগান-বাড়িটাও তার লেখায় বাদ পড়েনি। বিরাট বিরাট থামওয়ালা বাড়িটা। তার চারপাশে পাঁচিল ঘিরে বাগান। সেই বাগানের মধ্যে বসে থাকতো ক্লাইভ সাহেব। আর সেইখানে তখন থাকতো মরালী। বেগম মেরী বিবয়াস। শেষ জীবনে মরালীর সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে উদ্ধব দাসের। চাকর-

শান্ত সুখী মানুষটা। বাইরে থেকে দেখলে কিছু বোঝবার উপায় নেই।

নশির মিয়া গুটি-গুটি পায়ে মেহেদী নেসার সাহেবের পেছনে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে চুপি চুপি হাতে একটা চিঠি দিয়ে আবার বাইরে চলে গেল।

নেসার সাহেব চিঠিটা পড়ে আস্তে আস্তে কুর্নিশ করে চিঠিটা নবাবের হাতে দিলে।

চিঠিটা পড়তে-পড়তে মীর্জার চোখ দুটো কেমন জ্বলে উঠলো তাও লক্ষ্য করলে নেসার সাহেব।

নবাব জিজ্ঞেস করলে—এ খৎ কোত্থেকে এল?

—জাঁহাপনা, আমার [illegible] লোক আদায় করে এনেছে—

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বোমা ফেটে উঠলো মতিঝিলের দরবার-ঘরে। হয়ত বোমা ফাটলেও এত চমকাতো না কেউ। আলীবর্দী খাঁর আমলে যে-মীর্জাকে মীরজাফর দেখেছে এ যেন সে মীর্জা নয়।

এ-মীর্জা এ-রকম গলার আওয়াজ কোথায় পেলে! যাকে সবাই আড্ডাবাজ, ফুর্তিবাজ বলে জেনে এসেছে এতদিন, সে হঠাৎ একটা লড়াই জিতে এসেই একেবারে খাঁটি নবাবি-আনা শিখে ফেলেছে।

পাংখাওয়ালা পেছনে দাঁড়িয়ে বিরাট পাখা চালাচ্ছিল, হঠাৎ ভয় পেয়ে তার হাত থেকে পাখাটা পড়ে গেছে।

—মীরজাফর আলী সাহেব!

১৭৩০ সালে যে-মীর্জার জন্ম তার বয়েস সবে ছাব্বিশ পেরিয়েছে। অথচ তারই সামনে পাকা-ঝুনো-ঝানু সব আমীর-ওমরাহরা ভয়ে স্থির হয়ে রয়েছে স্থাণুর মত।

মীরজাফর আলি সাহেব এক-পা এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে কুর্ণিশ করলে।

—আপনি এ-চিঠি লিখেছেন?

বহু-শতাব্দী আগে মোগল-বংশ এসে হিন্দুস্থান দখল করে নিয়েছিল। ততদিনে সে-দখল কায়েমী হয়েও গিয়েছিল। কিন্তু রাজনীতি বোধহয় চিরকালই বে-কায়েম। রাজনীতির অভিধানে কায়েমী বলে কোনও শব্দ নেই। মসনদ আজ আছে, কাল নেই। নিজে নবাব আলীবর্দি খাঁর পাশে থেকে থেকে কবে যে মীর্জা সে-কথা শিখে নিয়ে রপ্ত করে ফেলেছিল তা বোধহয় তার ঘনিষ্ঠ ইয়ার মেহেদী নেসাররাও জানতো না। তাই সেদিন সেই মতিঝিলের দরবারের মধ্যে নবাব মীর্জা মহম্মদের গলা শুনে তারা চমকে গিয়েছিল।

—আমার ভাইকে আপনি বিদ্রোহ করবার জন্যে এই চিঠি লিখেছেন? এ তো দেখছি আপনারই হাতের লেখা। দেখুন, আপনার হাতের লেখা আপনি চিনতে পারেন কি না, আপনি নিজেই পড়ে দেখুন—

মীরজাফর আলি সাহেব চিঠিটা নিজের হাতে নিলে। তারপর আবার সেখানা ফিরিয়ে দিলে মীর্জার হাতে।

—কী দেখলেন?

মীরজাফর আলি সাহেব কোনও উত্তর দিলে না।

—তাহলে কি বুঝবো আপনিও আমাকে ভুল বুঝলেন? আপনি জানেন যে, আমার বল-ভরসা বলতে যা কিছু সব আপনারা। সেই আপনিই কিনা আমার শত্রুতা করবার জন্যে তৈরি? আমি যে নতুন সিংহাসন পেয়ে সুস্থির হয়ে সব কিছুর সুব্যবস্থা করবো, তাও আপনারা আমাকে করতে সময় দেবেন না? ফিরিঙ্গিদের আমি বুঝতে পারি। তারা হিন্দুস্তানে এসেছে ব্যবসা করে টাকা উপায় করতে। কিন্তু আপনারা? আপনারা যে আমার আত্মীয়! আপনাদের যে আমি সবচেয়ে বিশ্বাস করি। আপনারাই যদি এমন করে বিশ্বাসঘাতকতা করেন তো আমি দাঁড়াবো কোথায়? কার মুখের দিকে চেয়ে আমি রাজ্য চালাবো?

তবু মীরজাফর আলি সাহেব চুপ!

—আমি জানি আমার আড়ালে লোকে আমার নামে কী বলে! আমার নিজের দোষ নেই এ-কথা আমি বলছি না। আমার নিজের দোষটাও আমি জানি, আমার কী ভাল তাও জানি! কিন্তু আপনারা? আপনাকেই আমি জিজ্ঞেস করছি, আমার কি কোনও গুণই নেই? এমন কোন সদ্গুণ নেই যার জন্যে আমি আপনাদের সহানুভূতি পেতে পারি? আপনাদের ভালবাসা পেতে পারি? আপনারা কি সত্যিই চান আমার বদলে অন্য কেউ এই মসনদে বসলে দেশের মঙ্গল হবে? আপনারা মুখ ফুটে বলুন সে-কথা! আমি স্বেচ্ছায় মসনদ ছেড়ে চলে যাবো। যদি বোঝেন আমার মাসতুতো ভাই শওকত্ জঙ্গ এলেই দেশের ভাল হবে, তাহলে তাই-ই বলুন,

তাহলে আমি তাকেই ডেকে আনাবো, ডেকে এনে আমার জায়গায় বসিয়ে দেব। আর যদি বোঝেন ঘোসেটি বেগম এলেই দেশের ভালো হবে তো তাতেও আমি গররাজি নই। আমি এখখুনি আমার মাসিকে চেহেল-সতুনের বন্দীশা থেকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছি—

মীরজাফর সাহেব তখনও চুপ করে আছে।

—লোকে বলে আমি নাকি দেশ শাসনের কিছুই জানি না। আমি স্বীকার করছি দেশ-শাসনের আমি কিছুই জানি না। কিন্তু আমি তো সবে দেশের ভার মাথায় তুলে নিয়েছি। আমাকে প্রথমে জানতে সময় দিন বুঝতে অবসর দিন, তবে তো শিখতে পারবো। তার পরেও যদি দেখেন আমি কিছুই জানি না, তখন আমাকে না-হয় সরিয়ে দেবেন। সরিয়ে দিয়ে যাকে খুশী আমার সিংহাসনে বসাবেন। আমি খুশী মনে আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যাবো। আর কখনও মুর্শিদাবাদে আসবো না, প্রতিজ্ঞা করে যাবো—

তখনও মীরজাফর আলি সাহেব চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছু কথা বলে নি।

—এই যে এই পাসন্ড হলওয়েল্ দাঁড়িয়ে আছে। যদি মনে করেন এরাই দেশের ভাল করবে তো এদের হাতেই না-হয় এই মুর্শিদাবাদের মসনদ তুলে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু যদি মনে করেন যে, এরা দেশের দুশমন, এরা কারবার করবার নাম করে এখানে আমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে নিজেরা এই মসনদ কেড়ে নেবার মতলব করছে তো তাদের শায়েস্তা করা কি এতই অন্যায়? যে তাদের শায়েস্তা করবে, তাকে কি আপনারা কুশাসক বলবেন? বলবেন কি সে দেশ শাসন করতে জানে না?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—স্বীকার করছি আমার বয়েস কম, অভিজ্ঞতা কম, জ্ঞানও কম, কিন্তু আপনি আমার ডান হাত, আপনার তো অনেক বয়েস, আপনার তো অনেক অভিজ্ঞতা, আপনার তো অনেক জ্ঞান, আপনি সহায় থাকতে আমি দেশ-শাসন করতে পারবো না-ই বা কেন? যদি না পারি সে তো আপনারও লজ্জা! আপনারও কলঙ্ক! লোকে আপনাকেই দোষ দেবে, বলবে যে আপনার মত অভিজ্ঞ আত্মীয় থাকতেও কম-বয়েসী নবাবকে আপনি কিছু সাহায্য করেন নি। কী হলো, আপনি কথা বলছেন না কেন, উত্তর দিন?

মীরজাফর আলি সাহেব যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলো।

পাংখাওয়ালা আরো জোরে জোরে পাখা নাড়ছে। মেহেদী নেসার, ইয়ারজান-সাফিউল্লা, রাজা দুর্লভরাম সবাই পাথরের মূর্তির মত নবাবের রায় শোনবার জন্যে কান পেতে রয়েছে।

—উত্তর দিন, কেন আপনি এ-চিঠি লিখতে গেলেন?

ওদিকে একটা তাঞ্জাম দুলতে দুলতে এসে ঢুকলো মতিঝিলের ফটকে। ঝালরদার, সোনা-চাঁদির ঝকমকে তাঞ্জাম। এ-তাঞ্জাম দেখলেই চিনতে পারে মতিঝিলের ফটকের পাহারাদার। এটা নানী-বেগমের নিজস্ব তাঞ্জাম। কুর্নিশ করে পাহারাদার তাঞ্জাম ভেতরে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। সামনে ঝিল্। সেই ঝিল্ পেরিয়ে এসে তাঞ্জামটা সোজা ভেতরের চবুতরে ঢুকে গেল।

—ও যদি আপনার হাতের সই হয় তো আপনি বলুন, ও-চিঠি কেন লিখতে গেলেন?

মতিঝিলের বাঁদী এসে তাঞ্জামের ঝালর তুলে ধরলো। তাঞ্জাম থেকে নামলো নানী-বেগম। আর তার পেছন-পেছন আর একজন বেগম নামলো। তাঁকে এর আগে বাঁদী কখনও দেখেনি। দু'জনেই তাঞ্জাম থেকে নেমে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো।

—আমার কথার উত্তর দেবেন না আপনি? উত্তর দিন!

ইব্রাহিম খাঁ সরাবখানার মধ্যে অন্ধকারে চুপ করে বসে ছিল। হাতীর চোট খাবার পর সেদিন কিছু বিশেষ বোঝা যায়নি। কিন্তু পরদিন থেকেই গায়ে-গতরে একেবারে ব্যথা হয়ে টন্ টন্ করছিল।

—ও চিঠি জাল!

তাঞ্জামটা নজরে পড়েছিল ইব্রাহিম খাঁর। সিঁড়ির নিচেয় মতিঝিলের সরাবখানা। ঘুলঘুলিটা দিয়ে ওদিকটা দেখা যায়। হঠাৎ নজরে পড়লো দু'জন বেগম নামলো তাঞ্জাম থেকে। নানী-বেগমের তাঞ্জাম দেখলেই সবাই চিনতে পারে। নানী-বেগমকে অনেকবার দেখেছে ইব্রাহিম খাঁ। কিন্তু পাশের বেগমকে দেখেই চমকে উঠলো সর্বাঙ্গ পরিকারাসস্থা। যেন খুব চেনা-চেনা মুখ। কোথায় যেন দেখেছে, কোথায় যেন খুব কাছ থেকে দেখেছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলে না। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল। হাতিয়াগড়ের নফর শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর মেয়ে সেই মরালী না?

—জাল? আপনি প্রমাণ করতে পারেন, এ জাল চিঠি?

নেয়ামত খাঁ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকলো। নবাবের সামনে এসে তিনবার কুর্নিশ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—জাঁহাপনা, নানী-বেগম!

নানী-বেগম! এখানে! মতিঝিলে! এই অসময়ে! নবাব মীর্জা মহম্মদ যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মেহেদী নেসারের কানেও কথাটা গিয়েছিল। সেও কেমন যেন শুকিয়ে গেল কথাটা শুনে। মীরজাফর আলি সাহেব, ইয়ারজান, সফিউল্লা, মোহনলাল সবাই একটু নড়ে দাঁড়াল তৎক্ষণ পরে।

সরাবখানার অন্ধকারে সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ তখনও আকাশ-পাতাল ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর মেয়ে তো নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল বিয়ের পর। আবার এখানে এল কেমন করে?

নবাব মীর্জা মহম্মদ মসনদ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের দিকে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন—আপনারা বসুন। আমি আসছি—
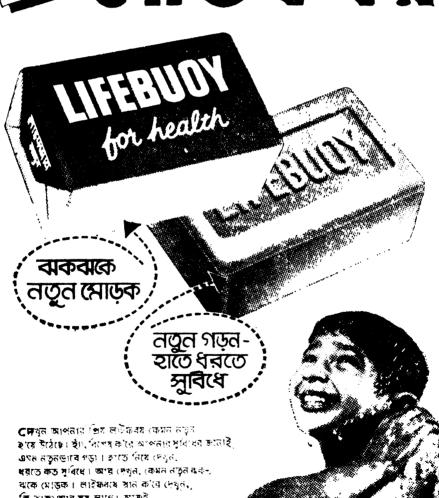
(ক্রমশঃ)

অটোয়া, ৭ই জুন, ১৯৬৪

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পরলোকগমন অন্যান্য দেশের মত এখানেও গভীর আলোড়ন এনেছে। গত কয়েকদিন ধরেই সংবাদপত্রে এবং টেলিভিশনে নেহরুর মৃত্যু এবং পরবর্তী নেতা কে হবেন এ নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে। পণ্ডিতজীর মৃত্যু সাধারণভাবে এখানে বেদনার সৃষ্টি করেছে। ২৭শে মে তারিখে সন্ধ্যাবেলা ভারতীয় হাইকমিশনারের বাসভবনে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। অটোয়ার অনেক ভারতীয় অধিবাসী ছাড়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সিংহল, ইজিপ্ট, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতবৃন্দ। এঁদের প্রায় সকলেই নেহরুজীকে ব্যক্তিগতভাবে জানতেন। সকলেই অল্পকথায় এই অসাধারণ মানুষটির বিশিষ্ট গুণাবলীর আলোচনা করলেন। ভারতবর্ষ বলতে তাঁরা নেহরুকেই বুঝতেন এমন কথা প্রায় সবাই বললেন। এর ৩।৪ দিন পরে এখানকার ভারত-ক্যানাডা সমিতির উদ্যোগে অটোয়ার একটি অন্যতম প্রধান গীর্জায় নেহরুজীর মেমোরিয়াল সার্ভিসের অনুষ্ঠান হয়। এখানেও অটোয়ার অধিকাংশ ভারতীয় বাসিন্দা, ক্যানাডা এবং অন্যান্য দেশের কিছু নেহরু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন ক্যানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ মার্টিন এবং পার্লামেন্টে বিরোধীদলের নেতা ও ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডিফেনবেকার। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ পিয়ার্সন শহরে উপস্থিত ছিলেন না। তবে ইতিপূর্বে পার্লামেণ্টে মিঃ পিয়ার্সন, মন্ত্রিবর্গ এবং অন্যান্য সভারা গভীর শোক প্রকাশ করেন। গীর্জার এই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠান সকলের মনে খুবই রেখাপাত করে। প্রধান যাজক বাইবেল থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ করেন। উপস্থিত ভারতীয়দের মধ্যে কয়েকজন গীতা, কোরাণ, গ্রন্থসাহেব এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করেন। Hymns, রবীন্দ্রসংগীত, মীরার ভজন, ইত্যাদি এবং সর্বশেষে 'জনগণমন অধিনায়ক' ও ক্যানাডার জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। মিঃ মার্টিন এবং মিঃ ডিফেনবেকার তাঁদের বক্তৃতায় নেহরুজীকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মার্টিন বললেন 'He was a very great man and a good man। মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির প্রশংসা করাই সাধারণ রীতি, তবে ব্যক্তিগত-ভাবে বলতে পারি, প্রায় ৫।৬ মাস আগে বিদেশাগত তরুণ বিজ্ঞানীদের এক বার্ষিক সভায় বক্তৃতার শেষে মার্টিন আমাদের জন-কয়েক ভারতীয়ের সংগে আলাপের প্রসংগে বলেছিলেন, 'Mr. Nehru is a very great man'। পণ্ডিত নেহরুর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় ক্যানাডার মন্ত্রিবর্গের কেউ-ই উপস্থিত থাকতে সক্ষম না হওয়ায় পার্লামেন্টে বিরোধী পক্ষ তুমুল গোলযোগ করেন। সরকার পক্ষ বলেন, হাতে এত কম সময় ছিল (খ্রীষ্টানমতে ৭২ ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়) যে কাউকে পাঠান সম্ভব হলো না। মিঃ মার্টিন আমাদের বলেছিলেন যে, নেহরুজীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েই যুক্ত-রাষ্ট্রের সেক্রেটারী অফ স্টেট মিঃ রাস্ক অটোয়াতে টেলিফোন করেন তিনি দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে দিল্লি রওনা হবেন—ক্যানাডার কোন মন্ত্রী যদি যেতে চান, তবে

অটোয়া শহরে পার্লামেণ্ট ভবন

তাঁকে এই সময়ের মধ্যে ওয়াশিংটনে পৌঁছতে হবে। বোঝা যাচ্ছে সময়মত কেউ ওয়াশিংটনে যেতে পারেননি। সরকারের নিজস্ব দূরপাল্লার জেটপ্লেনও কাছাকাছি না থাকায় সরাসরি কাউকে নয়াদিল্লি পাঠান সম্ভব হয়নি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই এক সৌজন্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কোন রাষ্ট্রের কর্ণ-ধারের পরলোকগমনে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রধানদের আগমন। মিঃ কেনেডীর মৃত্যুর পর জগতের প্রায় সব প্রধান দেশের রাষ্ট্র-নায়কদের আগমন এক অভূতপূর্ব নজীরের সৃষ্টি করেছিল। সে উপলক্ষে ভারত থেকে কেউ অবশ্য আসেননি।

নেহরুজী তাঁর বৈদেশিক নীতির জন্য পাশ্চাত্যজগতে নিন্দা এবং প্রশংসা দুই-ই সমানভাবে কুড়িয়েছেন। এখানকার কাগজে

এবং রেডিও ও টেলিভিশনে তাঁকে World Statesman, 'এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব' ইত্যাদি প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনেক কাজেরও কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। সমালোচনার মুখ্য বিষয়গুলো হলো তাঁর নিরপেক্ষতাবাদ, 'আক্রমণাত্মক' কমিউনিস্ট দুনিয়াকে (অবশ্য ইদানীং চীনকে বাদ দিয়ে) 'সহনশীল' পশ্চিমী জগতের সঙ্গে এক দৃষ্টিতে দেখা, সুয়েজের ঘটনায় তাঁর তীব্র প্রতিবাদ অথচ হাংগেরীর ঘটনায় প্রায় কিছু না বলা এবং সর্বশেষে 'মুখে শান্তির বুলি' অথচ গায়ের জোরে গোয়া দখল করা। মনে হয় গোয়ার ব্যথাটা আজও যেন এ/সব দেশ ভুলতে পারছে না। এ ব্যাপারে এক সময়ে এ'রা বলেছেন নেহরু নামে আইডিয়ালিস্ট হলেও নিজের কাজের সময় pragmatic হতে জানেন। যাই হোক মোটের ওপর এ দেশে তিনি নিন্দা থেকে প্রশংসাই অনেক বেশী পেয়েছেন। নেহরুজীর প্রতি মহাত্মা গান্ধীর বিখ্যাত উক্তি 'He is nearer to God than many who profess to be'—এই শিরোনামায় এখানকার একটি প্রধান দৈনিকে তাঁর রেখাচিত্র—শেষ বিদায় নিয়ে তিনি অনন্তের সন্ধানে চলেছেন—পণ্ডিতজীর ওপর এ দেশের সুগভীর শ্রদ্ধার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিছুদিন আগেও জোর আলোচ্য বিষয় ছিল, 'নেহরুর পরে কে?' এ-প্রশ্ন ভাবতেও সকলকে যেমন উদ্বিগ্ন করে তুলতো—এ'দেরও এতে কিছু চিন্তার কারণ ছিল। চিন্তার কারণ ভারতের বৈদেশিক নীতি নেহরুর পর কি রূপ নেয়, সেই ভেবে। 'নেহরুর পর কে?' এই প্রশ্ন গত জানুয়ারী মাসে তিনি অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই সকলের মনে বিশেষভাবে জেগেছিল। এখানকার কিছু সাংবাদিক মন্তব্যও করেছিলেন, ইন্দিরা গান্ধীই সম্ভবত পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন। ভারতে গণতন্ত্রের শেকড় যে কত দুর্বল, এ-ঘটনাতেই তা বোঝা যাচ্ছে। সুখের বিষয়, এরকম কোন ঘটনা ঘটেনি—তাহলে সত্যিই লজ্জার কারণ হতো। প্রধানমন্ত্রীর আসনটা যে বংশানুক্রমিক নয় এবং যোগ্যতর অনেক ব্যক্তিই ভারতে আছেন— এ-কথাটা জানতে পেরে আমরা দুঃখের মধ্যেও আনন্দ পেয়েছি। শান্তিপূর্ণভাবে নূতন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন গণতন্ত্রপ্রয়াসী ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে —এটাই সাধারণভাবে এখানকার সংবাদপত্রের মন্তব্য। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নির্বাচনে মোটামুটিভাবে সকলেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন। তিনি মধ্যপথের যাত্রী, নেহরুর নীতিকেই অনুসরণ করবেন, সকলেই এ আশা করছেন।

কয়েক মাস আগে নেহরুজীর প্রথম অসুস্থতার সময় যখন তিনি দপ্তরহীন মন্ত্রী হিসেবে মন্ত্রিসভায় যোগ দেন, তখনই তাঁর নাম কাগজে কিছুটা প্রাধান্য পায়। এক সাংবাদিক লেখেন, He is a simple man. He wears an Indian peasant's dress which looks like an oversized diaper!

Diaper বস্তুটি হলো বাচ্চা ছেলেদের জড়িয়ে রাখার তোয়ালে জাতীয় কিছু। সম্প্রতি লিখেছে, He wears an Indian peasant's dhoti.

ইদানীং তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরোচ্ছে। তিনি বিদেশে কোনদিন যাননি, ছাত্রাবস্থায় এত গরীব ছিলেন যে, বই মাথায় নিয়ে রোজ সাঁতার কেটে গঙ্গা পারাপার হয়ে স্কুলে যেতে হতো, কারণ নৌকোতে পার হবার পয়সা ছিল না। নেহরুজী নাকি কোনদিন ঠাট্টা করে তাঁকে 'half-civilized' বলেছিলেন—ইত্যাদি। যাই হক, তিনি খুব conciliatory এবং দক্ষিণ এবং বাম দুদিক ঠাণ্ডা রেখে ভারতীয় একতা বজায় রাখতে পারবেন, এমন আশা সবাই প্রকাশ করেছেন।

নেহরুর মৃত্যুর কয়েকদিন আগে শেখ আবদুল্লা এখানে বেশ পাবলিসিটি পেয়েছেন —তিনি কাশ্মীরের একমাত্র নেতা—

'Lion of Kashmir' ইত্যাদি বলে। কারামুক্তির পর শ্রীনগরে তাঁর বিজয়ী রোমান জেনারেলের মত প্রবেশ টেলিভিশনে অনেকক্ষণ ধরে দেখান হয়েছে। একদা তাঁর আমন্ত্রণেই ভারতীয় সৈন্য পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের হঠানোর জন্য কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল এবং পরবর্তীকালে সেই আক্রমণকারীদের সম্পর্কে তাঁর আত্মীয়তার মনোভাব—এ নিয়ে কারো কোন বক্তব্য নেই। সিকিউরিটি কাউন্সিলে শিক্ষামন্ত্রী চাগলার কাশ্মীর নিয়ে কয়েকবার পরিষ্কার বিতর্ক সত্ত্বেও এসব দেশের লোকের ধারণা, কুয়াশাচ্ছন্ন হয়েই রয়েছে। এর জন্য আমাদের দেশের পররাষ্ট্রনীতির ব্যর্থতাই দায়ী, না এ দেশের লোকের 'কানে দিয়েছি তুলো' নীতিই দায়ী, কে জানে?

এবার স্থানীয় আবহাওয়ার কথা একটু আলোচনা করা যাক। এপ্রিলের শেষে এসেই হঠাৎ শীত বিদায় নিয়েছে। মে মাসের গোড়া থেকেই বসন্তকাল শুরু হয়েছে। এখন পুরো বসন্তকাল—মনে হচ্ছে গ্রীষ্মও এসে পড়ল বলে। শীতের থেকে বসন্তকালের বিবর্তনটা যেন রাতারাতি ঘটে গেল। কদিন আগেও প্রকৃতি ছিল নির্জীব। ঘাস নেই, গাছে পাতা নেই, ফুল নেই—এখন কিছু-দিনের মধ্যেই প্রকৃতি হাসামুখী হয়ে উঠেছে—গাছ সবুজ পাতায় ভরা, কচি ঘাস পশমের মত মোলায়েম হয়েছে আর চারদিকে রঙ-বেরঙের ফুলের সমারোহ ঘটেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। বসন্তকাল আর গ্রীষ্মকাল যে কত আদরণীয় হতে পারে, এই ছ' মাস বরফের দেশে না থাকলে সেটা যেন মর্মে মর্মে অনুভব করা যায় না। নিঃসন্দেহে এই সময়টাকে আক্ষরিক অর্থেই 'মধুমাস' বলা চলে। অটোয়াতে অনেক রকম ফুলের বাহার আছে, এর মধ্যে টিউলিপই প্রধান। অটোয়াকে Tulip City বলা হয়ে থাকে। আসলে টিউলিপ নাকি হল্যান্ডের ফুল। প্রায় বিশ বৎসর আগে হল্যান্ডের রানী জুলিয়ানার উপহার দেওয়া ফুলের চারা থেকে এখানে টিউলিপ বোনার সূত্রপাত। এখানে প্রতি বৎসর টিউলিপ ফেস্টিভ্যাল হয়ে থাকে। ফুলটি নানা রঙের হয়ে থাকে, ছোট চারাগাছ গড়ে প্রায় দুই ফুট উঁচু হয়। মে মাসের শেষ সপ্তাহ দুটি এ-ফুলের চরম বিকাশ কাল—চারদিকে বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গিয়েছিল ফুলের বিশেষ বিশেষ বাগান দেখবার আমন্ত্রণ করে। ছুটির দিনে স্পেশ্যাল বাস নানা উদ্যানে, লেকের ধারে, নদীর তীরে ফুল দেখাবার জন্য যাত্রী নিয়ে যায়। এ-ফুলের আয়ু খুবই কম। এখন একটু গরমের ভাব আসায় সব টিউলিপই মরে গিয়েছে।

বসন্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার অধিবাসীরা ছুটির দিনে সারাদিন

মেপল পাতা হাতে লেখকের কন্যা

বাড়ির লনে (সেটা রাস্তার দিকেই থাকে) শুয়ে বা ডেকচেয়ারে বসে রোদ উপভোগ করেন—না হয়তো এদিক-ওদিক কোথাও বেড়াতে যান—সে-ও সূর্যস্নাত হবার জন্যেই। আজকাল সকলেরই পোশাক-পর্বের বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে—বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে। এ-সব সময় এখানে বেশীরভাগ মহিলা যে ধরনের পোশাক পরে থাকেন, তা আমাদের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে রীতিমত অস্বস্তিকর। কলকাতায় চৌরঙ্গীপাড়ায় সিনেমা দেখে ধারণা ছিল, 'বিকিনি' বোধহয় সাগরের বেলাভূমিতেই শোভা পায়—এখন দেখা যাচ্ছে, এ-দৃশ্য দেখতে না চাইলেই বরং জানলায় পর্দা টাঙিয়ে ঘরে বসে থাকাই সঙ্গত। যাই হোক, এ দেশের সবাই এ ব্যাপারে নির্বিকার—নিশ্চয়ই এ ধরনের পরিধেয় সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। কোন কাজেই যুক্তির অভাব হয় না। এদেরও একটা যুক্তি নিশ্চয়ই আছে—শরীর যতদূর সম্ভব হাল্কা করে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি গ্রহণ করা এবং ফ্যাকাশে চামড়াকে একটু বাদামী বা tan করা। এই উভয় সঞ্চয় শীতের দিনে কাজে লাগবে হয়তো।

গতবারে লিখেছিলাম, ক্যানাডার ঠিক নিজস্ব কোন জাতীয় পতাকা নেই। জাতীয় পতাকা বলে একটা কিছু অবশ্যই আছে—যা গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটা বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাকের একটু পরিবর্তিত সংস্করণ—অর্থাৎ লাল জমির ওপর বেশীরভাগ জায়গা জুড়ে ইউনিয়ন জ্যাক, নীচে ডান দিকের কোণে ক্যানাডার কোট-অব-আর্মস। এ-পতাকাটিকে সাধারণভাবে বলা হয় The Red Ensign। ক্যানাডার বর্তমান লিবারেল পার্টির সরকারের ইলেকশন ম্যানিফেস্টো ছিল দেশের বৈশিষ্ট্যমূলক (distinctive) একটি জাতীয় পতাকার রূপদান করা।

সরকার সম্প্রতি এ-ব্যাপারে অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন। ক্যানাডায় maple বলে একরকম গাছ প্রচুর জন্মে—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এই মেপল পাতা নিয়ে অনেক অনেক কিছুর নামকরণ করেছে—উদাহরণস্বরূপ, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রফেশন্যাল আইস হকি ক্লাব এখানকার টরেন্টো শহরের বিখ্যাত

দল 'Toronto Maple Leafs', এ-ছাড়া অজস্র জিনিসে মেপল পাতার ছাপ পাওয়া যায়। সরকারী ব্যবহারের মধ্যে ক্যানাডার এক সেন্ট মুদ্রার এক পিঠে মেপল পাতার ছাপ এবং সম্প্রতি ডাকটিকিটেও এই ছাপ ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা, মেপল পাতা একটি ক্যানাডিয়ান প্রতীকে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী মিঃ পিয়ার্সন তিনটি লাল মেপল পাতার একটি ডাঁটা সহ সাদা জমির ওপর দুপাশে নীল বর্ডার (ক্যানাডার দুই পাশে দুই মহাসমুদ্রের প্রতীক) দেওয়া একটি ডিজাইনকে Distinctive Canadian Flag বলে গ্রহণ করতে চান। এ নিয়ে তীব্র বাদ-প্রতিবাদ উঠেছে। আপত্তি করছেন প্রধানত English Canadian-রা। তাঁরা বৃটিশ ঐতিহ্যবাহী Red Ensign-কেই বজায় রাখতে চান—এত বৎসর যখন চলে আসছে, তখন আরও শতাব্দীকাল পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। অপরপক্ষে French Canadian-রা এবং তৃতীয় পক্ষের অধিকাংশই ইউনিয়ান জ্যাক বর্জনের পক্ষে। তাঁদের মতামত—আর কিছু ভাল নকশা না পাওয়া গেলে—মেপল পাতাই আসুক। মোট কথা Red Ensign আমরা চাই না। মিঃ পিয়ার্সন নতুন পতাকাটি চালু করতে বদ্ধপরিকর। তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর গভর্নমেন্টের পার্লামেন্টের ভোটে হেরে গিয়ে পতনের ঝুঁকি নিতেও তিনি রাজী আছেন। এই সঙ্গে তিনি ক্যানাডার জাতীয় সংগীত হিসেবে 'O Canada' নামক গানটিকে গ্রহণ করার জন্যও বিল আনবেন। এই গানটি বেসরকারী উৎসবে গাওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে সরকারী ব্যাপারে 'God save the Queen' গানটিই ব্যবহার হয়ে থাকে। মিঃ পিয়ার্সন অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, ক্যানাডার নিজস্ব জাতীয় পতাকা ও সংগীত গৃহীত হয়ে গেলেও উপযুক্ত ক্ষেত্রে Red Ensign এবং 'God save the Queen' তাদের প্রাপ্য মর্যাদা পাবে। কারণ, রাণী এলিজাবেথ 'Is Queen of Canada'।
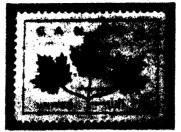
মেপল পাতার প্রতীকচিহ্নের ডাকটিকিট

ক্যানাডায় প্রধানত দুটি রাজনৈতিক দল—লিবারেল আর কনজারভেটিভ পার্টি। অন্য উল্লেখযোগ্য দলের মধ্যে আছে নিউ ডেমোক্রাটিক পার্টি। প্রধানমন্ত্রী মিঃ পিয়ার্সন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নেতা, একবার শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। এখানকার কুইবেক প্রদেশের ক্যানাডিয়ান কনফেডারেশন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার কথা আগের বার লিখেছিলাম। এই সম্ভাবনাটা মনে হয় ক্রমশই জোরদার হচ্ছে। সম্প্রতি কুইবেকের অত্যন্ত দায়িত্বশীল এক মন্ত্রী (যাকে ঐ প্রদেশের Spokesman বলা হয়) অভিমত নিক্ষেপ করে বলেছেন, ফেডারেল গভর্নমেন্ট যদি কুইবেককে অন্তত 'Associate State'-এর মর্যাদা না দেয়, তবে তাঁদের একেবারে স্বাধীন হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। তাঁর ভাষণে এমন ইঙ্গিতও ছিল, শান্তিতে না হলে তাঁরা অন্য কিছু করতে বাধ্য হবেন। এখানকার এবং আমেরিকার কাগজে কুইবেক আলাদা হয়ে গেলে ক্যানাডার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কি পরিবর্তন আসতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। মিঃ পিয়ার্সন কুইবেককে তুষ্ট রাখার জন্য তাঁর নিজস্ব প্ল্যান প্রায়ই কাট-ছাঁট করছেন। মেপল পাতার পতাকা গ্রহণ করার মূলে হয়তো কুইবেকের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফরাসী ক্যানাডিয়ানদের খুশী করার ব্যাপারও কিছুটা রয়েছে।

এবারে আবার একটু দেশের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে ভারত বলতে বিদেশের লোকে যেমন পণ্ডিত নেহরুকে বুঝেছে, তেমনি প্রাক্-স্বাধীনতাকালে মহাত্মা গান্ধীকেই লোকে ভারত-আত্মার প্রতীক বলে জেনেছে। এক সময় বিদেশের কিছু লোক ভারতকে রবীন্দ্রনাথের দেশ হিসেবেই চিনেছিল। আজ এ দেশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রায় অপরিচিতের কথা মনে বিস্ময় ও বেদনা সঞ্চার করে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ২৩ বৎসর আগে গত হয়েছেন—তাঁকে আধুনিক ছেলেদের অতটা জানার কথা নয়, কিন্তু বয়স্ক উচ্চশিক্ষিতদেরও অনেকে তাঁর নাম শোনেননি। একটি আলোচনা সভায় ভারতে পনেরটি প্রধান আধুনিক ভাষা এবং প্রায় আটশোটি উপভাষা আছে, এ-কথা আমি বলায় দু-একজন শ্রোতা বললেন, হিন্দীর কথা আমরা শুনে থাকি, তবে অন্য প্রধান ভাষাগুলোর লিখিত লিপি আছে কি? আমি এ ব্যাপারে যা বলার বলে মন্তব্য করলাম, অন্তত বাংলা ভাষায় একজন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন—তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মনে হল, তাঁর নাম এই উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় কেউই শোনেননি। বললাম, শেক্সপীয়রের পর ৪০০ বৎসরের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যে একরকম শ্রেষ্ঠ পুরুষ আর মাত্র দু-একজন জন্মগ্রহণ করেছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁর রচনাগুলোর অতি সামান্য অংশই ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হয়েছে। তিনি একার জীবনে যা শুধু লিখে গেছেন, আমাদের কারো একার পক্ষে তার সবটা হয়তো পড়াও সম্ভব নয়। তাঁরা বললেন, "Then tell us, we have missed something!"
বললাম, "I bet you have."

—সমীরকুমার বসু

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

তানসেনের প্রতিকৃতি

সবিনয় নিবেদন

তিরিশে মে'র দেশে গানের আসরে শার্ঙ্গদেবের 'মুঘল ইতিহাসে তানসেন' শীর্ষক আলোচনাটির সংগে তানসেনের একটি প্রতিকৃতি ছাপা হয়েছে দেখলাম। কিন্তু প্রতিকৃতিটি যে তানসেনের নয় সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। প্রথমতঃ, প্রতিকৃতিটি তানসেনের মৃত্যুর অনেক পরে আঁকা (অন্ততঃ দু'শ বছর পরে), দ্বিতীয়তঃ, যাঁকে তানসেন বলে অনুমান করা হয়েছে, তাঁর চেহারার সংগে সমসাময়িক প্রতিকৃতিতে পাওয়া তানসেনের চেহারার কোন মিল নেই। তানসেনের যে সমস্ত প্রতিকৃতি প্রামাণিক বলে স্বীকৃত হয়েছে সেগুলিতে দেখা যায় তানসেনের রঙ ছিল কালো, নাক ছিল বাজপাখির মত, ঝোলা গোঁফ ছিল, জুলপি ছিল, কিন্তু দাড়ি ছিল না। প্রবাদ আছে দীপক রাগ গাওয়ার ফলেই তাঁর দেহের রঙ কালো হয়ে গিয়েছিল। এই প্রবাদে যে মার্গ সংগীতের গায়ক মাত্রেই বিশ্বাসী তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁদের দীপক রাগ গাইবার অনিচ্ছা থেকে। আমরা এই সংগে তানসেনের একটি সমসাময়িক এবং প্রামাণিক (authentic) প্রতিকৃতি মুদ্রিত করলাম। এই সম্বন্ধে যাঁরা আরও বিস্তৃত বিবরণ চান, তাঁদের LALITKALA NOS 1-2, 3-4 দেখতে অনুরোধ করি।

নমস্কারান্তে — হীরেন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা—২৭

লেখকের বক্তব্য

দেশে যে ছবিটি মুদ্রিত হয়েছে সেটি বহুকাল থেকে তানসেনের মূল প্রতিকৃতি বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে। ছবির ওপর স্পষ্টাক্ষরে নাস্তালিকে লিখিত আছে— শবিহ্ তানসেন অর্থাৎ তানসেনের প্রতিকৃতি। এ ছাড়া চিত্রকরের স্বাক্ষর আছে— অমল-ই-লালা দেও লাল মুসাওয়ির: অর্থাৎ চিত্রকর লালা দেও লালের চিত্রকর্ম। আকবরের সময় দরবারী চিত্রকরদের মধ্যে লাল নামে একজন বিখ্যাত চিত্রকরের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। দুটি নামের বানানে তফাৎ আছে কিন্তু এরকম তফাৎ সে যুগের নামের বানানে বিরল নয়। ঐতিহাসিক তাঁর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করবার সময় চিত্রকর যে নামে সই করতেন, সেই নামের বানান মনে নাও রাখতে পারেন। তবে, লাল এবং দেও-লাল একই ব্যক্তি কিনা এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলতে পারবেন।

আমাদের প্রকাশিত প্রতিকৃতিটি মূল চিত্রের কপি হওয়াই স্বাভাবিক কারণ আকবরের যুগের বহু ছবিই পরে নকল করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুঘল দরবারের মূল চিত্র নেহাৎ কমই আমাদের দেশে পাওয়া যায়। মুঘল ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হতে হতে প্রায় সবই বিদেশে চলে গেছে।

কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিই দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করতে পারেন না যে, প্রতিকৃতিটি তানসেনের নয় যখন সেটি স্পষ্টভাবে চিত্রের উপরে লিখিত আছে। দরবারী চিত্র অধিকাংশই স্বাক্ষরিত থাকত। স্বাক্ষরবিহীন ছবিকে নিশ্চয়তার সংগে স্বীকার করা সম্ভব নয়।

পত্রলেখক যে প্রতিকৃতিকে আসল চেহারা বলে দাবি করছেন সেটি উদয়পুরের মহারাণা দিল্লির জাতীয় সংগ্রহশালায় উপহার দিয়েছেন। এই চিত্র কবে উদয়পুরের সংগ্রহে এসেছে তা কেউ জানে না। কে এর চিত্রকর তাও জানা নেই। চিত্রে কোনো পরিচয় বা শিল্পীর স্বাক্ষর নেই। চিত্রের পিছনে কেবলমাত্র হিন্দীতে লেখা আছে—তানসেন। এত অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ললিতকলা অপর সকল পণ্ডিত ব্যক্তির সংগৃহীত চিত্রকে উপেক্ষা করে ঘোষণা করেছেন যে চিত্রটি আকবরের দরবারী চিত্রকরগণের আঁকা। এই রকম হিন্দীবর্ণসমন্বিত কোনো ছবি আকবরের দরবারে থাকা আদৌ সম্ভব ছিল কি? এ ছবি যে দরবারী চিত্রকরের আঁকা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কই?
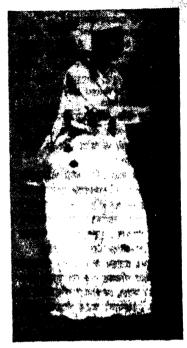
ললিতকলা প্রকাশিত তানসেনের চিত্র

ললিত কলা এ সম্বন্ধে বলছেন:

— The portrait must have been painted by one of Akbar's court painters between 1585-1590 when Tansen was about fifty five years of age. এও তাঁরা বলছেন, It is not known when it found its way into Udaipur collections.

এই রকম উক্তি কী প্রামাণিকতার পক্ষে যথেষ্ট? ওই সময় তানসেনের বয়স যে পঞ্চান্ন বৎসর তাই বা তাঁরা কেমন করে অনুমান করলেন?

পত্র লেখক তথা ললিতকলা তানসেনের আকৃতির ওপর দীপকরাগের প্রভাবের যে সংবাদ দিয়েছেন তা ঐতিহাসিকের অজ্ঞাত। তানসেনের সমসাময়িক বা পরবর্তী প্রামাণিক মুঘল সাহিত্যে তানসেনের প্রসঙ্গে দীপকরাগের উল্লেখমাত্র নেই।

তানসেনের চেহারা সম্বন্ধে পত্র লেখকের মতো নিশ্চিত অভিমত ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, যে প্রমাণে ললিতকলা বা পত্রলেখক বিশ্বাসী তাতে আমার গভীর সন্দেহ বর্তমান।

পত্রলেখক যে ছবিটি পাঠিয়েছেন, তার সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, পরিচয় বা স্বাক্ষরবিহীন একান্ত অনুমাননির্ভর ছবির চেয়ে পরিচয় এবং স্বাক্ষর যুক্ত ছবিকেই অধিকতর প্রামাণিক বলে সকলেই স্বীকার করেন। চিত্রকর এত দায়িত্বহীন কখনই হতে পারেন না যে তিনি আন্দাজে একটি প্রতিকৃতির ওপর তানসেনের নাম বসিয়ে দেবেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিষদ

৮ই জুন মহারাষ্ট্র নিবাস হলে রবীন্দ্র-সংগীত পরিষদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করে সুখী হয়েছি। পরিষদের সম্পাদক মহাশয় জানাচ্ছেন—'রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত সুষ্ঠু ও সঠিক গায়কিতে রবীন্দ্রসংগীতের অনুশীলন ও প্রচার ও ইহার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা এই পরিষদের একমাত্র শিক্ষা ও উদ্দেশ্য। রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষাদানের জন্য কলিকাতায় নানা প্রতিষ্ঠান আছে,—তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার কোন উদ্দেশ্য আমাদের নাই। শিক্ষাদান ও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রচার প্রকটিত হইতে পারে না। বিভিন্ন শিল্পী ও গোষ্ঠীর সহায়তায় রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপক প্রচার এই পরিষদের অন্যমত উদ্দেশ্য।" এই ঘোষণাটি আমাদের ভাল লেগেছে এবং এই উদ্দেশ্য সার্থক হোক—এই কামনা করি।

পরিষদের প্রচারিত পুস্তিকায় শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী, শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী এবং শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের নির্দলীয় মনোভাবটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। তাঁরা উভয়েই বাংলার সব রকম গানের অনুশীলনের পক্ষপাতী। আমাদের পাঠকবৃন্দ জানেন আমরা বহুদিন ধরেই এই চিন্তাধারার সার্থকতা সম্বন্ধে বলে আসছি।

এই উপলক্ষে আরও একটু সাবধান বাণী উচ্চারণ করা বোধ হয় প্রয়োজন। আজকাল অনেকেই নানারকম গান শিখছেন তাঁদের পুঁজি বাড়াবার জন্য, ঠিক জানবার উদ্দেশ্যে নয়। এই মনোভাব খুব প্রশংসনীয় নয়। কেন যে বাংলা গানকে ব্যাপকভাবে জানা দরকার তা উপলব্ধি করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের গানে বহুলভাবে টপ্পার প্রয়োগ দেখা যায় এবং বহু গান আছে যাতে পুরাতন বাংলা গানের শৈলী প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রাচীন বাংলার টপ্পা এবং কাব্যসংগীত না জানলে রবীন্দ্রনাথের এই সব রচনার মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ যে যুগের গানের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন সেই যুগকে জানা দরকার। এই রকম আগ্রহ নিয়ে শিখলে তবেই সে শিক্ষা সার্থক হবে নইলে যে গানই গাওয়া হোক না কেন তা একটা যান্ত্রিক রীতিতে গাওয়া হবে মাত্র। এই রকম উপলব্ধিহীন গান বর্তমানে শোনা যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকজন আধুনিক শিল্পীর গাওয়া প্রাচীন শ্যামাসংগীতের উল্লেখ করা যায়। অভিজ্ঞ ব্যক্তি এঁদের গান শুনলেই বুঝতে পারেন এই সব শ্যামা-সংগীত বা ভক্তিমূলক গানের রূপায়ণ কত অপটু। মূল শৈলীর সঙ্গে সুগভীর পরিচয় থাকলে তাদের নবরূপায়ণেও অনেক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যেত; সেগুলি একান্ত বৈশিষ্ট্যবিহীন ভঙ্গীসর্বস্ব গানে পরিণত হত না। বাংলা গানের ব্যাপকতা কম নয়। বাংলার এমন অনেক খাম্বাজ, ভৈরবী, বেহাগ কালাংড়া, কানাড়া, ইমন, বিভাস আছে যা স্রষ্টা সুরকারের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বিরাজ করছে। এই সব ধারা রবীন্দ্রনাথের বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনে প্রচলিত ছিল কিন্তু এখন আর সেগুলি শোনা যায় না। এই সব সৃষ্টির ভিতরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় কত বিচিত্র বাংলার সংগীত। অর্থাৎ উপলব্ধির আগ্রহই সবচেয়ে বড় কথা এবং সেইখানেই শিক্ষার সার্থকতা।

অনুষ্ঠানে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এবং শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র অনেকগুলি গান করে শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করেন। পরিষদ রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে "পায়ে চলার পথ" নামক একটি মনোজ্ঞ সংগীতরূপকের অনুষ্ঠান করেন।

১৭

সঙ্কল্পের জোর আছে সুজাতার। তা না থাকলে এতকাল স্বামীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকতে পারত না। হাতে পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করে তাঁর কাছেই ফিরে যেত। মুখ বুজে তাঁর সমস্ত অনাচার সহ্য করত। কিন্তু 'আমার যা ভালো লাগে না, যা আমি খারাপ বলে মনে করি, তা সহ্য করব না, তাতে আমার যত ক্ষতি হয় হোক, কপালে যত লাঞ্ছনা গঞ্জনা জুটুক আমি তা গ্রাহ্য করব না' মনের এই জোরই তাকে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

স্বামী বলতেন 'জোর নয়, জেদ। মেয়ে-মানুষের এত জেদ থাকব কেন?'

সুজাতা জানে তিনি নারীত্ব আর দৃঢ়-তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পেতেন না। তাঁর ধারণা ছিল জেদ পুরুষের ভূষণ কিন্তু নারীলাবণ্যের শত্রু। নারী মানে তাঁর কাছে ছিল শুধু নমনীয়তা, কমনীয়তা—যেমন দেহে তেমনি মনে। নারী মানে অভিমান আর অশ্রু; নারী মানে অনুচ্চ ভাষণ, অনুচ্চ হাসি, আভাস আর ইশারা—তার স্বামীর ধারণা ছিল। নারীকে তিনি রক্ত মাংসের মানুষ বলে মনে করতেন না। যদিও তাঁর নিজের মনে রক্ত মাংসের ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই ক্ষুধাকে তিনি তুলির রঙে রাঙাতেন, কবিতা দিয়ে মুড়ে রাখতেন। নারী মানে তাঁর কাছে ছিল শুধু রেখা আর রঙ, শুধু ছন্দ আর মিল। সুজাতা বুঝতে পারত সেই মিল স্বামী তার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছেন না। সুজাতার শুচিতা পরিচ্ছন্নতা, তার সংযম আর দৃঢ়তার মধ্যে স্বামী শুধু নীরস গদ্যকে দেখতেন কাব্যরূপ দেখতে পেতেন না।

সুজাতার মনে পড়ে গোড়া থেকেই কত অমিল ছিল দুজনের মধ্যে। সুজাতা ভালো বাসত ঘর দোর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে। তিনি ভালোবাসতেন অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন হয়ে বাস করতে। সিগারেটের ছাই জুতোর ধুলো সারা বাড়িতে ছড়িয়ে রাখতে। মদের গন্ধ, আর সেই গন্ধে তাঁর যে সব বন্ধু এসে জুটত সুজাতা তাদের কাউকে সহ্য করতে পারত না। আর তিনি বলতেন, 'কেন পারবে না। এতে দোষ কিসের। তুমি একালের মেয়ে। তোমার এত শুচিবাই থাকবে কেন?'

সুজাতা বলত, 'যা শুচিতা, তা চির-দিনেরই শুচিতা, যা ভালো, তা একালেও ভালো, সে কালেও ভালো।'

স্বামী হেসে উঠতেন, 'তুমি একখানি আস্ত মনুসংহিতা। আমি চাইলাম রাধা, তুমি হলে রক্তচণ্ডী। কবে যে গেরুয়া পরে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে ত্রিশূল হাতে বেরিয়ে পড়বে, আমার সেই ভয়।' তিনি হাসতেন।

কে জানে তখন থেকেই মনের মধ্যে গেরুয়া রঙ ধরতে শুরু করেছিল কিনা সুজাতার। তখন থেকেই মন উদাসীন হতে শুরু করেছিল কিনা। বৈরাগ্যের উদাস বাঁশী তখন থেকেই বাজতে শুরু করেছিল হয়তো।

সুজাতার মনে কি সুন্দরের ধারণা ছিল না? অবশ্যই ছিল। ছেলেবেলা থেকেই সে দেবদেবীর মূর্তিকে সুন্দর দেখত, পুজোর বেদী কে সুন্দর দেখত, দেবমন্দিরের সঙ্গে তার সৌন্দর্যের বোধ এক হয়ে গিয়েছিল। মায়েরও ফুলের বাগান ছিল। দেশী ফুলের বাগান। যুঁই শিউলি, টগর গন্ধরাজ, নানা রঙের নানা আকারের গাঁদা। মা বলতেন, 'সাদা ফুলেই দেবতারা বেশি তুষ্ট হন। সাদা ফুলের গন্ধ বেশি। যে ফুল পুজোয় লাগে সেই ফুলই সুন্দর। ফুল পুজোয় লাগে বলেই সুন্দর।'

সৌন্দর্যের সঙ্গে সাধনা আরাধনার ভাব ছেলেবেলা থেকেই মনের মধ্যে গেঁথে গিয়ে-ছিল সুজাতার। মাকে কখনো চুলে ফুল পরতে দেখেনি সুজাতা, কখনো ফুল শুঁকতে দেখেনি।

মা বলতেন, 'ফুল শুধু পুজোর জন্যে,

দেবতার জন্যে। ফুল মানুষের ভোগের জন্যে নয়। দেবতার প্রসাদী ফুল আশীর্বাদী ফুল মাথা পেতে নিবি। আর কোন অংগে ফুল পরলে মানায় না। আর কোন অংগে ফুল তুললে পাপ হয়। ফুল শুধু উত্তম অংগের জন্যে।'

মায়ের সেই উপদেশ মাতৃস্নেহের মতই তার জীবনের সংগে মিশে আছে। কিছুতেই সে অন্য চোখে জীবনকে দেখতে পারেনি, অন্য জীবনদর্শনকে অন্তরের মধ্যে নিতে পারেনি সুজাতা।

মা লেখাপড়া জানতেন। মিশনারী স্কুলে কয়েক বছর পড়েছিলেন। তিনি গোঁড়া ছিলেন না। চালচলনে আচার আচরণে অনেক হিন্দুয়ানীকে বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু সংযম আর শুচিতাকে বাদ দেননি।

তাই বলে কি দাম্পত্য জীবনে ও'রা অসুখী ছিলেন। নাকি সে জীবনে কোন রূপ রঙ রসের স্পর্শ ছিল না? সুজাতার সে কথা মনে হয়নি। বরং পিছু ফিরে তাকালে সুজাতা বাবা মার স্নিগ্ধ মধুর দাম্পত্য জীবনের চিত্রই বেশি দেখতে পায়। মায়ের ধর্মাচরণকে বাবা ব্যংগ করতেন না, বরং সমর্থন করতেন। তিনি বুঝতে পারতেন মেয়েদের পুতুলেরও দরকার আছে, প্রতিমারও দরকার আছে। তাঁর উচ্চ দর্শনের চূড়া থেকে বাবা বারবার নেমে এসে মায়ের হাত ধরতেন। তাতে তাঁর জাত যেত না। সেই হাত মৃত্যু ছাড়া আর কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনি।

কিন্তু স্বামীর বাড়িতে এসে কী দেখল সুজাতা। একেবারে বিপরীত চিত্র। তাঁর স্বামী ধর্মকে ব্যংগ করেন, শুচিতাকে শুচিবায়ুতা মনে করেন। তাঁর রুচি তাঁর রূপ বোধের সংগে সুজাতার কোন মিলই নেই। তিনি এক হাতে অনেকের হাত ধরতে চান। শুধু একটি মেয়ের মুঠি তাঁকে তৃপ্তি দেয় না।

অনেকে সহ্য করে নেয়। কিন্তু সুজাতা সইতে পারল না। হয়তো তারই দোষ।

তবু প্রথম প্রথম সইতে কি চেষ্টা করেনি? চেষ্টা করেনি নিজের বাড়িতেই আলাদা হয়ে থাকতে? নিজের আচার অনুষ্ঠান ধ্যানধারণা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে বাস করতে? সুজাতার সেই ঘরে শিবের মূর্তি ছিল, বুদ্ধমূর্তি ছিল। লুকিয়ে স্বামীর প্রতিকৃতিও সেখানে রেখে ছিল সুজাতা। কেউ জানে না, রেখেছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল তত সেই সুন্দর মূর্তির সংগে আসল স্বামীর ব্যবধান বেড়ে চলল। সুজাতার আর সহ্য হল না।

তিনি বললেন, 'তুমি শুধু আমাকে পাথরের মূর্তি করে রাখতে চাও। কিন্তু আমি রক্ত মাংসের মানুষ। '

সুজাতা বলত, 'তুমি শুধু রক্ত মাংসেরই মানুষ। রক্তমাংস ছাড়া আর কিছু চেন না।'

তিনি বলতেন, 'আর তুমি রক্তমাংস বাদ দিয়ে চলতে চাও।

সুজাতার স্বামীও অবশ্য মাঝে মাঝে রক্ত-মাংস বাদ দিতে চাইতেন। লতার মত, ফুলের মত নদীর মত ঝরনার মত মেয়েকে চাইতেন তিনি। কিন্তু কেউ কি আর কোমলা অবলা হয়ে সব সময় থাকতে পারে? তা থাকতে হলে সেজে থাকতে হয়। সে রূপসজ্জা স্টেজে চলে, শিল্পীর তুলিতে চলে, লেখকের কলমে চলে, কিন্তু বাস্তব-জীবনে চলে না। সুজাতা পারেনি। কিছুতেই পটের বিবি হয়ে সৌন্দর্যের মূক প্রতিমা হয়ে বসে থাকতে পারেনি।

অথচ স্বামী যেন তাই পছন্দ করতেন। তাঁর ঘরে নবযৌবনা নারীর নগ্নরূপের ছবি টাঙানো থাকত। যে সব ছবি দেখলে দু হাতে চোখ ঢাকতে ইচ্ছা করে, তিনি সেই ছবিগুলি অনুক্ষণ দেখতেন, অপলকে দেখতেন। গদ্যই হোক আর ছন্দোবদ্ধই হোক সাহিত্যের যেসব কথা শুনলে কানে আঙুল দিতে ইচ্ছা করত সুজাতার তিনি সেই সব শ্লোক সোহাগে সাগ্রহে আবৃত্তি করতেন।

সুজাতার মনে উল্টো প্রতিক্রিয়া হত। অনুরাগের বদলে বিরাগ আসত। আর স্বামী বলতেন, 'তুমি পাথরের প্রতিমা।'

কিন্তু সেই পাথর যে মাঝে মাঝে ফেটে চৌচির হয়ে যেত তা তিনি লক্ষ্য করতেন না।

মাঝে মাঝে রাগের বশে সুজাতা অস্বাভাবিক কাণ্ড করে বসেছে আজ সে কথা সে স্বীকার করে। তার ঘরে তো শুধু শিবমূর্তিই ছিল না, খড়্গধারিণী কালী-মূর্তিও ছিল, দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা-মূর্তিও ছিল। এখন ভাবলে হাসি পায়, কিন্তু তখন সুজাতা নিজেকে মাঝে মাঝে তাঁদের অংশ বলে মনে করত। আর সেই দশ-প্রহরণের দু একটি প্রহরণ নিজের হাতে তুলে নেওয়ার জন্যে তার হাত নিসপিস করত। মাঝে মাঝে নিতও। এখন ভাবলে দুঃখ হয়, লজ্জা হয়, কিন্তু তখন প্রচণ্ড ক্রোধে ত্রিনয়নে রক্তনয়নে বধ্য অসুররূপে সে একজনকেই দেখতে পেত—স্বামীকে। তখন তার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকত না। বিচার বিবেচনা হিতাহিত বোধ লোপ পেত।

স্বামী মাঝে মাঝে তাকে মনে করিয়ে দিতেন, 'আমি প্রথম রিপুর দাস আর তুমি দ্বিতীয় রিপুর দাসী। আমরা কেউ কর্তা গিন্নী নই, শুধু চাকরচাকরানী। তাদের সংসার বেশি দিন চলতে পারে না।'

চলেও না।

আজ গার্হস্থ্য জীবন ছেড়ে অন্য জীবনের পথে পা বাড়াতে গিয়ে সেই ছেড়ে আসা ঘর, ফেলে আসা দিনগুলির কথা বড়ো বেশি করে মনে পড়ছে সুজাতার। দিন-রাতের মধ্যে অনেকবার করে নানা ছলে, নানা সূত্রে মনে পড়ছে। সুজাতা অবশ্য সব ভুলে যেতে চায়। তবু কে যেন মনে করিয়ে দিতে ছাড়ে না। যে পার্ট তার হয়তো একদিন ছিল—আজ আর নেই, কাণ্ডজ্ঞান হীন প্রম্পটার সেই পার্টই সুজাতার কানে কানে গুঞ্জরণ করে চলেছে। মৌমাছির গুঞ্জরণ নয় বোলতার ডাক। তবু মাঝে মাঝে তাকে মৌমাছি বলে ভ্রম হচ্ছে কেন? এ কি মায়া? এ কি মমতা? যাওয়ার আগে তারা তার দু পায়ে বেড়ি পরাতে চায়? হাতের বেড়ি ভেঙেছে সুজাতা? পায়ের বেড়ি ছিঁড়তে পারবে না?

স্বামীজী তাকে সহজে অনুমতি দিতে চাননি।

তিনি বলেছেন, 'এখনো তোমার সময় আসেনি। তোমার দেরি আছে।'

কিন্তু আর কত দেরি? আর যে সবুরে সয় না সুজাতার। চৌত্রিশ পূর্ণ হয়ে পঁয়ত্রিশে পড়েছে। আর কতকাল সে অপেক্ষা করবে। যে ধর্ম বুড়ো বয়সের সান্ত্বনা অসহায়ের সম্বল সেই ধর্ম তো সে চায় না। সে চায় শরীরে শক্তি সামর্থ্য থাকতে তপশ্চর্যা করতে। সে যৌবনে যোগিনী হতে চায়।

কারো সময় আসে, কাউকে বা এগিয়ে গিয়ে সময়কে ডেকে নিয়ে আসতে হয়। সবাইর ভাগ্য এক রকম নয়, রীতিনীতিই বা সবাইর বেলায় এক রকমের হবে কেন? স্বামীজী বলেছেন, 'চাওয়াটা চাওয়ার মত হওয়া চাই। মানে চাওয়াটা যেন একেবারে না চাওয়ার মত হয়। তুমি যদি রাগ করে সংসার ছেড়ে চলে যাও, তাহলে সেই রাগ তোমার পিছনে পিছনে ছুটবে। সে কিছুতেই তোমাকে ছাড়তে চাইবে না।'

রাগ। নিজের রাগের জন্যে লজ্জিত সুজাতা। যে রাগ সংস্কৃত অনুরাগ, প্রাকৃত বাংলায় তার একমাত্র অর্থ শুধু ক্রোধ। সুজাতা মাঝে মাঝে ভাবে আর হাসে। একই শব্দ এক-জনের বেলায় সংস্কৃত অর্থ বয়ে নিয়ে এল আর একজনের মনে এল অশুদ্ধ, অসংস্কৃত হয়ে। কিন্তু অনুরাগের সংগে কি ক্রোধের কোন সম্পর্কই নেই? কাম আর ক্রোধ কি শুধু পাশাপাশি? পিঠোপিঠি নয়, অংগে অংগে আবদ্ধ নয়? তার মনের অপূর্ণ অনুরাগই কি এমন প্রচণ্ড ক্রোধ হয়ে উঠেছে? সুজাতা মাঝে মাঝে ভাবে। মাঝে মাঝে জীবনটা বড়ো শুকনো বড়ো নীরস মনে হয়। লজ্জা হয়, সত্যিই সে যেন মনে মনে রক্তচণ্ডী, রক্তকালীর মূর্তি ধরে রয়েছে। সংসারে থেকেও সে যে সংসারের বাইরে রয়ে গেল তার জন্যে মাঝে মাঝে দুঃখ হয় সুজাতার, অনুতাপ আসে, অনুশোচনা হয়। কিন্তু উপায় কী। এই রুক্ষতা শুষ্কতাই তার দিন রাত্রির অভ্যাসের সংগে মিশে গেছে। অভ্যাস নাকি মানুষের দ্বিতীয় প্রকৃতি। সুজাতার বেলায় তা অদ্বিতীয়া। সে সব ছেড়ে বাইরে যাবার জন্যে আজ পা বাড়ায়নি, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল, সে তাই দুপা হেঁটে আরো বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেখানে সে যদি একটু বিশ্রাম পায়, একটু শান্তি, একটু আশ্রয়। কেউ যদি সেখানে একটু সহায় হয়, কেউ যদি মিষ্টি কথায় বলে, 'বসো এখানে। এই গাছতলায় বসে দুদণ্ড জিরিয়ে নাও।'

এই পৃথিবীর কাছে সুজাতা আর কিছু চায় না। শুধু সেই গাছের ছায়াটুকু চায়। আগে কত তরুকে সে কল্পতরু ভেবে ছুটে গেছে। এখন আর সেই মোহ নেই লোভ নেই, এখন সে ভাবে শাখাপত্রে ভরা একটি গাছই যথেষ্ট। আহা, শ্যামল সুন্দর একটি গাছকে ভালোবাসতে পারলেও বুঝি জীবন সরস হত।

স্বামীজী অবশ্য তাকে তত ভরসা দেননি, বরং বারবার ভয়ই দেখিয়েছেন। বলেছেন, 'ওদের আবার নানারকম নিয়মকানুন আছে। তুমি কি মেনে চলতে পারবে?'

'পারব।'

'আমাদের মূলে যদিও এক, কাণ্ড যদিও এক, কিন্তু শাখা-প্রশাখা আলাদা। আমরা একজনের কাজে অন্য কেউ ইণ্টারফিয়ার করিনে। সাধারণত আমাদের তাই নিয়ম।'

'আমি নিয়মভংগ করব না স্বামীজী।

নিয়মভঙ্গ করতে আপনাকে অনুরোধও করব না।'

শুদ্ধানন্দ হেসেছিলেন, 'তোমার জন্যে অবশ্য প্রথমেই আমি গুরুদেবের এক নিয়মভঙ্গ করেছি। কিন্তু বারবার তো আর তা সম্ভব হবে না।'

সুজাতা বলেছিল, 'আমি তা জানি। আমি সেজন্যে তৈরী হয়ে আছি।'

'আচ্ছা, তা হলে এসো।'

সুজাতা তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করেছিল।

কী সেই নিয়মকানুন সুজাতা জিজ্ঞাসা করেনি। কী হবে সে সব জেনে। আশ্রমের নিয়ম কি সুজাতার নিজের চেয়ে কঠিন? কোন শৃঙ্খলাকে সুজাতা আর শৃঙ্খল বলে ভয় করে না। সে নিজেকে শাস্তি দিতে চায়। সে শাস্তি যত কঠিন হয়, ততই ভালো। সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। তা যত দুঃসাধ্য হয়, ততই ভালো। কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত? হিংসার আর ক্রোধের ক্ষমাহীনতার আর অসহিষ্ণুতার। 'ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমঃ। মহাভারতেও আছে, 'ক্রোধ সম পাপ নেবী, না দেখি সংসারে।'

লক্ষ টাকা পড়ে থাকলেও সুজাতার তা নিতে ইচ্ছা করবে না। পরম রূপবান গুণবান পুরুষ দেখেও তার চিত্ত চঞ্চল হবে না। কিন্তু ক্রোধ। ক্রোধের হাত থেকে রক্ষাচণ্ডী আজ সত্যিই রক্ষা পেতে চায়। সেই ক্রোধে অপর কারো কোন ক্ষতি হয় না। সুজাতার নিজের চিত্তই শুধু তাতে অশান্ত হয়ে ওঠে। ষড়্‌রিপুর দরকার হয় না, চিত্তকে আবিল পঙ্কিল করবার পক্ষে একটি রিপুই যথেষ্ট। শুধু নির্মল আয়নাতেই মুখের ছায়া পড়ে। শুধু নির্মল চিত্তই প্রজ্ঞার আলোয় উদ্ভাসিত হয়। সুজাতার মনে হয় এই রিপু জয়ের সাধনাই মানুষের প্রথম সাধনা। হয়তো শেষ সাধনাও। কারণ এর শেষ নেই। এই রিপুই কি সমস্ত অমঙ্গল, অকল্যাণ সমস্ত বিষবৃক্ষের মূল? অথচ তার শাখায় শাখায় পল্লবে পল্লবে পুষ্পে পুষ্পে শোভার অন্ত নেই। শত্রুকে কিছুতেই শত্রু বলে মনে হয় না। পরম মিত্র পরম আত্মীয়ের মত সে যেন সুজাতার সঙ্গে মিশে আছে। তাকে কি সুজাতা বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না? বিচ্ছেদের পথে তার যে যাত্রা শুরু হয়েছে তা কি শুধু স্বামী বিচ্ছেদেই শেষ হবে? তার অহঙ্কার অহংবোধ থেকেও কি সে নিজেকে ছিন্ন করে নিতে পারবে না?

বুঝিয়ে শুনিয়ে ধার্কাত্তিমনীত করে বাবার মত করাল, বউদিকে দাদাকে সম্মত করল সুজাতা।

প্রভাস বোনকে ধরে রাখতে অনেক চেষ্টা করেছিল। না পেরে হাল ছেড়ে দিল, হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'যাচ্ছিস যা। কিন্তু আমি জানি দু দিনের বেশি টিকতে পারবিনে। আতপান্ন আর নিরামিষ খেয়ে দুদিনেই বাপ বাপ বলে চলে আসবি।'

সুজাতা হেসে বলল, 'তুমি বুঝি সেই অভিশাপ দিচ্ছ দাদা!'

প্রভাস বলল, 'অভিশাপ নয় আশীর্বাদ। যত তাড়াতাড়ি তোর মতিভ্রম ঘোচে ততই মঙ্গল। আজকালকার বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষ ধর্মচর্চার জন্যে আলাদা কোন জায়গায় যায় না। ইচ্ছা করলে সে নিজেই এক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে পারে। যেমন আমরা শরীরকে বয়ে বেড়াই অথচ টের পাইনে, নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি রুচি নীতি আদর্শকে বহন করি, কিন্তু তা কখনো জাহির করিনে। আজকালকার মানুষের ধর্মের জন্যে আলাদা কোন পোশাক পরতে হয় না। টিকি পৈতা নামাবলীর দরকার করে না। সাধারণ স্বাভাবিক বেশই যথেষ্ট। এখনকার বুদ্ধিমান মানুষের আলাদা ধর্মকর্ম নেই। কর্মই তার ধর্ম। এখনকার ধর্ম বাইরে থেকে ভিতরে ঢুকেছে। এখনকার সভ্য মানুষ ধর্মকে আঙুলে তুলে দেখায় না, ধর্মকে সে অনুভব করে। তুই আমাদের ছেড়ে কোন মধ্যযুগের মঠে চললি তুইই জানিস। তবে দু চার দিনের মধ্যেই তোকে ফিরে আসতে হবে এও আমি তোকে বলে দিলাম।'

সুজাতা এ সব নিয়ে দাদার সঙ্গে আগে অনেক তর্ক করেছে। কিন্তু আজ যাত্রা করবার মুখে কোন তর্কের মধ্যে এল না। তাতে শুধু সময় নষ্ট হবে, সংশয় বাড়বে। কিন্তু সংশয়ের মধ্যে আর যেতে চায় না সুজাতা, দ্বিধাদ্বন্দ্বে আর দুলতে চায় না। তার ক্ষতবিক্ষত হৃদয় এখন শুধু আশ্রয় চায়। সে আশ্রয় যদি আশ্রমে জোটে তাতেও ক্ষতি নেই।

যাওয়ার সময় বাবাকে প্রণাম করল সুজাতা, দাদাকে প্রণাম করল, বউদিকে প্রণাম করতে যাচ্ছিল কিন্তু নন্দিতা সে প্রণাম নিল না। তাড়াতাড়ি হাতখানা ধরে ফেলে বলল, 'ছি ছি ছি, ও কি করছ! দু দিন বাদে কতজনে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে।'

ভাইপোকেও একটু আদর করল সুজাতা। গাল টিপে দিল, চুমো খেল কপালে।

বাবলু বলল, 'পিসীমণি, কবে আসছ?'

সুজাতা একটু হেসে চুপ করে রইল।

বাবলু বলল, 'পরশু?'

সুজাতা এবারও কোন কথা বলল না। হয়তো তারিখটা ওর বাবাই ওকে কানে কানে বলে দিয়েছে।

প্রশান্তবাবু শান্ত ভাবে বললেন, 'কেন যে এই ছেলেমানুষি করছিস তা তুইই জানিস।'

সুজাতা বলল, 'আমার আরো কত ছেলেমানুষি তুমি সহ্য করেছ বাবা। এটা কি তার চেয়েও বড়?'

প্রশান্তবাবু বললেন, 'আমার কথার যোগ্য উত্তর হল না, বুলু! এখানে তোর কী অসুবিধে হচ্ছিল যদি বলতিস—'

সুজাতা বলল, 'কোন অসুবিধেই হচ্ছিল না বাবা। অসুবিধে কিসের। তুমি আমাকে কত যত্নে রেখেছ। কিন্তু কতকাল ধরে এক জায়গায় পড়ে আছি। মন টিকছে না বাবা।'

প্রশান্তবাবু তাঁর চেয়ারে চুপ করে অনড় হয়ে বসে রইলেন। মনে হল তিনি ভিতরের কোন একটা উচ্ছল আবেগকে সংবরণ করে নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত শশাঙ্কের সুমতি হবে। ভুল বুঝতে পেরে নিজেই ও একদিন চলে আসবে। কিন্তু তাতো আর হল না। কোন মানুষ যে চিরকাল একই-ভাবে কাটায়, একটুও বদলায় না, জীবনে তা আমি এই প্রথম দেখলাম।'

সুজাতা মৃদুস্বরে বলল, 'বাবা ও সব কথা এখন থাক।'

কিন্তু প্রশান্তবাবু প্রসঙ্গটা অত তাড়া-তাড়ি ছেড়ে দিতে চাইলেন না। বললেন, 'আমি কতবার বলেছি, চল আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে তার কাছে রেখে আসি। অত মিথ্যে মান অপমান বোধ আমার নেই। তার চেয়ে তোর নিজের সুখশান্তি আমার কাছে অনেক বড়। অনেক বেশি সত্য!'

সুজাতা তেমনি মৃদুস্বরে বলল, 'সব সময় মান সম্মান বোধ বাদ দিলেই কি সুখশান্তি বাড়ে? তাছাড়া, আমার ও সব প্রবৃত্তি একেবারে চলে গেছে। তা না গেলে আমি তো একাই ফিরে যেতে পারতাম। তোমাদের কাউকেই সঙ্গে যেতে হত না। ও সব কথা থাক বাবা। বরং আমি যে পথে যাচ্ছি সেই পথে আমি যেন মন স্থির করে চলতে পারি, তুমি আমাকে শুধু সেই আশীর্বাদ করো।'

প্রশান্তবাবু আবার চেয়ারে শক্ত হয়ে মেরুদণ্ড টান করে বসলেন।

সুজাতা বুঝতে পারল ভিতরে ভিতরে বাবার খুব কষ্ট হচ্ছে। তাঁর বুকটা যত ভেঙে যেতে চায় পিঠটাকে তিনি তত শক্ত করে বসেন।

বউদি সুজাতাকে উদ্ধার করল। হাত ধরে তাকে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'বুলু তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল।'

'বলো।'

'কিছু মনে করবে না তো?'

সুজাতা একটু হাসল, 'মনে করবার কী আছে? তোমার যখন এত জরুরী কথা।'

নন্দিতা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমার মনে হয় শশাঙ্কবাবুর একটা মত নেওয়া উচিত।'

সুজাতা চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলে আস্তে আস্তে বলল, তোমার সঙ্গে আমার অবশ্য ঠাট্টা তামাশারই সম্পর্ক। তবু এ সময় তুমি এমন একটা ঠাট্টা করে বসবে ভাবতে পারিনি বউদি।'

নন্দিতা একটু দুঃখিত হয়ে বলল, 'ঠাট্টা নয় বুলু, আমি সত্যিই বলছিলাম। তুমি এই সব কাণ্ড করছ তিনি জানলে—'

সুজাতা বলল, 'তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসতেন আর আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতাম। তুমি বুঝি তাই ভেবেছ বউদি?'

নন্দিতা বলল, 'না ঠিক অতখানি আশা করিনি। তবে তাঁকে কি একবার জানানো উচিত নয়? বিশেষ করে তুমি যখন ধর্মের নাম করেই যাচ্ছ। তোমাদের সম্পর্ক তো এখনো আছে।'

'আইনের চোখে আছে বটে। আর কোন অর্থে নেই।'

'বেশ তো আইনের কথাই না হয় ধরা যাক। তিনি তো ইচ্ছা করলে হাঙ্গামা করতে পারেন।'

সুজাতা বলল, 'যতদূর জানি তিনি তা করবেন না। আর যদি করেনই আইনের পোর্টফলিও নিয়ে তুমি আছ দাদা আছে, তোমরা রুখতে পারবে না।'

নন্দিতা ফের একটু কাল চুপ করে রইল। তারপর একটু হেসে বলল, 'তোমার জায়ের সঙ্গে সেদিন টেলিফোনে আমার কথা হয়েছিল। তিনি বললেন, সেই মন্দিরার নাকি কোথায় বিয়ে হয়ে গেছে। আপদ গেছে। তাহলে তুমি কেন মিছিমিছি— '

সুজাতা বলল, 'কি ধারণা তোমার বউদি। তুমি বুঝি ভেবেছ আমি সেই মন্দিরার জন্যেই—। ছি ছি ছি। একজন কাউকে বিয়ে করলে তবু তো হত। তবু বুঝতাম ঘর সংসারের দিকে মন গেছে। তুমি জানো না বউদি। তাঁর এক মন্দিরা গেছে, আরো কত মন্দিরা আছে, আরো কত মন্দিরা আসবে তার কিছু ঠিক নেই।'

বেরোবার আগে নিজের ঘরখানার দিকে ফের একবার তাকাল সুজাতা। খাট চেয়ার আলমারি বইয়ের সেলফ সবই এ ঘরে থাকবে শুধু সেই থাকবে না। এই ঘর তাকে অনেক দিন আশ্রয় দিয়েছে। অনেক বিনিদ্র রাত্রির অনেক গোপন কান্নার সাক্ষী এই ঘরখানি। আবার পড়াশুনোর ভিতর দিয়ে আত্মস্থ হবার চেষ্টাও সে এই ঘরে বসেই করেছে।

দুটি সজল চোখ ফিরিয়ে নিল সুজাতা। মায়া কি শুধু এই ঘরখানার জন্যেই?

নন্দিতা বলল, 'স্কুলের কাজটা কি ছেড়ে দিয়ে গেলে বুলু?'

সুজাতা বলল, 'ছেড়ে দেওয়ারই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ওঁরা ছুটি নিতে বললেন।'

'সেই ভালো।'

বাড়ির গাড়িতে কিছুতেই গেল না সুজাতা। লোক পাঠিয়ে ট্যাকসি ডেকে এনেছে। তাতে উঠে বসল। সঙ্গে বেশি জিনিসপত্র নিল না। একটা সুটকেসে যা জামাকাপড় বইপত্র ধরে শুধু তাই রইল।

বাবা সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও সুজাতার আপত্তি। শেষ পর্যন্ত সঙ্গে কেউ যখন যাবে না, এটুকু পথ কারো যাবার দরকার কি। (ক্রমশ)

ডবল ডায়মণ্ড

শৌখিন লোকদের প্রিয়

ঝিনঝিনে মিশরী তুলো থেকে বোনা এক নতুন ধরণের পপ্‌লিন—ডবল ডায়মণ্ড। শরীর স্নিগ্ধ থাকে, প'রে আরাম, দেখতেও চমৎকার। আর সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, বিনীর প্রত্যেকটি কাপড়ের মতই মজবুত আর টেঁকসই ক'রে বোনা।

আপনার প্রয়োজনমত বিনীর কাপড় নিয়ন্ত্রিত দরে বিনীর অনুমোদিত স্টকিস্টের এই সাইনবোর্ড লাগানো দোকান থেকে কিনুন।

দি বাকিংহাম অ্যাণ্ড কর্ণাটিক কোম্পানী লিমিটেড, বিনী অ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, মাদ্রাজ-এর সহায়তাপ্রাপ্ত

JWT/BC-DD-2662A

শ্রীমতী

বেশী দিনের নয়, মাত্র পাঁচ-সাত বছরের পুরোনো কয়েকটি মহিলা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। গৃহিণীদের গৃহস্থালীর বাজেটের আলোচনা পড়ে কৌতুক অনুভব করছিলাম। দ্রব্যমূল্য সম্বন্ধে শঙ্কার সীমা নেই। কিভাবে সংসারের আয় ব্যয়ের দুটি মুখ একত্র মিলবে সেদিনই যদি ভাবনার বিষয় হয়ে থাকে তবে আজ আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি? আকাশ-ছোঁওয়া হয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দর, তার মধ্যে হয়তো যা সবচেয়ে প্রয়োজন তা অদৃশ্য হয়েছে বাজার থেকে। কখনও বা অকরুণ লুকোচুরি খেলা খেলে ধরনীর বুকে মরীচিকার মায়া রচনা করে চলেছে। তার নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে নির্মম আঘাত করেও যদি দিন চলার একটা পথের ইশারা মিলতো তবে আপত্তি ছিল না, কিন্তু একান্তই যে দুঃসহ হয়ে দাঁড়াচ্ছে পরিজনদের নিত্যকার অন্ন সমস্যা। এই দ্রব্যমূল্য নিয়ে আমাদের সরকার থেকে সাধারণ পর্যন্ত সবাই ভাবনায় অস্থির। কিভাবে প্রতিবিধান হতে পারে তার জল্পনা কল্পনার সীমা নেই। কিন্তু কেউ কি ভেবে দেখেছে তাদের সকলের চেয়ে কত কঠিন গৃহের গৃহিণীর সমস্যা! তার সমস্যা প্রতিদিনের, প্রতিমুহূর্তের। আলাপ আলোচনার অবসর নেই, পরিকল্পনার সুযোগ নেই, এমনকি দুদণ্ড ভাববারও সময় নেই। আর এদিকে তার ভাণ্ডার শূন্য, অর্থের অপ্রাচুর্যের অসীম অসুবিধার উপর উঠে গেছে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব, নেই, নেই, নেই কোথাও নেই। বাজারে নেই, দোকানে নেই গৃহিণীর ভাণ্ডারে আসবে কি করে? চাল নেই, তেল নেই, মাছের অবস্থা শোচনীয়, আনাজপাতির দাম নাগালের বাইরে!

এই এতগুলো 'নেই' সত্ত্বেও পরিবেশনের সময় সকলের মন রাখার অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেন গৃহিণী। তার উদ্ভাবনী শক্তির পরীক্ষা হয় পদে পদে। মনে হয় যেন রসায়নাগারের রাসায়নিকও বোধ হয় এত মাথা ঘামান না। বাঙালীর রান্নার যা বলতে গেলে একমাত্র মাধ্যম তেল, তাও যদি বাদ দিয়ে চলতে হয়, তবে পাকশাস্ত্রের নূতন অধ্যায় রচনা করা ছাড়া উপায় কি?

অধ্যায় রচনায়ও কি বাধা কম? এমন কোন জিনিস বাজারে আছে কি যা গৃহস্থ অনায়াসে কিনে ঘরে নিতে পারে? যে সাধারণ কথা 'ডাল ভাত' আমরা বলি তার কৌলীন্যও কোথায় পৌঁছেছে! ভাতের জন্য চাল নেই, ডালের দাম তাকে আর পাঁচটা খাদ্যের সমকক্ষ করে তুলেছে! তবে ডালের মধ্যে তরকারি সংযোগ করতে পারলে ঘি, তেলের খাতে কিছুটা বাঁচে বলে রক্ষা।

আমাদের বাংলাদেশের বাইরে এক ডালেরই রকম ফেরের সীমা নেই। মসলাপাতি দিয়ে ডালকেই সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করে গৃহিণী কিছুটা আত্মপ্রসাদ পান।

একটা ডালের রান্নার প্রণালী দেখেছিলাম যাতে খুব সহজলভ্য জিনিসে স্বাদ সৃষ্টি করা যায়। বাঙালীর কাছে অবশ্য ডালকে মাছের বিকল্প হিসাবে ধরা বাতুলতা মাত্র, তবে একান্ত অভাবে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখা চলে।

উপকরণ: কিছু কাঁচা মুগের ডাল, একটা পেঁয়াজ কুচি করে কাটা, অল্প দই, একটুকরো আদা কুচি করে কাটা, অল্প গোলমরিচের গুঁড়ো, গোটা দুই কাঁচা লংকা চেরা, খুব সামান্য ঘি বা তেল, আন্দাজ মত নুন, অল্প হলুদ আর কিছু শাক—পালং হলেই ভাল।

প্রণালী ১। কাঁচা মুগের ডাল খোলায় বা শুকনো অবস্থায় ভেজে নেবেন, ভাজা মুগের চেয়ে অনেকটা সস্তা হবে।

২। শাক ধুয়ে নেড়ে সামান্য জল দিয়ে সিদ্ধ করে নরম করে নেবেন। ঐ জল শাকের গায়েই শুকিয়ে যাবে।

৩। শাক হাতে চটকে নরম করে নেবেন।

৪। গরম জলে আদাকুচি, হলুদ আর ডাল চড়িয়ে দিন। ডাল নরম হলে শাক দিন, আন্দাজ করে নুন দেবেন। এবার অল্প দই দিয়ে ফেটিয়ে ডালে দিন। ঢিমে আঁচে মিনিট পাঁচেক রাখুন।

৫। ঘি বা তেল গরম করে তাতে কাঁচা-লঙ্কা ও পেঁয়াজ ভেজে ডালের উপর ছড়িয়ে দিন। গোলমরিচ ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

আলুর দামও ধা। তাতে আলুকে আর আটপৌরে তরকারি বলা চলে না। তবে গৃহস্থ সংসারের সব রান্নায় একটু আলু অন্যান্য অনেক তরকারির চেয়ে স্বল্পমূল্যে। ভাতের বদলে রুটি খেলে, আলুর দু'একটা রান্না মুখরোচকও হয়। মশলা, ঘি, তেল কম খরচ করে দই দিয়ে আলু রান্না করে দেখুন না, স্বাদ সকলের পছন্দ হয় কিনা। ছোট ছোট আলু হলেও চলবে।

উপকরণ : ছোট আলু, নুন, শুকনো লঙ্কা, আলুর পরিমাণ অনুসারে দই (২৫০ গ্রাম আলু) হলে এক পেয়ালার তৃতীয়াংশ দই হলেই চলবে) ধনেপাতা কিছু, একটু হিং গোলা জল। আদা, জিরে ভাজা ও হলুদ।

প্রণালী : ১। আলু খোসাসমেত সিদ্ধ করে, খোসা ছাড়িয়ে আধখানা করে কেটে নেবেন।

২। জিরে ভাজা ও আদা, হলুদ একত্র পিশে নেবেন।

৩। অতি সামান্য তেল বা ঘিয়ের মধ্যে অল্প জিরে দিন। জিরে ফুটে উঠলে সামান্য হলুদ গুঁড়ো ও শুকনো লঙ্কা দিয়ে আলু দিন।

৪। দই ফেটে, দই ও মশলা দিয়ে দিন, বেশ করে নাড়বেন যাতে দই ক্রীমের মত হয়, ছাড়া ছাড়া না হয়। নুন দিন আর উপরে ধনেপাতার কুচি দিয়ে গরম পরিবেশন করুন।

টোম্যাটোর সঙ্গে ঘোল মিলিয়ে একরকম 'চাটনি' চেষ্টা করে দেখুন, তেল ছিটেমাত্র লাগবে, চিনি লাগবে না, আর নুতনত্ব হিসাবে এক আধবার ভালও লাগতে পারে।

উপকরণ : দুটি বড় বড় টোম্যাটো, এক পেয়ালা টাটকা ঘোল, পাঁচটি কাঁচালঙ্কা (অবশ্য ঝাল কম দরকার হলে লঙ্কার পরিমাণ কম দেবেন) আধ পেয়ালা নারকেল কোরা, কিছু সরষে, সামান্য তেল, দুটি বা একটি শুকনো লঙ্কা, লবণ।

প্রণালী : ১। ছোট ছোট করে টোম্যাটো কাটুন।

২। কাঁচালঙ্কা, নারকেল কোরা এবং লবণ খুব মিহি করে পিষে নেবেন।

৩। সরষের খানিকটা ঐ নারকেল, লঙ্কা, নুন-এর সঙ্গে আবার পিষুন। এবার এই মসলা ভাল করে ঘোলের সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন। টোম্যাটো দিয়ে দিন।

৪। তেলের ছিটামাত্র কড়াইতে দিয়ে তাতে সামান্য সরষে দিন। সরষে ফুটলে ঐ চাটনিতে সম্বরা দিন।

শাকসবজি রান্নায় মনে রাখবেন উত্তাপ যত অল্প লাগবে সবজির গুণ ততটাই বজায় থাকে। অনেকে সবজির রং ঠিক রাখবার জন্য খাবার সোডা সবজিতে দেন, এতে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয়। সবজি রান্না করে বারে বারে গরম করবেন না। অনেক সময় রান্না করে গরম রাখার জন্য আমরা সবজি উনোনের পাশে রাখি। তার চেয়ে খাবার সময় গরম করা অনেক ভাল। সবজি কাটা ও রান্না করার মধ্যে অনেকটা সময় ফেলে রাখবেন না বা অনেকক্ষণ কাঁচা সবজি কেটে জলে ডুবিয়ে রাখবেন না। রান্নায় জলের ব্যবহার বেশী করবেন না। যেসব সবজি নিজের রসেই নরম হয় তার জন্য জল দিলে স্বাদও নষ্ট হয় গুণও নষ্ট হয়।

টুকিটাকি

অনেক সময় আমরা যা রোজ ফেলে দিয়ে থাকি তার নানারকম ব্যবহার হতে পারে। দিনে কতবার চায়ের ভিজে পাতা আমরা ফেলে দি। এই ভিজে পাতায়, অল্প রিঠার গুঁড়ো মিলিয়ে জল দিয়ে ফুটিয়ে মাথা ঘষবেন, দেখবেন উজ্জ্বল, সুন্দর হবে চুল।

গরমের দিনে অনেক সময় দই ফেঁপে ওঠে। অখাদ্য মনে হয়, ঝাঁজ হয়ে ওঠে কিন্তু এইরকম দইতে ডালের বেসন মিশিয়ে মুখে প্রলেপ দেবেন। শুকিয়ে গেলে আস্তে আস্তে ধুয়ে ফেলবেন। মাঝে মাঝে ব্যবহার করলে আপনি ত্বকের অনেকটা উন্নতি লক্ষ করবেন।

লেবুর রস নিংড়ে নিয়ে খোসাটি ফেলে দেবেন না। একটু নুন মিলিয়ে রান্নার বাসন মেজে দেখবেন কত পরিষ্কার হয়।

কমলালেবুর খোসা ফেলে দেবেন না। পরিষ্কার ফুটন্তো জল একটি পাত্রে রাখুন তাতে ২।৪টি কমলার খোসা দেবেন। বেশ ধারালো ছুরি দিয়ে জলের তলায় হাত রেখে কমলার খোসা কুচি কুচি করে কেটে ঐ জলে সারারাত রেখে দেবেন। সকালে খোসা ফেলে ঐ জল মুখে মাখুন দেখবেন কমলার খোসায় স্বাভাবিক তেলাক্ত পদার্থ কত উপকারী। জল শিশিতে দু'চার দিন রেখেও দিতে পারেন।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটনে মহাকাশযান

আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে।

কংগ্রেস এই মহাকাশ সংস্থাকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ নিয়ে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছে। এ সংক্রান্ত আইনে বলা হয়েছে, "মহাকাশের কার্যকলাপ মানুষের কল্যাণে শান্তিমূলক কাজে নিয়োজিত হবে, এইটাই যুক্তরাষ্ট্রের নীতি।"

আইনে আরও বলা হয়েছে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংক্রান্ত কার্যকলাপ এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে, যা এই আইন অনুসারে সম্পাদিত কাজেকর্মে এবং শান্তিমূলক কাজে তার প্রয়োগে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার ব্যাপারে সার্থক সহায়তা করবে।"

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা যেমন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি এটি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের একটি সংগঠন। মহাকাশ গবেষণার ব্যাপারে ষাটটিরও বেশি দেশের সঙ্গে এর সহযোগ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এক মহান আবিষ্কারের লক্ষ নিয়ে একযোগে কাজ করছেন। এতে শুধু যে মার্কিন বিজ্ঞানী ও তাঁদের সহযোগী বিজ্ঞানী উপকৃত হচ্ছেন তা নয়, সকল দেশের বিজ্ঞানীদের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি উপলব্ধির পক্ষেও অনেক অগ্রগতি হচ্ছে।

এই সহযোগিতার ফলে কি পাওয়া যাচ্ছে? মহাকাশ গবেষণার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য কি?

এই প্রচেষ্টার জন্য যে ব্যয় হচ্ছে, তার সার্থকতা আছে কি? ইতিমধ্যেই যে-জ্ঞান সঞ্চয় করা গিয়েছে, তার কতখানি মূল্য আছে?

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ক' বছর মহাকাশ গবেষণার মূল বিষয়গুলি শেখা গিয়েছে। শেখা সম্ভব হয়েছে যে, শূন্যে উৎক্ষেপণের পূর্বে মহাকাশ-যান ও রকেটকে কেমন করে পরীক্ষা করতে হয়, যাতে মহাকাশে ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়ে যথাযথ নিজেদের লক্ষ সাধন করতে পারে।

১৯৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শতাধিক মহাকাশ-যান পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেছে এবং পাঁচটি মহাকাশযান সূর্যের কক্ষপথে স্থাপন করেছে।

সুতরাং মহাশূন্যে সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশ-যান উৎক্ষেপণের জন্য যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জানা প্রয়োজন, তা জানা গিয়েছে। এই সঙ্গে মহাকাশে এগুলির পাল্লা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে এবং প্রয়োজনানুসারে মহাকাশ-যানের গঠনাদিরও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

মহাকাশ-যানের এই বহুমুখিতার প্রমাণ রয়েছে মনুষ্য-চালিত মার্কারি যান, কক্ষ-পরিক্রমারত সৌর মানমন্দির ও মেরিনারের শুক্রগ্রহ অতিক্রম করার মধ্যে এবং টেলস্টার ও রীলে কৃত্রিম উপগ্রহ ও বার্তাবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ সিনকমের মধ্যে।

মহাকাশ-যাত্রা সম্পর্কে যতই জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, ততই আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জানতে পেরেছি। যতদিন না মহাকাশ-যান ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করা হয়েছে, ততদিন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক রহস্যই আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসমন্বিত মহাকাশ-যান ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করা হয়েছে তিনটি কারণে। প্রথমত, আবহমণ্ডলকে জানবার চেষ্টা। আবহমণ্ডলে যন্ত্রপাতি স্থাপন করেই এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা যায়। ১নং এক্সপ্লোরার কর্তৃক পৃথিবী বেষ্টনকারী ভ্যান অ্যালেন তেজস্ক্রিয় বলয় আবিষ্কারের মধ্যে এর চমকপ্রদ প্রমাণ মিলেছে।

মহাকাশ-যান উৎক্ষেপণের দ্বিতীয় কারণ মহাকাশে বহুদূরবর্তী বস্তুনিচয়ের আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ। এর প্রধান দৃষ্টান্ত মেরিনার উৎক্ষেপণ।

শুক্রগ্রহ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছ দিয়ে যায়, তখন উভয়ের মধ্যে দূরত্ব থাকে দু' কোটি সত্তর লক্ষ মাইল। মেরিনার এই দূরত্বকে হাজার গুণেরও বেশি কমিয়ে দিয়েছে। মেরিনার যখন শুক্রগ্রহকে অতিক্রম করেছে, তখন ঐ গ্রহ থেকে মেরিনারের দূরত্ব ছিল একুশ হাজার মাইল।

শুক্রগ্রহের চৌম্বকক্ষেত্রের পরিমাপ এবং সৌর মহাকাশে (Solar Space) বিদ্যমান সূক্ষ্ম কণাসমূহের বিষয় মেরিনার আমাদের জানিয়েছে।

তৃতীয় কারণ এই যে, মহাকাশ-যাত্রার ফলে আমরা পৃথিবীর চতুষ্পার্শ্ববর্তী বৈজ্ঞানিক যবনিকার ঊর্ধ্বে যেতে পেরেছি।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু ঘটছে, তার সবগুলি না হলেও অনেকগুলি এমন ধরনের যা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। এগুলি অনুধাবনের জন্য যন্ত্রেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। এটি হল যুক্তি। এইসব 'অদৃশ্য' কার্যকলাপ যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করতে হলে আমাদের অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে এগুলি রেকর্ডে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

অতীতে গবেষণার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের

স্বল্পবিত্তদের 'রেসের ঘোড়া'—প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর রুঢ় জেলার মতো এই 'রেসের ঘোড়া', পোষা পারাবত এক সংখ্যায় কোথাও নেই। পশ্চিম জার্মানীর মোট পারাবত-প্রিয় ও প্রজননকারিদের মধ্যে রুঢ় ও রাইনেই আছে ষাট হাজার জন। এসেন, বোখাম ও ডর্টমাণ্ডের মতো শহরের অসংখ্য বাড়ির ছাদেই পায়রার খোপ দেখা যায়। কিন্তু এ বছর একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে—এইসব গৃহবাসী পারাবতদের মধ্যে বহু সহস্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করে না। বাজপাখির খপ্পরে ওরা পড়ে না। কারণ পশ্চিম জার্মানীতে শিকারী বাজপাখি এখন লোপ পেয়ে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান রাডার রশ্মি এদের গৃহের পথ নির্ণয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করছে

বৈজ্ঞানিকেরা এই ধরনের রেকর্ড করার কাজে কতকগুলি উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেছেন, যেমন ফটোগ্রাফিক প্লেট, অসিলোস্কোপ, রেডিও টিউব, গাইগার কাউন্টার, ট্রান্সজিস্টার প্রভৃতি।

আমাদের এই পৃথিবীর বাইরে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে এমন বহু ঘটনা ঘটছে, যার অনেকগুলিই এই সমস্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা যায়। পৃথিবীর বাইরে সৃষ্টির বিস্ময়ীভূত এই সব বস্তুর তেজস্ক্রিয়তা ও ঐ বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত উচ্চশক্তিসম্পন্ন কম্পনসমূহের সাহায্যে এই রেকর্ড করার কাজ সম্ভব হয়। এই তেজস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু এর খুব কম অংশই পৃথিবীর আবহমণ্ডল ও চৌম্বকক্ষেত্র ভেদ করে পৃথিবীতে আসতে পারে।

মহাকাশ অভিযানে পূর্বে দূর মহাশূন্য থেকে আগত তথ্যাদির শতকরা ৮৫ ভাগই আমাদের কাছে ছিল অজ্ঞাত।

শ্রমশিল্প ও সমাজবিজ্ঞানের উন্নয়নে বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সকল প্রকার মৌলিক গবেষণা থেকে আমরা যে উপকার পাই, তা গবেষণার ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু কোন্ মৌলিক গবেষণার কতখানি লাভ হবে, তা জানবার কোন উপায় নেই।

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে আমাদের মৌলিক গবেষণার কাজ বিপুল পরিমাণে চালাতে হয়। মহাকাশ গবেষণাও এর বহির্ভূত নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণার লক্ষ হল, নব নব দিগন্তের উন্মোচন। এ সম্পর্কে জ্ঞান এতদিন খুবই সীমিত ছিল এবং অনেক ভ্রান্ত ধারণাও বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিল।

মহাকাশ সন্ধানের পূর্বে ধারণা ছিল মহাকাশ শূন্য নয়, বরং আয়ন ও ইলেকট্রন প্রভৃতি কণার সমষ্টি। তবে এই কণাগুলি কতখানি পরিমাণে আছে, তা আমরা জানতাম না এবং কোথা থেকে এগুলি এসেছে বা সমগ্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডের গঠনে তাদের সম্পর্ক কি, তাও আমাদের অজ্ঞাত ছিল। এখনও আমরা এসব জানি না।

আমরা জানতাম পৃথিবীর চতুর্দিকে চৌম্বকক্ষেত্রের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাদের প্রসার ও বিন্যাস সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিল না।

মহাকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ, সূর্য ও গ্রহাদি সম্পর্কে পূর্বে আমাদের যে ধারণা ছিল, মহাকাশ সন্ধানের ফলে সেগুলি সত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে, অথবা তা সংশোধিত হচ্ছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে বিস্তারিত রেকর্ড করার যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরাও সেইরূপই করে যাচ্ছেন, তবে এখন কাজ আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। টাইকো ব্রাহে বিশ বছরের মধ্যে গ্রহাদির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড করেছিলেন। এই রেকর্ডিং-এর ফলেই জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী কেপলারের পক্ষে মঙ্গলগ্রহ কেমন করে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছিল।

এ থেকেই সৌরমণ্ডল সম্পর্কে আমরা অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। এর ফলেই নিউটন তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে এবং এই তত্ত্ব মানুষের মঙ্গলসাধনে আরও অনেক সম্ভাবনা এনে দিয়েছে।

পশু পোষ মানানোর ইতিহাস

বহু শতাব্দী ধরে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে সাধারণ লোকের বন্য জন্তু শিকার নিষিদ্ধ ছিল। গোপনে কেউ যাতে শিকার করতে না পারে সেজন্য সাধারণ লোককে, শিকারে অংশগ্রহণে অক্ষম, এমন ছোট ছোট কুকুর পুষতে দেওয়া হত। কিন্তু অনধিকার শিকারীদের উপায় উদ্ভাবনের প্রতিভা বহুমুখী। তাই উদ্যমী ইংরাজরা, নিতান্তই অভাবনীয় এমন একটি জন্তুকে তাদের শিকারের সহচররূপে শিক্ষিত করে তোলে। জন্তুটি হচ্ছে শূকর। প্রবল ঘ্রাণশক্তির জন্য এইসব শিকারী শূকররা তিতির, ফেজান্ট, কাদাখোচা পাখি এবং খড়গোস তল্লাসে কেউদের চেয়েও যোগ্যতার জন্য খ্যাতি লাভ করে।

শূকররা আরো নানারকম কাজে লাগে। প্রাচীন মিশর ও গ্রীসে মুখে ঠুলি পরানো শূকরদের সদ্য বীজ ছড়ানো ক্ষেত মাড়ানির কাজে নিযুক্ত করা হতো। ওদের ছুঁচলো পা বীজকে প্রয়োজনীয় গভীরত্বে প্রোথিত করে দিত। এমন কি বর্তমান কালেও তীব্র ঘ্রাণশক্তিযুক্ত শূকরদের অত্যন্ত মূল্যবান ভূগর্ভস্থ ছত্রাকের কন্দ উৎপাটনের কাজে লাগানো হয়। তবে শূকররা বেশী কাজে আসে মানুষের খাদ্য হিসেবে।

এই তথ্যগুলি পরিবেশন করেছেন অধ্যাপক এফ ই জ্যুনার তাঁর 'গৃহপালিত পশুর ইতিহাস' গ্রন্থে। অধ্যাপক জ্যুনারের মতে, পোষা জন্তু না থাকলে আজও আমরা বুনো বরাহ শিকার করতে যেতাম তীর-ধনুক নিয়ে।

পোষ মানানো কিভাবে আরম্ভ হয়? অধ্যাপক জ্যুনারের অনুমান হচ্ছে, সম্ভবত মানুষের প্রাচীনতম সঙ্গী কুকুর তার ধূর্ততা এবং শিকারে একাগ্র উদ্যমের জন্যই আদি মানুষের মৃগয়া সহচর হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। সুতরাং এটা অসম্ভব নয় যে, বাচ্চা নেকড়ে, শৃগাল অথবা বন্য কুকুররা যারা প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিকারী মানুষদের অস্থায়ী শিবিরের আশপাশে থেকে বড়ো হত তারা, স্বভাবতই যারা তাদের আংশিক খাদ্য সরবরাহ করতো, তাদের নিজেদেরই দলের বলে বিবেচনা করত—যে ব্যাপারটা শিকারীরা নিজেদের কাজে লাগিয়ে নিত।

হাজার বছরের প্রাচীন মেলা

মেলা জিনিসটা প্রত্যেক দেশেই আছে। মেলার আবার রকমফের আছে। জার্মানীতে "আউয়েদ ডুল্ট" বলে যে মেলা বসে তাতে সব পুরোনো জিনিস বিক্রি হয়। অঙ্গুষ্ঠানা থেকে শুরু করে জুড়িগাড়ি পর্যন্ত হেন জিনিস নেই যা এই মেলায় পাওয়া যায় না। এক সপ্তাহ ধরে এই মেলা বছরে তিনবার বসে মিউনিখে। এর সঙ্গে তুলনা হয় একমাত্র প্যারিসের পুরোনো জিনিসের মেলার সঙ্গে। তবে পশার প্রতিপত্তিতে মিউনিখের মেলা প্যারিসকেও হার মানায়। এখানে শুধু বেচাকেনা নয়, হৈ হল্লোড়, আমোদ ফূর্তিরও ছড়াছড়ি। বিলাতি ধনো শেরীর সঙ্গে ফুলুরি খেয়ে নাগরদোলায় চড়ে দিনটা মন্দ কাটে না!

জার্মানীর "ডুল্ট" মেলার একটা ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসের শুরু ৯৫৫ সনে লেচফেলেটর যুদ্ধের সময়। যুদ্ধ হয় ব্যাভেরিয়ানদের সঙ্গে হাঙ্গেরিয়ানদের। এই ব্যাভেরিয়ান দলে জ্যাকব কাণ্টহাউসের নামে এক তরুণ জমিদার ছিল। যুদ্ধের আগে সে প্রতিজ্ঞা করে যে, বেঁচে ফিরতে পারলে সে মিউনিখের কাছে তার গাঁয়ে সাধু জেমসের নামে এক গির্জা প্রতিষ্ঠা করবে। ৯৬৪ সনে এই গির্জা যখন উৎসর্গ হল, তখনই প্রথম মেলা বসে। পরে মেলার নাম হয় জ্যাকব মেলা—কারণ জার্মাণ ভাষায় জেমসকে জ্যাকব বলে। এর দুশো বছর বাদে এই মেলাকে মিউনিখে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতিমধ্যে সারা জার্মানীতে এই মেলার তখন খুব নাম ডাক হয়েছে।

আজ হাজার বছর পার হলেও সেই মেলার আনন্দ-উৎসবের ভোল বিশেষ পাল্টায়নি। একদিন ছিল যখন দোকানীরা এই মেলায় নতুন নতুন জিনিস আমদানি করে বাহবা পেত। কিন্তু এখন খেলো ও দুর্লভ জিনিসপত্রই পাওয়া যায়। তাই এই মেলায় সাধারণ ও ধনী উভয়কেই দেখা যায়। ফাটাফুটো ঘটিবাটি, ভাঙা আসবাবপত্র, ছেঁড়া পোশাক থেকে শুরু করে মহামূল্য পুঁথি ও হাতে-আঁকা বিখ্যাত ছবি এই মেলায় বিক্রয় আসে। আবার অনেক মেকি জিনিসও খাঁটি বলে এই মেলায় চালিয়ে দেওয়া হয়।

ভারতের অর্থনীতি

হলদিয়া বন্দর

কলকাতার বর্তমান বন্দর হুগলী নদীর উপর মোহানা থেকে প্রায় ১২০ মাইল উপরে অবস্থিত। সমুদ্র ও কলকাতার মধ্যে জাহাজের যাতায়াত কোনোদিনই সহজ ছিল না। জাহাজের আকার বৃদ্ধি, বিশেষ করে বাষ্পের প্রবর্তনের পর থেকে সমস্যা আরো কঠিন হয়েছে। ডায়মণ্ডহারবারের উপরের দিকের নদীতে চড়া ও বাধা থাকায় অনবরত পলিমাটি পরিষ্কার করবার দরকার হয়। কি রকম আকারের জাহাজ নদীপথে যেতে পারবে, তা নির্ভর করে ঐসব চড়ার উপরকার জলের গভীরতার উপর। চড়া প্রভৃতি পার হবার জন্য জাহাজকে জোয়ারের অপেক্ষা করতে হয়। তাছাড়া নদীর বাঁক দিয়ে নিরাপদে যাতায়াত করা সম্ভব হবে কি, তা বোঝা যায় জাহাজের দৈর্ঘ্য থেকে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের একটা বিশাল অঞ্চল ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য কলকাতা বন্দরের মুখাপেক্ষী। জনাকীর্ণ ও শিল্পোন্নত এই অঞ্চলের পণ্য কলকাতা বন্দর দিয়ে আদান-প্রদান করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। বন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করা হলেও একটা নির্দিষ্ট আকারের চাইতে বড়ো জাহাজ সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না এবং ফলে মাল নিয়ে আসা বা পাঠাবার দরুন অযথা অতিরিক্ত জাহাজ-ভাড়া লাগবে। কেবল সীমাবদ্ধ আকারের জাহাজ ব্যবহার করতে হচ্ছে বলে প্রতি বছর কমপক্ষে তিন কোটি টাকা সরাসরি খরচ পড়ে। ১৯৫৫-৫৬ সালে যে রপ্তানি ও আমদানী পণ্য পাঠানো বা আনা হয়েছিল, তাতে বেশী জাহাজ-ভাড়ার দরুন প্রতি টনে প্রায় চার টাকা লেগেছিল। এই সব অসুবিধা আছে বলে কলকাতার বর্তমান বন্দর যে দেশের সম্প্রসারণশীল আর্থিক ব্যবস্থার ব্যবসা-বাণিজ্যের সকল প্রয়োজন মেটাতে পারবে না, তা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বন্দর দিয়ে যে-সব ভারী মাল পাঠাতে হয়, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কয়লা ও খনিজ লোহা। কয়লা বাণিজ্যের জন্য ১০,০০০ টনের বেশী জাহাজের দরকার হবে না, কারণ, ঐ বাণিজ্য মোটামুটি ভারতের উপকূলবর্তী বড়ো ও ছোট বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। খনিজ লোহা অবশ্য পণ্য হিসাবে বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং তার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বড়ো আকারের জাহাজ লাগে। কিন্তু সেখানেও ২৫,০০০
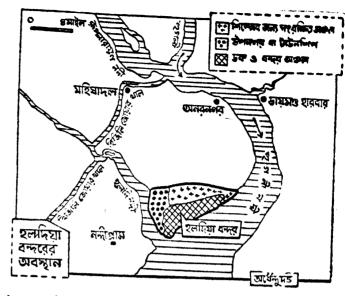
টনের জাহাজ দিয়ে কাজ চলবে বলে মনে হয়। মাল বোঝাই জাহাজ ছাড়াও, ভারতবর্ষ ও দূর প্রাচ্যের দেশসমূহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ২৫,০০০ টনের যাত্রিবাহী জাহাজের কলকাতা হয়ে আসা-যাওয়া করার দরকার হবে। হুগলী নদীর নাব্যতা সীমাবদ্ধ বলে ১৫,০০০ টনের বেশী বড়ো জাহাজ কলকাতা বন্দরে প্রবেশ করতে পারে না। ঐ বন্দরের পরিপূরক হিসাবে গভীর সমুদ্রের নতুন একটা বন্দর গড়ে তোলা তাই জরুরী প্রয়োজন। বড়ো আকারের জাহাজ তাহলে উপ-বন্দর দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে। যে-অঞ্চলের ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহায়ক হবে, সেই অঞ্চলে একটা সুবিধামতো জায়গায় পরিপূরক বন্দরটি অবস্থিত হবে এবং রাস্তা ও রেলপথ দ্বারা দেশের অভ্যন্তরের সঙ্গে বন্দরটিকে সহজে যুক্ত করা যাবে।

কলকাতা বন্দর থেকে নদীপথে প্রায় ৫৬ মাইল নীচে হলদিয়ায় উপরোক্ত সুবিধা-গুলি মেলে বলে সেখানে খাদ্যশস্য, কয়লা ও খনিজ লোহা আদানপ্রদানের জন্য নতুন বন্দর স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হলদিয়ায় একটা বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে স্বাভাবিকভাবে গভীর জল থাকে। জায়গাটা বর্ষার ঢেউ অথবা সন্নিহিত অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা পায়। বন্দরের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, বিশেষত গুদাম-ঘর, কর্মচারী ও শ্রমিকদের বাস-গৃহ, রেল স্টেশন ইত্যাদি তৈরি করবার উপযোগী বিস্তৃত ভূখণ্ড সেখানে পাওয়া যাবে।

যে-সব জাহাজ বেশী মাল থাকার জন্য কলকাতা বন্দরে আসতে পারে না, হলদিয়ায় তাদের বোঝার একটা অংশ কমিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। কলকাতা বন্দরে যেখানে পনের হাজার টন পর্যন্ত জাহাজ প্রবেশ করতে পারে, হলদিয়ায় সেখানে চল্লিশ হাজার টনের জাহাজ আসবে। পেট্রোল ও খনিজ ধাতু নতুন বন্দর থেকে রপ্তানি করা যাবে। কলকাতা বন্দর থেকে নদীপথে খনিজ দ্রব্য হলদিয়ায় নিয়ে এসে বড়ো জাহাজে করে তা বিদেশে পাঠানো যেতে পারে। হলদিয়ায়

যে বন্দরে খনিজ ধাতু আনার সুবিধা আছে, পরাদীপে (পরাদীপে একটা অন্তবর্তী বন্দর গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। ঐ প্রস্তাব অনুসারে পাঁচ লক্ষ টন খনিজ লোহা সেখান থেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করা যাবে), তা অনুপস্থিত। যদিও চল্লিশ হাজার টনেরও বেশী ভারী জাহাজ পরাদীপে আসতে পারে, তবু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সঙ্গে তার তেমন যোগাযোগ নেই; খনি অঞ্চল থেকে লোহা ঐ বন্দরে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করতে হবে।

হলদিয়ায় তৈল-শোধন শিল্প স্থাপন অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই যুক্তিসংগত। সেই সঙ্গে প্লাস্টিক ও সংশ্লিষ্ট তন্তু অর্থাৎ সিনথেটিক ফাইবার উৎপাদনের এটা একটা কেন্দ্র হতে পারে। তৈল-শোধন শিল্পের পরিত্যক্ত পদার্থ বা ওয়েস্ট থেকে ভালো সারও তৈরি করা যাবে।

কলকাতা বন্দরে এখন যে সুবিধা আছে, কেবল তার সম্প্রসারণের জন্য গোড়ার দিকে হলদিয়া বন্দরে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হলদিয়ায় যাতে শিল্পোন্নয়নের একটা নিজস্ব দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করা যায়, এবং নতুন কর্মপ্রার্থীদের জন্য যাতে কলকাতার বদলে হলদিয়া অঞ্চলে কাজের সংস্থান করে দেওয়া সম্ভব হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই অর্থে কলকাতার আর্থিক অগ্রগতি হলদিয়ার উন্নয়নের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

হিসাব করা হয়েছে যে, চারটি বার্থ-সমন্বিত একটি ডক-ব্যবস্থাশুদ্ধ হলদিয়া বন্দরটি নির্মাণ করতে প্রায় ২৫ কোটি টাকা খরচ পড়বে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনায় এই প্রকল্পের জন্য ৭ কোটি টাকা ধরা হয়েছে এবং আশা করা গেছে যে, আরব্ধ কাজের অবশিষ্ট অংশ চতুর্থ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবে। কলকাতা-খড়্গপুর প্রধান রেলওয়ের সঙ্গে বন্দরটিকে সরাসরি রেলপথে সংযুক্ত করার কথাও বলা হয়েছে।

হলদিয়া বন্দর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শহর হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। ঐ অঞ্চলের উন্নয়ন একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। নতুন বন্দরে যে-সব আনুষঙ্গিক সুবিধার প্রয়োজন হবে, তার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ (হিসাব করে দেখা গেছে যে, হলদিয়ার জন্য ৫০ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎশক্তি লাগবে; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎশক্তি বোর্ডকে এই প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করতে হবে), মেরামতের কারখানা ও পরিস্রুত জলের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নের মত, আনুষঙ্গিক সুবিধার ব্যাপারে হলদিয়া শহর ও বৃহত্তর কলকাতা যে পরস্পর-নির্ভরশীল হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

শান্তিকুমার ঘোষ

আলোচনা

ছিন্ন হৃদয়

॥ ১ ॥

মহাশয়,

"দেশ" পত্রিকায় নেহেরু বিয়োগে লেখা "রঞ্জনের" "ছিন্নহৃদয়" পড়ে মনে স্বভাবতই কয়েকগুলো প্রশ্ন কণ্টকিত হয়ে ওঠে। শ্রীরঞ্জন যে একজন স্মার্ট বা তৎপর লেখক তাতে সন্দেহ নেই, আর তাঁর এই তৎপরতায় যে একটা আপাত চকচকে ভাব আছে যার গুণে হয়তো বা কারুর কারুর মনোহরণেও সমর্থ। তবে একটু সন্ধানী চোখে এ চকচকে ভঙ্গির কৃত্রিমতা ধরা পড়ে যায়—যা মনে হয়েছিল খাঁটি সোনা তা যে গিল্টী করা নকল সেটা বুঝতে বাকী থাকে না। তেমনই হয়েছে এই বিশেষ লেখাটির বেলায়। শ্রীরঞ্জনের লেখাতে এটাই প্রতীয়মান যে ভারত নামক একটা অত্যন্ত অসভ্য কুসংস্কার-ভরা সংকীর্ণতার দেশে হঠাৎ বিদেশী সাহেবরা এসে শিখিয়ে দিয়েছে ঔদার্য আর সহনশীলতার মন্ত্র যা ভারতবাসী গ্রহণ করতে পারেনি। ভারতবর্ষের দর্শন যে সংকীর্ণ তার কোথাও ঔদার্যের বাণী নেই এমন একটা উক্তি শুনে ভারত ইতিহাসের একজন নাবালক পাঠকও হেসে উঠবে। যে ভারতের ধর্ম আর সংস্কৃতির মূল কথাই ঐক্য আর নিখিল মানবতার, যে দেশ জাতি-বর্ণনির্বিশেষে মানুষকে অমৃতের সন্তান বলতে পারে—তার বাণী সংকীর্ণতার—তার বাণী অনৌদার্যের এমন কথা কে বলবে। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষে অসংখ্য জাতি আর সভ্যতার আনাগোনার মধ্যে দিয়ে এই ভারত মহাসাগরের তীরে যে নিখিল মানবতার পুণ্যতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার থেকেই স্নিগ্ধবারি গ্রহণ করেছেন রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ গান্ধী নেহেরু প্রমুখ ভারতের নব-জাগরণের পুরোধারা। শ্রীরঞ্জন এই ঐতিহাসিক সত্যটি জানেন কিনা জানি না। ভারতের রেনেসাঁসের যাঁরা অগ্রণী তাঁরা ভরাতের চিরন্তন সত্তারই পূর্ণ মূল্যায়ণের চেষ্টা করেছেন কারণ ভারত চিরদিনই গ্রহণ করেছে উদার চিত্তে। তাই গত শতাব্দীর উপান্তে বসে এ দেশেরই দার্শনিক পরম প্রত্যয়ে বলতে পেরেছেন—"যত-মত-তত-পথ।" আর সেই বাণীই নিখিল বিশ্বে বজ্রকণ্ঠে বলতে পারেন ভারতের নবীন সন্ন্যাসী। শ্রীরঞ্জনকে প্রশ্ন করি তিনি ভারতীয় সংকীর্ণতায় এত ব্যথিত তিনি ইতিহাস যদি পড়ে থাকেন তাহলে কি জানেন নি ধর্মের নামে একই ধর্মের মানুষেরা ও-দেশে কি বীভৎস রক্তাক্ত উৎসবে মেতে উঠেছিলেন। তিনি কি জানেন না যে সেই সুসভ্য স্বর্গে আজও বর্ণবৈষম্যের বীভৎস প্রকাশ যার জন্যে আজও কেনেডির মত রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রাণ দিতে হয় "সুসভ্য" শ্বেত ঘাতকের গুলিতে? আর সাম্প্রদায়িকতা সেটা কি শ্রীরঞ্জনের জানা নেই এ-দেশে কাদের দান? স্পষ্টই বলি এই সাম্প্রদায়িকতার বিষের চারা পুঁতে দেন শ্রীরঞ্জনের দ্বারা বন্দিত শ্বেত বিজেতারা যাদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের নিষ্ঠুর মশুল আজও দিচ্ছে এদেশের কোটি কোটি মানুষ। ভারতীয়তাকে ছোট করার আগে শ্রীরঞ্জনকে অনুরোধ করি ভাল করে সশ্রদ্ধ অনুভব দিয়ে ভারতবর্ষের মর্মবাণীকে অনুধাবন করতে। ভারতীয় সংস্কৃতি তথা ভারতবর্ষ, একজন ব্যক্তি, তিনি যত মহৎই হোন না কেন তাঁর চেয়েও অনেক বড়—অনেক মহীয়ান। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, নেহেরু সেই ভারতবর্ষেরই সন্তান এটা "রঞ্জন" বিস্মৃত হন কেমন করে? ইতি

শ্রীজয়ন্ত ভট্টাচার্য
হাওড়া।

॥ ২ ॥

সবিনয় নিবেদন,

দেশ-এ রঞ্জন লিখিত 'ছিন্ন হৃদয়' শীর্ষক রচনাটি পড়ে এ চিঠি লেখার প্রেরণা পেলাম। নেহেরুজীর মৃত্যুর পর, আমাদের ছিন্ন হৃদয় স্বভাবতই লেখায়, কথায় ও বক্তৃতায় সোচ্চার। নানা ভাবে আমাদের ব্যথাক্লিষ্ট হার্দ্য উচ্ছ্বাসকে বিধৃত করছি। যাঁকে হারালাম, তাঁর সাধারণে দুর্লভ গুণপনাকে নানাভাবে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসও এক ধরনের শ্রদ্ধা নিবেদন। নেহরুর প্রতি এ ধরনের শ্রদ্ধা নিবেদনও যতত্র লভ্য। উক্ত সংখ্যা দেশ-এর প্রায় প্রতিটি রচনায় এর প্রামাণিকতা বর্তমান। 'ছিন্ন হৃদয়' রচনাটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির (এই প্রসঙ্গে বৈদেশিকী শীর্ষক রচনাও কিঞ্চিৎ স্মর্তব্য।) তিনি (রঞ্জন), নেহরুকে নেহরু হিসেবে, অর্থাৎ ভারতের চুয়াল্লিশ কোটি জনসাধারণের নেতা হিসেবেই দেখতে পেরেছেন—কোন মহামানব রূপে নয়। তাই নেহরু-মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লোকান্তরিত ব্যক্তির চরিত্র ব্যাখ্যানে কিছু আপাতরূঢ় মন্তব্য করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। অত্যল্প সুযোগে নেহরু সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

উচ্ছ্বাস যেখানে মুখ্য, সত্য সেখানে সহজ কারণে নির্বাসিত। এজন্যই ভিন্ন প্রকৃতির 'ছিন্ন হৃদয়' অত্যন্ত আশাগ্রাহী—হৃদয় 'ছিন্ন' হলেও অন্ধ নয়, এ বোধটুকু জাগিয়ে রাখার জন্যে শ্রদ্ধেয় 'রঞ্জন'কে আমার অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাচ্ছি।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী
শিলচর, কাছাড়

মাও সে তুং-এর যুদ্ধতত্ত্ব

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ২রা মে তারিখের দেশ পত্রিকায় জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মাও সে-তুং-এর যুদ্ধতত্ত্ব" সম্বন্ধে দামী প্রবন্ধটির সময়োচিত প্রকাশনার জন্য ধন্যবাদ জানবেন। প্রবন্ধটি পড়ে চীনাদের যুদ্ধতত্ত্ব বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারা গেল, যার সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকা আজকের দিনের ভারতবাসীদের একান্তই দরকার। লেখক নিজেও এ বিষয়ে উদাসীন নন। সেই জন্যেই বোধ হয় মাও-এর জটিল যুদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যা তিনি আশ্চর্য প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেছেন, সাধারণ মানুষ মাত্রেই যাতে তার মূল নীতি ভাল করে বুঝতে পারে। তবে প্রবন্ধটির

সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। যে বাঙালী ডাক্তারটির টি এ বিলের গণ্ডগোল সম্বন্ধে এখানকার কাগজে সংবাদ বেরিয়েছিল তা একান্তভাবেই তার ব্যক্তিগত অপরাধ। সেজন্যে বিলাত-প্রবাসী প্রত্যেক ভারতীয় ডাক্তারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো চলে না। অথচ লেখক তাঁর মন্তব্যে এখানকার এক বিরাট ভারতীয় চিকিৎসক ছাত্রসমাজকে সেজন্যে দায়ী করেছেন। আমরা তার প্রতিবাদ জানাই।

এদেশের National health service-এর এক বিরাট স্তম্ভ হচ্ছেন এখানকার ভারতীয় চিকিৎসকেরা। এদেশের কাগজে ও সাময়িক পত্রিকায় প্রায়ই সে কথা স্বীকার করা হয়।

অরুণকুমার দত্ত
মেডিকাল রেজিস্ট্রার
চেস্টার সিটি হসপিটাল, চেস্টার

অটোয়ার চিঠি

মহাশয়,

গত ৩০শে মে, ৩০ সংখ্যা, "দেশ" এ শ্রীসমীরকুমার বসু লিখিত "অটোয়ার চিঠি" সুলিখিত ও শিক্ষাপ্রদ। তবে তাঁর চিঠিতে একটু ভুল চোখে পড়ল, সেটি আপনাকে জানাই।

তিনি লিখেছেন, "এ খৃষ্টান দেশে পূর্ব-পাকিস্তানের গারো পাহাড়ের ৪০ হাজার খৃষ্টানদের দেশত্যাগ নিয়েও খবর নেই বললে মিথ্যে বলা হবে না" (পৃষ্ঠা ৪২৩)। বস্তুত গারো পাহাড় পূর্ব-পাকিস্তানে অবস্থিত নয়। গারো পাহাড় ভারতবর্ষেই অবস্থিত। আসাম রাজ্যের একটি জিলার নাম গারো পাহাড় (Garo Hills)। খৃষ্টান শরণার্থীরা পূর্ব-পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলা থেকে বিতাড়িত হয়ে আসামের গারো পাহাড় জিলায় আশ্রয় নিয়েছে। এই খৃষ্টান শরণার্থীদের অধিকাংশই গারো [illegible] (ট্রাইবেল) জাতীয়।

সত্যিই দুঃখের বিষয় যে, আসামের পার্বত্য অঞ্চল সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় লোকদের ধারণা খুবই অল্প ও অস্পষ্ট। প্রতিবেশী রাজ্য হিসাবে বাংলা দেশের লোকদের

অন্তত আসাম ও তার পার্বত্য অঞ্চল সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত।

ঋষীন্দ্রনারায়ণ দত্ত
অধ্যক্ষ তুরা কলেজ, গারো হিলস্।

মহেন্দ্রলাল সরকার ও ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চা

শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

১৩৭১ সালের "দেশ" সাহিত্যসংখ্যা উল্লেখযোগ্য প্রকাশন হিসেবে পাঠক-সাধারণের মনে নিশ্চয়ই চিহ্নিত হবে। বাংলাদেশে বিজ্ঞানসাধনার ঐতিহ্যবিচারে বিদগ্ধ লেখকবৃন্দের প্রয়াসের এইরকম সংকলন এর আগে হয়নি। প্রচ্ছদের বিশিষ্টতা দৃষ্টি আকর্ষণকারী। প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আছে।

(১) অধ্যাপক সমরেন্দ্রনাথ ঘোষাল লিখিত "মহেন্দ্রলাল সরকার ও ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা"। বাংলাদেশে যে রেনেসাঁসের সূচনা করেছিল রামমোহন রায়ের সংস্কার-মুক্ত মনীষা তারই ক্রমবিবর্তনের এক উল্লেখ্য স্তর হিসেবে এসেছিল বিজ্ঞানসাধনা—তত্ত্বীয় এবং কার্যকরী উভয় দিকেই। এরই পুরোধা ছিলেন মহেন্দ্রলাল সরকার। মহেন্দ্রলালের প্রচেষ্টা তাঁর জীবিতকালে পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারে নি; বিজ্ঞান গবেষণার বাঙালী মনীষার সাফল্যের সূচনা মহেন্দ্রলালের প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার বেশ-কিছু পরের ঘটনা। পাঠক হিসেবে আমাদের প্রত্যাশা ছিল লেখক এই ঘটনার কারণগুলি বিশ্লেষণ করবেন। এর জন্যে, বোধ হয় দরকার ছিল পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের তুলনায় আমাদের রেনেসাঁসের অসম্পূর্ণতা বিশ্লেষণ। লেখক এ আলোচনায় একেবারেই নিযুক্ত হন নি। এ-জাতীয় এক প্রবন্ধকে—যেখানে মূল্যায়নই প্রাথমিক বিবেচ্য হওয়া উচিত—লেখক বহু ঘটনায় ভারাক্রান্ত করেছেন। এই প্রবন্ধে মহেন্দ্রলালের বিবাহ কাহিনীর উল্লেখ বর্তমান পত্র-লেখকের মতে অপ্রাসঙ্গিক।

(২) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত "রবীন্দ্র-নাথের বিজ্ঞান চেতনা"। যে বৈজ্ঞানিক মেজাজের কথা রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতিতে আমরা পেলাম তাঁর সমগ্র চিন্তা-ধারার মধ্যে তার অভিব্যক্তি কিভাবে হয়েছিল তার বিস্তৃত আলোচনার প্রত্যাশা করেছিলাম। বিশেষ করে তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে পরিচয় পাই—সংস্কারাচ্ছন্ন, প্রথাশাসিত এই দেশে বুদ্ধি-দীপ্ত এক অনন্যতা, ব্যক্তিনিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ প্রভৃতি, এইগুলি এই মেজাজেরই ফসল। পরবর্তী কোন এক প্রবন্ধে, আশা করি রবীন্দ্র-প্রবন্ধাবলীর সাক্ষ্য অনুসরণ করে রবীন্দ্রমানসের এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে উপরিউক্ত মেজাজের সংযোগসূত্র লেখক স্থাপন করবার চেষ্টা করবেন।

ধীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ

'বাঁকুড়ার মন্দির'

মহাশয়,

দেশ পত্রিকায় বাঁকুড়ার মন্দির পর্যায়ে শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক আলোচনাগুলি সত্যি সত্যিই মর্মস্পর্শী, চিত্তাকর্ষক ও তথ্যবহুল হয়েছে। অজানা, অবলুপ্ত অনেক খবরাখবর পরিবেশন করে লেখক নিঃসন্দেহে পাঠক-সমাজের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে 'দেশ'এর কর্তৃপক্ষমণ্ডলীকে আমার অনুরোধ বাংলা দেশের মন্দির পর্যায়ের আলোচনার যেন এখানেই ছেদ টানা না হয়। প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বাঙ্গালার প্রাচীন মন্দিরগুলি সত্যি সত্যিই বিরাট ঐতিহ্য-সম্পন্ন। বর্তমান আলোচনায় আমি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী শহরের উল্লেখ করতে চাই।

বিজ্ঞানসাধক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জন্মস্থান কান্দীর মন্দিরগুলি এক গৌরবময় আসনের অধিকারী। কান্দী শহরের মন্দিরের সংখ্যা এক নয়—অসংখ্য। এর মধ্যে শহরের প্রান্তদেশে অবস্থিত দোহালিয়া কালীবাড়ির মন্দির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশিষ্ট। এই মন্দিরের বিগ্রহকে কেন্দ্র করে অনেক গল্প, কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। তাদের অধিকাংশের মূলেই হয়ত রয়েছে অন্ধ বিশ্বাস। তবু স্থানীয়—শুধু স্থানীয় কেন বাইরের বহু ধর্ম-বিশ্বাসীর কাছেই এই মন্দিরের আবেদন নিঃসন্দেহে খুব বেশী।

তাছাড়া শহরের প্রায় মধ্য-স্থলে অবস্থিত রাধাবল্লভজীর মন্দিরও জাঁকজমকে পুরোনো গৌরবময় দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাধাবল্লভকে ঘিরে রয়েছে তার প্রসাদভাজন অনেক ছোট ছোট দেবতা। এঁরা হলেন শ্রীগোপীনাথজী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণজী ও শ্রীগোবিন্দজী। এঁদের নিবাস অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে।

রাধাবল্লভজীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কারো কারো মতে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা একদা বাঙ্গলা, বিহার, ওড়িষ্যার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, অথচ অধিকাংশ স্থানীয় অধিবাসীর বিশ্বাস এ মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন সংসার-ত্যাগী সাধু লালাবাবু।

রাধাবল্লভজীর মন্দিরের পাশেই রয়েছে রাধামাধবজীর মন্দির। এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠায় রয়েছে নাকি শরিকী গোলমাল।

শহরের আর এক পাশে রয়েছে রুদ্রদেবের মন্দির। এটা নাকি বৌদ্ধযুগের মূর্তি। জনশ্রুতি, রুদ্রদেবের আশীর্বাদে অম্বলের ব্যথার ও স্ত্রী-ব্যাধির নিরাময় হয়। রুদ্রদেব দারুবিগ্রহ।

বস্তুত ঐতিহ্যে, প্রাচীনত্বে কান্দীর মন্দিরগুলি প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থানের দাবি করতে পারে। কাজেই এই মন্দিরগুলির উপর যদি যথোপযুক্ত আলোকপাত করা হয় তবে বাধিত হব। জ্ঞানান্বেষীদের কাছে এ সম্পর্কে আলোচনা অনেক নূতন তথ্য পরিবেশন করবে স্থির বিশ্বাস।

অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য
কলিকাতা ৫১।

বাজার হইতে চাউল তেল উধাও হইয়া গিয়াছে। অনেকে এই ভাবিয়া অবাক হইয়াছেন যে, ইহা ত আর পকেটে পুরিয়া নেওয়ার মত ছোট একটি বস্তু নয়, প্রকাশ্য রাজপথ ধরিয়া, পুলিসের চোখে ধুলো দিয়া হাজার হাজার মণ চাউল তেল কি করিয়া

পাচার করা সম্ভব হয়! বিশুখুড়ো বলিলেন, —"নেহরুজীর ভস্মাবশেষ গায়ে মেখে আর মুখে নেহরুনীতি অনুসরণের সংকল্প নিয়ে পাচারীরা যে বিভ্রম সৃষ্টি করেছে তাতেই কেল্লা ফতে; ত্রিশূলে দিয়ে যে-চোর সিঁদ কাটে তাকে ধরা সত্যিই শক্ত।"

এই প্রসঙ্গে সরকারী নিশ্চেষ্টতা আর ব্যর্থতার অভিযোগও অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছে।—"ব্যর্থতা সম্পর্কে আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, সরকার নিশ্চেষ্ট কখনো নন, যে-কোন দিন সরকারী বিবৃতি পড়লেই দেখবেন "কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের কড়া নির্দেশ" প্রতিনিয়তই সরকারের মুখে মুখে ঘুরছে"—বলে শ্যামলাল।

চাউল বন্টন প্রসঙ্গে কেন্দ্রের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী নাকি বলিয়াছেন যে, উড়িষ্যা যদি পশ্চিমবঙ্গকে চাউল না দেয় তাহা হইলে কেন্দ্র আর কী করিতে পারে।—"সত্যিই তো, দপ্তর বন্টন যখন হয়ে গেছে তখন চাল বন্টন নিয়ে আর কে মাথা ঘামায়?"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের মত চোরাকারবার এমন ব্যাপকভাবে আর কোথাও চোখে পড়ে না। খুড়ো বলিলেন—"চোখে পড়তে আর কতক্ষণ, হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস্ টুডে ইণ্ডিয়া উইল থিঙ্ক টুমরো!!

সংবাদে জানা গেল কলিকাতায় এক লক্ষ ছেলেমেয়ের প্রাথমিক শিক্ষার স্থান সুযোগ নাই।—"হয়ত নেই, কিন্তু শিক্ষার বিকল্পে 'মৎস্য ধরিব খাইব সুখের' সুযোগই কি আছে?"—প্রশ্ন করে শ্যামলাল।

কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও খনি মন্ত্রী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি হায়দ্রাবাদে সাংবাদিকদের নিকট নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি চাষবাসের জন্য দুই জোড়া বলদ কিনিয়াছিলেন, কিন্তু এমনই অদৃষ্ট যে এমন সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানের জন্য ডাক আসিল।—"দুঃখ করবেন না, দুই জোড়া না হউক এক জোড়া বলদ নিয়ে কাজ কারবার দিল্লিতেও চলবে"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ সেখানে নাকি বিদ্যুৎচালিত 'নকল বিড়াল' দিয়া ইঁদুর তাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।—"টোকিওর কথা জানিনে, আমাদের দেশের ইঁদুরেরা বড়ই সেয়ানা, এখানে নেংটি ইঁদুর পর্যন্ত আসল বেড়ালের

গলায় ঘণ্টা বেঁধে দেয়"—মন্তব্য করেন সহযাত্রী।

দশ কমিশনের রিপোর্টের পর পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকায়রন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং নাকি বলিয়াছেন যে, মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিলেও রাজনীতি তিনি ত্যাগ করিবেন না। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"অর্থাৎ শ্রীকায়রন 'কায়' ত্যাগ করলেও 'রণ' ত্যাগ করবেন না!!"

এক সংবাদে প্রকাশ কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রণালয় এবং বিভাগগুলির সমস্ত ফাইল পাশাপাশি লাইন করিয়া পাতিয়া চলিলে সে লাইন ১৩০ মাইল দীর্ঘ হইবে। —"এই সঙ্গে ঐসব ফাইলে সংযুক্ত লাল ফিতেগুলির বহর কত হবে তার একটা হিসেব দিলে জনসাধারণ উপকৃত হতো"—বলেন বিশুখুড়ো।

দিল্লিতে আসন্ন মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধের উপায় নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল বলিল—"প্রাজ্ঞ জনোচিত সংকল্পই করা হয়েছে, তবে আমরা নিশ্চি উপায়ের সঙ্গে—অপায়ও চিন্তয়েৎ!!"

এক সংবাদে শুনিলাম তিব্বতে নাকি এক মণ চাউল ৪০০্ টাকা দরে বিক্রয় করা হইতেছে।—"কলকাতার চালের কারবারীরা নিশ্চয়ই শ্যামা-সংগীত ধরেছেন, —এমন দিন কি হবে মা তারা"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কলিকাতা স্টেট বাসের ভাড়া বৃদ্ধির কথা নাকি চিন্তা করা হইতেছে।—"কিন্তু, আর কিন্তু-কিন্তু কেন, এটা বোঝার ওপর শাকের আঁটি বৈ তো নয়, মোরা কি ডরাই সখি......" বলেন অন্য সহযাত্রী।

আমাদের জনৈক সহযাত্রী একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে, জামাই ষষ্ঠীর দিন একটি দম্পতিকে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয় এবং মোবাইল কোর্টের বিচারে জরিমানা, অনাদায়ে জেলের দণ্ড দেওয়া হয়। দম্পতি জরিমানা না দিয়া জেলেই গিয়াছেন।—"ষষ্ঠীর দিনে জেলখানায় অন্ন হয়ত খাওয়ানো হয়নি কিন্তু বহুকাল আগে সাধারণের মধ্যে জেলখানাটাও শ্বশুর-মন্দির বলে পরিচিত ছিল, সেদিক থেকে বাবাজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হননি!

কলিকাতায় সম্প্রতি একটি আম্র প্রদর্শনী হইয়া গেল।—"যদ্দূর মনে পড়ে, প্রদর্শনীটি জামাই ষষ্ঠীর আগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। জামাতাজীবনদের

গোপালভাঁড় কথিত 'দৃষ্টি-আম' খাওয়ানার জন্যেই আম্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিনা তা ঠিক বোঝা গেল না"—বলে আমাদের মুত-শ্বশ্রু শ্যামলাল।

অরুণবরণ আম

The choicest fruit of Hindusthan
For garden's pride the mango is
sought;
Ere ripe, other fruits to cut we
bow
But mango serves us, ripe or not.
Amir Khusro—

প্রদর্শনীর শহর কলকাতায় গত শনি-রবি দুদিনব্যাপী রকমারি আমের প্রদর্শনী হয়ে গেল আলিপুরের বাগানে। আম ছাড়া আনারস, জামরুল, লিচু প্রভৃতি গ্রীষ্মের ফলও ছিলো কিছু-কিঞ্চিৎ, শাক-সব্জি ছিলো, গরমের ফুল লতাপাতাও প্রদর্শিত হয়েছিলো এক অংশে। কিন্তু ৩৫০ রকমের আমের সমারোহের কাছে এইসব অন্যেতর প্রসঙ্গ ব্যর্থ হয়ে যেতে দেখলাম। গুণানুসারে আমের বিচারে 'বিমলি' নাম্নী আম এক প্রথমা হলো—বাকি আম কোহিনুর, বেগথাস, বোম্বাই, রানীপসন্দ, কিষণভোগ এবং নানা জাতীয় ল্যাংড়া পড়ে রইলো ব্যর্থ টেবিলে। সকাল থেকে সন্ধ্যা আলিপুরের বাগান জমজমাট—গেটের কাছে সারবন্দী গাড়ি, ফুটপাতের ওপর বিক্রি হচ্ছে ম্যাগনোলিয়া আইসক্রীম আর কোকাকোলার বোতল অনবরত, ভিতরে শিশুদের কলধ্বনি। প্রদর্শনী দেখা তো আছেই, তারপরে বাগানের ভিতরে ঢুকে যাওয়া আরো সুখকর। এই সুযোগে চারিদিক ঘুরে-ঘুরে অনামা ফুল দেখা, অর্জুন গাছের ফাঁপা পেটে গিয়ে তালি বাজানো, বিস্ময়কর পাগলা গাছ খুঁটিয়ে দেখা—যার কোনো দুটো পাতার আকারে মিল নেই—এইসব। শহরের সংসারিকতা থেকে মুক্তি তো হয়ই, বলতে নেই না, আজ যদি মিলেছে তবে রকমারি আম দেখে বাউরের ছায়ায় মাটিতে ঘাসের উপর ছড়িয়ে বসে খাগড়া বাজারের গল্প বলা হোক, বাল্যের অপরাধ সেই দুপুরে আমের আচার-চুরি, কিংবা গ্রামদেশে কুড়িয়ে রাত্তিরে আম কুড়োতে-কুড়োতে ভূত দেখা—এইসব আষাঢ়ে গালগল্পে ভরে থাক পাশবালিশ আজ। কলকাতার লোক আজ আলিপুরের বাগানে এসে স্মৃতি, সন্ধ্যাদীপ আর গ্র্যান্ড-মা কালচারের কথায় বাচাল হয়ে উঠুক। সন্ধ্যা হয়নি তখনো। সারাদিন এক ধরনের গুমোট ছিলো, রোদের তাপ প্রখর ছিলো না—বেশ মেঘলা ভাব একটা আকাশে ছিলো ছড়িয়ে—আষাঢ়ের অসহ্য জলভারের ছবি যেন অতিদূর থেকেও দেখা যাচ্ছিলো সেদিন। কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে কয়েকটি যুবা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলো—তেমন আলো কোথায়, কোথায় বা তেমন জলন্ত সৌন্দর্য বোগেন-ভিলিয়ার ঝোপে?—কাঁধের ক্যামেরা তাই কাঁধেই থেকে গেলো।

সন্ধ্যার ঠিক মুখে আমরা আর একবার এসে দাঁড়ালাম প্রদর্শনী ঘরে। দেশী-বিদেশী পুরুষ মহিলা সকলেই ঝুঁকে পড়ে আমের বাহার পরখ করছেন। উচ্চৈঃস্বরে শুরু করছেন : আমরা সেবার মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলুম—ইস্টিশানে গিয়ে দ্যাখো না মাজদারে আম বস্তা বস্তা পড়ে রয়েছে—এবছর বাম্পার, আগামী বারে লীন ফলন হবে দেখে নিও—হাউ গ্রেসাস্—আঁটির কিন্তু এমনটা হয় না—বেনারসের, ল্যাংড়া খেয়েছো কখনো?—আচ্ছা, ভুতো বোম্বাই আসে নি? কাঁচা মিঠা আবার পাকে নাকি?—এইসব আত্মসন্ধান।

মাথার উপর পাখা আর নিয়ন লাইটের আলো। গাইডরা অনবরত বক্তৃতা করে চলেছেন। একদল কিশোর-কিশোরী হাতে এক টুকরো পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় ভেসে বেড়াচ্ছে। আমের গায়ের নাম ওরা কাগজে উঠিয়ে নিচ্ছে। আধুনিকার দল আমচুর, স্কোয়াস, আমজেলি, আমের আচারের শিশি বোতলের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। এই আমের প্রদর্শনীর সঙ্গে যে দুটি জিনিস ওতপ্রোত আমরা চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তাই—প্রদর্শনীর একাংশে এক বৃদ্ধা দিদিমা আর অন্য

অংশে আম আঁটির ভেঁপু থাকলে যেন অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতো!

আমের সাধারণ গল্প শুরু করার আগে একটি তালিকা তুলে দিলাম নিচে। আমের বিবিধ নামকরণের সাথে যে অলিখিত গল্প কাহিনী ছিলো—তার অধিকাংশই আজ বিস্মৃতির গহ্বরে গেছে, শুধু নামটি জড়িয়ে গেছে নানান আমের গায়ে।

স্থানের নামে আমের নাম : কলকাতা আমিন, বম্বে গ্রীন, মালদা বা চুনাখালি, বেঙ্গালী গোল্লা সিংগাপুরী প্রভৃতি।

রাজা বা ব্যক্তির নামে নাম : হুমায়ুনপসন্দ জাহাঙ্গীর, নিসারপসন্দ, আমিন মিঃ ফোর্ড, রহমৎখাস, ডেভীর ফেভারিট ইত্যাদি।

রোমান্টিক আইডিয়া নিয়ে নাম : দিলপসন্দ, হুসনারা, পরী, কিষণভোগ প্রভৃতি।

পদবী ও কৌলীন্য-নির্ভর নাম : ভাইসরয়, কালেক্টর, সেসনপসন্দ, মহারাজপসন্দ, ডাক্তারপসন্দ প্রভৃতি।

আকার অনুসারে নাম : হাতীঝুল, পাঁচসেরী, ওমলেট, লাড্ডু, চ্যাপ্টা; গোল্লা; বোতল, কিডনি, গিলাস ইত্যাদি।

রঙ অনুযায়ী নাম : ফজেরী, জাফরানী, কালাপাহাড়, স্বর্ণরেখা প্রভৃতি।

আস্বাদ অনুসারে নাম : সরবতী, মালাই, মিছরি, দুধিয়ামংলা, কাঁচামিঠা।

গন্ধ অনুযায়ী নাম : আনারস, গুলাবখাস, গুলাবজাম, লেমন, লা রোজ ইত্যাদি।

দুর্মূল্য রত্নপাথর অনুসারে নাম : সোনাতাল, ডায়মণ্ড, নীলম প্রভৃতি।

ফলন হিসাবে নাম : বারমাসী, সদাবাহার, দোফসলা ইত্যাদি।

মাস-ফসল কেন্দ্র করে নাম : বৈশাখিয়া, শ্রাবণী, ভাদুরিয়া, কার্তিকী প্রভৃতি।

উপরোক্ত তালিকা যেন সিন্ধুতে বিন্দু! এক ল্যাংড়া আমেরই যে কতো নাম আছে তা বলে শেষ করা যাবে না। আমি যে কটি জানি তার কয়েকটি এখানে লিখে দিচ্ছি। ল্যাংড়া জাতীয় আমের মধ্যে ল্যাংড়া দীঘা, ল্যাংড়া বেনারসী, ল্যাংড়া হাজিপুর, ল্যাংড়া পাটনা, ল্যাংড়া মীরাট, ল্যাংড়া ফকিরওয়ালা এবং ল্যাংড়া ডেভিড ফোর্ডই সর্বাধিক বিখ্যাত। এই ল্যাংড়া আমের বিষয়ে একটি মজার গল্প আছে। মজফরপুর জেলায় হাজিপুরে বলে এক গাঁয়ে এক ফকির ছিলো। সে দিনরাত এক গাছের তলে বসে থাকতো। ফকিরটি দুর্ভাগ্যক্রমে ছিলো খোঁড়া বা ল্যাংড়া এবং ঐ গাছটি ছিলো আমেরই গাছ। সুতরাং কিসে থেকে কি হলো—ফকির গিয়ে গাছে ঝুললো!

আম নিয়ে কথা চলতে গেলেই এক কাহন কথা হবে। তবু যে-সংবাদগুলো না দিলে নয়, সেগুলিই শুধু আমি দেবার চেষ্টা করছি।

ভারতবর্ষের মতো এত সুস্বাদু এবং ভালো জাতের আম পৃথিবীর কোথাও হয় না। তবু অল্পাবিস্তর আম সেন্ট্রাল আমেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রাজিল, ইন্দোচীন, মেক্সিকো, সিংহল, বার্মা; মিশর; ম্যাডাগাস্কার, হাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চলের স্থানে স্থানে উৎপন্ন হয়। ফ্লোরিডা আর কুইন্সল্যান্ড থেকে আম ইংলন্ডে রপ্তানি হয়। ফিলিপাইন থেকে জাপান, সিঙ্গাপুরে, আর জাভায় প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। সমগ্র ইউরোপে প্রকৃতপক্ষে আম হিসাবে ফিলিপাইন আর ফ্লোরিডার আমেরই চলন আছে। সর্বপ্রথম ১৮৯৬ সালে বম্বে থেকে জাহাজে ইংলন্ডের জনৈক জর্জ বাডউড কোম্পানীর মাধ্যমে আম রপ্তানি করা হয়। এত দূরের পথ যেতে অন্যান্য আমের চেয়ে 'আলফনসো' নামের আম উপযুক্ত বিবেচিত হয়। এর পরে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত বহুবারই য়ুরোপে আম-রপ্তানির চেষ্টা চলে—জানি না রপ্তানি-দ্রব্য হিসেবে বর্তমানে এই আমের উপযুক্ততা কতো এবং তা রপ্তানি হয় কিনা আদৌ, তবে আম যে অন্যতম টুরিস্ট-ইনটারেস্ট তার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বে বহুবার পেয়েছি। ডাক্তার ফেয়ারা চাইল্ড যাই বলুন না কেন আম মোটেই 'a ball of tow soaking in terpentine and molasses and you have to eat it in the bath-tub' নয়; বরং আমের কাছে apples of the Hesperides are but fables to them, for taste, the Nectarine, Peach & Appricot fall short.'

এই আমকে কেন্দ্র করে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান সমাজে বহু মাঙ্গলিকী, বহু আনুষ্ঠানিকতার সৃষ্টি হয়েছে। আম্রপল্লব থেকে শুরু হয়ে আম্রপঞ্চমা রাগিনীতে হয়েছে শেষ। আম্রপালী, আম্রধারিকা, আম্রকূট, আম্রস্বকেশ্বর—কেবলমাত্র কয়েকটি শব্দই নয়—এই কয়টি শব্দের মাধ্যমে আমের ইতিবৃত্তের আদি প্রকাশ সন্ধানীর কাছে উন্মুক্ত হতে পারে। পুরাণাদি ছাড়া, ইতিহাসে সম্ভবত আলেকজান্ডারই প্রথম যিনি সিন্ধু উপত্যকায় আমের বাগান লক্ষ করেছিলেন (৩২৭ খৃঃ পূঃ)। পরবর্তীকালে হিউয়েন শাঙ ও ইবন হাঙ্কল এই আমকে যথাক্রমে আন-মো-লো এবং আম-বাগ নামে বর্ণনা করেছেন। ইবন বতুতা আম সম্পর্কে বলেছেন, এই ফল কমলার মতো দেখতে। পরিব্রাজক নিকলো কন্টি এবং দা ভার্তেমার বিবরণে আম সম্পর্কে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করা আছে। সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে আম রাজানুগ্রহ লাভ করে।

বাবর ছিলেন আমের ভক্ত। আকবর তো নিজেই দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে বিখ্যাত লাখবাগ নামে একটি আমের বাগান প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে শোনা যায় এক লক্ষ আমের গাছ ছিল। আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরিতে জনৈক হাসানের বিখ্যাত এক আমেরবাগানের কথা লেখা আছে। আবুল ফজল তাঁর গ্রন্থে নানা জাতীয় আম সম্পর্কে এক বিশদ ফিরিস্তি দিয়েছেন সে যুগেই। সেকালে দিল্লিতে 'কৈর্ণা' নামে আমের খুবেই প্রসিদ্ধি ছিল। লাখবাগে 'কৈর্ণা' ভ্যারাইটির আম জন্মাত প্রচুর পরিমাণে। চার্লস মারিজ এই লাখবাগ পত্তনির ৩০০ বছর বাদে ভারতবর্ষে আসেন, তিনি তাঁর গ্রন্থে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ এই আমের বাগানের প্রশংসা করে গেছেন। এখনও দ্বারভাঙ্গার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লাখবাগের অস্তিত্ব আছে কিনা জানি না, হয়তো সেই লাখবাগ নেই, আর নেই সেই রাজানুকূল্য—ফলের রাজা আম ভারতবর্ষের টুকরো টুকরো লাখবাগ থেকে নিজের মহিমা প্রচার করছে—আজ জনসাধারণই তার যথার্থ মোগল বাদশাহ!

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

ভারতকোষ

খবরের কাগজে মাঝে মাঝে এক আধটি বেশ মজার খবর পড়া যায়। অনেক সময় সেগুলোকে একালের হিতোপদেশের গল্প বলেও মনে করা যেতে পারে। কিছুদিন আগে একটা খবরে দেখেছিলাম, এক বুড়ো ভদ্রলোক এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষের পাল্লায় পড়ে তাঁর যথাসর্বস্ব পুঁজি খুইয়ে ছিলেন। অবশ্য বোকামি বা দুর্মতি যাই বলি না কেন, সেটা ঘটেছিল বুড়ো ভদ্রলোকেরই প্রথমে; তিনি দশ টাকার নোট ভোজবাজিতে একশো টাকার নোট করে পেতে চেয়েছিলেন। অলৌকিক ব্যক্তিটি আশ্বাস দিয়েছিল, তার এমন কিছু ভোজবাজির কায়দাকানুন জানা আছে যাতে সে দশ টাকার নোটকে অনায়াসেই একশো টাকার নোট করে দিতে পারে। ভদ্রলোক সেই বিশ্বাসে বা বলা যাক লোভে পড়ে তাঁর যাবতীয় পুঁজিকে দশগুণ বাড়াতে চাইলেন। তাঁরই বাড়িতে, একটি আলাদা ঘরে, মাটির হাঁড়ি চাপা দিয়ে দশ টাকার নোটকে একশো টাকার নোট করার প্রক্রিয়া চলছিল। অতঃপর অলৌকিক পুরুষটি যাবার আগে বলে গেল, কাল হাঁড়ির মুখ ওল্টালেই যথারীতি একশো টাকার নোট পাওয়া যাবে। অনুমান করি, ভদ্রলোক সারা রাত নিশ্চয় অধৈর্য এবং উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পরের দিন তিনি যা পেয়েছিলেন তাকে সোজা কথায় বলে 'ছাই'। বাস্তবিকই কিছু ভস্ম জুটেছিল তাঁর কপালে।

এই খবরের সঙ্গে অবশ্য আমাদের আজকের আলোচনার খুব একটা সম্পর্ক নেই, তবু কেন যেন গল্পটা মনে পড়ল। হয়ত হিতোপদেশেরই কোনো আকর্ষণবশে।

মাত্র কদিন আগে সংবাদপত্রে জনৈক পাঠকের একটি চিঠি দেখেছিলাম। ভদ্রলোক ১৯৬৩-র আগস্ট মাসে 'ভারতকোষ'-এর গ্রাহক হবার জন্যে অগ্রিম চল্লিশটি টাকা পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ১৯৬৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত তিনি কোনো বই পান নি, এমন কি সাহিত্য পরিষদে চিঠি লিখেও জানতে পারেন নি, কবে নাগাদ 'ভারত কোষ' প্রকাশিত হবে।

খুবই মজার কথা, ভদ্রলোক যদিও অগ্রিম টাকা দিয়ে 'ভারত-কোষ'-এর গ্রাহক, তা সত্ত্বেও বিষয়টি সম্পর্কে কিছু জানতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর চিঠি ছাপা হওয়ার পর পরই আর-এক সংবাদপত্রে 'ভারত কোষ'-এর বিষয়ে অনেক জ্ঞাতব্য প্রকাশ করা হল। আমরা এই মর্মে অবগত হলাম যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, অতীব নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে কাজ করে বাংলা ভাষায় আধুনিক বিশ্বকোষটি প্রায় তৈরী করে ফেলেছেন এবং চার খণ্ডে সমাপ্য এই 'ভারতকোষ'-এর প্রথম খণ্ডটি যদিও গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত হবার কথা ছিল কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয় নি, আগামী সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবে। সাহিত্য পরিষদ যাঁদের হাতে 'ভারতকোষ'-এর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাঁরা যে কী পরিমাণ সতর্ক ও সাবধানী হয়ে সুসম্পাদনার দ্বারা 'ভারতকোষ' প্রকাশ করছেন তার বিষয়েও কিছু বলা হয়েছে কাগজে। খুবই সুখের কথা বলতে হবে।

১৯শে জুনের আনন্দবাজার পত্রিকাতেও 'ভারতকোষ' সম্পর্কে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই খবর থেকেও জানা যাচ্ছে, আগামী সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ 'ভারত কোষের' প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা আছে। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা হবে প্রায় সাত শো, এতে 'অ' থেকে "ঔ" পর্যন্ত স্বরবর্ণের আদ্যক্ষরযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের সংক্ষিপ্ত তথ্য থাকবে। প্রথম খণ্ডের ৪৫৬ পাতা ইতিমধ্যে ছাপা শেষ হয়েছে, বাকি আছে প্রায় ৩০০ পাতা। এখানে বলা প্রয়োজন, 'ভারতকোষ'-এর চার খণ্ডের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা হবে প্রায় ৩২০০। অর্থাৎ প্রতি খণ্ড মোটামুটি ৮০০ পাতা।

আপাতত দেখা যাচ্ছে 'ভারতকোষ' ছাপা হচ্ছে প্রায় ৮ হাজার। এর মধ্যে চার হাজার বিক্রি হয়েছে প্রাক-প্রকাশন গ্রাহকদের কাছে, অর্থাৎ এঁরা পুরো সেটের মূল্য বাবদ অগ্রিম ৪০ টাকা আগে-ভাগে দিয়ে দিয়েছেন, বাকি ৪ হাজার 'ভারতকোষ' ৮০ টাকা মূল্যে জনসাধারণ কিনতে পাবেন। খুবই সৌভাগ্য আমাদের।

কাগজের হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এই কোষগ্রন্থ প্রকাশের জন্যে আড়াই লক্ষ টাকা মতন সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হয়েছে। ইতিমধ্যে লক্ষাধিক টাকা, সরকারী টাকা, সাহিত্য পরিষদ আলোচ্য কোষ গ্রন্থের জন্যে পেয়েছেন (শোনা যায় এযাবৎ দেড় লক্ষ টাকা তাঁরা পেয়েছেন)। এই টাকার সঙ্গে প্রাক-প্রকাশন গ্রাহকদের দেয় টাকা ধরলে দেখা যাবে তাঁদের আরও ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাবার কথা। অর্থাৎ এযাবৎ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা 'ভারত কোষ'-এর জন্যে পাওয়া গেছে।

'ভারতকোষ' প্রকাশের পাতার হিসেব, টাকার হিসেব এবং অন্যান্য কিছু বিষয় সরল দৃষ্টিতে দেখার পরও আমাদের কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। প্রথম প্রশ্ন, 'ভারতকোষ'-এর কাজে হাত দেওয়া হয়েছিল কবে? কত বছর আগে? যতদূর মনে হয় পাঁচ ছ' বছর, অবশ্য সঠিক জানি না। 'ভারতকোষ'-এর দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা এতদিন ধরে কি করেছেন তাও জানি না। জানার উপায়ও নেই। কেননা, সাধারণত এক্ষেত্রে যেভাবে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সাহায্য নেওয়া হয়, নিলে প্রচার সম্ভব হয়,—'ভারতকোষ'-এর কর্ণধাররা তা নেন নি। আমরা 'ভারতকোষ' সম্পর্কে উড়ো এবং ভাসা ভাসা একটি দুটি খবর ছাড়া কিছু জানতে পারি নি। খবরের কাগজে কদাচিৎ এ সম্পর্কে কিছু লেখালেখি হয়েছে, এবং যেটুকু হয়েছে তাতেও স্বস্তি বোধ করার কারণ থাকে না। 'ভারতকোষ' সম্পর্কে আমাদের কারও কিছু জিজ্ঞাসা থাকবে না কর্তারা একথা মনে করে নিলেন কেন? এমন নয় এটা ব্যক্তিগত গ্রন্থ প্রকাশ। এর সঙ্গে সরকারী টাকার সাহায্যের প্রশ্ন ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলি প্রশ্ন জড়িত থাকতে পারে বলে আমরা মনে করি। সরকারী ও গ্রাহকদের কাছ থেকে ইতিমধ্যে সংগৃহীত ৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে যে কাজটুকু হয়েছে, তার বিষয়ে জানার অধিকার কি জনসাধারণের নেই? কাদের দ্বারা কি ভাবে, কি কি নিয়মে কাজ চলছে—এসব প্রশ্ন অবশ্য নীতিগত; 'ভারতকোষ'-এর কর্ণধাররা ইচ্ছা করলেই সংবাদপত্র মারফৎ আমাদের এ বিষয়ে কিছুটা অবহিত করতে পারতেন। আমরা এ-যাবৎ যা জেনেছি সবই রিপোর্টারদের কল্যাণে। কেন, সরকারী ভাবে কি ওঁদের কেউ কোনো বিবৃতি দিতে পারেন না? তাঁরা তা করেন নি, এবং জনসাধারণের দৃষ্টির ও জ্ঞানের আড়ালেই যা ঘটবার ঘটে যাচ্ছে।

খুবই অদ্ভুত লাগে শুনতে, ভারতের অন্য অন্য অনেক ভাষায় যেমন—তামিল, তেলেগু, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী হিন্দী ভাষায়—(কোনো কোনোটির হয় পুরোপুরি না হয় খণ্ড বা অংশ হিসেবে) 'ভারতকোষ' জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আমরা অবশ্য জানি না, এগুলির পরিকল্পনা কি ধরনের, কোষগুলি ভাল বা মন্দ হয়েছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে, উক্ত ভাষাগুলি সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করতে আমাদের মতন বিলম্ব করেন নি। আমরা, বাঙালীরা, ভাষার গর্বে আত্মহারা অথচ বাংলা ভাষায় একটি কোষগ্রন্থ প্রকাশ করতে অক্ষম, যদি বা নিতান্ত অক্ষম না হই তবে অলস ও অকর্মণ্য ছাড়া আর কি!

বাংলা ভাষায় 'ভারতকোষ' দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় মাত্র প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হচ্ছে,

যাচ্ছে যখন তখন মনে হয় এই গ্রন্থ একটা আকরকোষ হবে। তা ছাড়া সুসম্পাদনার ও পরিশ্রমের কথা আগেই যখন পাওয়া হয়েছে তখন ধরে নিতে হবে এরকম সুসম্পাদিত ভারতকোষ আর ভূ-ভারতে হয় নি। খুবই সুখের কথা, আশার কথা।

আমাদের একমাত্র বক্তব্য অবশেষে এই যে, অনেক ধৈর্যের পর যদি গল্পের দুধের মতন উল্টে-রাখা হাঁড়ি তুলে দেখি সবই 'ছাই' তবেই যা আক্ষেপ থাকবে।

ইংরেজী শব্দে বাংলা উচ্চারণ

বিদগ্ধ মহাশয়েষু,

'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১ শ্রীমতী মীরা বসুর "ইংরেজী শব্দের বাংলা উচ্চারণ" শীর্ষক চিঠিখানা পড়লাম। বছর পঁচিশেক আগে "শনিবারের চিঠি" "সংবাদ সাহিত্যে" এই প্রশ্নটা তাঁদের তৎকালীন স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় উপস্থাপন করে-ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পে 'ফেইল' (fail) কথাটি পেয়ে তাঁরা বিস্ময়প্রকাশ করেছিলেন; বলেছিলেন, "পূর্ববংগীয় ট্রান্স-লিটারেশন"; এবং সর্বশেষে "ইচ্ছা আছে একদিন ট্রেইনে করিয়া, অর্থাৎ ট্রেইনে চাপিয়া, শান্তিনিকেতন যাইয়া শূন্য চেইয়ারের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রবীন্দ্রনাথের ফোটো ফোটো ...... একবার দেখিয়া আসিব।" তিরিশ দশক ও চল্লিশের গোড়ার দিকে ঐ ধরনের ইংরেজী শব্দ (পাশাপাশি ai আছে যাতে) বাংলায় একটি ইকার যোগ করে লেখার রেওয়াজ খুব বেড়ে গিয়ে-ছিলো। এবং ঐ 'ই' যোগ করবার প্রবণতা থেকে "মেইক আপ"ও এসেছিলো, যেমন আজকে কেউ কেউ কেইক, রেইট ইত্যাদি ইত্যাদি লিখছেন। মাঝখানে এ-অভ্যেসটি কমে যায়—সম্প্রতি আবার বেড়েছে। "দেশ"-এর ঐ সংখ্যায় ঠিক আগের পাতায় সর্বাধিনায়ক সেনের একটি 'কাঠের উপর পেইন্টিং' মুদ্রিত হয়েছে।

কিন্তু এ-প্রসঙ্গে আমার একটু বক্তব্য আছে। অকসফোর্ড ডিকশনারি খুললেই দেখা যাবে, এটা তো সত্যি যে বাংলায় এ-কার দিয়ে ai-র উচ্চারণটা ঠিক বোঝানো যায় না। বোঝানো যায় না বলেই আমাদের ইংরেজী উচ্চারণে এতো বিকৃতি এসেছে। PAIN বাংলায় লিখতে হবে পেন, আবার PENও পেন। ফলে এদুটোর উচ্চারণই হয়ে যাবে এক, অথচ কে না জানে ও দুটোর উচ্চারণে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এ-রকম বহু শব্দ আছে ইংরেজীতে বাংলায় যার সঠিক উচ্চারণ প্রকাশ করা সম্ভবই নয়। আর, কেবল কি স্বরবর্ণের উচ্চারণ? ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণও কি কম কঠিন? V, W, th ইত্যাদি কী দিয়ে লিখবো? কিংবা কেউ লিখুক দেখি বাংলায় FAITH শব্দটি? বা ELIZABETH?

অথচ ইংরেজী শব্দ বাদ দিলেও চলবে না, এবং তা বাংলাতেই লিখতে হবে। তাই এ-রকম শব্দগুলির ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেখানে প্রায় সম-উচ্চারণের দুটি শব্দ আছে: TAIL-TELL, PAIN-PEN, FAIL-FELL ইত্যাদি সেখানে প্রথমোক্ত শব্দ-গুলিতে একটি ইকার যোগ করলে উচ্চারণের পার্থক্য দেখানোর সুবিধে হয় বলেই আমার ধারণা। তবে এ-জাতীয় শব্দ যেখানে একটি, যথা, FAITH, RAIL ইত্যাদি সেখানে ফেথ বা রেল লেখাই যুক্তিযুক্ত। কেইক বা রেইট লেখা তো অমার্জনীয় অপরাধ।

প্রণব মজুমদার, কলকাতা।

কাছে বিশেষ কোন বিশ্বাসের বস্তু নয়। ভ্রমরকে সে ভালবাসে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রেম এবং ঈশ্বরে কোন তফাত নেই।

মধ্য ভারতের এক শহরে ভ্রমরের বাবা অধ্যাপক। পারিবারিক বন্ধুত্বের সূত্রে অমল তাদের বাড়ি অতিথি। একটি সযত্নরচিত মনোরম পরিবেশে লেখক ভ্রমর এবং অমলের অন্তরাত্মার কাহিনী গড়ে তুলেছেন। ভ্রমর অসুস্থ, বিমাতার অনুচ্চারিত শাসনে পরিবেষ্টিত। তার চারদিকে নিঃসঙ্গতার দেয়াল। তার একমাত্র অন্তরঙ্গ সঙ্গী বাইবেল। অমল সেই একাকিত্বের দেয়াল-ঘেরা বাইবেলের জগতে কখন গিয়ে ভ্রমরের সঙ্গী হয়ে বসেছে। কাহিনীর এই অধ্যায়ে (এইটিই প্রধান অধ্যায়) লেখক এক অনন্যসাধারণ রচনা-কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। খণ্ড দৃশ্য, টুকরো প্রতীক সব মিলিয়ে একটি কাব্যধর্মী পরিবেশে কাহিনী প্রবাহিত।

ভ্রমরের মনে সারাক্ষণ একটি বেদনা অনুরণিত: "যীশু নিজের জন্যে কিছু চাননি, সকলকে তিনি ভালবেসেছিলেন। তবু কত কষ্ট দিয়ে মানুষ তাঁকে মেরেছিল। ...আমরা বড় নিষ্ঠুর। ভালবাসা জানি না।"

দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা করাতে নাগপুরে যাবার আগেও ভ্রমর অমলকে লাজারের গল্প শোনাচ্ছে। ভ্রমরের অসুখে শঙ্কিত অমলের কাছে বাইবেলের লাজারের গল্প কোন সান্ত্বনার, কোন আশ্বাসের বাণী বহন করে আনে না। তাই অমলের কাছে 'এ-সব গল্প'। কিন্তু ভ্রমরের কাছে প্রত্যয়ের অঙ্গ।

ভ্রমর বিশ্বাস করে, "ভগবানকে যে বিশ্বাস করে, সে মরে না; ভগবান তাঁকে বাচান।" অমল দুঃখকে ভালবাসে না। কিন্তু বাইবেলে ভ্রমরের বিশ্বাস তাকে শিখিয়েছে, "দুঃখই একদিন আনন্দ হয়ে দেখা দেবে। যীশু বলেছিলেন, এখন দুঃখ সও, কিন্তু আমি আবার এসে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব, তখন সুখী হবে।" একটি তরুণীর ধর্মবিশ্বাস কখন প্রেমের প্রত্যয়ে একাকার হয়ে গেছে।

এ-কাহিনীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় রচনার মেজাজ। প্রথমেই: "অন্ধকার আকাশের তলায় দেখতে দেখতে একটি আলোর ময়ূর ফুটে উঠল। অবিকল সেই রকম কণ্ঠ, সেই পুচ্ছ। আলোর ফুলকি-গুলো যেন হাসছিল"...ইত্যাদি। ভাষার এই কাব্যধর্মী স্নিগ্ধতা কাহিনীকে একটি দুর্লভ সৌষ্ঠবে সজ্জিত করেছে। কাহিনী শেষ করে একটি গীতিকাব্য পাঠের আনন্দ অনুভব করবে পাঠককে। এমন একটি কাব্যধর্মী প্রেমের কাহিনী অনেক দিন পড়ি নি ও সম্ভবত বাঙলা সাহিত্যে খুব কমই লেখা হয়েছে। ১৩৯।৬৪

কাব্যোপন্যাস

স্বকালপুরুষ। আনন্দ বাগচী। ধ্রুপদী প্রকাশন কাজঃ-১৯। দাম পাঁচ টাকা॥

তরুণ কবি আনন্দ বাগচীর সাম্প্রতিক গ্রন্থ স্বকালপুরুষ—কাব্যোপন্যাসে—কবির তথাকথিত কবিত্ব স্পষ্ট উচ্চারিত, এবং গতানুগতিক স্বতঃস্ফূর্ত নিরবচ্ছিন্ন পাঠের পক্ষে ক্লান্তিকর বলেই বর্তমান গ্রন্থে কাব্যপাঠের বিমল আনন্দ যেমন উহ্য, নতুন আঙ্গিকে উপন্যাস পাঠের তৃপ্তিও তেমনি অনুপস্থিত। আসলে গ্রন্থটি নিতান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই সীমাবদ্ধ। আঙ্গিকগত নতুনত্ব ছাড়া কী বিষয় নির্বাচনে অথবা চরিত্রোদ্ঘাটনে অথবা পরি-ণতিতে এমন কোন দৃপ্ত তথা বলিষ্ঠতা দেখাতে পারেন নি যার জন্যে সপ্রশংস উচ্চারণ সম্ভব। বরং বলা যায়, গদ্যের মনোহারী বাকবন্ধের মোড়কে একদল নষ্ট-চরিত্র যুবক-যুবতীকে চিত্রিত করেছেন, যা গদ্যে ইদানীংকালে বহুবার বহুভাবে আসর জমিয়েছে। এই চরিত্রসমূহের জন্যে কাব্যের মশাল জ্বালার প্রয়োজন ছিল না, ওতে কবিতার অব্যয় এবং অব্যর্থতা প্রমাণ হয় নি। কবিতার ক্ষেত্র ভিন্ন, এবং সেখানে তার স্থায়িত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নে সাম্প্রতিক ভয় নিরর্থক, যেহেতু যথার্থ কবিতা এখনো স্বক্ষেত্রে সম্রাট। যা কবিতা নয়, তার প্রতি পাঠকের আকর্ষণ স্বল্প; সহৃদয় পাঠক পাওয়া—সে সত্যই দুরূহ। অর্থাৎ কবিতার কোন বিকল্প নেই, পাঠক মন হরণের জন্য ভেকবদলও পণ্ডশ্রম। তার চেয়ে যথার্থ কবিতা গড়ে তোলার জন্য নয়, হয়ে ওঠার
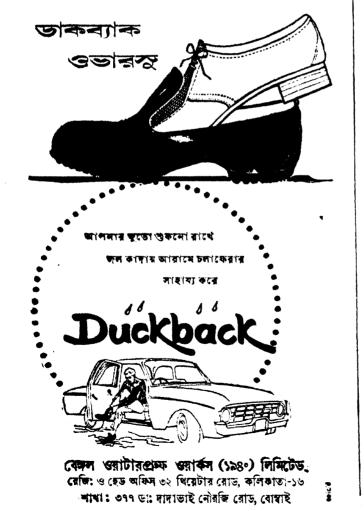
জন্যে সময়ের ও শ্রমের ধৈর্য প্রয়োজন—কবিরা সেকথা যখন ভুলে যান তখনই সংকটের শুরু, অনর্থে অর্থারোপের হুড়োহুড়ি পড়ে, অকবিরা কবি সেজে আসর মাত করেন

৫৪৬।৬৩

অনুবাদ

নীল চন্দ্রমল্লিকা—কারেল চাপেক। অনুবাদ—মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়। রূপা এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-১২। দাম : চার টাকা।

মধ্য ইয়োরোপের ছোট্টো একটি দেশ চেকোস্লোভাকিয়া। প্রতিবেশী বৃহৎ সব দেশের চাপে এই পাহাড়-ঘেরা ছোট্টো দেশটির রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বারেবারেই বিঘ্নিত হয়েছে। তথাপি, অথবা, হয়তো তার-জন্যেই, এ-জাতির স্বাতন্ত্র্যবোধ খুব প্রবল। এবং সেই স্বাতন্ত্র্যবোধের ফলেই এ-জাতির মধ্যে এসেছে এক অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা যা তার কাব্যসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। চেক সাহিত্য তাই, ফরাসী, জর্মন, রুশীয় সাহিত্যের মতো অতো উন্নত বিশাল, বৈচিত্র্যময় না হলেও বিশিষ্ট। চেক গদ্যরচনা ও চেক কথা-সাহিত্য ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সম্পদ। চেক জাতির সংস্কৃতি সমন্বয়ের সংস্কৃতি; চেক সাহিত্যেও সেই সমন্বয়ের সুস্পষ্ট চিহ্ন লক্ষ করা যায়। দুই ভিন্নমুখী সাহিত্য—ফরাসী ও রুশের প্রভাব এ-সাহিত্যে অনেকখানি।

কারেল চাপেক (KAREL CAPEK) চেক সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নাম। গল্প-লেখক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও ভ্রমণ-কাহিনীর লেখক হিসেবে চাপেকের খ্যাতি বিশ্ববিশ্রুত। এ শতকের বিশ ও ত্রিরিশ-দশকে সাহিত্যসৃষ্টি করে তিনি যে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন আজ পর্যন্ত তা অম্লান। তাঁর রচিত গল্প থেকে বাছাই করে চৌদ্দটি গল্পের অনুবাদ এ পুস্তকে পরিবেশিত হয়েছে।

কী সুন্দর চাপেকের গল্পগুলি! হঠাৎ রেক-কষা সাসপেন্স বা স্টীয়রিং ঘোরানো সারপ্রাইজ নেই এসব গল্পে। আছে সাধারণ মানুষ, অতি-সাধারণ ঘটনা নিয়ে সরস, সূক্ষ্ম কৌতুকাবহ, স্নিগ্ধ, মনোরম, নিটোল এক একটি গল্প যা লেখককে মনে পড়ায়, মনে পড়ায় রবীন্দ্রনাথকে। কোনো একটি গল্পেও জ্যামিতিক প্রেম অথবা যৌনতার বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই; কিন্তু আছে সেই বস্তু যা না থাকলে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয় : মানব-প্রেম। কতো সামান্য বিষয় নিয়ে কী অসামান্য সব গল্প রচনা করেছেন চাপেক। তিনি অসামান্য লেখক।

তেমনি অসামান্য অনুবাদ করেছেন মোহনলাল ও মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়। চেক ভাষার জ্ঞান না থাকলেও শুধু অনুবাদ পাঠেই বোঝা যায় কতো সহজ, স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর অনুবাদ এগুলি। পড়তে গেলে কোথায়ও হোঁচট খেতে হয় না, রসগ্রহণে কোথায়ও এতোটুকু অসুবিধা হয় না। মোহনলালের রচনা যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন কী পরিষ্কার, ঝরঝরে লেখা তাঁর। শ্রীমতী মিলাডা নিজে চেক হওয়ায় সুষ্ঠু ভাষানুবাদের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গত ভাবানুবাদও, অনুমান করি, সম্ভব হয়েছে।

পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই প্রথম শ্রেণীর। প্রচ্ছদ ভারি স্নিগ্ধ। ১৬১।৬৪

নবম তরঙ্গ (তৃতীয় খণ্ড)—ইলিয়া এরেনবুর্গ। অনুবাদক : সত্য গুপ্ত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ ১২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২। মূল্য ৭·৫০ নঃ পঃ।

বর্তমান সোভিয়েত সাহিত্যের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র এরেনবুর্গ। তাঁর 'দি স্টর্ম', 'ফল অফ প্যারিস' পৃথিবীর সর্বত্র বিপুল অভিনন্দন ধন্য। উপরোক্ত দুই গ্রন্থ বাংলায় ইতিপূর্বে অনূদিত হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থ 'নবম তরঙ্গ'ও বিপুল জনসমাদর লাভ করেছে। এ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থ এই মহৎ উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড।

নবমতরঙ্গে ইলিয়া এরেনবুর্গ যুদ্ধোত্তর-কালীন পটভূমিকায় অভিব্যক্ত করেছেন যুদ্ধ ও শান্তির সংঘাত। এই উপন্যাসের কেন্দ্র বস্তু রুশ-মার্কিণ ঠাণ্ডা লড়াই। এর বিষয় বস্তু যেমন ব্যাপক বক্তব্য তেমনি গভীর। আজকে পৃথিবীর ঘাতপ্রতিঘাতের মানবিক প্রতিক্রিয়ার উজ্জ্বল ছবি ও উপন্যাস।

সত্য গুপ্তের অনুবাদ অ-স্বচ্ছন্দ।

১২৩।৬৩

রঙ্গজগৎ

চিত্র-সমালোচকের সমস্যা

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসবে প্রেরিত এক ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেছেন, চিত্র-সমালোচকদের লেখনী যেন সতর্কতার সহিত চালিত হয়, এবং শিল্পোপলব্ধির কোন হানি না করে, উহা যেন ন্যায় বিচারের দ্বারা সংযত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেনের এই উপদেশ নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু এই ক্ষেত্রে চিত্র-সমালোচকদের সমস্যা উপেক্ষা করার মত নয়। শিল্পের তথা আর্টের শর্ত কী, এর উৎকর্ষ কীভাবে এবং কোন্ পথে গড়ে উঠতে পারে—এ-সম্পর্কে উদাসীন থাকা চিত্র-সমালোচকদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং স্বভাবতই চিত্র-সমালোচনায় সমালোচকদের এই শিল্পসচেতনতার প্রভাব থেকে যায়। শুধু তাই নয়, শিল্পের যা আর্টের কষ্টিপাথরেই তাঁরা ছায়াছবির বিচার করে থাকেন। কলকাতার চিত্র-সমালোচকদের সম্বন্ধে বি-এফ-জে-এ অনুষ্ঠানে শ্রীঅশোককুমার সরকার যা বলেছেন, তা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, সত্যিকারের শিল্প-সমৃদ্ধ ছবিকেই এখানকার সমালোচকরা সমর্থন করে থাকেন। তিনি আরও বলেছেন, সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" যে একটি যুগান্তকারী ছবি, বিদেশে পুরস্কার পাওয়ার আগেই কলকাতার চিত্র-সমালোচকরা এ সম্পর্কে প্রথম অভিমত প্রকাশ করেন।

শ্রী সরকারের এই উক্তির সত্যতা অনস্বীকার্য। ছায়াছবির সমালোচনায় কলকাতার সমালোচকরা আর্টের দাবিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য, চিত্র-সমালোচকদের এই দৃষ্টিভঙ্গী সংখ্যাগরিষ্ঠ চিত্রনির্মাতা অথবা চিত্রামোদীদের সন্তুষ্ট করতে পারে না। বেশীর ভাগ দর্শক ছায়াছবির মাধ্যমে আমোদই শুধু আহরণ করতে চান। এবং যেহেতু বহুজনের চিত্তবিনোদনের উপকরণের সঙ্গে আর্টের শর্তের একটি স্বাভাবিক বিরোধ রয়েছে, সে কারণে তথাকথিত আমুদে ছবিতে শুধু আর্টের প্রতিশ্রুতি দুর্লক্ষ্যই থেকে যায়। বিপরীত মূল্যবোধের এই অনিবার্য সংঘাতের মাঝখানে চিত্র-সমালোচকদের আর্টের পক্ষই সমর্থন করতে হয়। আর্টের সপক্ষে চিত্র-সমালোচকরা যখন তাঁদের লেখনী চালনা করেন, তখন বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁরা চিত্র-ব্যবসায়ীদের বিচারে একদেশদর্শীরূপেই অভিহিত হন।

শিল্পোপলব্ধির সঙ্গে ন্যায়বিচারের সামঞ্জস্যের যে কথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সেন তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, চিত্র-সমালোচকরা যে তা সব ক্ষেত্রে উপেক্ষা করে চলেন, তা নয়। শিল্পের বিচারে আপসহীন হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু চলচ্চিত্র যেহেতু শিল্পব্যবসায় অথবা ইন্ডাস্ট্রির বস্তু, তাই তুরীয় অবস্থায় থেকে এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তব ও আর্থিক সমস্যাবলীর প্রতি উদাসীন থেকে চলচ্চিত্রকে কোন ব্যক্তিবিশেষের একক প্রয়াস হিসাবে বিচার করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে চিত্র-সমালোচককে এক বিশেষ দায়িত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত হতে হয়। অপর দিকে তাঁদের শিল্প-সমালোচনার স্বধর্মটিকেও বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয়। এই অপ্রতিরোধ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়ে চিত্র-সমালোচকদের স্বভাবতই একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করতে হয়। তাঁরা ছায়াছবিকে বর্ণভেদে বিভক্ত করে নেন। নিছক জনমনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তথা টিকিট-ঘরের আনুকূল্য লাভের জন্য নির্মিত ছবিগুলিকে তাঁরা একটি পৃথক শ্রেণীতে চিহ্নিত করেন। এই ধরনের ছবিতে রুচি ও শালীনতা আছে কিনা, এবং জনচিত্তবিনোদনে ওইসব ছবি সক্ষম কিনা, সে সম্পর্কেই চিত্র-সমালোচকরা তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেন। এই শ্রেণীর ছবি কেন তৈরী হবে এবং সব ছবিই আর্টের শর্তে কেন নির্মিত হবে না, এই গোঁড়ামিপ্রসূত দাবি দায়িত্বশীল চিত্র-সমালোচকের লেখনীতে প্রকাশ পাবার কথা নয়। এই অভিযোগ পোষণ করবেন নতুন যুগের "রাগী ইন্টেলেকচুয়াল" তরুণ দর্শক। এ দেশে সব ছবিই সত্যজিৎ রায়, ফেলিনি, ত্রুফো, বার্গম্যান, কুরোসাওয়া প্রমুখ চিত্রকরদের ছবির মত উঁচুদরের কেন হবে না—এ নিয়ে কোন অসহিষ্ণুতা স্থিরবুদ্ধি চিত্র-সমালোচকের মনে স্থান না পাওয়াই স্বাভাবিক এবং কল্যাণজনক।

তথাকথিত আমুদে ছবির ক্ষেত্রে—যে ছবি বহুজনকে নির্দোষ আনন্দ দেয়—চিত্র-সমালোচকরা কেন আরও নির্মম হতে পারেন না, এই অভিযোগ তাঁদের শুনতে হয়। এক শ্রেণীর বামপন্থী দর্শক আছেন, যাঁরা সাধারণ ছবির সমালোচনায় সমা-

বীরভূম অঞ্চলে "আরোহী"র বহির্দৃশ্য গ্রহণকালে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, আলোকচিত্রশিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন চিত্রপরিচালক তপন সিংহ
ফটো—দেশ

পরশমল দীপচাঁদের "অন্তরাল" (পরিচালনাঃ অগ্রদূত) ছবিতে দিলীপ রায় ও দীপিকা দাস

চিত্র-সমালোচনা

একটি প্রশ্ন

চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের আর কোন সার্থকতা আছে কি? রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত "শেহর ঔর সপনা" (নয়া সংসার) ছবিটি দেখার পর বিচারশীল দর্শকের মনে এই প্রশ্নটি বার বার জাগবে।

রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শ ও লোকশিক্ষার মানদণ্ডে ছায়াছবির গুণাগুণ বিচারের যে অযৌক্তিক ও অর্থহীন নীতি সরকার অনুসরণ করে চলেছেন (গত এগারো বছরের মধ্যে সরকার বাঞ্ছিত ছবির অভাবেই ছয়ত, যার ব্যতিক্রম খুব অল্পই দেখা গেছে), বিদগ্ধ দর্শকের মনে তা গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নামে রাজধানী দিল্লীতে এবার যে প্রহসন অনুষ্ঠিত হল, "শেহর ঔর সপনা" দেখার পর যা নিঃসংকোচে বলা চলে, তার বুঝি আর তুলনা নেই।

ছবিটি দেখে যদি বলতে পারতাম যে, বোম্বাইয়ে এমন একটি বলিষ্ঠ ছবি তৈরি করাটাই কৃতিত্বের কথা—যদিও এই আপেক্ষিক সাফল্যের জন্য কোন ছবি সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেতে পারে না—, তবু না হয় কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেত। কিন্তু তা-ও বলার উপায় নেই। এমন বলিষ্ঠ ও বাস্তবভিত্তিক হিন্দী ছবি বোম্বাইয়ে এর আগেও তৈরী হয়েছে।

তবে কী দেখে সরকার নিযুক্ত আওয়ার্ড কমিটি ছবিটিকে মহত্তের চেয়েও মহৎ বলে ঘোষণা করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। ছবিটিতে এর কোন উত্তর খুঁজে পাইনি।

ছবিতে পেয়েছি সমাজ-জীবনের অর্থনৈতিক বৈষম্যভিত্তিক কিছু স্লোগান, মদ্যপান-বর্জন ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এবং এক সক্ষম তরুণের মুখে মূর্তিমান পুরুষকার সম্বন্ধে অকারণ বিলাপ ও স্বগতবিলাস। ছবিতে আর যা আছে তা মামুলী উপকরণ—প্রেম, দুর্বৃত্তের সঙ্গে নায়কের সংঘর্ষ, কৌতুক এবং মেলোড্রামা।

ছবির শুরুতেই অনতিক্ষুদ্র নেপথ্য-ভাষণের মাধ্যমে প্রযোজক, পরিচালক ও কাহিনীকার খাজা আহ্‌মদ আব্বাস তাঁর বক্তব্য দর্শকদের জানিয়ে দিয়েছেন। বক্তব্য আর কিছু নয়, একটি বৈভবপূর্ণ শহরে কত অভাগার স্বপ্ন ফুটপাথের পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে কেমন করে বিলীন হয়ে যায় সেই কথা। এই কথা যাত্রার দলের বিবেকের মত শ্মশ্রুধারী সর্বহারা এক ব্যক্তি কখনো গানে, কখনও বা সংলাপে বার বার দর্শকদের শুনিয়ে যায়।

কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে এত সোচ্চার বিলাপ, প্রলাপও বলা যেতে পারে, সেই নায়ককে কিন্তু হতভাগ্য মনে করার কোন কারণ নেই। শহরে এসে জীবিকা অর্জনের জন্য তাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। চাকরি সে অপর এক সহৃদয় চাকরিপ্রার্থীর উমেদারিতে সহজেই পেয়ে যায়। চাকরি পাওয়ার পর তার বেশ-ভূষা দেখে এমন মনে করার কারণ নেই যে, অল্প বেতনে সে কাজ ঢুকেছে। রাস্তায় একটি বড় পাইপের ভিতরে ভবঘুরের যে সুশ্রী তরুণী সংক্ষণ সঙ্গে ছোরা নিয়ে নির্ভয়ে বসবাস করে এবং বড়লোকের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে

দুই নবাগত : অনিন্দ ঘোষ (বাঁয়ে) ও তাপস গঙ্গোপাধ্যায় : অজয় কর পরিচালিত "প্রভাতের রঙ" ছবিতে এ'দের দেখা যাবে

(তখনও তার সঙ্গে ছোরা থাকে) জীবিকা-নির্বাহ করে, তাকে প্রেয়সী এবং পরে স্ত্রী-রূপে পেতেও নায়কের বিলম্ব ঘটে না। মেলে না শুধু তার একটুকু বাসা (এ ক্ষেত্রে বর্তমান কালের শহরে নিদারুণ বাসগৃহ সমস্যার বিষয়টিও উপস্থিত করা হয়েছে)। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ওই পাইপের মধ্যেই নবদম্পতি কিছুকাল বাস করে। তারপর যখন নায়িকা সন্তানসম্ভবা হয় তখন নায়ক বাড়ির খোঁজে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তার পূর্বপরিচিত তিনজন বয়স্ক দরদী বন্ধুর ডেরায় এসে উপস্থিত হয়—যেখানে সে আরও আগেই আসতে পারত। ওই তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন মুসলমান, একজন খৃষ্টান, অপরজন হিন্দু। তারা তিন ভাইয়ের মত একসঙ্গেই বাস করে (যেন ধর্মনিরপেক্ষতার এক চরম নিদর্শন!)। যথাসময়ে নায়কের সন্তান জন্মগ্রহণ করে। শিশুর জন্মমুহূর্তে বড়লোকের বুলডোজার এসেছে বস্তি উচ্ছেদ করতে। তখন ঘর থেকে বেরিয়ে নায়কের অভিভাবকস্থানীয় বন্ধুরা চিৎকার করে বলছে, ইনসান প্যায়দা হো রহা হ্যায়। বস্তি ভেঙে যায়। নবজাতক ইনসানকে নিয়ে নায়ক-নায়িকা এসে দাঁড়ায় আবার পথে, তেমনি, একটি বড় পাইপের সামনে। পাইপের ভিতরে নায়ক মুহূর্তের জন্য দেখে সাজানো ঘর, আসবাবপত্র। ও কিছু নয়। স্বপ্ন।

বাস্তবের কাহিনী যে কত অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে উপস্থিত করা যেতে পারে তা ছবিটি না দেখলে বোঝা যায় না। এ ছবি নিয়ে এত চুলচেরা বিচারের প্রয়োজন হত না, যদি না এর মধ্যে বড় কিছু বলার কোন ভনিতা থাকত। এমনিতে একটি পরিচ্ছন্ন উপভোগ্য ছবি হিসাবে "শেহের ঔর সপনা" দর্শকদের ভাল না লাগবার কথা নয়। গতানুগতিক প্রমোদ-উপকরণ ও অতি-নাটকীয়তা এতে থাকলেও এর বিন্যাসধারার বহু অংশে এমন অভিনবত্ব আছে যা সাধারণ হিন্দী ছবিতে দুর্লভ। মেলোড্রামার উপাদান এতে আছে। কিন্তু কোথায় তার ছেদ টানতে হবে সে সম্পর্কে পরিচালক প্রশংসনীয় পরিমিতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। প্রয়োগ-নৈপুণ্যের কয়েকটি বিস্ময়কর উজ্জ্বল মুহূর্তও এতে আছে। নায়ক-নায়িকার প্রণয় বিন্যাস রুচিসম্মত। এমনটি হিন্দী ছবিতে কমই দেখা যায়। চিত্রকার শ্রীআব্বাস কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত গড়ে তোলার কাজেও সুন্দর কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। গানের সঙ্গে তিনি অর্কেস্ট্রা ব্যবহার করেননি। হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে তা দুঃসাহসিকতার পরিচয় বইকি।

ছবির প্রধান দ্বটি সম্পদ সংগীত ও আলোকচিত্রগ্রহণ। সংগীতপরিচালক জে পি কৌশিক পরিবেশানুগ ও মনোরম আবহ-সুর রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অতি উঁচুদরের আলোকচিত্রগ্রহণ (রামচন্দ্র কৃত) এ ছবিকে চমৎকার বহিরঙ্গ রূপ-শোভায় মণ্ডিত করে তুলেছে।

এ সত্ত্বেও "শেহর ঔর সপ্না" বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে না। ছবির প্রধান দুর্বলতা এর আখ্যানভাগ। এতে নতুনত্ব বা ভিন্নধর্মিতা বলতে কিছু নেই। ছবির জীবনস্পর্শরহিত আখ্যানবস্তুর অনেক ঘটনা—যেমন অর্থপিশাচ পাত্রপক্ষের অন্যায় দাবিতে নায়িকার বিবাহ পণ্ড হওয়ার কাহিনী যা ফ্ল্যাশব্যাকে বর্ণিত—কৃত্রিম এবং ছায়াছবিতে প্রায়শ দ্রষ্টব্য। ছবির বিশিষ্ট পার্শ্বচরিত্রগুলিও বিশ্বাসযোগ্য নয়। ছবির এই বিবর্ণ কথাবস্তুর উপর দিয়ে আবার সোচ্চার বক্তব্যের রোলার চালানো হয়েছে। যেন কিছু বলবার জন্যই এই ছবি। এ-কারণে ছবিটি সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে,

নায়কচরিত্রে নবাগত দিলীপরাজ স্বচ্ছন্দ, প্রাণোচ্ছল অভিনয় করেছেন। নায়িকার ভূমিকায় নবাগতা সুরেখার অভিনয় চরিত্রানুগ। কয়েকটি কৃত্রিম চরিত্রে স্বীয় অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ডেভিড, আনোয়ার, নানা পালসিকর, মনোমোহন কৃষ্ণ প্রভৃতি। কলাকৌশলের অন্য সকল বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়।

চতুরঙ্গ অভিনীত "বাবু"

রসরাজ অমৃতলালের "বাবু" প্রকৃতপক্ষে নাটক নয়, নক্‌শা। বলা যেতে পারে, উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী সমাজের আংশিক অবক্ষয়ের একটি চিত্রকল্প। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও মানসিকতার প্রভাবে এক শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে তখন এক ধরনের উন্নাসিকতা দেখা দিয়েছিল। বিভ্রম ও কৃত্রিমতার রাহু-গ্রাসে তাদের ধর্ম ও সমাজচিন্তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ওই বিভ্রান্ত বাঙালীদের চাল-চলন, মতিগতি, বিশ্বাস ও ভাবনা নিয়ে একটি রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক নকশা রচনা করেন অমৃতলাল। তারই নাম "বাবু"। শাণিত বিদ্রূপ ও অফুরন্ত রঙ্গরস "বাবু"র

দুই মূকাভিনেতা—অরুণাভ মজুমদার (বাঁয়ে) ও যোগেশ দত্ত : যশস্বী মূকাভিনেতা শ্রীদত্তর পর শ্রীমজুমদার সম্প্রতি মূকাভিনয়ের আসরে আত্মপ্রকাশ করেছেন

প্রধান উপজীব্য। বিগত যুগের সমাজ-দর্পণ হলেও এতে এমন কিছু রস ও বক্তব্য আছে যার আবেদন আজও অম্লান নয়। চতুরঙ্গ গোষ্ঠী অভিনীত "বাবু"তে মূল রচনার অনিবার্য আকর্ষণটি সযত্নে রক্ষিত। "বাবু" মঞ্চস্থ করে চতুরঙ্গ নাট্য সম্প্রদায় নাট্যরসিকদের সাধুবাদার্হ হলেন। "বাবু" নাটকাভিনয় আরও ঘনবন্ধ হতে পারত। অবশ্য এতে নাট্যঘটনা বলতে বিশেষ কিছু নেই। তবু বিবরণধর্মিতা সহজেই এড়ানো যেত। এই দুর্বলতার জন্য নাটকটি দর্শকের কৌতূহলকে আগাগোড়া সমানভাবে উজ্জীবিত করে রাখতে পারে না। তবে
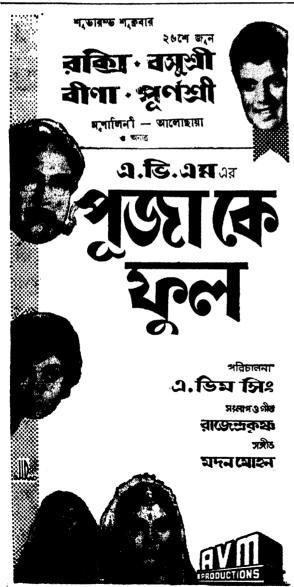
বিদগ্ধ ও রসজ্ঞ দর্শকরা "বাবু"র সূক্ষ্ম ব্যংগ ও রঙ্গরস মন ভরে উপভোগ করবেন। নাটকের শেষাংশ উপভোগ্য। এবং নাটকটি সর্বাঙ্গীণভাবে রুচিসম্পন্ন। নাটকের এই বিশেষ গুণের জন্য প্রশংসা পাবেন নাট্য পরিচালক বরুণ দাশগুপ্ত।

সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্য নাট্য প্রযোজনার ত্রুটি অনেকাংশে ঢেকে দিয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে নাটকটি চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে।

পাঁচজন শিল্পীর স্বচ্ছন্দ ও মনোজ্ঞ অভিনয় সর্বাগ্রে প্রশংসনীয়। এ'রা হলেন মিহির চট্টোপাধ্যায়, বরুণ দাশগুপ্ত, নিখিল সেনগুপ্ত, মল্লিকা মিত্র ও শাশ্বতী রায়। শিল্পীরা কৌতুকাভিনয়েও অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়েছেন। অন্যান্যদের মধ্যে সুঅভিনয় করেছেন বিমল মুখোপাধ্যায়, সুজন সেনগুপ্ত, সরস্বতী চক্রবর্তী, হারু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেশ্বর পালধি, মায়া হালদার, দেবেন্দ্র গুপ্ত, বুলা সেনগুপ্তা প্রভৃতি।

"মঞ্চ-মনোরমা"

বিহার আর্ট থিয়েটার পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক প্রয়াসের দ্বারা সিনেমা টেলিভিসনের যুগে রঙ্গমঞ্চকে স্বীয় মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ব্রত গ্রহণ করেছেন। এ'দের চতুর্থ নাট্যনিবেদন "কারখানা" নাটকটিতে একটি সম্পূর্ণ নতুন মঞ্চ-পরিকল্পনা লক্ষণীয়। এই নতুন মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে "মঞ্চ-মনোরমা" বা ইংরাজীতে প্যানোরমিক্ স্টেজ। এই নতুন মঞ্চে যবনিকা বা পর্দাকে একেবারে বর্জন করা হয়েছে। মঞ্চটি সব সময়ই দর্শকদের সামনে অনাবৃত এবং উন্মুক্ত থাকবে। অন্যভাবে বলতে গেলে দর্শক বা অভিনেতার মাঝখানে কোনও ব্যবধান থাকবে না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা এর পরিধি অনেক বড়। মঞ্চ-মনোরমার মাপ ১০০ ফিট×২০ ফিট×৪৫ ফিট। এই বৃহৎ মঞ্চের উপর যে কোনও দৃশ্য সাজিয়ে রাখা সম্ভব এবং এভারেস্ট-

আর ডি বনসালের ভোজপুরী ছবি "মোরে মন মিতুয়া"-তে (পরিচালনা : গিরিশরঞ্জন) বোম্বাইয়ের শিল্পী নাজ ফটো—দেশ

গিরিশৃঙ্গ ভারের ন্যায় আশ্চর্যজনক নাটকও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্যরূপে দেখানো সম্ভব। "কারখানা" নাটকে মঞ্চের এক দিকে কারখানার কুটীরশ্রেণী, অন্য দিকে শহরতলির নানা আকৃতির ঘরবাড়ি ও মাঝখানে একটি শহরের প্যানোরমা এবং পিছনে একটি কারখানার সম্প্রসারণ দৃশ্য। বারোটি আর্কটিং জোনে ভাগ করা সাতটি এলিভেশনের উপর পর পর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নাটকের গতি অব্যাহতভাবে চলতে থাকে ও সওয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে নাটকটি শেষ হয়। অবিকল সিনেমার মত অবিরাম দৃশ্যের পর দৃশ্য দর্শকদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং অদৃশ্য হয়। একই সঙ্গে একাধিক দৃশ্যে পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীল সম্পর্কবিশিষ্ট ঘটনাবলীকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে মঞ্চ-মনোরমার মাধ্যমে দর্শকদের চোখের সামনে তুলে ধরা যায়। আমেরিকার বিখ্যাত টেলিভিসন-চিত্র পরিচালক মিঃ পীটার জেফরীজ্ পর পর দুই দিন কারখানা নাটকটি দেখবার পর মন্তব্য করেন—মঞ্চ-মনোরমার অদ্ভুত কলাকৌশল আধুনিক স্টেজকে ফিলম বা টেলিভিসনের থেকেও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। প্রতিযোগিতায় রঙ্গমঞ্চ আর কখনই সিনেমা বা টেলিভিসনের পিছনে পড়ে থাকবে না।

এই নাটকটিতে মঞ্চের উপর ৬০ জন ও নেপথ্যে ৫৭ জন অর্থাৎ ১১৭ জন কর্মী কাজ করেন। সকলেই অবৈতনিক। কোনও পেশাদার প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই ধরনের প্রচেষ্টা সম্ভবপর নয়।

বিহার আর্ট থিয়েটারের আগামী নাটক "ন্যাশনাল হাইওয়ে" (১৯৬৫) মঞ্চ-মনোরমার উপর আরও বিরাট, আরও নিখুঁতভাবে দেখবার চেষ্টা হচ্ছে। বর্তমানে পিকচার-ফ্রেম এবং রিভলভিং স্টেজ ক্রমেই অচল হয়ে পড়ছে। মঞ্চ-মনোরমা বা উপরে বর্ণিত প্যানোরমিক্ স্টেজই আধুনিক কালোপযোগী স্টেজ।

'স্বীকৃতি'র শততম অভিনয়

রঙমহলের বর্তমান নাট্যোপহার "স্বীকৃতি"র (রচনা : সলিল সেন) শততম

অভিনয় অবিলম্বেই সম্পূর্ণ হচ্ছে। নাটকটির জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। সবিতাব্রত দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সরযূ দেবী, দীপিকা দাস, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লতিকা দাশগুপ্ত, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মিত্র, শিপ্রা মিত্র, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নির্মল, মৃণাল প্রভৃতি নাটকের প্রধান শিল্পী।

"রঘুবীর"

ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে শিল্পশ্রী সংস্থা সম্প্রতি স্টার থিয়েটারে "রঘুবীর" অভিনয় করেন। শঙ্করনারায়ণ কর্তৃক সুপরিচালিত এই নাট্যাভিনয় উপস্থিত দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দেয়। নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিতে প্রশংসনীয় অভিনয় করেন সুধীর রায়চৌধুরী (রুস্তম), অসিত রায় (রঘুবীর), বিশ্বনাথ দে, অমর দে, শঙ্করনারায়ণ, গীতা দে, তারা ভাদুড়ী, জ্যোৎস্না বসু প্রভৃতি।

শিল্পশ্রীর প্রাক্তন সভাপতি শৈলেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ এই নাট্যাভিনয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে প্রাক্তন সভাপতির একটি তৈল-চিত্র উপহার দেওয়া হয়। উপস্থিত সাংবাদিকদের বিচারে ওই সম্মানলাভের অধিকারী হন সুধীর রায়চৌধুরী।

বার্লিন যাত্রা

আগামী ১লা জুলাই বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "মহানগর" ছবিটি প্রদর্শিত হবে। ওই উৎসবে যোগদানের জন্য চিত্রপরিচালক শ্রীরায়, "মহানগর" ছবির প্রযোজক আর ডি বনসাল এবং নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায় বার্লিন রওনা হচ্ছেন।

বোম্বাই সমাচার

প্রযোজক-পরিচালক নরেশ সায়গলের নতুন ছবির নাম যব ইয়াদ কিসি কি আতি হ্যায়। ধর্মেন্দ্র ও মালা সিংহ ছবির নায়ক-নায়িকা নির্বাচিত হয়েছেন। সংগীত পরিচালনার ভার পড়েছে মদনমোহনের উপর। ইস্টম্যান কালারে ছবিটি তৈরী হবে।

বি এস প্রোডাকশনস-এর পাল্কী ছবির ত্রিশ দিনব্যাপী ইনডোর শুটিং-এ নায়িকা ওয়াহীদা রেহমান অংশ গ্রহণ করেন। এস ইউ সানি ছবিটি পরিচালনা করছেন। রাজেন্দ্রকুমার নায়কচরিত্রের শিল্পী। নৌশাদ সংগীত পরিচালক।

পরিচালক পান্নালাল মহেশ্বরীর কাজল ছবির চিত্রগ্রহণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

হাওড়া কলাভবন (শিবপুর) কর্তৃক সম্প্রতি মহাজাতি সদনে মঞ্চস্থ 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্য-নাট্যে সংগীত পরিবেশন করেন রেবা ঘোষ

সম্প্রতি মীনাকুমারী ও রাজকুমারকে নিয়ে ছবির কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য গৃহীত হয়। পদ্মিনী, ধর্মেন্দ্র, মমতাজ ও মাহমুদ ছবির কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী। ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ফণী মজুমদার। রবি সুরকার।

মুকুল
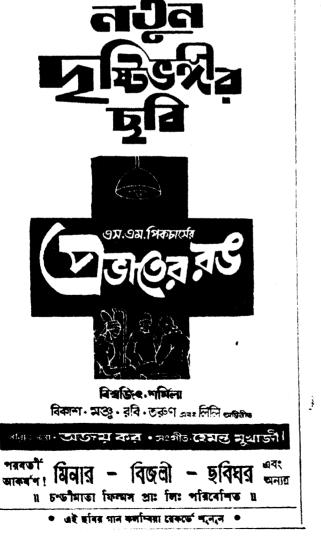
অফ্-সাইড ফুটবলের আইনকানুনের সবচেয়ে বিতর্কমূলক বিষয়। এই সপ্তাহে অফ্-সাইডই সংক্ষিপ্তসারের আলোচনার বস্তু। অর্থাৎ খেলার সময় কখন আপনি অফ্-সাইড হবেন আর কখন হবেন না। আগে সূত্রগুলি লেখা যাক।

কখন অফ্-সাইড হবেন

(১) প্রতিপক্ষের অর্ধাংশে যদি বলের আগে থাকেন এবং সেই অবস্থায় আপনার আগে প্রতিপক্ষের অন্তত ২ জন খেলোয়াড় না থাকেন;

(২) ঐ অবস্থায় আপনার আগের প্রতিপক্ষের দুজন খেলোয়াড়ের মধ্যে আপনার কাছাকাছি খেলোয়াড়ের যদি সম-লাইনে থাকেন;

(৩) অফ্-সাইড থেকে নিজের গোলের দিকে দৌড়ে এসে নিজ খেলোয়াড়ের পাস-করা বল যদি অন-সাইডেও ধরেন;

(৪) প্রতিপক্ষের অর্ধাংশে শুধু প্রতিপক্ষের একজন খেলোয়াড়, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন হাফওয়ে লাইনের উপরে—এই অবস্থায় নিজ খেলোয়াড়ের দেওয়া বল যদি প্রতিপক্ষের অর্ধাংশে গিয়ে কিংবা নিজেদের অর্ধাংশে এসে ধরেন;

(৫) আপনাদের ফ্রি-কিকের সময় যদি প্রতিপক্ষের অর্ধে প্রতিপক্ষের ওয়ালের লাইনে গিয়ে দাঁড়ান এবং 'ওয়ালের' লাইনের পেছনে যদি শুধু গোলকিপার দাঁড়িয়ে থাকেন অথবা গোলে যদি গোল-লাইনের উপর দাঁড়ান।

কখন অফ্-সাইড হবেন না

(১) নিজের অর্ধাংশের মধ্যে;

(২) বলের পেছনে থাকলে;

(৩) বলের সম-লাইনে থাকলে;

(৪) প্রতিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় আপনার আগে থাকলে;

(৫) গোল-কিক, কর্নার-কিক, থ্রো-ইন রেফারীর ড্রপ এবং প্রতিপক্ষের স্পর্শ থেকে সরাসরি বল পেলে;

(৬) অন-সাইডে থাকা সময়ে নিজ খেলোয়াড়ের দেওয়া বল অথবা নিজের শট-করা বল অফ্-সাইডে গিয়ে, এমন কি বলের আগে গিয়ে ধরলেও;

(৭) অফ্-সাইড হবার পর খেলায় অংশ না নিলে, বিপক্ষের বাধা সৃষ্টি না করলে, অথবা সুযোগ লাভের চেষ্টা না করলে।

[সমস্ত ১০ নম্বর আইনের অন্তর্ভুক্ত]

অফ্-সাইড সম্পর্কে আইন বইয়ে রেফারীদের প্রতি উপদেশের সূত্রটি মনে রাখলে অফ্-সাইড নিয়ে অনেক বিতর্কের অবসান ঘটে।

সূত্রে অফ্-সাইড সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"The deciding factor is where the player WAS at the moment the ball was played by a member of his own side; NOT as is often thought, where he IS when he himself plays the ball. It stands to reason that if a player is not in front of the ball when it is played, he can not, even if he then runs forward, be off-side."

(Law-11 : Advice to Referees)

অর্থাৎ, মীমাংসার বিষয়টি হচ্ছে, যে মুহূর্তে নিজ দলের একজন বল খেলেন তখন খেলোয়াড় কোন্ জায়গায় ছিলেন; সাধারণত যেমন মনে করা হয়, যখন তিনি নিজে বল খেলেন, তখন তিনি কোথায় আছেন, তা কিন্তু নয়। যুক্তিতে এই দাঁড়ায়, যখন বলটি খেলা হয়, তখন যদি খেলোয়াড় **বলের আগে না থেকে থাকেন,** তবে পরে বলের আগে দৌড়ে গেলেও অফ্-সাইড হতে পারেন না।

ইংরেজী লেখার মধ্যে 'ওয়াজ' ও 'ইজ' এবং বাংলা লেখার মধ্যে (খেলোয়াড় কোথায়) 'ছিলেন' ও 'আছেন' বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এবং পাস্ট ও প্রেজেন্ট টেন্সের এই দুটি শব্দই অফ্-সাইডের প্রশ্ন মীমাংসার মূল সূত্র।

মোটকথা, নিজ খেলোয়াড়ের বল পাসের আগে যদি খেলোয়াড় অফ-সাইডে না থেকে থাকেন, তবে পরে বলের আগে চলে গেলেও অফ্-সাইড হবেন না।

চিঠিপত্র

ঠাকুরপুকুর লীগ টুর্নামেন্ট কমিটির পক্ষে শ্রীকনকরঞ্জন চক্রবর্তী, ঠাকুরপুর, বেহালা।

প্রশ্ন—গত ১৪।৬।৬৪ তারিখে আমাদের এখানে স্থানীয় এক লীগ টুর্নামেন্ট কমিটির পরিচালনায় ফুটবল লীগের একটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলাটি শুরু হয় ৫-৩০ মিঃ-এর সময়, হাফ-টাইমের পূর্বে ২৫ মিনিট ও ৫ মিনিট হাফ-টাইমের পর আরও ২৫ মিনিট খেলবার কথা। শেষার্ধের খেলার সময় প্রতিযোগী এক দলের ক্যাপ্টেন রেফারীর কাছে আলোকাভাবের জন্য খেলা বন্ধ করার আবেদন জানান ও রেফারী খেলা শেষ হবার ৯ মিনিট পূর্বে সেই আবেদন মঞ্জুর করে খেলা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এই ফুটবল লীগের খেলাগুলি আই এফ এ-র নিয়মমত পরিচালিত হবার কথা।

অতএব, মহাশয়, আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি যদি দয়া করে আই এফ এ-র নিয়ম অনুসারে ঐ খেলার ফলাফল কি হওয়া উচিত জানান বাধিত হব। খেলা **বন্ধ হবার পূর্বে যে দল আলোকাভাবের আবেদন জানান, তাঁদের বিপক্ষ দল** ৫—০ গোলে অগ্রগামী ছিল।

উত্তর—প্রথমেই জেনে রাখুন, খেলা পরিচালনার ব্যাপারে আই এফ এ-র নিজস্ব কোন আইন নেই। আই এফ এ-র খেলা পরিচালিত হয় আন্তর্জাতিক আইনে।

যখন খেলা বন্ধ হবে, তখনকার ফলাফলই বহাল থাকবে—যদি প্রতিযোগিতার বা লীগের এমন নিয়ম না থাকে, তবে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে অসমাপ্ত খেলা আবার পুরো সময় খেলাতে হবে। কোন রেফারীরই অন্ধকারের মধ্যে খেলা শেষ করার ঝুঁকি নিয়ে দেরিতে খেলা আরম্ভ করার উচিত নয়। যাই হোক, খেলা যখন আরম্ভ হয়েছিল এবং ৯ মিনিট সময় হাতে থাকতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তখন ঐ খেলাটির আবার খেলার ব্যবস্থা করাই আইনের বিধান।

শ্রীশ্যামসুন্দর সিংহ, খাসজিন্দা কোলিয়ারী, ধানবাদ।

প্রশ্ন—বল গোলে প্রবেশের মুখে একজন দর্শকের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। রেফারী আইন অনুযায়ী ঘটনাস্থলে ড্রপ দিলেন। বল কোন খেলোয়াড়ের স্পর্শের আগে গোল-লাইন অতিক্রম করে নেটের মধ্যে ঢুকে গেল। রেফারী কিসের নির্দেশ দেবেন?

উত্তর—কোন নির্দেশ দেবেন না, ঐ জায়গায় আবার বল ড্রপ দেবেন এবং আবারও যদি কোন খেলোয়াড়ের স্পর্শের আগে গোলে প্রবেশ করে বা গোলের পাশ দিয়ে মাঠের বাইরে যায়, তবে আবার ড্রপ দেবেন।

শ্রীসোমশংকর দাশগুপ্ত, পূর্ব-পল্লী, শান্তিনিকেতন।

উত্তর—আপনার তিনটি প্রশ্নই পড়ে দেখলাম। এর আগেও আপনি অনেক প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সব প্রশ্নই পুরনো। এর আগে উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে।

যে কারণেই হোক, প্রথমার্ধে একজন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা হলে দ্বিতীয়ার্ধে গোলকিপার ছাড়া আর কোন খেলোয়াড় পরিবর্তন চলে না, বর্তমান আইনের এই বিধানের কথা বহুবার লিখেছি। বল ফেটে গেলে সেটা যে আর আইনমাফিক বল থাকে না, সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। বলের আঘাতে কর্নার-পতাকা যদি ছিন্নভিন্ন হয়েই যায়, তবে হাফওয়ে লাইনের পাশের পতাকা কর্নারে বসান যেতে পারে। সম্ভব হলে নতুন পতাকাও সংগ্রহ করা যেতে পারে। যদি হাফওয়ে লাইনের পাশে পতাকা না থাকে, ক্লাব থেকেও সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়, তবে ছিন্নভিন্ন পতাকা দিয়ে কাজ চালালেও আইনের লঙ্ঘন হয় না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৫ই জুন—অদ্য রাজ্য মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে সরিষার তেলের দাম বাড়াইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিলো প্রতি তিন টাকার স্থলে এখন দর হইবে ৩·২৫ টাকা। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্যদানের জন্য রাজ্য সরকার প্রথম বৎসর পৌনে দুই কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পহেলা জুলাই হইতে এই সাহায্য পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইবে।

১৬ই জুন—কলিকাতার ছয় হইতে বার বছরের প্রায় তিন লক্ষ ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রায় এক লক্ষের কোন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নাই। ঐ বয়সের ১ লক্ষ ৯৭ হাজারের মত ছেলেমেয়ে বিভিন্ন অনুমোদিত বিদ্যালয়ে যায়। তাহাদের মধ্যে মাত্র ৫৪ হাজারের পৌর বিদ্যালয়গুলিতে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ আছে।

স্বরাষ্ট্র দপ্তর সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এক গোপন রিপোর্টে জানাইয়াছেন যে, অবিলম্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা না গেলে এবং তৈল-তণ্ডুল সঙ্কট মিটাইতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে ঘোরতর দুর্যোগ দেখা দিতে পারে এবং সেই দুর্যোগে রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

১৭ই জুন—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের দুর্নীতি দমন দপ্তর কলিকাতার এনফোর্সমেন্ট পুলিসের জনৈক ভূতপূর্ব অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিয়া একটি রিপোর্ট স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পেশ করিয়াছেন।

কোচবিহারের এক সংবাদে জানা যায় যে, একদল বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী দিনহাটার এস ডি ও-কে গতকাল তাঁহার কক্ষে চার ঘণ্টাকাল ঘেরাও করিয়া রাখে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা খাদ্যের দাবি জানায় এবং খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য রোধের জন্য ধ্বনি দিতে থাকে।

১৮ই জুন—পশ্চিমবঙ্গে ভেজাল অনুসন্ধান কমিশন ভেজাল ঔষধ প্রস্তুতকারকদের "অতিজঘন্য দুষ্কৃতকারী" আখ্যা দিয়া বলিয়াছেন যে, ভেজাল ঔষধের কারবারের সঙ্গে কয়েকজন নামকরা ডাক্তার ও একজন নামকরা বাইওকেমিস্ট জড়িত আছেন।

আজ শ্রীনগর হইতে ১৬ মাইল দূরে এক জনসভায় শেখ আবদুল্লা বলেন যে, কাশ্মীরের ৫০ লক্ষ অধিবাসী ভারত, পাকিস্তান অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের সম্পত্তি নয়। কোন কারণেই তাঁহারা আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকার পরিত্যাগ করিবেন না।

১৯শে জুন—পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের লইয়া একটি জাতীয় উন্নয়ন বাহিনী গঠনের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, অর্থ, প্রতিরক্ষা ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের দ্বারা বিবেচিত হইবার পর তাহা গভর্নমেন্টের অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

গতকল্য দুপুরে ক্যানিং গাছঘাটে ১২—১৪ কে জি ওজনের এক একটি বড় ইলিশ মাছ ৬ পয়সা থেকে ১০ পয়সা দরে খুচরো বিক্রয় হইয়াছে। অবশ্য ঐ মাছ পচাগলা। সংবাদ পাইয়া স্বাস্থ্য বিভাগের স্থানীয় ইনস্পেক্টরগণ আসিয়া ঐ পচা ইলিশের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন।

২০শে জুন—বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল, পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সংস্থায় বেশ কয়েক লক্ষ টাকা কারচুপির ঘটনা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বিশেষ পুলিস কর্তৃপক্ষ আবিষ্কার করিয়াছেন। কয়েকজন পদস্থ সামরিক অফিসার নাকি ইহাতে জড়িত বলিয়া প্রকাশ।

আগামী সোমবার হইতে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি হইতে চাউল এবং গম সরবরাহ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার এবং কালোবাজারী রোধের উদ্দেশ্যে পুলিস ও খাদ্য দপ্তর এক ব্যাপক এবং যুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

২১শে জুন—পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী সর্দার প্রতাপ সিং কায়রণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের পর দাস কমিশন তাঁহাকে একটি ক্ষেত্রে তাঁহার নিজের সুবিধার জন্য এবং অন্য তিনটি ক্ষেত্রে তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়দের সুবিধার জন্য তাঁহার প্রভাব ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

প্রতাপ সিং কায়রণকে পাঞ্জাবের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মুখ্যমন্ত্রীরূপে তাঁহার কার্যভার হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে এবং বর্তমানের মত ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই জুন—নেপালের রাজা মহেন্দ্র ও রাণী রত্না দুইদিনব্যাপী সফরে আজ করাচী পৌঁছিয়াছেন। বিমানঘাটিতে পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ভুট্টো তাঁহাদিগকে স্বাগত জানান।

রাষ্ট্রসঙ্ঘে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি মিঃ এডলাই স্টিভেনসন আজ বলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি খুবই সংকটময় এবং উহা সমগ্র বিশ্বকে সঙ্কটের পথে ঠেলিয়া দিতে পারে।

১৬ই জুন—আজ বিকালে জাপানের মূল দ্বীপ হনসুর উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এবং কাণ্টোর উপকূলভাগে বিস্তীর্ণ এলাকায় গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মৃতের সংখ্যা ২২ এবং আহতের সংখ্যা ১৪০ জন।

পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভায় গতকাল একটি অর্ডিন্যান্স অধিকাংশের ভোটে অনুমোদিত হয়। এই অর্ডিন্যান্স-বলে পূর্বাহ্নে কর্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন লোক তাহার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে, হস্তান্তর করিতে বা উইলের সাহায্যে সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।

১৭ই জুন—গতকাল অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, হায়দরাবাদ (পাকিস্তান) এবং উহার নিকটবর্তী থারপারকার জেলায় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির দরুন গৃহ পতনের ফলে ২৫০ জনেরও বেশী লোক মারা গিয়াছে এবং শত শত বাড়ি পড়িয়া গিয়াছে।

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী খান হবিবুল্লা খান গতকাল ঢাকায় বলেন যে, পাকিস্তান কদাপি ভারতের সহিত লোক-বিনিময়ে সম্মত হইবে না।

১৮ই জুন—বর্ণবিদ্বেষ নীতি দমন করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাহার সনদ অনুসারে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে, তাহা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এক বিশেষজ্ঞ দল গঠনের প্রস্তাব আজ নিরাপত্তা পরিষদে ভোটে গৃহীত হয়।

দীর্ঘ বিলম্বের পর মাফিলিণ্ডো (মালয়েশিয়া, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া) পররাষ্ট্র মন্ত্রিত্রয়ের সম্মেলন আরম্ভ হয়। এক ঘণ্টার মধ্যেই সম্মেলন একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে : মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া সীমান্তে তিনটি অতিরিক্ত পরীক্ষা চৌকি খোলা হইবে।

১৯শে জুন—আজ লিওপোল্ডভিলের সংবাদ হইতে অনুমান করা যাইতেছে যে, বিদ্রোহী বাহিনীর নিকট টাঙ্গানাইকা হ্রদের তীরে অবস্থিত উত্তর কাতাঙ্গার রাজধানী আলবার্টভিলের পতন হইয়াছে।

আগামীকাল সম্ভবতঃ আজ নতুবা টোকিওতে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান ও ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ম্যাকাপাগাল এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হইবেন।

২০শে জুন—পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাজ্য নেপালের ভিতরই অন্ততঃ সম্প্রতি হাজার হাজার পাকিস্তানী মুসলমান অনুপ্রবেশ করায় নেপাল এখন এক গুরুতর সংকটের সম্মুখীন বলিয়া স্থানীয় একটি দৈনিকে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

আমেরিকায় বর্ণবিদ্বেষের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে আনীত ঐতিহাসিক নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত বিলটি গতকাল বিপুল ভোটাধিক্যে মার্কিন সেনেটে অনুমোদিত হইয়াছে।

২১শে জুন—প্রাভদার রাজনৈতিক সমীক্ষক যুরি জুকভ বলিয়াছেন যে, চীন যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নোংরা অপপ্রচার বন্ধ না করে, তাহা হইলে সংকটকালে সোভিয়েট সাহায্য পাইবে না।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীজেড এ ভুট্টো বলেন, কাশ্মীর সম্পর্কে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের যে নীতি ছিল, আজও তাহাই আছে—অর্থাৎ কাশ্মীর রাজ্যের অধিবাসীদের ইচ্ছা অনুযায়ীই কাশ্মীর প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া উচিত। কাশ্মীরীদের গ্রহণযোগ্য না হইলে কোন স্থায়ী এবং সম্মানজনক মীমাংসা লাভ অসম্ভব।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা — ৪০ পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, টাকা, ষাণ্মাসিক—১০, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, টাকা, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক — ৫ টাকা ৫০ পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১।
টেলিফোন : ২৩-২২৮৩ ও ২৩-৮৫৪১ স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

বিমল মিত্রের
কড়ি দিয়ে কিনলাম
প্রথম খণ্ড—১৫,
দ্বিতীয় খণ্ড—১৫,
এই বছরের রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
একক দশক শতক (তৃতীয় মুদ্রণ) ১৪, শ্রেষ্ঠ গল্প ৫,
প্রমথনাথ বিশীর
লালকেল্লা
তৃতীয় মুদ্রণ
— চৌদ্দ টাকা —
সৈয়দ মুজতবা আলীর
টুনিমেম
দ্বিতীয় মুদ্রণ
— সাড়ে সাত টাকা —
জরাসন্ধের
ছবি
দ্বিতীয় মুদ্রণ
— চার টাকা —
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
কাল, তুমি আলেয়া (তৃতীয় মুদ্রণ) ১২॥
মন্মথনাথ ঘোষের
সোহাগরাত ৪,
কালীপদ ঘটকের
মৃদঙ্গার ৪॥
মায়া বসুর
কখন অন্যমনে ৬,
অপূর্বমণি দত্তর
স্বর্গ হইতে বিদায় ৪॥
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের
মগ্নমৈনাক (দ্বিতীয় মুদ্রণ) ৪॥
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নবতম উপন্যাস
সংকেত ৫,
নীহাররঞ্জন গুপ্তের
ঝড়
— দশ টাকা —
তরুণকুমার ভাদুড়ীর
সন্ধ্যাদীপের শিখা ৪,
মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

* সূচীপত্র *

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রশাসনে দুর্নীতি	... ...	৮৭১
ফরিয়াদ : দেবদারু হত্যার বিরুদ্ধে (কবিতা) —শ্রীকেতকী কুশারী	... ...	৮৭২
প্রাত্যহিক (কবিতা)—শ্রীশান্তি লাহিড়ী	... ...	৮৭২
বৈদেশিকী—	... ...	৮৭৩
সুনন্দর জার্নাল—	... ...	৮৭৫
জওহরলাল নেহরু ও ভারতীয় অর্থনীতি —শ্রীনিলয় মজুমদার	... ...	৮৭৭

আপনার ছেলেকে স্বাবলম্বী হতে শেখান

বাপ হিসেবে সুবিধেই শুধু নয়, আপনার দায়িত্ব ছেলেকে ভবিষ্যতের জন্যে তালিম দেওয়া। যা-ই করুন, সঞ্চয়ের দামী অভ্যেসটা যেন ওর রপ্ত হয়। একবার অভ্যেস হয়ে গেলে সঞ্চয় করা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাবে! জীবনে বড় হওয়ার রাস্তা তার সামনে খুলে যাবে। ☐ কম বয়সে শুরু হওয়াই ভাল। ···তাতে দরকারে সব সময় সে আপনার সাহায্য পাবে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাতে সঞ্চয়ের অভ্যেস হয়···দি ব্যাঙ্ক অব বরোদায় তার জন্যে একটা বিশেষ মাইনরস্ সেভিংস্ অ্যাকাউন্ট আছে: ১৪ বছর বা তার বেশী বয়সের অপ্রাপ্তবয়স্কেরা তাতে টাকা রাখলে শতকরা ৩. টাকা সুদ পাবে। আপনার ছেলে বা মেয়ের নামে ব্যাঙ্ক অব বরোদায় একটা মাইনরস্ সেভিংস্ অ্যাকাউন্ট খুলে দিন। তার নিজের নামে পাশবই হবে, আর তার চেয়েও বড় কথা, সে নিজে-নিজেই তার সেভিংস্ অ্যাকাউন্ট বাবদ লেনদেন করতে পারবে।

দি ব্যাঙ্ক অব বরোদা লিমিটেড

(স্থাপিত ১৯০৮)

হেড অফিস: বরোদা

'আপনার সাহায্যে আসতে পারি কি?' এই নামে আমাদের
বিশদ বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকা লিখলেই বিনামূল্যে পাবেন।

JWT/BB 2220A

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
হাটবার—শ্রীসোমনাথ ভট্টাচার্য	... ...	৪৮১
রূপকথার কলকাতা—রূপচাঁদ পক্ষী	... ...	৪৮৯
ভারতের অর্থনীতি—শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ	... ...	৪৯১
প্রেমেবাসে—	... ...	৪৯২
বেগম মেরী বিশ্বাস—শ্রীবিমল মিত্র	... ...	৪৯৩
এক যে ছিল রাজা—শ্রীমেদিনী চৌধুরী	... ...	৯০৭
পুনর্দর্শনায় চ—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	৯১৩
মস্কোর চিঠি—শ্রীবিশ্বজিৎ রায়	... ...	৯১৯
সূর্যসাক্ষী—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	... ...	৯২৫
ঘরে-বাইরে—শ্রীমতী	... ...	৯৩১

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীদিলীপকুমার দাশ

গ্রন্থ পরিচয়

বহ্নিবন্যা (চতুর্থ মুদ্রণ)—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃঃ ৪৮৪। মূল্য সাড়ে আট টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রের "বহ্নিবন্যা" পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় এই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। এই বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র কানপুরের ঘটনাগুলিই এই উপন্যাসের ভিত্তি। কিন্তু লেখক ইহাকে অবলম্বন করিয়া সিপাহী বিদ্রোহের একটি সামগ্রিক চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কানপুরের বিদ্রোহ ও তাহার নায়ক নানা সাহেবের সম্বন্ধে অনেক ঘটনাই আমরা সঠিক জানি—কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কয়েকটি আছে, যাহার কারণ অথবা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। লেখক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবিকৃত রাখিয়া, তাহার কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। এবং এই কল্পনার মধ্য দিয়াই নীরস ঐতিহাসিক ঘটনা উপন্যাসের সরস কাহিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সর্বজনসম্মত রীতি এবং লেখক কোথাও এই রীতি লঙ্ঘন করেন নাই। এই উপন্যাসের প্রধান নায়িকা আমিনা নাম্নী নানাসাহেবের একটি মুসলমান আত্মীয়া রক্ষিতা। ইঁহারই অঙ্গুলি হেলনে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়াইয়া পড়ে, ইনিই নানাসাহেবের প্রতিটি গতিবিধির নিয়ামক, ইঁহার আদেশেই বিবিঘরের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সাধিত হয়, মৌলবী আহম্মদউল্লা ও আজিমুল্লা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ইঁহারই আদেশে পরিচালিত। অসাধারণ শৌর্য সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত নীতিতে অদ্ভুত নিপুণতা, নারীর কোমল চিত্তবৃত্তি ও কঠোরতার অপূর্ব সম্মিলন, অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর স্বৈরিণী-বৃত্তি ও নির্মল প্রেমের একত্র বিকাশে চরম নিষ্ঠুরতা ও অনমনীয় জিঘাংসা-বৃত্তি—আমিনাকে একটি অপূর্ব সৃষ্টিতে পরিণত করিয়াছে। এই নারী চরিত্র ও তাহার অদ্ভুত কার্যকলাপ অনেকের নিকট অপ্রাকৃত মনে হইতে পারে—কিন্তু লেখক এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নির্মলকুমারীর নজির দেখাইতে পারেন। নির্মলকুমারী সম্পূর্ণরূপেই বঙ্কিমচন্দ্রের মানসী কন্যা—ইতিহাসে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু আমিনার কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। সমসাময়িক কোন লেখকের মতে নানাসাহেবের একটি মুসলমানী রক্ষিতাই কানপুরের ইংরেজ স্ত্রীলোক ও শিশুদের নিষ্ঠুর হত্যার জন্য দায়ী। এই সূত্রটি অবলম্বন করিয়াই লেখক আমিনার ন্যায় অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একটি নারীচরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উপন্যাসখানির প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যত কিছু ঘটিয়াছে, তাহার সকলেরই মূলে আমিনাকেই খাড়া করিয়াছেন।

এই উপন্যাসখানির মধ্য দিয়া কানপুরের সিপাহী বিদ্রোহের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহাতে বাঙ্গালী পাঠক অনেকেই হয়ত ক্ষুণ্ণ হইবেন। কারণ নানাসাহেব ও সিপাহীদের প্রকৃত স্বরূপই এই উপন্যাসের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, দেশের উদ্ধারব্রতে দীক্ষিত বীরের মূর্তি অঙ্কিত হয় নাই। এই দিক হইতে দেখিলে বলিতে হইবে যে বর্তমানকালে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস নামে পরিচিত অনেক গ্রন্থই প্রকৃত প্রস্তাবে উপন্যাস এবং আলোচ্য উপন্যাসখানিই প্রকৃত ইতিহাস।

(ডঃ) শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

DESH 40 Paise
Saturday, 4th July 1964.

৩১ বর্ষ ॥ ৩৫ সংখ্যা ॥ ৪০ পয়সা
শনিবার, ২০ আষাঢ় ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

প্রশাসনে দুর্নীতি

এক সময়ে এদেশে স্বাদেশিকতা, দেশসেবা ও সমাজসেবা ছিল জীবনের মূল মন্ত্র, সেই মন্ত্রে দীক্ষিত বহু যুবককে দেখেছি নিঃস্বার্থভাবে বহু ক্লেশ ও কৃচ্ছ্রতা সহ্য করেই দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষ নিয়েই দেশ, মানুষের সেবাই ছিল সেদিন দেশসেবার আদর্শ। গ্রামে নগরে সর্বত্রই দরিদ্র, অনাহারক্লিষ্ট, অসহায় দেশবাসীর সেবাপরায়ণ নীরব নম্রচিত্ত যে মানুষদের সেদিন দেখেছি তাঁরা বিষয়বস্তুতে সমাজে প্রতিষ্ঠাবান ছিলেন না, কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্যে তাঁরা ছিলেন সমাজে শ্রদ্ধার পাত্র। পরবর্তীকালের দূষিত আবহাওয়ায় সেই সেবাব্রতী মানুষেরা যেন কোথায় মিলিয়ে গেলেন। সমাজে শ্রদ্ধাবান পাত্র হলেন তাঁরাই, যাঁরা মুনাফালোভী, চোরাকারবার আর কালোবাজারী ব্যবসায়ে 'আজ অগাধ বিত্তবান।

পরাধীনতার যুগে বিদেশী রাজের হাতে ছিল শাসন কর্তৃত্ব, তাঁরা তাঁদের রাজত্ব কায়েম রাখবার জন্য সেই ভাবেই প্রশাসনিক যন্ত্র গঠন করেছিলেন। স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই যন্ত্রের হাতবদল হয়েছে মাত্র, রূপান্তরিত হয় নি। বিদেশী মোড়কটা পালটে স্বদেশী মোড়কে একই দাওয়াই বিলি। এই প্রসঙ্গে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ব্যঙ্গচিত্রের কথা মনে পড়ে। বৃটিশ আমলে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল প্রশাসন-কার্যে কেরানি তৈরীর যন্ত্র। বিশ্ববিদ্যালয় নামক বিরাট কারখানার এক দরজা দিয়ে লিকাপ্রবাহের মত ছাত্রদল প্রবেশ করছে, অন্য দরজা দিয়ে তারা বেরিয়ে আসছে নিষ্প্রাণ নিষ্পেষিত কাগজের পুতুল হয়ে। গগন ঠাকুর আজ বেঁচে থাকলে হয়তো এমনই একটি যন্ত্রের ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন, সে-যন্ত্র হত প্রশাসন যন্ত্র এবং দেশের জনসাধারণ সেই যন্ত্রের নিষ্পেষণে নিষ্প্রাণ কাগজের টুকরোয় পরিণত।

সম্প্রতি খাদ্যদ্রব্য নিয়ে চোরাকারবারী মজুতদারদের শায়েস্তা করতে না-পারার প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কায়রোঁ সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রকাশিত দাশ কমিশনের রিপোর্ট দেখে এই চিন্তাই আমাদের ব্যথিত করছে যে, জনসাধারণের সেবাই যাদের প্রধান ব্রত হওয়া উচিত তাদের কাছে আজ নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থই একমাত্র ধর্ম হয়ে উঠেছে। দাশ কমিশনের তদন্ত একটি রাজ্যের প্রশাসনে দীর্ঘকাল যাবত দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের পরিচয় প্রকাশ করেছে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী থেকে পদস্থ কর্মচারীরা পর্যন্ত যেভাবে কলঙ্কিত হয়েছেন দেশবাসীর সামনে তা উদ্ঘাটিত হওয়ায় একদিকে গণতান্ত্রিক কংগ্রেসী সংগঠনের যেমন সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে, অপরদিকে কংগ্রেসী প্রশাসনের এই নগ্ন রূপ চিন্তার কারণও ঘটিয়েছে। কমিশনের রিপোর্টের সার্থকতা কায়রোঁর পদত্যাগে বা সে-রাজ্যের কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীর শাস্তি বিধানেই শেষ হয়ে যায় নি, এই রিপোর্টের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। দাশ রিপোর্টের চিরস্থায়ী ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কীর্তি হচ্ছে, এতকাল দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের যে-সব অভিযোগ কানাঘুষোয় লোকের মুখে শোনা যাচ্ছিল, কংগ্রেসী প্রশাসনের ইতিহাসে, সেই সব অভিযোগ লোকচক্ষুর সামনে অত্যন্ত নগ্ন সত্যরূপে ধরা পড়েছে। 'যা রটে তার কিছু বটে'—এই প্রবাদবাক্যের সত্যতা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে দাশ কমিশনই হাতেকলমে প্রমাণ করে দিলেন। জনসাধারণ এতকাল নানা কারণে এই ধারণাই পোষণ করে এসেছে যে, মন্ত্রীমহোদয়দের আত্মীয়স্বজন ভাগ্যবান পুরুষ এবং সেই ধারণা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে নয় তা প্রমাণ করে দিল দাশ কমিশনের তদন্তরিপোর্ট।

জনসাধারণ কিন্তু প্রতাপ সিং কায়রোঁর অপদস্থতাকে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে দুর্নীতির বিচ্ছিন্ন একক ঘটনা বলে মনে করবে না। দলীয় সুনাম ও স্বার্থের জন্যই কংগ্রেস সভাপতির প্রধান কর্তব্য হবে কংগ্রেসী নেতাদের কোন্ কোন্ আত্মীয়স্বজন কংগ্রেস সংগঠন ও সরকারের সুনামের অন্তরায় হতে পারে তা ভালভাবে যাচাই করা। স্বজনপোষণ মানব-চরিত্রের এমনই এক দুর্বলতা যার পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়, বিশেষ করে যে-দেশের মানুষ বেকার দরিদ্র ও অনাহারে ক্লিষ্ট।

প্রশাসনে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি দূর করার জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এক বিশেষ পন্থা অবলম্বনে অগ্রসর হয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি করে দপ্তর খোলার জন্য রাজ্য সরকার-সমূহকে পরামর্শ দিয়েছেন। ঐ দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে থাকবে এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে রাজ্যের মুখ্যসচিব ঐ দপ্তরের কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তর খোলা হয়েছে। জনসাধারণের অভিযোগ দূরীকরণের জন্য সংস্থা গঠন, ভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির সুযোগসুবিধা দূরীকরণ এবং বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ কার্যকর করার দায়িত্ব ঐ দপ্তরের উপর দেওয়া হয়েছে। নূতন দপ্তর একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশনের সাহায্যে সমগ্র ভারতে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের ব্যবস্থা করবেন। রাজ্য সরকারকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, প্রশাসনিক দপ্তরকে এমন ক্ষমতা দিতে হবে যেন উক্ত দপ্তর রাজ্যের প্রশাসনকে কলুষমুক্ত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন।

দাশ কমিশনের রিপোর্ট শুধু জনসাধারণের নয়, কংগ্রেসের নেতৃবর্গেরও চোখ খুলে দিয়েছে। প্রশাসনিক সংস্কারের এই নির্দেশ তারই অব্যবহিত ফল। দীর্ঘদিনের আলস্যজনিত জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয়ে আছে। প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরকে অনুরোধ, কঠোর হস্তে সম্মার্জনী চালনায় সে-জঞ্জাল দূর করুন, জনসাধারণ আছে তাঁদের সহায়।

ফরিয়াদ : দেবদারু-হত্যার বিরুদ্ধে

কেতকী কুশারী

আমাদের বাড়ির সামনেকার দুটি দেবদারু কেটে ফেলবার পর

মহান কোথায় গেলো আমার যমজ স্বর্গতরু
ক্ষীরস্রাবী দ্রুম দেবদারু?

এখন বিশিষ্ট ঋতু, প্রথম বৈশাখ,
কালবৈশাখীতে স্নিগ্ধ, উচ্ছলিত, প্রীত, আমোদিত;
ছানা দেয় কৃষ্ণচূড়া উল্‌টানো-সিঁদুরকৌটো ফুল,
আনন্দের বৃষ্টিমেঘের উত্তরসাধক।

কেউ কারও ঠিকানা রাখে না,
বিস্মরণ ক্রন্দন মানে না।

মেঘাচ্ছন্ন মধ্যদিনে দুরন্ত সমুদ্র-হাওয়া দেয়,
সরায় বৃষ্টির পর্দা স্মিতহাসা আলো,
গুপ্তকক্ষে লিখে রাখি, কতখানি কমেছে মর্মর,
পাখি কি হারালো।

এখনও ভুলিনি বটে, চার ঘর অভিজাত ছিল
মায়া চৈত্র ভরেছে বিলাপে,
হায় তোমরা উদাসীন কানে এঁটেছিলে ক্রুর খিল,
তোমরা তবে পরোক্ষ ঘাতক।

তোমাদের হিসাব মেলে না,
মত্ততার নন্দন পেলে না।

রক্তের অধিক রক্ত, হিমালয়-সম্ভূত সীডার,
বনানীর রাজ্ঞী-জ্ঞানে নতজানু কবির বন্দিত,
যাদের গিয়েছো ছেড়ে শিশির তাদের জন্য রেখো,
একান্তে চৈতন্যে থেকে পূর্ণ কোরো শূন্যের আধার।

আকস্মিক এসেছিলো নবপত্র বসন্ত-প্রভাতে,
পক্ককাল শ্রী-অঙ্গে থাকলো না।
কৌতূহলী এসেছিলো রাজমিস্ত্রী, বাবু-কর্মচারী,
উদাসীন লজ্জাও ঢাকলো না

দোলপূর্ণিমার রাত্রে চতুর্দিকে বসন্ত-উৎসব,
আঙিনায় বাবচ্ছিন্ন স্তূপীকৃত কাষ্ঠময় শব।
সর্বশেষ মূল্য স্থিরীকৃত
একশো পঁচাত্তর :
তবু সূর্য এলো গেলো নিরন্তর কত রাত্রিদিন,
সম্মান রাখলো না।

প্রাত্যহিক

শান্তি লাহিড়ী

এক রাত তোমার সঙ্গ, বড় বেশী পৌনঃপুনিকতা
এক রাত তোমার মুখ, মনে হয় তুমি মরে গেছ,
এক রাত গোপনদেশে নির্বিচার আকাঙ্ক্ষায় খেলা,
রূপ হীন, দীপ্তি হীন—এক রাত অনেক যুগ তোমার জানুতে।

ঘুমের ওষুধ ভিন্ন অন্য কি উপায় দেখা যায়
প্রতিবেশিনীরা খুব ঘন ঘন দেখা দেয় কার্নিসের ধারে,
বৃষ্টির ধারার মত কেউ, কেউ মরে গেছে নবীনা বয়সে।
সব আলো জ্বলে থাকে, কোন আলো ডাকে না নিকটে।

প্রত্যহ সায়াহ্নে যুবা এসপ্লানেড ভরে যায় অচেনা মানুষে,
মাঝে মধ্যে ভেসে ওঠে পরিচিত স্মৃতির পৃথিবী,
প্রবাসী বন্ধুর সঙ্গে কিছুক্ষণ ইতস্তত বইএর দোকানে
পুনরায় তুমি আসো, বাতি জ্বলে টেবিলে, কাগজে।

বৈদেশিকী

লো জবাহরলালজীর অসুস্থতার সংবাদে দেশ চিন্তিত হয়েছে। অসুখ হওয়াটা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। নেহরুজীর মৃত্যুর আকস্মিক আঘাতের পর থেকে যে-নিরবচ্ছিন্ন শারীরিক এবং মানসিক ব্যস্ততা, উদ্বেগ এবং নূতন দায়িত্বের গুরুভার তাঁকে বহন করতে হয়েছে সেটা অতিবলশালী মানুষের পক্ষেও সহজ নয়। সুতরাং শরীরের কিছু মাত্র অপরাধ নেই। অসুস্থতার প্রকাশিত বিবরণে অতিরিক্ত শ্রমজনিত ক্লান্তি ভিন্ন অন্য কিছু বলা হয় নি।

আশা করি এর চেয়ে গুরুতর কিছু নয়ও। তবে এসব থেকে সরকারী সংবাদ-দাতাদের কিছুটা অস্পষ্ট থাকার দিকে খানিকটা ঝোঁক থাকে। কোনো সাধারণ মানুষের অসুখ করলে রোগের সোজা ভাষায় সাধারণের বোধ্য চলতি নামটারই উল্লেখ করা হয়, তাতে লোকে বোঝে কী হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের বড়ো লোকদের বেলায় তা করা হয় না, নানা রকম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিছু বলা হয় বা থেকে ডাক্তাররা হয়ত কিছু আন্দাজ করতে পারেন কিন্তু সাধারণের কাছে ব্যাপারটা ধোঁয়াটে হয়ে থাকে।

"পলিটিক্যাল সিকনেস" বলে একটা কথা আছে যার মানে এই যে, কোনো একটা অস্বস্তিকর অবস্থা এড়াবার জন্যে রাজপুরুষরা কখনো কখনো মেকি অসুখের আশ্রয় নেন। মজা এই তাঁদেরই যখন সত্যি সত্যি বড়ো অসুখ করে তখন সেই অসুখটাকে যতদিন সম্ভব হাল্কা করে দেখবার চেষ্টা হয়। অবশ্য সব সময়েই যে এটা কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাপার তা নয়। কাজের মানুষ নিজেকে রেহাই দিতে চান না, কাজের মানুষকে কাজ থেকে আলগা করাও সহজ নয়। তিনি কাজের সঙ্গে লেগে থাকার জন্যে যতদিন সম্ভব নিজের অসুখ সম্বন্ধে নিজেকে এবং অন্যদের অন্যমনস্ক রাখার চেষ্টা করেন এবং অসুস্থতাকে অস্বীকার করার যখন কোনো উপায় থাকে না তখনও সেটাকে হাল্কা করে দেখাবার চেষ্টা করেন। কর্তৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত শক্তিশালী ব্যক্তির এরূপ চেষ্টাকে তাঁর পার্শ্ববর্তীদের পক্ষে এমন কি ডাক্তারদের পক্ষেও অগ্রাহ্য বা প্রতিহত করা কঠিন হয়।

এর একটি মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত আমরা সম্প্রতি দেখেছি। অন্য রোগী হলে ডাক্তাররাই যে-কথা বলতেন এবং রোগীকে যে-নির্দেশ পালন করাতে বাধ্য করার চেষ্টা করতেন জওহরলালজীর বেলায় তা করা হয় নি। জওহরলালজীর ইচ্ছার কাছে চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত কর্তব্যবোধ এবং সাহসও অনেকখানি হার মেনেছিল। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর নিজের ইচ্ছা এবং কাজের নেশা ছাড়াও অনুরাগী দলীয় রাজনৈতিক সুবিধাবাদও গত দেড় বছরে তাঁর স্বাস্থ্যের অনেকাংশে একটা অলীক চিত্র দেশের সামনে ধরে রাখার চেষ্টা করেছিল। তাতে শেষ পর্যন্ত কারোরই সত্যিকারের ভালো হয় নি। না দেশের, না জওহরলালজীর নিজের।

জীবনের শেষ বছরে জওহরলালজীকে বহু আশাভঙ্গজনিত দুঃখ পেতে হয়েছে। দেশের অনেক আভ্যন্তর নীতির আশানুরূপ ফলের অভাব এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে কূট-নৈতিক এবং সামরিক মর্যাদাকালিকর আঘাত —বিশেষ করে চীনা আক্রমণের লজ্জা ও গ্লানিই পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য ভঙ্গের প্রধান কারণ হল অথবা তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙতে আরম্ভ করেছিল বলেই তাঁর আগের মতো কর্মকুশলতা ছিল না এবং সেটাই এই সব অসফলতা বা বিপর্যয়ের জন্যে অংশত দায়ী —এ প্রশ্নের কোনো এক-রোকা উত্তর হতে পারে না। হয়ত দুটোই সত্যি—স্বাস্থ্যের অবনতির জন্যে যেমন চিন্তা এবং কাজের উৎকর্ষ্য কমে গিয়েছিল তেমনি অসফলতার আঘাত স্বাস্থ্যের উপর এসে পড়ছিল। দুর্ভাগ্য এই যে, এই অবস্থার যে সমস্যার

উদ্ভব হল তার সম্মুখীন না হয়ে যেন তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই চলল, ফলে পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর কাজ উভয়ই একে অপরের ক্ষতি করে চলতে লাগল যতদিন না পর্যন্ত মৃত্যু এসে এই সমস্যার অবসান ঘটাল। যে-বিশেষ ঐতিহাসিক স্থান এবং প্রতিষ্ঠা পণ্ডিতজীর নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল যেন সেইটাই হল বাধা যাতে পণ্ডিতজী নিজে এবং তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীরা সমস্যার সমাধান করতে পারলেন না, যে সমস্যার সমাধান মৃত্যুর দ্বারা হতে হল।

হয়ত এর জন্যে দুঃখ করা নিষ্ফল, অসাধারণত্বের গৌরব করব এবং সঙ্গে সঙ্গে আটপৌরে "ডেমোক্রাটিক প্রসেস-এর" স্বচ্ছন্দ গতিও আশা করব—এটা বোধহয় চলে না। যাই হোক, আমরা এখন সাধারণ-এর রাজ্যে এসেছি। এখন প্রধান-মন্ত্রীর অসুখ করলে সাধারণ নিয়মে যা কর্তব্য, তাই করা উচিত, অর্থাৎ যাতে অসুখ তাড়াতাড়ি সেরে যায়, সেইভাবে তাঁর এবং তাঁর পার্শ্ববর্তীদের চলা উচিত। এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত লালবাহাদুরজীর সম্বন্ধে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, তিনি আগের চেয়ে ভালো আছেন এবং এরূপ আশা করা যায় যে, তিনি দু-একদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন, ও কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে লণ্ডন যাত্রা করতে পারবেন। আশা করি, এই আশা সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

তবে এখানে একটা সতর্কবাণীরও প্রয়োজন আছে। শ্রীলালবাহাদুরের শরীর যদি কিছুমাত্র খারাপ থাকে, তবে তাঁর লণ্ডন যাত্রা নাকচ করে দেওয়া উচিত। সেটা অবশ্য দুঃখের কারণ হবে। কিন্তু বর্তমানে লালবাহাদুরজীকে স্বাস্থ্যভঙ্গের ঝুঁকি নিতে দেওয়া কখনই উচিত হবে না। আশা করা যায়, এরূপ অনুচিত-ঝুঁকি নেওয়া থেকে প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিনিবৃত্ত করার দায়িত্ব সম্বন্ধে লালবাহাদুরজীর চিকিৎসক-গণ এবং সহকর্মিগণ সচেতন আছেন।

অসুস্থতার জন্য লালবাহাদুরজী যেতে না পারলে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে ক্যাবিনেটের "দু নম্বর" অর্থাৎ শ্রীগুলজারী-লাল নন্দকে বোধহয় যেতে হবে। তাতে ভারতের স্বার্থের দিক দিয়ে এমন একটা ইতরবিশেষ কিছু হবে না। কমনওয়েলথ কনফারেন্সে যে-সব বিষয় আলোচিত হবে, সে-সব সম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে নীতিগত কোনো নূতন কথা বা নূতন দায়িত্ব গ্রহণের বিশেষ কোনো প্রশ্ন নেই। "অ্যাপার্টহাইট" নীতি বর্জন করতে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে বাধ্য করার জন্য যে সক্রিয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাতে উপযুক্ত অংশ নেওয়ার জন্যে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উপর চাপ দেওয়া এই কনফারেন্সের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। এবিষয়ে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে যিনিই যাবেন, তিনিই ভারত সরকারের কথা বলতে পারবেন। বৃটিশ গিয়ানায় যে-বিপজ্জনক এবং দুঃখকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার প্রতিবিধানকল্পে কমনওয়েলথ-এর ভিতর থেকে কোনো সদিচ্ছামূলক চেষ্টার অবসর আছে কি না, সেটা এই কনফারেন্সে সরকারী বা ঘরোয়া-ভাবে আলোচিত হতে পারে। বৃটিশ গিয়ানায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং আফ্রিকান বংশোদ্ভূতদের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব চলছে এবং যার ফলে ওখানকার সারা ভবিষ্যৎ সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, সেটা ভারতের পক্ষে বিশেষ দুশ্চিন্তা ও দুঃখের বিষয়। এটা দূর করতে সহায়ক হবে, এমন কোনো প্রস্তাব হলে ভারত সরকার নিশ্চয়ই তার সমর্থন করবেন।

একটা ব্যাপার ছিল, যার জন্যে প্রধান-মন্ত্রীর স্বয়ং লণ্ডনে উপস্থিত থাকার একটা বিশেষ সার্থকতা ছিল। সেটা হচ্ছে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তার ব্যাপার। পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে একটা আশার ভাব জেগেছিল। পণ্ডিতজীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের দু-একটি বিবৃতিও আশাজনক ছিল। কিন্তু তার পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব এবং শ্রী ভুট্টোর সুর বদলেছে। অন্য দিকে শেখ আবদুল্লার ক্রিয়াকলাপও অধিকতর দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। কাশ্মীরে নূতন দলাদলিও দেখা দিয়েছে। অবস্থাটা আরও একটু পরিষ্কার এবং বুঝার মতো না হওয়া পর্যন্ত দুই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে ফলদায়ক কথাবার্তার সম্ভাবনা কম। সুতরাং সেদিক দিয়ে এখন লালবাহাদুরজীর লণ্ডনে না গেলে বিশেষ যে একটা ক্ষতি হবে, তা মনে হয় না। যাই হোক, তিনি যদি সম্পূর্ণ সুস্থ হন এবং লণ্ডনে যেতে পারেন, তাহলে সেটা আনন্দের কথা হবে। তবে যদি যেতে না পারেন, তাহলে মহা অনর্থ কিছু ঘটবে, তা-ও নয়।

২১।৬।৬৪

'ধৃতরাষ্ট্র—নাম্বার টু'

বাস্তবিক, ব্যাপারটা কী ঘটছে বলুন তো?

কিছুদিন ধরে সকালে কাগজ খুললেই দেখি, 'কায়রোঁ', কায়রোঁ, (অথবা কায়রন? কিংবা কাইরন?) রবে দেশসুদ্ধ লোক

পুত্রমিত্রবদাচরেৎ

ভাইরো ভাঁজছে। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি—অধুনা বিশ্বভারতীর উপাচার্যের নামে জয়ধ্বনি উঠছে—এমন কি, মন্ত্রী নন্দজী পর্যন্ত জানিয়েছেন ও'র বুক থেকে নাকি বিরাট বোঝা নেমে গেল!

'পুত্রগণের দুর্নীতিতে প্রশ্রয়, নির্বাচনে অন্যায়ভাবে সরকারী প্রভাব প্রয়োগ' ইত্যাদি নানা অভিযোগে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, 'পুত্রদের সম্পর্কে আমার পূর্বেই!—আমেরিকান ইউনিভার্সিটির পলিটিক্যাল সায়েন্সের এম এ সর্দারজীর রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' পড়া আছে কিনা আমার জানা নেই। থাকলে হয়তো অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো ছেলেদের বলতে পারতেন 'মণিলোভে কাল-সর্প করিলি কামনা, দিনু তোরে নিজ হস্তে ধরি তার ফণা—অন্ধ আমি!' সেই মহাভারতের ধর্মযুগে ধৃতরাষ্ট্রের চতুর্দিকেই ছিলেন জলজ্যান্ত মুনি-ঋষির দল, ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুর-সঞ্জয়ও নিশ্চয় সদুপদেশের ত্রুটি করেননি, তবু কি তিনি দুর্যোধনকে থামাতে পারলেন? এই পাপ কলিযুগে সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁ (কাইরন কিংবা কায়রনও হতে পারে) একা কী করতে পারতেন অস্ত্র?

অবশ্য, কলিযুগেই অন্য নজীরও আছে। পিটার দি গ্রেট ছেলে আলেক্সির প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন, রোমের বিচারপতি ব্রুটাস ঠিক এমনি একটি কীর্তি করেছিলেন, বাংলা দেশের মহারাজা রামপালও বোধ হয় এই ধরনের একটি নজীর রেখেছেন। কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন, নজীরগুলো সব সময়েই ব্যতিক্রম; সবাই যদি আদর্শ-টাদর্শ মেনে চলত, তা হলে আর ওগুলোর কোনো মানেই থাকত না।

আমার ধারণা, আপনারা অকারণে একটা শক্ত সবল মানুষকে 'কর্মাবকাশ' করলেন। তার চাইতেও বলায় আপনাদের সমবেত উল্লাস: 'এতদিনে একটা মহান দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল।'

কিসের মহান দৃষ্টান্ত?

পুত্রস্নেহে কি আপনারও পক্ষপাত নেই? আপনি নিশ্চয়ই পাড়ার বালকবৃন্দ হাবলা-নাপলা-পানু-শিবে কিংবা কার্তিককে আপনার ছেলে গোবরার মতো পুত্রবৎ মনে করেন না। মারামারি করতে গিয়ে নাপলার যদি মাথা ফাটে, পানুর যদি দাঁত ভাঙে, কার্তিকের নাকে যদি রক্ত গড়ায় এবং গোবরার যদি কান ছিঁড়ে যায়, আপনি কি সকলেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন? করবেন না—বংশধর গোবরাকেই পাঁজাকোলা করে পাড়ার ডাক্তারখানায় ছুটবেন। অফিস

'স্বজন-পোষণ' মানে কি বাবা?

থেকে যখন কিছু কাগজ-পেনসিল সরিয়ে আনেন, তখন কি পাড়াসুদ্ধ সব ছেলেকেই তার ভাগ দেন, না গোবরাই তাদের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হয়ে থাকে? আপনি যদি নিষ্ঠাবান হিন্দু হন, তা হলে অবশ্য জানেন যে, পুত্রার্থেই ভার্যা এবং প্রেত-শরীরে যদি সেই পুত্রের পিণ্ড গিলতে না পারেন, তবে অনন্তকাল ধরে নরকে যমদূতের ঠ্যাঙানি খেতে হবে আপনাকে। সুতরাং—

কিন্তু এ আলোচনাও থাক। পিতা শক্তিমান হলে পুত্র অযাচিতভাবে অনেক সময়েই প্রীতির অর্ঘ্য পেয়ে থাকে, সে কি পিতার অপরাধ? আপনার কিছু ক্ষমতা আছে, কিন্তু আপনার শিশুটির হাতে কেউ একটি চকোলেট গুঁজে দিলেই সে ক্ষমতার অপব্যয় হল কি?

আসল কথা কী জানেন, কেউ কেউ দিয়েই খুশী হয়। ভক্তির বেগে, প্রাণের আবেগে, হৃদয়ের—কী বলে—আকুল

সেক্রেটারীকে বিয়ে করা বা স্ত্রীকে সেক্রেটারী নিয়োগ করাও দুর্নীতি (বিলিতি চুটকি)।

হাহাকারে। ধরুন, গুরুদেব উদ্বাহু সন্ন্যাসী, তিনি সোনা-চাঁদি কিছুই ছোঁন না। কিন্তু আমি যদি চিত্তের ব্যাকুলতায় তাঁর হেড্-শিষ্যদের থলি-ঝুলি বোঝাই করে দিই, সাধন-ভজনের জন্যে মঠ-মন্দির (ক্ষেত্রবিশেষে কোল্‌ড্ স্টোরেজ, সিনেমা) ইত্যাদি নির্মাণের আনুকূল্য করি, তবেই সেটাকে দুর্নীতি বলবেন? আশ্চর্য আপনাদের এথিক্‌স্—এর মর্ম আমি বুঝতে পারলুম না!

ভক্তি দারুণ জিনিস, মশাই। সেটা আমার যখন দানের আবেগে উছলে ওঠে, তখন শুধু একটি কথাই বলতে ইচ্ছে করে: 'লহো লহো—সব লহো, জীবনবল্লভ!' আমার এক মামাতো দাদার 'মটো'ই ছিল, কখনো টিকেট কিনে রেলে চাপবেন না। ফলে, কামরায় চেকার উঠলেই এক গাল হেসে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিতেন তাঁর দিকে। শেষে এমন হল, পথে ঘাটে যেখানে হোক, কারো গায়ে সাদা কিংবা কালো রঙের কোট দেখলেই তার হাতে সিগারেট গুঁজে দিতেন। এমনকি, একবার এক ড্রাইওয়াশের দোকানে কী কাচতে দিয়ে তাদের সারি সারি হ্যাঙ্গারে যতগুলো কোট ছিল, প্রত্যেকটার পকেটে একটা করে সিগারেট পুরে দিয়েছিলেন তিনি।

আমার কথা হচ্ছে, সর্দারজীকে গঞ্জনা দেবার আগে প্রথমে এই 'দানী'দের ম্যানেজ করুন। মুখ্যমন্ত্রীর ছেলেদের কথা ছেড়েই দিন, যে লোকটি একদিন অকারণে তাঁর ঝাড়ুদারকে বিড়ি খাইয়ে গেল, ওকেই আগে পাকড়ে ধরুন। গর্তে বৃষ্টির জল জমেছে বলে গর্তের ওপর রাগ করবেন অথচ বৃষ্টির জল ঠেকাতে পারবেন না—এ কেমনতরো লজিক?

আর নির্বাচনে দুর্নীতি? এগিয়ে আসুন মশাই, দক্ষিণ-বাম যে যেখানে আছেন, বুকে হাত দিন। তারপর শপথ করে বলুন, ইলেক্‌শনের সময় আপনাদের ব্যালট-বাক্সে একটিও জাল ভোট পড়েনি, একটিও পরলোকগত ভোটার আপনাদের সমর্থন করেনি—আপনারা সবাই নির্মল গণতন্ত্রের দ্বারা নির্বাচিত বা নিপাতিত হয়েছেন!

জানি, বলতে পারবেন না।

দাশ কমিশনের রিপোর্ট আমি দেখিনি—তাতে শুধু একটি তথ্যই আমার জানবার আছে। সর্দারজীর অর্ধাঙ্গিনী-সম্পর্কিত কুটুম্বেরা (কেউ কি আর নেই?) কে কতটা উপকৃত হয়েছেন? পরোক্ষ প্রশ্রয়ে পুত্রকৃত্য করার ভেতরে কোনো বাহাদুরি নেই, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রয়াসে পত্নীর অগ্রজানুজদের জন্যে কিছু না করার ভেতরে প্রলয়ঙ্কর দুঃসাহস আছে। সর্দারজী যতই 'শক্তমানুষ' হোন, চিরন্তন স্বামীরূপে তিনি যে দীন বাঙালী সুনন্দ রায়ের চাইতে বেশী শৌর্যবান—এ আমি বিশ্বাস করি না!

আপনাদের পলিটিক্যাল নীতি-দুর্নীতি আমি বুঝি না মশাই, ওতে আমার অভক্তি হয়ে গেছে। কিন্তু যদি পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষপাতের তালিকায় তাঁর শ্বশুরকুলের কোনো উল্লেখ না থাকে, তা হলে আপনারা যা খুশি বলুন, আমি বীরবক্ষ সর্দারজীকে হৃদয়-মন্দিরে বসিয়ে চিরকাল বীরপূজা করতে থাকব।

জওহরলাল নেহরু ও ভারতীয় অর্থনীতি

নিলয় মজুমদার

পৃথিবীর ইতিহাসে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির সন্ধান মিলিবে যিনি একাধারে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে নব-ভাবধারার প্রতিষ্ঠায় জীবিতকাল মোটামুটি সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের একজন নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারতের স্রষ্টা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। বিশ্ব শান্তি, নবীন এশিয়া-আফ্রিকান দেশের নিরপেক্ষ নীতি এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সম্প্রসারণে তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য, সেইরূপে ভারতে গণতন্ত্র-ভিত্তিক সামাজিক বিবর্তনে তাঁহার ভূমিকা সর্বজনবিদিত। কিন্তু ভারতের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর তাঁহার এবং তাঁহার সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অচলায়তনের অবসানের কৃতিত্বের দাবিও তাঁহার অগ্রগণ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা তাঁহার অর্থনৈতিক চিন্তা এবং সেই সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক পরিবর্তনে তাঁহার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ভারতে জাগতিক উন্নতিভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রগতির স্বপক্ষে দাদাভাই নৌরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, রানাডে এবং গোখলে ইংরাজ যুগে যে মতবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, শ্রীনেহরু তাঁহারই প্রকৃত উত্তরসাধক। সেই হেতু তাঁহার চিন্তায় আর্থিক সমৃদ্ধি ও শিল্পোন্নতির স্থান সর্বাগ্রে। কিন্তু একাধারে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ততা এবং অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বিশেষ প্রভাবই শ্রীনেহরুর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীনেহরুর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চিন্তার প্রথম দিকে মার্কসীয় ভাবধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। আত্মচরিতে তিনি লিখিয়াছেন, "জগদ্ব্যাপী অর্থসংকট ও মন্দা হইতে মার্কসীয় বিশ্লেষণের যৌক্তিকতাই প্রমাণিত হয়। যখন অন্যান্য পদ্ধতি ও মতবাদ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে, তখন কেবল মার্কসীয় মতবাদই ইহা অল্পবিস্তর সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত সমাধানের পথ নির্দেশ করিতেছে। (১) কি কারণে মার্কসীয় মতবাদ তাঁহার মনকে জয় করিয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, "অলৌকিক মতবাদ হইতে মুক্ত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই আমি মার্কসীয় মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি।" (২) মার্কসীয় সাহিত্য পাঠ এবং সেই সঙ্গে ১৯২৭ সালে রাশিয়া পরিভ্রমণই তাঁহাকে মার্কসবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের অনুরক্ত করিয়াছিল।

শ্রীনেহরুর সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আকর্ষণের প্রথম সর্বভারতীয় প্রকাশ ঘটে সম্ভবত ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে। তিনি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া ঘোষণা করেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রামচারী মনে করেন যে, ১৯৩১ সালের করাচী কংগ্রেসে সরকারী মালিকানা অথবা নিয়ন্ত্রণে প্রধান প্রধান শিল্প সংস্থা পরিচালনার প্রস্তাব শ্রীনেহরুর আগ্রহেই গৃহীত হয়। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি ঘোষণা করেন যে, সমাজতন্ত্র ভারত তথা পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান করিবে।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আকর্ষণই শ্রীনেহরুকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করে। তাঁহার আত্মচরিতে অবশ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বিশেষ কোন আলোচনা নাই, এবং সেই কারণে মনে করা অন্যায় হইবে না যে, তৎকালীন বামপন্থী রাজনীতিকদের ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করিতেন যে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাই, অর্থাৎ শিল্পসংস্থার মালিকানার পরিবর্তন, সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ঘটাইবে। সম্ভবত সুভাষচন্দ্র, বিশ্বেশ্বরায়া, অশোক মেহতা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উক্তি এবং রচনা শ্রীনেহরুকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অপরিহার্যতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সুভাষচন্দ্রই ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতিরূপে "জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি" গঠন করেন এবং শ্রীনেহরুকে উহার সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে আহ্বান জানান। সে সময় ভারতীয় রাজনীতিতে নানা বিরোধ বিসম্বাদের ফলে ক্রমেই আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং কংগ্রেস পরিকল্পনা কমিটিকে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের প্রকাশ্য 'বিদ্রোহের' নিদর্শনরূপে গান্ধীপন্থী কংগ্রেসসেবীরা দেখিতে আরম্ভ করেন। সেই কারণে অনেকেই

শ্রীনেহরুকে উক্ত কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ না করিবার উপদেশ দেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রবীন্দ্রনাথ শ্রীনেহরুকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন (শ্রীনেহরুর পুরাতন পত্রগুচ্ছ দ্রষ্টব্য)। 'ভারত-সন্ধানে' গ্রন্থে শ্রীনেহরু লিখিয়াছেন, "আমি দ্বিধাবিহীন চিত্ত এবং ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী না হইয়া পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ করি নাই। কিন্তু কাজটা আমার মনোমত ছিল এবং সেই কারণে উহার বাহিরে নিজেকে রাখা সম্ভব হইল না।......কংগ্রেস কর্তৃকই সেই সংস্থার সৃষ্টি হয়, কিন্তু উহার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ উহাকে অবাঞ্ছিত সন্তানরূপে দেখিতে আরম্ভ করেন। উহা কি রূপ ধারণ করিবে তাহা না জানা থাকায় তাঁহারা উহার ভবিষ্যৎ কার্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। (৩) কংগ্রেস পরিকল্পনা কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার পর তিনি পুনোদ্যমে উহার পরিচালনা করিতে থাকেন, অবশ্য শেষ পর্যন্ত উক্ত কমিটি রাজনৈতিক কারণে উহার কার্য সমাপ্ত করিতে পারে নাই। কংগ্রেস পরিকল্পনা কমিটিকে পরিচালনার ফলে শ্রীনেহরুর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রতি গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়, যাহার ফলে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সত্রপাত হইতে তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর, উহার সভাপতিরূপে আমাদের দেশের তিনটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সহিত বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন।

শ্রীনেহরুর রাজনৈতিক চিন্তার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায় যে, পূর্বের ন্যায় তিনি আর মার্কসবাদে আস্থাশীল নহেন। ১৯৪৫ সালে "ভারত সন্ধানে" গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সামাজিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে মার্কসের সাধারণ বিশ্লেষণ অদ্ভুতরূপে নির্ভুল, কিন্তু বহু পরিবর্তন পরবর্তী যুগে সংঘটিত হইয়াছে যাহার সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণীর সঙ্গতি নাই।" (৪) কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ কোনক্রমেই হ্রাস পায় নাই এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি জনসাধারণের প্রকৃত সমৃদ্ধি আনয়ন করিবে না। তিনি আরও মনে করিতেন যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিল্পোন্নয়ন অথবা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিবে না, যদি মুনাফা-ভিত্তিক বেসরকারী শিল্প সংস্থা জাতীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে। আহরণশীল সমাজব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতি যে জনস্বার্থের পরিপন্থী সে কথা "ভারত সন্ধানে" গ্রন্থের ৬০৯-৬১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীনেহরুর অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক চিন্তার শেষ অধ্যায় আরম্ভ হয় শাসন ক্ষমতা লাভের পর। এই সময় তত্ত্বমনস্কতা (Doctrinaire attitude) হইতে তিনি বহুলাংশে মুক্ত এবং তাঁহার মতবাদ এবং কার্যকলাপ অর্থনৈতিক বাস্তবতাবোধের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। তাঁহার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিষয় সর্বশেষ মতামত কংগ্রেস দল পরিচালিত ইকনমিক রিভিউ পত্রিকায় "Basic Approach" নামক নিবন্ধে পাওয়া যাইবে। এই প্রবন্ধটি ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এখানে শ্রীনেহরু মার্কসীয় তত্ত্বমনস্কতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তথায় তিনি মার্কসীয় অর্থনীতি কালোপযোগী নহে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্তর্বিরোধ সম্বন্ধে কম্যুনিজম বহুবার বলিয়াছে, এবং এই বিশ্লেষণের ভিতর সত্য রহিয়াছে। কিন্তু কম্যুনিজমের অনড় কাঠামোর ভিতরও ক্রমবর্ধমান অন্তর্বিরোধ আমরা দেখিতে পাই। ইহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছে।... বৃষ্টির কল্যাণে ব্যক্তিকে অবহেলা কি নির্ভুল লক্ষণ?" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের কর্ণধাররূপে তিনি আর মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সহানুভূতিশীল নহেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ারূপে অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁহার মতবাদের পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৫৬ সালে সরকারী শিল্পনীতি ঘোষিত হইবার পর সেই বৎসরের ২৫শে মে লোকসভায় তিনি বলেন, "আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, আমরা যদি বেসরকারী শিল্প সংস্থাকে ধ্বংস করিতে চাই, উহার পরিবর্তে উপযুক্তভাবে কোন কিছুর ব্যবস্থা আমাদের প্রকৃত পক্ষে ক্ষমতা নাই। আমাদের সম্পদ নাই যে উহার পরিবর্ত সৃষ্টি করি এবং সেইরূপ কিছু করিলে আমাদের উৎপাদন শক্তির ক্ষতি হইবে। আমরা কেন তাহা করিব? আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বেসরকারী শিল্প সংস্থায় যাহারা নিযুক্ত আছেন, তাহাদের স্থানচ্যুত করিতে কেন আমরা আমাদের শক্তি ক্ষয় করিব? সুতরাং আপনাদের কেবলমাত্র বেসরকারী শিল্প সংস্থাকে অনুমোদন করিলেই চলিবে না, কিন্তু আমি মনে করি যে উহাদের কার্যকলাপকে উৎসাহ দিতে হইবে।"

ভারতের প্রধানমন্ত্রীরূপে শ্রীনেহরু দেশকে কোন প্রকার রাজনৈতিক তত্ত্বমনস্কতা দ্বারা পরিচালিত করেন নাই এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দেশে মার্কসীয়

দৃষ্টি চলে না। বাঁধের শীর্ষে নীলোজ্জ্বল আকাশ, পাহাড়ের শ্রেণীর মত মেঘের বিন্যাস—শিখর, সানুদেশ, উপত্যকা। রাস্তাটা গুটিগুটি উঠে গেছে বাঁধের ওপর। মাঠটার মাঝখানে একটা বড় গাছ, গাছের ছায়া। শিবেন মাঠ ভেঙে গাছতলার দিকে এগিয়ে গেল। চটি খুলে আসন করল। গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে পা দুটো টানটান করে ছড়িয়ে দিল। স্কেচবুকটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখল। রোদ-চশমাটা খুলে চোখ কুঁচকে সামনের দিকে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। সামনের দিকে তাকাতে আবার বাঁধটার ওপর নজর পড়ল। বাঁধের ওপর থেকে উতরাইয়ে এক সাঁওতাল দম্পতী নেমে আসছে। পুরুষটার মাথায় একটা বস্তা, মেয়েটার পিঠে বাঁধা কয়েক মাসের একটা শিশু, পেছনে পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে একটা কুকুর। শিবেন ভাবল, এখানে এতবড় একটা বাঁধের হঠাৎ কি প্রয়োজন ছিল?—হয়ত, বাঁধটা বর্ষায় কুলপ্লাবিনী নদীর জলোচ্ছ্বাস রোধ করত এক সময়। শিবেন সকৌতুকে ভাবল, এ সময় লোকটা থাকলে হয়ত বাঁধটার উৎপত্তির কোনো ইতিহাস শোনাত।

হাটের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন শব্দ ভেসে আসছে।—কথার টুকরো, গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ ঝঙ্কার তুলেই থেমে গেল। তরকারির হাটের পাশের ইঁদারা থেকে কেউ জল তুলছে, কপিকলের ক্যাচক্যাচ শব্দ, বালতি থেকে ইঁদারার মধ্যে জল-ছলকে পড়ার শব্দ—শব্দটা গুরু-গম্ভীর। নির্জনতার সুযোগে শালিকের দল নেমে এসেছে। রাস্তার ধারে জমে থাকা জল পাখনা ছিটিয়ে স্নান সারছে। রোদের রঙ ক্রমশ হলুদ হয়ে আসছে। ছায়া দীর্ঘ হচ্ছে।

'টেস্টিং ওয়ান-টু-থ্রি'......অ্যাম্প্লিফায়ারের গলার স্বর ভেসে এল। আবার নিস্তব্ধতা। সাউন্ড-বক্সে পিন পরানোর কটকট শব্দ। ফেনাসঞ্জিং প্রায় অ্যাকোশফউটন একটা শব্দ। তারপরই দেশী-বিদেশী মেশান বাজনার কাঁকালো সুর। শিবেন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। হাটের মধ্যে মানুষজনের যাতায়াত, জটলা বেড়েছে। শিবেন উঠে দাঁড়াল। চটিটা পায়ে গলিয়ে এগিয়ে গেল। পাজামার তলায় দিকটা চোরকাঁটায় ভর্তি হয়ে গেছে। 'জল খোঁটে খোঁটে মা-বেচেনের পায়ের হাতের আঙুলের গাঁকিতে হাজা হয়—রস কাটে, সুড়সুড় করে' ......এস্ট্রাফিয়ারে ওষুধের বিজ্ঞাপন শোনা গেল। তরকারি আর মাছের জায়গায় ভিড় লেগেছে। প্রশস্ত জায়গাটা ভরে গেছে প্রায়। ছেলে-বুড়ো-বুড়ি-বউ সকলের সামনেই যা হোক কিছু একটা পণ্য রয়েছে। অ্যাম্প্লি-ফায়ারে এবার একটা বাংলা গান বাজছে। 'এই চললো গরমা-গরম—' কড়ায় গরম তেলের শব্দ। তেলেভাজাওয়ালার বারকোষে লাল লাল তেলেভাজা উঁচু হয়ে উঠেছে। বেসম মাখা হাতে পাতায় তেলেভাজা মুড়ে দিচ্ছে খদ্দেরকে, হিসাব করে পয়সা নিচ্ছে। ধানের আড়তের সামনে চার-পাঁচটা গরুর গাড়ি। ধানের বস্তা খালাস হচ্ছে। পাটের আড়তের প্রকাণ্ড দাঁড়িপাল্লা উঠছে-নামছে। সুর করে ওজন হাঁকছে ওজনদার। অপ্রশস্থ রাস্তাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে গরুর গাড়ির সার। পাশকাটিয়ে যেতে শিবেনের পাঞ্জাবি পা-জামায় চাকার তেলকাদা লাগল। দাঁড়িয়ে পড়ে বিরক্ত দৃষ্টিতে গাড়োয়ানকে বিদ্ধ করার আগেই পেছন থেকে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াবার তাড়া এল। 'মাফ্ করতে হল—যাদের দাঁত কালো-শ্যাওলা ধরেছে, মাজনটা দাঁতের মাজন তাঁদের কাজে আসবে না।'—অনেকগুলো কচিগলার হাসি বাজল অ্যাম্প্লিফায়ারে। 'যাদের দাঁত এখনও সে-অবস্থায় আসেনি......' মাথায় মাথায় আলগা পাটের বোঝা, ধানের বস্তা অন্যান্য পণ্য। 'এই চললো গরমা গরম' চারিদিকে অত্যাচার। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে আসছে প্রৌঢ়রা—কাঁধে ছাতা, হাতে ঝোলানো থলে, গলায় দড়ি বাঁধা খালি বোতল। বোতলে বোতলে ঠোকাঠুকি লেগে ঠুংঠুং শব্দ হচ্ছে। সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষের একটা দল হাটে এসে পৌঁছল। মেয়েদের আঁট করে বাঁধা চুল, পরিষ্কার কাপড়, তেল চকচকে শরীর, হাতে ছোট ছোট গামছার পুঁটলি। পুরুষদের রুক্ষ চেহারা, তেলহীন কোঁকড়ানো চুল মুখের ওপর থেকে সরিয়ে রাখতে গাছের লতা ছিঁড়ে বাঁধা। প্রায় সকলেরই খালি হাত—একজনের হাতে ঝুলোনো বাঁশের বাঁক-বেহালা। রাস্তার ধারে মাটিতে ঘর এঁকে দুই প্রৌঢ় বসে বাঘবন্দী খেলছে নিরাসক্ত এবং গভীর মনোনিবেশে। সাঁওতাল মেয়েদের দলটার মধ্যে একটি মেয়ে বাকী দলটার দিকে তাকিয়ে কি বলল। পরক্ষণেই সমস্ত দলটা ভেঙে পড়ল কাচের চুড়িওয়ালার কাচের ঢাকা দেওয়া বাক্সের সামনে। একটা গাছতলা থেকে ওষুধের বিজ্ঞাপন ঘোষিত হচ্ছে।—অনেকগুলো ছোট ছেলেমেয়ে গাছতলাটা ঘিরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছে। শিবেন দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়াতে হল।—কয়েক পা দূরেই সেই চারাগাছের ঝোপ, লোকটা, মেয়েটা। সামনে দু-চারজন দাঁড়িয়ে। হাতে গাছ তুলে নিয়ে দেখছে, লোকটার সঙ্গে কথা বলছে। মেয়েটা এটাওটা এগিয়ে দিচ্ছে লোকটার হাতে। হ্যারিকেনটা গাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা। জ্বলছে। শিবেন ফিরে দাঁড়াল। মেয়েটার চোখদুটো, দু-চোখের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মনে পড়ল। একজন মধ্যবয়স্ক লোক একটা পাঁঠাকে গলার দড়ি ধরে প্রায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। অবরুদ্ধ স্বরে পাঁঠাটা পরিত্রাহি চীৎকার করছে। বাঘবন্দীর ছক থেকে একজন পৌঢ় তাকাল। 'কি গো, কবে'

করবে নাকি?' তারপর কি দেখে বলল, 'ছেলে কাঁদে কেন?' শিবেনও তাকাল।— পেছনে আদুড়-গা একটা ছোট ছেলে। একহাতে প্যাণ্টের সামনেটা মুঠো করে ধরে সামলাচ্ছে। চোখ রগড়াচ্ছে অন্য হাতে। চোখ দুটো লাল, সমস্ত মুখ জলে-সর্দিতে মাখামাখি। 'ওরই ছেলো, সারাদিনমান পাঁঠার দড়ি ধরে ঘুরে বেড়াত—অভাব কি আর সে সব শোনে!' লোকটা পাঁঠাটাকে টানতে টানতে এগিয়ে গেল। অস্ফুটে কান্নার শব্দ করতে করতে ছেলেটা পেছন পেছন চলল। 'জবাই হবে,' শুনে ছেলের দল আনন্দে [illegible] ছেড়ে ছুটল। চালা দিতে দিতে দ্বিতীয় প্রৌঢ় এতক্ষণে কথা বলল, 'কি যে একটা হবে শেষ মেষ—!' এবার রামপ্রসাদী গান বাজছে, 'সুরা পান করি না আমি—!' বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল চতুর্দিকে। নিমেষে রাস্তা ফাঁকা। যাদের হাতে ছাতা তারা অকুতোভয়ে ছাতা খুলল। মাথার ওপর একটা ছাউনির আশ্রয় নিতে ব্যস্ত সকলে। উপায় নেই [illegible] সবকিছু সামলাতে পড়ে রইল, [illegible]। শিবেন সামনের চায়ের দোকানটায় ঢুকে পড়ল। দোকানটার ভেতর [illegible] গায়ে গা-লাগিয়ে শুধু দাঁড়াবার [illegible] হয়েছে। তার মধ্যেই হাতে হাতে চায়ের গেলাস ঘুরছে। শিবেন বলল, 'এক ভাঁড় চা দেখি।' দোকানী চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দিল। শিবেন এক সময় ঘড়ি দেখল—ছটা বাজতে চলেছে। ফেরার ট্রেন আটটায়। সাড়ে ছটার মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে পড়া উচিত —মনে মনে হিসেব কষল। কিন্তু শিবেনের [illegible] হল, হাটটায়, হাটটা ঘিরে যে-একটা [illegible] উত্তেজনা এবং উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে এখন সেই উত্তেজনা এবং উন্মাদনা অজ্ঞাতসারে তার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়ে পড়েছে। শিবেনের মনে হচ্ছিল [illegible] হাটটা যেন কোনো [illegible] হাতের দশ আঙুল প্রসারিত [illegible] স্পন্দিত হতে হতে ফুটে উঠছে—এই মুহূর্তে একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ তাকে ফিরে যেতে দিতে চাইছে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি ধরে এল। ধাক্কাধাক্কি পড়ে গেল বাইরে বেরুবার জন্য। দোকান থেকে শিবেন বেরিয়ে এল। আকাশ পরিষ্কার। দু-একটা তারা ফুটে-উঠেছে। আলো জ্বলবার তোড়-জোড় চলছে দোকানে দোকানে। 'এই চপ্ [illegible] গরম গরম—' তেলেভাজাওয়ালা আবার হাঁক পাড়ল। 'ক্রিমিনাশিনী বটিকা, ছেলেমেয়েরা ঘুমের ঘোরে দাঁত কিড়মিড় করে' আমপ্লিফায়ারে বিজ্ঞাপন ঘোষিত হল। পায়ে পায়ে জল উঠে রাস্তাটা কাদায় ভরেছে। পা-জামা আর পাঞ্জাবিটার গায়ে কাদা ছিটকে ছিটকে লাগছে। চটির ভেতরটা জলকাদায় আঠার মত চট চট করছে, চলতে গোড়ালি পিছলে মাটিতে নেমে পড়ছে। পাঁঠাটার

অন্তিম আর্তস্বর উঠেই মিলিয়ে গেল। গোল হয়ে জমা মানুষের ব্যূহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে ছেলেটা ভয়ংকর রকম কাঁদতে কাঁদতে রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করেছে। খোকা যাস নে, তেলেভাজা কিনে দেব—ভিড়ের মধ্যে থেকে লোকটার উঁচু গলার স্বর ভেসে এল। ছেলেটা ততক্ষণে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হ্যারিকেন, কুপী, মোমবাতি আর কার্বাইডের বিভিন্ন বর্ণের আলোর পরিমণ্ডল ফুটে উঠেছে অন্ধকারের মধ্যে। তেলেভাজাওয়ালার শরীরের অর্ধাংশ উনুনের আগুনে টকটকে লাল। অন্ধকারে আলোর পরিধির মধ্যে দেখা যাচ্ছে, ঘাম-তেলে চকচকে মুখ, চোখের সাদা অংশ। 'সন্ন্যাসী প্রভু বাতের তেল......' ঝাঁপিকল ঘোরার শব্দ। ইঁদারার মধ্যে জলপড়ার গুরু গম্ভীর শব্দ। দেখা যায় না, সাঁওতাল পুরুষের হাতে বাঁশ-বেহালায় একটা অচেনা সুর বাজছে। শিবেন দেখল, সে বাঁধের দিকে হাটের শেষে এসে উপস্থিত হয়েছে।

'বলো হরি, হরি বো-ও-ল—'

শব্দটা এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিবেন সচকিত হয়ে শব্দানুসরণ করে বাঁধের দিকে তাকাল। চড়াইয়ের শীর্ষে, অন্ধকারে, আলো-পিছে চারটে স্পষ্ট অবয়ব ফুটে উঠেছে। মাথার ওপর তারাভরা নির্মল আকাশ। চারমূর্তির ঠিক পেছনে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত খানিকটা উজ্জ্বল গাঢ় সাদা মেঘ। চড়াইয়ের শীর্ষে চারমূর্তি যেন থমকে দাঁড়াল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর কাঁধের ভার নিয়ে পা বাড়াল উতরাইয়ের বুকে। হাটের দিকে—।

'বলো হরি, হরি বো-ও-ল'

উতরাইয়ের শেষে নেমে হাঁকটা আরও নিকট, আরও গম্ভীর। শিবেনের সহসা মনে হল, হাটের সমস্ত শব্দ, সব কলকোলাহল যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে। একটা প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা নেমেছে সারা হাটটা জুড়ে। শিবেন ফিরে তাকাল। হাটের মানুষ কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছে রাস্তার দু-ধারে। তিনটে ভিড় [illegible] মিশেছে রাস্তার দু-ধারের ভিড়ের সঙ্গে। মাঝখানে রাস্তাটা ফাঁকা, নীল আকাশের উজ্জ্বলতার প্রতিভাসে ঝকঝক করছে। শিবেনের মনে হল, যেন এখনই একটা শোভাযাত্রা যাবে—রাস্তাটা যেন তারই প্রস্তুতি। হঠাৎ দ্রুত একটা চিন্তা শিবেনের সমস্ত স্নায়ুকে নাড়া দিয়ে গেল। ভয়ের মুহূর্তে শিবেন একটা চারকোণের টুকরো চেপে ধরল। পেছন থেকে চারজোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

'বলো, হরি-ই-ই-'

হাটের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছে চারজোড়া পা। এখন ফাঁকা রাস্তাটার বুকে, মাঝখানে শিবেন একা। দু-পাশে কাতার দেওয়া মুখের সার। শিবেনের দেখতে যেন কোন অসুবিধা হচ্ছে না—কেননা, শোভাযাত্রাটা যেন চোখধাঁধানো আলোর উজ্জ্বলতা নিয়ে এগিয়ে আসছে। সে-আলো অস্ত্রোপচারের টেবিলের ওপর ছায়াহীন আলোর মত—শিবেন দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণধার ছুরির মত করে কাতার দেওয়া মুখগুলো চিরছে, চিরে দেখছে।—ত্রাস, শঙ্কা, বিপন্নতা—কোনো কিছুই তার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারছে না। দু-পাশে মুখের সার। শিবেন রাস্তার বুকের ওপর হেঁটে চলেছে একা—তীব্র, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রতিটি মুখের ওপর ফেলতে ফেলতে। সকলের রুদ্ধশ্বাস দৃষ্টি শোভাযাত্রাটার দিকে স্থির নিবদ্ধ। শিবেন হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মুখের সারের পুরোভাগে একটা পরিচিত মুখ—[illegible], সেই লোকটা—ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে, লোকটা যেন অস্ফুটে কি বলছে, [illegible] পাড় বিস্ফুত দেখাচ্ছে সমস্ত মুখ, অস্বাভাবিক [illegible] দু-চোখের দৃষ্টি। [illegible] শিবেন পেছন [illegible]। দেখল, চারিদিক একটা [illegible] আকার নিয়ে কখন সাদা মেঘটা সমস্ত আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। কাঁধের ওপর [illegible] বয়ে চারজোড়া পা, [illegible] এগিয়ে আসছে। [illegible]

এ সময় একটা মৃদু, চাপা শব্দ হচ্ছিল—শব্দটা যেন অনেক উঁচু দিয়ে, মেঘের মধ্যে শরীর লুকিয়ে যাওয়া একটা এরোপ্লেনের শব্দের মত। মেঘ, মৃতদেহ, চারজোড়া পায়ের অমোঘ গতির দিকে তাকিয়ে শিবেনের সমস্ত শরীর হঠাৎ কেঁপে উঠল। দারুণ ত্রাসে শিবেনের মনে হল, এই মেঘ, এই মৃত্যুকে আমি পূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি—আমার সত্তা, আমার আত্মা, আমার চেতনার সঙ্গে এই মেঘ, এই মৃত্যুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। শিবেন অসহায়ের মত সামনে তাকাল, পালাবে! অতিকায় ব্যাঙের ছাতার মত মেঘটা আরও বিশাল হচ্ছে—হাটের ওপর সমস্ত আকাশ গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে।

'.....হরি বো-ও-ল'

হুংকারের মত শব্দটা বাজল-যেন ঠিক পেছনেই। ফিরে সামনে তাকাতে শিবেনের দৃষ্টি গাছতলায় চারাগাছের ঝোপটায় আটকে গেল—মেয়েটা একা দাঁড়িয়ে আছে। গাছের ডালের সঙ্গে ঝোলান হ্যারিকেনটা জ্বলছে। শিবেন ভাবল, এখনও কি আকাশ জুড়ে এই মেঘসজ্জা মেয়েটার চোখে পড়ে নি!—মৃত্যুর শোভাযাত্রার এই হুংকার মেয়েটার চেতনায় গিয়ে পৌঁছয় নি। মেয়েটা বলেছিল, সন্ধিলগ্নে জবা নীল হয়ে ফুটবে। শিবেন বিশ্বাস করে নি। আর বিশ্বাস করে নি বলেই মেয়েটার দু চোখের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। শিবেনের মনে হল, তার পাঁজরের তলায়, অজ্ঞাতে, বহুকাল ধরে একটা কান্না বিন্দু বিন্দু করে জমতে জমতে বরফের মত হয়েছিল—এখন সেটা গলতে শুরু করেছে। গলতে শুরু করে শরীরের সমস্ত শিরা, উপশিরা, ধমনী বেয়ে হৃদপিণ্ডে এসে জমছে। সে দারুণ চাপে তার হৃদপিণ্ড বুঝিবা ফেটে যাবে। শিবেনের মনে হল, চিৎকার করে বলে, 'আমি অবিশ্বাসী নই—।' কিন্তু চারাগাছের ঝোপটার দিকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে যেতে যেতে শিবেন অনুভব করল, তার শরীরের সমস্ত পেশী, স্নায়ু অস্বাভাবিক রকম দৃঢ় হয়ে উঠেছে—সে দৃঢ়তা এখন যে কোনো আঘাতকে প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত। পেছনে জ্বলন্ত হ্যারিকেন, শিবেনের ছায়া পড়ল মেয়েটার ওপর। মেয়েটা মুখ তুলে তাকাল।—দেখল। তারপর ঝুঁকে পড়ল চারাগাছের ঝোপের মধ্যে।—এখন মেয়েটা নীলজবার চারা খুঁজতে ব্যস্ত।

'বলো হরি, হরি বো-ও-ও-ল।'

ঠিক পেছনেই হুংকার উঠল আবার। শিবেন আরও দু-পা এগিয়ে গেল। শিবেনের দুহাত আরও দীর্ঘ, আরও সর্বনাশা হয়ে ছুঁয়ে ফেলল মেয়েটার সমস্ত শরীর।—অবসাদ, ক্লান্তি, আচ্ছন্নতার মধ্য এক সময় স্পষ্টতই শিবেন অনুভব করল, স্কেচবুকটা কখন তার হাত থেকে খসে পড়ে গেছে।

শিবেন গ্রাহ্য করল না।

মুখ পর্যন্ত তাদের এই শাখা-ব্যবসায় লিপ্ত থাকতো—অর্থাৎ দুপুরের পর থেকে ঘণ্টা দুই-তিনের জন্য পুরানো বইয়ের মেলা বসতো তখনকার দিনের হ্যারিসন রোডের কোল ঘেঁষে।

বর্তমানকালেও এই পুরানো বই-ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই ধর্মে মুসলমান। আমরা যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তাম, সময় ছিলো গত দশকের প্রথম দিকটা, তখন এদের মধ্যের সবচেয়ে পুরানো যে ব্যবসায়ী তাকে খুঁজে বের করেছিলাম। অনেকেই দেখেছি, বিশ পঁচিশ বছর ধরে ব্যবসা করে চলেছে। বাপদাদা যে-ব্যবসা চালু করেছিলো ছোট ভাই এখন অনেক সময় তাদের অবর্তমানে এই ব্যবসা দেখছে। এই ব্যবসার প্রতি মমতা এদের প্রায় জাত-ব্যবসার তুল্য। অনেককে শুধিয়ে দেখেছি—এদের কারুর কারুর বাড়ি সুদূর বিহারে, কারুর বা মজঃফরপুরে, কারুর বা দ্বারভাঙা। অতো দূর অঞ্চল থেকে কিভাবে এই ব্যবসায় এরা নেমে এলো সে ভারি আশ্চর্যের কথা। অনেকের পূর্বপুরুষ আমাদের জন কোম্পানীর খানসামা ছিলো। তাদের উত্তরাধিকার তর্কের প্রশ্রয় পায় না, কিন্তু বাকি যারা আজ বিশ বছরের ব্যবসায়ী তারা এসে তাদের দেশের গ্রামের পল্লীর ভাই-বাদারের দপ্তরীখানায় ভিড় করেছিলো নিশ্চয়। সেই দপ্তরীখানা থেকে কিছু মলাটহারা বই নিয়ে তারা বিশ বছর আগে প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিঙে বই সাজাতে বসে গেছে। আজো এই দপ্তরীখানাই পুরাতন এবং নতুন অধিকাংশ বইয়ের ব্যাংক। এছাড়া ছোটখাটো যেসব বইয়ের দোকান, লাইব্রেরী প্রভৃতি উঠে যায় তার সমস্ত বইপত্র এখানে এসে ভিড় করে। দপ্তরীখানাগুলো এই পুরানো বইপত্রের সর্ববৃহৎ সোর্স।

কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলেই এই পুরানো বইয়ের দোকান ছড়িয়ে আছে—তার মধ্যে খিদিরপুরে জাহাজী লোকেদের জন্যে বই-পত্রের কটা দোকানে—বিশেষত ইংরেজী বই থাকে, আর অরুচিকর কিছু কিছু প্যাম্ফলেট। ফ্রি স্কুল স্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলের দোকানগুলো ভরা থাকে নানান পত্রিকা আর সস্তা ফটোগ্রাফি অ্যানুয়েলে। এসব দোকানে বাংলা বই পাওয়া যায় না। নিউ মার্কেটে কয়েকটি দোকানে পুরানো আর নতুন বই লাইব্রেরির মতো টাকা জমা রেখে পড়ার জন্য পাওয়া যায়। আমাদের কলেজে পড়ার সময় আমরা এইভাবে অনেক বিচিত্র বই হাতে পেয়েছিলাম—চাঁদা খুবই সামান্য। নতুন বই হলে তাকে মলাট দিয়ে যত্নে রাখা হতো, বইয়ের কোণ ছিঁড়ে গেলে সে বইয়ের জন্যে ড্যামেজ দিতে হতো ক্ষতি-পূরণ। সে রকম কোনো ব্যবস্থা আমরা কলেজ স্ট্রীটে করতে পারিনি।

শুনেছি দিল্লিতে বছর খানেক হলো ফুটপাতে বই এসে পড়েছে। করলবাগের মোড় থেকে চেস্টার বোলজকে উপহার দেওয়া একটি বই পাওয়া গেলো। ঢাকা শহরে বাংলা বাজার ফুটপাতে সারাদিন ঢেলে বই বিক্রি হয়, জিন্না অ্যাভিনিউ আর নবাবপুর রোডে কেবলমাত্র সন্ধ্যার সময় এই বইয়ের বাজার বসে। চট্টগ্রাম পোস্ট অফিস রোড আর স্টেশন রোডে আমাদের কলকাতার খিদির-পুরের মতোই জাহাজী লোকদের জন্যে বই বিক্রি চলে। ঢাকাতে শুনেছি, এইসব ফুটপাথের ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট ধনী—অনেকে পাকা দোকানে বসবার উপযুক্ত—কিন্তু তাদের শুধিয়ে দেখা গেছে, যেহেতু তাদের ভাগ্য পথ থেকেই গড়া, তারা পথ থেকে ঘরে উঠতে ভয় পায়। এই মানসিকতা আমাদের কলেজ স্ট্রীটের কোনো ব্যবসায়ীর আছে কিনা, জানি না, তবে তাদেরকে শুধিয়ে দেখেছি, এই বইয়ের ব্যবসা ছেড়ে অন্য কোনো ব্যবসায় তারা যেতে ইচ্ছুক নয়। অনেকেই পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে—অনেকেরই খাদ্যসংস্থান হওয়া শক্ত—তবু এই পুরানো বইয়ের ব্যবসা এক ধরনের নেশা। যেমন নেশায় কলকাতার অনেক মানুষের সংগে এই দোকানদারদের অনেকেই ভুগছে। বিশেষত এখন কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় গেলে দু-রকম ব্যবসায়ী দেখা যায়—যারা প্রেসিডেন্সীর রেলিঙ সাজিয়ে বসেছে, আর যারা সিজন্যাল ও অতি নতুন স্কুল বই আর কলেজ বইয়ের দোকানী। তাদের অনেকেই মাসে ৮০—৯০ টাকার মতো ব্যবসা করে। কিন্তু স্কুলের এক প্রান্ত থেকে সংস্কৃত কলেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মোট জনা পনেরো দোকান তাদের। প্রেসিডেন্সীর রেলিঙ এদেরকে বলে 'কমার্শিয়ালস্'। প্রেসিডেন্সীর রেলিঙের ঐতিহ্য এদের নেই বটে, কিন্তু এদের মাধ্যমে বাঙালী নিম্ন-মধ্যবিত্তের উপকার অস্বীকার করা যায় না। বাংলা দেশে নতুন পুরানো লেখকদের মধ্যে এই প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিঙ নিয়ে একটি মজার পরীক্ষা আছে। যে লেখকের বই রেলিঙে এসে পৌঁছায়নি—তার লেখক হিসাবে স্বীকৃতিই মেলেনি—এমন কথাও বলা হয়। অন্যদিকে এমন অনেক অদ্ভুত লেখকপুঙ্গ আছেন যাঁদের বই কেবলমাত্র যেন রেলিঙে আসার জন্যই ছাপানো হয়েছিলো। বটতলার অনেক রোমাঞ্চকর লেখককে দেখেছি যাঁরা টাকার বদলে প্রকাশকের কাছ হতে মাসে মাসে যে বিশ-পঁচিশখানা বই যোগাড় করতে পারেন, তা এদের হাতে সঁপে দিয়ে কিছু-কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক তুলে নেন তাঁদের পরিশ্রমের। এছাড়া দুপুরে স্কুলের ছেলের দল সিনেমার পয়সা খুঁজে পায় শেষ পর্যন্ত এখান থেকে। আমি কলকাতার অনেক প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীর বই এখানে বিক্রি হতে দেখেছি। 'কালার ডিকশিনারি' খুঁজছিলেন আমার এক বন্ধু কিছুদিন ধরে। এক দোকানীর সংগে তাঁর যে বিস্ময়কর কথাবার্তা হলো তাতে আমি প্রকৃত অবাক বোধ করলাম। দোকানী তাঁকে শুধোলেন অবশেষে একদিন যে, তিনি যদি বলতে পারেন বইটি অমুক লাইব্রেরীতে আছে কিনা, তাহলে দোকানী পরের সপ্তাহে তাঁকে ঐটি যোগাড় করে দেবেন। সেদিন আমরা সবান্ধব পিছিয়ে এসেছিলাম অবশ্যই। কিন্তু লাইব্রেরীর বই আর দোকানদের মধ্যবর্তী তস্করের হাতের দুঃসাহসিক ব্যবহারের কথা ভেবে পরে বহুবারই পুরানো বইয়ের দোকান থেকে পিছিয়ে এসেছি। কয়েক বছর আগে ডঃ মনোমোহন ঘোষের সই করা একটি গোল্ডেন ট্রেজারি দেখেছিলাম—এছাড়া বিভিন্ন লেখকের উপহার দেওয়া বইয়ের সংখ্যা এখানে অসংখ্য। আমার এক বন্ধু কেবলমাত্র 'ফার্স্ট এডিশন' সংগ্রহ করেন—ওইটিই তাঁর নেশা। তাঁর বাড়িতে আমি যে দুষ্প্রাপ্য বইপত্রের সংগ্রহ দেখেছি তা আমি অন্য কোথাও দেখিনি আজ পর্যন্ত।

সকাল থেকে সন্ধ্যা এই পাড়ায় বাঘের পায়ের মতো সতর্ক পা ফেলে একদল লোক অনবরত ঘোরাফেরা করে। সন্ধ্যা থেকে কারবাইডে গ্যাস জ্বলে দোকানে দোকানে, প্রেসিডেন্সী কম্পাউন্ড থেকে বকুল ঝরে পড়ে ফুটপাথের উপর—রাত নটা পর্যন্ত ভিড় থাকে—তারপরে ক্রমশ দোকান গোটাতে থাকে দোকানী—প্রতিদিন সাজানো, প্রতি-দিনই ভেঙে ফেলা—তাদের দিনের ভাগ্য দিনের ভিতরেই নির্বাপিত হয়। একদিন এই এলাকায় ঘুরে এক অদ্ভুত পাগলের দেখা পেয়েছি। এই বিস্বাংসাঙ্খী পাগল অনেকের কাছ থেকে পয়সা ভিক্ষা করে বই কেনে—বই কিনে প্রতিটি পাতা পড়া শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মুচড়ে গোল করে পকেটে রাখে, একসময় গোলদিঘীর জলে সেইসব পাতার গোল্লা ভাসিয়ে দিয়ে আর মুখে বলে 'ঢুকে গেলো, ঢুকে গেলো!' তার ধারণা সেই বইয়ের সে-ই শেষ পাঠক।

ভারতের অর্থনীতি

সরকারী ব্যবস্থায় খাদ্য বণ্টন

গত কয়েক মাস খাদ্যশস্য, বিশেষ করে চালের দাম খুব দ্রুত বেড়েছে। ২৮ মার্চ তারিখে চালের মূল্যসূচক ১২২·২ ছিল; শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে মূল্যসূচক ১৬ই মে ১৩১·৩-এ পৌঁছেছে। চালের উৎপাদন সরকারী হিসাব অনুসারে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টন হওয়া সত্ত্বেও তার দাম ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে।

বর্তমানে কেরালার পর খাদ্যশস্যে সবচেয়ে ঘাটতি রাজ্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। এই মরসুমে ওড়িষ্যা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে চাল পশ্চিম বাংলায় আসেনি—ওড়িষ্যার চাষী ও ব্যবসায়ীরা আরো চড়া দরের আশায় শস্য মজুত করে রেখেছে। নতুন ফসল বাজারে এলে সাধারণত মূল্যের যে ঋতুগত হ্রাস ঘটে থাকে তা এ বছর লক্ষ করা যাচ্ছে না।

খাদ্যশস্যের মূল্য ছাড়াও অন্যান্য খাদ্য-সামগ্রী অর্থাৎ খাবার তেল, চিনি, মাছ প্রভৃতির দাম বেড়েছে। কাপড়ের দামও ক্রমবর্ধমান। চাহিদার উত্তরোত্তর সম্প্রসারণের অনুপাতে যোগান বৃদ্ধি যথেষ্ট না হওয়ায় যে বৈষম্য দেখা দিয়েছে তা জটিল ও দুরূহ হয়েছে ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপে। কলকাতার মতো বড়ো শহরে অত্যধিক মূল্যস্ফীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়েছে বলে খাদ্যশস্য ব্যবসায় সরকারের হাতে নিয়ে আসা এবং খুচরো বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

সরকারী ব্যবস্থায় খাদ্যশস্য ব্যবসায় কার্যকর করতে হলে যে দক্ষ সংগঠন ও শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন তা বর্তমানে একরকম নেই বললেই চলে। তা ছাড়া, কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে, এমন কি একই গভর্নমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের ভেতরে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব (উদাহরণস্বরূপ, খাদ্যের সর্বোচ্চ মূল্য বলবৎ করা হয়েছে মাত্র কয়েকটি রাজ্যে) দুর্লক্ষ্য নয়। তার চেয়ে বেশী, খাদ্যশস্যের সমস্ত লেনদেন হাতে নেবার মত সংগতি ও আয়োজন বর্তমানে সরকারের নেই।

১৯৬৩-র শেষে সরকারী ব্যবস্থায় সুলভ মূল্যের বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৬০,০০০; স্পষ্টত দেশের সমগ্র খাদ্য ব্যবসায়ের খুব সামান্য অংশই ঐ দোকান-গুলির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে চালের মোট উৎপাদন যেখানে ৩২০ লক্ষ টন ছিল সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ৪৬৪,০০০ টন এবং রাজ্য সরকারসমূহ প্রায় ১৪২,০০০ টন চাল কেনে; অর্থাৎ সরকার কর্তৃক সংগৃহীত চালের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০৬,০০০ টন। সেই রকম, ১৯৬৩ সালে যেখানে দেশে মোট প্রায় ৮ কোটি ৩২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাওয়া গিয়েছিল (আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও আমদানি* থেকে), কেন্দ্রীয় সরকারের শস্য ভাণ্ডার থেকে সেখানে মাত্র ৪৯ লক্ষ টন শস্য বাজারে ছাড়া হয়েছে। সরকারী বণ্টন ব্যবস্থায় খাদ্য-শস্যের অন্তর্বাণিজ্য কত অল্প পরিমাণের হয়ে থাকে তা এর থেকে বোঝা যাবে। স্পষ্টত, বাজারের অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে সরকারকে সুলভ মূল্যের বিক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা বেশ কয়গুণ বাড়িয়ে দিতে হবে। সেই সঙ্গে খাদ্যশস্য মজুত রাখার ব্যবস্থারও সম্প্রসারণ দরকার। ১৯৬৩-র শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় ১৭ লক্ষ টন শস্য রাখার মত গুদাম ছিল। ১২ লক্ষ টন শস্য মজুত রাখবার উপযোগী ভাড়া-করা গুদাম-ঘর এবং ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য রাখার জন্য নতুন গুদাম তৈরি করার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা ধরলে কেন্দ্রীয় সরকারের শস্য জমা রাখবার মোট ক্ষমতা দাঁড়াবে ৪৫ লক্ষ টনে। রাজ্য সরকার-গুলির শস্য মজুত রাখার ব্যবস্থাও যথেষ্ট নয়। উপরন্তু, ছোট বড়োর উৎপাদন কেন্দ্র থেকে আরম্ভ করে আধুনিক রীতির কল পর্যন্ত আমাদের দেশে ৪৮,০০০ চালের কল আছে। সেগুলোর জাতীয়করণ করতে হলে কল পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ১,৫০,০০০ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীর দরকার। এই সব বিবিধ অসুবিধা ও সমস্যা থেকে এটা স্পষ্ট যে, খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের বহরের তুলনায় সরকারের বর্তমান সংগঠন ব্যবস্থা নিতান্ত সীমাবদ্ধ। খাদ্য বণ্টনের বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হলে শাসন ও সংগঠন ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও শক্তিবৃদ্ধি অপরিহার্য।

এমনতর পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষে যা সম্ভব তা হচ্ছে স্বাভাবিক বণ্টন ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে সরকারী বণ্টনের ব্যবস্থা করা। স্বাভাবিক বাণিজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনা বিশেষত বাজারের অনভিপ্রেত বা অস্বাভাবিক অবস্থা সংশোধন করবার উদ্দেশ্যে সরকারী শস্য ভাণ্ডার থেকে খাদ্য বিক্রয় বা ক্রয় করার প্রয়োজন হবে। সমবায় সমিতিগুলির সহযোগিতায় সরকারী ব্যবস্থা যাতে উৎপাদন ও ভোগ উভয় ব্যাপারেই মধ্যবর্তী ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণ বা খর্ব করতে পারে সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। সেই সঙ্গে দেখা উচিত যে ঘাটতি অঞ্চলগুলিতে নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে গিয়ে সরকারী বিধিনিষেধ যেন খাদ্য-শস্যের স্বাভাবিক লেনদেন ব্যাহত না করে।

চাল, গম, চিনি, গুড় ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে হলে যেমন আভ্যন্তরীণ যোগান বৃদ্ধি, সরকারের মজুত শস্য থেকে বাজারে আরো সরবরাহ এবং বেসরকারী ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ না করে উপায় নেই, তেমনই জনসমষ্টির দুর্বল অংশের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সুলভ মূল্যের বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে মোটামুটি একরকম রেশন-ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে যাতে খাদ্যশস্যের যথাযথ বণ্টন অব্যাহত থাকে।

মূল্য যেখানে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সেখানে কি উৎপাদন কি বণ্টন ব্যবস্থা, কোনোটাই স্বাভাবিক অবস্থার বাজারের মত সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত মূল্যের আগের মত দ্রুত পরিবর্তন সম্ভব নয়। নিয়ন্ত্রণ যদি মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও বণ্টনকার্য সুষ্ঠু-ভাবে সম্পন্ন করতে কিছুটা সাহায্য করে, তাহলে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করতে যত অসুবিধাই হোক না কেন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়। যোগানের সঙ্কট বা অনটন যদি নিয়ন্ত্রণের কারণ হয় তবে অনটন দূর না হওয়া পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত বণ্টন বলবৎ রাখা উচিত।

কৃষি দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি নিবারণ করলে কৃষকরা উৎপাদন বাড়াতে নিরুৎসাহ হবে এরকম আশঙ্কা অমূলক (এখানে অবশ্য দেখা উচিত যাতে অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের সঙ্গে কৃষিদ্রব্যের দামের একটা সামঞ্জস্য থাকে)। ফসল উৎপাদন বাড়াবার জন্য চাষী-দের মূল্যবৃদ্ধি ছাড়া অন্যভাবে উৎসাহ দেওয়া সম্ভব। তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য ও স্থিতিশীল মূল্য সংরক্ষণ এবং কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন, যেমন জলসেচ, জলনিষ্কাশন, মৃত্তিকা সংরক্ষণের বন্দোবস্ত দ্বারা কৃষিকার্যের আনুষঙ্গিক ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কমিয়ে আনা যায়। (সুলভে উন্নত ধরনের বীজ ও সার বণ্টনও তাদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে)। সেই রকম, কৃষকদের ভেতর কারখানাজাত সামগ্রীর চাহিদা-সৃষ্টি ও সেইসব দ্রব্য যাতে উচিত দামে পাওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করে দিলে তারা উৎপাদন বাড়াতে এবং বাজারে ফসল বিক্রয় করতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

---

* ১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৩-৬৪ সালে আমাদের দেশে যথাক্রমে ৩৯ ও ৪৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম বলিয়াছেন যে, ব্যবসায়ীদের মুনাফা লুটিবার মনোভাবের পরিবর্তন না হইলে সরকার "ড্রাস্টিক সার্জারি" অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। শ্যামলাল বলে—"দেহে

গ্যাংগ্রিন হলে বড় রকমের শল্য চিকিৎসার নিশ্চয়ই প্রয়োজন, কিন্তু দেখে আসছি চিরা-চরিত তুকতাক—ঝাড়ফুঁক ছাড়া আর কোন কিছুই করা হয় না।"

আমেরিকা ভারতবর্ষকে দীর্ঘ মেয়াদী ও বিপুল সামরিক সাহায্যদানের প্রতি-শ্রুতি দিয়াছেন শুনিয়া হিলাল-ই-পাকিস্তান (সাধারণে 'ভুট্টো' নামে খ্যাত)

সিয়াটো এবং সেণ্টো সংস্থা ত্যাগ করিবার প্রশ্ন পাকিস্তান বিবেচনা করিয়া দেখিতেছে বলিয়া বিবৃতি দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"ভাগ্যিস আমেরিকায় ভূমিকম্প হয় না, হলে ঐ এক হুমকিতেই স্কাইস্ক্র্যাপারগুলি কড়কড় কড়াং করে ধসে পড়ত!!"

নয়াদিল্লিতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি রোধ সম্পর্কে উপায় অবলম্বনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন চলিতেছে।—"প্রথম অধিবেশন হয়ে গেল বুধবার ১০ই আষাঢ়, তখনো অম্বুবাচীর নিবৃত্তি হয়নি, তখনো স্বপাক, পরপাক নিষিদ্ধ, তার ওপর ভরা পূর্ণিমা, তার জন্যেও ব্রতোপবাস। কোনটাই খাদ্য নিয়ে আলোচনার পক্ষে প্রশস্ত নয়, সুতরাং......" বলেন খুড়ো॥

ট্রামে বাসে

এক সংবাদে প্রকাশ ভারত পাকিস্তান হইতে এক লক্ষ টন চাউল খরিদ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"পুরনো চাল নয় কিনা তাই ভাতে বাড়ার সম্ভাবনা নেই, যা হোক সরকার চাল কেনার সংগে একখানা পাক-প্রণালীও যেন ক্রয় করেন।"

তণ্ডুলের সুরাহা কিছু পরিমাণ হইলেও কলিকাতার বাজারে তৈল-সমস্যার কোন সমাধান এখনো হয় নাই। —"হওয়ার কোন আশাও নেই; তৈলাধারে পাত্র, না পাত্রাধারে তৈল এ তর্কের মীমাংসাও তো আজ পর্যন্ত হয়নি বলেই জানি"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

তেল প্রসংগে এক সংবাদে শুনিলাম পশ্চিমবংগের মন্ত্রী মহাশয়দের অনেকের ভাঁড়ারই নাকি তৈলশূন্য। শ্যাম-লাল বলিল—"আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মতে তৈলের উপকারিতা হলো—মর্দনাৎ, ন তু ভক্ষণাৎ। ভক্ষণের নিমিত্ত তৈলের অভাব হলেও মর্দনের তৈলের ব্যাপারে সচিবালয় ঘাটতি অঞ্চল নয় বলেই ত জানতাম!!"

তেলের অনটনের জন্য দায়ী কে?—এই প্রশ্ন প্রসংগে বলা হইতেছে, খুচরা দোকানীর মতে তেলকল, আর তেল কলের মতে সরিষার ব্যাপারী। বিশুখুড়ো বলিলেন—"ছোটবেলায় ছড়ায় পড়েছিলাম, বউ ভাত দেয় না, কলা গাছ পাত দেয় না বলে; কলা গাছ বলে সে পাত দেয় না বৃষ্টি হয় না বলে; বৃষ্টি বলে—ব্যাং কেন ডাকে না; ব্যাং বলে সাপে কেন খায়? এই প্রশ্নের উত্তরে সাপের সাফ জবাব—খাবার জিনিস খাব না? গড়গড়িয়ে যাবো না?' আমরাও বলি দায়ী কে এই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে না গিয়ে; সাপের মতো সাফ জবাব দিলেই তো তেলের টিন হাতে অত হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় না।"

বিজয়বাড়ার একটি মহল্লার নাম শুনিলাম কৃষ্ণলংকা। শ্যামলাল বলে—"হোক না কৃষ্ণ, তবু লংকা তো বটেই। সুতরাং হনুমানেরা লেজের আগুনে লংকা দগ্ধ করবে এ আর বিচিত্র কী। তবে এটাও ঠিক, হনুমানদের মুখপোড়া নাম ঘোচানো যে দায় হবে, সেটাও বিচিত্র নয়!!"

সরেজমিনে উপস্থিত হইয়া গ্রাম সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হওয়ার জন্য অন্তত তিন চার দিনের জন্য হইলেও গ্রামে গিয়া চাষীদের সঙ্গে বাস করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুরজী তাঁহার মন্ত্রীদের ও অফিসারদের নির্দেশ দিয়াছেন।—"কিন্তু এতে শহরাঞ্চলে কালচার্যাল অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য, বারোয়ারীতলায় উদ্বোধন, নানান সংবর্ধনা সভায় শোভাবর্ধন প্রভৃতির কাজ যে ব্যাহত হবে সে কথাটি লাল-বাহাদুরজী কি ভেবে দেখেছেন?"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিয়াছিলাম সুন্দরবন অঞ্চলে মাতলা ও বিদ্যা নদীতে একদিন পর্যাপ্ত ইলিশের আকস্মিক আবির্ভাব হয় এবং ফলে অবিশ্বাস্যরূপে সেই ইলিশ ছয় হইতে দশ পয়সা কিলো দরে বিক্রয় হয় এবং অবিক্রীত প্রচুর ইলিশ মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হয়। এই সংবাদও শুনিয়াছিলাম যে, ইলিশের সংবাদ পাইয়া পশ্চিমবংগ সরকারের মৎস্য দপ্তর ছয় ছয়টি লঞ্চ লইয়া মাতলা অভিমুখে রওয়ানা হইয়া যান। পরবর্তী

সংবাদে শুনিলাম প্রত্যক্ষদর্শীরা নাকি মাতলাতে একটিও সরকারী লঞ্চ দেখিতে পান নাই।—"কিন্তু বন্দর বন্দর বলে মাতলার দিকে লঞ্চ ভাসাবার আগে, ইলিশের আকস্মিক আবির্ভাবের হেতু, ক-বছর পরে পরে ইলিশের এবম্বিধ আগমন হয়, তৎসংক্রান্ত নথিপত্র না দেখে তো আর ইলিশ বলে নৃত্যে গেলে সরকারী দপ্তরের চলে না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

অসংখ্য পথঘাট সম্পর্কে নেহরুজীর নাম যুক্ত করিবার বিচিত্র পরামর্শের পর, 'নেহরু দিঘী' নামকরণ করিয়া প্রতি চারটি গ্রামে এক একটি দিঘী খনন করার কথাও শুনিলাম। পরস্পরের সংগে দেখা হইলে নমস্কারের বদলে 'জয় নেহরু' বলিয়া সম্ভাষণের পরামর্শও শুনিয়াছি। চৌরংগীর একাংশকে (দেবো কিপিং, করব না বঞ্চিত) নেহরু রোড নাম দিয়াছেন পৌরপিতারা। জনৈক পত্র প্রেরক কলিকাতাকে 'নেহরু শহর' নামাঙ্কিত করার প্রস্তাবও করিয়াছেন। আমাদের দপ্তরে প্রাপ্ত একটি পত্রের লেখক (অবশ্য ব্যঙ্গচ্ছলে) গোটা ভারতকে "নেহরুবর্ষ" নামকরণ করার প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। টীকা নিষ্প্রয়োজন।

বেগম মেরী বিশ্বাস

বিমল মিত্র

॥ ২৬ ॥

চেহেল-সতুনের ভেতরেও বোধহয় তখন তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিল নানী-বেগমের হুকুম শুনে। লুৎফুন্নিসার ঘরে গিয়ে নানী-বেগম বলেছিল—আমি মতিঝিলে যাচ্ছি বহু—

এমন সাধারণত হয় না। নানী-বেগমকে যারা জানে তারা শুধু তাকে এতদিন কোরাণ হাতে নিয়ে থাকতেই দেখেছে।

—আমি গিয়ে মীর্জাকে জিজ্ঞেস করবো এই রানীবিবিকে কে এখানে আনতে হুকুম দিয়েছে, মীর্জা নিজে না মেহেদী নেসার—

মরালী চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সমস্ত চেহেল-সতুন আজ তাকে চিনে ফেলেছে। এতদিন এখানে এসেছে, কিন্তু কেবল নিজের ঘরের মধ্যেই কাটিয়েছে সারা দিনরাত। তাকে কেউ চিনতো না, কেউ জানতো না, এক গুলসন ছাড়া। মরালী ভেবেছিল এমনি করেই চারটে দেয়ালের মধ্যে বুঝি তার জীবন কেটে যাবে। সবাই তাকে মরিয়ম বেগম বলেই জানবে। তারপর একদিন সবার অগোচরে চেহেল-সতুনের বাইরে খোশ-বাগের কবরখানায় চারজন লোক তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে কবর দিয়ে দেবে। কিন্তু তা হলো না। সব জানাজানি হয়ে গেল। জুবেদার ওই অবস্থা দেখে আর চেপে রাখতে পারেনি সে নিজেকে। একেবারে সকলের মুখোমুখি হয়ে নিজের পরিচয় সকলকে জানিয়ে দিয়েছে।

নানী-বেগম প্রথমে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিল—তোমার কিছু ডর নেহি বেটি, তুমি আমার কাছে কিছু চেপে রেখো না, বলো, তোমার কী হয়েছে?

মরালী বলেছিল—আমি অনেক দিন ধরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম মা, আমার অনেক কথা বলবার ছিল—কিন্তু কেউ আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে দিত না—

—কে দেখা করতে দিত না?

—ওই আপনার খোজা নজর মহম্মদরা। একদিন গুলসন বেগমের সঙ্গে আপনার কাছে লুকিয়ে লুকিয়ে আসছিলাম, তারপর ভয় পেয়ে ভুল-ভুলাইয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম—

—তারপর?

—তারপর সেদিন রাত্তিরে লুৎফুন্নিসা বেগমসাহেবার ঘরে ভুল করে ঢুকে পড়েছিলাম, ভেবেছিলাম ওইটেই বুঝি গুলসন বেগমের ঘর। সেখান থেকে নিজের ঘরে গিয়ে দেখি মেহেদী নেসার সাহেব আমার ঘরে বসে আছে, আর তারপরই নজর মহম্মদ আপনাকে গিয়ে খবর দিতেই আপনি এলেন, আপনি এসে আমাকে মেহেদী নেসার সাহেবের হাত থেকে বাঁচালেন। সেদিন আপনি আমার আদর করলেন, আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম আমার নাম মরিয়ম বেগম। তখন আমি ভয়ে আপনাকে সত্যি কথা বলতে পারিনি মা—

—হাতিয়াগড় থেকে এখানে তোমায় কে আনলে?

মরালী এক দণ্ড চুপ করে ভেবে নিলে। তারপর বললে—এখান থেকে পরোয়ানা গিয়েছিল হাতিয়াগড়ের ছোটমশাই-এর নামে—

নানী-বেগম বললেন—সে আমি জানি, তোমার বড় সতীন আমাকে চিঠি লিখেছিল—

—চিঠিতে কী লিখেছিল?

নানী বেগম বললেন—তুমি যা বললে মা, সে-ও ওই কথাই লিখেছিল, আমি মেহেদী নেসারকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম চিঠিটার কথা সত্যি কিনা,

—কী বললে মেহেদী নেসার সাহেব?

নানী বেগম বললে—ও-সব কথা তোমার শুনে দরকার নেই মা! এই মুর্শিদাবাদে কেউ সত্যি কথা বলে না, কাকে বিশ্বাস করবো? মীর্জা, আমার নাতি তারও সময় নেই আমার সঙ্গে কথা বলার, সেও নানান হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছে—তাকেই বা দোষ দিই কী করে, সবাই মিলে তাকে নাজেহাল করে দিচ্ছে—

কেন? মরালী উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলে—কেন মা? কে নাজেহাল করছে?

নানী বেগম বললে—সে তুমি বুঝবে না মা, না বোঝাই ভালো তোমাদের। আমি কিছু কিছু বুঝি, এক এক সময় আমিই তো ভাবতুম নবাবের বেগম হওয়ার চাইতে

গরীবের ঘরের বউ হওয়া এর চেয়ে অনেক ভাল! তা সে-সব কথা থাক, আমার সঙ্গে তুমি এক জায়গায় যাবে?

—নিশ্চয়ই যাবো। কোথায় মা?

—মতিঝিলে। মীর্জার কাছে!

নামটা শুনেই মরালী ভয় পেয়ে গিয়েছিল প্রথমে। নবাব! নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা! যার মহ্‌ফিলের আসরে গুলসন নাচতে গিয়েছিল। যেখানে গেলে ভাগ্য ফিরে যায় এক রাত্রের মধ্যে। যেখানে যেতে পারার জন্যে মজর মহম্মদকে ঘুষ দেয় বেগমরা। সেই মীর্জা মহম্মদ। মরালীর সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। সেই মতিঝিলে নানী বেগম-সাহেবা তাকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে!

—ভয় পেও না মা, ভয় কীসের? আমি তো তোমার সঙ্গে থাকবো! আর লোকে মীর্জার সম্বন্ধে নানান কথা বলে বটে, কিন্তু আমি তো মা আমার মীর্জাকে চিনি। এই এতটুকু বেলা থেকে মা, ওই নাতি আমার কাছে মানুষ হয়েছে। আমিনা, ওর মা তো দেখতোও না। শুধু কি এখানে, আমি যেখানে গিয়েছি সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি, ওর নানা যেদিন নবাবী পেয়েছিল সেইদিনই ও জন্মায়। ও আমার খুব পয়া
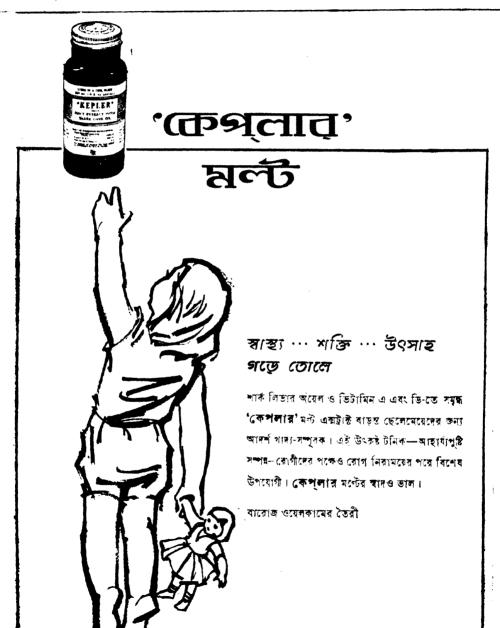
নাতি মা! ওর কত বুদ্ধি, ওর কত বিদ্যে, তা তোমরা কেউ জানো না। ওর ইয়ার বক্সীরা ওকে খারাপ পরামর্শ দিয়ে দিয়ে ওই রকম করে দিয়েছে, নইলে ও ভয় করবার মত ছেলেই নয়—তোমরা ওকে ভুল বুঝো না মা। আর তা ছাড়া আমি তো থাকছি সঙ্গে—

তারপর মরালীকে নিয়ে সোজা লুৎফুন্নিসার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল।

কদিন আগেই মরালী এই ঘরে একলা একলা এসেছিল। এই সেই নবাবের ঘর। মরালী আবার চেয়ে দেখলে চারদিকে। সেই বাঁদীটা আবার দরজা খুলে দিয়ে নানী বেগমকে কুর্নিশ করলে। কী চমৎকার দেখতে! তাকে দেখে একটু হাসলো লুৎফুন্নিসা বেগম। যেন আত্মীয়তা পাতিয়ে ফেলেছে একদিনেই।

নানী বেগম বললে—আমি যাচ্ছি আমার এই বৌটিকে নিয়ে মীর্জার কাছে—

লুৎফুন্নিসা বললে—কিন্তু কেন যাচ্ছ তুমি নানীজী! যদি এখন তাঁর মেজাজ খারাপ থাকে? যদি তোমার সঙ্গে দেখা না করে?

—আমার সঙ্গে দেখা করবে না মীর্জা? আমার মীর্জাকে আমি চিনি না?

লুৎফুন্নিসা বললে—না নানীজী, আমি শুনেছি তাঁর মেজাজ ভাল নেই, কলকাতা থেকে ফিরিঙ্গিদের ধরে নিয়ে এসেছে, তার দরবার হচ্ছে সেখানে—

—তা হলোই বা। তা বলে সে তার নানীর সঙ্গে দেখা করবে না?

—কিন্তু নানীজী, তুমি কী বলবে সেখানে গিয়ে?

—আমি বলবো, এই বান্দীবিবিকে হাতিয়াগড় থেকে কেন নিয়ে আসা হয়েছে, তার কৈফিয়ৎ চাইবো মীর্জার কাছে।

—কিন্তু নানীজী, এ কি এই প্রথম? এর আগেও তো কতবার এরকম হয়েছে। কত লেড়কী এখানে এসেছে, তার বেলায় তো তুমি কিছু বলোনি। তারাও তো এই বহেনজীর মত কষ্ট পেয়েছে।

—তাদের কথা আলাদা।

—কেন? আলাদা কেন? তারা কি মানুষ নয়? তাদেরও কি স্বামী, বাপ, মা কেউ নেই? তারা কি এখানে এসে কেঁদে কেঁদে রাত কাটায় নি? তুমি তাদের জন্যে কী করেছ?

নানী-বেগম কী যেন ভাবলে একবার। তারপর বললে—তুই যা বলেছিস সব সত্যি বটে, কিন্তু তখন তো আমি একলা ছিলাম না মা। তখন যে নানা-নবাব ছিলেন মাথার ওপর, তার কথার ওপর তো আমি কথা বলতে পারতাম না। এখন যত দিন যাচ্ছে, তত সে বাড়ছে—এর তো একটা বিহিত করা দরকার—

—দেখো, তুমি যদি পারো, আমি কিছু জানি না।

নানী-বেগম বললে—আমিনা কোথায় রে? আমিনাকে একবার বলে যাই—

বলে মরালীকে নিয়ে আবার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। তারপর চলতে চলতে অন্য এক মহলে চলে গেলেন। মরালীও সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল। চারদিকে চেয়ে চেয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিল মরালী। এও যেন একটা শহর। শহরের রাস্তার দুপাশে বাড়ি-ঘর-দোর। সামনে পেছনে যারা আসছে যাচ্ছে তারা নানী বেগমকে দেখে সবাই ভয়ে-ভক্তিতে নিচু হয়ে কুর্নিশ করছে। আর মরালীর মুখখানাকে দেখছে। মরিয়ম বেগমকে সবাই চিনতে পারছে। কাল যে কাণ্ড করে বসেছে মরালী তার পর তাকে চিনতে আর কারো বাকি নেই।

—আমিনা?

নানী-বেগম ঘরের মধ্যে ঢুকল। এই আমিনা বেগম! নবাব-বেগমদের অনেক কথা বাইরের লোক জানে। মরালীও জানতো। যেন সব স্বপ্নের জগৎ। হাতিয়াগড়ের মানুষরা এই আমিনা, ঘেসিটি, সবাইকার কাহিনী জানতো। হোসেনকুলী খাঁর কথা জানতো। নবাব আলীবর্দী খাঁর বড় আদরের মেয়ে এই আমিনা। মরালীর চোখ দুটো জুড়িয়ে গেল!

আমিনা বেগমও অনেকক্ষণ ধরে দেখলে মরালীকে। তারই পেটের ছেলে মীর্জা মহম্মদ এই মেয়েকে হাতিয়াগড় থেকে এখানে নিয়ে এসেছে।

—তুই যাবি আমার সঙ্গে?

আমিনা বেগম বললে—আমি যাবো না মা,

মিছিমিছি অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। তাকে তুমি চেনো না—

নানী-বেগম বললে—অবাক করলি তুই আমাকে, মীর্জাকে আমি চিনবো না তো তুই চিনবি? তাকে তুই মানুষ করেছিস না আমি করেছি?

আমিনা জ্বলে উঠলো—মানুষ করলেই বা, আমাকে কি মীর্জা মা বলে মানে করে? তা যদি করত তাহলে সেবারই আমার কথা শুনতো—

—কোনবার?

—কেন? আমি বারণ করিনি ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে? আমার কথা শুনেছে সে? সে তো তুমি জানো। আমি নিজে মতিঝিলে গিয়ে ওকে বললাম—তুমি হলে নবাব, বাংলার নবাব, তুমি কেন ওদের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে ছোট করবে? ওরা বেণের জাত, ওদের সঙ্গে লড়াই করলে ওদেরই সম্মান দেওয়া হবে! তা শুনেছে মীর্জা আমার কথা? আমাকে উত্তরে কী বললে জানো? আমি ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে আফিমের কারবার করি বলে নাকি আমি তাদের দিকে টেনে কথা বলছি—শোন কথা!

তারপর একটু থেমে বললে—তা কারবার করলেই আমার দোষ হয়ে গেল? আমার সঙ্গে তো তাদের কেবল টাকার সম্পর্ক! আমি আফিম বেচি সোরা বেচি তারা কেনে, আমি টাকা পেলেই সম্পর্ক চুকে গেল—

মরালীর মনে হলো যার মা এমন, তাকে কেমন দেখতে কে জানে। অথচ তাকে সবাই ভয় করে কেন? বাইরে থেকে যা কিছু সে শুনেছিল কিছুই তো সে রকম নয়।

—আমি যদি গিয়ে বলি এই বেগমকে এর বাড়ি পাঠিয়ে দাও তো আমাকেই হয়ত শাসাবে, বলবে আমি হয়ত কিছু টাকা নিয়েছি এর কাছ থেকে, নইলে এর জন্যে এত টেনে বলছি কেন? আর আমার কথা না-শুনে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কী লাভটা হলো? কত টাকা পেলে ও? কিছু তো টাকা পায়নি। টাকা পায়নি বলেই তো ফিরিঙ্গি সাহেব হলওয়েলকে ধরে নিয়ে এসেছে—যদি তাকে...

—কাকে ধরে নিয়ে এসেছে?

—তুমি শোনোনি কিছু? হলওয়েল সাহেবকে। এখানে মতিঝিলে হাত-কড়া দিয়ে বেঁধে এনে রাখছে-তাই করে অপমান করছে। ইয়ার-বক্সীরা বলেছে ওকে চাপ দিলেই নাকি লাখ লাখ টাকা বেরোবে ফিরিঙ্গিদের খাজাঞ্চিখানা থেকে—

নানী-বেগম আর দাঁড়াল না। বললে—তাহলে আমি একলাই এই মেয়েকে নিয়ে যাই—

তারপর ঘরের বাইরে এসে কোন্ পথ দিয়ে বেঁকে কোন্ রাস্তায় বেরোল তার কিছুই বোঝা গেল না। চবুতরের কাছে নানী-বেগমের তাঞ্জাম দাঁড়িয়ে ছিল। তাতেই গিয়ে বসলো। মরালীকেও নিয়ে সামনে বসালে। তারপর চলতে চলতে একেবারে চেহেল-সুতুনের বাইরে এসে পড়লো তাঞ্জাম। চেহেল-সুতুনের ভেতরে আসার পর, আবার এই প্রথম বাইরে যাওয়া। সমস্ত রাস্তা দুজনেই চুপচাপ। নানী-বেগমের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে মরালী। যেন খুব ভাবছে একমনে। যেন বড় উদ্বিগ্ন।

সকালবেলা চক্-বাজারের রাস্তায় তেমন ভিড় থাকে না। তবু তাঞ্জাম দেখে যে কজন লোক ছিল তাদের সরিয়ে দিলে কোতোয়ালের লোক। তাঞ্জাম যাচ্ছে তার খেয়াল নেই? নানী-বেগমের তাঞ্জাম। মুর্শিদাবাদের লোক রাস্তা করে দিলে তাঞ্জামের। তারপর দেখলে সে তাঞ্জামটা গিয়ে ঢুকলো মতিঝিলের ভেতরে।

মরালীও পেছন পেছন চলছিল। মতি-ঝিলের শ্বেতপাথরের চবুতরে নেমে নানী-বেগম আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। এবার মরালী চলতে লাগলো পাশাপাশি। দূর থেকে কানে গেল যেন কার ভারি গলার আওয়াজ। যেন ভারি গলায় কে কাকে বকছে। নবাব নাকি! নবাব সিরাজ-উ-দ্দৌলা! নানী-বেগমের মীর্জা মহম্মদ!

মাথার ওপরে ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলছে। সারা দেয়ালে পাথরের কাজ। পায়ের তলায় শ্বেত

পাথর। যদি যকে তাকে নবাব! নবাবের হুকুম না-মানার জন্যে যদি নানী-বেগমকেও বকুনি দেয়। কেন মরিয়ম বেগমকে পাঠাওনি তুমি?

হঠাৎ নানী-বেগম বললে—তুই এই ঘরে দাঁড়া বেটি, আমি পাশের ঘরে গিয়ে মীর্জাকে ডেকে পাঠাচ্ছি, মীর্জা এখন দরবারে বসেছে—

মরালী একলাই দাঁড়িয়ে রইল। মতিঝিলের নামই মরালী শুনে এসেছে এতদিন, দেখলে এই প্রথম। এখানেই গুলসন এসেছিল। এখানে আসবার জন্যেই সব বেগমরা পাগল। এখানে একবার এলে এক রাতেই ভাগ্য ফিরিয়ে নেওয়া যায়। সেই মতিঝিলের মধ্যে এসেই আজ দাঁড়িয়েছে সে। দেয়ালে দেয়ালে পাখাওয়ালা পরীদের মূর্তি। তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধরতে চাইছে পুরুষমানুষরা। এরাও ছাড়বে না, ওরাও ধরা দেবে না। কোথাও আবার দুটো হাঁস গলা জড়াজড়ি করে জলের ওপর ভাসছে। পাশের ঘরে চলে গেছে নানী-বেগমসাহেবা। অলিন্দের দিকে পা বাড়ালো মরালী। কাঠের জাফরি দিয়ে ঢাকা অলিন্দ। জাফরির ফাঁক দিয়ে বাইরে দেখা যায়। মরালী বাইরের দিকে চাইলে। বিরাট ঝিল। ঝিলের ওপর হাজার হাজার পদ্ম ফুটে রয়েছে। কাঁটা বক একমনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জলের দিকে চেয়ে। টিপ্ করছে মাছ ধরবে বলে।

হঠাৎ পাশের দিকে নজর পড়তেই মনে হলো কে যেন উঁকি দিয়ে তাকে দেখছে। একটা বীভৎস মুখ, একমুখ দাড়ি।

মরালী চোখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু খানিক পরে আবার চোখ দুটো ফেরাতেই সমস্ত শরীর যেন আতঙ্কে শিউরে উঠলো। মুখটা যেন দাঁত বার করে হাসলো। তার দিকে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করলো। আর মরালীর মনে হলো বীভৎস মূর্তিটা যেন গ্রাস করতে আসছে। মরালী আর চেপে রাখতে পারলে না। হঠাৎ ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠলো—আঁ-আঁ-আঁ আঁ আঁ—

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কারা যেন পাশের ঘর থেকে দৌড়ে আসছে। অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ। সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম শব্দ করে যেন কারা দৌড়ে নীচে নামতে লাগল। তার পরে আর তার জ্ঞান নেই।

সারাফত আলির দোকানে আগের দিন সন্ধ্যে বেলা কান্ত কেবল ছটফট করেছে। সন্ধ্যেবেলা কান্ত কেবল ছটফট করেছে। নজর মহম্মদের মুখখানাই কেবল দেখবার চেষ্টা করেছে। সন্ধ্যেবেলা মুর্শিদাবাদের চক-বাজারে কোথা থেকে এত লোক জমা হয় কে জানে। কাজই বা কীসের তাও কান্ত বুঝতে পারে না। হয়ত সারাদিন কাজ-কর্ম করে সন্ধ্যেবেলা ফূর্তি করতে বেরোয়। তখন গণৎকাররা ছক-পেতে বসে রাস্তার মোড়ে। বসে মানুষের ভাগ্যকে কখনও আকাশে ওঠায়, কখনও পাতালে নামায়। বেলফুলের মালা নিয়ে ফিরি করতে বেরোয় মালীরা। ওদিক থেকে হাতীর দল গঙ্গায় চান করে সার সার ফেরে পিলখানার দিকে। তখনই ইব্রাহিম খাঁ মদের হাঁড়া মাথায় নিয়ে মতিঝিলের দিকে যায়।

সেদিনও হাতীগুলো যাচ্ছিল। ইব্রাহিম খাঁ কিন্তু গেল না। আগের দিন হাতীর ধাক্কায় পড়ে গিয়ে হয়ত পায়ে-গতরে ব্যথা হয়ে পড়ে আছে ঘরে। বেলফুলের ফেরিওয়ালাও চলেছে। দোকানের ভেতরে সারাফত আলি তখন আলবোলাতে জোরে জোরে দিয়ে আফিমের নেশায় জোরে-জোরে গুড়গুড়ার ধোঁয়া টেনে দোকান ঘর অন্ধকার করে দিয়েছে। ঠিক এই সময়েই রোজ নজর মহম্মদ আসে। এসে গল্প করে। মিয়াসাহেবের সঙ্গে দাঁড়িয়ে চেহেল-সুতুনের বেগম-মহলের খবরাখবর দেয়। তারপর এক ফাঁকে আরকের পাত্রটা কাপড়ের খুঁটের ভেতরে লুকিয়ে নিয়ে চলে যায়। সেদিনও যথাসময়ে আসার কথা। গরজটা নজর মহম্মদেরও যেমন, কান্তরও তেমনি। নজর
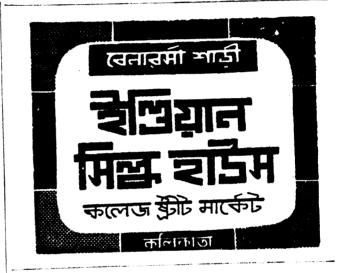
মহম্মদ বিনা-নজরানাতে চেহেল-সতুনে নিয়ে যাবে না, সুতরাং কান্তকে নিয়ে গেলে তার লাভও কম নয়।

সারাফাত আলি নেশার ঝোঁকেও কান্তকে দেখতে পেয়েছে—কাঁহে কান্তবাবু, নজর এল—?

কান্ত বললে—না মিয়াসায়েব, এখনও তো তার পাত্তা নেই—

—আসবে, আসবে, আনেই পড়েগা, না এসে যাবে কোথায়?

কান্তরও মনে হয়েছিল নজর মহম্মদ আসতে দেরি করছে কেন? আজ যে কান্তর একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। মরালী কেন তার পরিচয়টা দিতে গেল! কেন অমন সর্বনাশ করতে গেল নিজের। নিজেরও সর্বনাশ, পরেরও সর্বনাশ! এখনই যদি কোনও রকমে একবার চেহেল-সতুন থেকে বার করে নিয়ে আসা যায়, তাহলেই হয়ত সব দিক থেকেই রক্ষে পাবে মারালী।

—আচ্ছা মিয়াসায়েব, আজ যদি নজর মহম্মদ আর না আসে?

সারাফাত বললে—না আসে তো না আসবে! লেকেন উসকা আনেই পড়েগা!

—কিন্তু আজ আসবে না? আজ যে আমার জরুরী দরকার ছিল।

—আজ না এলে কাল আসবে। মেরে পাশ আনেই পড়েগা উস্‌কো!

—কিন্তু আজই যে আমার দরকার!

—কেন? আজই তোর দরকার কেন?

কান্ত বললে—ওই যে ইব্রাহিম খাঁ, কালকে যে লোকটা হাতীর ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়েছিল, তার কাছে যে চেহেল-সতুনের ভেতরের কান্ড শুনলুম কি না, এলাহী কান্ড নাকি ঘটে গেছে চেহেল-সতুনে—

—দূর ও-রকম কান্ড চেহেল-সতুনে হামেশা হচ্ছে! ও চেহেল-সতুনকা মামুলী বাত্‌!

—না মিয়াসায়েব, রানীবিবি একটা দারুণ কান্ড করে বসেছে নাকি!

—কী কান্ড?

—নিজের আসল পরিচয়টা সক্কলকে বলে দিয়েছে রানীবিবি। এতদিন মরিয়ম বেগম বলে সবাই জানতো রানীবিবিকে, এখন জেনে ফেলেছে ও হচ্ছে হাতিয়াগড়ের জমিদারের দ্বিতীয় পক্ষের বউ! সেই জন্যেই তো আমার ভয় হচ্ছে খুব!

—কেন, তোর ভয় কীসের? মরিয়ম বেগম হলেও যা, রানীবিবি হলেও তাই। ও একই বাত্‌! বাঁদী ভি বাঁদী, বেগম ভি বাঁদী। বেগমরাও আমার আরক খায়, তোর রানী-বিবিও আমার আরক খায়—

কান্ত রেগে গেল। বললে—না মিয়াসাহেব, রানীবিবি কিছুতেই তোমার আরক খায় না।

—আজ খায় না কাল খাবে। পহেলে তো কেউ খায় না, পরে খায়। আমার আরক খেলে পহেলে তো আরাম মালুম দেয়, তারপর নেশা পাকড়ে যায়, তখন মরিয়ম বেগম, বব্বু বেগম, গুলসন বেগম, তক্কি বেগম, ঘেসিটি বেগম, আমিনা বেগম, সব গোলমাল হয়ে এক-কাট্টা হয়ে যায়—

সারাফাত আলি যখন কথা বলে তখন আর থামতে চায় না। তখন হাজি আহম্মদের একেবারে কুলুজি ধরে টান দেয়। কোথায় যেন একটা বোবা অভিযোগের অশান্তি মনের মধ্যে দিনরাত ঘুরপাক খায়, তাই একটু ফুটো পেলেই একেবারে হুড়-হুড় করে বেরিয়ে পড়ে।

বলে—মরিয়ম বেগমই হোক আর হাতিয়াগড়ের রানীবিবিই হোক, আমার আরক ওদের পিলিয়ে দে,—ও সব বিলকুল সাফ হয়ে যাক—

এ-সব কথা কান্তর অনেক শোনা আছে। বুড়োর বক্‌-বকানি বেশি ভাল লাগে না। অথচ না-শুনলেও চলে না। বুড়ো বড় ভাল-

মানুষ। থাকতে দেয়, খেতে দেয়, ঘর ভাড়া নেয় না। এত হিন্দু আছে মুর্শিদাবাদে, তাদের ক'জন এমন করে করবে তার জন্যে। আবার লজ্জাও করে। মাগনা তার জন্যে এ কেন করে সারাফাত আলি। নিশ্চয়ই কোনও ঘা খেয়েছে। এমন ঘা যা বুড়ো বয়েস পর্যন্ত ভুলতে পারে না। বাদশাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিল কান্ত—আচ্ছা বাদশা, মিয়াসাহেবের এত রাগ কেন বলো তো চেহেল-সুতুনের ওপর? তুমি কিছু জানো?

বাদশা বলেছিল—না জনাব, আমি সে বলতে পারবো না—

কান্ত বলেছিল—আমার জন্যে এত মোহর কেন খরচ করছে? চেহেল-সুতুন থাকলো কি গেল তাতে মিয়াসাহেবের কী আসে যায়?

—ও জনাব আমার জন্যে ভি খরচা করেছিল মিয়াসাহেব! আমি ভি চেহেল-সুতুনে গিয়েছি কতবার। আমাকে ভি মিয়াসাহেব চেহেল-সুতুন ভেঙে গুঁড়িয়ে গোরস্থান বানিয়ে দিতে বলেছিল। আমি পারিনি—

—নজর মহম্মদই তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল?

—জী জনাব!

—তুমি গিয়ে কার সঙ্গে দেখা করতে?

বাদশার চোখ-কান-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল কথা বলতে বলতে। চেহেল-সুতুনের কথা মনে পড়তেই যেন অনেক লজ্জাকর স্মৃতি মনে উদয় হয়েছিল।

কান্ত তবু ছাড়েনি, জিজ্ঞেস করেছিল—সত্যি, বলো না, তুমি যেতে কী করতে?

বাদশা কুড়ি-বাইশ বছরের জোয়ান ছেলে। বললে—বেগমরা সব তাগড়া-তাগড়া, আমি ওদের সঙ্গে লড়তে পারবো কেন বাবুজী? রাতের পর রাত গিয়ে গিয়ে আমার তবিয়ত খারাপ হয়ে গেল, আমার তাগদ্ চলে গেল—

—কেন তাগদ্ চলে গেল কেন?

—সে আপনাকে কবুল করতে পারবো না জনাব, জোয়ান লেড়কা চেহেল-সুতুনে গেলে তার তাগদ্ ফুরিয়ে যায়, তাগড়া তাগড়া বেগম লোগ্ তাকে বরবাদ করে দেয়—

বলে মিটি-মিটি হাসতে লাগলো বাদশা।

এর পরে বাদশার কথার মানে বুঝতে আর দেরি হয়নি। সেখান থেকে চলে গিয়েছিল কান্ত! কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগলো তার। তবে কি সারাফাত আলি সেই জন্যেই তাকে পাঠাচ্ছে চেহেল-সুতুনে।

যখন রাত আরো গভীর হলো তখনও নজর মহম্মদের দেখা নেই। আর দেখা হলো না মরালীর সঙ্গে। তখন সারাফাত আলির অন্য কথা বলবার ক্ষমতা থাকে না। আফিমের মৌতাত তখন তার মাথার ঘিলুতে গিয়ে ঠেকে। তখন আর ভাল-মন্দ-জ্ঞান থাকে না তার। তখন চেহেল-সুতুনের ওপরেও রাগ থাকে না। তখন সারাফাত আলি নিজেকে নিয়েই বুঁদ হয়ে থাকে। ভাবনা-চিন্তা করবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত তার লোপ পেয়ে যায়।

অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল কান্ত। নিজের ঘুপচি ঘরের মধ্যে শুয়ে-শুয়েও নজর মহম্মদের কথা ভেবেছিল। তারপর ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়লো বশির মিয়ার কথা। বশির মিয়ার সঙ্গে তার পর থেকে আর দেখা হয়নি। হয়তো সে ব্যস্ত আছে খুব। নবাব ফিরে এসেছে মুর্শিদাবাদে। চারদিকে সব থম-থমে ভাব। নবাব ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই মুর্শিদাবাদের চেহারা যেন আবার বদলে গিয়েছে।

ভোর বেলা বিছানা থেকে উঠেই বশির মিয়ার বাড়ির দিকে যাবার জন্যে বেরিয়েছিল। যদি বশির মিয়া তাকে আবার কোনও একটা কাজ দেয় তো আবার তাকে এই অবস্থাতেই বাইরে যেতে হবে। হয় মোল্লাহাটি, নয় তো কেষ্টনগর, নয় তো অন্য কোথাও। সারা বাঙলাদেশময় বশির মিয়ার জাল পাতা আছে।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বশির মিয়ার বাড়ির সামনেও এসে দাঁড়াল।

একবার ডাকতেও ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু আবার মনে হলো তাকে ডেকেই বা কী হবে। তারপর আবার সেই রাস্তা দিয়েই সোজা চলতে লাগলো। একেবারে সোজা মহিমাপুরের দিকে। ওদিকে জগৎশেঠ সাহেবের বাড়ি। বিরাট বাড়ি। সামনে বিরাট বাগান। ফটকের সামনে পাঠান পাহারাদার ভিখু শেখ দাঁড়িয়ে থাকে যমদূতের মত। ভিখু শেখকে দেখলেই কান্তর ভয় করে।

তারপর এক জায়গায় গিয়ে কান্ত আবার ফিরলো।

আবার কোথায় যাবে! কী করে সময়টা কাটাবে? সময় কাটাতেই অনেক সময় কান্ত বিব্রত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যার আগে আর নজর মহম্মদ আসছে না। যখন সারাফাত আলি আবার আগরবাতি জ্বালিয়ে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে তামাকের ধোঁয়া টানবে, সেই-ই নজর মহম্মদের আসার সময়। হঠাৎ কোতোয়ালের লোক তাড়া করতে লাগলো—হটো হটো, হট্ যাও—

রাস্তার একপাশে সরে এল কান্ত। একটা রূপোলী ঝালরদার পাল্কি চলেছে রাস্তা দিয়ে। সামনে পথ করতে করতে চলেছে নবাবের এক জোড়া হাতী। হাতী দুটোর শুঁড়ের মাথায় ঝালর ঢাকা। ওপর থেকে শুঁড়ের ডগা পর্যন্ত নক্সা কাটা।

—হটো হটো, হট্ যাও—

পাশের একটা লোককে জিজ্ঞেস করাতে সে বললে—নানী-বেগমের পাল্কি। কান্ত আরো ভালো করে পাল্কিটার দিকে চেয়ে দেখলে। মরালীকে যে-পাল্কিটা করে সে এখানে নিয়ে এসেছিল সেটাতে এমন ঝালর দেওয়া ছিল না। এটা আরো দামী। পাল্কিটার গায়ে কাঠের ওপর নক্সা আঁকা।

—সকাল বেলা নানী-বেগম কোথায় যাচ্ছে?

—মতিঝিলে। বোধহয় নবাবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে।

মতিঝিলের কথাটা শুনেই সেই ইব্রাহিম খাঁর কথা মনে পড়লো। সেই সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ। কী অদ্ভুত নাম রেখেছিল তার বাপ-মা। কান্ত মতিঝিলের দিকেই পা বাড়ালো। তার সঙ্গে দেখা করলে হয়। পাল্কিটা হু-হু করে সামনের দিকে এগিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। কান্তও সেই দিকে পা বাড়ালো।

যখন মতিঝিলের ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন পাল্কিটার আর দেখা পাওয়া গেল না। সেখানা কোথায় ভেতরে চলে গেছে। হাতী দুটো শুধু ঝিলের ধারে ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্ছে।

—ইব্রাহিম খাঁ ভেতরে আছে ভাই?

—ইব্রাহিম খাঁ?

—হ্যাঁ, তোমাদের এই মতিঝিলের সরাব-খানার খেদ্‌মদ্‌গার। এই খুব বুড়ো মতন, প্রায় সত্তর বছর বয়েস, মুখময় কাঁচা-পাকা দাড়ি। তার সঙ্গে একবার দরকার ছিল আমার, দেখা হবে এখন?

পাহারাদার লোকটা বোধহয় ভালো। সংসারে যেমন এক-একজন ভালো মানুষ থাকে, তেমনি।

কান্ত আবার বললে—আমার বিশেষ জানা-শোনা মানুষ, ভেতরে যাবার নিয়ম হয়ত নেই, না গো!

তারপর একটু থেমে নিজেই আবার বললে—তা আমাকে যদি ভেতরে যেতে দিতে আপত্তি থাকে তো তাকেই একবার ডেকে দাও না, দেখাটা করে কথা বলে চলে যাই—

পাহারাদার লোকটা বললে—যাইয়ে, অন্দর মে যাইয়ে—লেকিন্......

বলে যে-কথাটা বললে, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে নানী-বেগম ভেতরে গেছে, নবাবেরও দরবার চলেছে, এ-সময়ে যেন বেশিক্ষণ ভেতরে না থাকে। দেখা করেই যেন বাবুজী চলে আসে।

কান্ত বললে—না না, আমি বেশিক্ষণ থাকবো না, আমার কাজ এক-দণ্ডেই মিটে যাবে, সামান্য একটুখানি শুধু দেখা করা—

তারপর জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আমি যাবো? আমি তো সরাব-খানাটা ঠিক চিনি না—

লোকটা নিজেই একজনকে ডেকে শেষ পর্যন্ত সুব্যবস্থা করে দিলে। সত্যি নিজামতের লোকরা সবাই-ই কিছু খারাপ নয়। কিছু কিছু ভালো লোক এখানে আছে বইকি! ভালো লোক না থাকলে কবে এক-দিন এদের নিজামতি চলে যেত। ভালো লোক আছে বলেই তো নবাবিআনা চলছে এতকাল ধরে। লোকটার ভালো হোক। কান্ত নিজের মনে মনেই বললে লোকটার ভালো হোক। ভালো লোকদের ভালো হলেই তো আনন্দ হয়। পৃথিবীর খারাপ লোকদের ভালো হতে দেখলেই কান্তর বড় মন-খারাপ হয়ে যায়। ষষ্ঠিপদ ভালো লোক, তার ভালো হোক। বশির মিয়া ভালো লোক, তর ভালো হোক। আসলে সারাফাত আলিও ভালো লোক, তারও ভালো হোক। আর মরালী? মরালীও তো ভালো। মরালীও তো কোনও দোষ করেনি, তারও ভালো হোক। বর পছন্দ না-হওয়াতে পালিয়ে গিয়েছিল বলে কি আর সে রাতারাতি খারাপ মেয়ে হয়ে গেল? তা নয়। আসলে খারাপ-ভালো বিচার করাই শক্ত। মরালী যদি জোর-জবরদস্তিতে আরক খেতে বাধ্য হয়, কেউ যদি সাপের বিষ জোর
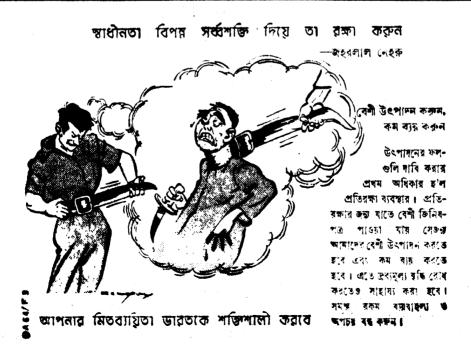
করে তার গলায় ঢুকিয়ে দেয়, তাতেই কি সে খারাপ হয়ে যাবে? আর, বাদশা যা বলছিল, তাও যদি মরালীর ভাগ্যে ঘটে, তাতেই বা কী দোষ মরালীর! কী আশ্চর্য, বাদশা বলে কিনা সে রাত কাটাতো চেহেল-সতুনের ভেতরে। রাত কাটিয়ে চেহারা খারাপ হয়ে গেল বলেই আর যায় না। তাহলে কান্তকেও কি সেই জন্যেই চেহেল-সতুনে পাঠাচ্ছে সারাফাত আলি। যাতে নেশা লাগে, লেগে শরীর খারাপ হয়?

—আরে বাবাজী, তুমি?

একেবারে সচ্চরিত্র পুরকায়স্থর মুখোমুখি দাঁড়াতেই কান্ত যেন আবার পৃথিবীতে ফিরে এল। সিঁড়ির নিচেয় অন্ধকার একটা ঘর। চারদিকে কড়ির জালা। সারফাত আলির দোকানে যেমন খুশবু তেল থাকে, তেমনি থরে থরে সাজানো। বেশ মিষ্টি-মিষ্টি কড়া-কড়া গন্ধ ঘরটার মধ্যে। যে লোকটা কান্তকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সে তখন চলে গেছে।

কান্ত বললে—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম তাই আপনার কথা মনে পড়লো। কেমন আছেন এখন?

সচ্চরিত্র পুরকায়স্থ কান্তকে দেখেই উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠেছে—এই তোমার কথাই ভাবছিলাম বাবাজী, তোমাকে সেই বলেছিলাম না শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর কন্যার কথা? সেই যার সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করেছিলাম?

কান্ত উদগ্রীব হয়ে বলে উঠলো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বলেছিলেন, তা তার কী হয়েছে?

—সে তো নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল বিবাহের রাত্রে, সে তো তোমাকে বলেছি—হঠাৎ সেই কন্যাকে আজ এখানে দেখলাম।

—এখানে?

—হ্যাঁ, এখানে। এই এখুনি নানীবেগম-সাহেবার সঙ্গে এই মতিঝিলে তাঞ্জাম থেকে নামলো। এই এখখুনি। নেমে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল তুমি আসবার একটু আগে। সেই কথাই বসে বসে ভাবছিলাম, ভাবছিলাম শোভারাম বিশ্বাস মশাই-এর কন্যা এখানে এল কেমন করে, এমন সময়ে বাবাজী......

কান্ত জিজ্ঞেস করলে আপনি ঠিক দেখেছেন?

—তা বাবাজী, আমি এই সত্তর বছর বয়েস পর্যন্ত এত কন্যার বিবাহ দিয়েছি, আমার ভুল হবে?

—কিন্তু এখানে কী করতে এল সে?

—তা কে জানে বাবাজী আমিও তো তাই অবাক হয়ে ভাবছি এখানে এই মতিঝিলে সে-কন্যা এল কেমন করে!

—কিন্তু আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না ঘটক মশাই।

—না বাবাজী, তোমাকে আমি দেখাতে পারি। এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেই দেখা যায়। আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিতে পারি! অথচ শোভারাম বিশ্বাস মশাই ওদিকে পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মেয়ে-মেয়ে করে! খবরটা ওঁকে একবার দেব ভাবছি!

কান্ত বললে—না, ঘটক মশাই, বাপকে আর এ-কথাটা বলবেন না, বড় মনোকষ্ট পাবেন। আপনি কাউকে বলবেন না। আমি শুধু ভাবছি আপনি ভুল দেখেন নি তো? অন্য কাউকে দেখেন নি তো?

—তবে তুমি আমার সঙ্গে ওপরে চলো, আমি তোমায় চাক্ষুষ দেখিয়ে দিচ্ছি। চলো চলো আমার সঙ্গে—

জোর করে পুরকায়স্থ মশাই কান্তকে ওপরে নিয়ে চললো। বললে—একটু আস্তে আস্তে এসো বাবাজী, ওপরে আবার নবাবের দরবার বসেছে—কলকাতা থেকে সব ফিরিঙ্গি ধরে এনে বিচার করছে নবাব। সেই জন্যেই তো এই পিছনকার সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে এলাম তোমাকে—চুপি চুপি তোমায় দেখিয়ে দিয়ে আবার নেমে যাবো, কেউ দেখতে পাবে না, এসো, পা টিপে টিপে এসো—

এই-ই প্রথম ভেতরে ঢুকলো কান্ত। এই মতিঝিলের ভেতরে। এলাহি ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেল। চেহেল সতুন দেখেছে খানিকটা, কিন্তু এ যেন অন্যরকম। এ যেন সত্যিই রাজপ্রাসাদ। দিল্লী কখনও দেখেনি কান্ত, শুধু দিল্লীর বাদশার কেল্লার গল্প শুনেছে। এ সত্যিই দেখবার মত। কিন্তু এখানেই বা এল কেন মরালী! কেউ নিয়ে এল, না নিজে থেকে এল?

—ওই দেখ বাবাজী! ওই দেখ—

একটা বিরাট ঘর। চারদিকের জাফরি ঢাকা বাইরের সিঁড়ির কোন্ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা। খুব ভাল স্পষ্ট দেখা যায় না। তবু কান্ত পুরকায়স্থ মশাই-এর পেছন থেকে দেখতে চেষ্টা করলে।

—কই? কোথায়?

—ওই যে, ওই ঘুলঘুলিটার দিকে মুখ করে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। মুখটা এদিকে ফেরালেই চিনতে পারবে বাবাজী। আর চিনতেই না পারবে কী করে তুমি? তুমি তো বিশ্বাস মশাই-এর মেয়েকে দেখেছ।
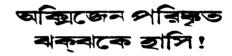
শুভদৃষ্টি হবার আগেই তো সব ভণ্ডুল হয়ে গেল—ওই ওইটিই হচ্ছে বিশ্বাস মশাই-এর মেয়ে, ওরই সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম বাবাজী, তা তোমারও কপালে নেই, আমারও দুঃসময় পড়লো তখন থেকে—

হঠাৎ মরালী এই দিকে মুখটা ফিরিয়েছে। আর পুরকায়স্থমশাইকে দেখতে পেয়েছে। যেন ভয় পেয়েছে দেখে। পুরকায়স্থমশাই বোধহয় একটু সাহস করে এগিয়ে যেতে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মরালী আর্তনাদ করে উঠেছে সারা মতিঝিল কাঁপিয়ে।

আর ওদিক থেকে যেন কাদের দৌড়ে আসার শব্দ শোনা গেল। দুম-দাম করে শব্দ হচ্ছে। কান্ত ভয় পেয়ে গেল। যদি এখন কেউ তাদের এখানে দেখে ফেলে।

পুরকায়স্থমশাইও ভয় পেয়ে গেছে। বললে—শিগ্‌গির নেমে এসো বাবাজী, কী সব্বোনাশ—

বলে নিজেই আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে গেল।

নানী বেগম পাশের ঘর থেকে দৌড়ে এসেছে। পেছনে-পেছনে নবাব।

নানী-বেগম মরালীর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—ক্যা হুয়া বিটি? ক্যা হুয়া?

মরালীর তখন আর কথা বলবার মত অবস্থা নয়। নবাবও মরালীকে দেখলেন ভালো করে। জিজ্ঞেস করলেন—এ কৌন্, নানীজী?

নানী বেগম বললেন—এই তো হাথিয়াগড়ের রানীবিবি!

—হাথিয়াগড়ের রানীবিবি? এখানে কেন? এখানে কী করতে এসেছে?

নানী বেগম বললেন—আমি চেহেল-সুতুন থেকে সঙ্গে করে এনেছি—

—চেহেল-সুতুনে রানীবিবি কেন এসেছে? কী করতে?

নানী বেগম বললে—সে-জবাব কি আমি দেব? চেহেল-সুতুনের মালিক কি আমি? যেদিন থেকে তোর নানাজী মারা গেছে, সেদিন থেকেই তো আমি সব দেখা-শোনা করা ছেড়ে দিয়েছি। আমি তো সেদিন থেকে আমার কোরাণ নিয়েই থাকতুম, কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়লো এই বেটিকে। একে মরিয়ম বেগম বলে জানতো এতদিন,—

—মরিয়ম বেগম? সে কে?

—তুই যদি কিছুই না-জানিস মীর্জা, তাহলে কেন এদের কষ্ট দিতে চেহেল-সুতুনে আনিস? কোথা থেকে সব ধরে-ধরে আনিস এদের আর এদিকে আমার যে প্রাণ বেরিয়ে যায়!

মীর্জা বললে—কিন্তু আমি ক'দিক দেখবো নানীজী, আমি তোমার চেহেল-সুতুন দেখবো, না মুর্শিদাবাদ দেখবো না তামাম বাঙলা মুলুক দেখবো! চারদিকে যে আমার শত্রু ঘিরে রয়েছে! কেউ যে আমায় এক দণ্ডের জন্যে শান্তি দিচ্ছে না। কাকে বিশ্বাস করবো আমি? কাকে বিশ্বাস করে সব কাজের ভার দেব বলতে পারো? যেদিন থেকে মসনদে বসেছি সেদিন থেকেই তোমার মেয়েরা তোমার আত্মীয়রা আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছে। তার ওপরে আছে ফিরিঙ্গিরা, তার ওপরে আছে শওকত্ জঙ্—

নানী বেগম মুখ তুললেন।

—কেন? সে বেচারি তোর কী করেছে?

—তুমি তো কারোর দোষ দেখতে পাও না। কিন্তু তাকে ক্ষেপিয়ে তোলবার লোকের তো অভাব নেই!

—কে ক্ষেপাচ্ছে তাকে? কারা তারা?

—তোমাকে সব কথা বলা যায় না নানীজী, সব কথা তুমি বিশ্বাসও করবে না। কিন্তু তুমি বলতে পারো কে শত্রু নয় আমার? তোমার জাফর আলি থেকে শুরু করে জগৎশেঠ পর্যন্ত কে শত্রুতা করছে না? কার নাম করবো তোমার কাছে! আমি কি একদিনের জন্যেও একটু শান্তি পাবো না? আমি কার কাছে কী এমন অপরাধ করেছি যে সবাই আমার শত্রুতা করবে? তুমি একজনের নাম করো যে আমার ভালো চায়, যে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার ভাল হলে যে আনন্দ পায়—

—কেউ পায় না?

—কে, তার নাম করো!

—কেন, আমি তোর ভাল চাই না?

মীর্জা হঠাৎ নানী বেগমকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে। বললে—নানীজী, তুমি তো আমাকে মানুষ করেছ নানীজী! তুমি কেন এ-কথা বলছো?

বলে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে রইল নানীজীকে। কিছুতেই আর ছাড়তে চায় না মীর্জা।
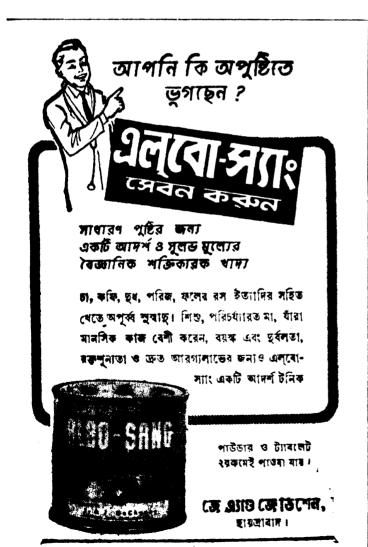
নানী বেগম বললে—ওরে, ছাড় ছাড় আমাকে, ছেড়ে দে—

—বলো আগে, তুমি ও-কথা আর বলবে না?

—কিন্তু আমি ছাড়া কি আর কেউ নেই তোকে ভালবাসার?

—কে?

—কেন, লুৎফা?

মীর্জা হঠাৎ নিজের হাত দু'টো ছেড়ে দিলে। বললে—তুমি নানীজী আমাকে হাসালে! তুমি আমাকে কিছুতেই বুঝতে পারলে না নানীজী! সবাই সেই ভুলই করে। যাক্ গে, তুমি আমাকে বুঝতে পারবে না। যদি বুঝতে তাহলে আর আমার কাছে বলতে আসতে না ও-কথা! ভালো তো আমাকে আমার খেদ্‌মদ্‌গাররাও বাসে, কিন্তু তাতে কি বাঙলার নবাবের মন ভরে? আর, আমাকে ভালবাসতে গেলে যে অশেষ দুঃখ কষ্ট মাথায় তুলে নিতে হবে—তা কে পারবে! সে-রকম লোক আমি কোথায় পাবো? তুমিই বলো না!

হঠাৎ নেয়ামত ঘরের ভেতর ঢুকে কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

—কী খবর?

—জাঁহাপনা, কলকাতার রাজা মাণিক-চাঁদের কাছ থেকে লোক এসেছে খত্ নিয়ে, জাঁহাপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়!

জাঁহাপনা, জাঁহাপনা, জাঁহাপনা! শুনতে শুনতে বোধহয় মীর্জার কান যেন পচে যাবার অবস্থা হয়েছে।

নানী বেগম মীর্জার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। মুখখানা যেন হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেল। এ যেন অন্য মীর্জা। বহুদিন আগে যখন নানী বেগম বালেশ্বরে ছিলেন তখন নবাব আলীবর্দী খাঁকেও এক-একদিন তিনি এই রকম চিনতে পারতেন না। রাত্রে কতদিন ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখেছেন নবাব ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন আর মুখে বিড় বিড় করছেন। আজ মীর্জারও যেন সেই অবস্থা।

নানী বেগম বললেন—তুই ভেতরে যা মীর্জা, তোর অনেক কাজ, আমি আসি—

মরালীর তখন বোধহয় একটু জ্ঞান ফিরে এসেছে। চোখের পাতা একটু খুলেছে।

—এই রিবিজীকে কী করে নিয়ে যাবে তুমি?

—সে তোকে ভাবতে হবে না। তুই নিজের কাজ করগে যা—

—তাহলে তুমি খবর দিয়ে দিও নানীজী, আজ রাত্তিরে আমি চেহেল-সতুনে যাবো।

বলে মীর্জা চলে গেল। নানী বেগম মরালীকে জিজ্ঞেস করলো—এখন তবিয়ত কেমন লাগছে বেটি?

মরালী কোনও কথা বলতে পারল না। ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল শুধু।

নানী বেগম জিজ্ঞেস করলেন—হঠাৎ কী হয়েছিল? অত চেঁচিয়ে উঠেছিলি কেন মা? কী হয়েছিল বল্ তো?

মরালী বললে—আমার মনে হলো কারা যেন ঘরের ভেতর ঢুকে আমাকে ধরতে আসছিল—যেন আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দাঁত বার করে হাসছিল—

—দূর পাগলী মেয়ে! এই মতিঝিলে কে তোকে ধরতে আসবে? এখানে কার এত সাহস হবে? নিশ্চয়ই ভুল দেখেছিস্ তুই! স্বপ্ন দেখেছিস জেগে জেগে—

তারপর একজন বাঁদীকে ডেকে মরালীকে ধরতে বললেন। মরালীর দিকে চেয়ে বললেন—চল, চেহেল-সতুনে গিয়ে হেকিম-সাহেবকে ডেকে পাঠাবো, সব ঠিক হয়ে যাবে, চল, মীর্জাকে তোর কথা সব বলেছি, এখন দরবার চলছে, আজ রাত্তিরে মীর্জা চেহেল-সতুনে আসবে চল—

তাঞ্জাম তৈরিই ছিল। নানী বেগম আর বাঁদীটা দুজনে মিলে মরালীকে ধরে তাঞ্জামের ভেতরে তুলে দিলে। তাঞ্জামটা আবার মতিঝিল পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লো। আবার আগেকার মতন একজোড়া ঝালর-ঢাকা হাতী আগে আগে চলতে লাগলো।

সন্ধ্যে বেলা নজর মহম্মদ দোকানে আসতেই সারাফত আলি বললে—কী রে নজর, কাল এলি না তুই, বাবুজী তোর জন্যে রাত পর্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরেশান হয়ে গেল

নজর মহম্মদ বললে—কাল মিয়াসায়েব, চেহেল-সতুনে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল সব—

—কী রকম?

—ভেবেছিলুম আমি সব ফাঁস করে দেব মিয়াসায়েব, মেহেদী নেসার সাহেব আমার নামে কাছারিতে নালিশ পেশ করেছে, ও হারামীর বাচ্চাকে আমি এবার দেখে নেব। কিন্তু আমাকে শালা কিছুই করতে হলো না। মরিয়ম বেগমসাহেবা খুদ্ নিজেই সব ফাঁস করে দিয়েছে নানী বেগমসাহেবার কাছে। নানী বেগম আজ রানীবিবিকে নিয়ে মতি-ঝিলে গিয়েছিল।

কান্তও কথাটা কানে যেতেই ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল।

—নানীবেগম নবাবকে সব ফাঁস করে দিয়েছে!

কান্ত আর থাকতে পারলে না। বললে—তারপর?

নজর মহম্মদ সারাফত আলির দিকে চেয়েই বলতে লাগলো—মিয়াসাহেব, নবাবের কি ফুরসৎ আছে সব কথা শোনবার। দরবার আছে, লড়াই আছে, জেনানা আছে, একলা কত কাম করবে নবাব! হলওয়েল সাহেবকে পাকড়ে এনেছিল কলকাতা থেকে, তাকে ভি ছেড়ে দিল—

—কাহে?

—নানী বেগম নবাবকে বললে ছেড়ে দিতে। জাফর আলি সাহেবকে খুব ধমক দিয়েছে নবাব। ভাইয়ে-ভাইয়ে লড়াই লাগিয়ে দেবার মতলোব করছে তো? নানী বেগম জাফর আলি সাহেবকেও খুব ধমক দিয়েছে। নবাবের নোকরি হারামের নোকরি মিয়াসাহেব। চারদিকে কেবল দুশমনি। শালা দুশমন তাড়াতে-তাড়াতে রাতে নিদ ভি নেই নবাবের চোখে। অত ফুর্তিবাজ নবাব একেবারে হয়রান হয়ে গেছে মসনদে বসে।

সারাফত আলি বললে—তা আজ বাবুজীকে চেহেল-সতুনে নিয়ে যাচ্ছিস তো তুই?

নজর মহম্মদ ভয়ে আতকে উঠলো—ইয়া আল্লা আজ তো জান নিকলে যাবে আমাদের।

—কেন?

—নবাব খুদ্ নিজে চেহেল-সতুনে আসবে রাত্তিরে, রাত্তিরে চেহেল-সতুনে দরবার। হাথিয়াগড়ের রাণীবিবির সঙ্গে মোলাকাত করে সব বাত-চিত্ শুনবে, মেহেদী নেসার সাহেব যত ঝুটে বাত বলেছে, তার সব ফয়শালা হবে, আজ বাবুজীকে চেহেল-সতুনে নিয়ে গেলে আমাদের জান চলে যাবে মিয়াসায়েব—

কান্ত চুপ করে সব শুনছিল। বললে—রাণীবিবির সঙ্গে নবাব দেখা করবে!

—হাঁ জনাব, হাঁ। সব ফয়শালা হবে যে আজ। হুকুম হয়ে গেছে চেহেল-সতুনে। এই তো আজ জলদি লোট যাচ্ছি, আজ কাজে গাফিলি করলে আমার জান চলে যাবে।

বলে আর দাঁড়াল না নজর মহম্মদ।

কান্ত অধীর হয়ে উঠেছিল। বললে—রাণীবিবি দেখা করতে রাজি হয়েছে? রাণীবিবি আপত্তি করেনি?

কিন্তু নজর মহম্মদের কানে সে-কথা পৌঁছুল না। নজর মহম্মদ তখন হন্-হন্ করে বরাবর সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে চক্-বাজারের রাস্তা দিয়ে।

(ক্রমশ)

আপনার
বাচ্চার ছবি
পাঠান

এই ত সেদিনকার কথা। সব ছিল ওদের। দেড়শ বছর আগেও ওদের রাজ্য ছিল, রাজা ছিল আর ছিল ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তি-সম্মান। এখন সব হারিয়ে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দিন গুনছে, কবে যেন রাজার জাতির শেষ স্মৃতিটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ওরা ছিলেন রাজার জাতি। এসেছিলেন তিব্বত্ থেকে। গোবি মরুভূমির স্বপ্ন মাড়িয়ে। দক্ষিণের এই সবুজ দেশে, ভাগ্যের অন্বেষণে। আসামের নদী আর পর্বতের শ্যামলিমায় মুগ্ধ হলেন আর গড়ে তুললেন শ্যামল প্রাচুর্যের বুকে চিরস্থায়ী আস্তানা।

তিব্বত্ থেকে আসা বলেই পুরাতন মানুষের এই বিশাল স্রোত নিজেকে পরিচয় দিলে বড়ো বলে।

তারপর ওরা প্রতিষ্ঠা করলেন রাজ্যের, শাসন করলেন পূর্ব আসামের এক বিশাল ভূখণ্ডের অগণন প্রজার ওপর। রাজধানী হিসেবে বেছে নিলেন ডিমাপুরকে। ডিমাছের ডি মানে জল; মা মানে বড়; আর বড়ো ভাষায় দৈমা মানে নদী, ডিমাছাতেও ডিমা মানে সাধারণত নদীকেই বোঝায়। নদীর সঙ্গে যাদের জীবনের সব কিছুই ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত ওদের পুরী হল ডিমাপুর। (বড়ো রাজা হিড়িম্বাসুরের নামানুসারে হিড়িম্বাপুর থেকে ডিমাপুর হয়েছে বলেও একটি বিকল্প মত আছে।)

ওদের সংস্কৃতি নদীমাতৃক। তাই উত্তর কাছাড় আর কাছাড়ে ওদের নাম হল ডিমাছা। ডিমা বা দৈমানি ফিছা অর্থাৎ নদীর সন্তান। এই রাজার জাতির অপর একটা নাম হল কছারী। কাছাড়ে বসবাস করার জন্যে নয়, খস বা খাসিয়াদের সঙ্গে আত্মীয় বজায় রাখার জন্যে অন্যেরা বলত খসারি। খসারি থেকেই হল কছারী। কছারীর রাজ্য ছিল বলেই হয়তো এই দেশের নাম হল কাছাড়।

এত নাম নিয়ে হবে কি? রাজার জাতির রাজ্য তো গেলই, জাতটাও টিঁকে থাকল না। জাতি নিয়ে হল জনজাতি; রাজপুরুষ এখন রাজ-অনুগ্রহার্থী।

সেদিন গিয়েছিলাম খাসপুরে। কাছাড়ের এক সময়কার রাজধানী। ভেবেছিলাম মরচে-ধরা অতীতের দিকে তাকিয়ে একটু বিস্মিত হলে, মন উল্লসিত হবে স্মৃতির আনন্দে। প্রাচীনত্বের মহিমায় হারিয়ে ফেলতে পারবো নিজেকে।

কিন্তু সেখানে যা দেখলাম, মন স্তিমিত হয়ে এলো। ১৮৩২ সাল পর্যন্ত যে জনপদ ছিল জনাকীর্ণ, এখন সেখানে শ্বাপদসংকুল অরণ্য-ঘেরা নির্জনতা। মানুষ রাজাদের জায়গা দখল করে বসে আছে মগরাজেরা।

সুদূর অতীতের কথা না হলেও খুব বেশি অতীতের কথা নয়; ১২২০ খৃষ্টাব্দে ডিমাপুর-রাজ নির্ভয়নারায়ণ ধ্বজ সংকল্প করলেন, ব্রহ্মদেশ জয় করার। রাজার উপর স্বপ্নাদেশ হল ব্রাহ্মণের, পরদিন প্রত্যুষে রাজ কারিগর দেবুলোকে রাজকোষ থেকে ছয় মণ লোহা দিয়ে দিবেন রাজা নিজে। সেই লোহা দিয়ে তৈরি হবে ব্রহ্ম-অভিযানের যাবতীয় সব অস্ত্র। ঠিক একই সময়ে দেবুলাও দেখল স্বপ্ন। ব্রাহ্মণ ওকে নির্দেশ দিয়েছেন অস্ত্র তৈরির। যে লোহা রাজা দেবেন, তাকে ছোট ছোট সরিষার মতো টুকরো করে কাটতে হবে আর সেই টুকরো-গুলোকে সরিষার সঙ্গে মিশিয়ে জমি চাষ করে ছড়িয়ে দিতে হবে। তারপর আসবে ঘুঘুপাখির ঝাঁক। তারা খাবে সরিষার সঙ্গে লোহার টুকরো। তাদের পুরীষ থেকে লোহা কুড়িয়ে বানাতে হবে অস্ত্র। অভিযানে সেই অস্ত্র হবে অমোঘ। দুর্জয়। দেবুলাকে সতর্ক করে দেওয়া হল, এই নির্দেশ যেন গোপন রাখে। কাউকে যেন বলে না, এমন কি, নিজের স্ত্রীকেও না।

কাজ আরম্ভ হল। ঘুঘুপাখিরাও এল ছয় মাস পরে। কিন্তু রাজার যে আর তর সয় না। ছোটলোকদের বিশ্বাসও করতে নেই। অস্ত্র বানাবে বলে লোহা বিক্রি করে হয়ত শেষকালে চম্পট দেবে। তা না হলে সামান্য কয়েকখানা অস্ত্র বানাতেই এত সময় নেবে কেন?

ডাক পড়ল দেবুলার রাজ-দরবারে। সে সবিনয়ে নিবেদন করল যে, আরও অন্ততপক্ষে এক বৎসর সময় চাই। রাজার সন্দেহ ঘনীভূত হল। রেগে আগুন হয়ে নিজেই গেলেন অস্ত্রাগারে। দেখলেন তরবারির শুধু আধখানা পর্যন্ত হয়েছে। রাগের মাথায় ছুঁড়ে ফেললেন তরবারি। তরবারি লাগল একটা বটগাছে। প্রকাণ্ড বটগাছ নুইয়ে পড়ল আর তরবারি ভীষণ শব্দ করে পড়ল রাজবাড়ির পুকুরে। দেবুলার ভাগ্যে পড়ল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ।

আবার স্বপ্নাদেশ হল। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ রহিত হওয়া চাই। রাজার ভুল শোধরানোর উপায় আছে এখনও। ঐ বট-গাছের পুকুর পাহারা করতে হবে সাত দিন। সপ্তম দিনে যে প্রাণী এসে বটগাছ প্রদক্ষিণ করবে, তার মাথায় হাত দিতে হবে রাজাকে। তারপর যা করবার, সব করবে ওই প্রাণী।

পাহারা হল। সপ্তম দিনে পুকুরে উঠল বিরাট ঢেউ, যেন আস্ত পুকুরটাই উঠে আসবে। এক বিশালকায় অজগর এসে প্রদক্ষিণ করল বটগাছের চারদিকে। রাজা ভয়ে "থ" হয়ে গেলেন। সাতবার প্রদক্ষিণ করে সাপ যখন নাচতে লাগল পুকুরে, রাজার ভাই ত্রিলোচন দাদাকে দিলেন এক ধাক্কা। ভয় হল, রাজার দুর্বলতার জন্যে বুঝি সব পণ্ড হয়ে যায়। রাজা পড়ে গেলেন। সাপের লেজে পড়ল হাতের চাপ। লেজের টুকরো রয়ে গেল তরবারির টুকরো হয়ে সেইখানটায়।

ত্রিলোচন আবার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। এই মন্ত্রপূত তরবারির জোরে যদি তাঁর দাদা

ওকে ভবিষ্যতের সব স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত করে ফেলে। তাই তরবারির সেই টুকরোটা নিয়েই দুই ভাইয়ের মধ্যে লেগে গেল ধস্তাধস্তি। বাট রয়ে গেল ত্রিলোচনের হাতে আর রাজার কাছে রইল তরবারির টুকরো। বাট নিয়ে ত্রিলোচন গেল ত্রিপুরায়। সেখানে গড়ল ও নিজেই এক স্বাধীন রাজ্য। আর নির্ভয়নারায়ণ সেই তরবারির টুকরোকেই প্রতিষ্ঠা করলেন রণচণ্ডী মন্দিরে বিগ্রহরূপে। খাসপুর থেকে সরিয়ে নেওয়া সেই রণচণ্ডী-বিগ্রহ এখনো বড়খলায় বিদ্যমান।

এটা হল কিংবদন্তীর কথা। কিন্তু কিংবদন্তীতেও সত্য থাকে নিহিত। এমন সত্য, যা জাতির মর্মমূলে বসে চিরদিন সাধারণের ভাগ্য নিরূপণ করে এক অব্যাহত আর চিরন্তন গতিতে। বিমৃষ্য-কারিতা কোনদিন এই জাতির ভাগ্যে ঘটল না। জাতির পরিকল্পনার সঙ্গে দূরদর্শিতার চিরদিন রইল বিরোধ।

কোথায় যেন কে একজন আদিপুরুষ মন্তব্য করে বসলেন, দুধ আর মদ একসঙ্গে খেলে ক্ষয়রোগ হয়। তাই অনেক চিন্তা করে জাতির কল্যাণ কামনায় তাঁরা ছেড়ে দিলেন দুধ। দুধ ব্যবহারের সুফল পেতে হলে কতদিন যে অপেক্ষা করতে হয় একজনকে। কিন্তু মদের বেলায় গলায় ঢেলে দিলেই হল, তৎমুহূর্তেই ম্যাজিকের মত কায়মনে এসে পড়বে শক্তি উৎসাহ আর সব ভোলানো আনন্দ। দুধ খেলে কবে যে হবে রক্তশোধন আর দেহের পুষ্টি, এতো দেরি কি আর বসে থাকা যায়।

চারিত্রিক এই দুর্বলতাই হল নির্ভয়-নারায়ণের ব্যর্থতার কারণ, আর সেই একই অভিশাপ রইল জাতির ক্রমক্ষয়িষ্ণুতার কারণ হয়ে।

কিংবদন্তীর কথা এখন থাক, খাসপুর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতাই বলি। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শেষ কাছারী রাজা হল যশনারায়ণ। বিদ্যোৎসাহী রাজা মহা-মাণিক্যের পৌত্র কি প্রপৌত্র। এখানে বলে রাখা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না; এই

মহামাণিক্যের আমলেই চৌদ্দ শতকে অসমীয়া ভাষার রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেছিলেন পণ্ডিত মাধব কন্দলি। তখন কছারী রাজার রাজভাষা ছিল অসমীয়া। তাই মহামাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ রচিত হল অসমীয়া ভাষাতে।

যশনারায়ণের রাজ্য ছিল দক্ষিণ পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত। গৌহাটী থেকে ত্রিশ মাইল পূর্বে অবস্থিত ডিমরুমাও ছিল ওর রাজ্যের অন্তর্গত। ষোল কি সতেরো শতাব্দী পর্যন্ত ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, তারপর আহোমের সঙ্গে হতে লাগল ঘন-ঘন বিরোধ। শেষকালে সব পাট চুকিয়ে চলে আসতে হল দক্ষিণ পাহাড়ের দিকে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল। পাহাড়ই তো ছিল আদিম আবাসভূমি। তাই সবুজ সমতলের সুখ সহ্য হল না, নিয়ন্তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন পাহাড়ে।

সেই থেকেই শুরু হল যাযাবরী ইতিহাসের। উত্তর কাছাড় আর কাছাড়ের প্রায় সব জায়গা জুড়ে প্রতিষ্ঠা করলেন এক বিশাল রাজ্যের। তারই রাজধানী হল "খাসপুর"। তাইতো গেলাম খাসপুরে। ভেবেছিলাম—কাছাড়ের শেষ স্বাধীন নৃপতির স্মৃতিমণ্ডিত অনেক কীর্তিচিহ্ন দেখতে পাবো। কিন্তু কই? হাবেলির বুকে বসেছে ছোট ছোট কুঁড়েঘরের সারি। জানতে পারলাম সেটা নাকি একটা সাপ্তাহিক বাজার। আর রাজবাড়ির পরিখা থেকে আরম্ভ হচ্ছে কার যেন বাড়ির সীমানা।

রাজবাটির সিংহদ্বার আছে বটে। কুঁজো-পিঠ মস্ত বড় একটা যেন বুড়ো হাতী। নড়তেই যেন চায় না। কিন্তু দ্বার থাকলে হবে কী? সিংহ তো আর নেই। এখন তো আর দ্বারের সম্মুখে দাঁড়ালে বুক দুরু-দুরু কাঁপে না! এখন সেই দ্বার দিয়ে বাইরে যায় অঞ্চলের লোক, কারোও অন্তঃপুরে নয়।

সিংহদ্বারের কাছেই আছে একটা মন্দির —"রণচণ্ডীর"। অনেক দিনের নিবে-যাওয়া ছোট ছোট মোমবাতি কয়েকটা দেখলাম। কারো হয়তো শুভবুদ্ধি হল, তাই হয়তো দিয়ে গেল পুজো।

আজকাল যুগের চাপে সত্তাও গেছে পালটে। দেবতারাও সৃষ্টজীব বইতো আর-কিছু নয়। তাই হয়তো কেউ আত্মার পরম শান্তি কামনা করে দিয়ে গেল পুজো। মানস শেষ হল আর তল্পিতল্পা গুছিয়ে মা-রণচণ্ডীকে শেষ প্রণাম জানিয়ে চলে গেল যে যার পথে। রণচণ্ডীর দিকে ফিরে তাকাবার কারও ফুরসত রইল না।

বারদোয়ারী মন্দিরে গেলাম। দুপুর বেলাতেও অমানিশার অন্ধকার মন্দিরের ভিতর। যে মন্দিরে কোনদিন দীপ নিবতো না সেই মন্দিরে দুপুরের অন্ধকারে জ্বলে

রণচণ্ডীর মন্দির
আত্মার পরম শান্তি কামনা করে দিয়ে গেল পুজো

সাপের চোখের মণি। নিশ্চিন্তমনে কয়েকটা সাপ বেশ আরাম করে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমুচ্ছে। ভয়ে ছমছম করল বুকটা। ব্যথিত হলাম। আজ দেড়শো বছর আগেও যেখানে মানুষের ভিড়ে যাবার জো ছিল না, যেখানে নিত্য চলত দেবতার অর্চনা, সেখানে মন্দিরের মহিমা তো নাই-ই, ভূতুড়ে বাড়ির থমথমে ভাবটাও চলে গেছে কবেই। এখন সেখানে মানবেতর প্রাণীর আড্ডা।

রাজার স্নানাগারের ভগ্নাবশেষ আছে। কিন্তু মধুক্ষরা মধুরা চলে গেছে অনেক দূরে। পুকুরগুলোর বুকেও এক-একটা ছোটখাটো সুন্দরবন, জঙ্গলের সাপ-ব্যাঙের আস্তানা। শুনেছি, রাজা স্নান সেরেই সোজা চলে যেতেন বারদুয়ারী মন্দিরে, সেখানে পুজো শেষ করে শিব-মন্দিরে, সেখান থেকে রণচণ্ডীতে, তারপর চুকতেন অন্দরমহলে।

যেদিন কোন পর্ব থাকে সেদিন সিংহ-দ্বারের বাইরে এসে বসতেন রাজা। খেলা দেখতে। সেই খোলা মাঠ এখনও আছে। অবশ্য, অতীতের বেশ নেই কোথাও একটুখানি।

কছারীরা ছিলেন প্রধানত শিব-উপাসক। বাস্তুদেবতা হল শিব। শিব্রাই। শি—মানে আদি, ব্রাই—মানে বুড়ো। ওই আদি বুড়ো শিবকেই ওঁরা পুজো করে আসছেন অনাদিবধি অনেকরূপে। তবে আচার হল শিব আর শক্তিমিশ্রিত। এখানকার সব জন-জাতিরই আচার একরূপ। শৈব ও শাক্তের সমাহার। শক্তিকে পুজো করত রণচণ্ডী, কাঁচাখাইতী আদি বিভিন্ন নামে। প্রচলিত বিশ্বাস, একসময় কাঁচাখাইতীর মন্দিরে নাকি নরবলিও হত। সত্য-মিথ্যা আমরা জানি না তবে কছারী রাজারা যে ধর্মপরায়ণ ছিলেন, তার নজির চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই আমরা পেয়েছি। বৈদিক ধর্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার মাত্রা অনেক বাড়াল।

খাসপুরের রাজবাটির গা ঘেঁষে চলে গেছে নাকুটি নদী। লোকে বলে, রাজার কল্যাণেই হয়েছিল নাকুটি নদীর সৃষ্টি। শত্রুর অভিযান রোধ করতে আর নিজের গড়কে সুরক্ষিত করতে নাকি এই নদীর খনন হয়। কেননা, অবিশ্বাসী শত্রু মণিপুর তো কাছেই ছিল।

তার ওপারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের বাবা না দাদা হরিচন্দ্র নারায়ণের রানী
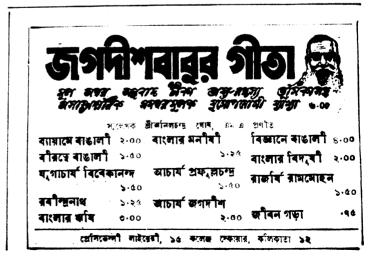
লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক শিবাশ্রম ১৭২০ শকাব্দে। অসমীয়া অক্ষরে লিখিত এক শিলালিপি এখনও মন্দিরের কর্মকর্তার হাতে সযত্নে রক্ষিত আছে। ওই কর্মকর্তা শ্রীগোপী ব্রহ্মচারীই হল বিগত অতীতের একমাত্র প্রতিভূ। অনেক কষ্টে এখনও আগলে আছে শেষ স্বাধীন নৃপতির শেষ স্মৃতিচিহ্নকে।

শিবাশ্রমের শিবলিঙ্গ আনা হয়েছিল কাশীধাম থেকে। কত দুর্গম পথ পেরিয়ে। মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল ইঁট দিয়ে। যে ইঁটের প্রচলন আসামে প্রথম কছারীরাই করেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণ জুড়ে ছিল একটা বিরাট পুকুর। কচুরিপানা অবশ্য এখনও হয়নি, কিন্তু হতে আর কতোদিন।

এই তো সেদিন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দির ধসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে ধসে পড়ল জনসাধারণের স্মৃতির আকাশ থেকে এক বিশাল সূর্য—যে সূর্যের অশেষ ক্ষমায় মণ্ডিত হয়েছিল ওদের সমস্ত অতীত, পরিবর্ধিত হয়েছিল ওদের সমগ্র সম্ভাবনা।

তবু চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। সূর্য খসে যাক, কিন্তু কৃতজ্ঞ মানুষের মন আর সবচেয়ে বড় ওর হৃদয়, সে তো আর আত্মহত্যা করতে পারে না।

সবচেয়ে আনন্দের কথা হল—কাছাড়ের জনসাধারণ ধার্মিক এবং নিজের অতীতকে ভালোভাবেই চেনে। যতই গরীব হ'ক না কেন, পথের ধারে থাকা বিগ্রহকে সামর্থ্য-মতো অর্চনা না দিয়ে ওরা পথ চলে না। ঠিক তেমন নিষ্ঠাভরেই কি হিন্দু কি মুসলমান, সবাই পথের ধারে অযত্নে পড়ে থাকা মন্দির অথবা ভগ্নস্তূপ একটা দেখলেই স্মরণ করে ওদের শেষ স্বাধীন নরপতি গোবিন্দচন্দ্রের কথা।

রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কথা উঠলেই মনে পড়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের এক তরলমন যুবকের কথা। তখন উনি ছিলেন "খাসপুরের" রাজবাটিতে। দাদা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে। দ্বিতীয় স্বার পরিগ্রহ করে সুখেই ছিলেন। রাজকোষের অফুরন্ত ঐশ্বর্য, রাজভক্ত প্রজাদের শ্রদ্ধার গর্ব আর নিজের খেয়াল চরিতার্থ করবার যাবতীয় উপায় সবই ছিল ওর নাগালে। টাকা ছড়িয়ে বিলাসে মেতে থাকতেন দাদার স্নেহের আশ্রয়ে।

তখন খাসপুর থেকে কিছু দূরে বড়-খেলায় আর রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে হরিটিকরে ছিল মফস্বলের সেরেস্তা। খাসপুরের একঘেয়ে স্নেহে বিরাগ আসলেই চলে যেতেন মফঃস্বলে।

এই সুখ সহ্য হল না। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তঃপুরে এসে পৌঁছলেন এক সুন্দর অভিশাপ। তিলোত্তমার রূপ নিয়ে প্রজাপতির অমোঘ নির্দেশে এসে পড়লেন মণিপুররাজ গম্ভীর সিংহের ভগ্নী ইন্দুপ্রভা রাজমহিষীরূপে। আবার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল।

ইন্দুপ্রভার প্রেমে পড়ল গোবিন্দচন্দ্র। সুযোগও মিললো কয়েক মাসের মধ্যেই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। রাজবৈদ্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ভান চিকিৎসায় কৃষ্ণচন্দ্রকে ঠেলে দেওয়া হল মৃত্যুর কবলে। তারপর ইন্দু-প্রভাকে নিয়ে সিংহাসনে বসলেন কাছাড়ের শেষ স্বাধীন নৃপতি গোবিন্দচন্দ্র সিংহ।

জনশ্রুতি বলে, এই গোবিন্দ সিংহ গিয়েছিলেন নদের গৌহাটীতে তীর্থদর্শন মানসে। সেখানে এক উঁচু পাহাড়ের শৃঙ্গে নিয়েছিলেন এক ব্রাহ্মণের শরণ। সেইজন্যেই নাকি এখনও সেই পাহাড়কে স্থানীয় লোকেরা বলে শরণীয়া পাহাড়।

তীর্থদর্শন করেছিলেন বটে, দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন একাধিক কিন্তু দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না।

রাজা হয়েও রাজসুখ থেকে বঞ্চিত হলেন। লুসাই, খাসিয়া, মণিপুরীদের

ইন্দুপ্রভার প্রেমে পড়লো গোবিন্দচন্দ্র

সঙ্গে বেশ বেগ পেতে হল। রাজ্যে শান্তি নেই, সর্বদিনই একটা-না-একটা কিছু লেগে রইল।

শেষকালে মণিপুরীদের অত্যাচারে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন খাসপুর থেকে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে। হরিটিকরের রাজাটিলায় রাজবাটি গড়ে তুললেন। তারপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডেভিড স্কটের সঙ্গে বদরপুরে এক চুক্তি সম্পাদিত হল। দশ হাজার টাকার বিনিময়ে ডেভিড স্কট রাজাকে সাহায্য করলেন তাঁর সৈন্যবল দিয়ে।

ডেভিড স্কট সাহায্যও করেছিলেন, তবে রাজাকে নয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে। তারপরের কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। রাজার রাজকোষ থেকে সাত মণ সোনা চুরি করে লুসাইরা নিয়ে গেল "কাটাখাল" দিয়ে। হাইলাকান্দির নিকটে এক গ্রামে কোম্পানীর সেপাইয়ের হাতে ধরা পড়ল লুসাইরা। গ্রামের একজন প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সেপাইদের সাহায্য নিয়েছিলেন এই স্বর্ণের উদ্ধারকার্যে। চোর তো ধরা পড়ল, কিন্তু সোনার হদিস আজ পর্যন্ত মিলল না।

যাক, সোনা গেলে আরও সোনা আসবে। কিন্তু মানুষের শুভবুদ্ধি এত সহজে মেলে না। তাই গোবিন্দচন্দ্র কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ ওই শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিকে দিলেন অপরিমিত ভূমিসম্পদ।

এদিকে ডেভিড স্কটের সাহায্য চাওয়ার কথা শুনে ক্ষেপে উঠল শত্রুরা। একদিন রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে আক্রমণ করল হরিটিকর রাজবাড়ি। পুড়িয়ে ফেলল পর্বতাকার ধানভাণ্ডার আর হত্যা করল শেষ স্বাধীন নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রকে।

এখন রাজাটিলাতে স্কুল হয়েছে। কিন্তু তার মাটি খুঁড়লে এখনও পাবেন পোড়া ধান। রাজার ঐশ্বর্যের গরিমাকে এখনও যেন ভুলতে দেয় না। তবুও ভুলে গেছে মানুষ। প্রাত্যহিকতার অবসরে কেউ হয়তো মনের বিলাস চরিতার্থ করে এক-একবার ভবে হৃতসর্বস্ব রাজার কথা। সেটাকে তো আর মনে রাখা বলতে পারা যায় না।

আত্মস্মৃতিকে চিরন্তন করে রাখার বাসনা সবারই আছে। রাজা এবং কৃতবিদ্য লোকেরাই করতে পারেন সেই বাসনাকে সফল করার প্রচেষ্টা।

কছারী রাজারাও কম করেন নি। আসামের নানা স্থানে তার সাক্ষী রয়ে গেছে। কাছাড়ে চন্দ্রাগিরি পর্বত (ভুবনহিল) জয়পুর এই সব স্থানে রয়েছে তার সাক্ষ্য।

মনে পড়ে কিংবদন্তীর কথা। তখন রাজা ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র নারায়ণ। একদিন রাজার উপর হল স্বপ্নাদেশ, ভৈরব মন্দির প্রতিষ্ঠা করার, খাসপুর থেকে অনেক দূরে দক্ষিণ-পূর্বে চন্দ্রাগিরি পর্বতের চূড়ায়। হাতী আর লোকজন দিয়ে রাজা পাঠালেন সৈন্যাধ্যক্ষ জয়চন্দ্র বর্মণকে। অটবী অরণ্য, নদী পেরিয়ে জয়চন্দ্র এসে এক জায়গায় প্রতিষ্ঠা করলেন মন্দিরের। চন্দ্রাগিরি কোথায় কে জানে? সৈন্যাধ্যক্ষই যখন জানেন না, রাজার জানবার তো কোনো উপায় নেই। তাই রাজার অজ্ঞতা আর নিজের কুশলতার উপর নির্ভর রেখে এক জায়গায় এসে মন্দির গড়লেন। কিন্তু মানুষের বেলায় চালাকি চলে, দেবতার বেলায় তো আর চলে না। আবার স্বপ্নাদেশ হল। দেবতা রুখে দাঁড়ালেন। রাজাও রুখে দাঁড়ালেন জয়চন্দ্রের উপর। তাই ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে আবার বেরোলেন জয়চন্দ্র চন্দ্রাগিরির খোঁজে। 'ধলাই'র পূর্বে গিয়ে এইবার সঠিক ঠিকানাই খুঁজে পাওয়া গেল।

সেই চন্দ্রগিরিতেই হল ভৈরব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। আজও শিবরাত্রির মেলা হয় সেখানে। পূজারী আর তামশেগীরের সমদল চলে চড়াই পথে। কিন্তু কে মনে রাখে রাজার কথা? জয়চন্দ্রের নামানুসারে হল জয়পুর, রাজার নাম নিয়েই হল রাজাবাজার। কিন্তু সে তো হল শুধু নাম। অর্থ, ইতিহাসবিবর্জিত নগ্ন কয়েকটা নাম।

তবুও এই ইতিহাস 'বিস্মৃতির মর্মে বসি' কাছাড়ের আত্মায় দোলা দেয়। খাসপুরে ডিমাছা নেই। হরিটিকরেও নেই। রাজার ইতিহাসকে ওরা আজ ভুলে যেতে চায়। রাজাকে নিয়ে গর্ব করে যত, তার চেয়ে বেশী করে ঔদাসীন্য—ঠিক রাজার প্রতি নয়, রাজ-সংস্কৃতির প্রতি।

কি জানি কেন? হয়তো রাজার অবর্তমানে পৃথিবী ওদের দিয়েছে সহানুভূতির ছলনায় উপহাস, স্নেহের বদলে বিদ্রূপ তার শ্রদ্ধার নামে দয়া। এসেছিলেন ভাগ্যের শিকার করতে, শেষ পর্যন্ত নিজেরাই হলেন শিকার।*

[* প্রবন্ধের লেখকের মাতৃভাষা বাংলা নয়। তিনি আসামের কছাড়ী জনজাতীয় সমাজের মানুষ; আসাম রাজ্য সরকারের একজন পদস্থ প্রশাসনিক। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক।]
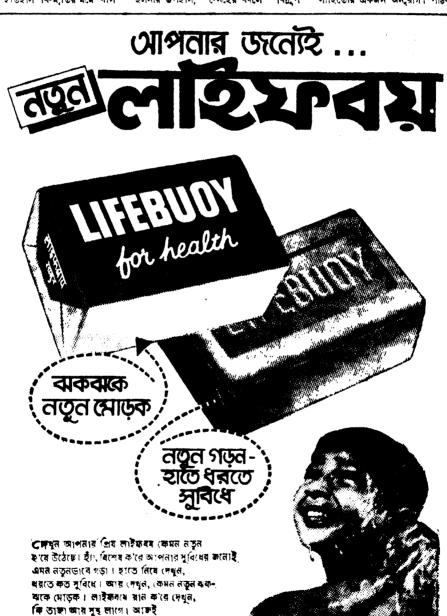
॥ ৪ ॥

পরদিন ভোরে ভোলাবাবুদের ফিল্ড ওয়ার্কে বেরবার কথা, কাজেই লামি ঘুম থেকে উঠেই হাতুড়ি হাতে ওদের গাড়ি করে চলে গেল পাথর ভাঙতে। আর আমরা ঘুম থেকে উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে দেখি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন ভোলাবাবুর মামা।

—চলুন আপনাদের কারেল চাপেকের জন্মস্থান দেখিয়ে আনি।

আমাদের গ্রামের নাম 'টির্নে'। তার পাশের গ্রাম 'মালে স্বাটনভিৎসে'। সেইখানেই চেকোস্লোভেকিয়ার এ যুগের শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক কারেল চাপেক জন্মেছিলেন। কারেলের সব উপন্যাস এবং নাটকই ইংরেজীতে তর্জমা হয়েছে। যুদ্ধের আগে চাপেকের বই ইংলণ্ডের লোক প্রচুর পড়ত। চাপেকের বিখ্যাত নাটক 'ইনসেক্ট প্লে' এবং 'মাদার' মাসের পর মাস লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এমন একটি ছোট্ট দেশ থেকে আধুনিক যুগে বিশ্বের সাহিত্য ক্ষেত্রে যে এদেরই একজন গদ্যলেখক পাকাপোক্ত স্থান করে নিয়েছেন এর জন্যে এরা সবাই ভারি গর্ব অনুভব করে। চাপেকের উপন্যাস ছাড়াও তাঁর অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী, ছোট গল্প এবং রম্যরচনা আমি পড়েছিলুম। উপন্যাসের চেয়েও সেগুলি আমার আরও ভালো আরও সরস আরো মধুর লেগেছিল। কাজেই চাপেকের জন্মস্থানের এত কাছে আমরা এসে পড়েছি এটা যখন শুনলুম তখন সুখী এবং চঞ্চল না হয়ে থাকতে পারলুম না। মামাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম মালে স্বাটনভিৎসে গ্রামের দিকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দু পাশে গমের ক্ষেতের মধ্য দিয়ে রাস্তা। গম কাটা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে 'য়েটেল' আর ঘাসের জমি। এই থেকে এদের ঘোড়ার বিচালি হয়। য়েটেল একটু বেড়ে উঠলেই কেটে ঘরে নিয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যে ডগা থেকে আবার পাতা বেরয়। তখন আবার কাটে। এমনি চলে শীতের আরম্ভ পর্যন্ত। এদের শুকিয়ে বাড়ির ছাদের ঘরে জমা করে রেখে দেয়। শীতকালে যখন চারিদিক বরফে সাদা, কোথাও ঘাসের চিহ্ন মাত্র থাকে না তখন ছাদের ঘর থেকে এই বিচালি টেনে বার করে ঘোড়াকে গরুকে খেতে দেয়। চর্ণিক যারা, তারা জানে এই শুকনো ঘাসের আসল মূল্য। সন্ধ্যার সময় ঘুরতে ঘুরতে কোনো অচেনা গ্রামে পৌঁছে অজানা চাষীর বাড়ি আশ্রয় নিলে তার ছাদের ঘরে শুকনো ঘাসের উপর রাত কাটাবার স্থান পাওয়া যায়। শুকনো ঘাসকে এরা বলে 'সেনো'। সেনোর উপর চাদর পেতে ঘুমোতে যা আরাম—চর্ণিক হয়ে যে না ঘুমিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

কারেল চাপেক

গম আর সেনোর জমির ঠিক পিছনেই ঢিপি-মত একখানা পাহাড়। মামাবাবু বললেন—এ পাহাড়টা এখানে কেমন করে এল জানেন?

আমরা বললুম—পাহাড় আবার আসে নাকি? যেখানকার পাহাড় সেখানেই তো থাকে।

মামাবাবু মুখ গম্ভীর করে বললেন—এ পাহাড় সে রকম পাহাড় নয়। শুনুন তাহলে বলি। এই যে ককনশে অঞ্চল দেখছেন এখানে পুরাকালে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, এও তার মধ্যে একটা। আমাদের গ্রাম থেকে খুব বেশী দূরে নয়, এক জায়গায় একটি সুফলা চেরিগাছ ছিল, সে গাছে সারা বছর চেরি ফল ধরত। ফল খেতেও যেমন মিষ্টি ফলের গুণও ছিল তেমনি। সেই চেরি খেয়ে কত লোকের কত রোগ যে সেরে গেছে তার ঠিক নেই। একবার হল কি, সেই চেরিগাছ হঠাৎ যেতে লাগল শুকিয়ে। তাতে আর ফল ধরে না। সবাই বললে—দেশের লোকের পাপে গাছ মরে যাচ্ছে। তাকে অনেক বাঁচাবার চেষ্টা হল কিন্তু কিছুই হল না। একের পর এক পাতা ঝরে ঝরে পড়ে যেতে লাগল; একের পর এক ডাল শুকিয়ে যেতে লাগল। সেই সময় কোথা থেকে দেশে এক সাধু এলেন। তিনি এসে বসলেন সেই গাছের তলায়। তিনদিন শুধু চুপ করে বসে রইলেন। তারপর চেরি গাছের তলা থেকে একখানি পাথর সরিয়ে ফেললেন। পাথর সরাতেই কুল-কুল করে ঝরনার জল বয়ে চলল। গ্রামের লোক চারিদিক থেকে সাধুকে দেখতে জড় হয়েছে। সাধু বললেন—খোঁড়ো এখানে এক 'স্টুডাংকা' অর্থাৎ চৌবাচ্চা। সবাই মিলে মস্ত এক স্টুডাংকা খুঁড়ে ফেলল। সেই স্টুডাংকা থেকে জল তুলে গাছের গোড়ায় ঢালতেই গাছ আবার আগের মত হয়ে গেল। সবুজ পাতায় গাছের ডাল গেল ভরে। খবরটা রটে যেতেই চারিদিক থেকে পুজো পড়তে লাগল সেই স্টুডাংকার আর গাছ-তলায়। জায়গাটা তীর্থস্থানে

পরিণত হল। লোকেরা বললে, এখানে ঠাকুরের মন্দির তৈরি করতে হবে।

এখন ঠাকুরের শত্রু হচ্ছেন শয়তান। শয়তানের কানে যেই এ খবরটা পৌঁছল অমনি সে তার একজন 'চের্ট'কে অর্থাৎ দৈত্যকে পাঠিয়ে দিল স্টুডাংকা বুজিয়ে গাছটাকে মেরে ফেলবার জন্যে। চের্ট করল কি, একখানা ছোট-খাট পাহাড় উপড়ে নিয়ে রাত্তির বেলা রওয়ানা হল আমাদের এই গ্রামের দিকে। আমাদের গ্রাম পেরিয়ে তবে পবিত্র স্টুডাংকা আর চেরি গাছ। দৈত্যের চেষ্টা পাহাড় চাপা দিয়ে স্টুডাংকা বন্ধ করে দেবে। এই করতে পারলে ঝরনাও চাপা পড়বে, গাছও মরে যাবে, ঠাকুরের মন্দিরও আর তৈরি হবে না—তীর্থস্থান যাবে ভেঙে। দৈত্য ছুটল পাহাড় কাঁধে। অনেক পথ যেতে হবে, রাত পোয়াবার আগেই পৌঁছতে হবে। রাত পুইয়ে গেলে শয়তানের চের্টের জারি-জুরি আর খাটবে না। চের্ট যখন আমাদের গ্রামের কাছে এসে পৌঁচেছে তখনও রাত রয়েছে। আর একটু এগুলেই সে স্টুডাংকার কাছে পৌঁছে যায়। ঠিক সেই সময় ঠাকুর করলেন কি, এই গ্রামের মোরগদের বললেন—ডাকো তোমরা। গ্রাম সুদ্ধ মোরোগ চারিদিক থেকে ডেকে উঠল—কক্কর কোঁ! সে কী আওয়াজ। চের্ট ভাবলে, সকাল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে পাহাড় নামিয়ে দৌড় দিল পাতালে। স্টুডাংকা বেঁচে গেল। আর ঐ দেখুন সেই পাহাড়। সেই থেকে আজ অবধি ওখানে পড়ে আছে।

আমরা শুনে তাজ্জব হয়ে গেলুম। বললুম—আর সেই স্টুডাংকা? সেই চেরি গাছ?

—চেরি গাছ কি অতদিন বাঁচে? কবে মরে গেছে। চলুন স্টুডাংকা দেখাতেই তো নিয়ে যাচ্ছি। চাপেকের বাড়ির পাশেই। এই বলে তিনি মালে স্বাটনভিৎসের দিকে পা বাড়ালেন। আমরাও পিছু ধরলুম।

মাইল দেড়েক দূরে মালে স্বাটনভিৎসে গ্রাম। সকালের আকাশ মেঘলা। গ্রামের পথে লোকজন খুব কম। এই শান্ত গ্রামের রাস্তায় মাঠে কারেল আর তাঁর ভাই য়োসেফ চাপেক মানুষ হয়েছেন। য়োসেফ চাপেকেরও লেখক বলে নাম আছে, তবে য়োসেফের খ্যাতি শিল্পী হিসাবেই বেশী। এই দুই ভাইকে জন্ম দিয়ে এদের গ্রাম ধন্য। এমনি মেঘলা আলোয় জানলার ধারে বসে কারেল প্রথম গল্প প্রথম উপন্যাস লিখেছেন। য়োসেফ তুলি হাতে নিয়ে হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। সেদিনের সকালে কি হয়েছিল জানিনা, মনে হচ্ছিল যেন এ গ্রাম থেকে সভ্য-জীবনের সমস্ত বেগ, চাঞ্চল্য, কর্মব্যস্ততা ছুটি নিয়েছে। আমরা ধীর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমে গ্রামের চত্বরে এসে পৌঁছলুম। প্রস্তরময় স্থানটি। একদিক তার নীচু, অন্য দিক উঁচু। এই হচ্ছে গ্রামের কেন্দ্রস্থল। এখানে গ্রামের পৌর আপিস, গ্রাম-সরকারের আপিস আর চাপেকের মিউজিয়াম স্থাপিত। আমাদের দেশে হলে এইখানে থাকত গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ। চাপেকের বাবা ছিলেন ডাক্তার। এই বাড়িতেই তিনি থাকতেন। দুই ছেলের জন্ম এই বাড়িতে। সেই বাড়ি সযত্নে রক্ষা করেছে এখানকার মানুষেরা। আমাদের দেশে হলে কবে ভেঙে উড়িয়ে দিত। আমরা পৌঁছে দেখলুম মিউজিয়ামের দ্বার বন্ধ। চারিদিকে কেমন একটা যেন ছুটি ছুটি ভাব। কিন্তু মামাবাবু কি অত সহজে ছাড়বার পাত্র? ভারত থেকে চাপেকের ভক্তরা এসেছেন, তাঁদের কি বন্ধদ্বার দেখিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, না বসিয়ে রাখা যায়? চললেন তিনি চাবির খোঁজে। চত্বরে এসে বললেন—উঁচুর দিকের ঐ কোণে সেই

পবিত্র স্টুডাংকা আর মন্দির। দেখে আসুন গিয়ে। আমি চাবির অধিকারীকে খুঁজে বার করি ততক্ষণ।

আমরা সেই পবিত্র স্টুডাংকার দিকে এগুলুম। লোহার রেলিং দিয়ে খাঁচার মত করে ঘেরা গোল একখানা চৌবাচ্ছা। তার মাথার কাছে পাথরের মধ্য দিলে কলকল করে জল বেরিয়ে চৌবাচ্ছা ভর্তি হচ্ছে। স্বচ্ছ চৌবাচ্ছার জলের মধ্যে রাশি রাশি টাকা পয়সা চকচক করছে। তীর্থযাত্রী যারা আসে জলের মধ্যে পয়সা ফেলে পুণ্য সঞ্চয় করে। জলের ধারে ঐতিহাসিক চেরিগাছ আর নেই। দেয়ালের গায়ে চেরিগাছের একখানা ছবি শুধু আঁকা। উপরে যীশুমাতা মেরীর মন্দির। ঝরনার জল অতি উপাদেয়। ভেষজ গুণও নাকি আছে। এক চুমুক করে সেই প্রবহমান ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিয়ে আমরা চত্বরে এসে নামতেই মামাবাবু দেখি আমাদের চেঁচিয়ে ডাকছেন। মিউজিয়ামের কর্তাকে পাওয়া যায়নি, তিনি শহরে. কিন্তু যে রক্ষয়িত্রীর কাছে চাবি থাকে তাঁকে পাওয়া গেছে। তিনি চত্বরেরই একটি দোতলা বাড়ির বারান্দা থেকে রেলিং-এর উপর মোটা মোটা হাত রেখে মামাবাবুর সঙ্গে কথা কইছেন। ভারতের মত সুদূর দেশ থেকেই যে অতিথিরা এসেছেন মামাবাবুর এ কথায় রক্ষয়িত্রীর তখনো সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেনি। তাই মামাবাবু তাড়াতাড়ি আমাদের চেহারা দেখাতে চান। আমরা খানিকটা এগিয়ে আসতেই উপর থেকে আমাদের আকৃতি তাঁর চোখে পড়ল। তিনি হন্তদন্ত হয়ে হাতে চাবি ঝুলিয়ে নেমে এলেন। তারপর মহা খাতির করে নিয়ে গেলেন আমাদের মিউজিয়ামে।

কারেল চাপেকের সব কিছু রক্ষয়িত্রীর একেবারে মুখস্থ। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গড়গড় করে কি সব বলে যেতে লাগলেন না থেমে। ঐ প্রচণ্ড স্রোতের মধ্য থেকে হয়তো এক আধটা পরিচিত শব্দ ছটকে আসছিল কানে, বাকিটা অবোধ্য। আমরা অমনোযোগী হয়ে পড়লুম কিন্তু তাতে মহিলার বক্তৃতার তোড় একটুও কমল না, তিনি কড়িকাঠের দু ফুট নীচে দেয়ালের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাঁর বাক্যস্রোত চালিয়ে যেতে থাকলেন। আমরা কখন যে আস্তে আস্তে তাঁর কাছ থেকে সরে গিয়ে মিউজিয়ামের নানা দ্রব্যাদির আশে পাশে নিজেদের নির্লিপ্ত করে ফেলেছি তা তিনি টেরই পেলেন না। সেই সময় মিউজিয়মের কর্তা এসে ঢুকলেন। শহরে গিয়েছিলেন, কেউ বোধ হয় তাঁকে খবর দিতে ছুটেছিল। তাঁকে দেখে রক্ষয়িত্রীর বক্তৃতা থেমে গেল এবং তাঁর সুকঠিন কর্তব্য কেমন সুদক্ষ-ভাবে সমাধা করেছেন এই উপলব্ধিতে তাঁর মুখ স্মিত হাস্যে ভরে গেল। আমরা দেখলুম রক্ষয়িত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে মিউজিয়ামের কর্তা হাঁপাচ্ছেন।

তারপর তিনি যখন দম ফিরে পেলেন, আমাদের প্রচুর আপ্যায়ন করলেন। ছোট ছোট বই দিলেন এবং দেখাতে শুরু করলেন মিউজিয়ামের এক মুড়ো থেকে আর এক মুড়ো পর্যন্ত। প্রায় যখন মিউজিয়াম দেখা শেষ করে এনেছি সেই সময় ভোলাবাবু আর লামি তাদের পাথর কাটা শেষ করে মিউ-জিয়াম দেখতে এসে হাজির। কর্তামশায় নতুন উৎসাহে আবার গোড়া থেকে মিউ-জিয়াম দেখানো শুরু করলেন।

ক্রকনশে পাহাড়ের নীচে যে অঞ্চলে আমরা এসেছি সেটা খনি অঞ্চল। অনেকগুলি কয়লার খনি এখানে আছে। টিনে আর মালে স্বাটনভিৎসের অধিকাংশ লোকই কোন না কোন রূপে কয়লার খনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বংশ-পরম্পরা ধরে এই চলে আসছে। চাপেকের বাবা ছিলেন খনির ডাক্তার। গ্রামের বড়লোকেরা ছিল সব খনির মালিক। এখন খনির স্বত্ব জাতির। জাতির জীবনের মানের অগ্রগতির প্রধান উপকরণ, দেশের শ্রমশিল্পের টিকে থাকবার প্রধান উপায়, মোটের উপর

জাতির দিনকে দিন বেঁচে থাকবার রসদ আসে এই খনির থেকে। চাপেকের বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখনকার দিনে খনির মালিকরা খনিগুলোকে মনে করত খুব বড়লোক হয়ে যাবার একটা চমৎকার উপায়। আজকের দিনে চেকরা মনে করে খনিগুলি হচ্ছে সমস্ত জাতির স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার অন্যতম সহায়। সেই জন্যেই এরা খনি অঞ্চলের চেহারা একেবারে ফিরিয়ে দিয়েছে। খনি অঞ্চল শুনলেই যেমন মনে হয় কালো-কালো ময়লা, নোংরা গলি, ভাঙা বাড়ি, খোলা নর্দমা আর দুর্গন্ধ-ভরা বস্তি, তেমন মোটেই নয় জায়গাটা। বরং একেবারে উল্টো। অন্য অনেক শহরের চেয়েও মনে হয় যেন বাড়িগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজানো-গোছানো; রাস্তাগুলি ঘষা মাজা; জানলায় জানলায় ফুলের গাছ, বাগানে সযত্নে পালিত ফলের গাছ। ঘরে ঘরে রেডিও, টেলিভিশন, বিজলি উনুন, বিজলি কাপড়-কাচা কল। আজকাল খনিতে যারা কাজ করে তারা নামেই মজুর, কাজের বেলা তারাই কর্তৃপক্ষ। নিজেদের মাইনে একরকম নিজেরাই ঠিক করে। বেশ আরামে আছে। নতুন নতুন বাড়ি, আধুনিক কায়দার ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে এদের জন্যে চারিদিকে।

মিউজিয়াম থেকে ফিরে এসে ভোলাবাবু সেদিন বললেন, তারপর দিন তিনি ক্রকনশে পাহাড়ের উপরে যাবেন। সেখানে এক পাহাড়ি কুটিরে তাঁর স্ত্রী ও দুটি শিশু ছুটি কাটাচ্ছেন। কাছেই পাহাড়ের উপর তাঁদের ফিল্ড ওয়ার্ক হচ্ছে, এবার তাঁকে সেইখানে কাজে যেতে হবে। লামি তাঁর সঙ্গে গেলে ভালো হয়। তাঁদের পাহাড়ী কুটিরে থাকতেও পারবে লামি কদিন। আমরা বললুম—এ অতি উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আমাদেরও একটা পাহাড়ী কটির যোগাড় করে দিন না। দু-চার দিন কাটিয়ে আসি। ঠিক হল ভোলাবাবু আর লামি পরদিন পাহাড়ে গিয়ে খুঁজে দেখবেন আমাদের থাকবার মত জায়গা মেলে কি না।

ভোলাবাবুর বাবা বলবেন—চাপেকের জন্মস্থান তো আপনারা দেখলেন, বোজেনা নেম্‌ৎসোভা কোথায় তাঁর শৈশব কাটিয়েছিলেন দেখবেন না? বলে আলমারি থেকে টেনে নেম্‌ৎসোভার একটি সুদৃশ্য সংস্করণ "বাবিচ্‌কা" বার করলেন। বাবিচ্‌কা অর্থাৎ দিদিমা বোজেনা নেম্‌ৎসোভার বিখ্যাত উপন্যাস।

আমরা বললুম—বোজেনা নেম্‌ৎসোভার জন্মভূমি এখানেই নাকি?

ভোলাবাবুর বাবা বললেন—এখান থেকে ট্রেনে করে পুবমুখো একটু দূরে গেলেই উপা নদীর ধারে ফুলে ভরা যে অপূর্ব উপত্যকা পাবেন তারই নাম বাবিচ্‌কার উপত্যকা। বোজেনা যদিও জন্মেছিলেন বিদেশে ভিয়েনা শহরে, কিন্তু জন্মের পরেই তাঁর বাপ-মা তাঁকে নিয়ে চলে আসেন এখানকার রাটেবারিৎসে গ্রামে। বাবিচ্‌কার উপত্যকার পাশেই ঐ গ্রাম। সেই গ্রামেই তাঁর বেশীর ভাগ জীবন কেটেছিল। যান, কাল গিয়ে দেখে আসুন—ভাল লাগবে আপনাদের।
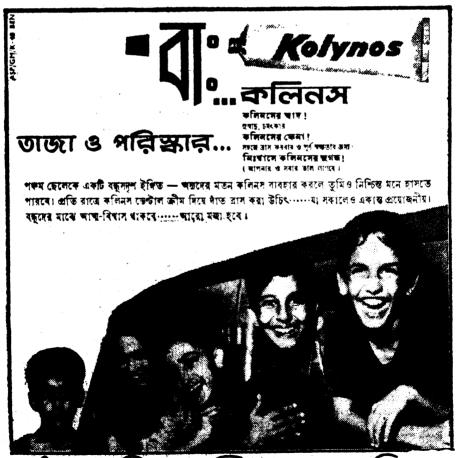
কাজেই তার পর দিন বেরলুম আমরা বাবিচ্কার উপত্যকা দেখতে। বোজেনা নেম্‌ৎসোভার লেখা বাবিচ্কা আমার পড়া ছিল। অপূর্ব বই। নিজের অতীব দুঃখ দুর্দশা এবং কষ্টের সময় একটু একটু করে এই বই তিনি লিখেছিলেন। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে দারিদ্র্যের মধ্যে বোজেনা মারা যান। শৈশব আর কৈশোরের সুখস্মৃতি আর তাঁর বাবিচ্কার মধুর স্নেহময় অপূর্ব চরিত্র বোজেনা কোনো দিন ভুলতে পারেন নি। দুঃখের দিনে অতীতের সেই সুখস্মৃতিকে উল্টে-পাল্টে দেখে রচনার মধ্যে যে আনন্দ পেতেন সেই টুকুই ছিল তাঁর শেষ জীবনের একমাত্র সুখোপভোগ। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তাঁর বাবিচ্কাকে তিনি অমর করে রেখে গেছেন। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় যখন বোজেনার জন্ম হয় তখন তাঁর মায়ের মা বাবিচ্কা বহু দূরে সিলেশিয়া অঞ্চলের এক গ্রামে বাস করতেন—মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে কোনো দিন দেখা হত না। বোজেনার জন্মের কয়েক বছর পরেই বোজেনার বাবা ভিয়েনা ত্যাগ করেন। তিনি একটি মনের মত কাজ পেয়ে যান। কাজটা রাটিবরিৎসে গ্রামে, এবং জায়গাটা সিলেশিয়া থেকে বেশী দূরে নয়। বোজেনার মা বাবিচ্কাকে লেখেন সিলেশিয়ার গ্রামের পাট তুলে দিয়ে রাটিবরিৎসেতে চলে আসতে। বৃদ্ধা দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। সিলেশিয়ার যে গ্রামে থাকতেন সুখে ছিলেন। সেখানে তাঁর কোনো আত্মীয় ছিলেন না, কিন্তু গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ ছিল আত্মীয়ের বাড়া। এদের সবাইকে ছেড়ে এই বুড়ো বয়সে অজানার সন্ধানে ভেসে যাওয়া তাঁর পক্ষে বড় সমস্যাময় বড় কঠিন। কিন্তু তবু রক্তের টান বড় টান। অজানা দেশ হোক, তবু নাতি-নাতনীদের তো কাছে পাবো—এই টানে পড়ে তিনি সব ছেড়ে চলে এলেন উপা নদীর তীরে মেয়ে জামাইয়ের কাছে। সেদিন প্রথম এসে পৌঁছলেন, ছোট ছোট নাতি-নাতনীদের সে কী উত্তেজনা। তারা তো দিদিমাকে কখনো দেখেনি, কেমন তিনি হবেন কে জানে? অন্য শিশুদের দিদিমাদের তারা দেখেছে, তাই মনের মধ্যে দিদিমা বস্তুটির একটা ছবি তাদের আঁকা ছিল, কিন্তু যখন তাদের নিজেদের দিদিমা এসে গাড়ি থেকে নামলেন তারা দেখল তাদের কল্পনার সঙ্গে একটুও মিলছে না। এ একেবারে নতুন বস্তু। তারপর থেকে এই বাবিচ্কা ছাড়া নাতি-নাতনীদের একটি দিনও কাটেনি। অদ্ভুত গল্প বলার ক্ষমতা এবং কৌশল ছিল বাবিচ্কার। বাবিচ্কার প্রভাব নাতি-নাতনীদের সারা জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিল। বাবিচ্কার মুখে গল্প শুনতে শুনতেই বোজেনার গল্প লেখার আগ্রহ জন্মায়। তিনি বহু রূপকথা সংগ্রহ এবং রচনা করেছেন। গ্রাম্য জীবন নিয়ে অপূর্ব রচনা তাঁর আছে। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা দিদিমার স্মৃতির পক্ষপুটে বসে তাঁরই স্নেহচ্ছায় বিগত শৈশবের সহজ সরল সুখের দিনগুলির লিপি "বাবিচ্কা।"

আঁকাবাঁকা পথে পাহাড়ী ট্রেন ছুটে চলেছে। ট্রেন থেকে উপা নদীর তীর চোখে পড়ল। আমরা এসে নামলুম স্টেশনে। তারপর এগলুম গ্রামের দিকে। জায়গাটা ভারি সুন্দর। উপা নদীর একদিকে খাড়া পাহাড় আর বন। অন্য দিকে মস্ত চওড়া সবুজ ঘাসে ভরা উপত্যকা। তার পাশে পাশে বাদাম গাছের সারি। উপত্যকার এ পাশেও প্রকাণ্ড একটা বন আছে। বনের উঁচু উঁচু গাছের চন্দ্রাতপের আড়ালে রোদ এসে পৌঁছয় না মাটির উপর। এরা বলে বন-মোরগের বন। বন-মোরগ চারিদিকে—তাদের তীক্ষ্ণ ডাক আর ডালপালার মধ্যে দিয়ে শোঁশোঁ করে উড়ে যাওয়ার চকিত শব্দ থেকে থেকে কানে আসে। বনের মধ্য দিয়ে সুঁড়ি রাস্তা বেয়ে আমরা চললুম। বনের ভিতরে ঠিক মনে হয় রূপকথার দেশ। পথ হারিয়ে যে-কোন সময় যেন পিঠে-দিয়ে-গড়া ডাইনি বুড়ির কুটিরে পৌঁছে যাওয়া যায়। এই বন পেরিয়ে জমিদার বাড়ি, সেখানে নেম্‌ৎসোভার বাবা কাজ করতেন। এখন মিউজিয়মে পরিণত। কিছু দূরে বাবিচ্কা তাঁর নাতি-নাতনীদের হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছেন এই মূর্তি গড়ে বনের ধারে এক রাস্তার মোড়ের মাথায় এরা দাঁড়িয়ে রেখে দিয়েছে। কাছেই বোজেনা নেম্‌ৎসোভার বাড়ি দেখলুম আর বাড়ি থেকে একটু দূরে নদীর ধারে পুরোনো দিনের নদীর জলশক্তিতে চলা যাঁতা-কল, যার কথা নেম্‌ৎসোভার কত লেখার মধ্যেই আছে। আর দেখলুম, নেম্‌ৎসোভা যেখানে পড়তে যেতেন সেই বহু দিনের পুরোনো ঐতিহাসিক কালের আসবাব ভরা স্কুলটি। এ সবই আজ এদের জাতীয় সম্পত্তি। প্রতিটি জিনিস, যেটি যেখানকার, অতি যত্নে তাদের রক্ষা করা হয়েছে। সারা দেশ থেকে লোক আসে এই সব মিউজিয়াম দেখতে।

তারপর আমরা একটু হাত-পা ছড়াবার জন্যে ফিরে চললুম বাবিচ্কার উপত্যকায়। রোদের আলোয় প্রকাণ্ড একটি সবুজ গালিচা বিছিয়ে রয়েছে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে। কী তার কারুকার্য! কাছে গিয়ে দেখলুম প্রায় এক হাঁটুর সমান নরম ঘাসে ভরা মাঠ আর কি বিচিত্র ফুলই যে ফুটেছে সারা মাঠ ভরে, দেখে দেখে আর চোখের ক্ষুধা মেটে না। ঘাস মাড়াতে পা সরে না। অনেক খুঁজে সরু মত একটা পথ পেয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে নদীর দিকে এগলুম। ছোট্ট একটি নদী—বড় বড় পাথরের গোলার উপর দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে। সাঁকোর উপর দিয়ে ওপারে গিয়ে বাদাম গাছের তলায় বসে অবাক হয়ে তাকালুম উপত্যকার দিকে। এইটুকু নদীর কী বিস্তৃত উপত্যকা! নিশ্চয় এ নদীতে যখন বান আসে তখন ঐ মাঠের শেষ পর্যন্ত এর জল গিয়ে পৌঁছয়, তা নইলে অত বড় উপত্যকা হবে কেন? মনে পড়ে গেল বাবিচ্কা বইটির একটি পরিচ্ছেদের কথা। উপা নদীতে সেবার বান এসে-

ছিল। সবে বসন্ত কাল তখন এসেছে। বরফ গলে গিয়ে মাঠ হয়ে উঠেছে সবুজ, তার উপর এসেছে বসন্তের ফুলের জোয়ার। পাহাড়ের উপর খোলা রোদে গিরগিটিরা চিত হয়ে রোদ পোয়াতে শুরু করেছে। সেই সময় একদিন সকাল বেলা গ্রামের বনরক্ষী এসে বাবিচ্কাকে বললেন, তিনি শুনে এসেছেন পাহাড়ে নাকি দুর্জয় বৃষ্টি নেমেছে। বসন্তের বৃষ্টি ঐ রকমই আসে। প্রচণ্ড বৃষ্টির জল আর তার সঙ্গে মেশে বরফ-গলা জল। পাহাড়ী ঝরনা গুলো সব ফুলে ফেঁপে ওঠে।

বাবিচ্কা উদ্বিগ্ন হয়ে বনরক্ষীর দিকে তাকান। জিজ্ঞেস করেন, তাঁর মত কি? বৃষ্টি তো প্রতিবারই হয়, এবারকার অবস্থা কি আশঙ্কাজনক?

—খুবই খারাপ অবস্থা। বলে গম্ভীর মুখে বনরক্ষী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

তারপর দুপুর বেলা এসে বনরক্ষী বললেন, নদীর জল ক্রমশ উপর দিকে উঠতে আরম্ভ করেছে। বাইরে থেকেও যে সব খবর এসেছে তাও খুব আশাপ্রদ নয়। এখনই সাবধান হওয়া দরকার। তিনি বললেন—বাড়ি ছেড়ে সবাই চলে আসুন আমার কুটিরে। বনরক্ষীর কুটির ছিল পাহাড়ের উপরে। সেখানে বানের জল পৌঁছবে না। নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু বাবিচ্কা বললেন—না। নাতি-নাতনিদের নিয়ে তাদের মা চলে যাক বনরক্ষীর কুটিরে। তিনি নিজে কিন্তু বাড়ি আগলাবেন। মেয়ে ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি শুনলেন না মেয়ের কথা। শুধু ঝি উরসুলাকে ডাকলেন। বললেন—উরসুলা আমার সাহায্য করবে নিচের ঘরের আসবাব পত্র দোতলার ঘরে তুলে ফেলতে। বলে সবাইকে পাঠিয়ে দিলেন বিপদের বাইরে। নিজে বুড়ো মানুষ রয়ে গেলেন এক উরসুলাকে নিয়ে যুঝতে বানের সঙ্গে।......

"যেমন সন্ধ্যে হয়ে এল জলও উঠতে লাগল উঁচু থেকে আরো উঁচু। নদীর গা থেকে যে নালী দিয়ে পোষাই কলে জল ঢুকত তাও ভর ভর হয়ে এল। বাঁধের ওপারে যতখানি মাঠ তা ইতিমধ্যেই জলের তলায়। বাড়িটা নীচু জমির উপর; সেখান থেকে নদীর উঁচু পাড়টা দেখা যায়। পাড়ের গায়ে যেখানেই ভর্তি গাছের শ্রেণীতে ফাঁক সেখান দিয়ে দিদিমার চোখে পড়ছিল জলের উত্তাল তরঙ্গ বয়ে চলেছে। তিনি চেখার টেকো সরিয়ে রাখলেন। হাত জোড় করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে বসলেন। উরসুলা ঘরে এসে ঢুকল। ক্ষিপ্র হাতে জানলার ধারের বোঁচকাটা বাঁধ দিতে দিতে বলল—জলের যা গর্জন, শুনতে শুনতে ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। জন্তুরা যেন টের পেয়েছে কিছু একটা হবে। সব লুকিয়ে পড়েছে, কোথাও একটি চড়াই পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া গেল আর বাঁধের ধারের রাস্তা ধরে একজন ঘোড়-সওয়ার উর্দ্ধশ্বাসে এসে হাজির হলেন। এক মিনিটের মত তিনি ঘোড়ার বেগ কমিয়ে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—গ্রামবাসী সব! নিজেদের প্রাণ বাঁচাও! বান আসছে! বলেই তিনি জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে নদী তীর ধরে পোষাই কারখানার দিকে চলে গেলেন এবং সেখান থেকে শহরের দিকে।

দিদিমা মুখ শুকিয়ে বললেন—ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। উজানের দিকে তাহলে নিশ্চয় খুব খারাপ—না হলে ওরা দূত পাঠায়? আবার তখনই তিনি সাহস দিতে থাকলেন উরসুলাকে। তারপর আর একবার গেলেন তিনি উঁকি মেরে দেখতে—যাতে নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে বাঁধ এখনও টিঁকে আছে—কূল ছাপিয়ে যায়নি।......

মধ্যরাত্রির ঠিক আগে বাড়ির চারিদিকে জলে ছেয়ে গেল। যে দিকটায় পাহাড় সেদিকে পাহাড়ের গা দিয়ে লোকে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল। বনরক্ষী পাহাড়ের গায়ে-লাগা বাইঃশালায় ঢুকে দিদিমারা কেমন আছেন জানবার জন্যে দিদিমার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। তিনি জানতেন এমন রাতে দিদিমা নিশ্চয়ই ঘুমোন নি।......সব কিছু ঠিক আছে খবর নিয়ে বনরক্ষী ফিরে গেলেন দিদিমার মেয়ে আর নাতি-নাতনীদের নিশ্চিন্ত করবার জন্যে।

যখন সকাল হল তখনই ঠিক জানা গেল বন্যা কতদূর এসেছে। সমস্ত উপত্যকা এক প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত হয়েছে। একতলার বসবার ঘরে কাঠের পাটাতন পেতে তবে এক দিক থেকে আর একদিকে যাওয়া যায়। ঝাকুব অনেক কষ্টে জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে পাহাড়ের গায়ে মুরগীদের খাওয়াতে গেল। জলের এমনই তোড় যে ঝাকুবকে ফেলে দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল না এইটেই আশ্চর্য। দিনের বেলা বনরক্ষীর বাড়ি থেকে সবাই এল বাড়ির কি অবস্থা হয়েছে দেখবার জন্যে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে শিশুরা যখন দেখল তাদের বাসস্থান জলমগ্ন আর তাদের দিদিমা বসবার ঘরে পাটাতনে পা রেখে জলের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছেন তখন তারা এমনই কান্না শুরু করে দিল যে তাদের শান্ত করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়াল।

কুলিরা এসে খবর দিলে, নদীর নিম্নভাগে যে সব গ্রাম সেখানকার অবস্থা নাকি আরো অনেক খারাপ। কিলচু গ্রামে দুখানা বাড়ি স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তার মধ্যে একটা এক বুড়িসুদ্ধ ভেসে গেছে। ঘোড়-সওয়ার এসে বুড়িকে সাবধান করে দিয়ে-ছিলেন—বলেছিলেন বাড়ি ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে, কিন্তু বুড়ি ইতস্তত করছিল, কোনো মতেই বাড়ি ছাড়তে পারেনি।........

পুরো দুদিন ধরে এই ভীতি সঙ্কার ছিল। তিন দিনের দিন জল কমতে আরম্ভ করল। বনরক্ষীর বাড়ি থেকে শিশুদের যখন নিজেদের বাড়িতে আনা হল তারা একেবারে অবাক হয়ে গেল। বাগানটা একেবারে ভেসে গেছে। ফলের বাগানে কাদার পাহাড়। জায়গায় জায়গায় বিরাট গর্ত।......"

কত কাল আগে কত যুগ আগে বান এসেছিল এই শান্ত নদীতে তারই দৃশ্য আমাদের মনের চোখে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল। (ক্রমশ)

শান্ত নিরিবিলি রাস্তা উলিৎসা ওর্লুখা। মস্কোর কেন্দ্র থেকে অনতিদূরে হলেও কেন্দ্রের ব্যস্ততা আলোড়নের তরঙ্গ এখানে এসে পৌঁছোবার আগেই মিলিয়ে যায়। এই রাস্তার ওপরেই ভারতীয় দূতাবাস। সেখানে আজ মস্কো-প্রবাসী প্রায় সব ভারতীয়ই নতশীরে দাঁড়িয়ে; অকস্মাৎ নেহেরু-প্রয়াণের সংবাদে উদভ্রান্ত, বজ্রাহত। দূতাবাসের বাইরেও ভিড়। কাতারে কাতারে সোভিয়েৎ দেশবাসী। দূতাবাসের বাইরে নেহেরুর কিছু ছবি টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই চিরপরিচিত কঠিন প্রতিজ্ঞায় দীপ্ত সহসা মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে তারা। বেলা চারটে। অস্ফুট গুঞ্জন উঠল জনতার মধ্যে। কালো রঙের একটি চাইকা গাড়ি আস্তে আস্তে ঢুকল দূতাবাসের দ্বার পেরিয়ে। গাড়ি থেকে নাবলেন সোভিয়েৎ প্রধানমন্ত্রী নিকিতা খ্রুশ্চোভ। সঙ্গে প্রথম সহকারী প্রধানমন্ত্রী আলেকসাই কসিগিন আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রেই গ্রোমীকো। গভীর বেদনায় অভিভূত সকলেই নীরব। ধীরে ধীরে খ্রুশ্চোভ এসে হাত ধরলেন রাষ্ট্রদূত ত্রিলোকীনাথ কাউলের। রাষ্ট্রদূতের চোখের জল বাধা মানল না। দূতাবাসের বহিকক্ষে রাখা নেহেরুর প্রতিকৃতি, তার নিচে কালো-ফিতের বর্ডার দেওয়া শোক-লিপির গ্রন্থ। খ্রুশ্চোভ এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসে স্বাক্ষর করলেন সেই গ্রন্থে। তারপর নীরবে কিছুকাল দাঁড়িয়ে রইলেন প্রিয় বন্ধু সহসংগ্রামীর ছবির সামনে। অবশেষে হঠাৎ যেন নিজেকে ঠেলা মেরে কতকটা আত্মসচেতনভাবে কসিগিন, গ্রোমীকো আর কাউল সমভিব্যাহারে দূতাবাসের দ্বিতল কক্ষে গিয়ে বসলেন। চাপা গলায় সোভিয়েৎ কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক জানালেন যে, শান্তি সংগ্রামের পক্ষে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক ইন্দ্রপাত হয়ে গেল; বললেন অন্তত আরেকবার নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাতের তাঁর একান্ত অভিলাষ ছিল। খ্রুশ্চোভ সদলে বিদায় নেওয়ার পরেই শুরু হল অন্যান্য রাষ্ট্রদূত এবং সোভিয়েৎ গণপ্রতিনিধিদের আনাগোনা।

দূতাবাস থেকে বেরিয়ে এলাম, একজায়গায় যেতে হবে। এক বৃদ্ধা ফুল হাতে কাছে এলেন, পেছনে ছোটখাট ভিড়। "আমরা ফুল দিয়ে আসতে চাই নেহেরুর ছবিতে। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ-নিষেধ। আপনি আমাদের এই ফুল গ্রহণ করুন।" আন্তরিক শ্রদ্ধার দান হাত পেতে নিলাম। কী আশ্চর্য সবই গোলাপ। রেখে এলাম যথাস্থানে। দেরি হয়ে গেছে, ট্যাক্সি নিতে হল।

"কী হয়েছিল ? এমন হঠাৎ মারা গেলেন।" ট্যাক্সিওয়ালা প্রশ্ন করে গাড়ি চালাতে

মস্কোর দোম-সোইয়ুজে অনুষ্ঠিত শোকসভা
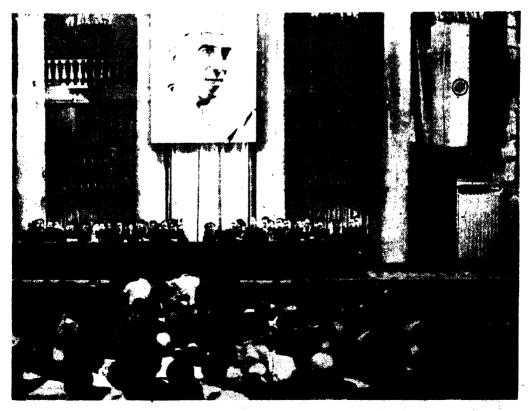
চালাতে। উত্তর শুনে নিজে নিজেই বলে—"বস্ত কাজ করতেন। অতবড় একটা দেশ ভারত, তার জন্য চিন্তা, আবার সারা পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখার জন্য ভাবনা। কেনেডি গেলেন, নেহেরুও গেলেন, আমাদের খ্রুশ্চোভ একা হয়ে পড়লেন।"

"নেহেরুকে পছন্দ করতেন আপনারা?"

"পছন্দ করব না! একটা মানুষের মত মানুষ।" স্টিয়ারিং হুইল থেকে ডানহাতটা চাকতে তুলে মুঠো করে বুড়োআঙুলটা খাড়া করে বলে—"নেহেরু এই।" বলে রাখি এদের বুড়ো আঙুল দেখানোর মানে আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কাউকে উচ্চ প্রশংসা করার জনাই এ-দেশে উক্ত মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ভাড়া দিতে যাব—ট্যাক্সিওয়ালা বললে, "না, নেব না। আজ তোমাদের বড় দুঃখের দিন।"

দৃষ্টান্ত বহু দেওয়া যায়। নেহেরু-বিয়োগে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন যে সত্যই বেদনাবোধ করেছে তার প্রমান অসংখ্য। পরের দিন কাগজে কাগজে নেহেরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ভারাতুর মনকে ভরে তুলেছিল সমবেদনার আন্তরিক বাণীতে। তবে কিয়ৎ পরবর্তী কালে সোভিয়েৎ শোক-প্রকাশের কয়েকটি দিক অনুধাবন করে এ-দেশ সম্বন্ধে কিছু ধারণা স্পষ্টতর হয়েছে।

অক্লান্ত শান্তি-সংগ্রামী, কঠোর উপ-নিবেশবাদ-বিরোধী, মহান দেশপ্রেমিক, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ দেশ সংগঠক এবং দূরদর্শী জোট-নিরপেক্ষ-নীতি অনুসরণকারী রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে নেহেরুর উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি করা হয়েছে। কিন্তু যখন এশিয়া-আফ্রিকার অসংখ্য দেশে শাসন কর্তার লৌহমুঠিতে সর্বপ্রকার বিরুদ্ধতা এবং বাক্ আর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিষ্পেষিত, যখন ঘানায় এনক্রুমার কিম্বা ইন্দোনেশিয়ার সুকার্ণোর যাবজ্জীবন ক্ষমতাশালী থাকার শিলঠাকুরের-আপন-দেশ-সংক্রান্ত আইন লিপি-বদ্ধ, তখন জনপ্রিয়তার অপ্রাচুর্য না-থাকা সত্ত্বেও নেহেরু কর্তৃক উক্ত অগণতান্ত্রিক পথ-পরিহার, যা এশিয়া আফ্রিকায় প্রায় একক দৃষ্টান্ত তা ভারতের এবং বিশ্বের বিবর্তনের পক্ষে যে অতবড় আশির্বাদস্বরূপ সে-উপলব্ধির প্রকাশ চোখে পড়ে নি। সাধারণত উপনিবেশবাদের শোচনীয় পরিণতির থেকে আশু পরিত্রাণের পক্ষে এশিয়া-আফ্রিকার সব দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণকে অনিবার্য বলেই এখানে দেখা হয়ে থাকে। তাই নেহেরু যে গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিকতার পথ বেছে নিয়েছিলেন সে-পথের লক্ষ্য সম্বন্ধে সোভিয়েৎ ইউনিয়নে সন্দেহ না-থাকলেও তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট আস্থা সম্ভবত নেই। বোধ হয় সেই কারণেই যদিও দেশের অর্থনীতি গঠনে রাষ্ট্রীয় বিভাগের প্রতি তার জোর দেওয়ার জন্য সাধুবাদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু নেহেরুকে

সমাজতন্ত্রী বলে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। অথচ যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, যেখানে কমিউনিস্টরা নির্যাতিত সেখানকার গামেল আবদেল নাসের, কিম্বা আলজিরিয়া, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী, সেখানকার আহমেদ বেন বেল্লা যদি সমাজতন্ত্রী বলে এ-দেশে অভিহিত হতে পারেন তবে উক্ত আখ্যায় জওহরলাল নেহেরুর দাবি নিঃসন্দেহে বৃহত্তর। ইওসেফ্ ব্রজ টিতো যেমন আবাদী কংগ্রেসের প্রসঙ্গ তুলে সমাজতন্ত্রবাদের সাহায্যে ভারতের উন্নয়নের পন্থা-নির্বাচনের জন্য নেহেরু-নীতির জয়গান করেছেন তেমন কিছুটা এ-দেশে হলে ডাস্ ক্যাপিটাল সম্ভবত অশুদ্ধ হতো না। নীতিপরিণত সাংবাদিক চেতনার একটি লক্ষণও পীড়া দিয়েছে। নেহেরুর দেহাবসানের খবর পরের দিনের কিছু কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় থাকলেও সব কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি ছিল খ্রুশ্চোভের এবং প্রথম পৃষ্ঠার প্রধান স্থান অধিকার করেছিল সাম্প্রতিক যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র সফর সম্বন্ধে তাঁর টেলিভিশন-ভাষণের বিবরণী।

তবে "কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি।" কারণ যা পেয়েছি তাও নেহেরুর অযোগ্য হয় নি। টেলিভিশন-ভাষণে নিকিতা খ্রুশ্চোভের সহৃদয় উক্তি, মস্কো রেডিও এবং প্রাভদা-ইজভেস্তিয়ার শ্রদ্ধার্ঘ, ইলিয়া এরেনবুর্গের নেহেরু-মহিমা বিশ্লেষণ, লিতেরাতুর্নায়া গাজেতা পত্রিকায় আলেকসান্দ্র কর্নেইচুকের প্রবন্ধ, টেলিভিশনে ঐতিহাসিক শেষযাত্রার চিত্র প্রদর্শন যে কোন ভারতীয়ের মনই স্পর্শ করবে। মানতেই হবে যে নেহেরুর স্মৃতিতর্পণ সোভিয়েৎ-দেশ প্রাণ ঢেলে করেছে। দোম সোইয়ুজ শা সংঘ-ভবনে অনুষ্ঠিত বিরাট শোকসভাটি যে-কোন বিদেশীর প্রীতি মুগ্ধ। জাপানের দিক দিয়ে সোভিয়েৎ দেশে অভূতপূর্ব। নেহেরু সম্বন্ধে যে প্রশস্তি উচ্চারণ করা হয়েছে তার মধ্যে কোথাও ফাঁকি নেই। একটি উদাহরণ দিই। এই কবিতাটি সোভিয়েৎ লাটভিয়ার প্রখ্যাত কবি মিরজা কেম্পে লিখেছিলেন সিনা পত্রিকায়।

জওহরলালের চিতাভস্ম

ছিলাম আমি অগ্নিশিখা এখন চিতাভস্ম
এই ভস্মরাশি গাইছে কী গান শুনছো ঃ
ঊর্ধ্বে তোল ঊর্ধ্বে তোল ঐ আকাশে
শাদা-মেলা ভস্মরাশি আমরা উড়তে চাই।
গভীর নীলের থেকে,
ছড়িয়ে দিও ভারতের ঐ বুকের পরে।
ধীরে ধীরে ঘিরে তাকে হালকা ওড়না হয়ে,
বলব কানে কানে ঃ
মাগো তুমি পাচ্ছ আমার অনুভবে?
জীবনে মরণে,
অগ্নিশিখা, ভস্মরাশি রূপে
নিজেকে যে দিয়েছি মা তোমার কাছে
উজাড় করে ঢেলে।
বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে
নীরব মর্মরে ভারত কয় ঃ
আমার জহরলাল,
তোমার তরে নেইকো কভু বিশ্রাম-বিলম্বিত,
তোমার যাত্রা নেইকো কভু মৃত্যুনদী-পার।
তোমার ভস্মরাশি আকুল হয়ে
লাল গোলাপের কুঁড়ির আশায় থাকে,
তোমার অমল জীবনপদ্মখানি
অনন্তকাল ফুটবে আমারমাঝে॥
ছিলাম আমি নীল সাগরের উদ্দাম তরঙ্গ,
এখন শুধু ধূসর বিধুর নীরব ভস্মরাশি
এই ভস্মরাশি গাইছে কী গান শুনছো ঃ
এক মুঠো এক মুঠো করে নিও আমাদের
এলাহাবাদের নদীর জলে দিও ঢেলে
পৌঁছবো সেই চিরপ্রবাহিনী গঙ্গাতে,
বুকের পরে তুলে নেবে মোদের
ও নিয়ে যাবে সে যে সমুদ্রসঙ্গমে—
জগৎ পারাবারে।
মানবজাতি অবিরত উদয় হবে,
বলবে মানুষ-শান্তির দূত তোমার
বিশ্রাম নেই কেন?
সংঘবদ্ধ হও,
একে অপরে বাঁধো আলিঙ্গনে—
আমার ভস্মরাশির মুকুট-পরা
ঢেউ উঠবে ডেকে,
জড়িয়ে ধরে আরেক তরঙ্গকে
চলবে বেগে আগে আরো আগে
হানাহানির জগৎ অভিমুখে—
নিখিল জুড়ে বাজবে যে ডাক প্রেম আর
শান্তির, প্রেম আর শান্তির॥

নেহেরু ভারতে ঠিক কী গড়তে চেয়েছিলেন তা আজকে স্বভাবতই মনে পড়ে নবা সমাজ সৃষ্টির কেন্দ্র মঞ্চকাছে বসে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গড়ার উদ্দেশ্য ছিল নেহেরুর। ধর্মের অর্থ এখানে অবশ্যই রিলিজিয়ন বা আচারগত ধর্ম। তার চৌহদ্দি ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেই সীমিত করে রেখে রাষ্ট্রের ব্যাপার থেকে তাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখাই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের মর্ম। এ-দেশ কিন্তু সে-দিক

দিয়ে ছিল। এ-দেশে রাষ্ট্রশাসন যে-পার্টির হাতে তার মতাদর্শ অনুযায়ী ধর্ম এবং আস্তিকতা মানব প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর। তাই স্তালিনের সঙ্গে সঙ্গে যদিও ধর্মীয় আচারের প্রতি রাষ্ট্রের জবরদস্তির মনোভাব অন্তর্হিত হয়েছে কিন্তু ধর্মীয় আচার এবং আস্তিকতার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম বন্ধ হয় নি। মানুষের মনকে ধর্মের এবং আস্তিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য তাই মস্কোতে নাস্তিকতা-চর্চার রাষ্ট্রীয় ইনস্টিটিউট খোলা হচ্ছে। এর ফল কী হবে জানি না। আজ অন্তত তরুণ সোভিয়েৎ প্রজন্মের কাছে ধর্মের আকর্ষণ সম্পূর্ণ স্তিমিত। কোন দেশেই কি তা থেকে জোরালো? সে যাই হোক একটা সদর্থক ফল এদেশে দেখে উল্লসিত হয়েছি যে, বহু ধর্মের এই সোভিয়েৎ দেশে ধর্মবিদ্বেষ সম্পূর্ণ তিরোহিত, বিচিত্র জাতির সংঘবদ্ধতা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা খণ্ডিত নয়। অন্তত নেহেরুর সে-স্বপ্ন এ-দেশে বাস্তবরূপ নিয়েছে।

নেহেরু চেয়েছিলেন ভারতকে আধুনিক করে তুলতে। কিন্তু তার মানে কি পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকার আধুনিকতার

তিনি ভারতকে মুড়ে দিতে আগ্রহী ছিলেন? বোধ হয় না। ভারতে নেহেরু যে সর্বশ্রেণীর প্রীতি এবং আস্থাভাজন ছিলেন সেই পরম-সত্যটি তলিয়ে দেখলেই এ-কথা বোঝা যাবে। রেনেসাঁস-উত্তর পশ্চিম ইউরোপ এবং পরবর্তীকালে আমেরিকা, যন্ত্রবিপ্লবের সাহায্যে যে-নতুন সমাজ ব্যবস্থার চিন্তা এবং সংস্কৃতির সৃষ্টি করল আজও সেই ধারাকেই আধুনিক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে আমাদের দেশে। কিন্তু নেহেরু এবং নেহেরু যাঁকে গুরুদেব বলতেন সেই রবীন্দ্রনাথ উক্ত আধুনিকতাকে সর্বাংশে স্বীকার করেন নি। রেনেসাঁস এবং যন্ত্রবিপ্লব-উত্তর পশ্চিমী ধারাকে তাঁরা মিলিয়ে নিতে চেয়েছিলেন যুগযুগান্তর ধরে মানব ঐতিহ্যের যে নিত্য কতকগুলি ধারা প্রবহমান—যা এখনো অব্যাহত ভারতের গ্রামে—তার সঙ্গে। তাঁরা অবশ্যই গান্ধীজীর মতো একমাত্র তাকেই সত্য বলে পশ্চিমের গ্রহণযোগ্য সবটুকুকে খারিজ করে দেন নি। কিন্তু তাঁদের মনে প্রকৃতি প্রেম, রোম্যান্টিকতা, সারল্য, স্বতঃস্ফূর্ততা ইত্যাদি কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের প্রতি পক্ষপাত এবং মানব-প্রীতি বিবর্জিত বিশুদ্ধ-মুনাফা-কেন্দ্রিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী আর্থনীতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনিহা ছিল প্রচুর পরিমাণে। ভারতের চাষী গোলাপ আর শিশুর প্রতি নেহেরুর অকৃত্রিম আকর্ষণ, গল্পগুচ্ছের লেখক বা প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁদের সমাজতান্ত্রিক বা সমবায়ী দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এর মধ্যেই। অথচ পশ্চিমের যন্ত্র-যুগে, বৈষয়িক ঋদ্ধি অথবা চিন্তার সাফিস্টিকেশন-এর কোনটিকেই তাঁরা বাদ দেন নি। এক কথায় বলতে গেলে কলকাতা শহর আর বাঙলা দেশের গণ্ডগ্রাম এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্যসাধনই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। জাতীয়তাবাদের হাওয়ায় এক সময় এই প্রক্রিয়া সুফল দিয়েছিল। প্রমাণ রবীন্দ্র-সাহিত্য-সংগীত তথা সমগ্র রবীন্দ্র-সংস্কৃতি, অবনীন্দ্র-নন্দলালের শিল্পকলা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-নেহেরুর এই উত্তরাধিকারকে কি আমরা স্বীকার করেছি? আজ তো স্বাধীন ভারতে চোখে পড়ে উত্তরোত্তর গ্রাম আর শহরের ব্যবধান বৃদ্ধি। একদিকে কেবল মত্ত পশ্চিমী সুলভ বৈষয়িক উন্নতি এবং ধ্যান-ধারণা আচার-ব্যবহারকেই মোক্ষলাভের পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করা হচ্ছে। সোভিয়েৎ ইউনিয়নে যে উন্নতি বা প্রগতির প্রক্রিয়া চালু হয়েছে তাতেও অবশ্য পশ্চিম এবং বিশেষত পশ্চিমের শ্রেষ্ঠতম দেশ আমেরিকার বৈষয়িক মানকে ধরে ফেলার আগ্রহ সুপ্রকট। কিন্তু তাকে সাধনার চরমসিদ্ধি বলে ধরা হয় না। জাতির নিত্যকালের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যকে না-হারিয়ে উক্ত বৈষয়িক সমৃদ্ধিকে অধিকার করার চেষ্টাই প্রবহমান এ-দেশে। ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যেকালে

টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর ইত্যাদির প্রবর্তন চলছে পুরোদমে সেকালে টুইস্ট-নাচ পরিহার, বিমূর্ত কম্পোজিশনের পরিবর্তে নিসর্গচিত্রাঙ্কণে উৎসাহদান, উৎকেন্দ্রিকতা (উদ্ভূত) রাগী ছোকরার কৃত্রিম ভূমিকার হাস্যকরতা প্রদর্শন ইত্যাদিও চলছে। যেখানে চাপ দেওয়া হচ্ছে সেখানে অবশ্যই উপায়গতভাবে তা রবীন্দ্রনাথ-নেহেরু বিরোধী কিন্তু সামাজিক উদ্দেশ্য হিসেবে এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে তাঁদের অনুমোদিত।

পশ্চিমসুলভ শহুরেপনাও যে বিপরীত কোটির মনোভাব ভারতে আরো পরিব্যাপ্ত তা হচ্ছে গ্রাম্যতা। বলা বাহুল্য এটিও নেহেরু-রবীন্দ্রনাথের সমর্থনসূচক নয়। এ-দেশে শিক্ষার সর্বব্যাপ্ত প্রচারে মানুষ দ্রুত মহাজাগতিক যুগোপযোগী হয়ে উঠছে। গ্রাম্যতা বহুল পরিমাণে দূরীভূত যদিও সুখের বিষয় সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণতাকে বিসর্জন দেওয়া হয় নি। সংস্কৃতির সুপরিচিত শাখা গান-নাচের ক্ষেত্র থেকেই তার উদাহরণ দেওয়া যায়। ভোলগা নদীর মাঝির গান কিম্বা মাজুরকা নাচকে আজকের জীবনের অঙ্গীভূত করে নেওয়ার প্রচেষ্টাই এখানে বড়। প্রাচীন ঐতিহ্যকে নবযুগের সৃষ্টিকার্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। সমাজের শিক্ষাও মানুষের প্রকৃতিকে উক্ত ঐতিহ্য বিমুখ করছে না। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীনকে যে নতুনতর রূপে ঢেলে সাজার প্রয়োজন আছে তার অনিবার্যতাকেও স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে যে অদ্ভুত প্রক্রিয়া চলছে তা একদিকে হচ্ছে হয় সম্পূর্ণ পশ্চিমের প্রবর্তন, নয় প্রাচীনের অনুবর্তন। প্রথমটি পূর্বের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত। দ্বিতীয়টির প্রসঙ্গ তোলা যেতে পারে মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে নেহেরুর মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোকসভাটিকে কেন্দ্র করে। দূতাবাসের তরফ থেকে আয়োজিত এই শোকসভাটিতে মস্কোর প্রায় সব ভারতীয়ই যোগ দিয়েছিলেন। যদিও আন্তরিকতার কিছুমাত্র অভাব ছিল না কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি চেতনা গ্রাম্যতার এমন পর্যায়ে যে অমার্জিত উচ্চারণে স্থানকালপাত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী মন্ত্রপাঠে এবং পরিমিতিবোধরহিত ভাষণ দানে গাম্ভীর্যের পরিবর্তে সৃষ্টি হয়েছিল বিরক্তির। সবচেয়ে দুঃসহ হয়েছিল সুর-তাল-লয় বর্জিত কিন্তু কণ্ঠের তীক্ষ্ণতা সম্বলিত সমবেত কণ্ঠে "বৈষ্ণব জন তো" এবং "রঘুপতি রাঘব রাজারাম" গান দুটি। গান দুটির শোকসভায় গীত হবার তাৎপর্য বা দাবি কী তা আমার কাছে দুর্বোধ্য। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমার কোন আপত্তি নেই যদি তাতে শ্রদ্ধা বা গাম্ভীর্যের অভাব না থাকে। কিন্তু "রঘুপতি রাঘব রাজারাম" যে-কোন সময়েই আমার মনে সাড়া জাগাতে অক্ষম। কারণ গ্রাম্যতাকে আমি সরলতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি না। গান্ধীজীর প্রিয় বলে গানটিকে যে নেহেরুর মৃত্যু দিনেও গাইতে হবে এবং তাও মার্জিত গীতভঙ্গীকে বিসর্জন দিয়ে—এই ব্যাপারটি নেহেরুর প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের পরিচায়ক নয়। বরঞ্চ তার দ্বারা নেহেরুকে পরিত্যাগই সূচিত করে এবং সেই কারণেই ভারতীয় সংস্কৃতির একটি ভয়াবহ সম্ভাবনাও সূচিত করে। এই শোকসভার পরের দিনই এক সোভিয়েৎ-প্রবাসী এক ইংরেজ সাংবাদিকের শেষকৃত্যে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। ধর্মকে বাদ দিয়েও মানুষের শেষ-যাত্রাকালে কীভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে হয় তার একটি হৃদয়স্পর্শী চিত্র সেদিন চোখে পড়েছিল। বিশেষ করে নাড়া দিয়েছিল অর্গানের সুগম্ভীর ধ্রুপদী শোকবাদ্য। পশ্চিমের সম্পূর্ণ অনুকরণ কিম্বা দেশের গ্রাম্যতার অনুসরণ সংস্কৃতির পক্ষে দুই-ই সমান শোচনীয়। কিন্তু যখন পশ্চিমের বাহিরাকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয় দেশের গ্রাম্য-প্রকৃতি তখন তা শোচনীয়তর। সোভিয়েৎ দেশ সর্বাংশে সফল না হলেও পূর্বোক্ত তিনটি সংস্কৃতিগত প্রমাদকেই এড়িয়ে যেতে সচেষ্ট। মহাজন বলে নেহেরুর প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে তো তাঁর মধ্যপথ আমাদের একমাত্র পন্থা।

॥ ১৮ ॥
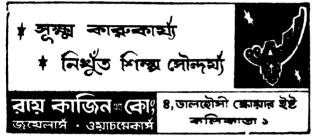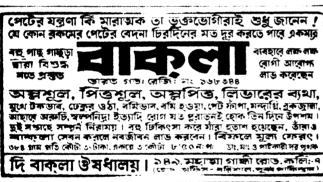
শহরের ওপারে নব শহরতলীতে কল্যাণ আশ্রমের মহিলা বিভাগ। নারকেল ডাঙা ছাড়িয়ে কাদাপাড়া। এই পাড়ারই একটি নিরিবিলি অঞ্চলে আশ্রমের কর্তৃপক্ষ বাড়িটি নিয়েছেন। আগে ছিল কোন এক জমিদারের পুরোনো বাগানবাড়ি। বিলাসকুঞ্জ। এখন সেই জীর্ণ জাতিভ্রষ্ট বাড়িটির এমন রূপান্তর হয়েছে যে চেনা যায় না। বাড়ির চারদিকে উঁচু প্রাচীর। সামনে আশ্রমের সাইনবোর্ড টাঙানো। ভিতরে স্কুল, শিল্প-মন্দির, দেবমন্দির, পাঠমন্দির, হস্টেল—সব মিলিয়ে একটি খণ্ডরাজ্য। এ রাজ্য আরো ছড়াবে। আশে পাশে আরো জায়গা কেনা হচ্ছে। আরো বাড়ি উঠছে। আরো নতুন নতুন বিভাগ এখানে উঠে আসবে। প্রাচীরের বাইরে দ্বাররক্ষী দুটি দেবদারু, আশেপাশে নারকেলের সারি। একটি গাছের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা কল্পনা করেছিল সুজাতা এখানে গাছের অভাব নেই। আশ্রমের বাইরে গাছ ভিতরে গাছ। তার সেই নীরব সবুজ স্নিগ্ধতায় চোখ জুড়িয়ে যায়। আর চোখ জুড়োলেই হৃদয় জুড়োয়। কানের ভিতর দিয়ে প্রিয় নাম যেমন মরমে পৌঁছায় চোখের ভিতর দিয়েও তেমনি প্রিয় দৃশ্য হৃদয়কে স্পর্শ করে।

গেটের কাছে বন্দুকবান ভোজপুরী প্রহরী। মহিলা নিবাসে এই বোধ হয় একমাত্র পুরুষ প্রতিনিধি। তার কাছে পরিচয় দিতে হল। শুধু নিজের নাম-ধাম নয়, কার কাছ থেকে এসেছে সেকথাও জানাল সুজাতা।

শুদ্ধানন্দের নামে রুদ্ধ দরজা খুলে গেল। দুটি কম বয়সী কুমারী মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দোরের কাছে এগিয়ে এল। আর কজন চঞ্চল উৎসুক চোখে অপার কৌতূহল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল পিছনে।

'আপনিই কুমারী সুজাতা সেন?'

সুজাতা একটু ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ।'

'আসুন আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আপনার সঙ্গে কি আর কেউ এসেছেন?'

সুজাতা বলল, 'না। এখানে নাকি কারো আসবার নিয়ম নেই?'

শ্যামবর্ণ স্নিগ্ধ সুশ্রী মেয়েটি বলল, 'তাই বলে কি কেউ পৌঁছে দিয়ে যেতে পারেন না? তা পারেন।'

মেয়েটি বড় চপল। তার দুটি চোখ কৌতুকে উজ্জ্বল। একুশ-বাইশ বছরের বেশি হবে না বোধ হয় বয়স। ওকে দেখে সুজাতার প্রথমেই মনে হল, 'আহা এবেচারা কেন এসেছে এখানে? কোন দুঃখ কোন আঘাত এত অল্প বয়সে ওকে সংসারের বাইরে টেনে নিয়ে এল? ওকি সুজাতার মত?' সুজাতা ভিতরের দিকে এগোতে লাগল।

'তোমার নাম কি ভাই?'

'আমার নাম শ্যামলী। আমি কালো কিনা তাই। আর ওই যে দেখছেন ফর্সা ফুটফুটে রঙের মেয়েটি ওকে কিন্তু ধবলী বলে ডাকবেন না। ডাকলে ও ভারি ক্ষেপে যায়।'

সুজাতা হেসে বলল, 'ওর নাম কী?'

শ্যামলী বলল, 'বড় সেকেলে নাম। যূথিকা। তাই ও সব সময় মন খারাপ করে বসে থাকে। কালে কালে যদি সন্ন্যাসিনী টন্যাসিনী হতে পারে তখন তো নামান্তরও হবে জন্মান্তরও হবে। তখন একটা ভালো নাম ও পেতে পারে। তার আগে কোন আশা-ভরসা নেই।'

'কেন যূথিকা তো বেশ নাম।'

যূথিকা বলল, 'আমাকে সবাই জুঁই বলে ডাকে। আপনিও তাই বলবেন।'

'বেশ মিষ্টি নাম।' সুজাতা হাসল।

শ্যামলী বলল, 'মিষ্টি নাম না মিষ্টি গন্ধ? গন্ধখানা খুব যে মিষ্টি তা নয়। আমরা একই ঘরে থাকি। দু' দিনেই টের পাবেন। ওর দারুণ ঘাম। আর ঘামের সে কী বোটকা—। যাই বলুন সুজাতাদি তাকে

ধ্'ূইয়ের গন্ধ সইতে পারব না।'

যূথিকা লজ্জিত হয়ে বলল, 'বাঃ কী হচ্ছে। ওর কথায় কান দেবেন না সুজাতাদি। ও ভারি অস্থির। ভারি চপল।'

'এত চাপল্য নিয়ে সাধনভজনে ওর মন বসে কী করে?'

শ্যামলী বলল, 'বসে কি আর?'

যূথিকা প্রতিবাদ করে উঠল, 'বা বসে না। ও যেন সবই জানে। ওদের ধারণা কি জানেন সুজাতাদি? ধ্যানাসনে আমার মন কেবল ওঠ বস করে।'

সুজাতা বলল, 'তাতে লজ্জা কি ভাই? আমাদের সবাইর মনই তাই।'

দোতলাবাড়ি। একতলায় সারি সারি খান পাঁচেক ঘর। ঘরে ঘরে তক্তপোষ পাতা। কোথাও তিনটি, কোথাও দুটি।

সুজাতাকে নিয়ে একটি তিন শয্যার ঘরে ঢুকল শ্যামলী। মাঝখানের সীটটিই খালি আছে।

শ্যামলী বলল, 'আপনি ইচ্ছে করলে পুব-দিকের ওই জানলার ধারের সীটটাও নিতে পারেন। আমি এখন সেটায় আছি। কিন্তু আপনার বোধ হয় মাঝখানেই থাকা ভালো। আমাদের দুজনের ঝগড়া-বিবাদ মিটাতে পারবেন।'

সুজাতা হেসে বলল, 'তোমরা ঝগড়া-বিবাদও করো নাকি?'

শ্যামলী মুখ টিপে হেসে বলল, 'করিনে আবার? আপনি ভেবেছেন কি বলুন তো? দুদিন থাকুন দেখবেন এখানে সব আছে। সুজাতাদি এখানে সব আছে।'

সুজাতা হেসে শ্যামলীর হাতখানা ধরে বলল, 'তুমিও আছ, সব চেয়ে বড় ভাগ্যের কথা।'

মেয়েদের পরনে কালাপেড়ে সাদাখোলের শাড়ি। সবাইর সিঁথি সাদা। কারো গায়েই কোন গয়না-গাঁটি নেই। দু হাতে দুগাছি চুড়ি সুজাতার এখনো আছে। মনে মনে ভাবল এখনই খুলে রাখতে হবে। কেমন হয় এরা অন্তত বড় একটা লোভ জয় করেছে গয়নার লোভ।

বউদির এখনো প্রায় কি-মাসে নতুন গয়নার দরকার হয়। যে মাসে গয়না হয় না সে মাসে দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকে। মুখ-শালী দাদা ওই এক জায়গায় ভারি দুর্বল।

আজ বুঝি স্কুল ছুটি। ভারি নিরিবিলি নির্জন পরিবেশ। বাইরের উঠানে একটি শ্বেত করবীর গাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সবই চুপ চাপ। সুজাতার মনে হল সত্যিই যেন এক নতুন রাজ্যে এসে পড়েছে। স্থান মাহাত্ম্য আছে বইকি। নদীর কাছে বসলে মনের এক রকম ভাব হয়, পাহাড়ের কাছে বসলে এক রকম ভাব হয়। আবার থিয়েটার সিনেমায় গেলে সেই মনেরই ভাবান্তর ঘটে। যোগাস্থানেই এসে পড়েছে সুজাতা। শুধু মন নিয়ে পড়ে থাকবার এই হল জায়গা। মনোভূমি কর্ষণ করে যাবার এই তো উপযুক্ত স্থান। কিন্তু এখানেও সভ্য জগতের সব আছে। ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, কিচেন, বাথরুম। এখানেও নিছক কাঠ শয্যা নয়। বিছানা বালিশ নরম তোষক শুধু সেই তোষকের ওপর একখানি করে ছোট কম্বল পাতা। কৃচ্ছ্রতার প্রতীক।

কিন্তু এই প্রতীকী কৃচ্ছ্রতা নয়, সুজাতা যেন আত্মা কাঠিন্য আত্মা ক্লেশবরণের জন্যে তৈরী হয়ে এসেছিল। পুরাকালের এমন এক গিরিকন্দরে সে প্রবেশ করতে চায় যেখানে আধুনিক সভ্যতার কিছুই প্রবেশ করেনি। এমন এক গিরিগহ্বর যেখানে শুধু ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ, ঝরণার জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ। যেখানে সঙ্গী নেই, কথা বলবার কেউ নেই। শুধু সেইখানেই কি নিজের হৃদয়ধ্বনিতে নিজে কান পেতে থাকা যায়? কেন যেন নিজেকে ভারি কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে। সুজাতার পরম প্রতিকূল পরি-বেশে শ্বাসরোধী অবস্থার মধ্যে অতিকষ্টে প্রাণ-ধারণ করতে ইচ্ছে করে। এতদিন অন্য একজনের হনন পীড়নের চিন্তায় যে আনন্দ পেয়েছে কিন্তু আজকাল ভিতরের বাইরের কৃচ্ছ্রতা দিয়ে নিজেকে নিপীড়িত করবার বড় সাধ হয় তার। অথচ সে তো এমন কোন অপরাধ করেনি এমন কোন পাপ করেনি যে এত তীব্র আত্মগ্লানি তাকে পেয়ে বসল। হাত দিয়ে করেনি, কিন্তু মনে মনে করেছে। হাতের পাপ আইনের কাছে মনের পাপ ধর্মের কাছে। সেই ধর্মাধিকরণের প্রতিষ্ঠা নিজের অন্তঃকরণে।

'ওকি সুজাতাদি, বসে পড়লেন যে, উঠুন।'

'কোথায় যাব?'

শ্যামলী বলল, 'বাঃ সবই তো আপনার দেখা বাকি। ঠাকুর-ঘর দেখবেন—' তারপর গলা নামিয়ে একটু হেসে বলল, 'ঠাকুরানীর ঘর দেখবেন।'

সুজাতা বলল, 'ঠাকুরানী কে?'

শ্যামলী বলল, 'আমাদের বড়দিদি। তিনিই এখানকার সব। মেজদি সেজদি ছোড়দিদের কোন ভয়েস নেই।'

সুজাতা হেসে বলল, 'তোমার ভয়েসটি তো বেশ শুনতে পাচ্ছি ভাই।'

'কী যে বলেন সুজাতাদি। এ আবার ভয়েস নাকি? এতো ফিসফিসানি।'

সুজাতা শ্যামলীর পিছনে পিছনে চলল।

দোতলায় উঠে বারান্দা দিয়ে পুব মুখে একটু হেঁটে গেলে বাঁদিকের সব চেয়ে বড় ঘরখানা বড়দিদির। ঘরের আধখানা জুড়ে সুন্দর বোম্বাই প্যাটার্নের একখানি মেহগনির খাট। পুরু গদি, তার ওপর ধবধবে গেরুয়া চাদর। তারও ওপরে চারু-দর্শন একটি মৃগ চর্ম।

ঝকঝকে মসৃণ মেঝে। সদ্য চুনকাম করা শুভ্র সুন্দর দেয়াল। জানালায় জানলায় গেরুয়া রঙের পর্দা।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বইপত্রগুলি সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এক ধারে টিক টিক করছে একটি টাইমপিস ঘড়ি।

কিন্তু বড়দিদি কোথায়? ইজিচেয়ারে মুণ্ডিত মস্তক এক সন্ন্যাসী অর্ধশায়িতভাবে চিন্তামগ্ন। গায়ে একটি গেরুয়া রঙের চাদর জড়ানো।

সুজাতা ফিস ফিস করে বলল, 'বড়দি কোথায়?'

শ্যামলী তার চেয়েও ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'ওইতো।'

এবার অধ্যক্ষা চোখ তুলে তাকালেন।

সুজাতা তার ভুল বুঝতে পারল। যাঁকে সে পুরুষ বলে ভেবেছিল তিনি পুরুষ নন, নারী। কিন্তু পরম রূপবতী, পরম ব্যক্তিত্বময়ী নারী। একটু লম্বাটে ডৌলের মুখ। মাথার চুল নেই তবু সে মুখের শ্রী যেন লুপ্ত হয় নি। আয়ত ঘন কালো দুটি চোখ কী ভাগ্য, ভ্রমরকৃষ্ণ অপরূপ দুটি সুন্দর ভ্রূ ধর্মের অনুশাসন থেকে রক্ষা পেয়েছে। স্নিগ্ধ চিকণ সুগৌর গায়ের রঙ। পাতলা লাল টুকটুকে দুটি ঠোঁট লিপস্টিকে অত সুন্দর রঙ হয় না। পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হবে বোধ হয় বয়স। কিন্তু ওঁকে দেখলে বয়সের কথা মনে হয় না।

কোথাও মেদবাহুল্য নেই। সুঠাম সুদীর্ঘ দেহ। তবে লতার মত নয়। নারীদেহের সেই কমনীয়তা নমনীয়তা নেই। বরং কোথায় যেন এই চেহারার মধ্যে একটু পৌরুষ দীপ্ত হয়ে আছে।

সুজাতা এক পলক সেই অর্ধনারীশ্বরের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

তারপর তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

প্রাপ্য প্রণাম তিনি নিঃশব্দে গ্রহণ করলেন। তারপর অনুচ্চস্বরে বললেন, 'তোমার ঘর দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোন অসুবিধে হয়নি?'

'না।'

'শ্যামলী বুঝি তোমাকে বলেনি, এ ঘরে জুতো পায়ে আসতে নেই?'

তিনি হাসলেন। সুগঠিত সুন্দর শুভ্র দাঁতের সারি। তবু সেই হাসির মধ্যে যেন শিক্ষিকার শাসন অনুশাসন সবই যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠল।

সুজাতা লজ্জিত হয়ে একটু জিভ কাটল। তারপর তাড়াতাড়ি জুতো জোড়া ঘরের বাইরে রেখে এল।

তিনি ফের একটু হাসলেন, 'কিছু মনে করো না। cleanliness is next to Godliness. এই কথাটা এখনো আমি ক্লাসে ক্লাসে মেয়েদের শিখে রাখতে বলি। আমাদের বাল্য শিক্ষা শুধু বাল্যকালের জন্যেই নয়, তা যৌবনে বার্ধক্যে সমানভাবে শিখে যেতে হয়। বরং ছেলেবেলায় অমরা যা শুধু কণ্ঠস্থ করি তা হৃদয়স্থ করবার সুযোগ আসে বেলা আরো বাড়লে। বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

বড়দি কারুকার্য করা চন্দনকাঠের মোড়াটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বোসো।'

শ্যামলীকে হাতের একটু ইশারা করতেই সে বেরিয়ে গেল।

সদ্য পরিচিতা এই ব্যক্তিত্বময়ী কর্তৃত্বময়ী মহিলার কাছে একা একা বসে থাকতে সুজাতার একটু ভয় হল। ঠিক ভয় নয়, অস্বস্তি।

সুজাতাকে বড়দি কী জিজ্ঞাসা করবেন কে জানে। তিনি কি তার ব্যক্তিগত জীবনের কথা জানতে চাইবেন? না কি সুজাতা কেন এল এখানে, কী চায় সে, সেই কৌতূহলী প্রশ্ন তার সামনে তুলে ধরবেন?

ঘরের মধ্যে কোন শব্দ নেই। শুধু ঘড়িটি টিক টিক করছে। দেয়ালে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতার একখানি বাঁধানো প্রতিকৃতি। তাঁর মুখে স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য। নিচু কাঁচের আলমারিতে ধর্ম আর দর্শনের বইগুলি সুন্দর করে সাজানো। ওপরের তাকে কিছু শিল্প প্রীতির নিদর্শন। শ্বেত পাথরের দুটি একটি মূর্তি, একটি শাঁখ, নকশাকাটি রঙীন বিনুক—দুটি ফুলদানি। এসব যেন ব্যবহারের জন্যে নয়, শুধু দেখবার জন্যে।

'তুমি কি স্কুলে পড়াতে?'

হঠাৎ ওঁর প্রশ্ন শুনে একটু চমকে উঠল সুজাতা। বলল, 'হাঁ। অবশ্য কর্পোরেশন স্কুল।'

'তা হোক। পড়াবার অভ্যেস থাকলেই হল। আমাদেরও একটা স্কুল আছে। তুমি ইচ্ছে করলে নিচের ক্লাসগুলিতে পড়াতে পারো।'

'স্বামীজীর কাছে শুনেছি। আমারও তাই ইচ্ছে।'

'আমাদের এখানে একদণ্ডও কেউ বসে থাকতে পারে না। আলস্যের কোন জায়গা আমরা রাখিনি। আরাম-বিলাসের কোন স্থান নেই এখানে।'

সুজাতা বলল, 'আমি সব শুনেছি। আপনার কাজকে মর্যাদা দেন। আপনাদের কাছে কর্মনিষ্ঠাই হল বড় সত্য। [illegible] কর্মই একমাত্র মানুষের ধর্ম।'

বড়দি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, [illegible] মাথা নেড়ে বললেন, 'না তা নয়। সব কর্মই মানুষের ধর্ম নয়।'

'ধর্ম নয়?'

'না। অনেক কাজ আছে যা শুধু শরীরের অভ্যাস। দেহরক্ষার জন্যে আমাদের সেসব কাজ করে যেতে হয়। নাওয়া খাওয়া ঘুমোন। এমনি আরো অনেক। সে সব কাজ জীবধর্ম হতে পারে কিন্তু ধর্ম বলতে আমরা কি সেসব কাজ বুঝি? তা বুঝিনে। জীবধর্মের মত এমন অনেক কাজ আছে যা জীবিকার কাজ, যা শুধু বৃত্তি। নিজের আর পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে সেই অর্থকরী কাজও মানুষের অবশ্য করণীয়। তবু এও ধর্ম নয়।'

'ধর্ম নয়?'

'না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত এই যে জীবিকার কাজ কখনো একা, কখনো বা যৌথভাবে [illegible] অন্বেষণ [illegible] [illegible] দোহাই দিয়ে এরেই আমরা ধর্ম বলে [illegible] খুশি থাকি, নিজেদের ভোলাই। কিন্তু এও ধর্ম নয়। এও অভ্যাস, বন্ধন। এর মধ্যেও মুক্তির স্বাদ নেই। ধর্ম এই বাধ্যতাকে ছাড়িয়ে যায়, আবশ্যিকতাকে অতিক্রম করে ধর্মে আমরা আমাদের স্বার্থের গণ্ডীকে পার হয়ে চলে যাই। এই জন্যেই ধর্ম হল সেই মহৎ কাজ। [illegible]

[illegible]

[illegible] এই [illegible] কথাই [illegible] [illegible] আরো [illegible] [illegible] কথাই [illegible] [illegible] ভালো লাগল। [illegible] [illegible] তা নারীর [illegible] ছাড়লেও [illegible] [illegible] সে [illegible] [illegible] [illegible]

সুজাতার [illegible] কথার [illegible] [illegible] তার [illegible] যে জিজ্ঞাসা [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] কথাই ধর্ম নয়, এই কথাটি সুজাতার মনে [illegible] রইল। ধর্ম [illegible] থেকে আমাদের মহত্ত্বের দিকে আকর্ষণ করে, স্বার্থচিন্তা থেকে নিঃস্বার্থতার দিকে নিয়ে যায়—কথাটা নিজের মনেই কয়েকবার আবৃত্তি করল সুজাতা।

আশ্রমের কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে

ঘুরে ঘুরে সে অন্য ঘরগুলিও দেখল। দেখল লাইব্রেরী ঘর। ধর্ম, দর্শন, ধর্মের ইতিহাস, ধর্মতত্ত্বের বই-ই অবশ্য বেশি। কিছু কিছু কাব্যও আছে যা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। আছে দেশ বিদেশের মহাপুরুষের জীবনচরিত, ধর্মসাধিকাদের জীবন আখ্যান।

লাইব্রেরী রুমের লাগা রীডিংরুম। কয়েকটি তরুণী মেয়ে সেখানে বসে গভীর মনোযোগে পড়াশুনো করছে। কারো হাতেই গল্প কবিতা নাটক-নভেল দেখতে পেল না সুজাতা। নিরাভরণা ব্রহ্মচারিণীদের হাতে সব ধর্মগ্রন্থ। সুজাতার মনে হল হ্যাঁ, এই ঠিক উপযুক্ত সময়। এই তরুণ বয়স থেকেই সকলের মনে ধর্ম জিজ্ঞাসা জাগ্রত ক'রে দিতে হয়। অযথা অকারণে দ্বেষে হিংসায় যৌন-উত্তেজনায়, দুঃসহ জ্বালায়, নিষ্ফল ক্রোধে, বিফল আত্মনিগ্রহে জীবনের বহু সময় নষ্ট হয়েছে সুজাতার। এই কিশোরী কুমারী মেয়েদের কখনোই সেই নিষ্করুণ জীবনের মুখোমুখি হতে হবে না। শাড়ির লালপাড়ের মত ওদের সমগ্র জীবন একটি দীপশিখায় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকবে। একটি তারে শুধু একটি সুর বাজবে। সে সুর পুণ্যের পবিত্রতার। ওদের সমগ্র জীবন শুধু একটি ধর্মসঙ্গীতের মত ধ্বনিত হবে। অন্য বাসনা কামনার কথা ওরা জানবে না, অন্য [illegible] অপবিত্রতাও ওদের জীবনভোর বয়ে বেড়াতে হবে না। যে বোঝা [illegible] নামাতে চাচ্ছে সেই বোঝা [illegible] কখনো ওদের বইতে হবে না। ওদের শাড়ির শুভ্রতার মতই ওদের জীবনও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক অমলিন অকলঙ্কিত পবিত্রতার [illegible] হয়ে থাকবে।

তারপর আশ্রমের ঠাকুরঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুজাতা। এ ঘর বেশ বড়। একটি বেদীর ওপরে শিবের কল্যাণমূর্তি আর একটি বেদীতে [illegible] প্রতিকৃতি। শ্বেত শ্মশ্রুধারী, দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসী। সকাল [illegible] সচন্দন পুষ্প বিল্বদলে পূজা [illegible] হয়ে গেছে। এখন ধূপদীপ জ্বলছে। এক [illegible] শাঁখ ঘণ্টা পূজার উপকরণ গুছিয়ে রাখা হয়েছে।

[illegible] দেয়াল ঘেঁষে একখানি খাট। [illegible] সুন্দর করে বিছানা পাতা রয়েছে। [illegible] আছে পাশ বালিশ আছে। [illegible] ব্যবস্থা আছে। বালিশের ঢাকনি বিছানার চাদর সবই গেরুয়া রঙে [illegible]। মাথার ওপর বৈদ্যুতিক পাখা। তা সত্ত্বেও [illegible] একখানি হাতপাখা আছে। কাপড়ে [illegible] বর্ডারে অপরূপ সূচীশিল্প। অপরূপ খাটের নিচে চন্দন কাঠের খড়ম। [illegible] পিতলের বালতিতে জল। তার ওপর [illegible] তোয়ালে।

সুজাতা একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'এসব কেন।'

শ্যামলী আর যূথিকা ছিল সঙ্গে। দুজনে এ ওর মুখের দিকে তাকাল।

শ্যামলী বলল, 'আপনি কী সুজাতাদি? ঠাকুর কি পা ধোবেন না? তিনি কি ময়লা পা নিয়ে বিছানায় উঠবেন?'

সুজাতা বলল, 'তা বটে।'

একটু ইতস্তত করে যুক্তকর কপালে ছোঁয়াচ্ছিল সুজাতা শ্যামলী তাকে শুধরে দিয়ে বলল, 'এখানে ওসব সামাজিক শুষ্ক শিষ্টাচার চলবে না। এখানে সষ্টাঙ্গ প্রণামের বিধি।'

[illegible] যা ভয় দেখিয়েছিল, সুজাতা দেখল এখানে তেমন কিছু নেই। নিরামিষও আছে, আমিষও আছে। যে যা খায় যে যা ভালো বাসে। আমিষের ব্যবস্থা [illegible] নিরামিষ কেউ খেতেই চায় না। ভাত আর রুটি দুই-ই চলে। রাত্রে কেউ কেউ রুটি খায়। কিন্তু বেশির ভাগ ব্রহ্মচারিণীরাই মাছ ভাত অন্ত প্রাণ।

রান্নাবান্নার কাজ পালা করে মেয়েরাই করে। একটি ঝি আছে। তবে বাসনকোসন মেয়েরাই মাজে, ঘরদোরও তারাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। শ্রমশীলতার ওপর এই জোর খুব ভালো লাগল সুজাতার। নিজের সংসারে সে শুয়ে বসে আলসেমি করে কাটায়নি। বাপের বাড়িতে ঝি চাকর আছে। এসব কাজে তাকে হাত না দিলেও চলে। তবু কখনো সে হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। ঘরের কাজ তার ভালো লাগে। মাকে দেখেছে এক হাতে সব করতে। গৃহকর্ম তার মার কাছেই শেখা। মা শিখেছিলেন দিদিমার কাছে। কিন্তু এ শিক্ষা মার কাজে লেগেছিল সুজাতার কোন কাজে লাগল না।

[illegible]

এখানে জীবনযাত্রা। হস্টেলে স্থায়ীভাবে কোন দিন থাকেনি সুজাতা। তেমন উপলক্ষ ঘটেনি। তবে গেস্ট হিসাবে দু-একদিন থেকেছে বইকি। ভালোই লাগতো লাগল সুজাতার। সব মিলিয়ে জন পনের মেয়ে আশ্রমবালা এখানে আছে। একটি মালার মত গাঁথা। একই রকমের বেশবাস, চালচলন ধরণ-ধারণ কথাবার্তা। সব সময় যে উচ্চ-মার্গের আধ্যাত্মিক কথাই এরা বলছে তা নয়। তাদের আলাপ আলোচনার বিষয় অলৌকিক নয়, পারলৌকিক নয়, বরং একান্তই ইহলোক ঘেঁষা। তবে দুশ্চিন্তা নেই দুর্ভাবনা নেই। এদের উচ্ছলতা তরলতা উল্লাস প্রাণচাঞ্চল্য ভালো লাগল সুজাতার। নিজের ছাত্রীদেরও তো সে ভালোই বাসত। তাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা প্রীতি সে যথেষ্ট পেয়েছে।

আরো দুজন মহিলার সঙ্গে আলাপ হল সুজাতার। রমাদি আর রত্নাদি। একজন সুজাতার চেয়ে বয়সে বড়, আর একজন তার কাছাকাছি বয়স। রমাদি কর্মব্যস্ত, রত্নাদি একটু গুরুগম্ভীর। তাঁরা চট করে সুজাতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চাইলেন না। বরং যেভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করলেন তাতে একটু যেন সন্দিগ্ধতা অপ্রসন্নতাই প্রকাশ পেল।

শ্যামলীর কাছ থেকে শুনে নিল সুজাতা বড়দির একটি ভারি ধরনের নাম আছে—জ্ঞানপ্রভা। তবে এ নাম ধরে কেউ তাঁকে ডাকে না। এ নামে তাঁর চিঠিপত্র আসে। আর ঐ নাম তাঁর নিজের কলমের মুখে থাকে—স্বাক্ষরের সময়।

সন্ধ্যার পরে ঠাকুর ঘরে পুজো আরতি, সন্দেশ দিয়ে ভোগ। বড়দিই পুরোহিত। এ সময়ে সবাইকে কৃতাঞ্জলি হয়ে দোরের সামনে উপস্থিত থাকতে হবে। সুজাতাও তাই রইল। কিন্তু মনের কুণ্ঠাটুকু গিয়েও যেতে চায় না। অনেকদিন হল এসব অনুষ্ঠান সে ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেবেলায় ছিল ঘোর আনা পূজারিণী। পারতো ত তেত্রিশ কোটি দেবতার প্রত্যেকটিকে পুজো করতে চাইত। সেই পুজো পুজো খেলা কবে যে সাঙ্গ হল তা আর মনে নেই। সেই বহু ঈশ্বরবাদ কোথায় মিলিয়ে গেল। তারপর একেশ্বরবাদেরও কত পরিবর্তন দিগন্তর। মন্ত্রী আর দাদা এই দুই নাস্তিকের প্রভাবে পড়ে বাইরের আচার অনুষ্ঠান কখন যে তার অন্তরের মধ্যে হারাল, নিজের কাছেও তার প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হল, তা সে নিজেও টের পেল না। শেষের দিকে তার একমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল অধ্যয়ন আর মনন। এঁরা কি তাকে ফের গোড়া থেকে শুরু করতে বলছেন? এই শুরুর কি কখনো শেষ হবে না? এঁদের পাঠ কি চিরকাল প্রথম পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে?

পুজো শেষ হল, আরতি শেষ হল। ঠাকুরের নৈশ ভোজন মুখপ্রক্ষালন হরিতকি লবঙ্গ দিয়ে মুখশুদ্ধি শেষ হল। এবার ঠাকুর ঘুমোতে যাবেন। কিন্তু তার আগে শয্যারচনা দরকার।

বড়দি বললেন, 'সুজাতা, তুমি ঠাকুরের বিছানা পেতে দাও। এদিকে মশার উৎপাত আছে। পাখার হাওয়া দিয়ে মশারীটা খাটিয়ে দিয়ো।'

সুজাতা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এসব আমাকে করতে হবে বড়দি?'

জিজ্ঞাসার ধরণে তিনি ভ্রূ কুঁচকে সুজাতার দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ, তোমাকেই করতে হবে। প্রথম এসেই এ সম্মান কেউ পায় না। তোমার বহু ভাগ্য তাই পেয়েছ। আজ যা বলছি তাই করো। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে কাল শুনব।'

বড়দি তাঁর ঘরে চলে গেলেন। অন্য সবাই সরে গেল দোরের কাছ থেকে।

সুজাতা এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখানে এই বোধ হয় তার প্রথম পরীক্ষা।

একটু বাদে ধীরে ধীরে খাটের কাছে এগিয়ে গেল সুজাতা। বিছানা ঝাড়ল, পরিপাটি করে বিছানা পাতল। পাখার হাওয়া দিয়ে মশা তাড়াল। তারপর নেটের মশারিটি নামিয়ে চারদিকে গুঁজে দিতে লাগল। তার হঠাৎ অনেক দিন অনেক মাস অনেক বছর আগের একটি রাত্রির কথা তার মনে পড়ল।

এখানে নয়, ভবানীপুরে নয়, সেই বেলেপুকুরের রাত্রি। সেদিনও এমনি পাখার হাওয়া দিয়ে মশারি নামিয়ে চার ধারে সেই মশারির প্রান্ত গুঁজে দিচ্ছিল সুজাতা। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারেনি। বিছানায় ঘুমের ভান করে শুয়েছিলেন যে পুরুষ-প্রবর তাঁর লুব্ধ হাতখানি সুজাতার কোমর আঁকড়ে ধরেছিল। সেই হাত সুজাতাকে একপাও আর এগোতে দেয়নি।

ফের একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল সুজাতা। তারপর ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে আস্তে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

স্মৃতির এই বিশ্বাস হননে, চিন্তার এই অশুচিতায় সুজাতার চেয়ে বেশি বিব্রত, বেশি লজ্জিত বেশি পীড়িত এই নিশ্চিন্ত নিরাপদ নিদ্রিত আশ্রমে আর কেই-বা আছে?

(ক্রমশ)

ঘরে বাইরে

শ্রীমতী

রেডক্রস আজ একটি জগৎজোড়া প্রতিষ্ঠান। যুদ্ধবিগ্রহ তো বটেই শান্তির সময়েও মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করার কাজে রেডক্রস একব্রত। রেডক্রসের কাজে নারী ও পুরুষ সমানভাবে এগিয়ে এসেছেন সর্বত্র।

রেডক্রসের আদর্শ বা তার জন্ম অনাদি অনন্তকাল থেকে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর সুভদ্রা সুলোচনাকে বলেছিলেন—

"আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি
আমাদের শত্রুমিত্র নাই
বহিবার ধারা সম অজস্র জননীপ্রেম
সর্বত্র ঢালিয়া চলি যাই।"

যুদ্ধক্ষেত্রে আর্তের কোন শত্রুমিত্র ভেদ নাই। দুঃখের কোন জাত নেই। যেখানে দুঃখ সেখানে সেবা মানবতার ধর্ম। এই ধর্মবোধের আকস্মিক উদয় হয়েছিল একটি মহাপুরুষের মনে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ইটালীতে সলফেরিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের এক ধনী দ্যুনে সাহেব, Jean Henry Durant. উদ্দেশ্য ছিল কিছু ব্যবসায়ের সুবিধা করা। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকায় কোথায় ভেসে গেল তাঁর নিজের চিন্তা। কি ভয়ংকর দৃশ্য, কাতর, বিপন্ন আহত মানুষের চরম দুর্দশা। এই আহতদের মধ্যে উভয়পক্ষের সৈন্যই সমান কষ্টভোগ করছে। দ্যুনে তখন চিকিৎসকদের ডেকে বললেন "Siano Tulti Tulti Fratelli" সবাই আমরা ভাই ভাই। সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এসো আমরা শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সেবা করি।

এরপর কোথায় গেল দ্যুনের ব্যবসা আর নিজের কাজ। এই মহাব্রতের পথে যাতে পৃথিবীর দেশগুলি একত্র হতে পারে এজন্য দেশে বিদেশে জনমতের জন্য ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যার নিরপেক্ষতা সব সময় সকলে স্বীকার করে নেবে। কেউ বা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো, কেউ বা মনে করলো বাতুলতা। দ্যুনে নিরুদ্যম হবার পাত্র নন, সব কিছু ভুলে যে পথের ইশারা তাঁকে এতদূর টেনেছে সে যে জীবন উৎসর্গ করার আহ্বান। কিছুদিন পরে তাঁর লেখা "সলফেরিনোর স্মৃতি" প্রকাশিত হবার পর বহু বিশিষ্ট ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁর মর্মস্পর্শী বর্ণনায় তাঁর আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। এমনকি তৃতীয় নেপোলিয়ন

গ্রামের ধাত্রীদের শিক্ষাদান করা হচ্ছে

নিজেও তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনিভাতে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলো। কয়েকটি দেশ মিলে সিদ্ধান্ত করলেন যুদ্ধে আহত সৈনিকেরা নিরপেক্ষ, যুদ্ধকালে ডাক্তার নার্স, হাসপাতাল, সেবার সরঞ্জাম প্রভৃতি আক্রান্ত হবে না ইত্যাদি।

দ্যুনের স্বপ্ন সার্থক হবার পথে, এই মহাব্রতের সাধনায় তিনি হলেন নিঃস্ব, কপর্দকহীন। শোনা যায় তাঁর উত্তরকাল কেটেছিল বিভিন্ন দাতব্যালয়ের আশ্রয়ে। পরে কোন সাংবাদিক তাঁর সন্ধান পেয়ে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিল সে খবর। মানুষ সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ বা হৃদয়হীন নয়। যে দ্যুনেকে বিস্মৃতির আবরণ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সে আবরণ উন্মোচন করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সবদিক থেকে আসতে লাগলো শ্রদ্ধার দান, টাকা পয়সা, চাঁদা অজস্র। দ্যুনে তা স্পর্শও করেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল সব জমা করা আছে দুনিয়ার দুঃখনিবারণ ব্রতের জন্য!

ভারতীয় রেডক্রস এবং বঙ্গদেশে প্রাদেশিক রেডক্রস প্রায় একই সঙ্গে ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অবশ্য ব্রিটিশ রেডক্রসের ভারতীয় শাখা যথেষ্ট কাজ করেছিল। সেণ্ট জন ওয়ার কমিটির সঙ্গে একযোগে মেসোপোটেমিয়া এবং অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও আর্তের সেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সে সময়ই তাঁরা লক্ষ করেছিলেন দূরে লণ্ডনের উপর নির্ভর করে কখনও কখনও আর্থিক সাহায্য

শিশুর স্নান

দুর্গম পথেও সেবার দুর্নিবার যাত্রা

পেতে দেরি হয়ে যেত। তাঁদের এই অসুবিধা দূর করার আবেদনে অবশ্য অনেক টাকা তাঁদের তহবিলে এসেছিল। সে টাকা এতই বেশী ছিল যে, যুদ্ধশেষে তারই উদ্বৃত্ত যা কিছু, তাই দিয়ে ভারতীয় রেডক্রসের প্রথম সংগঠন হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশেষ করে শান্তিকালীন আর্তের সেবা সম্বন্ধে রেডক্রস সচেতন হয়ে উঠেছেন। যুদ্ধই একমাত্র কারণ নয় দুঃখের, আরও বহু দুঃখ দুর্দশা দৈনন্দিন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। বিশেষতঃ যেসব দেশ উন্নতির যাত্রাপথে সবেমাত্র পা রাখতে শুরু করেছে তাদের জীবনযুদ্ধ নিত্যকার।

ভারতীয় রেডক্রসের মূলনীতি ও কর্মসূচী তাই আহত ও পীড়িত সৈনিকের সেবা ও স্বাচ্ছন্দ বিধান মাত্র নয়, সকল পীড়িতের সেবা, স্বাস্থ্যরক্ষা, অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ এমনকি নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান করাও তারই কাজ। কেবল পশ্চিম বাংলায় ১১টি মাতৃ ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনা করেছেন রেডক্রস, বিভিন্ন জায়গায় ১৫টি আউটডোর ডিসপেনসারী তাঁদের পরিচালনায়। তাঁদের নারী-কর্মীদের অনেকে হাসপাতালে সেবা করেন রোগীদের। তাদের চিঠিপত্র লিখে দেওয়া, সুখদুঃখের খবর, কিছু পড়ে শোনানো এর মূল্যও কম নয়। যক্ষ্মা ও ক্যান্সারের দরিদ্র রোগীদের জন্য বাংলা দেশের রেডক্রস হাসপাতালে যথাক্রমে ৮২টি এবং ১০টি শয্যা রক্ষা করেন। মহামারীর সময় সরকারী, বেসরকারী সব সেবাকার্যের সহযোগিতা করা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা রাজনৈতিক, সামাজিক অশান্তিতে সব সময় রেডক্রস-কর্মী প্রস্তুত।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে সেবা ও সুস্থ নাগরিক জীবন যাপনের শিক্ষা যাতে ছেলে-মেয়েরা পায় এই উদ্দেশ্যে ১৯২৬ সালে রেডক্রসের জুনিয়র শাখা গঠন হয়। আজ জুনিয়র রেডক্রস কর্মীসংখ্যা ভারতবর্ষে ৩০ লক্ষেরও উপর। জুনিয়রদের আর একটি মস্ত বড় সুযোগ রেডক্রসের সাহায্যে আসে। দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আদান-প্রদান, ভাবের আদানপ্রদান, কৃষ্টির আদান-প্রদান আর পৃথিবীর সকলকে প্রীতির বন্ধনে বাঁধবার শিক্ষা। চিঠিপত্র লেখা, আঁকা ছবি পাঠানো চলে, বিনিময় হয় ভাবধারার। ভারতের ছোট ছেলেমেয়ে চেনে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান, জার্মানী, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড আমেরিকার ছেলেমেয়েদের আর তারাও তাদের ভূগোলের বাইরের ভারতবর্ষকে জানবার সুযোগ পায় তাদেরই মত ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে। কম কথা নয়। ১৯৬২ সালে যে আমেরিকার জাতীয় রেডক্রস দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েদের একত্র হবার মস্ত সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের এই পরিকল্পনার নাম ছিল—

Operation "vista"—visit of international students America.

ভারতবর্ষ থেকে পাঁচটি "জুনিয়র" যোগ দিয়েছিল, দুটি ছেলে আর তিনটি মেয়ে। কিশোর কিশোরীরা তাদের সমবয়স্কদের সঙ্গে মেলামেশার, তাদের গৃহে অতিথি হবার সুযোগে নতুন করে বিশ্বমৈত্রীর এক অধ্যায় দেখে এসেছিল। আমাদের কিশোর কিশোরীরা কারও চেয়ে কম নয়, দুঃখের বিষয় তারা সব সময় সমান সুযোগ পায় না। অভিভাবক, বাপ-মা, স্কুল সকলের সে জন্য সদাসচেতন থাকা দরকার যে কোন সম্ভব সুযোগের সুবিধা যেন ছেলেমেয়েরা পায়। এই "Vista" প্রোগ্রামে যোগদানকারী কিশোর রেডক্রস দলকে আমেরিকান রেডক্রসের প্রেসিডেণ্ট নাম দিয়েছিলেন "Brilliant juniors!" প্রতিভাতে ঝলমল এরকম ছেলেমেয়ে আরও কত আছে।

রেডক্রস তাই চেষ্টা করছে মানুষের সুখ-দুঃখের দুর্দিনেও আশার আলো জ্বালতে। কর্মীদের আমরা অভিনন্দন জানাই। জানাই আমাদের শুভেচ্ছা। তাঁদের কল্যাণব্রত সার্থক হ'ক। তাঁদের কাজে নূতন কর্মী আসুক। সে হবে এক সুন্দর সমন্বয়—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ং"—। সেবাব্রত যার শুরু সে আজ জগতে প্রীতির বন্ধনকে, পরস্পরের অসময়ের সাথী হওয়াকে একত্র করে দিল, এ আর আশ্চর্য কি? দুঃখের মুহূর্তে মানুষ জানবে মানবতা একেবারে হারিয়ে যায়নি, শুধু মাঝে মাঝে পথ ভুল করে।

কিম্ববিচিত্রা

বিজ্ঞানজগতে এক নতুন জ্যোতিষ্ক

আপেক্ষিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে এতদিন আইনস্টাইনের থিওরীই পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রাহ্য হয়ে এসেছে। কিন্তু সেটা যে শেষ কথা নয়, সম্প্রতি দুজন বিজ্ঞানী অংক কষে সেটা প্রমাণ করেছেন। এ'রা দুজন হচ্ছেন কেম্ব্রিজের পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ ফ্রেড হয়েল এবং তাঁর সহকর্মী ডঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকর। ডঃ নারলিকরের এই কৃতিত্ব বিজ্ঞান জগতে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টির সঙ্গে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতকে এক মহাসম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে—যে সম্মান আচার্য জগদীশচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও রমনের পর আর অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

ডঃ হয়েল বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য সুখ্যাত, কিন্তু যে নতুন থিওরীর ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাজাগতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে সে-ব্যাপারে ডঃ নারলিকরের কৃতিত্ব সমধিক। এঁদের থিওরিটি এমন অগ্রবর্তী পদার্থের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল যে, রয়াল সোসাইটিতে ব্যাখ্যা করার সময়ে উপস্থিত বিজ্ঞানীদেরও অনেকের পক্ষেই সমাক অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। ডঃ নারলিকর সাত বছর আগে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এস-সি পাস করে কেম্ব্রিজে যান এবং অধ্যাপক ডঃ হয়েলের অধীনে গবেষণায় রত হন।

ডঃ নরলিকর ১৯৩৮ সনের ১৯শে এপ্রিল কোলাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ওঁর বাবা ডঃ ভি ভি নারলিকর কেম্ব্রিজের এম এ এবং র‍্যাংলার। ওঁর মা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের এম এ। অতি শিশু বয়সেই ডঃ জয়ন্ত অংকের প্রতি তাঁর ঝোঁক প্রকাশ করেন এবং সে বিষয়ে পিতার উৎসাহ ও প্রেরণা তাঁর জীবনপথ নির্ধারিত করে দিতে সহায়ক হয়। অপরদিকে তিনি শিশুকাল থেকেই মায়ের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং এখন গীতা তাঁর একটি প্রিয় গ্রন্থ। পিতা বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে অংক শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে যোগদান করায় শৈশবেই তিনি কোলাপুর ত্যাগ করেন। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে ওঁর পিতা বর্তমানে রাজস্থানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ডঃ জয়ন্ত শেষবার তাঁর বাবা-মার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন তিন বছর আগে।

বেনারসে স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং পিতার কাছে শিক্ষালাভ করে অংক শাস্ত্রে সম্মানের সঙ্গে স্নাতক হন। কেম্ব্রিজে তিনি ডঃ হয়েলের অধীনে অংক, পদার্থবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান বিষয়ে গবেষণায় রত হন। গত বছর কিংস কলেজ তাঁকে একজন ফেলো করে নেয় এবং তিনি পি-এইচ-ডি হন।

হয়েল-নারলিকরের যে থিওরী সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে বিস্ময় ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সেটি হচ্ছে সৌরজগতের গঠন নিয়ে। নিউটন থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এই মতে বিশ্বাসী যে বিশ্বপরিমণ্ডল থেকে অর্ধেক গ্রহ অদৃশ্য হয়ে গেলেও সৌরমণ্ডলীতে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু হয়েল-নারলিকর বলছেন যে, তেমন অবস্থা হলে সূর্যের তাপ শতগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং পৃথিবী সেই তাপে পুড়ে যাবে। রয়াল সোসাইটিতে এই নূতন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে ডঃ হয়েল অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলেন যে, তাঁদের এই তত্ত্ব আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদের সামান্য সম্প্রসারণ। অথচ সামান্য সম্প্রসারণের চেয়েও বড়ো ব্যাপার। এঁদের এই নতুন থিওরীর উৎস হচ্ছে মাখ তত্ত্ব।

ডঃ জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকর

সেটি হচ্ছে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেক বস্তুর ভর [illegible] অপর প্রতিটি বস্তুর অবস্থানের প্রভাবিত হয়। আইনস্টাইন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের সঙ্গে মাখের এই সিদ্ধান্ত একীভূত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। হয়েল-নারলিকর এই

একীভূত করলেই সাফল্য অর্জন করেছেন বলে দাবি করছেন। এটি বুঝাতে এমন জটিল অঙ্কের সহায়তা গ্রহণ করা হয় যে, রয়াল সোসাইটিতে সেদিন (গত ১১ই জুন) উপস্থিত বিজ্ঞানীরা হতবাক হয়ে যান। বক্তৃতা অন্তে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রায়ান ফ্লাওয়ার্স মন্তব্য করেন যে, তাঁকে তিন মাস ভাববার সময় দিলে তবে যদি তিনি কিছু উপলব্ধি করতে পারেন।

এই নতুন থিওরী কতকগুলি সুবিধা এনে দেবে। এতে বুঝানো হয়েছে যে আপেক্ষিকতা কেন সর্বদাই আকর্ষক শক্তি-বিশিষ্ট, কখনই বিকর্ষক নয়। ডঃ হয়েল বলেন, সকলেই একথা জানেন যে, আপেল নিউটনের মাথার উপরে পড়েছিল, উপর দিকে উড়ে যায় নি। আইনস্টাইন এই

আপেক্ষিকতা সম্পর্কে নতুন থিওরীর অন্যতম উদ্ভাবক ডঃ ফ্রেড হয়েল
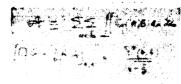
ক্রিয়াটিকে ধরে নিয়ে গাণিতিক সমীকরণে ইচ্ছামত একটি বিয়োগ চিহ্ন প্রয়োগ করেন। হয়েল-নারলিকর এই বিয়োগ চিহ্নটির যথার্থ্য প্রমাণ করেছেন।

এঁদের এই থিওরী আরো ব্যক্ত করেছে যে, কেন বিশ্বের বহু দূরের গ্রহমণ্ডলী আলোর চেয়ে দ্রুততর গতিতে পৃথিবী থেকে সরে যায়। আইনস্টাইনের মতে এই গতি নির্দিষ্ট এবং তা ছাপিয়ে যেতে পারে না। হয়েল-নারলিকরের নির্ধারণ হচ্ছে যে এক অঞ্চলের বস্তুর আলোক-গতির সঙ্গে অন্য অঞ্চলের বস্তুর আলোক-গতির তুলনা করা ভুল। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, তাঁদের থিওরী পার্থিব পরিভাষায় বিশ্বের দূরস্থানীয় অঞ্চলে যা ঘটে সেটা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম।

এই কণাপুঞ্জ অর্থাৎ সূর্য ও পৃথিবীর আপেক্ষিকতা ঘটছে কতকটা পরস্পরের জন্য এবং কতকটা আরো দূরের তারকা ও নক্ষত্র-মণ্ডলী জাতীয় বস্তুর দরুণ। এঁদের মতে বিশ্বকে যদি দু-আধখানা করা যায় তাহলে স্থানীয় সৌরমণ্ডলীর আপেক্ষিকতা দ্বিগুণ হয়ে পৃথিবীকে সূর্যের আরো কাছে টেনে নেবে। সূর্যের কেন্দ্রস্থলে তাপ ও চাপ বাড়ার ফলে তাপ এবং শক্তির সঙ্গে উজ্জ্বল্য বিকিরণ করবে। সেই তাপে কাঠকয়লায় পরিণত হবার আগে মানুষের ওজন দেড়শ পাউণ্ডের জায়গায় দাঁড়াবে তিনশ পাউণ্ড।

রয়াল সোসাইটিতে তাঁদের এই থিওরী ব্যাখ্যা করার পর ডঃ নারলিকর এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে, তিনি এবং অধ্যাপক হয়েল দীর্ঘ পরিশ্রম এবং ভুলভ্রান্তির পর এই নতুন থিওরীর উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেনঃ "এ কাজে আমার অংশ আলাদাভাবে ধরা যায় না। এটা বাস্তবিকই যুক্ত প্রচেষ্টা। ব্যাপারটা সত্যিই কিছু দাঁড়াচ্ছে মনে হওয়াতেই আমরা রাতের পর রাত, অনেক সময়ে সারারাত পর্যন্ত কাজ করে গিয়েছি।"

ডঃ নারলিকরের কৃতিত্বের কথা প্রকাশিত হবার পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা তাঁকে ভারতে এসে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু ডঃ নারলিকরকে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে তিনি জানান যে, তিনি দূর ভবিষ্যতের কথা কিছু ভাবেননি। তবে তাঁকে ১৯৬৭ পর্যন্ত কেম্ব্রিজে গবেষণায় রত থাকতে হবে। তারপরে তিনি দেশে ফিরে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে পারেন। ডঃ নারলিকর তাঁর থিওরীর একটি কপি পাঠিয়েছেন পিতার কাছে। তাঁর মতে যে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি এটা বুঝতে পারবেন তাঁদের মধ্যে তাঁর পিতা একজন। সুদর্শন, নিরামিষাশী এবং ধূমপানেও অনাসক্ত যুবক ডঃ নারলিকর হিন্দু-দর্শনের অত্যন্ত ভক্ত এবং মনেপ্রাণে ও আচরণে তিনি একান্তভাবেই ভারতীয় আদর্শই অনুসরণ করে চলেন।

প্রাধান্যলাভ করেছে—সেটা হল এই দুঃসহ অবস্থার অবসান করে? আপনি যথার্থই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, অর্জনসংকেত দেখেও যদি মন্ত্রীদের নিদ্রাভঙ্গ না হয়, যদি তাঁরা ঝড় উঠবে না মনে করে নিশ্চিন্তে থাকেন, তাহলে ভুল করবেন। কারণ মানুষের সহ্যের সীমাটা অসীম নয়। ইতি

শ্রীপ্রমথেশ ভট্টাচার্য
ভুবনেশ্বর

প্রতিষ্ঠা সংগ্রাম

॥ ১ ॥

মহাশয়,

বর্তমান ভারতীয় সমাজজীবনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে শান্তিপ্রিয় বসু ও শতদল দাশগুপ্তের পর্যালোচনা (শনিবার, ৬ আষাঢ়, ১৩৭১ প্রকাশিত) সময়োপযোগী ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ হয়েছে। আধুনিক সমাজের চাঞ্চল্য, অশান্তি ও অসন্তোষের মনোভাবকে এক কথায় "প্রতিষ্ঠা-সংগ্রাম" নামে আখ্যাত করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি সমস্যার উল্লেখ ও কারণ নির্ধারণের মধ্যেই যে কোনো আলোচনা নিঃসীম হয়, তার সমাধান বা আলোকপাত আলোচনা থাকে না। ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা, সামাজিক গতিশীলতা, নগরীকরণ, বৈজ্ঞানিক উপকরণের সুপ্রচুর ব্যবহার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে একদিকে বাণিজ্যিকতার প্রসারতা আজ সারা দুনিয়ায়; অন্য দিকে ভারতে জনবাহুল্য, খাদ্যাভাব, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অব্যবস্থা, প্রাচীন গোষ্ঠীবদ্ধ কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ভাঙন, উপর থেকে চাপানো যান্ত্রিকতার ক্রম অথচ স্বল্প প্রসার ইত্যাদি ভারতীয় সমাজজীবনে য়ুরোপীয় বা মার্কিনী সমাজ-ব্যবস্থা এনে দিচ্ছে, টয়েনবি যাকে বলেছেন Conquest of western materialistic civilisation এটা যে ভালো নয়, তা বর্তমান ভারতের গঠনরূপ পরিকল্পনার উদ্গাতা মনীষীরা, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ, ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সমাজের ভোগবাদ, ও জীবনধারা ভারতকে পশ্চিমী দুনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পথে নিয়ে যাবে যে পথ—T S Eliot-এর কথায়—"This is the way the world ends" সোশ্যাল সিকুরিটি ও সোশ্যাল জাস্টিস কাম্য, বুদ্ধিনিষ্ঠ মানুষ আজ বুঝেছে তার সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন ও অবস্থা তার করায়ত্ত; বর্তমান অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা মানুষকে এ ক্ষমতা দিয়েছে। তাই বর্তমান ভারতীয় তথা পৃথিবীর সমাজ-জীবনের এই ভারসাম্য সন্দেহকার চিন্তায় অশান্তিতে দোদুল্যমান অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাওয়া চাই, এ কথাটা বলা দরকার।

সুদেষ্ণা ও দিলীপ চট্টোপাধ্যায়
দীঘা।

ছিন্ন হৃদয়

॥ ১ ॥

সবিনয় নিবেদন,

গত ৬ই জুন, ১৯৬৪, 'দেশ' পত্রিকায় নেহরুজীর প্রতি শ্রদ্ধায় বেষ্টিত যে নিবন্ধগুলি পরিবেশিত হয়েছে তাদের মধ্যে 'ছিন্নহৃদয়' রচনাটির অন্তর্ভুক্তি বিসদৃশ বলে মনে হওয়ার আশঙ্কা আছে। নেহরুজীর একান্ত প্রয়াসে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার ভারতীয় সংবিধানে বিধৃত হয়েছে সেই অধিকারবলেই উক্ত রচনার বক্তব্য, ভিন্নহৃদয়কে ছিন্ন না করেও, দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করতে বাধা নেই। তবুও মনে হয় অন্য কোনও সময় ঐ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলে বোধ হয় শোভন হত।

সুদীর্ঘকাল ধরে নেহরুজী ভারতীয়-চিত্ত অধিকার করেছিলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন সূত্রে তাঁর সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় ঘটেছে, দেশবাসীও একাত্ম বোধ করেছেন তাঁর সান্নিধ্যে এসে। আধুনিক কালে দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের উত্থান-পতনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত হয়ে আছে নেহরুজীর জীবনকাহিনী। যখন কোনো তাঁকে পরাভব স্বীকার করতে হয়েছে সেই পরাজয় ব্যক্তিগতভাবে জওহরলাল নেহরুর হয়নি, হয়েছে ভারতবর্ষের অধিনায়কের। তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বলতে পারেন কিন্তু তাঁর পশ্চাদ্বর্তী চুয়াল্লিশ কোটি নরনারী তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরগামী হয়নি। আজ যদি এই নিষ্পত্তিও হয় যে, নেহরু-নায়ককে আমরা অগ্রাহ্য করেছি তাহলে সেই সঙ্গে এই কথাও সর্বদাই স্বীকৃত হবে, নেহরুজীকে অগ্রাহ্য করে আমাদের মধ্য থেকে তাঁকে আমরা কখনও বাদ দেই নি।

এই প্রসঙ্গে নেহরুজীর জীবনের একটি ঘটনা মনে পড়ছে: বিখ্যাত কবি ইকবাল তাঁর মৃত্যুশয্যায় নেহরুজীকে ডেকেছিলেন এবং জানতে চেয়েছিলেন যে, নেহরুজী এবং মিঃ জিন্নার মধ্যে প্রভেদ কোথায়। নিজের জিজ্ঞাসার মীমাংসা ইকবাল নিজেই করে গেলেন। তিনি বলেছিলেন, মিঃ জিন্না রাজনীতিজ্ঞ এবং জওহরলাল দেশপ্রেমিক।

দেশপ্রেমে মগ্ন থাকলেও জওহরলাল কখনও রাষ্ট্রীয় গন্ডি-চেতনার পূজারী ছিলেন না, জাতীয় আত্মম্ভরিতার মোহও তাঁকে মোহগ্রস্ত করেনি।

দিলীপকুমার দাস
বর্ধমান।

॥ ২ ॥

মহাশয়,

শ্রীনেহরুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সারা দেশের বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যক্তিসমাজ যখন ভাবাবেগে আচ্ছন্ন (বিশেষত সংবাদপত্রে, তাঁর মৃত্যুর সাত দিন পরেও 'শ্রীনেহরুর শোকে মৃত্যু' এই শিরোনামায় ভাবাবেগের দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি), এমন সময় আকস্মিকভাবে বোধ হয় একমাত্র পত্রিকা 'দেশ'-এর পাতায় রঞ্জনের 'ছিন্নহৃদয়' রচনাটি প্রকাশিত হওয়ার অতি সময়োপযোগী এবং মূল্যবান মনে করছি। নেহরুর প্রতি রঞ্জনের ভাবোচ্ছ্বাসবর্জিত নিরপেক্ষ মন্তব্য আপাতদৃষ্টিতে অপ্রিয় ভাষণ হলেও অসত্য ভাষণ নয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সুদীর্ঘ প্রায় আঠার বছর ধরে শ্রীনেহরুর প্রধানমন্ত্রীত্বে আমরা সেই পদে তাঁর অধিষ্ঠান অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে এসেছি, আমরা জওহরলালে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। সেই অভ্যাসের শিকল আকস্মিকভাবে ছিন্ন হওয়ায় আমরা দিশাহারা হয়েছি।

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর চারিত্রিক বিশ্লেষণের চেয়ে পদের ভূমিকায় তিনি কতখানি সার্থক, তার সমালোচনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অস্বীকার করবার উপায় নেই, মানুষ হিসাবে শ্রীনেহরুর জীবনী সর্বসাধারণের পঠিতব্য হবে নিঃসন্দেহে কিন্তু ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁর চিন্তাধারা কর্মধারা ও রাজনীতি ভারতবর্ষের ব্যক্তি ও রাষ্ট্রজীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়েছে কিনা তার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা আমরা দাবি করব।

সনৎ মুখোপাধ্যায়
পারুলিয়া।

॥ ৩ ॥

মহাশয়,

রঞ্জনের "ছিন্নহৃদয়" প্রবন্ধটি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু সময়োপযোগী হয়নি তার প্রমাণ, পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা বিভাগে প্রকাশিত উষ্মাপূর্ণ একটি চিঠি।

নেহরু নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন তাকেই তাঁর চরিত্রবিশ্লেষণের মাপকাঠি হিসেবে না ধরে নিজস্ব স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করার সৎসাহসের জন্য রঞ্জনকে ধন্যবাদ জানাই।

নেহরু এক বিরাট আন্তর্জাতিক নেতা হিসেবে প্রচুর যশ অর্জন করেছিলেন। নিজের দেশের বহু সমস্যার সমাধান না করতে পারলেও বিদেশী রাষ্ট্রের সমস্যা সুরাহা করে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তাঁর এই আন্তর্জাতিকতার মূলে বড় আঘাত করেছে চীনের ভারত আক্রমণ, যে চীনকে আমরা নেহরুজীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভাই ভাই বলে সরবে অভিনন্দিত করেছিলাম। এটা তাঁর আন্তর্জাতিকতার চরম ব্যর্থতা, এ সত্য কোনমতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এইরকম কতকগুলি বড় ঘটনার বিশ্লেষণ যদি সমালোচনার দৃষ্টিতে বিরুদ্ধ হয় তাহলে রঞ্জন নিশ্চয়ই অপরাধী।

অরবিন্দকুমার বসু
কলিকাতা-১২।

তিনি কখনও কোনও বিতর্ক বা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নি। কিন্তু পুণার মন্দিরে মন্দিরে ধর্ম ব্যাখ্যা করার সময়ে তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দেন।

পরাঞ্জপের ছিল ঈশ্বরদত্ত সুন্দর চেহারা। রাজোচিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। এক শতাব্দী পূর্বে জন্মগ্রহণ করলে হয়তো তিনি পেশোয়া বংশের গৌরব বর্ধন করতে পারতেন। তাঁর দেহের বর্ণ ছিল সুগৌর, তদুপরি ছিল তীক্ষ্ণ নাসা ও সুদৃঢ় চিবুক। প্রাচীন রীতি অনুযায়ী তিনি ধুতি ও সাদা জামা পরতেন—মাথায় থাকত লাল মারাঠী পাগড়ী। গান্ধীযুগ প্রবর্তিত হবার পর তিনি খদ্দরের টুপি ব্যবহার করতেন। তাঁর কমনীয় চেহারা দেখে সকলেই আকৃষ্ট হত। তার ওপর ছিল তাঁর নির্ভুল শব্দ চয়ন। একদিকে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা ও বলিষ্ঠ কল্পনাধারা, অন্যদিকে তাঁর নির্ভীক দেশপ্রেম। ফলে লাউডস্পীকারের সাহায্য না নিয়ে তিনি ওজস্বিনী বক্তৃতার দ্বারা সহস্র সহস্র শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারতেন। এমন কি তাঁর বিচারের সময়ে জুরীর সভ্যগণ পর্যন্ত তাঁর বাক-চাতুর্যে অভিভূত হয়ে যেতেন।

পরাঞ্জপের চরিত্র সম্যকভাবে বোঝা একটু কঠিন। ভল্টেয়ার ও ডেমস্থেনেস-এর বিভিন্নমুখী প্রগতির সমাবেশ হলে যে বিশেষ চরিত্রের সৃষ্টি হত—তাঁর চরিত্রও যেন অনেকাংশে সেই রকম। এক হিসাবে তিনি এই দুজনের চেয়েই বেশী বাধা লাভ করেছিলেন—কারণ তাঁকে বিদেশী শাসন-কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। এদের বিরুদ্ধে প্রাণপণে সংগ্রাম করার জন্য তিনি ক্রমাগত নিজ লেখনী ও ওজস্বিনী বক্তৃতার সাহায্য নিতেন।

তিলক অথবা গান্ধীর মত তিনি সক্রিয় রাজনীতিক কর্মী ছিলেন না বটে কিন্তু প্রয়োজন হলে তিনি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করতেন না। ১৯০৮ সালে 'কাল'-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধের জন্য তাঁকে ১৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯২২ সালে এক জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার জন্য জমি দখল করার বিরুদ্ধে তিনি মুলশি সত্যাগ্রহে যোগদান করেন—ফলে তিনি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

বীর সাভারকারের ন্যায় বিপ্লবী পর্যন্ত পরাঞ্জপেকে রাজনৈতিক গুরু বলে স্বীকার করতেন ও তাঁর রচনাবলী পড়ে অনুপ্রাণিত হতেন। 'বৃটেনের সমস্যা ও তদ্ঘটিত ভারতের প্রকৃত সুযোগ—' এ নীতি পরাঞ্জপেরই প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। একদা এই আদর্শই নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও রাজনৈতিক মতবাদের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়।

পরাঞ্জপে ৬৫ বৎসর বেঁচেছিলেন। এর মধ্যে তিনি দুটি উপন্যাস, ছয়টি নাটক ও দর্শনশাস্ত্র বিষয়ে 'পূর্ব মীমাংসা' একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, 'কাল'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল। সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর পরে জাতীয় সরকার সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন এবং ১৯৪৬ সালে সেই রচনাবলী দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৯০৯ সালে 'কাল'-এর প্রকাশন বন্ধ হয়ে গেলে তিনি 'চিত্রময় জগৎ' নামক মাসিক পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন ও পরে 'স্বরাজ্য' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'স্বরাজ্যে'র উদ্দেশ্য ছিল মহারাষ্ট্রে গান্ধী মতবাদ প্রচার করা।

১৯২৯ সালে বেলগাঁয়ে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির পদ অলংকৃত করার অল্পদিন পরেই পরাঞ্জপের দেহাবসান হয়। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের যে প্রতিজ্ঞা কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল সেটা তিনি মৃত্যুর পূর্বেই জেনে গিয়েছিলেন এবং এটাই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা।

পুস্তক পরিচয়

একটি সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস

ত্রিবর্ণ। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য দশ টাকা।

বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য কিছু কম নয়। কিন্তু একক প্রচেষ্টায় বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) উপন্যাসে যত রকমের বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন এমন আর কেউ নন। বনফুল এই বৈচিত্র্য ঘটিয়েছেন কেবল বৈচিত্র্যের জন্য নয় বরং জীবনকে জানবার অদম্য কৌতূহলই এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ধরা পড়েছে। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক অর্থাৎ দেহ ও আত্মার ঐক্যেই বনফুলের উপন্যাসের বিশিষ্টতা। ত্রিবর্ণ উপন্যাসটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

সমাজে সমস্যা আছে। এই সমস্যা সমাধানের প্রতিকূলতার অন্ত নেই। আবার সমাধানের পথও একটা নয়। মোটামুটি তিন দলের মনোভাব পরিস্ফুট হয় সমাজ সমস্যা সমাধানে। একদল সমন্বয় পন্থী, দ্বিতীয় দল নবীন—সংশোধন পন্থী, তৃতীয় দল বে-পরোয়া পন্থী। প্রথম দলের রঙ সাদা, দ্বিতীয় দলের সবুজ আর তৃতীয় দলের লাল। এই হল ত্রিবর্ণ। এই ত্রিবর্ণের মধ্যে আছেন ডাক্তার সুঠাম মুখোপাধ্যায় যিনি প্রথম মতের পক্ষপাতী, দ্বিতীয় মতবাদে বিশ্বাসী গণেশ হালদার এবং তৃতীয় মতবাদ আশ্রয় করেছে ঝিনুক। বনফুল এদের জীবনদর্শন ব্যক্ত করেছেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় এবং গণেশ হালদারের রোজনামচাগুলিতে সমাজের সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে। ত্রিবর্ণ উপন্যাসের এই এক দিক। অন্যদিকে রয়েছে উদ্বাস্তু ঝিনুক, শামুক, সতীশ প্রভৃতি চরিত্র। উদ্বাস্তুদের অসহায়তার, সুযোগ নিয়ে ডাক্তার রাঘব ঘোষাল, মিস্টার সেন ইত্যাদি স্বার্থপরতার পাপ জালে বিভোর। বনফুল উপন্যাসটিতে সর্বস্বান্ত বাঙালীর জীবনবেদ রচনা করেছেন। নানা বিপর্যয় সত্ত্বেও মানুষের বেঁচে থাকার বাসনা যে কত প্রবল তা এই উপন্যাসটি পড়লে বোঝা যাবে। বনফুল আশাবাদী লেখক। কেবল বীভৎসতার নগ্ন রূপটিই তিনি প্রকাশ করেননি। গণেশ হালদারের জীবনের ন্যায়ে এবং সুঠাম মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে গড়ে তোলার প্রেরণার ইতিহাসই এই উপন্যাসের অন্যতম আবেদন। ৪।৬৪

অনুবাদ

পঞ্চমাঙ্ক। আগাথা ক্রিস্টি। অনুবাদ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১২। মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আমাদের সাহিত্যে ভাল রহস্য উপন্যাসের অভাব আছে। এককালে কেউ কেউ ভালো রহস্য উপন্যাস লেখবার চেষ্টা করেছেন। কিছু সাফল্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কেন জানি না এ জাতীয় রচনায় প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা অগ্রসর হতে চান না। অথচ রহস্য, কৌতূহল মানবমনের আদিম বৃত্তি। সে কারণে গোয়েন্দা কাহিনী স্বভাবতই সে পড়তে চায়। ভালো রচনার অভাবে অনেক সময়েই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হয়। আর যাঁরা লেখেন তাঁরা (সকলে নন) বিদেশী রহস্য কাহিনীর অনুকরণ করেন বলে মূলেরও পাই না আবার মৌলিক গল্পের স্বাদও সেগুলিতে থাকে না।

অনুবাদের মধ্য দিয়ে ভাষা পুষ্ট হয়, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বাড়ে। নীরেন্দ্র চক্রবর্তী আগাথা ক্রিস্টি'র 'টুওয়ার্ডস জিরো' বইটির পঞ্চমাঙ্ক নামে অনুবাদ করেছেন। রহস্য-কাহিনীর রচনার দিক থেকে আগাথা ক্রিস্টির নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। ডিটেকটিভ কাহিনীর মূল উপাদানগুলির সমাবেশ করে তিনি সেগুলির উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করেন তেমনি চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের জটিলতার দিকটির প্রতিও তিনি সেইরকম মনোযোগী হন। ফলে তাঁর কাহিনীতে পারিবারিক উপন্যাস অথবা সামাজিক উপন্যাসের মত বিন্যাস কৌশল লক্ষ করা যায়। পঞ্চমাঙ্কেও সেই বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। খুনের পশ্চাতে যে নিগূঢ় কারণ থাকে এবং হত্যাকারী যে লোকচক্ষুর আড়ালে তার পরিকল্পনা রচনা করতে থাকে সেটা স্বাভাবিক। আগাথা ক্রিস্টি এই গল্পে হত্যাকারী সেইসব সূক্ষ্ম পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনার পশ্চাতে হত্যাকারীর মানসিক প্রবণতাগুলি ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করে পরিণতিতে এসে পৌঁছেছেন। লক্ষণীয় যে, নেভিল, ম্যাক-হোয়াটার, মেভিল, টমাস এবং সর্বোপরি অড্রে সব চরিত্রগুলিই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় হল ইন্সপেক্টর ব্যাটেলের চরিত্র। রহস্য উদ্ঘাটনে তিনি কিভাবে কার দৃষ্টান্তের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন তা লক্ষ করবার মত। নীরেন্দ্রবাবু এই বইটির অনুবাদ করে ডিটেকটিভ গল্পখোর পাঠকের ধন্যবাদভাজন হবেন নিশ্চয়ই। অনুবাদের ভাষা ঝরঝরে। মূলের স্বাদ কোথাও বিকৃত হয়নি।

কবিতা

আমি যেতে চাই নরকে। ভূদেব সেন। প্রকাশক : সত্যেন্দ্রনাথ সেন, পি১৮, দরগা রোড, কলকাতা-১৭। দু'টাকা।

আলোচ্য কবিতা গ্রন্থের কবি স্বর্গত ভূদেব সেন সমসাময়িক ঘটনাবলীর মধ্যে একটি চাঞ্চল্যকর নাম, যৌবনের সূচনায় অতর্কিত মৃত্যু যাঁকে অধিকার করে নিয়েছে। এই ঘটনা কোনো কবির সার্থকতা বিচারের মাপকাঠি না হলেও সংকলনের কবিতাগুলির মধ্যে এমন কিছু-কিছু গুণ আছে, যা অনুধাবন করে বলা যায় ভবিষ্যতে হয়তো ইনি সার্থক কবির স্বীকৃতি লাভ করতেন। আঙ্গিক বিষয়ে সচেতনতা ও গতানুগতিক চিন্তা পরিহার করার চেষ্টায় ভূদেব সেনের কবিতাগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সাঁতা বলতে; কৈশোরক উদ্দামের সুস্পষ্ট ব্যবহারের ফলে অত্যন্ত ঋজু ও অকপট ভাষায় কবি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পেরেছেন। যেমন :

'আমি চেয়েছিলাম নরকের নীচ পল্লীতে
ঠাঁই পেতে।
মানুষের ঘৃণার সে রাজ্যে
ক্লেদ আছে জানি—কিন্তু সুন্দরের বঞ্চনা
নেই।'

রঙ্গজগৎ

রঙ্গালয়ে জাতীয় সংগীত পরিবেশন

কলকাতার একটি বিশিষ্ট পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে প্রতি নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠানের পর জাতীয় সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য কোন রঙ্গালয়ে এই রীতি এখনো প্রবর্তিত হয়নি। আমরা আশা করেছিলাম, কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ এই জাতীয় কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্যের প্রশ্রয় দেবেন না। এই মর্মে ইতিপূর্বে আমরা আবেদনও জানিয়েছিলাম।

কম্যুনিস্ট চীনের ভারত আক্রমণের পর দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধের যে অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি রঙ্গালয়ে অবিলম্বে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের ব্যবস্থা করা উচিত। জনমনে দেশচেতনা যাতে আরও সুদৃঢ় হতে পারে, সে ব্যাপারে রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কম নয়। বিগত যুগের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে বাংলার রঙ্গমঞ্চ দেশপ্রেমের অন্যতম পীঠস্থান রূপে পরিগণিত হত। বাংলা রঙ্গমঞ্চের সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা আজকের দিনের রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষরা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হননি। তাই আমরা আশা করব, জাতীয় দায়িত্ব পালনের এই মুহূর্তে আমাদের রঙ্গালয় পশ্চাতে পড়ে থাকবে না। এবং আদর্শচ্যুতির অপবাদ কলকাতার রঙ্গালয়ের সুমহান ঐতিহ্যকে কোনদিনই কলুষিত করবে না।

ডি আর প্রোডাকশন্স-এর "আলোর পিপাসা" (পরিচালনা : তরুণ মজুমদার) ছবিতে সন্ধ্যা রায়
ফটো—[illegible]

সেলজ্‌নিক পুরস্কার

ইতালির অভিনেতা মার্চেলো মাস্ত্রোয়ানি এবং জাপানের চিত্রপরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া ১৯৬৪ সালের গোল্ডেন সেলজ্‌নিক ট্রফি লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে গোল্ডেন লরেল পুরস্কারে ভূষিত হয় ফেদারিকো ফেলিনির "৮½"।

সিলভার লরেল পুরস্কার পায় "দি এল শেপড রুম" (ব্রিয়ান ফরবেস), "দি স্পোর্টিং লাইফ" (লিণ্ডসে অ্যাণ্ডারসন), "টম জোনস" (টনি রিচার্ড), ইতালির ছবি "দি সাক্ড লাইফ" (দিনো রিশি) ও "দি সাউণ্ড অব ট্রাম্পেটস" (আরমানো ওলমি), "উইণ্টার লাইট" (ইংগমার বার্গম্যান) এবং রাশিয়ান ছবি "মাই নেম ইজ ইভান" (তারকোভস্কি)।

[illegible] প্রোডাকশন্স-এর "লালপাথর" ছবিতে (পরিচালনা: সুশীল মজুমদার) সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তমকুমার

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে "চারুলতা"

সংবাদে প্রকাশ, আসন্ন ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ভারত সরকার সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ও আর ডি বনসাল প্রযোজিত "চারুলতা" ছবিখানি নির্বাচন করেছেন। আগামী আগস্ট মাসে উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

বার্লিন উৎসবে "মহানগর"

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ও আর ডি বনসাল প্রযোজিত "মহানগর" চিত্রটি বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হচ্ছে। ভারত সরকার উক্ত উৎসবের জন্য চিত্রটি নির্বাচন করেছেন।

বিশ্বনাথন, শম্পা চক্রবর্তী, শ্যামল ঘোষাল, ছায়া দেবী, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতি ছবির মুখ্য চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন। সংগীত পরিচালনা করেছেন সলিল চৌধুরী।

অন্তরাল

পরশমল দীপচাঁদের "অন্তরাল" ছবির শুটিং প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নীতা সেনের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এই ছবি পরিচালনা করছেন অগ্রদূত-গোষ্ঠী। চিত্রনাট্য তাঁদেরই রচনা। ছবির মুখ্য চরিত্রগুলিতে আছেন বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, দিলীপ রায়, দীপিকা দাস, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তরুণকুমার, লতিকা দাস, রবি মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, শিশির বটব্যাল প্রভৃতি। সুধীন দাশগুপ্ত সুরকার।

নিশাচর

ভূপেন রায় পরিচালিত গুপ্তশ্রী প্রোডাকশন্সের রহস্যারোমাঞ্চের ছবি "নিশাচর"-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন শম্ভু মিত্র, বিকাশ রায়, অসিতবরন, দিলীপ রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, সুমিত্রা সান্যাল, স্মিতা মজুমদার, লীলাবতী দেবী, নমী মজুমদার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতাঞ্জলি রায়, ভুবন চৌধুরী, মণি শ্রীমানী, প্রীতি মজুমদার, ধীরাজ দাস, দীনেশ মিত্র, মুকুন্দ চট্টোপাধ্যায়, কামু, মণিকা অধিকারী প্রমুখ জনপ্রিয় শিল্পিবৃন্দ।

নতুন তীর্থ

চিত্রপরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় প্রোডাকশন সিণ্ডিকেটের "নতুন তীর্থ" ছবির শুটিং প্রায় শেষ করে এনেছেন। বিধায়ক ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এ ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করবেন উত্তমকুমার, সুলতা চৌধুরী, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, তপতী ঘোষ, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, রেণুকা রায়, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী, জীবেন বসু, দিলীপ রায়, মন্মথ মুখোপাধ্যায়, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, অরুণ চৌধুরী, শিশির মিত্র, অজিত চট্টোপাধ্যায়, পিণ্টু দাশগুপ্ত, তরুণকুমার ও শঙ্কর। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক।

জয় ইঞ্জিনীয়ারিং-এর শ্রদ্ধার্ঘ্য

শ্রীনেহরুর স্মৃতির প্রতি জয় ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের শ্রদ্ধার্ঘ্য "প্রণাম" চিত্রটি (আশিস মুখোপাধ্যায় কৃত) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমে গত সপ্তাহে কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরলোকগত নেতার প্রতি কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধা নিবেদনের ঘটনা এই প্রথম।

সপরিবারে বার্লিন যাত্রার প্রাক্কালে দমদম এয়ারপোর্টে স্ত্রী ও পুত্র সহ সত্যজিৎ রায় —বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১লা জুলাই শ্রীরায়-কৃত 'মহানগর' ছবিটি দেখানো হচ্ছে ফটো—দেশ

শুভমুক্তি

অজয় কর পরিচালিত এস এম পিকচার্স-এর "প্রভাতের রঙ" এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। বিশ্বজিৎ ও শর্মিলা ঠাকুর ছবির দুটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, রবি ঘোষ, লিলি চক্রবর্তী, পদ্মা দেবী, তরুণকুমার, স্মিতা মজুমদার, নবাগত তাপস গঙ্গোপাধ্যায়, অনিন্দ্য ঘোষ, মিণ্টু দাশগুপ্ত, রবি মিত্র, বীরেশ্বর সেন, পদ্মা দেবী প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকার।

ছবির পর ছবি

অয়নান্ত

সন্ধানী প্রোডাকশনস-এর "অয়নান্ত"-র মুক্তি আসন্ন। সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন সন্ধানী-গোষ্ঠী। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, নবাগতা সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, এন ,

এস এস পিকচার্স-এর "প্রভাতের রঙ" ছবির (পরিচালনা: অজয় কর) বিভিন্ন দৃশ্যে বিশ্বজিৎ, শর্মিলা ঠাকুর, বিকাশ রায় ও মিহির চক্রবর্তী

টার্জন-অভিনেতার বিপদ !

ছায়াচিত্রে টার্জনের ভূমিকাভিনেতা এবং একদা-অলিম্পিক-সাঁতারু জনি উইসমূলার বর্তমানে একটু বিপদে পড়েছেন। বিপদটা জলজ অথবা স্থলজ প্রাণিঘটিত নয়। নিতান্তই পার্থিব—অর্থসংঘটিত।

অভিনেতা আদালতে অভিযুক্ত হয়েছেন। তিনি সাত হাজার টাকা ঋণ শোধ করেননি—এই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ। আদালতে দাঁড়িয়ে উইসমূলার বলেছেন: "সপ্তাহে আমার মোট খরচ ৩৯০০্ টাকা, আয় ৬৫০্ টাকা; তাই আজ আমি ঋণগ্রস্ত।

বিচারকের রায় এখনও জানা যায়নি।

ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅজিত বসু

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার দ্বাদশ বার্ষিক সভায় শ্রীঅজিত বসু সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি-পদে শ্রী বসুর নাম প্রস্তাব করেন শ্রী বি নাগি রেড্ডী এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রী মেহবুব খাঁর মৃত্যুর পর সভাপতির পদ শূন্য হয়। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার শ্রী বসু ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সংস্থার সভাপতি ছিলেন।

ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হবার পর শ্রী বসু এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমাদের ইনডাস্ট্রি সবচেয়ে বেশী ট্যাক্স-জর্জরিত। সরকারকে আমরা এই দুরবস্থার কথা এখনও বোঝাতে পারলাম না। তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, ফিল্ম ইনডাস্ট্রি ও সরকারের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্রমশই উন্নতি ঘটবে। তিনি বলেন, নতুন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পাব বলে আশা করি। বিদেশে তাঁর সুখ্যাতি প্রচুর। আমাদের বিশ্বাস, বহির্বিশ্বে তিনি ভারতীয় ছায়াছবির মর্যাদা ও বাণিজ্য বিস্তারের কাজে সক্ষম হবেন। এবং এর ফলে ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট কর্পোরেশন-এর কাজেরও উন্নতি হবে।

শ্রী বসু বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন ও অরোরা স্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় অনাদিনাথ বসুর পুত্র। তিনি বর্তমানে এই দুই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার।

"চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যাভিনয়

এ বি ডি সংস্থার দ্বিতীয় নিবেদন, রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্যাভিনয় ৫ই জুলাই সকাল সাড়ে দশটায় রক্সি সিনেমায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। "চিত্রাঙ্গদা"র গানে কণ্ঠদান করবেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। নৃত্যাংশে থাকবেন অনাদিপ্রসাদ ও তাঁর সম্প্রদায়।

মাধবী পিকচার্স-এর "মোমের আলো" (পরিচালনা: সলিল দত্ত) ছবিতে ললিতা চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

চিত্র-সমালোচনা

আত্মত্যাগের হিড়িক

যে-কোন ব্যক্তির আত্মত্যাগ অপরের মনে আবেগের উত্তাপ সঞ্চার করে। এই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বটির উপর চিত্রনির্মাতাদের আস্থা গভীর। বিশেষত হিন্দী চিত্রনির্মাতাদের—সহজ উপায়ে অতিবিস্তৃত বাণিজ্যিক পরিধির দর্শককুলকে সন্তুষ্ট করার কথা যাদের সকলের আগে ভাবতে হয়। তাই তাঁদের ছবিতে—যদি তা সামাজিক মেলোড্রামা হয়—আত্মত্যাগ ও মহত্ত্বের উপকরণ থাকবেই। শুধু তাই নয়, এই উপকরণের ভিত্তিতেই ছবির আবেদনটি ন্যস্ত করা হয়। এবং বহু ক্ষেত্রে এই মানবীয় উপাদান অবিশ্বাস্য ও মাত্রাতিরিক্ত রূপে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এ-ভি-এম-এর "পূজা কে ফুল" ছবিতে যা লক্ষণীয়।

এই ছবির অতিদীর্ঘ চিত্রনাট্য (রাজেন্দ্রকৃষ্ণ কৃত) যেন আত্মত্যাগের হিড়িক ফেলেই দিয়েছে। কার আগে কে প্রাণ দান করবে এ নিয়ে যেন কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে। প্রেয়সী তার প্রিয়তমকে সানন্দে কঠোর কর্তব্য পালনে, অর্থাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রীর সুখের জন্য এক অন্ধ মেয়েকে বিয়ে করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রেমিকের আত্মত্যাগও কম বড় নয়। সে আবার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সিঁথির সিঁদুর অটুট রাখার জন্য তার দুর্বৃত্ত স্বামীর হত্যাপরাধ নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছে। আবার ভ্রাতুষ্পুত্রীও আত্মত্যাগের পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়বার মেয়ে নয়। সে খুড়োকে তাকে বাঁচাবার জন্য নিজের সুখ-শান্তি নিমেষে তুচ্ছ করে স্বামীর গর্হিত পাপকর্মের প্রমাণ আদালতে এনে হাজির করেছে। অপর দিকে, ছবির নায়িকা শুধু নিজের প্রণয়-সুখ বিসর্জন দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি। তার একদা-প্রেমাস্পদ অন্ধ সহধর্মিণীকে নিয়ে যাতে সুখী হয় সে ব্যাপারেও চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেনি। এবং পরিশেষে আদালতে উকিল হয়ে (প্রণয়-বিপত্তির পর চিত্রনাট্যকার তাকে আইন পাশ করিয়ে রেখেছেন) তার পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে (যিনি পাব্লিক প্রোসিকিউটর) সে পূর্ব-প্রণয়ীকে আইনের শাস্তির হাত থেকে বাঁচায়। এবং চিত্র-কাহিনীর যবনিকায় এই মহীয়সী (ছবিতে দেবী বলে উল্লিখিত) নারী তার একদা-প্রেমিককে স্ত্রী-পুত্রে (পুত্র নবজাতক) নিয়ে সুখী দেখে পরম শান্তিতে পিতা-মাতার হাত ধরে রজতপট থেকে অদৃশ্য হয়। ছবিতে নায়কের অনুজ, তার অন্ধ পত্নী এবং নায়িকার পিতা-মাতার মহত্ত্বের কথা অনুক্তই রইল।

ছায়াছবির চরিত্রেরা এমন অনেক কিছুই করে ও ভাবে যা আমরা বাস্তবে ঘটতে দেখি না। এ ছবির চরিত্ররাও তাই। মাটির বুকে এ ধরনের মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। ছবিতে তারা আত্মত্যাগ ও মহত্ত্বের এমন প্রমাণ দিয়েছে যা মোটেই বিশ্বাস্য নয়। মহত্ত্ব তবে এমনই জিনিস যে, তা যদি নকলও হয় তবু বুঝি মানুষের মনে রেখাপাত করে। আর ছায়াছবির দর্শকরা—যাঁরা কাল্পনিক কাহিনী দেখে আনন্দ পাওয়ার জন্যই প্রেক্ষাগৃহে ঢোকেন—তাঁরা তো নিশ্চয়ই অভিভূত হবেন। তবে দর্শকদের মিথ্যা বস্তু দিয়ে আবিষ্ট করে রাখার শক্তি সব ছবির থাকে না। এ ছবির আছে। "পূজা কে ফুল" সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শক মনোরঞ্জনে নিঃসন্দেহে সক্ষম। ছবির এই সাফল্যের জন্য প্রশংসা পাবেন এ ভীম সিং। আবেগের উপকরণ তিনি ছবিতে থরে থরে সাজিয়েছেন। অনেক উপভোগ্য মুহূর্ত—যার মধ্যে নাচ-গান ও কৌতুকও আছে—তিনি সৃষ্টি করেছেন।

ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে ধর্মেন্দ্র ও মালা সিনহার চমৎকার প্রাণবন্ত অভিনয় ছবিটিকে অনেকাংশে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বি এন ফিল্মস-এর "গরিয়া চলি নৈহারবা" (পরিচালনাঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়) ভোজ-পুরী ছবিতে মনোমোহন কৃষ্ণ ও লিলি চক্রবর্তী। ফটো—দেশ

নায়িকার পিতা অশোককুমারের অভিনয় ছবির অন্যতম সম্পদ। হিন্দী ছবিতে সন্ধ্যা রায়ের (নায়কের ভ্রাতুষ্পুত্রীর চরিত্রে) সাবলীল ও চিত্তগ্রাহী অভিনয় দর্শকদের অবাক করবে। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন প্রাণ, নানা পালসিকর, সুলোচনা চ্যাটার্জি, মোহন চটি প্রভৃতি।

মদনমোহন সুরারোপিত ছবির গানগুলি সুখশ্রাব্য। কলাকৌশলের সকল বিভাগের কাজ উঁচুদরের।

সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন

বর্তমান নাট্যআন্দোলনের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং নাট্যাভিনয়, নাট্যসমালোচনা ও নাট্যরচনার লক্ষ্য ও আদর্শ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন গত সপ্তাহে তিন দিনব্যাপী এক বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করেন। গত ২০ জুন এই সম্মেলন সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্য সারা বাংলা নাট্য সম্মেলন প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করেন। সম্মেলনের মুখপাত্র তাঁদের সংস্থার বক্তব্য ও আদর্শ সাংবাদিকদের জানান এবং বলেন, আমরা শুধু অতীতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আমাদের কর্তব্য শেষ করব না। প্রকৃত আত্মসমীক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বিশ্লেষণ করব আমাদের সামগ্রিক নাট্যপ্রয়াসকে। আমরা বিচার করে দেখব, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি নাটক তার মহান দায়িত্ব কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করতে পেরেছে।

সম্মেলন শুরু হয় ২৭ জুন। প্রথম দু দিনের প্রতিনিধি সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল "সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের ভাব ও চিন্তা", "নাট্যপ্রযোজনার আবেগ ও চরিত্র" এবং পেশাদার ও অপেশাদার মঞ্চ সম্পর্কিত আলোচনা। তাপস সেন, জহর রায়, সবিতাব্রত দত্ত, শেখর চট্টোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বিশ্বাস, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী, সুনীল দত্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য, কিরণ মৈত্র, রাসবিহারী সরকার, দেবনারায়ণ গুপ্ত, ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, প্রভৃতি বিভিন্ন দিনের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। ২৯ জনের প্রকাশ্য সম্মেলন ও গুণী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মন্মথ রায়। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়।

নট-নাট্যমের "পাখীর বাসা"

নট-নাট্যম সংস্থা সম্প্রতি নিউ এম্পায়ার মঞ্চে একাঙ্কিকা "দায়ে পড়ে দারগ্রহ" ও পূর্ণাঙ্গ নাটক "পাখীর বাসা" মঞ্চস্থ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গ-হাস্যরসাত্মক একাংক নাটকটি খুবই উপভোগ্য হয়। অভিনয় করেন ফণিভূষণ গুই, শিবনাথ সরকার, হরিশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না সিংহ, নিমাই চৌধুরী ও কমল মুখো-পাধ্যায়।

"পাখীর বাসা" আধুনিক সামাজিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। নাটকে বক্তব্য আছে, সে সঙ্গে রয়েছে রস। হারাধন চক্রবর্তী, রমা দাস, গোপী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নাটকের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। নাট্যরচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাহ করেন জগমোহন মজুমদার।

ক্লাইভ-চিত্র প্রসঙ্গে

চিত্রনাট্যকার প্রযোজক উমেশ মল্লিক রবার্ট ক্লাইভের ভারত-শাসন-অধ্যায়কে কেন্দ্র করে একটি চিত্র-নির্মাণের যে পরিকল্পনা করেছিলেন, তার সঙ্গে নিজের যোগ ছিন্ন করেছেন। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ছবির নাম হওয়ার কথা ছিল 'টাইগার অ্যান্ড ট্রাম্পেটস্'।

শ্রী মল্লিক ছবির জন্য যে চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন, জানা গেল, পরিচালক টেরেন্স ইয়ং সেই রচনার কিছু পরিবর্তন করেছেন। শ্রী মল্লিক প্রস্তাবিত পরিবর্তনের নানা স্থলে একমত হতে পারেননি। তাঁর মতে, নূতন চিত্রনাট্যটি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সর্বত্র সহানুভূতিশীল নয়। এই কারণে শ্রী মল্লিক ওই ছবির প্রযোজকের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখছেন না। চিত্রনাট্যের স্বত্ব ত্যাগের জন্য তিনি ৫০ হাজার টাকা নিতে সম্মত হয়েছেন বলে জানা গেল। এ ছাড়া ক্ষতিপূরণেরও কথাবার্তা চলছে। একটি মার্কিন কোম্পানি নাকি এই স্বত্ব ক্রয় করছেন।

জার্মান চিত্রের প্রদর্শনী

পশ্চিম জার্মেনীর কলিকাতাস্থিত কনস্যুলেটের ডঃ শ্যুমানের বাসভবনে গত সপ্তাহে (২৫শে জুন) নির্বাক চিত্র "দি ক্যাবিনেট অব ডঃ ক্যালিগরি" এবং দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রের এক বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকরা আমন্ত্রিত হন।

পশ্চিম জার্মেনীর রাষ্ট্রপতি ডাঃ লুবকের ভারত পরিদর্শনের প্রামাণিক চিত্রটি সাংবাদিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। এই স্বল্পদৈর্ঘ্যের রঙিন চিত্রে ভারতের সংস্কৃতি ও বর্তমান অর্থনৈতিক সংগ্রামের পরিচয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। তথ্যপূর্ণ এই ছবির দৃশ্যগঠন ও কলাকৌশলের কাজ চমৎকার। স্বল্প-দৈর্ঘ্যের অপর চিত্রটি একটি পরীক্ষামূলক প্রয়াস। 'জাজ' সংগীতের সুরমূর্ছনার সঙ্গে বর্তমান যন্ত্রযুগের বৃহৎ কর্মকাণ্ডের ঐকতান গড়ে তোলা যায় কিনা তা নিয়েই এক "এক্সপেরিমেন্ট" করা হয়েছে এই রঙিন ছবিতে। বড় বড় কল-কারখানায় নানা ধরনের যন্ত্রচালনার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে আবহসুর হিসাবে "জাজ" সংগীত এই ছবিতে পরিবেশিত। ছবিটি দেখে মনে হয়েছে, যন্ত্রের সঙ্গে জাজ-এর কোথায় যেন একটি মিল রয়েছে। যন্ত্রের গতিছন্দ ফুটিয়ে তুলতে যেন জাজ এর জুড়ি নেই। ছবিটি উপস্থিত সাংবাদিক-দের মুগ্ধ করেছে।

ইণ্ডিয়ান ব্যালে থিয়েটার

বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের প্রাক্তন সতীর্থ এবং ছাত্র-ছাত্রীরা "ইণ্ডিয়ান ব্যালে থিয়েটার" নামে একটি সংস্থা গঠন করেছেন। নৃত্যকলার উৎকর্ষসাধন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করাই এই সংস্থার লক্ষ্য। শিবশংকর, কমলেশ মৈত্র প্রমুখ শিল্পীরা এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন।

গত ২৬শে জুন রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে ইণ্ডিয়ান ব্যালে থিয়েটার শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্যের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। উদয়শংকর ঘরানার শিল্পীদের এই নৃত্যানুষ্ঠান রসিকজনকে প্রভূত আনন্দ দেয়।

বি-এফ-জে-এ'এর বার্ষিক নির্বাচন

গত ২০ জুন বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন-এর সভ্যদের এক সাধারণ সভায় সংস্থার বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্য পরিচালনা করেন শ্রীমতী প্রীতিদেবী মুখোপাধ্যায়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন। কর্মকর্তা-রূপে আর যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা হলেন : শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ ও শ্রীনির্মলকুমার ঘোষ (সহ-সভাপতি); শ্রীবাগীশ্বর ঝা ও শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত (যুগ্ম সম্পাদক); শ্রীশিশিরেন্দ্র সিংহ (কোষাধ্যক্ষ)। কার্যকরী সমিতিতে রয়েছেন : শ্রীজ্যোতির্ময় বসুরায়, শ্রী বি সি আগরওয়াল, শ্রীমহেন্দ্র সরকার, শ্রীরণবীর সাহিত্যালংকার, শ্রী এ এন কুমার, শ্রীমথুরাপ্রসাদ যোশী, শ্রীমতী প্রীতিদেবী মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্র মল্লিক, শ্রীঅশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীরঞ্জিত দত্ত, শ্রীনন্দলাল দত্ত, শ্রী সি এল শাহ, শ্রীওয়ারিসুল হক, শ্রীসমীর ঘোষ, শ্রীরোমজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরবি বসু।

নেহরু স্মরণে সঙ্গীতাঞ্জলি

নেহরুজীর মহাপ্রয়াণে গ্রামোফোন কোম্পানী কয়েকটি রেকর্ডের মাধ্যমে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। বাংলা রেকর্ডটিতে (এন ৮৩০৭২) "নেহরু অমর রহে" ও "সেই দিশারী জওহরলাল" গান দুখানি রচনা করেছেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, গেয়েছেন সুরকার শ্যামল মিত্র এবং সহ শিল্পিবৃন্দ।

কোম্পানীর আর-একখানি রেকর্ড (এন ৮৭০৪১) "জওহর-প্রশস্তি" (অসমীয়া ভাষায় নেহরুজীর স্মৃতি-তর্পণ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। গান রচনা ও পরিবেশন করেছেন ভূপেন হাজারিকা।

এ ছাড়া দুখানি হিন্দুস্থানী রেকর্ডও এই উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। "এক জওহরলাল"-এ (এন ৮৮৪০১) শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ভারত-বিখ্যাত শিল্পী

চিত্রমন্দিরের 'সন্ধ্যাদীপের শিখা' সুচিত্রা সেন ও দিলীপ মুখোপাধ্যায় (পরিচালনা : হরিদাস ভট্টাচার্য) ছবিতে সুচিত্রা সেন ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

আহম্মদ রফী। অপরটি বিখ্যাত কাওয়াল ইউসুফ আজাদ কাওয়ালের (এন ৮৮৪০২) "হায় জওহরলাল" ও "জওহরলাল হামসে জুদা নেহি লকুয়া"।

শ্রীহাফেসজী সংবর্ধিত

মেট্রো সিনেমার কর্মাধ্যক্ষরূপে শ্রী আই এ হাফেসজীর কর্মজীবনের বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এই উপলক্ষে গত ২০ জুন মেট্রোর কর্মীরা শ্রীহাফেসজীকে এক প্রীতিসম্মেলনে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। কর্মীরা তাঁকে মাল্যভূষিত করেন ও একটি অঙ্গুরীয় উপহার দেন। সভায় শ্রীহাফেসজীর কর্মদক্ষতা ও জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা দেন শ্রী পি গুপ্ত, শ্রী বি মজুমদার এবং বেঙ্গল মোশান পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জনৈক বক্তা শ্রীহাফেসজীর দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

সংবর্ধনার উত্তরে শ্রীহাফেসজী আবেগ-জড়িত কণ্ঠে বলেন, এই দিনটির কথা তিনি কখনও ভুলবেন না, এবং প্রীতি-উপহার-স্বরূপ এই অঙ্গুরীয় জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি ধারণ করবেন। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি ও কর্মীদের মঙ্গল-সাধনই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। সমস্ত শক্তি তিনি এই লক্ষ্যসাধনেই নিয়োজিত করবেন।

জাওয়ার মুভীজ-এর 'ছোটিসি মুলাকাত' (পরিচালনা: আলো সরকার) ছবিতে বৈজয়ন্তীমালা ও উত্তমকুমার

বোম্বাই সমাচার

প্রযোজক-পরিচালক খাজা আহাম্মদ আব্বাসের পরবর্তী ছবির নাম আসমান মহল। ইন্দ্ররাজ আনন্দের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী হবে। বক্তব্যধর্মী এই ছবিতে আধুনিক সামন্তযুগ ও গণতন্ত্রের সংঘর্ষকে তুলে ধরা হবে। পৃথ্বীরাজ কাপুর ছবির একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন। তা ছাড়া অন্য দুটি চরিত্রে "মেহের ঔর সপ্‌না"-খ্যাত দিলীপরাজ ও সুরেখা অভিনয় করবেন। সংগীত পরিচালনা করবেন জে পি কৌশিক।

গুলশান ফিল্ম-এর [illegible] আকবর ছবিতে সম্রাট আকবরের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন পৃথ্বীরাজ কাপুর। নামভূমিকায় শিল্পী হলেন প্রেমনাথ। নিশি ছবির অন্যতম শিল্পী। ছবিটি পরিচালনা করবেন হারবানস্।

মিত্র প্রোডাকশন্স-এর জি চাহ্‌তা হায় ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। বি মিত্র প্রযোজিত ও পরিচালিত এই ছবির প্রধান ভূমিকায় জয় মুখার্জি, রাজশ্রী ও শ্যামা অভিনয় করেছেন। কল্যাণজী-আনন্দজী ছবির সংগীত-পরিচালক।

দিলীপ বসুর পরিচালনায় সম্প্রতি চাঁদ কি দিওয়ার ছবির তিন দিনব্যাপী ইনডোর শুটিং সমাপ্ত হয়। ভারতভূষণ ও নূতন ছবির নায়ক-নায়িকা। ইন্দ্রাণী মুখার্জি, সুবীর ও নাজ ছবির তিনটি প্রধান চরিত্রের শিল্পী। এন দত্ত সুরকার।

পরিচালক বাবুভাই মিস্ত্রী সম্প্রতি মহাভারত ছবির কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য গ্রহণ করেন। 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরা' ছিল তার মধ্যে অন্যতম। পদ্মিনী, প্রদীপকুমার, দারা সিং, মনোহর দেশাই প্রভৃতি শুটিং-এ অংশ নেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন চিত্রগুপ্ত।

অশ্বপৃষ্ঠে জয় মুখার্জি ও সায়রাবানুকে নিয়ে সম্প্রতি দূর কি আওয়াজ ছবির একটি গানের দৃশ্য গৃহীত হয়। দেবেন্দ্র গোয়েল ছবিটি পরিচালনা করছেন। রবি সংগীত পরিচালক।

রাজ কাপুরের সঙ্গম সেন্সরের সর্বজনীন ছাড়পত্র পেয়েছে বলে জানা গেল। দিল্লিতে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স বেনাভোলেন্ট ফাণ্ড-এর সাহায্যার্থে ছবির এক বিশেষ প্রদর্শনী অনতিবিলম্বে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ কাপুর, বৈজয়ন্তীমালা ও রাজেন্দ্রকুমার ছবির তিন প্রধান শিল্পী। শঙ্কর-জয়কিষণ সংগীত পরিচালক।

ফুটবলের আইনকানুন

মুকুল

ফুটবলের আইনকানুনের সংক্ষিপ্তসারে এবার থ্রো-ইনের ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ কখন থ্রো-ইনে ত্রুটি হয়। আগে সূত্রগুলি লেখা যাক।

কখন থ্রো-ইনে ত্রুটি হয়

(১) অংশত মাঠের দিকে মুখ না করে দাঁড়ালে;

(২) দুই হাতে সমান জোর দিয়ে বল না ছুঁড়লে;

(৩) দুই হাতে ছুঁড়েও আলতোভাবে বল ফেলে দিলে;

(৪) মাথার উপর দিয়ে বল না ছুঁড়লে;

(৫) বল ছোঁড়ার জন্য হাত চালনা করার সময় হাতের অবিচ্ছেদ গতি না থাকলে;

(৬) মাঠের মধ্যে ঢুকে এসে বল ছুঁড়লে;

(৭) বল ছোঁড়ার সময় দুই পায়ের পাতার কিছু না কিছু অংশ টাচ-লাইনের সঙ্গে বা টাচ-লাইনের বাইরে জমির সঙ্গে লেগে না থাকলে।

[সমস্ত ১৫ নম্বর আইনের অন্তর্ভুক্ত]

উপরের এই সূত্রগুলি আরও পরিষ্কার করতে হলে বলতে হয়: বল থ্রো করবার সময় যদি অংশত মাঠের দিকে মুখ করে না দাঁড়ান, যদি দুই হাতে সমান জোর না দিয়ে এবং বল ছোঁড়ার সময় হাতের অবিচ্ছেদ গতি না রেখে বল ছোঁড়েন, যদি সোজা সোজাই বল না ছুঁড়ে আলতোভাবে বল ফেলে দেন, কিংবা মাথার উপর দিয়ে বল না ছোঁড়েন, যদি টাচ-লাইন ছেড়ে মাঠের মধ্যে ঢুকে এসে বল ছোঁড়েন, কিংবা দুই পায়ের পাতার কিছু না কিছু অংশ টাচ-লাইনের সঙ্গে লাগিয়ে না রেখে বা টাচ-লাইনের বাইরের জমির সঙ্গে লাগিয়ে না রেখে বল ছোঁড়েন তবে থ্রো-ইনে ত্রুটি হবে।

শেষের সূত্রটির আরও পরিষ্কার অর্থ, বল ছোঁড়ার সময় অবশ্যই দুখানি পায়ের পাতার কিছু না কিছু অংশ মাটির সঙ্গে লাগিয়ে রাখতে হবে। মাটি থেকে কোন পা শূন্যে উঠে গেলে ত্রুটি হবে।

এখন কথা হচ্ছে, টাচ-লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে বল থ্রো করা যায় আবার টাচ-লাইনের বাইরে থেকেও থ্রো করা যায়; কিন্তু টাচ-লাইনের কত দূরে দাঁড়িয়ে বল থ্রো করা যায়, আইনে তার উল্লেখ নেই। আইনের সাহায্যকারী বইতে বলা হয়েছে—টাচ-লাইনের এক গজ দূর থেকে বল থ্রো করা উচিত। অবশ্যই যাঁরা দূর থেকে থ্রো করতে চান তাঁদের জনাই এই উপদেশ। টাচ-লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে থ্রো করতেও কোন অসুবিধা নেই।

থ্রো-ইনের ত্রুটি ফুটবল খেলার আইনের 'নিরামিষ' অপরাধ। শাস্তি প্রতিপক্ষের থ্রো-ইন। কিন্তু থ্রো-ইনের ত্রুটিতে নিজেদের অসুবিধা অনেকখানি। ধরুন, যদি প্রতিপক্ষের সীমায় কর্নার-পতাকার কাছে থ্রো-ইন পাওয়া যায়, তার থেকে গোলের সুযোগও এসে যেতে পারে। কারণ, থ্রো-ইনের সময় অফ-সাইডের বালাই নেই। আবার নিজেদের সীমায় কর্নার-পতাকার কাছে নিজেদের থ্রো-ইনে ত্রুটি হলে প্রতিপক্ষ পাল্টা থ্রো-ইনে গোলের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। যাঁদের বাহুতে শক্তি আছে তাঁদের অনেকেই কর্নার-পতাকার কাছ থেকে বল থ্রো করে একেবারে গোলের মুখে ফেলে দিতে পারেন। সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারত ও ইরানের প্রাক-অলিম্পিক ফুটবল খেলা দেখার যাঁরা সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, ইরানের ৬ নম্বর খেলোয়াড় কর্নার-পতাকার কাছ থেকে বল থ্রো করে কিভাবে প্রতিপক্ষের গোলের মুখে বল ফেলেছেন। সুতরাং থ্রো-ইনের ত্রুটি নিরামিষ অপরাধ হলেও যাতে ত্রুটি না হয়, সব খেলোয়াড়ের সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

বলা বাহুল্য, আইনের অজ্ঞতার কারণেই থ্রো-ইনে ত্রুটি হয়ে থাকে। ত্রুটিতে লাভ কিছুই নেই, লোকসান অনেকখানি।

[চিঠি-পত্র]

শ্রীপঙ্কজ রায়, মেদিনীপুর:

প্রশ্ন—দুই দলের খেলার সময় একদল বিশেষ উত্তেজিত হয়ে খেলতে আরম্ভ করল এবং পর পর মারাত্মকভাবে ফাউল করার অপরাধে সেই দলের ৫ জন খেলোয়াড় রেফারী কর্তৃক মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এক দলে সাতজনের কম খেলোয়াড় হলে খেলা হওয়া সম্ভব নয়। ফুটবল আইনের এই বিধান। যে দলের ৫ জন খেলোয়াড় মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন তাঁদের বাকি ছয়জনে খেলা চালাবেন কিভাবে? এ ক্ষেত্রে রেফারীর কর্তব্য কি? এই অবস্থায় কোন পক্ষ যদি গোল করে অগ্রগামী থাকে তা হলেই বা খেলা বন্ধ হলে খেলার ফলাফল কি হবে?

উত্তর—কোন দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকলে খেলা হওয়া সম্ভব নয়—এটা ঠিক আইনের বিধান নয়, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের উপদেশ। আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ মনে করেন, কোন দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকলে সে খেলা প্রথম শ্রেণীর খেলা বলে গণ্য হওয়া উচিত নয়। অবশ্য আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের উপদেশকে প্রকারান্তরে আইনেরই বিধান বলে ধরা যেতে পারে। তবু এ সম্পর্কে অ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আছে।

যাই হোক, খেলাটিকে কোনভাবে প্রহসনে পরিণত না করাই আইনের উদ্দেশ্য এবং রেফারীর কর্তব্য। মারাত্মক ধরনের অপরাধের জন্য যে দলের এক একজন করে ৫ জন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেবার প্রয়োজন হয়, স্পষ্টই বুঝতে হবে, সে দল খেলার মধ্যে ন্যায়নীতির পথ ত্যাগ করে উচ্ছৃঙ্খলতামূলক আচরণের পথ বেছে নিয়েছে। ২ জন ৩ জন বা ৪ জন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেবার পর রেফারীর উচিত দলের অধিনায়ককে অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া। খেলার মধ্যে প্রহসনমূলক আচরণ বা পাইকারী উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করা হবে না,—এই বলে রেফারী দলটিকে সতর্ক করে দিতে পারেন। তার পরেও উচ্ছৃঙ্খলতার পুনরাবৃত্তি ঘটলে খেলা প্রহসনে পরিণত হচ্ছে—এই বিবেচনায় রেফারী খেলাও বন্ধ করে দিতে পারেন।

খেলার ফলাফল কি হবে, বা অপরাধী দল সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সে সম্পর্কে রেফারীর কোন কিছু করণীয় বা দায়িত্ব নেই। রেফারী শুধু ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে, খেলা বন্ধ থাকার সময়ে খেলার ফলাফল জানিয়ে এবং কি জন্য খেলা বন্ধ করেছেন তার কারণ উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে রিপোর্ট করবেন। পরে কর্তব্য অ্যাসোসিয়েশনের। অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের সাংগঠনিক নিয়ম-কানুন অনুযায়ী খেলার ফলাফল বহাল রেখে অপরাধী পক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, অপরাধী দলকে স্ক্র্যাচ করে দিতে পারেন, আবার শুধু সতর্ক করে ছেড়ে দিতে পারেন।

শ্রীরামচন্দ্র দাস, কাকদ্বীপ, ২৪ পরগনা।

উত্তর—পেনাল্টি-কিক গোল-পোস্টে বা ক্রস-বারে কিংবা রেফারীর গায়ে লেগে কিকারের কাছে ফিরে এলে কিকার যদি আবার শট করে গোল করেন তবে গোল হয় না—আর কোন খেলোয়াড়ের স্পর্শের আগে নিজেই দ্বিতীয়বার বল খেলার অপরাধে কিকারের বিরুদ্ধে ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নির্দেশ দিতে হয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২২শে জুন—অদ্য হইতে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে নয়া ব্যবস্থা অনুসারে সরকারী মজুত হইতে ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত বাংলা সিদ্ধ চাল ও গম বিক্রয় শুরু হয়। বৃহত্তর কলিকাতার ১৯০৫টি দোকানে এই সরবরাহ ব্যবস্থা হইয়াছে।

পাঞ্জাবের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব আজ চণ্ডীগড়ে জানান যে, প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোহনলালকে গতকাল মধ্যরাত্রির পূর্বেই তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিতে বলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন।

২৩শে জুন—মার্কিন সরকার অদ্য ভারত সরকারকে দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার বা এগার কোটি নব্বই লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৬৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১২ বৎসরে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। ইহার জন্য বার্ষিক শতকরা ৫ টাকা ৫০ পয়সা হারে সুদ দিতে হইবে।

উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনা ঘটায় মানা অঞ্চলের উদ্বাস্তু শিবিরগুলির প্রশাসন এবং নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৪শে জুন—দেশব্যাপী ক্রমবর্ধমান মূল্যাহার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা এবং কেমন করিয়া উহার মোকাবিলা করা যায়, তাহা ঠিক করার জন্য আজ নয়াদিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

গত এক মাসে বহু লক্ষ টাকার সোনা ভারত হইতে খিড়কি পথে পাকিস্তানে পাচার হইয়াছে। সেইজন্য সম্প্রতি ভারত সরকার পাকিস্তানে সোনা লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারি করিয়াছেন।

২৫শে জুন—১৯৬৫ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীরা চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষার যে কোন ভাষায় পরীক্ষা দিতে পারিবে। বর্তমানে তাহারা কেবল বাংলা, হিন্দী, উর্দু ও নেপালী ভাষায় পরীক্ষার উত্তরপত্র লিখিতে পারে।

আজ অপরাহ্ণে হৃষীকেশ হইতে ১৬ মাইল দূরে গুলারে যোশীমঠগামী একটি বাস উল্টাইয়া খাদে পড়িয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় ২৮ জন যাত্রী নিহত হইয়াছে। অপর ৮ ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হয়।

২৬শে জুন—কলিকাতার অধিকাংশ ন্যায্য-মূল্যের দোকান, বিশেষ করিয়া পুরাতন দোকানগুলি কালোবাজারে পরিণত হইয়াছে। ন্যায্যমূল্যের দোকান ও মুদিদোকান একই সংগে থাকায় এই কালোবাজারীর পথ আরও প্রশস্ত হইয়াছে।

আজ নয়াদিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধিরোধে স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

২৭শে জুন—ব্রহ্মপুত্র ও উহার শাখা নদী-গুলির বানের জলে উত্তর কামরূপ, জোড়হাট, ডিব্রুগড় ও গোলাঘাট মহকুমার অন্তত ১৬৪টি গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। ইহার ফলে বহুলোক বিপন্ন হইয়াছে এবং পাট ও ধানের ক্ষতি হইয়াছে।

খনি ও ইস্পাত দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এন সঞ্জীব রেড্ডি ২৮শে জুন কটকের নিকট মহানদী ও বিরূপা সেতুর উদ্বোধন করিবেন। এই সেতুটি ৭০৯২ ফিট দীর্ঘ। ভারতবর্ষে ইহা অপেক্ষা দীর্ঘ সেতু আর নাই।

২৮শে জুন—আজ পাঞ্জাব বিধানমণ্ডলীর কংগ্রেসী দলের এক সভায় দলের নূতন নেতা নির্বাচনের দায়িত্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর উপর ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

আজ এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ভারত সরকার পিলানীর বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ও সায়েন্স এবং বোম্বাইয়ের টাটা ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল সায়েন্স—এই দুটিকেই দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

২২শে জুন—চীন পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্য দিয়া পশ্চিমবঙ্গের চীন-প্রেমী কম্যুনিস্টদের জন্য প্রচুর টাকা পাঠাইতেছে। রাজ্য সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর এই অর্থ আমদানীর কিছু প্রমাণও পাইয়াছেন।

সোভিয়েট মুখ্য সহকারী প্রধানমন্ত্রী আজ জাকার্তায় পৌঁছিয়া ইন্দোনেশীয় নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি সোভিয়েট পার্লা-মেণ্টারী প্রতিনিধি দলের নেতা হিসাবে এখানে আসিয়াছেন এবং ১১ দিন এখানে অবস্থান করিবেন।

২৩শে জুন—আজ জাপানের সর্বাপেক্ষা উত্তরের দ্বীপ হোক্কাইডুতে প্রচণ্ড ভূ-কম্পন অনুভূত হয়। প্রাথমিক সংবাদে প্রকাশ, কয়েকটি ঘরবাড়ি ধসিয়া পড়িয়াছে এবং কয়েক স্থানে মাটিতে ফাটল ধরিয়াছে। রেলপথের ক্ষতি হওয়ায় রেল চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজেড এ ভুট্টো গত রাত্রিতে আমেরিকাকে পরোক্ষভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, আমেরিকা "ভারতকে দীর্ঘমেয়াদী ও বিপুল সামরিক সাহায্যের" প্রতিশ্রুতি দিবার যে সিদ্ধান্ত সম্প্রতি গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ফলে পাকিস্তান আমেরিকার উদ্যোগে গঠিত সিয়াটো ও সেণ্টোর মত সামরিক চুক্তিসংস্থা ত্যাগের কথা বিবেচনা করিবে।

২৪শে জুন—সাইপ্রাস সমস্যার সমাধানের জন্য প্রেসিডেণ্ট জনসন যে চেষ্টা করিতেছেন সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য গ্রীক প্রধানমন্ত্রী জর্জ পাপানদ্রু আজ হোয়াইট হাউসে আসিয়াছেন।

গতকাল সেনেটর ওয়েন মোর্স (ওরেগন, ডেমোক্র্যাট) ওয়াশিংটনে বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় যুদ্ধবিগ্রহের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে।

২৫শে জুন—দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী নুয়েন খান জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলরের সায়গনে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে মন্তব্যকালে বলেন, দ্রুতগতিতে পট-পরিবর্তন হইতেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তি ও উত্তর ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার আর বিলম্ব নাই।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী আনাস্তাস মিকোয়ান আজ ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেণ্টে ভাষণ দানকালে বলেন, বৃটেন তাহার সামরিক ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নূতন ধরনের উপনিবেশ সৃষ্টি করিতেছে।

২৬শে জুন—ঢাকার ডেপুটি কমিশনার গতকল্য রাত্রিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকার ছয়টি থানার অন্তর্গত শিল্পাঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারী করিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রমিক দলের বিরোধের ফলে পাছে শান্তিভঙ্গ হয়, এই আশংকাতেই উক্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হইয়াছে।

পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ এই প্রদেশের সর্বত্র আগামী ১২ই জুলাই "দমননীতিবিরোধী দিবস" পালনের সংকল্প ঘোষণা করিয়াছে। এই দলের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান শান্তিপূর্ণভাবে এই দিবস পালন করিতে এই প্রদেশের ইউনিটগুলিকে নির্দেশ দিয়াছেন।

২৭শে জুন—পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী আগামী ১৪ই জুলাই লণ্ডনে এক আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

কঙ্গোলী ন্যাশনাল রেডিওর সংবাদে প্রকাশ, উত্তর কাতাংগা প্রদেশের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জেসন সেণ্ডওয়ে আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। বিস্তারিত সংবাদ জানা যায় নাই।

২৮শে জুন—আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থার স্থায়ী সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে মিশরের প্রতি-নিধি সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। চীনা প্রতিনিধি তাঁহাকে কুৎসিতভাবে আক্রমণ করিলে প্রতিবাদে তিনি সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। ফলে সভা মাঝপথেই শেষ হয়।

পি টি আই-র সংবাদে বলা হইয়াছে যে, প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অসুস্থতার সংবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীলালবাহাদুর কিরূপ লোক এবং লণ্ডন বৈঠকে তিনি কিরূপ করেন তাহা জানিবার জন্য পশ্চিমী জগৎ অপেক্ষায় আছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা — ৪০ পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, টাকা, ষাণ্মাসিক—১০, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, টাকা, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক — ৫ টাকা ৫০ পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা - ১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০ ও ২৩—৮০৪১ স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

* সূচীপত্র *

আদরের ধন হারিয়ে গেল
EVEREADY
সবসময়ে নির্ভরযোগ্য
এভারেডী
টর্চ • ব্যাটারী
বাল্‌ব • ম্যান্টল
UNION CARBIDE
WTUC 1412

* সূচীপত্র *

বর্ষার জন্যে তৈরী থাকতে দরকার
অ্যাঙ্গিয়ার্স ইমালশন

অ্যাঙ্গিয়ার্স — নিরাময় অপেক্ষা প্রতিষেধক শ্রেয়!

সোল ডিস্ট্রিবিউটার্স : হারবার্টসন লিমিটেড, ব্রিস্টল হাউস, ৫, ডালহৌসি স্ট্রীট, কলিকাতা-১.

* সূচীপত্র *

প্রচ্ছদ : শ্রীপঙ্কজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ইউনিট ট্রাষ্ট

(১৯৬৩ সালের, ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট অনুযায়ী স্থাপিত)

১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই থেকে এই ইউনিটগুলি বিক্রী করা সুরু হবে

প্রত্যেকটি ইউনিটের প্রকৃত মূল্য ১০ টাকা, এগুলি ১০এর গুণিতকে পাওয়া যাবে এবং প্রথমতঃ ১০ টাকা মূল্যে ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই থেকে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত এগুলি বিক্রী করা হবে।

এই ইউনিটে লগ্নী করলে আপনি কতকগুলি প্রধান সুবিধে পাবেন:

* সুনিশ্চিত আয়
* নিরাপদ মূলধন
* লগ্নীর টাকা প্রয়োজন অনুযায়ী তোলা যায়
* কর যথেষ্ট রেহাই

নিম্নলিখিত ব্যাঙ্কগুলির সমস্ত শাখা অফিসে এই ইউনিটগুলি পাওয়া যাবে:

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, স্টেট ব্যাঙ্ক অব হায়দরাবাদ, স্টেট ব্যাঙ্ক অব মহীশূর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানের এবং জয়পুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্দোর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ত্রিবাঙ্কুর, স্টেট ব্যাঙ্ক অব সৌরাষ্ট্র, স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাতিয়ালা, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, [illegible]

আমেদাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, হায়দরাবাদ, কানপুর ও মাদ্রাজের স্টক এক্সচেঞ্জগুলির স্টকব্রোকার সদস্যদের কাছেও এগুলি পাওয়া যাবে।

ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট

পোঃ বঃ ২000, বোম্বাই-১

টাকা লগ্নী করার একটি নতুন উপায়

DESH 40 Paise
Saturday, 11th July, 1964

৩১ বর্ষ ॥ ৩৬ সংখ্যা ॥ ৪০ পয়সা
শনিবার, ২৭ আষাঢ়, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

বিদেশে ভারতীয় বিজ্ঞান-কর্মী

আজকের জগতে মানুষের প্রধান অবলম্বন বিজ্ঞান। সভ্যতার ইতিহাসে যথেষ্ট বিলম্বে প্রবেশ করলেও বিজ্ঞান মনুষ্য-সমাজকে এত দূর প্রভাবিত করতে পেরেছে যে, আমাদের অস্তিত্ব এখন বহুলাংশে এর ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও সমাজ সম্পর্কিত একটি নিবন্ধে আইনস্টাইন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে বিজ্ঞান আমাদের এমন সব সহায়তা দেয় যার ফলে অস্তিত্বের ধারাই সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিগোচর প্রভাব দেখা যাবে, আমাদের জীবন যেখানে সমৃদ্ধ হচ্ছে তার উপকরণগুলির দিকে তাকালে, বিজ্ঞান এদের নির্মিতি সম্ভব করেছে। জীবনের সামাজিক প্রয়োজনের দিকটা সংকটে যেমন বিজ্ঞান মিটিয়ে দিতে পারছে, তেমনি জ্ঞানের দিকেও তার দান নিরন্তর বেড়ে চলেছে। প্রথমটায় সমাজ ও মনুষ্যজীবন প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত বলে আমরা তার কথাই সচরাচর বিবেচনা করি, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের কথা ভাবি না, কেননা বুঝি না। না বুঝলেও জানি, এর মূল্য কোনো অংশে কম নয়। সম্প্রতি যে ভারতীয় যুবকটির বিশ্বজোড়া বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কথা আমাদের দৃষ্টিগোচর হল, তাঁর সম্পর্কে বলতে গেলেও বলতে হবে, ডঃ নার্লিকরের বৈজ্ঞানিক ও আঙ্কিক সাধনা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের, আমাদের পক্ষে তা বোধগম্য নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, তাঁর কীর্তি মহৎ। আইনস্টাইন এই ধরনের জটিল ও উচ্চ বিজ্ঞান গবেষণা সম্পর্কে বলেছেন, এই কাজগুলি অতীব মহান ও গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর দ্বারা আমরা মানুষের চিন্তা-প্রণালীর ওপর বিশ্বাস রাখতে ও ভরসা করতে শিখেছি।

আপাতত আমরা বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকাটির কথা বিবেচনা করব। বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকা প্রধানত সুখী ও সচ্ছল সমাজ গঠনের চেষ্টা। প্রকৃতির সঙ্গে কষ্টসাধ্য সংগ্রামকে সহজ করা, তার ভাণ্ডার থেকে এ-যাবৎ অনর্জিত উপাদানগুলি অর্জন করা ও মানবহিতে নবলব্ধ অভিজ্ঞতা ব্যয় করাই মোটামুটি এখানে বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া, য়ুরোপের নানা দেশ ও জাপান যে উন্নত সমাজ স্থাপন করতে পেরেছে তার কারণ বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকাটিকে তারা কাজে লাগিয়েছে। বৈষয়িক ক্ষেত্রে ও সমাজগত উন্নতির ক্ষেত্রে তারা যতদূর এগিয়েছে আমরা তার বহু পিছনে পড়ে আছি। যদি ভারতকে স্বাবলম্বী, সুখী, সচ্ছল দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হয় তবে আজ বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর গতি নেই। সুখের বিষয়, দেশ স্বাধীন হবার পর বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের উৎসাহ বেড়েছে, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের চর্চাও বেড়েছে। ভারত সরকার গত সতেরো বছরে অনেকগুলি গবেষণা কেন্দ্রও স্থাপন করেছেন এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে সেগুলি চলছে। কিন্তু ভারতের মতন বৃহৎ একটি রাষ্ট্রে (এবং অনুন্নত দেশে) যে ভাবে ও যে অনুপাতে সর্বাঙ্গীণ বিজ্ঞান গবেষণার ও চর্চার প্রয়োজন তার সামান্যমাত্র আপাতত পালন হচ্ছে। আমাদের দ্বিতীয় অভাব, অভিজ্ঞ বিজ্ঞান-গবেষক ও সক্ষম বিজ্ঞান-কর্মীর। সম্প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি এদিকেও পড়েছে।

সম্প্রতি কলকাতায় আশুতোষ জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিদেশে—য়ুরোপ ও আমেরিকায় অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানের সাধক রয়েছেন, তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন, অবশ্য তাঁদের এখানে আনার মতন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির হিসাব মতন, য়ুরোপ ও আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয় বিজ্ঞান-কর্মীর সংখ্যা সাড়ে চার হাজারেরও বেশী। আমাদের ধারণা, অন্যান্য দেশে কর্মে নিযুক্ত বিজ্ঞান-গবেষকদের হিসাব ধরলে এই সংখ্যা আরও সামান্য কিছু বাড়তে পারে। মোটামুটি সংখ্যা হয়ত পাঁচ হাজার হবে। এখন আমাদের ভাবতে হবে এই চার পাঁচ হাজার বিজ্ঞান কর্মীকে আমরা কি ভাবে স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে পারি।

রাষ্ট্রপতির উপদেশ, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করলে সম্ভবত এঁদের আনা যাবে। কথাটি কিছুমাত্র বাহুল্য নয়। উপযুক্ত পরিবেশ বলতে প্রথমত বুঝতে হবে এঁদের যোগ্য কর্মকেন্দ্র ও কর্ম; দ্বিতীয়ত বুঝতে হবে তাঁদের জীবনযাত্রার উপযোগী মান বজায় রাখার ব্যবস্থা। প্রথমটির গুরুত্বই বেশী, কেননা—ভারত সরকার এবং কোনো কোনো বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সাহায্যে যদিও এদেশে বিজ্ঞান-গবেষণার ও প্রযুক্তি-বিদ্যার কাজ কিছু কিছু চলছে—তবু তার অনুপাত এত কম যে বিদেশ থেকে ভারতীয় বিজ্ঞান-কর্মীদের এখানে এনে তাঁদের যোগ্য কাজ দেওয়া শক্ত। যদি বা কিছু কর্মীকে কাজ দেওয়া গেল—তাঁদের কাজের জন্যে, গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেওয়া গেল না। এক্ষেত্রে তাঁদের আসা নিরর্থক হবে।

কাজেই, পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রাথমিক শর্ত হল—ভারত সরকার এবং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন দায়িত্ব নিতে হবে যাতে ভারতে বিবিধ বিজ্ঞান-কর্মশালা গড়ে তোলা যায়। এই বিজ্ঞান কর্মকেন্দ্রগুলিকে আবার আধুনিক সাজসরঞ্জামে, যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ হতে হবে।

এখানে জীবনযাত্রার মান অনেক নীচুতে। বিদেশ থেকে যে-সব ভারতীয়দের আনানো হবে তাঁদের অভ্যস্ত মান বজায় রাখার মতন বেতন দেওয়া এখনও সম্ভব হবে না—এই ধরনের একটি কথা শুনি। স্বীকার করি, য়ুরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের জীবনযাত্রার মান অনেক উঁচুতে, কিন্তু এ-কথা কেন ভেবে দেখি না—সেখানের সাধারণ মানের তুলনায় প্রবাসী ভারতীয় বিজ্ঞান-কর্মীরা যে জীবনমান বজায় রেখেছেন তা কি এমন ভয়ংকর বেশী! সেদিক থেকে, আমাদের মতন দরিদ্র দেশের সাধারণ জীবনযাত্রার মানের তুলনায় তাঁরা যা পাবেন তা এমন কি তুচ্ছ! তা ছাড়া, এঁদের মনে এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করা উচিত যাতে স্বদেশের স্বার্থ ও শ্রীবৃদ্ধি-চিন্তা তাঁরা অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করেন এবং কিছুটা স্বার্থত্যাগে রাজী থাকেন। এ-ধারণা বোধ করি ঠিক নয় যে, একমাত্র অর্থই আলোচ্য বিজ্ঞান-কর্মীদের বিদেশে আটকে রেখেছে, বরং কাজের সুবিধা ও সুযোগ পেলে বহু কর্মীই ভারতে এসে কাজ করতে পারেন।

অতুল্যদা—
যা দেখে গিয়েছিলাম......
['দেশ'-এর কার্টুনিস্টের বিদেশ-ভ্রমণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন]
যা দেখছি।

বৈদেশিকী

একশো আটাশি বছর আগে বৃটিশ মার্কিনী ঔপনিবেশিকরা বৃটেনের অধীনতা পাশ ছিন্ন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। 'মার্কিন স্বাধীনতা-যুদ্ধের' নেতারা যুক্তরাষ্ট্রের যে সংবিধান তৈরি করেন, তাতে ঘোষণা করা হয় যে, যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা বিশ্বাস করেন যে, সকল মানুষই সমান হয়ে জন্মায়। এবং সকলেরই সুখান্বেষণের সমান অধিকার আছে। আক্ষরিক অর্থে এই উক্তির প্রথম অংশটা সত্য নয়। সকল মানুষ সমান হয়ে জন্মায় না, সকলের শারীরিক এবং মানসিক শক্তি একরকমের বা সমান হয় না। ব্যক্তি-গতভাবে মানুষে মানুষে পার্থক্য এতো প্রত্যক্ষ যে, তা নিয়ে তর্ক করাও নিরর্থক মনে হয়। অথচ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধী এই কথাটার শক্তি এবং মহত্ত্বের কাছে যারা মাথা নোয়াতে পারে, মানব-সভ্যতায় তারাই তত বেশী অগ্রসর বলে আমরা মনে করতে পারি।

সকল মানুষ যে সমান হয়ে জন্মায় না, সেটা প্রকৃতির ঘটনা। মানুষকে এই প্রকৃতির ঘটনাকে অনেকাংশে আমাদের হাতে অর্থাৎ হাতে পার্থক্য নিয়ে জন্মালেও সাধারণ জীবনযাত্রা পার্থক্যের অত্যাচারের দ্বারা চিহ্নিত না হয় অর্থাৎ মানবজীবনযাত্রার বৃহদাংশের ব্যবস্থা এরকম হলে, সকল মানুষ সমান হয়ে জন্মালে যেরকম হত।

বলা বাহুল্য, এটা কেবল হৃদয়াবেগের দ্বারা সাধ্য নয়। আহার্য বস্তুর পরিমাণ যদি এরূপ হয় যে, সেটা সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়, তা হলে যার গায়ের জোর বেশী আছে, সে কেড়ে খাবার চেষ্টা করবে। সেই জন্যে বাহ্য অবস্থার সংস্কারও আবশ্যক। কেড়ে খাবার চেষ্টাকে সংযত করার জন্যে মানুষের হৃদয়ে স্বাভাবিক-ভাবে কতকগুলি কোমল বৃত্তি নিহিত আছে, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থার উপর সেগুলি অনেক ক্ষেত্রেই জয়ী হতে পারে না। কোমল মনোবৃত্তির আচরণও একটা মিশ্র ব্যাপার। মা সন্তানের মায়ায় যেমন নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে, তেমনি সন্তানের মায়ায় অপরের প্রতি নিষ্ঠুর হতেও পারে। ব্যক্তি-গত ছেড়ে এবং শ্রেণীগত এবং শ্রেণীগত ছেড়ে জাতিগত ভালোবাসাও এইরকম নিষ্ঠুরতায় পর্যবসিত হতে পারে।

সমতার আদর্শের আকর্ষণ মানুষে যখন অনুভব করে তখন সব সময়ে যে তার বোধের গণ্ডী খুব বৃহৎ, তা নাও হতে পারে, অনেক সময়েই তা হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতারা যখন "সকল মানুষের" কথা বলেছিলেন তখন তাঁদের মনে ইউরোপীয় বংশোদ্ভূতদের কথাই মনে ছিল, আমেরিকার আদিম বাসিন্দা রেড ইন্ডিয়ানরা অথবা নিগ্রোরাও যে "সকল মানুষের" অন্তর্ভুক্ত সেরূপ চেতনা তাঁদের ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তার পরিধি অনেক বেড়েছে। প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা ছিল তার চেয়ে এখন অনেক বড়ো। লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল নতুন জমি দখল করে রাষ্ট্রের অন্তর্গত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানের আদিম বাসিন্দাদের উচ্ছেদ-সাধন চলেছে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, এই বাস্তবের সঙ্গে সংবিধানে ঘোষিত উপর্যুক্ত মহৎ বাক্যের কোনো সামঞ্জস্য নেই। যদি রেড ইন্ডিয়ানদের "সকল মানুষের" অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয় তাহলে সংবিধান লঙ্ঘন করেই আমেরিকার "বৃদ্ধি" হয়েছে দেখা যায়।

নিগ্রোদের সম্পর্কেও তাই বলা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন স্থাপিত হয় কেবল তখন নয়, তার পরেও এক শো বছর পর্যন্ত দাসত্ব প্রথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণী স্টেটগুলিতে "আইনসম্মত" ছিল। গত শতাব্দীর ষষ্ঠম দশকে "গৃহযুদ্ধের" পর দাসত্ব প্রথা আইনত লোপ করা হয়। যে দেশের সংবিধানে "সকল মানুষ সমান" এই বিশ্বাস ঘোষিত হল একশো বছর ধরে, সেই দেশের মধ্যে লক্ষ লক্ষ দাসের অস্তিত্ব আইনসংগত হয়ে থাকল। তারপর দাসত্ব প্রথা আইনত যখন থেকে উঠে গেল তখনও সাদা কালোর যে পার্থক্য থাকল এবং এখনো যে-রকম আছে সেটা মার্কিন সংবিধানকে নিয়ত মুখ ভেংচে আসছে।

নিগ্রোদের সমান নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখার লজ্জা শ্বেতকায় মার্কিন সমাজের একাংশ অনেকদিন থেকেই অনুভব করে এসেছেন। নিগ্রোরা স্বেচ্ছায় আমেরিকায় যায় নি, পশুর মতো ধরে আফ্রিকা থেকে তাদের আমেরিকায় চালান দেওয়া হত। দাস নিগ্রোদের পরিশ্রমের উপর আমেরিকার শ্বেতকায়দের, বিশেষ, কৃষিপ্রধান অঞ্চলের সমৃদ্ধির পত্তন হয়। বহুদিন পর্যন্ত, যে সব অঞ্চলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে "দাস প্রথা" মালিকদের পক্ষে লাভজনক ছিল, বহুদিন পর্যন্ত সেই সেই অঞ্চল থেকে তার উচ্ছেদসাধন সম্ভব হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের সংখ্যা সমগ্র লোক-সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ। এই দুই কোটি লোকের সমস্যা আমেরিকায় বা অস্ট্রেলিয়ায় আদিম বাসিন্দাদের সমস্যার মতো সমাধান করা সম্ভব নয়—বিশেষত বর্তমান যুগে। এরা নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকতে রাজী নয়।

মার্কিন শ্বেতকায় সমাজের হৃদয়বান অংশ এই কলঙ্ক থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চায়। পৃথিবীতে আমেরিকার কেবল-

সম্মান নয়, আমেরিকার সম্পর্কও এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। পৃথিবীর অশ্বেত জাতিগুলির চক্ষে আমেরিকার নিগ্রোদের অবস্থা মার্কিন রাষ্ট্রের একটা বড়ো কলঙ্ক মাত্র নয়, নিগ্রোদের অপমান পৃথিবীর সকল অশ্বেতদের গায়ে লাগে।

আমেরিকার পক্ষে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা এখন আরো মুশকিল এই কারণে যে, কিছুকাল পূর্বে পর্যন্ত যেমন পৃথিবীর অশ্বেত জাতিগুলির মতামত ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না, এখন আর সে অবস্থা নেই। বিশেষত, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং তৎসংলগ্ন কিছু অঞ্চল ছাড়া আফ্রিকা—যে আফ্রিকা নিগ্রোদের আদি বাসভূমি—সেই আফ্রিকা আজ স্বাধীন। আজ মার্কিনী নিগ্রোদের উদ্ধার কেবলমাত্র মার্কিনী শ্বেতকায় সমাজের করুণার উপর নির্ভর করছে না।

মার্কিনী নিগ্রোদের আন্দোলন গত কয়েক বছর যাবৎ ক্রমশ শক্তিশালী এবং উগ্র হয়ে উঠছে। মার্কিনী শ্বেতকায় সমাজের উদারভাবাপন্ন অংশের শুভ বুদ্ধি এবং ন্যায়বোধের সমর্থনও সেই আন্দোলনের সহায়ক হয়েছে। নিগ্রোদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার ভোগের পক্ষে বর্ণবৈষম্যমূলক সর্বপ্রকার বাধা যাতে দূর হয় সেই চেষ্টায় পরলোকগত প্রেসিডেন্ট কেনেডি একটি বিস্তৃত বিল এনেছিলেন, অনেক ধস্তাধস্তির পরে প্রেসিডেন্ট জনসন সেটিকে আইনে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু আইনে লিখিত হলেই যে সেটা অনায়াসে কার্যে পরিণত হবে তা নয়। এই আইনকে বাস্তব সামাজিক সত্যে পরিণত করার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। কতকগুলি স্টেটে বিরোধিতা নানারকম সংঘর্ষ সৃষ্টি করবে। কিছু কিছু সংঘর্ষের সংবাদ ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। আশা করা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল গবর্নমেন্ট অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধিতার সামনে অটল থাকবেন এবং বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্যে নূতন আইনে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে-সব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ থেকে বিরত হবেন না। এ ব্যাপারে আমেরিকার কী হয় তার উপর জগতের অন্যত্র বর্ণবৈষম্যমূলক যে-সব দ্বন্দ্ব ক্রমশ ভীতিজনক রূপ নিচ্ছে সেগুলির ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে।

*

শ্রীলালবাহাদুর ডাক্তারদের পরামর্শ শুনে লণ্ডন যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করেছেন। তিনি যে ডাক্তারদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেননি তাতে দেশবাসী স্বস্তিবোধ করবে। প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের কনফারেন্সে ভারত সরকারের প্রতিনিধিত্ব করবেন। এঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলার নেই তবে এবিষয়ে আরো "ফরম্যাল" হলেই বোধ হয় ভালো হত। ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রীর পরেই যাঁর স্থান তাঁর যাওয়াটাই বেশি শোভন হত। শ্রীনন্দকে নাকি বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি নিজেই নাকি শ্রীকৃষ্ণমাচারী ও শ্রীমতী ইন্দিরাকে পাঠানোর প্রস্তাব সমর্থন করেন। এটা কোনো ভদ্রতা অভদ্রতার ব্যাপার নয়। এসব ক্ষেত্রে যেটা "ফরম্যাল" উচিত সেটা করাই ভালো। তা নাহলে অনাবশ্যক নানারকম জল্পনা-কল্পনার সুযোগ দেওয়া হয়।

৬।৭।৬৪

সাংখ্য দর্শন

["শুধু সংখ্যার হিসাবে নির্ভর করিলে চলিবে না, আমাদের বাস্তবভাবে অবস্থা জানিতে হইবে"—কোনো মহাজনের স্বীকারোক্তি। এ থেকে আমার মনে একটি গভীর আবেগ আবির্ভূত হল। কিছুকাল আগে প্যারীতে থাকবার সময় ওখানকার 'বিব্লিয়তাক্ ন্যাসনাল' থেকে একটি প্রাচীন বাংলা রচনা আবিষ্কার করেছিলুম—সেটি কোন্ যুগের এবং কার লেখা তা এখনো নির্ধারণ করতে পারিনি। ইচ্ছে আছে, অদূর ভবিষ্যতে সেটির সাহায্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বাংলার ডি ফিল যোগাড় করে নেব, কিন্তু প্রশ্নের অকুলতায় এখানে তার কিছু অংশ উদ্ধৃত না করে থাকতে পারছি না।—সুনন্দ]

তখন হস্তিনাপতি কহিলেন, হে মহামাত্য শুনিতেছি লাট-প্রদেশে বিপুলসংখ্যক প্রান্তরচারী মূষিকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং তাহারা ক্ষেত্রস্থ শালিধান্য, নীবার ধান্য, গোধূম, সর্ষপ প্রভৃতি শস্যাদির অশেষ ক্ষতি করিতেছে। তাহাতে দুর্ভিক্ষ ও রাজস্বহানি ঘটিতে পারে। অতএব সত্বর মূষিক-নিপাতের উপায় নির্ধারণ করুন।

তচ্ছ্রবণে মহামাত্য বদ্ধাঞ্জলিপুটে নিবেদিলেন, হে মহীপতে! দণ্ডনীতির প্রবক্তাগণ কহিয়াছেন, রণযাত্রার পূর্বেই শত্রুর সংখ্যা, তাহাদের বলাবল, তাহাদের দুর্গের দৃঢ়তা প্রভৃতি নির্ধারণ করা কর্তব্য, নতুবা পশ্চাত্তাপ ঘটিতে পারে। অতএব হে স্বামিন্! অগ্রে তথ্যাবলী সম্যগ্‌রূপে আহরণ করা প্রয়োজন।

সৌম্য, উত্তম কহিয়াছ, তাহাই হউক।

অতঃপর মহামাত্য মহাবলাধিকৃতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ধীমন্! লাট-প্রদেশে মূষিকের আকস্মিক উপদ্রব ঘটিয়াছে। তুমি বিবরণাদি সংগ্রহ করিয়া [illegible] হইবে। তুমি উক্ত প্রদেশের মহাকরণকে আদেশ দাও মূষিকের সংখ্যা, তাহাদের পুত্রপৌত্রাদি, তাহাদের দন্তবল, [illegible] এবং বহুবিধ বিবরসমূহের পূর্ণ বিবরণ রাজসমীপে প্রেরণ করিতে কহ।

উত্তম কহিয়াছেন, তাহাই হইবে—এই প্রকার উক্তি করিয়া মহাকরণিক মহা-

[illegible] কহিলেন, হে ভদ্র, লাট-প্রদেশে—[illegible] সংক্ষেপ করে [illegible] মহাকরণিকের [illegible] সত্যাধ্যক্ষকে কহিলেন, অবশ্যই [illegible] প্রকাশ হয়। এ-সবের যে কিছু বিবরণ আছে, তা অনেকটা এরই পুনরুক্তি বলা যায়।

অনন্তর বহু প্রান্তর, নিবিড় অরণ্যানী, অভ্রংলিহ পর্বতমালা এবং অগণ্য কল্লোলিনী-

নটিনীতটিনীবিধৌত জনপদ অতিক্রম করিয়া দূত বাজীযোগে লাট-প্রদেশে উপনীত হইলেক এবং মহাশাসকের হস্তে লেখন প্রদান পূর্বক দণ্ডায়মান রহিলেক। মহাশাসক দূতের যথোচিত পরিচর্যা করতঃ কহিলেন, ত্বরায় প্রধান করণিককে আহ্বান করহ।

প্রধান করণিক উপস্থিত হইলে তাহার হস্তে লিপিপ্রদান পূর্বক মহাশাসক কহিলেন, তিলার্ধ কালব্যাজ না করিয়া ভুক্তিনায়কগণকে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করহ যে, তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলস্থ প্রান্তরীয় মূষিকগণের সংখ্যা, তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদি-সমেত সমর্থ যোদ্ধৃবৃন্দ, তাহাদের দন্তবল, নখবল, পুচ্ছবল—না, পুচ্ছবলের প্রয়োজন নাই, তাহাদের বিবরাদির ছিদ্রসমূহ—ইত্যাকার সম্পূর্ণ বিবরণ যেন আমাকে অচিরে পরিজ্ঞাত করা হয়।

প্রভু, তাহাই করিব—ইহা বলিয়া প্রধান করণিক প্রধান লেখনিককে সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, হে সুধী! ভুক্তিনায়কগণকে এই মর্মে পত্র প্রেরণ করহ যে তাহাদের স্ব-স্ব অঞ্চলস্থ প্রান্তরীয় মূষিক সংখ্যা, তাহাদের দন্তবল, নখবল (ইত্যাদি ইত্যাদি)—

ভুক্তিনায়কগণ তৎকালে স্ব-স্ব অধিকারে বিচারাদি, ভাষণাদি, উদ্বোধনাদি, বৃক্ষরোপণাদি ও ভ্রমণাদি প্রমুখ বিবিধ গুরু কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। পত্র লাভে কেহই প্রসন্ন হইতে পারিলেন না। প্রত্যেকেই নিজ অধিকরণিককে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন, হে বিজ্ঞ! অবিলম্বে উপভুক্তিনায়কগণকে লিপি প্রেরণ করহ যে, তাহারা অগৌণে তত্রত্য ভূমিস্থ যাবতীয় ক্ষেত্র-মূষার দন্তবল, নখবল (ইত্যাদি ইত্যাদি)—

মহদাশয়, এই প্রকারই হইবে।

উপভুক্তিনায়কগণ উক্ত পত্রলাভে সাতিশয় বিড়ম্বিত বোধ করিলেন। তাঁহারাও ভুক্তিনায়কগণের অনুরূপ কর্মধারা অনুসরণ করিতেছিলেন। পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ করণিককে কহিলেন, অহে করণিক! যাবতীয় চৌরোদ্ধরণিককে এই মর্মে আদেশ দেহ যে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া তাহারা স্ব-স্ব অধিকারভুক্ত ক্ষেত্র-মূষিকগণের সংখ্যা, দন্তবল, নখবল (ইত্যাদি ইত্যাদি)—

চৌরোদ্ধরণিকগণ এবম্প্রকার লিপিপ্রাপ্তিতে মহতী ক্রোধের দ্বারা তাড়িত হইলেন। তাঁহারা পরস্পর আলাপন করিলেন: আমরা চৌর, গ্রন্থিচ্ছেদককে (১) ও সন্ধিহারকের (২) সন্ধান করিব, না প্রান্তরে মূষিকের পশ্চাদ্ধাবন করিব? এই নিমিত্তই কি বহুল আয়াসের দ্বারা রাজকর্ম সংগ্রহ করিয়াছি? এইরূপ আদেশ অতীব অন্যায়, ইহাতে আমাদের পদের অবমাননা হইল।

তাঁহারা অবিলম্বে নীলবেশধারী গ্রাম্য প্রহরিগণকে আহ্বান করিলেন। আহূত প্রহরিচয় বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় বেপমান হইয়া যুক্ত করে তাঁহাদের অগ্রে দণ্ডায়মান রহিলেন।

চৌরোদ্ধরণিকগণ স্বভাবসিদ্ধ গর্জনস্বরে কহিলেন, অরে ভৃত্য! ত্রিদিবস মধ্যে নিজ নিজ পল্লীপ্রান্তরস্থ সমুদয় মূষিকের সংখ্যা, তাহাদের দন্তবল, নখবল (ইত্যাদি, ইত্যাদি) পরিজ্ঞাত করিবি। —রক্তচক্ষে আরো কহিলেন, নতুবা মুণ্ড ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড করিব!

গর্জন ও তর্জনীতাড়িত প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ মহাভয়ে প্রান্তরমধ্যে মূষাসন্ধানে ধাবিত হইল। কিন্তু—আহা! মূষিকেরা হস্তিনাপতি বা মহাশাসকের সম্বাদ রাখে না, চৌরোদ্ধরণিকদের গর্জনও তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তাহারা প্রহরিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সংখ্যানির্ণয়ের বা বিবরণ করিয়া বিবরপরিদর্শনের, কোনো সুযোগই প্রদান করিল না। প্রহরিকুল ব্যাকুলিত হইয়া প্রান্তরে প্রান্তরে মূষিক অন্বেষণ করিতে লাগিল, রৌদ্রে গলদ্ঘর্ম হইল, বৃষ্টিতে সিক্ত, কর্দমে লিপ্ত ও কণ্টকে বিক্ষত হইল, তাহার পর ভাগ্যক্রমে চকিত-চপলার চমকের ন্যায় কেহ একটি, কেহ দুইটি মূষা সন্দর্শন করিল, কেহ-বা একটিও দেখিতে পাইল না। অগত্যা অবশিষ্ট দুই দিবস বৃক্ষমূলে নিদ্রা দিয়া তাহারা কালহরণ করিল।

চতুর্থ দিবসে চৌরোদ্ধরণিকগণ সমীপে বার্তা নিবেদিত হইল।

অতঃপর চৌরোদ্ধরণিক হইতে উপভুক্তিনায়ক, তৎপর ভুক্তিনায়ক, তৎপর মহাশাসক, তৎপর মহামাত্য, পরিশেষে রাজসমীপে বৃত্তান্ত পৌঁছিল। পর্যালোচনায় দেখা গেল: সমগ্র লাট-প্রদেশে সর্বসমেত দ্বাবিংশতি মাত্র মূষিক ক্ষেত্রমধ্যে বিচরণ করে। তাহাদের একটি বৃদ্ধ, একটি খঞ্জ, অপরটি ছিন্নপুচ্ছ। সিদ্ধান্ত হইল: মাত্র এই কয়েকটি প্রাণীনিধনের জন্য সৈন্যসজ্জা সম্পূর্ণই অনাবশ্যক, লগুড়ধারী একজন চণ্ডালই যথেষ্ট।

পুনশ্চ দিয়া বলা হইল: কিন্তু ইহাদের বিনাশ করা কর্তব্য নহে, তাহাতে জীবসংরক্ষণ নীতি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

হস্তিনাধীশ নিশ্চিন্ত হইলেন।

ইহার পর কয়েক মাস অতিক্রান্ত না হইতেই লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্র-মূষিকের আক্রমণে লাট-প্রদেশে এক-কণা শস্যও আর অবশিষ্ট রহিল না।

[টীকা: (১) গাঁটকাটা; (২) সিঁধেল চোর।]

অন্যান্য বীজাণু

ওরা বলে তুমি নেই।   এবং আমিও।

কেননা তেত্রিশ কোটি কোম্পানিতে আবৃত জগৎ আজ,
সব রাস্তা ঋজু, সব এঞ্জিন করুণাময়।
দন্তশূলে কষ্ট নেই, নাভিশ্বাসে কষ্ট নেই,
কইমাছের মতো আর প্রসূতিরা কাৎরে ওঠে না।

জননীর সম্মোহনে জন্ম নিয়ে, অশ্রুহীন অক্সিজেনে ঢ'লে পড়ে,
মাঝখানে ব্যাঙ্ক, বীমা কোলে নিয়ে দোল দেয় সমীচীন,
মনোবৈদ্য হৃদয়ের ঝুল ঝাড়ে,
অতীতেরে হত্যা ক'রে বেঁচে থাকে প্রফুল্ল মানুষ।

চেয়ে দেখি সুখ, স্বাস্থ্য, উজ্জ্বলতা; কানে শুনি বৈকুণ্ঠ মাভৈঃ—
কেউ আর শীর্ণ হাত বাড়াবে না,
                                        দাঁড়াবে না ছায়ামূর্তি চৌরাস্তায়,
ধুঁকে-ধুঁকে হবে না হতাশ, পাংশু;
দ্বন্দ্ব দ্বিধা দূষিত মনের মল—
                              দু-আনার আত্মারাম বটিকায় নিষ্কাশিত হবে।

দিকে-দিকে পরিচ্ছন্ন সমতল ব্যাপ্ত হয়,
                                        উগ্র পশু লম্বা চেনে বাঁধা পড়ে,
সূচ্যগ্র ফাটল নেই অম্লান দেয়ালে,
গোপন টিকটিকি-চক্ষু কোন গর্তে লুকোবে এবার?

শুধু যদি মাসিক কিস্তিতে ওরা আনন্দ জোগান দিতে পারে!
সিগারেট ছেড়ে দিয়ে সত্যি যদি অমরতা লাভ করা যায়!

যদি মর্ত্যে কালকীট আমাদের নিশ্বাসের বাতাস না-হ'তো!

আরশোলা নির্বংশ হ'লে মহান কল্যাণ।
কিন্তু তারা জানে—
জলকেলি শেষ হ'লে, তুবড়ি পোড়ানো শেষ হ'লে,
অন্ধকারে নির্ঘুম তাকিয়ে থাকে যারা,
অন্ধকারে নির্ঘুম তাকিয়ে থাকে,
একা শুয়ে অন্ধকারে,
প্রেমিক বা প্রেমিকার পাশে শুয়ে
পরস্পর-নিশ্বাসের শব্দ শুনে-শুনে
নিশ্চল তাকিয়ে থাকে অন্ধকারে, একা—
পরস্পরে অঙ্গে-অঙ্গে যুক্ত, তবু উত্তাপরহিত,
নিশ্চল তাকিয়ে থাকে, একা—
রোম, ব্রহ্ম, কাভিয়ার, কাইরোতে উদর-নৃত্য—এই সব সাঙ্গ হ'লে পর
অকস্মাৎ নিজেদের দেখা পেয়ে কেঁপে ওঠে যারা—
তারা জানে, অন্যান্য বীজাণু আছে ধ্বংসহীন,
রক্তে লীন, মাংসে বদ্ধমূল,
অন্যান্য বেদনা আছে ধ্বংসহীন,
হয়তো বা আকাঙ্ক্ষাও আছে।

হয়তো সে-আকাঙ্ক্ষাই তুমি।

জাতীয় অর্থ বিনিয়োগ কর্পোরেশন

—পরিকল্পনা দপ্তর—

হেড অফিস : বিনিয়োগ বিল্ডিংস

গ্রেড্ইয়ার্ড রিক্লামেশন

বম্বে—১।

রেফা : আই এন ভি টি ডিভ/ক্যাল/ওয়াই টি এ/১২০

ম্যানেজার,

আঞ্চলিক অফিস,

কলিকাতা।

প্রিয় মহাশয়,

বিঃ তুলারাম জুট মিলস্ লিঃ, কলিকাতা (বর্তমান নাম, তুলারাম সিনথেটিক্স্ লিঃ) শেয়ার প্রতি টাঃ ০·৫০ নঃ পঃ হারে ১০০ (একশত) অর্ডিনারী শেয়ারের (নম্বর ১২৩৪৫৬—৫৫৫) উপর ৩১-১২-১৯৫৫ বর্ষশেষের ডিভিডেন্ড—টাঃ ৫০·০০ (পঞ্চাশ টাকা)।

আমরা উপরোক্ত তুলারাম জুট মিলসের একশত অর্ডিনারি শেয়ারের মালিক। উক্ত শেয়ার ১৯৫৫ সালের ১৩ই নবেম্বর তারিখে ব্রোকারস্ জয়গোপাল জয়সোয়াল অ্যান্ড সন্সের মাধ্যমে ডিভিডেন্ডসহ খরিদ করা হয়। ১৯৫৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১২ই মার্চ পর্যন্ত উক্ত কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই বন্ধ থাকে। আমরা উক্ত শেয়ারগুলি আমাদের নামে বদলির রেজেস্ট্রী করিবার জন্য কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই বন্ধ হইবার আগেই পাঠাই; কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সেগুলি পৌঁছাইতে একদিন দেরি হইয়া যায়। তাই, ১৩ই মার্চ তারিখে উক্ত কোম্পানি যে ডিভিডেন্ড ঘোষণা করে তাহা আইনানুযায়ী আমাদের প্রাপ্য হইলেও প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তাহা দেওয়া হয় সেই শেয়ারহোল্ডারকে যাঁহার নামে উপরোক্ত শেয়ারগুলি কোম্পানির বইতে ছিল।

আমরা উপরোক্ত ব্রোকারকে এ-বিষয়ে পুনঃপুনঃ লিখিয়া কোনো জবাব পাই নাই। অতঃপর উক্ত কোম্পানিতে চিঠি লিখিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি যে উক্ত ডিভিডেন্ড তাঁহারা তদানীন্তন শেয়ার-হোল্ডার, শ্রীমতী ভদ্রাবতী কেজরিবাল,... নং অশোক রোড, কলিকাতা-২৭-কে পাঠাইয়াছেন। শ্রীমতী কেজরিবালকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়া তার প্রাপ্তি সংবাদও পাওয়া যায় নাই, জবাব তো দূরের কথা। আপনাকে তাই অনুরোধ করা যাইতেছে যে আপনি অবিলম্বে কোনো দায়িত্বশীল প্রবীণ অফিসারকে এই ব্যাপারের ভার দিবেন যিনি উপরোক্ত শ্রীমতী ভদ্রাবতী কেজরিবালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত ডিভিডেন্ড পঞ্চাশ টাকা—সম্পর্কিত ইনকম-ট্যাক্স ডিডাকশন সার্টিফিকেটসহ আদায় করিবেন।

ব্যাপারটি দীর্ঘদিনের পুরানো এবং সম্প্রতি সংসদে আমাদের এই ধরনের অনাদায়ী প্রাপ্য টাকা লইয়া প্রশ্নোত্তর হইয়াছে। তাই, আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে এই বিষয়টিকে আপনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিবেন।

পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করুন।

আপনার বশংবদ,

ওয়াই আদিশেষাইয়া

অ্যাকটিং ম্যানেজিং ডিরেক্টর

নোট টু দি ম্যানেজার

বিঃ তুলারাম জুট মিলস্ লিঃ (বর্তমান নাম, তুলারাম সিনথেটিক্স্ লিঃ), কলিকাতা—১০০ অর্ডিনারি শেয়ারের উপর ৩১-১২-১৯৫৫ বর্ষশেষের ডিভিডেন্ড।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি বিগত তিনদিন যাবৎ হেড অফিসের ১৩ই নবেম্বরের চিঠি অনুযায়ী (ইহার সহিত সংযোজিত) উপরোক্ত ডিভিডেন্ড আদায়ের চেষ্টা করিয়াছি। প্রথমেই আমি শ্রীমতী ভদ্রাবতী কেজরিবালের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার আলিপুরের বাসভবনে যাই। সেখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এবং অনেক চেষ্টা করিয়া শ্রীমতী কেজরিবালের দেখা পাই। শ্রীমতী কেজরিবাল প্রথমে আমাকে দেখিয়া চটিয়া যান, পরে অবশ্য ঠাণ্ডা পানি দিয়া আপ্যায়ন করিতে চান। ডিভিডেন্ডের কথায় তিনি আমাকে তাঁহাদের গদিতে যাইতে বলেন—তিনি নিজে উহার কিছুই জানেন না। গদি ক্লাইব রোডে।

গদিতে কেহই আমাকে পাত্তা দেয় না, তবে, আমিও নাছোড়বান্দা। অবশেষে এক ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন, আপনারা চিঠি লিখুন। আমি বলিলাম, অনেক চিঠি লেখা হইয়াছে এবং তাহাতে কাজ হয় নাই বলিয়াই আমি নিজে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন তাঁহারা চিঠি পান নাই। তাছাড়া, আমরা সরাসরি লিখিলে কিছুই হইবে না—আমাদের ব্রোকারদের মাধ্যমে আসিতে হইবে। অনেক কথা বলিয়াও সুবিধা হইল না। অতঃপর আমি ফিরিয়া আসি।

গতকাল আমি ব্রোকারস্ জয়গোপাল জয়সোয়াল এণ্ড সন্স্-এর অফিসে গিয়া দেখি উহা তালাবন্ধ। আশপাশের অফিসের লোকেরা বলিল উহা আজ চার-পাঁচ বছর বন্ধ আছে। ঐ ফার্মের দুই পার্টনারের মধ্যে একজন মরিয়া গিয়াছে, অপরজন জেলে। ইহা শুনিয়া আমি পুনরায় কেজরিবালদের গদিতে গেলাম। উঁহাদের সমুদয় বিষয়টি বিস্তারিত বলিয়া বলিলাম সামান্য পঞ্চাশ টাকার জন্য আমাদের মতো এতোবড়ো সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা উঁহাদের ঠকাইবে না। ইহার উত্তরে তাঁহারা এমন একটি মন্তব্য করিলেন যাহা দুর্বোধ্য! যাহা হউক, অবশেষে আমি তাঁহাদের এইটুকু

সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছি যে, আমরা যদি তুলারাম জুট মিলসের অফিস হইতে চিঠি আনিতে পারি যে, ঐ ডিভিডেণ্ড তাঁহারা শ্রীমতী ভদ্রাবতী কেজরিবালকে দিয়াছেন তাহা হইলে উঁহারা হয়তো ডিভিডেণ্ড ফেরত দিতে আপত্তি করিবেন না।

সেইজন্য আমি বলিতেছি যে, হেড অফিস যে-চিঠিখানি তুলারাম জুট মিলস্ হইতে পাইয়াছে উহা আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিক যাহা দেখাইয়া আমরা হয়তো কৃতকার্য হইতে পারিব।

প্রমোদ সান্যাল,
ইনচার্জ, ইনভেস্টমেণ্টস্ (স্টক এক্সচেঞ্জ)
২২-১১-১৯৬১

দেখিলাম এবং ম্যানেজারকে দেখাইলাম।
এই রিপোর্টের কপি হেড অফিসে পাঠাইয়া দিন।

এম্ ডি খাটাউ
অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ২৩-১১-৬১

নোট টু দি ম্যানেজার

বিঃ তুলারাম জুট মিলস্ লিঃ—
ডিভিডেণ্ড ফেরৎ

অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি পুনরায় কেজরিবাল ব্রাদার্সের গদিতে দেখা করি। হেড অফিস কোম্পানির মূলে চিঠি না পাঠানোয় (তাঁহারা কপি পাঠাইয়াছিলেন) কাজ হয় না। তাছাড়া, ঐ চিঠিতে শুধু এই কথা লেখা আছে যে ডিভিডেণ্ড শ্রীমতী কেজরিবালকে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু, উহা

—"কম্প্যানির সেক্রেটারী"

যে আমাদের প্রাপ্য তাহা কে বলিবে? তাই উঁহারা কোম্পানি হইতে এমন চিঠি চান যাহাতে বলা হইবে যে উক্ত শেয়ারগুলি শ্রীমতী কেজরিবালের নাম হইতে আমাদের নামে ট্রান্সফার হইয়াছে এবং আইনানুযায়ী ঐ ডিভিডেণ্ড আমাদের প্রাপ্য। আমরা তখন এখান হইতে তুলারাম জুট মিলে একখানা চিঠি লিখি এবং তাহা লইয়া আমি নিজে ঐ কোম্পানির সেক্রেটারি, শেয়ার অ্যাণ্ড কোম্পানি ল'র সহিত দেখা করি। তাঁহাকে ব্যাপারটি বুঝাইয়া বলিলে তিনি ঐরূপ চিঠি দিতে রাজী হন, যদিও এই ধরনের চিঠি তাঁহারা সাধারণত কাহাকেও দেন না। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, ঐ সেক্রেটারি ভদ্রলোক নিম্নস্বাক্ষরকারীর এক বন্ধুর আত্মীয়।

গতকাল তুলারাম জুট মিলের চিঠি লইয়া আমি পুনরায় কেজরিবালের অফিসে যাই। চিঠি অবশ্য তাঁহাদের মনোমত হয়, কিন্তু আমরা যে ডিভিডেণ্ড-সহ (কাম ডিভিডেণ্ড) ঐ শেয়ারগুলি কিনিয়াছি তাহার প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ—ব্রোকারের কনট্রাক্ট—তাহা আমাদের হেড অফিসে নিশ্চয়ই আছে। আমি কিন্তু সে কথা না বলিয়া (কারণ তাহা হইলে আরো কতো দেরি হইবে, কে জানে!) উঁহাদের বেশ কিছু কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিই। ইহা সত্ত্বেও, অথবা, সম্ভবত ইহারই জন্য, উঁহাদের সুর নামিয়া যায় এবং উঁহারা আমাকে বসাইয়া রাখিয়া পুরানো রেকর্ড খুঁজিতে থাকেন। পুরানো রেকর্ড পাঁচ মিনিটেই খুঁজিয়া বাহির করা হয় এবং তাহাতে দেখা যায় যে ঐ একশত শেয়ারের ডিভিডেণ্ড উঁহারা শ্রীটার্বি আরাটুন নামক এক ভদ্রলোককে ইনকাম-ট্যাক্স ডিডাকশন সার্টিফিকেট-সহ পাঠাইয়া দিয়াছেন, কারণ, ঐ ভদ্রলোক তাঁহার ব্যাংকারের মাধ্যমে দাবি করেন যে, ঐ শেয়ারের ঐ সময়ের মালিক তিনিই।
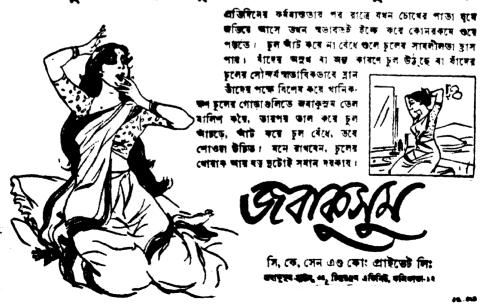
"ইউ গো টু হেল—"

শ্রীটার্নি আরাটুনের ঠিকানা—কেয়ার অব ব্রিটিশ মার্কেন্টাইল ব্যাংক....নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১।

শ্রীটার্নি আরাটুনকে পত্র দেওয়া হইতেছে।

প্রদোষ সান্যাল,
২২-১১-৬১

এই নোটের কপি ও শ্রীটার্নি আরাটুনকে যে পত্র দেওয়া হইবে তাহার কপি হেড অফিসে পাঠাইয়া দেওয়া হউক।

এম্‌ ডি খাটাউ
২২-১১-৬১

হ্যাঁ
এ সি নিয়োগী
৫-১-৬২

নোট টু দি ম্যানেজার

বিঃ তুলারাম জুট মিলস্‌ লিঃ—ডিভিডেণ্ড পেমেন্ট

দীর্ঘ নয় মাস পর আমি গত সপ্তাহে শ্রীটার্নি আরাটুনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হই। শ্রী আরাটুন প্রায় এক বৎসরকাল নিউজীল্যাণ্ডে ছিলেন। তিনি এখন ... নং রসেল স্ট্রীটে বাস করিতেছেন। তাঁহার অফিস পার্ক স্ট্রীটে। আমার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, ইহা এতো দীর্ঘদিনের ব্যাপার যে, তাঁহার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। তিনি আরও বলিলেন যে কোটি কোটি টাকা লইয়া আমাদের কারবার আর এই সামান্য টাকার দাবি আমরা ছাড়িতে পারিতেছি না? আমি বলিলাম, এ টাকা যে জনসাধারণের। কথাটি ভালো করিয়া বুঝাইবার পর তিনি বলিলেন তিনি দুই একদিনের মধ্যেই জবাব দিবেন।

সাতদিন অপেক্ষা করিবার পর আমি আজ আবার শ্রী আরাটুনের সহিত সাক্ষাৎ করি। একগাদা লোকের সম্মুখে তিনি আমার প্রতি প্রথমে উপেক্ষা, পরে তাচ্ছিল্য এবং সর্বশেষে অপমান প্রদর্শন করিলেন। আমার কোনো কথায় তিনি কান করিলেন না এবং আমি যখন তাঁহাকে লিখিত জবাবের কথা বলিলাম তখন তিনি বলিলেন তাঁহার সময় নাই।

এই লোকটির সহিত দেখা করিয়া আর কোনো ফল হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। চিঠি লিখিয়া যে কোনো কাজ হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রদোষ সান্যাল
১০-১০-৬২

মিঃ খাটাউ নিজে একবার সময় করিয়া এই আরাটুনের সহিত দেখা করিতে পারেন।

এ সি নিয়োগী
১৫-১০-৬২

চলুন, দেখে আসি আপনার আর্মেনিয়ান সাহেবকে। বললেন মিঃ খাটাউ। চলুন, স্যর, বললো প্রদোষ।

টার্নি আরাটুনকে তাঁর অফিসে পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল তাঁর কার্পেটের দোকানে। সেটাও পার্ক স্ট্রীটে। ওদের দেখেই জ্বলে উঠল আরাটুন। "আমি ডিভিডেণ্ড ফেরত দেবো না, তোমাদের যা খুশি করতে পারো। সামান্য পঞ্চাশ টাকার জন্যে কালক্ষেপণ। আমার শান্তিভঙ্গ করছ তোমরা। সবকিছুর একটা সীমা আছে। আমরা কাজের লোক।"

মিঃ খাটাউ ঠিক সমানভাবে চটে উঠলেন: "ডিভিডেণ্ড না পেলে আমরা কোর্টে যাবো।"

"ইউ গো টু হেল।" বললো আরাটুন। খাটাউ সাহেব হন হন করে বেরিয়ে গেলেন দোকান থেকে।

"ব্যাপারটা খুব ভালো হল না, মিঃ আরটুন," প্রদোষ বলল, "আমাদের মতো ফরিনফেবল পার্টির সঙ্গে মামলা করে আপনি পারবেন?"

"সে চিন্তা আমার"—বললো আরটুন।

অফিসে ফিরেই খাটাউ সায়েব প্রদোষকে বললেন আনুপূর্বিক সব জানিয়ে নোট দিতে না ডিপার্টমেন্টে।

"কিন্তু হেড অফিসের সম্মতি ছাড়া লিগ্যাল অ্যাকশান নেয়া ঠিক হবে কি?" আস্তে আস্তে বলল প্রদোষ।

"ওঃ ইওর হেড অফিস!" বললেন খাটাউ

নোট তৈরি করল প্রদোষ। কিন্তু সে নোট আর দেবার দরকার হল না, তার আগেই আরটুনের চিঠি এসে গেল। তাতে লেখা—...নং রয়েড স্ট্রীটের শ্রীমতী ভায়োলেট ম্যাসকারেনহাসকে ঐ ডিভিডেন্ড ফেরত দেওয়া হয়েছে ১৯৫৬ সালের নবেম্বর মাসে।

"তো, এতো কাণ্ড করতে গেল কেন?" বললেন খাটাউ। "কতো রকম লোকই যে আছে! হোপলেস!"

প্রদোষ সন্ধ্যাকে আবার বেরুতে হল চিঠি নিয়ে শ্রীমতী ম্যাসকারেনহাসের কাছে। প্রৌঢ়া, ঘনকৃষ্ণ গায়ের রং, কাঁচাপাকা চুল কোঁকড়া। মনে পড়ল রবিবর্মার ছবি : অশোকবনে সীতা।

"অত্যন্ত দুঃখিত, মিসেস ম্যাসকেরানহাস,

"—ইউ হ্যাভ নাইস আইজ"

এ-সময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হল।" প্রদোষ সংক্ষেপে বিবৃত করল কী কারণে ওর আগমন।

মিসেস ম্যাসকারেনহাস অতি দ্রুত অনেকগুলো কথা বলে গেলেন, একবর্ণও বুঝলো না প্রদোষ।

"এক্সকিউজ মি, মিসেস ম্যাসকারেনহাস আই ডোন্ট স্পীক মালয়ালম। হম মলয়ালম নেহি সমঝতে।"

"বাট আই অ্যাম স্পীকিং ইংলিশ!" থেমে থেমে অত্যন্ত স্পষ্ট উচ্চারণে বললেন মিসেস। নাকের পাশ দুটো এমনিতেই ফোলা, তা আরো ফুলে উঠল।

"আমি দুঃখিত।" বোকার মতো হেসে বলল প্রদোষ। "আপনি আরেকটু আস্তে আস্তে বললে আমার সুবিধে হয়। জানেন তো, আমাদের ইংরেজী জ্ঞান কতো সীমাবদ্ধ।" হায় প্রদোষ! তুমি না ইংরেজী অনার্স, তুমি না তোমার কনভেন্ট-পড়া ছাত্রীদের ইংরেজী উচ্চারণে ভুল ধরো?

চিঠিটা পড়ে মিসেস ম্যাসকারেনহাস ভেতরে চলে গেলেন। একটু বাদে এসে দেখালেন একটা ফাইল যার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে ঐ ডিভিডেন্ড তিনি ফেরত দিয়েছেন ...হোশাম রোডের শ্রীঅমরনাথ ভাণ্ডারিকে; হ্যাঁ, ইনকোমট্যাক্স সার্টিফিকেট সমেত।

নোট করে নিল প্রদোষ। অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে উঠতে যাচ্ছে, হাঁটু ধরে বসিয়ে দিলেন প্রৌঢ়া, দ্রাবিড় মহিলা। বসলেন ঘনিষ্ঠ হয়ে। "ইউ হ্যাভ নাইস আইজ, ইয়ং ম্যান! মাইন্ড এ ড্রিংক?"

কী সর্বনাশ! ভয় করল প্রদোষের। আবার আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেক কষ্টে বেরিয়ে এলো। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে! কাছে এক চীনে দোকানে গিয়ে এক বাটি সুপ খেয়ে সুস্থ হল।

নতুন করে সব জানিয়ে চিঠি গেল হেড অফিসে।

পরের সপ্তাহে হোশাম রোডে। আবার মহিলা। আর, সে মহিলা চোলিপরা খাটি আর্যা : নিটোল মুখ, নিটোল স্বাস্থ্য। দরজায় দাঁড়িয়েই কথা হল। অমরনাথ ভাণ্ডারি ব্যবসায়ী। সকাল আটটার আগে আর রাত দশটার পরে দেখা হবে। চিঠিখানা নিলেন মহিলা।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় পেছনে তাকিয়ে দেখে ভদ্রমহিলা ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। রাস্তায় নেমে দেখে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মহিলা ওকেই দেখছেন। সমস্ত রক্ত মাথায়, শরীরে কেমন ঝিমঝিমানি! বারে বারে পেছন ফিরে দেখে আর বুকের মধ্যে টিপটিপ করে। 'সাব!' ড্রাইভারের ডাকে চমক ভাঙে। কিছু দেখল নাকি ড্রাইভার?

পরের দিন কেটে গেল, জবাব নেই ভাণ্ডারির। আবার গেল। এবারও সিঁড়ির মাথায়—এ কেমন ভদ্রতা রে বাপু! "এখানে এ সময়ে এলে কিছু হবে না তো জানেনই." হেসেই বললেন মহিলা। তারপর প্রদোষের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কী হল? প্রদোষের চাউনি দেখেই কি...? ছি ছি ছি ছি ছি! কী লজ্জা, কী ঘেন্না। পালাও, পালাও এ পাড়া থেকে, এ-শহর থেকে! কোথায় ড্রাইভার, কোথায় গেল সে যাইন?

এর পরের তিনটি দিন যেন ফাঁসি সেলে

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

ধ্রুপদের বর্তমান গায়নরীতি

কিছুদিন হল বেতারে ধ্রুপদ গান শুনেছি। আকাশবাণী যে নিয়মিতভাবে ধ্রুপদ শোনাবার ব্যবস্থা করেছেন এ খুব ভাল কথা। কিন্তু যা শুনেছি তার অধিকাংশই দুন বাঁট ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ কেউ ধ্রুপদের বন্দেশ পর্যন্ত রাখতে চান না। দিন কয়েক আগে সকালে একজন খাঁ সাহেবের ধ্রুপদ শুনে স্তম্ভিত হলাম। ইনি সাক্ষাৎ তানসেনের ঘরের ধ্রুপদ গান করেন বলে প্রচার করা হয়; কিন্তু এই কি সেই ঘরের পরিচয়? সারা গানে একটি শব্দ বোধগম্য হল সেটি হচ্ছে "রাজারাম" এবং এ শব্দটিও যথেচ্ছভাবে বিকৃত করে গাওয়া হল। এই যদি আদর্শ গায়কের ধ্রুপদ হয়ে থাকে তবে সাধারণ শিল্পীদের কথা কি বলা যাবে!

ধ্রুপদ সঙ্গীতে আলাপ একটি মুখ্য অঙ্গ কিন্তু আজকালকার ধ্রুপদ থেকে এই আলাপের মাধুর্য উপভোগ করা শক্ত। আলাপ করতে বসে ঘন ঘন তোম-নোমের ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু প্রকাশ করবার শক্তি অনেকের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে না। আলাপের মধ্যে চারটি তুক প্রকাশ করাকে প্রায় শিল্পীই বাহুল্য মনে করেন এমনকি কোন রাগ যে গাওয়া হচ্ছে তা পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে বোঝবার উপায় নেই। আকাশবাণী ধ্রুপদের আয়োজন করেছেন কিন্তু—তাঁর ধ্রুপদগুলি কিভাবে প্রচারিত হচ্ছে তা শুনে বিচার করেন কি?

ধ্রুপদ হচ্ছে আমাদের সঙ্গীতের আদর্শ প্রতীক। রাগ রূপায়ণ এবং গীতের সমতা-রক্ষা, সবই ধ্রুপদে মধুরভাবে প্রতিফলিত হয়। এই মাধুর্য থেকে বিচ্যুত হওয়া মানেই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়া। গত কয়েক বছরের মধ্যে ধ্রুপদের কয়েকটি আসরে গিয়ে দেখেছি আলাপের মধ্যে রাগের স্বরূপ প্রতিভাত হয় না। অনেকক্ষেত্রে আবার দীর্ঘায়িত আলাপ ক্লান্তিকর ঠেকে। আলাপের পরে গানে এসে চারটি কলি সমানভাবে গাইবার ধৈর্য অনেকেরই থাকে না; তাঁরা গানে পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গেই দুন করতে লেগে যান। ধামারের ক্ষেত্রে বণ্টনের আধিক্য দেখা যায় ফলে ধ্রুপদের মূল উদ্দেশ্যই পরাজিত হয়ে থাকে।

একদা "ধ্রুব" নামক এক পর্যায়ের গানের বহু প্রকারভেদ হয়েছিল ক্রমে বৈষম্য এবং বৈচিত্র্য এত বেশী হয়ে উঠল যে এর একটি নির্দিষ্ট মান প্রস্তুত করা নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। মুঘলযুগের অব্যবহিত পূর্বে গোয়ালিয়রের রাজা মান প্রধানত

ট্রামে বাসে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী ফসলের মরসুম হইতে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় শুরু করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।—"আমরা ব্যবসায়ী নই, তবু বলি পাষাণ ভাঙার কৌশলটা এখন থেকেই সড়গড় করে রাখুন, কেননা অনভ্যাসের ফোঁটা তো কপালে চড়চড় করা অসম্ভব নয়"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

এই প্রসঙ্গের জের টানিয়া শ্যামলাল বলিল—"এর চেয়ে জামনগরে আবিষ্কৃত ভেষজগুণসম্পন্ন "কালীয় কন্দ" নামে লতাটি আমদানির ব্যবস্থা করলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়, শুনেছি এই লতা খেয়ে মানুষ এক সপ্তাহ পর্যন্ত অন্যকিছু না খেয়েই কাটিয়ে দিতে পারে। পাকা হর্তুকীর বিকল্প এই কালীয় কন্দই সই।"

কলিকাতা শহরে জলের অভাবের কথা আগেই শুনিয়াছিলাম, সম্প্রতি শোনা

যাইতেছে, বড় বড় রেস্তরাঁর জলে নাকি আন্ত্রিক রোগের জীবাণু পাওয়া গিয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"অসম্ভব কিছু নয়; 'বাহাত্তুরে' পাইপ তো!!"

জেনেভা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ সেখানে "সাইকোসেল" নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার দ্বারা খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় বলিয়া দাবি জানানো হইয়াছে।—"রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার না করেই আমরা উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল আবিষ্কার করেছি: —চালে কাঁকর, সর্ষেতে শেয়াল কাঁটার বীজ, দুধে জল, ইলিশের পেটে ছাগলের চর্বি প্রভৃতি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ!"

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুরজী নাকি বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের জীবন লইয়া খেলা সরকার বরদাস্ত করিবেন না। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু যে-হারে খেলা চলছে তাতে তো মনে হয় খেলাকে জাতীয় অলিম্পিক পর্যায় পর্যন্ত ঠেলে না তোলা হলে আর খেলোয়াড়রা থামবে না, 'বরদাস্ত' তো ছোট কথা, রাস্তার ধারের লাইট পোস্টে ফাঁসি চড়ানোর হুমকীকে পর্যন্ত বাবুরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে।"

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পর শ্রীমতী ইন্দিরা বলিয়াছেন—দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের তাল রাখিয়া চলিতেই হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তা তো বটেই। কিন্তু মুশকিল হল আমরা যে বিলম্বিত লয়েই রেয়াজ করে এসেছি, ওটাই যে আমাদের ঘরানা।"

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, গয়াতে নাকি ভেজাল সিমেন্টের ছড়াছড়ি। —"মন্দের ভালো বলতেই হবে। গয়ার মাটিতে তৈরি ঘরে শেষ নিঃশ্বাস পড়লে, আদ্যশ্রাদ্ধে 'ত্বং পিণ্ডং গয়ায়াং ব্রজ' বলে আর পিণ্ডি গয়ার দিকে ঠেলতে হবে না।"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম, সরবরাহ বাড়াইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি কৃত্রিম উপায়ে মৎস্য প্রজনন প্রথার আশ্রয় লইয়াছেন।—আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এতে আমাদের আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু মৎস্যের জাতি-উৎপাদনে

সরকারকে না একদিন আবার পরিবার পরিকল্পনা প্রথার আশ্রয় নিতে হয়!!"

ভারতীয় ক্রীড়াসামগ্রী প্রবর্তক কমিটি টোকিও অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় এক প্রদর্শনী ব্যবস্থার তোড়জোড় করিতেছেন—ঐ সময়ে ভারতে নির্মিত হকি স্টিক, অ্যাথলেটিকসের জুতো, ফুটবল প্রভৃতি প্রদর্শিত হইবে। —"খেলা দেখানো যখন সম্ভব নয়, তখন খেলায় ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর প্রদর্শনী দেখানোই 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিত' হবে। তবে প্রদর্শনীতে ভারতে প্রস্তুত ডাংগুলির কথাটা আশা করি প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা ভুলে যাবেন না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সংবাদে প্রকাশ, রাজ্য সরকার নাকি স্টেডিয়াম নির্মাণে পুনরায় সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। —"হতেই হবে। আমরা আগেই বলেছি, ফুটবল মরসুমে স্টেডিয়ামটা হলো কর্তৃপক্ষের বার্ষিক আশ্বাস, এ বৎসরেও তার ব্যতিক্রম হয় নি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সংবাদে প্রকাশ, অস্ট্রেলিয়ায় নাকি "টপলেস বেদিং স্যুট" লইয়া মাতামাতি চলিতেছে। শ্যামলাল কবিতায় মন্তব্য

করিল (কবিতাটি কাব্যময় কিনা!)—"টপলেসে কি বা কাজ, তীরে ফেলে এসো সাজ, ঢেকে দেবো সব লাজ, সুনীল জলে!"

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন প্রতিরক্ষা সাহায্যের জন্য সোবিয়েৎ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনার জন্য মস্কো যাইতেছেন। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"অক্ষুব-ক্রুশ্চেভ প্রমুখদের আর একদফা 'বেসামাল' অবস্থার আয়োজন আর কি!!"

মাতলা নদীতে নাকি এখনও পর্যাপ্ত ইলিশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সংবাদে বলা হইতেছে,—বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই ইলিশ ধরিলেও রাজ্যের মৎস্য দপ্তর তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় একটি ইলিশও ধরিতে পারিতেছেন না।—"আমরা বিশ্বাস করি নে। ধরার সময় হলে নিশ্চয়ই সরকার ইলিশ ধরবেন। মনসুন এলেও কলকাতায় এখনো বৃষ্টি হচ্ছে না, দোকানে গোলাপসরু চাল চাই, তেল-ঘি-সোনামুগ, খুড়ি গৌফ ক্যারেট মূল্য বাড়ন্ত, ইলিশ এনে কি ছাকে তুলে রাখব"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

বৈদেশিক সাহায্য কমে গেলে ভারতকে তার উন্নয়ন নীতি সেই মতো পরিবর্তিত করে নিতে হবে। তখন সবচেয়ে বেশী সমস্যা দেখা দেবে বিদেশ থেকে মাল-সরঞ্জাম ইত্যাদি আমদানি করার ব্যাপারে। সে অবস্থায় রপ্তানি বৃদ্ধি করা ছাড়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের বিকল্প কোনো উপায় থাকবে না। আক্ষেপের বিষয় এই যে বর্তমানে আমাদের দেশের স্বল্পসংখ্যক দ্রব্যই বিদেশের প্রতিযোগিতার সামনে দাঁড়াতে পারে। সে কারণে প্রধানত শিল্প-সামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হবার মতো করে তুলতে হবে। সন্দেহ নেই যে সমৃদ্ধ দেশসমূহ যদি অনগ্রসর দেশগুলিকে তাদের দ্রব্য রপ্তানি করার ব্যাপারে আগের চাইতে বেশী সুযোগ-সুবিধা দেয় তাহলে বিদেশ থেকে অর্থসাহায্যের অভাব খানিকটা পূরণ করা যাবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

আলোচনা

সরকারী খাদ্যনীতি

সবিনয় নিবেদন,

'সরকারী খাদ্যনীতি' (দেশ, ২৭ জুন ১৯৬৪) প্রসঙ্গে আপনারা বলেছেন, '...মুনাফাবাজদের আটকাচ্ছে কে?' আজ দেশের বিড়ম্বিত জনসাধারণের মনে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হচ্ছে। আমাদের খাদ্যসমস্যা কোনও সাম্প্রতিক ঘটনা নয় এবং আমরাও, আপনাদের কথায় বলতে গেলে, ক্ষুধা, সংসার প্রতিপালন ও দৈনন্দিন দুঃখশোকের দায়ে 'উপায়হীন প্রার্থীর মতন যেন সব-কিছু রাষ্ট্রের পায়ে সঁপে দিয়ে বসে আছি' এইজন্য যে, রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ আমাদের কল্যাণ-কামী হবেন এই একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক আশায়। দীর্ঘকাল ধরে আমরা দেখে এসেছি যে, রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষের উদ্যোগে সংঘটিত হয়েছে বহু সম্মেলন ও তথ্যসংগ্রহ, বৈঠক বসেছে নানাবিধ কমিটির, বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানিতে অর্থব্যয় হয়েছে প্রচুর, শোনানো হয়েছে বিকল্প খাদ্যের নানাপ্রকার পথ্য, উদ্ভাবিত হয়েছে অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের বিবিধ পন্থা কিন্তু পরিণামে শুধু এই কথাই জানানো হচ্ছে যে, যেখানে রয়েছে জনসিন্ধু সেখানে সমস্যা থাকবেই, নাই বা জুটলো উদরপূর্তির খাদ্যবিন্দু। তাহলে, মনে সংশয় জাগে, খাদ্য বিষয়ে সব পরিকল্পনা কী নিতান্তই 'কবি কল্পনা'?

ক্রমশ দেখা যাচ্ছে যে, কালোবাজারীর অপ্রতিহত প্রতাপে আমাদের দেশ যেন হয়ে উঠছে ঘাটতি-উঠতির দোল-দোলানো মুনাফাবাজী-মজুতদারির মেলা। নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হবার ফলে যখন অযুত মানুষ দুর্দশার প্রান্তে উপনীত হয় তখন দেখা যায় মজুত মাল নীরবে অদৃশ্য হয়ে গেছে কোনো অজ্ঞাত উপকণ্ঠে। সেই অবস্থার মধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের সহিষ্ণুতা হতে চায় নষ্ট। বাজারে প্রচলিত ভেজাল অথচ বিশুদ্ধতার বিজ্ঞাপনমণ্ডিত জিনিসের মতন নানাপ্রকার প্রতিকারের ব্যর্থ পরিহাস তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে।

এত নৈরাশ্য ও দুর্দশা সত্ত্বেও সুব্যবস্থার আশায় সাধারণ মানুষের এখনও রাষ্ট্রের প্রতি মুখাপেক্ষিতা নিঃসন্দেহে একটি শুভ লক্ষণ। অধ্যবসায়ী প্রশাসনের নির্মম ভূমিকা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের তৎপরতাই ব্যবসায়ী অসহযোগিদের অনাচার নিবারণ করতে পারে। বলা বাহুল্য যে, বিক্ষুব্ধ মানুষের সহ্যের সীমা যেমন অনতিক্রম্য নয় তেমনি

রূপকথার কলকাতা

'Asutosh in the eyes of his country men and in the eyes of the world represented the University so completely that for many years Asutosh was in fact the University & the University Asutosh.' Lord Lytton.
"... a vision of Nalanda growing up in this, the greatest & most populous city of the Indian Empire."
Earl of Ronaldshay, Governor of Bengal 1921.

আজ থেকে আনুমানিক সত্তর বছর আগের কথা। গোলদীঘির পাড়ে বসে সন্ধ্যার সময় একটি বালক নীরবে অশ্রুপাত করে চলেছে। লোকজন তেমন বিশেষ নেই সেদিন পার্কের ভিতরে। যে কয়জন আছেন, তাঁরা আপন আপন দলের মধ্যে গল্প-গুজবে ব্যস্ত। শুধু একজন যুবাপুরুষ বারবার বালকটিকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেই বালক বড় দুঃখী, কোন্ এক গণ্ডগ্রামে বিধবা মায়ের সঙ্গে বাস করে, বিনা বেতনে স্কুলের পাঠ শেষ করে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, সব পরীক্ষাই দিয়েছে, কিন্তু বাংলা পরীক্ষার দিন ম্যালেরিয়ায় কাবু হয়ে পড়ায় পরীক্ষা দিতে পারেনি, আর-এক বছর অপেক্ষা সে কোনমতেই করতে পারবে না, দয়ালু জমিদার মশায় তাকে পরীক্ষান্তে চাকরি দেবেন স্বীকার গিয়েছিলেন, কিন্তু এখন অনাথা মায়ের সঙ্গে সেই বালক সুনিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধাবমান—এই ভবিষ্যৎ ছবি কল্পনা করে সহায়সম্বলহীন বালক সন্ধ্যাবেলা গোলদীঘির পাড়ে বসে অশ্রুপাত করছিল।

এর পরবর্তী আখ্যান প্রায় গল্পেরই মতো। সেই বালক স্যার আশুতোষের শরণাপন্ন হল। শুধু প্রস্তাবই নয়, সেই বালককে ইণ্টারমিডিয়েট বাংলা পরীক্ষা দিতে আদেশ দিলেন আশুতোষ। সেই আদেশ শিরোধার্য করে বালক তার এই বিচিত্র ব্যবস্থায় সে-বছর পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছিল। স্যার আশুতোষের ব্যক্তিত্বে আর কাজে প্রয়োজনীয়তা অনেক সময় রীতি আর নিয়মকে লংঘন করেছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন-এর 'আশুতোষ স্মৃতি-কথা' গ্রন্থে এরকম বহু বিচিত্র কাহিনী আছে। বাঁকুড়া কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার-বৃদ্ধির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন: "পূর্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মর্যাদা ছিল, এখন আর তাহা নাই। ক্যালেণ্ডার খুঁজিয়া পাশ-ফেলের পার্সেণ্টেজের তারতম্য দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উচ্চ আদর্শ ক্রমশ হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে। এই বিদ্যাশালার গ্র্যাজুয়েটদের এখন আর কোন সম্মানই নাই: নির্বিচারে পাশের স্রোত চলিয়াছে।" স্যার আশুতোষ উত্তর দিলেন: "আমাদের পাশ-ফেলের সংখ্যা আলোচনা করার পূর্বে বক্তা তাঁহার নিজের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পাশ-ফেলের সংখ্যা একবার আলোচনা করিলে ভাল হয়। লণ্ডন, অক্সফোর্ড কেমব্রিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংখ্যা আমাদের ছাত্রদের সংখ্যা হইতে শতকরা এখনও অনেক বেশি। আমি মনে করিতে পারি না যে, সেই দেশের ছেলেদের অপেক্ষা আমাদের দেশের ছেলেরা কম মেধাবী। আমি লক্ষ করিয়াছি, আমাদের ছেলেদের এই সফলতায় অনেকে মনে মনে ক্ষুব্ধ; এই ক্ষোভের কারণ আমি মোটেই উপলব্ধি করিতে পারি না। বিশেষত, যাঁহারা কলেজের অধ্যক্ষ; ছাত্রদের শুভাশুভের সঙ্গে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদের এইরূপ মনোভাব আমার নিকট একেবারে দুর্বোধ্য।"

১৯০৪ সালের আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু-তিনটি কেরানীসহ রেজিস্টার সাহেবকে কাজ চালাতে হত। ১৯২৪-এর মধ্যে এই সংখ্যা দেড় শতে পৌঁছলো। অধ্যাপক ছিলেন মাত্র একজন—এই সময়ের মধ্যেই অধ্যাপকের সংখ্যা হল জনা-পঁচিশ। আশুতোষকে কেন্দ্র করে সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দানের লড়াই লেগে গেল যেন। খয়রার রাজার সাড়ে পাঁচ লক্ষ, নির্মলেন্দু ঘোষের স্মৃতি-রক্ষার্থ গিরিশবাবুর বিপুল অর্থ, পালি বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বহুমূল্য সম্পত্তি দান, ভোলানাথ বড়ুয়ার দশ হাজার টাকা—এই রকম ছোট-বড় দানের তোড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমা হল। দীনেশ সেন মশায় লিখছেন: "দিনাজপুরের বাবু তারকনাথ চৌধুরী মৈথিলীর অধ্যাপকের পদের ব্যয়ভার বহন করিতেছেন—এবিষয়ে গবেষণার জন্য অর্থ দিতেছেন রাজা কীর্তানন্দ সিংহ; ময়মনসিংহ-সেরপুরের জমিদার গোপালদাস চৌধুরী বাংলার জন্য প্রচুর অর্থ দিয়াছেন, শোণপুরের মহারাজা ওড়িয়ার অধ্যাপকের পদের ব্যয় বহন করিতেছেন। এইরূপ বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অকুণ্ঠিতদানে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। যাদুকরের মন্ত্রপূত কাঠি দিয়া আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে ছিল আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ!"

বাস্তবিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে এক আশ্চর্য সুসময়। আশুতোষের আহ্বানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পানে ছুটে এসেছেন মহারাষ্ট্র পণ্ডিত ভাণ্ডারকর, সিংহলী পণ্ডিত রেভারেণ্ড সিদ্ধার্থ, ত্রিবাঙ্কুরের রাও অনন্তকৃষ্ণ, হিন্দী পণ্ডিত ভাগবত সহায়, কাশীর পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী, মৈথিলী অধ্যাপক বাবুয়া মি

অংকের অধ্যাপক গণেশপ্রসাদ, মাদ্রাজী অধ্যাপক সি ভি রমন, বর্তমান রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন, পণ্ডিত তারাপুরেওয়ালা, সিরাজী, জাপানী ও চীনা পণ্ডিত মাসুদা ও কিমুরা ইংরেজী অধ্যাপক স্টিফেন, অংকের অধ্যাপক কালিস, জার্মান পণ্ডিত রুল প্রভৃতি।

প্রাদেশিক ভাষা বিভাগে তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়েকটি ভাষা গ্রহণ করেছিলেন—বাংলা অসমীয়া, ওড়িয়া, উর্দু, হিন্দী, গুজরাতী, দ্রাবিড়ী, তামিল মালয়ালম, কানাড়ি এবং সিংহলী। নিয়ম ছিল, এদের মধ্যের যে-কোনোটিকে পরীক্ষার্থী প্রধান বিষয়ে হিসেব নিতে পারবে, কিন্তু তাছাড়াও অন্য একটি দ্বিতীয় ভাষাও তাকে অবশ্য নিতে হবে। সেই সাবসিডিয়ারি ভাষার জন্যে দু-দশ নম্বর নির্দিষ্ট ছিল। আশুতোষ সেযুগে এই প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কিভাবে কল্পনা করেছিলেন তা ভাবলেও অবাক লাগে। বর্তমানকালে এই রকম বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় সংহতি দৃঢ়বদ্ধ হবে—এই বিবেচনা করে অনেকগুলি কেন্দ্রেই ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশুতোষের বাটিতে সেই ধরনের একটি বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র খোলার কথা আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই জেনেছি।

এ-বছর কলকাতায় আশুতোষের জন্মশত-বার্ষিকী পালন করা হল। ছোট-বড়ো নানান অনুষ্ঠান হল শহরতলির দিকেও। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানভবনে একটি উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেন্ট্রাল লাইব্রেরী থেকে একটি মূল্যবান 'বিবলিওগ্রাফি' হাতে এসে পৌঁছলো—যার মধ্যে স্যার আশুতোষের প্রকাশিত গ্রন্থ ও চিঠিপত্র-বক্তৃতার একটি প্রামাণ্য তালিকা দেওয়া আছে। সেই সংগে আশুতোষের উপর ইংরাজী ও বাংলায় লেখা পুস্তক এবং প্রবন্ধের একটি বিশদ বিবরণ মুদ্রিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই পুস্তিকাটি খুবই সীমাবদ্ধভাবে প্রচারিত হয়েছে। ছাপাও বেশি পরিমাণে হয়েছে বলে মনে হয় না—আশা করি, পরবর্তী কোনো সময়ে জন্ম-শতবার্ষিকী সমিতি এ ধরনের একটি তালিকা বহুল পরিমাণে প্রচারের দায়িত্ব নেবেন।

মৃত্যুর পর আমাদের স্মৃতিতে তিনি আছেন এভিনিউ-র মতো। সময়ে অসময়ে তাঁর পুরাতন কাজ ও কীর্তির ভিতরে আমাদের যাতায়াত—জন্মশতবার্ষিকী পালনের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করার সুযোগ বাঙালী মাত্রেই গ্রহণ করেছে আজ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধার দিয়ে যেতে যেতে এই মহান্ সংগঠকের কথা অবধারিতভাবে মনে পড়বে সবার—বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে তাঁর আত্মা, তাঁর অস্তিত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

বেগম মেরী বিশ্বাস

বিমল মিত্র

॥ ২৭ ॥

মতিঝিলের নবাব শুধু মতিঝিলের নবাবই নয়, বাংলা বিহার ওড়িষ্যারও নবাব। যার একটা হুকুমে মুর্শিদাবাদের চেহেল-সুতুনের ইটগুলো পর্যন্ত ভয়ে থর থর করে কাঁপে, যার একটা কথায় হাতিয়াগড়ের রাজা দ্বিতীয় পক্ষের বউকে সুড় সুড় করে চেহেল-সুতুনে পাঠিয়ে দেয়, সে মানুষটাকে সেই-ই প্রথম দেখলো মরালী। যেমন আর পাঁচজন মানুষ, ঠিক তেমনি। তেমনি মুখ-চোখ-কান-কপাল সব কিছু। গলার আওয়াজটাও আর পাঁচজন মানুষের মতন। এই মানুষটাই ইচ্ছে করলে নাকি যে-কোনও লোকের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারে। এই মানুষটার কাছে যাবার জন্যেই গুলসন বেগম থেকে সুরু করে সব বেগম উদগ্রীব হয়ে থাকে। এই মানুষটাই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সকলের ভাগ্যবিধাতা। ভাবতেও অবাক লাগে।

নবাবের সব কথা কানে যায়নি ভাল করে। কিন্তু যেটুকু গিয়েছিল সেইটুকুতেই বড় মায়া হয়েছিল মরালীর মানুষটার জন্যে! সত্যি, কেউ কি নেই যে নবাবের ভাল দেখে! এমন কেউ কি নেই যে নবাবের ভাল চায়?

নানী বেগম আসবার সময় জিজ্ঞেস করেছিল—তুই অত ভয় পেয়েছিলি কেন বেটি? অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলি কেন? কী হয়েছিল তোর? মীর্জাকে তোর এত ভয়?

মরালী সে কথার উত্তর না দিয়ে বলেছিল —নবাবের বুঝি অনেক শত্রু নানীজী?

নানীবেগম বলেছিল—বেচারাকে সবাই মিলে বড় নাজেহাল করে দিচ্ছে মা, সাধে কি আর দুঃখ হয় আমার মীর্জার জন্যে! সবাই ওর দুষমণ মা, সবাই ওর দুষমণ!

—কেন? কীসের জন্যে শত্রুতা করে তারা? কী করেছে নবাব?

—দুষমণির কি কোনও কারণ থাকে মা। ও ক-একজনের কপালে লেখা থাকে। তারা ষমণ নিয়েই জন্মায়, তারা লোকের ভালো রুক মন্দ করুক, তাদের দুষমণ থাকবেই—

—কারণ না থাকলেও শত্রুতা করবে?

—তা করে না? মীর্জা তো আমার কোনও য করেনি, তবু কেন আমার নিজের পেটের য়ে তাকে দেখতে পারে না? ওর মামারও ই রকম ছিল মা, সারা জীবন তাকে জ্বলতে য়েছে! তাই তো বলি বড় হওয়াই পাপ। আর বড় হওয়া লোকে ভাল চোখে দেখে না। তাই তো তোকে বলেছিলাম নবাবের চেয়ে নবাবের প্রজারা অনেক সুখে আছে। তারা তবু রাত্তিরে আরাম করে ঘুমোতে পারে, শাক-ভাত যাহোক দুটো পেট ভরে খেয়ে শান্তি পায়। মীর্জার আমার খেয়েও সুখ নেই, ঘুমিয়েও সুখ নেই। এই যে আমার সঙ্গে আজ কতদিন পরে দেখা, কত দিন পরে দেখা হলো। কত কথা বলবার ছিল, কিন্তু কোথা থেকে হঠাৎ মাণিকচাঁদের চিঠি এল আর সব বন্ধ হয়ে গেল। এখন দেখি, আজ রাত্তিরে যদি আসে তো তোর একটা হিল্লে করে দেব মীর্জাকে বলে—

—আমার আবার কী হিল্লে করবে নানীজী?

—তোকে যদি হাতিয়াগড়ে ফেরত পাঠাবার জন্যে মীর্জার মত করাতে পারি!

—আমাকে ফেরত পাঠাবেন?

মরালী চমকে উঠল।

—কেন? ফেরত পাঠালে তুই যা... কি চেহেল-সুতুনে থাকতে ... ফেরত পাঠালে তোর সোয়ামী ... না?

মরালী বললে—না।

নানীবেগম আবার জিজ্ঞেস করলে—... নেবে না?

মরালী আবার বললে—না। আমি মুসলমানের হাতে খেয়েছি, আমার জাত গেছে, এর পর কেউ কাউকে ঘরে নেয় না।

—তা কী করবি বল্? মীর্জাকে আমি কী বলব?

মরালী বললে—আমি এখানেই থাকব।

নানীবেগম আরো অবাক হয়ে গেল। বললে—তুই থাকতে পারবি? কষ্ট হবে না থাকতে? তুই তো নজর মহম্মদ, পীরালি খাঁ, বরকত আলি ওদের দেখেছিস, ... মন জুগিয়ে চলতে পারবি?

মরালী হঠাৎ বললে—আমি আপনার কাছে থাকব নানীজী!

নানীবেগম হেসে ফেললে। বললে—দূর পাগলি, আমি আর ক'দিন! আমি তো আর বেশি দিন বাঁচবো না। আমি মরে গেলে তুই কী করবি। কে তখন দেখবে তোকে?
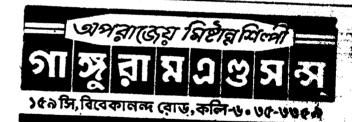
মরালী বললে—ছোটবেলায় তো আমার মা-ও মারা গিয়েছিল, তখন কে আমায় দেখেছিল ?

এর পর নানীবেগম আর কোনও কথা বলেনি। মরালীও আর কোনও কথা বলেনি। কেমন যেন সেইদিনই দুজনের মন জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। সেদিন থেকে আর কোথাও যেতে মরালীকে কেউ বাধা দেয়নি। সেই দিন থেকেই মরালী চেহেল-সুতুনের ভেতরে এ-মহাল থেকে ও-মহালে ঘুরে বেড়িয়েছে। ওস্তাদজীর কাছে গান শিখেছে, নাচ শিখেছে। সে সব অনেক পরের কথা। সেই তখন থেকেই মনে হয়েছিল, যে লোকটার এত শত্রু তাকে একটু শান্তি দিতে হবে! আর তারপরে যখন সেই ক্লাইভ সাহেব এসেছিল তার জীবনে, তখনও সেই মানুষটার কথা ভুলতে পারেনি।

ক্লাইভ সাহেব মরালীকে মেরী বলে ডাকতো। কোথাকার কোন্ সাত সাগর তের নদী পারের দেশ। সেখান থেকে এসেছিল এখানে চাকরি করতে। সামান্য চাকরি। সাহেব এক একদিন চুপ করে বসে থাকতো বাগানে। আবার এক একদিন প্রাণ ভরে গল্প করে যেত। ফরসা টক্ টক্ করছে গায়ের রং। কত লড়াই করেছে কত জায়গায়। কতবার আত্মহত্যা করতে গেছে।

মরালী জিজ্ঞেস করত—কেন গো, আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে কেন তুমি?

সাহেব বলত—এখনও মাঝে মাঝে মরে যেতে ইচ্ছে করে আমার, তা জানো মেরী?

—কেন? তোমার এত কষ্ট কীসের?

তখন সাহেবের প্রচুর টাকা। তখন কর্নেল ক্লাইভও যা, দিল্লির বাদশাও তাই। মরালীর অবাক লাগত সাহেবের কথা শুনে। মনে পড়ত মুর্শিদাবাদের নবাবের কথা। মুর্শিদাবাদের নবাবেরও ঘুম আসত না রাতে। ক্লাইভ সাহেবও ঘুমোত না।

মরালী জিজ্ঞেস করত—সত্যি বলো না সাহেব, তোমার কীসের কষ্ট?

সাহেব বলত—সে কি তুমি বুঝতে পারবে? সবাই আমার শত্রু—এমন কেউ নেই যে আমার ভাল চায়, যে আমার ওয়েল-উইশার, এমন কেউ নেই আমার ভাল হলে যে আনন্দ পায়—

মরালী বলত—কেন, মেজর কিল্‌প্যাট্রিক সাহেব, ওয়াটসন সাহেব, তোমার কোম্পানীর বড় সাহেবরা—

সাহেব বলত—কেউ না, কেউ না, কেউ না—

সাহেব 'না বলত আর মাথা নাড়ত। যেন যন্ত্রণায় সাহেবের বুক ভেঙে যেত কথা বলতে বলতে। যে মানুষটা দুবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, দুবারই বেঁচে গিয়েছিল। সাহেবের কথাগুলো শুনতে শুনতে মরালীর নানীবেগমের কথা মনে পড়ত। নানীবেগম বলেছিল—দুর্ষমণির কি কোনও কারণ থাকে

মা, ও এক একজনের কপালে লেখা থাকে। তারা দুষমণ নিয়েই জন্মায়। তারা ভালোই করুক আর মন্দই করুক, তাদের দুষমণ থাকবেই—

কিন্তু এ সব কথা এখন থাক্‌।

উদ্ধব দাস তার কাব্যে এ সব কথা অনেক পরে লিখেছে, আমি আগে থেকেই শেষের কথাগুলো বলে ফেলছি। মরালী কি তখন নবাবকে ভাল করে চিনেছে না ক্লাইভ সাহেবকেই চিনেছে। একজনের বয়েস ছিল তখন মাত্র ছাব্বিশ বছর। ছাব্বিশ বছরেই নবাবি পেয়ে সে মানুষটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আর একজনের বয়েস ছিল তখন মাত্র একত্রিশ। সেই একত্রিশ বছর বয়েসেই দেশ-ঘর-সমাজ ছেড়ে এসে হাজির হয়েছিল এই জল-কাদা-মশা-মাছির দেশে।

নানীবেগম বলত—আমি তো সেই জন্যেই কোরাণ নিয়ে থাকি মা দিনরাত, খোদার কাছে দিনরাত দোয়া চাই, খোদাতাল্লাকে কেবল বলি মীর্জা যেন আমার শান্তি পায় খোদা, মীর্জা যেন আমার দুদণ্ড ঘুমোতে পারে, মীর্জা যেন ভাল থাকে—

সেদিন সকাল থেকেই তোড়জোড় সুরু হয়ে গিয়েছিল চেহেল-সুতুনের ভেতরে। নবাব মতিঝিল থেকে চেহেল-সুতুনে আসবে। সব বেগমই আতর-কুঙ্কুম-পেশোয়াজ-পাঁয় জোড় নিয়ে ব্যস্ত। গুলসন সেদিন আর লুকিয়ে লুকিয়ে এল না। একেবারে সোজা সিংহ দরজা দিয়েই এসে ঘরে ঢুকলো।

বললে—তুমি নাকি ভাই মতিঝিলে গিয়েছিলে?

মরালী বললে—তুমি কোত্থেকে শুনলে?

—এমনি শুনলাম। নবাব তোমাকে কী বললে? তোমাকে দেখে হেসেছে?

মরালী বললে—হ্যাঁ—

—তবে আর কী, ভাই। তবে তো তুমি জের দিয়েছ!

মরালী বললে—কেন, তুমিও তো কাল মতিঝিলে গিয়ে নেচে অনেক মোহর পেয়েছ শুনলাম, তোমারও তো ভাগ্য ভাল!

গুলসন বললে—কিন্তু, তার জন্যে কত খরচ করতে হয়েছে, তা জানো! ওই নজর মহম্মদকে কত ঘুষ দিয়েছি, কত খোসামোদ করেছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মজুরি পোষাবে কি না কে জানে ভাই!

—কেন?

—সকলের চক্ষুশূল হয়ে গেছি যে ভাই! সবাই আমার দিকে টেরিয়ে টেরিয়ে চাইছে। যেন আমি সকলের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছি। অথচ, তুমি তো ভাই জানো, আমি কারো মন্দ চাইনে। আমি চাই সকলের ভালো হোক! অথচ তোমরা যে ভেট কত টাকা রোজগার করছ, তার জন্যে তো আমি কিছুছু বলি না—

মরালী অবাক হয়ে গেল। বললে—টাকা? অন্যেরা টাকা রোজগার করছে? সে কি?

—ওমা, টাকা রোজগার করছে না? সবাই তো কারবার করে। তুমি কি ভাবছ বেগম সবাই চুপ করে বসে থাকে?

—কীসের কারবার করে সবাই?

—[illegible] রকমের কারবার করে। কারবার কি একটা? সোরা কেনা-বেচা করে, আফিং কেনা-বেচা করে, রেশম কেনা-বেচা করে। ওই যে নবাবের মা, আমিনা বেগম, ওর কি কম টাকা মনে করেছ? বিধবা হয়ে এস্তোক এখেনে এসেছে, সেই থেকে লাখ-লাখ টাকা আয় করেছে কলকাতার ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে কারবার করে। আর ওই ঘসেটি বেগম! ওরা সবাই লাখ-লাখ টাকার মালিক! আমি তো তাতে কিছু বাকিনি কোনও-দিন। আমি ভাবতুম যদি কোনও দিন কিছু টাকা পাই তো আমিও কারবারে খাটাবো সে-টাকা! কিছু সোরা কিনে ফিরিঙ্গিদের বেচবো। এই ধরো পাঁচ-কুড়ি টাকার মাল বেচলে ন'কুড়ি টাকা ঘরে আসে, তা মন্দ কী! সেই জন্যেই তো ভাই নজর মহম্মদকে অত খোসামোদ করে মতিঝিলে গিয়েছিলাম—

—তা এবার কারবার করবে তো?

—ওমা, সে গুড়ে বালি ভাই। সেই যে কথায় আছে না, অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। আমার হয়েছে তাই। ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে লড়াই হবার পর থেকে তো সকলের কারবার বন্ধ!

—কেন?

—তা মাল কে কিনবে যে কারবার করবে? ফিরিঙ্গিরাই তো মাল কিনতো। তারা যখন নেই তখন কে আর কিনবে? কাশিমবাজার কুঠি তো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে নবাব। কলকাতায় উমিচাঁদ সাহেব বলে একজন মহাজন ছিল, তাকেও তো নবাব শায়েস্তা করে দিয়েছে। বেভারিজ সাহেব বলে একজন ফিরিঙ্গি ছিল, তারা তো গদি-টদি গুটিয়ে পগার-পারে চলে গেছে! কে কিনবেটা কে?

তারপর একটু থেমে বললে—সেই জন্যেই তো সবাই নবাবের ওপর চটে গেছে! নবাবের মা পই-পই করে ছেলেকে বারণ করেছিল লড়াই করতে। লড়াইতে নবাব জিতলে কী হবে, বেগমদের খুব লোকসান হলো তো। টাকা আমদানি বন্ধ হলো তো। ছেলের ওপর রাগ হবে না মায়ের? এখানে একজন বড় শেঠ আছে তার নাম ভাই জগৎশেঠ, সেও তো শুনেছি রেগে গেছে ওই জন্যে। তা রাগ হবে না, তুমিই বলো!

তারপর হঠাৎ গলাটা নিচু করে বললে—বললে তো অনেক কথাই বলতে হয় ভাই, বলি না বলে তাই। কিন্তু জানি তো সব! আমার ওপর চোখ টাটালে আমিও একদিন রাগের মাথায় সব বলে দেব—

—কী বলবে?

—তবে তোমাকে চুপি চুপি বলি। কাউকে যেন বলো না ভাই। এখেনে চক্‌বাজারে সারাফাত আলি বলে একজন পাঠানের দোকান আছে। সে তো বলেছি তোমাকে। বাইরে খুশ্‌বু তেলের দোকান। কিন্তু তার মতলোব খুব খারাপ ভাই, জানো। সে তো আরক বেচে। সে-আরক আমরা খাইও, কিন্তু আসল ব্যাপারটা আলাদা।

—কী রকম?

—এখন বুড়ো থুথ্‌থুড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু শুনেছি যখন জোয়ান বয়েস ছিল তখন থাকতো দিল্লীতে। সেখেনে নবাব আলীবর্দীর দাদা হাজী-আহম্মদ ওর বউকে ফুস্‌লে নিয়ে আসে। খুব সুন্দরী বউ। সেই বউ ফুস্‌লে নিয়ে আসার পর থেকেই হাজী-আহম্মদের ভাগ্য ফিরলো। তার

আপন ভাই আলীবর্দী খাঁ, নিজের অন্নদাতা সুজাউদ্দীনের ছেলে নবাব সরফরাজ খাঁকে খুন করে এই মুর্শিদাবাদের নবাব হলো, আর সারাফাত আলির অবস্থা তার পর থেকেই খারাপ হতে সুরু করলো। সেই সময় থেকে বুড়ো এইখেনে এসে দোকান খুলেছে, আর কেবল হাজি মহম্মদের বংশ ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে—

—হাজি আহম্মদের বংশ মানে?

—সেটা আর বুঝলে না। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা তো হাজি আহম্মদেরই নাতি হলো। নবাব আলিবর্দী খাঁর তো নিজের ছেলে হয়নি। তিন মেয়ের সঙ্গে দাদার তিন ছেলের বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। আমাদের নবাব তো হাজি আহম্মদের‍ই ছোট ছেলের ছেলে—তাকেই তো আলিবর্দী খাঁ পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিল—

তারপর গুলসন কথা বলতে বলতে যেন একটু দম নিতে লাগলো।

মরালী বললে—তারপর?

—তারপর এখেনে এসে বুড়ো সারাফাত আলি ওই দোকান করেছে। আর খোজাদের খুব দিয়ে দিয়ে আরক বেচছে! আর শুধু কি আরক? খোজাদের ঘুষ দিয়ে দিয়ে আর কী করে জানো ভাই?

মরালী জিজ্ঞেস করলে—কী?

—নজর মহম্মদ তোমার কাছে এসে কিছু বলে না?

—কী বলবে?

—বাইরে থেকে জোয়ান-জোয়ান ছোকরা আনবার কথা? তা আর কিছুদিন থাকো না, তখন দেখবে তোমাকেও ঠিক বলবে! আগে সারাফাত আলি এখেনে একটা ছেলেকে পাঠাতো, সে ভাই কী চমৎকার দেখতে, তোমাকে কী বলবো। তার নাম রশীদ। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি গড়ন! একেবারে কন্দর্পের মত চেহারা ভাই, কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো হলে কী হবে, এতগুলো তাগড়া-তাগড়া বেগম, এদের সকলের সঙ্গে সে একলা যুঝতে পারবে কেন? তা এখেনে এলেই সবাই মিলে তাকে ছেঁকে ধরতো। সন্ধ্যে বেলা আসতো আর ভোর হবার আগে কেউ ছাড়তো না। একেবারে ছিঁড়ে খেত তাকে। অমন স্বাস্থ্য ভাই, দুদিনে শুকিয়ে হাড়-সার হয়ে গেল! তারপর আর সে আসতো না। তখন পাঠাতো আর একটা ছেলেকে, তার নাম কেশর। সেও যেন ভাই একেবারে রাজপুত্তুরের মতন দেখতে! কোত্থেকে যে ভাই সারাফাত আলি অমন বাছা-বাছা ছেলেদের আমদানি করতো কে জানে! এমনি করে এক-একজনকে সারাফাত আলি চেহেল-সুতুনে পাঠিয়েছে আর দুদিন পরেই তারা শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেছে। এদানি একটা পাঠান ছেলে আসতো, তার নাম বাদশা। কদিন ধরে খুব এল, সব বেগমদের ঘরে রাত কাটাতে লাগলো পালা করে। কিন্তু একদিন সে-ও আর এলো না, তার আসা বন্ধ হয়ে গেল। এখন আবার অন্য একজনকে ধরেছে—

—আবার আর একজন? এখানে রোজ রাত্তিরে আসে?

—আমি এখনও দেখিনি তাকে। নজর মহম্মদ তো আমাকে কদিন ধরে খুব খোসামোদ করছে। রোজই বলে—গুলসন বিবি, একজন খুবসুরত জোওয়ান লেড়কা আছে, তাকে আনবো?

মরালী জিজ্ঞেস করলে—কে সে?

—ওই সারাফাত মিঞাসের লোক, আর কে। এবার নাকি হিন্দু, আর মুসলমান নয় —রোজ খোসামোদ করছে। আনতে পারলে তো সারাফাত আলির কাছ থেকে মোহর পাবে কি না—

—কেন?

—সারাফাত আলি তো ওই লোভ দেখিয়েই ছেলেগুলোকে এখেনে পাঠায়। বেটা হাজি মহম্মদের বংশ-ধ্বংস করতে চায়। আর খোজারাও সেই টাকায় সোরা, আফিম, রেশম, এই সবের কারবার করে। খোজা-গুলোর কি কম টাকা আছে নাকি ভেবেছ? তা এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম—এ কে? একে কেমন দেখতে? নজর মহম্মদ বললে —খুব খুবসুরত দেখতে গুলসন বিবি। একেবারে তাজা জোয়ান। এ হিন্দু-বাচ্ছা। এর নাম কান্তবাবু—

মরালী আকাশ থেকে পড়লো—কান্তবাবু? কান্ত কী? পদবী কী?

—কান্ত সরকার......

কিন্তু কথাটা পুরো শেষ হবার আগেই আরো কয়েকজন এসে হাজির। বব্বু বেগম, তক্কি বেগম, পেশমন বেগম, সবাই এসে ঢুকে পড়েছে মরালীর ঘরে। সবাই খবর পেয়ে গেছে নবাব চেহেল-সুতুনে আসছে মরিয়ম বেগমের সঙ্গে দেখা করতে। সবাই হিংসে করছে আজ তাকে। সবাই দেখতে এসেছে নবাব চেহেল-সুতুনে আসবে বলে কী সাজ করেছে মরিয়ম বেগম, কী পোশাক পরেছে। আজ যদি নবাবের ভালো লেগে যায় মরিয়ম বেগমকে তো আজ অনেক মোহর পাবে সে, অনেক টাকার মালিক হয়ে যাবে। মরালীও আজকে সবাইকে মুখোমুখি প্রথম দেখলে।

কিন্তু নানীবেগমই বাদ সাধলো। বলা-নেই-কওয়া-নেই হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়েছে।

চুকেই বললে—তুম সব ইঁহা ক্যা? তুম যাও ইঁহাসে, সব নিকলো—নিকলো—

সকলকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে নানী-বেগম। ফিরে বাঁদীকে ডাকলে। জুবেদাকে খালাস করে দেবার পর মরিয়ম বেগমের জন্যে নতুন বাঁদী এসেছে, তাকে ডাকলে। ডেকে মরালীকে সাজাতে বসলো। মীর্জা আসবে জেহেল-সুতুন এতদিন পরে, তবু যদি তার মন ভোলে। তবু যদি মরিয়ম বেগমের দিকে ফিরে চায়। তবু যদি মরিয়ম বেগমকে দেখে মনে শান্তি পায়। সুখ পায়। দিদিমার প্রাণ। মীর্জার এতটুকু সুখ শান্তি দেখলে তবু দিদিমার প্রাণটা জুড়োবে। সেইখানে বসে বসে মরালীকে প্রাণ ভরে সাজাতে বসলো।

মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা জন্মেছিল ১৭৩০ সালে। কিন্তু আর এক দেশে, আর এক ভূখণ্ডে জন্মেছিল আর একটি ছেলে। তার জন্মের তারিখ ১৭২৫। শুধু পাঁচটা বছরের তফাত। তার নাম রবার্ট ক্লাইভ। ইংলণ্ডে স্রপশায়ারের বাজারের সেই ছেলেটাই যে একদিন কুড়ি বছর বয়েসে মাদ্রাজে এসে জাহাজ থেকে নামবে, তা তার বাপও জানতো না, তার গর্ভধারিণীও জানতো না। দুবার

পিস্তল নিয়ে নিজের বুক তাগ্ করে ঘোড়া টিপেছিল সেই ছেলে. কিন্তু গুলি বেরোয়নি। সেদিন সে-গুলি বেরিয়ে ক্লাইভের বুকে বিঁধলে আর উদ্ধব দাসকেও 'বেগম মেরী বিশ্বাস' লিখতে হয় না. আমাকেও এই সপ্তাহের পর সপ্তাহ উপন্যাস লিখে আপনাদের জ্বালাতন করতে হয় না। মাস-কাবারি ছ' টাকা মাইনের চাকরি। বিদেশ-বিভুঁইতে এসে এর চেয়ে ভালো চাকরি করবার বিদ্যেও নেই তার, বুদ্ধিও নেই। অন্তত বাপ-মায়ের তাই মনে হয়েছিল। বখাটে হয়ে যে জন্মেছে, তার কপালে ভবিষ্যতে এই ছাই-ই থাকে। তার চেয়ে এই-ই ভালো। এই ছ' টাকা মাইনে আর এই জল-জঙ্গল-মশা-মাছির দেশ। সারা দিন কোম্পানীর আপিসে কলম পেষো, হিসেব-পত্তর রাখো, আর রাত্তির হলে কুঠি-বাড়ির এক কোণে নাক ডাকিয়ে ঘুমোও। কিন্তু শান্তি যার কপালে নেই, তার কোথাও গিয়েই শান্তি নেই। নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে এসেও তার যেন ঝগড়া করা স্বভাব গেল না। আশে-পাশের সবাই যেন তার শত্রু। কেউ দেখতে পারে না ছেলেটাকে। ওপরওয়ালা কর্তারা সবাই বলে—
—ওয়ার্থলেস্।

ছেলেটা শোনে, শুনে রেগে যায়, রেগে গিয়ে ঝগড়া করে। হোম-বোর্ডে তার নামে কর্তারা কমপ্লেন করে। সে চিঠি এখান থেকে বিলেতের কর্তাদের হাতে পৌঁছতে ছ'মাস লাগে, উত্তর আসতেও আবার ছমাস। কিন্তু ততদিনে ছেলেটা বুঝে নিয়েছে ইন্ডিয়ার মানুষের হৃদ্‌-চক্র। বুঝে নিয়েছে ইন্ডিয়ার ক্লাইমেট। বুঝেছে এদেশে সে এদেশে চাকরি করা তার চলবে না। এখানে এসে ভুল করেছে সে। এখানে এসে একদিন চিঠি লিখেছিল দেশে I have not enjoyed a happy day since I left my native country! শেষকালে ইতিহাসের ভাগ্য-বিধাতা ইন্ডিয়ার এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করলে, যার পর ছেলেটা আর চুপ করে থাকতে পারলে না, আগুনের কুণ্ডলীর মধ্যে সশরীরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো।

তা সে আগুনই বটে। ১৭০৭ সালে বাদশা আওরংজেবের মৃত্যুর পর থেকে সারা দেশে বলতে গেলে আগুনই জ্বলে উঠলো। সে আগুন আর নিভলো না। তারপর যখন ১৭৩৯ সালে নাদির শা দিল্লীর বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে, মোগল বংশের নাভিশ্বাস শুরু হলো বলতে গেলে সেই তখনই। বলতে গেলে মোগল-সাম্রাজ্য তখনই চিরকালের মত খতম্ হয়ে গেল। দক্ষিণে দুটো বড় ভূখণ্ড, কর্ণাটক আর দাক্ষিণাত্য। দুটোতেই তখন থেকে শুরু হলো বংশানুক্রমিক সুবাদারগিরি। নিজাম-উল-মুলক আর কর্ণাটের নবাবের মত বাঙলা দেশেও সেই নিয়ম চালু হয়ে গিয়েছে ততদিনে। অর্থাৎ জোর যার মুলুক তার। সুবাদার, নবাব, জায়গীরদার, ডিহিদার থেকে পাহারাদার পর্যন্ত সবাই লুটে-পুটে খাবার জন্যে মারমুখী হয়ে বসে আছে আর তলোয়াল শানাচ্ছে। ক্ষেতে ধান থাকতেও নিশ্চিন্ত থাকবার উপায় নেই। ঘরে সুন্দরী বউ রেখেও নিশ্চিন্ত থাকবার অবস্থা নেই কারো।

ছেলেটা কিন্তু ততদিনে বেশ কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে উঠেছে। লড়াই করে অদ্ভুত সাহস দেখিয়ে নাম কিনেছে বেশ। হৈ-চৈ পড়ে গেছে পার্লামেন্টে। কে এই রবার্ট ক্লাইভ? না, এ সেই ছ' টাকা মাইনের রাইটার। পল্টনের দলে নাম লিখিয়ে রাতারাতি একেবারে সকলের নজরে এসে গেছে। এক-একটা লড়াই করে আর জয়-জয়কার পড়ে যায় তার। ডাকো, ডাকো এখানে, ডেকে পাঠাও ওকে। সেই ছেলেকে দেশে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে একেবারে সবাই মাথায় তুলে নিয়ে নাচলো। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে। হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

নাম ধাম তো হলো। টাকাও হয়েছে বেশ। কিন্তু মানুষের কি লোভের শেষ আছে?

ইতিহাসের অমোঘ বিধানে যাকে একদিন চিরস্মরণীয় হতে হবে, তার কপালে বুঝি অত সহজে শান্তি আসে না। তাকে সুখ শান্তি ঘুম আরাম কিছুই পেতে নেই। সে সব সাধারণ মানুষের জন্যে। বাঙলার নবাবের চেয়ে যে পাঁচ বছর আগে পৃথিবীতে এসেছে, তাকেই এখানে এসে মুখোমুখি মুলাকাত করতে হবে আবার তারই সঙ্গে. এই-ই যদি বিধান হয়ে থাকে তো হোক। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। নিজের দেশে যার সম্মান নেই, তার বিদেশে যাওয়াই ভালো।

যে-দেশে সে এতদিন কাটিয়ে গেছে, যে জলহাওয়ায় সে এত লড়াই করে গেছে, যেখানকার মাটিতে সে নিজের প্রতিষ্ঠা করেছে নিজের হাতে সেখানেই তার গতি হোক।

যেদিন আবার ছোলেটো করমণ্ডল উপকূলে জাহাজ থেকে নামলো আবার সেইদিনই কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে ফিরিঙ্গিরা। ঠিক সেই একই দিনে। সেই ২০শে জুন ১৭৫৬ সালে। এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ ইতিহাসের।

ভালো করে নবাবের গায়ের ঘাম তখনও শুকোয়নি। একটু যে জিরিয়ে নেবে নবাব, একটু যে ফূর্তি করবে, একটু বিশ্রাম করবে চেহেল-সতুনে গিয়ে, তারও সময় দিলে না নবাবের খোদাতালা।

নবাব আবার দরবারে গিয়ে বসলেন। দেওয়ান মানিকচাঁদের চিঠিটা নিয়ে পড়লেন—

দেওয়ানজী লিখেছে—আমাদের চরের মুখে খবর পেয়েছি, ফিরিঙ্গিরা ফলতার কাছে গিয়ে জাহাজ নোঙর করে ছিল এতদিন। এবার খবর পেলাম মাদ্রাজের সেণ্ট ডেভিড কেল্লা থেকে কোম্পানী মেজর কিলপ্যাট্রিক বলে এক ফিরিঙ্গিকে পাঠিয়েছে আমাদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে। আর একজন ফিরিঙ্গি আসছে, তার নাম রবার্ট ক্লাইভ! আমার মনে হয়, যুদ্ধের জন্যে আমাদের তৈরি থাকতে হবে।

শেষে লিখেছে—সঙ্গে ওয়াটসন নামক আরো একজন ফিরিঙ্গি যোদ্ধা আসিতেছে। সত্য-মিথ্যা জানি না। চরের মুখের সংবাদ। কিন্তু সত্য হউক বা না-হউক, ফিরিঙ্গি কোম্পানী যে বসিয়া নাই ইহা তাহারই প্রমাণ। তাহারা আট-নয়শত ফিরিঙ্গি পল্টন এবং এক হাজার সিপাহি সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিয়াছে। আমি তাহাদের অগ্রগমনে বাধা দিবার মনস্থ করিয়াছি। এখন যাহা কর্তব্য হয় জানাইতে আজ্ঞা হয়। ইনি—বশংবদ...

ইব্রাহিম খাঁ তখনও হাঁফাচ্ছিল। বুড়ো মানুষ। কান্তকে বললে—তুমি চলে যাও বাবাজী, ও যা হবার তা হবে—যে-যার কপাল নিয়ে এসেছে সংসারে। তুমিই বা কী করবে, আর আমিই বা কী করবো—

কান্ত যাবার আগে বলে গেল—আপনি যেন কাউকে বলবেন না পুরকায়স্থ মশাই—

পুরকায়স্থ মশাই বললে—না না, আমি কেন বলতে যাবো বাবাজী! আমার কী? যার চরিত্র খারাপ হবে তার চরিত্র খারাপ হবে। ভালোই হয়েছে বাবাজী, ও-কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়নি, নষ্ট-চরিত্রা কন্যার পাণি-গ্রহণ পাপ। সে-পাপে সে নিজেও মরে, অপরকেও মারে—তুমি কিছু ভেবো না, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য—

কান্ত চলে যাবার পর ইব্রাহিম খাঁ সরাবখানার মধ্যেই বসে ছিল নাকে কাপড় চাপা দিয়ে। হঠাৎ যেন অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরবার শেষ হয়ে গেল নাকি তবে! সবাই যাচ্ছে কোথায়?

কিন্তু না। পায়ের শব্দটা আসছে বাইরের দিক থেকে। একটু উঁকি মেরেই দেখতে পেলে। জগৎ শেঠজীর তাঞ্জাম এসে চবুতরে নামলো। সঙ্গে পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজ। জগৎ শেঠজী তাঞ্জাম থেকে নেমে সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

মতিঝিলের দরবারে কতবার এসেছেন জগৎশেঠজী। তাঁর আসা এই প্রথম নয়। কিন্তু এবার যেন জরুরী তলব দিয়েছে নবাব। নবাব-বাদশার ব্যাপার। তার মধ্যে চুনোপুঁটি সচ্চরিত্র পুরকায়স্থর সমস্যা নিয়ে কে মাথা ঘামাবে। খুড় আরামে আছে সব। খাচ্ছে দাচ্ছে ফুর্তি করছে, আর বেগমদের নাচ দেখছে গান শুনছে। টাকার কথাও ভাবতে হয় না, কেমন করে পেট চলবে তাও ভাবতে হয় না।

হঠাৎ নেয়ামত খাঁকে যেতে দেখে ইব্রাহিম জিজ্ঞেস করলে—খেদমদগারজী, আজ যে দারু খাচ্ছে না কেউ, কী হলো? কেউ মদ খাবে না?

—আরে দূর বুড়ো! এখন সব মাথা-গরম হয়ে রয়েছে, এখন দারু খাবে কে!
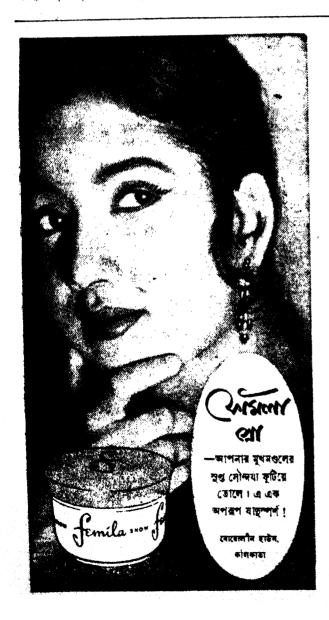
—কেন? মাথা-গরম কীসের? নবাব বাদশাদের আবার মাথা-গরম কীসে হলো?

নেয়ামত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলে গেল—তুই বুঝবিনে বুড়ো, জগৎশেঠজী এসেছে, নবাব রেগে একেবারে সব তুল-ক্রাম করে দিচ্ছে, এখন চুপ কর—

বলতে বলতে সোজা ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দরবারের ভেতরে তখন নবাব চিৎকার করছেন মহতাপচাঁদ জগৎশেঠের দিকে চেয়ে—তাহলে আপনি কী করতে আছেন? বাদশার সনদ এনে দেওয়া তো আপনার কাজ! এতদিন আপনি আমাকে বাদশার সনদ এনে দেননি কেন?

সত্যিই এতদিন এ-জিনিসটার দিকে কারো নজর পড়েনি। পূর্ণিয়ার শওকত জঙ্গ দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে উজীর-এ-আজম-এর সিল-মোহর করা সনদ এনে ফেলেছে। সেই সনদের জোরে শওকত জঙ্গ কড়া চিঠি লিখেছে নবাবকে। সে-চিঠি তখনও নবাবের হাতে। সেই চিঠি পেয়েই নবাব অপমানে ছটফট করতে করতে মহতাপ জগৎশেঠকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

—এতদিন নবাব হয়েছি, সনদ আনতে এত দেরি হচ্ছে কেন? এই দেখুন শওকত কী লিখেছে আমাকে—লিখেছে 'আমি স্বনামে বঙ্গ-বেহার-উড়িষ্যার সুবাদারি-পদের বাদশাহী সনদ পাইয়াছি। কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতা, তোমার প্রাণ-বধের ইচ্ছা করি না। তুমি তোমার ভরণ-পোষণ জন্য ঢাকা প্রদেশের যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারো, তোমার প্রার্থনা মত ইহার জন্য সনন্দ প্রদত্ত হইবে। ইতিমধ্যে রাজ-কোষ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমার কর্মচারি-গণকে বুঝাইয়া দিয়া ঐ অঞ্চলে চলিয়া যাইবে। অতি শীঘ্র এই পত্রের উত্তর পাঠাইবে। আমি রেকাবে পা তুলিয়া উত্তরের অপেক্ষা করিতেছি।' এর পর বলুন আপনার কী বলার আছে?

মহতাপ জগৎশেঠ বললেন—জাঁহাপনার যা-অভিরুচি তাই-ই করবেন।

—কিন্তু নবাব-সুবাদার আমি, না শওকত জঙ্গ!

—আপনি, জাঁহাপনা, আপনি, আপনিই বাঙলা-বেহার-উড়িষ্যার নবাব-সুবাদার।

—কিন্তু তাহলে এতদিন আমি কীসের জোরে নবাবিআনা করছি? আমার সনদ কোথায়? সনদের কথাটাও কি আপনাকে আমায় মনে করিয়ে দিতে হবে? আপনারা কি আমাকে এটুকু সাহায্যও করবেন না? আপনারাই তো আমার বল-ভরসা। আপনারা যদি সহায় না হন তো আমি কার ভরসায় দেশ-শাসন করবো?

জগৎশেঠ বললেন—সনদ আনতে তো মোহর লাগবে—নজরানা লাগবে!

—তা লাগবে লাগবে। যা লাগে তা তো আপনারই দেওয়া কাজ। কত মোহর লাগবে, কী কী নজরানা দিতে হবে, সে তো আপনিই জানেন। আপনারাই তো বরাবর সনদ আদায় করে এনে দিয়েছেন। তেমনি আমার বেলাতেও দেবেন। আমি কি সে-সব কথা নিয়েও মাথা ঘামাবো?

—কিন্তু সে অনেক টাকা।

—অনেক টাকা লাগলে অনেক টাকাই দেবেন!

মহতাপ জগৎশেঠ উত্তরে অনেক কথাই বলতে পারতেন, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—তাতে প্রজাদের ওপর অত্যাচার হবে—

সঙ্গে সঙ্গে নবাবের রক্ত টগ-বগ করে ফুটে উঠলো। সামনে তেড়ে এগিয়ে গিয়ে বললে—কী...?

ইব্রাহিম শুধু দেখেছিল সিঁড়ি দিয়ে কে যেন দুম্-দুম করে নেমে গিয়েছিল। তারপর ভাল করে চেয়ে দেখেছিল নেয়ামত! আর কিছু জানতে পারেনি সে!

চেহেল-সুতুনে তখন মরিয়ম বেগমকে মনের মতন করে সাজিয়ে তুলেছে নানী-বেগম। কত রকমের গয়না পরিয়েছে। হীরে-মুক্তোর ছড়াছড়ি। চোখে সুর্মা দিয়েছে, কানে আতর। কোনও গয়নাটারই নাম জানে না মরালী। বাপের জন্মেও কখনও এসব দামী সৌখীন জিনিস দেখেনি। হাতীর দাঁতের আয়নাটা নিয়ে বাঁদী মুখের সামনে ধরেছে। নিজেকে যেন তার সুন্দরী মনে হলো বড়। নিজেকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করলো তার।

নানীবেগম দেখে শুনে বললে—এবার পায়জোড় পরিয়ে দে বেগমসাহেবাকে—

বাঁদীটা তাই-ই পরাতে যাচ্ছিল।

মরিয়ম বেগম বললে—আবার পায়জোড় পরে কী হবে নানীজী, আমার অভ্যেস নেই, পড়ে যাবো শেষকালে—

নানীবেগম বললে—তা হোক মা, পরো, মীর্জা এখনই এসে যাবে—সারা দিন-রাত ধরে দরবার করে খেটে-খুটে মেজাজ গরম করে আসছে, তোমাকে খুবসুরত দেখলে তবু মনটা জুড়োবে বাছার। মীর্জাকে তুমি ভয় কোর না মা, তোমার মনে যা আছে সব খুলে বলবে। তোমার সোয়ামীর কথা বলবে, তোমার সতীনের কথা বলবে, কেমন করে ডিহিদার পরওয়ানা পাঠিয়েছিল, তাও বলবে—। কোনও কথা লুকোবে না। দেখবে, বাছা তোমার কথা সমস্ত মন দিয়ে শুনবে—

—কিন্তু যদি রেগে যান?

—রাগবে কেন মা? লোকে অন্যায়

—কাঁদলেই মীর্জা রেগে যায়, নইলে কেন মতি-ঝিলে উৎপাত করবে মানে তোমার ওপর? তুমি কী অপরাধ করেছ? তোমার তো কোনও কসুরই নেই! লোকের মুখে মীর্জার বদনাম শুনে কষ্ট হয়, সে-সব তো বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলা!

—তা সবাই ওর নামেই বা বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলে কেন?

—বলবে না? বড় হলেই সে লোকের নজরে পড়ে। যাকে-তাকে গালা-গাল দিয়ে তো আরাম হয় না মা! বড়কে গালাগাল দিয়েও যেমন ভাল লাগে, বড়র গালাগাল শুনেও তেমনি ভাল লাগে!

তারপর একটু থেমে বললেন—তুমি যদি না হাঁসুলিগঞ্জে ফিরে যেতে চাও, সেও বলবে, আবার যদি সে না-চাও তো তাও বলবে মীর্জাকে। আর যদি তুমি চাও যে কোথাও একলা থাকবে নিরিবিলি ... সে-ব্যবস্থাও করে দেবে আমার মীর্জা। বড় দরদী শরীর। তোমার জীবনটা যখন মীর্জার জন্যে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, তখন তো মীর্জারই সব দায়িত্ব। জমি-জায়গা ইজারা দিয়ে তোমাকে কুঠি বানিয়ে দেবে, তুমি সেখানেই তোমার নিজের সংসার পাতবে, সেই-ই তো ভালো। তোমাকে এ চেহেল-সতুনেও থাকতে হলো না, সোয়ামীর সংসারে যেতে হলো না—আর একটা কথা...

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই নেয়ামত দৌড়তে দৌড়তে এসেছে।

—বন্দেগী নানীবেগমসাহেবা।

—কী রে নেয়ামত? মীর্জা আসছে?

—না বেগমসাহেবা! নবাব খবর ভেজিয়েছে আজ চেহেল-সতুনে আসতে পারবেন না।

—কেন? কী হলো? আবার কী খবর এল?

—জগৎশেঠজীকে নবাব চড় মেরেছেন গোসা করে।

—সে কী রে? কেন? কী করেছে জগৎশেঠজী? নানীবেগম হায়-আফসোস করে উঠলো।

—জগৎশেঠজী নবাবের মুখের ওপর কথা বলেছিল। তাই জগৎশেঠজীকে নবাব গ্রেফতার করে রেখে দিয়েছেন মতিঝিলে। ওকে ফাটকে পাঠানো হবে।

নানীবেগম দাঁড়িয়ে উঠলেন। যেন মাথায় বজ্রাঘাত হলো তাঁর।

—সেখানে আর কে কে আছে?

—সবাই আছেন বেগমসাহেবা। মীরজাফর সাহেব, রাজা দুর্লভরাম, মীর বক্সী মোহনলাল, মীরমদন সাহেব, মেহেদী নেসার সাহেব, সবাই আছে—

—মীর্জা কী বলছে?

—বেগমসাহেবা, মীরজাফর সাহেব নবাবকে বলেছে বাদশাহী সনদ না-পেলে নবাবের তরফে আর কেউ থাকবে না—

নানীবেগম আর শুনতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি বললেন—আমার তাঞ্জাম সাজাতে বল্, আমি মীর্জার সঙ্গে দেখা করতে যাবো মতিঝিলে। মীর্জার কপালে কি এক দিনের জন্যে শান্তি থাকতে নেই—

বলে মরিয়ম বেগমের দিকে চেয়ে বললেন—তুই একটু অপেক্ষা কর মা, আবার এক গণ্ডগোল বাধিয়ে বসেছে মীর্জা, একটা দিনের জন্যে ওকে শান্তি দেবে না কেউ। কী কাণ্ড করে বসলো! জগৎশেঠজীকে চড় মেরে বসেছে, রেগে গেলে ওর জ্ঞান থাকে না ছোটবেলা থেকে—কী যে করি ওকে নিয়ে—

বলে বাইরে গেলেন ছুটে। পিছে আমিনা বেগমের ঘরে ঢুকলেন। বললেন—শুনেছিস, জগৎশেঠজীকে চড় মেরেছে মীর্জা, মেরে ফাটকে পুরে রেখেছে—মীর্জা আজ চেহেল-সতুনে আসছে না—

আমিনা বেগম তখন বোধহয় নিজের কারবারের হিসেব-পত্র দেখছিল। মুখ তুলে বললে—তুমিই দেখ, আমার ও-সব দেখা আছে, তোমরাই আদর দিয়ে ওকে ছোট-বেলা থেকে নষ্ট করে দিয়েছ—এখন বললে কী হবে?

বলে আবার অফিসের হিসেবের কাগজপত্রের মধ্যে মাথা গঁুজে দিলে।

নানীবেগম তখন গেলেন লুৎফুন্নিসার ঘরে।

—সর্বনাশ হয়েছে বহু, জগৎশেঠজীকে চড় মেরেছে মীর্জা, ফাটকে আটকে রেখেছে তাকে, জাফর সাহেব বলেছে মীর্জার দলে আর থাকবে না! মীর্জা খবর পাঠিয়েছে সে আজ চেহেল-সুতুনে আসছে না। এখন যাবি? যাবি মা তুই মতিঝিলে? তা তুই গিয়েই বা কী হবে! তোর কথা তো ভারি শোনে সে। আমি একলাই যাই, দেখি জাফর সাহেবকে বলে-কয়ে ঠান্ডা করতে পারি কি না—আমার হয়েছে বুড়ো বয়েসে এক জ্বালা—

বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নানীবেগম। লুৎফুন্নিসা বেগম একটা কথারও উত্তর দিলে না। শুধু পাথরের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। আর মরালীর ঘরে মরালীও তখন আস্তে আস্তে গয়নাগুলো সব খুলে ফেলতে লাগলো একে একে। হঠাৎ তার যেন কাঁদতে ইচ্ছে করলো প্রাণ ভরে।

মনসুর আলি মেহের সাহেবের দপ্তরে যথারীতি কান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। কাজ না থাকলে নিজামত-কাছারিতে একবার করে হাজরে দিতে হয়। যদি কোথাও কাজ থাকে তো জেনে নিতে হয়, আর নয় তো হাজরে দিয়েই বাড়ি। সেই যে হাতিয়াগড় থেকে আসার পর আর কোনও কাজ পড়েনি তার ভাগে।

রোজই আসছিল কাছারি থেকে। এসে সেই সারাফত আলির দোকানে ঢোকা। কিন্তু সারাফত আলিকেও যেন আর ভালো লাগতো না। বাদশার কাছে সেই নবাবের হুকুম শোনবার পর থেকেই যেন মনটা বিরস হয়ে গেছে মিয়াসায়েবের ওপর।

নিজামত কাছারির সবারই যেন কেমন একটু ব্যস্ত-ব্যস্ত ভাব। যেন অন্যদিনের চেয়ে বেশি তাড়াহুড়ো। কারো কথা বলবার সময় নেই।

সবে ফটকের কাছে এসেছে হঠাৎ বশির মিয়ার সঙ্গে দেখা। একেবারে হন্তদন্ত হয়ে ছুটেছে। কান্তকে দেখতেই পায়নি। তারপর কান্তই ধরলে গিয়ে—কী রে, কোথায় যাচ্ছিস?

বশির বিরক্ত হয়ে উঠলো—তোর জন্যেই তো যত গন্ডগোল, তুই একেবারে সকলকে বিপদে ফেলেছিস।

—আমি? বিপদে ফেলেছি? কাকে?

—আবার কাকে? সকলকে। মেহেদী নেশার সাহেব ভীষণ গোসা করেছে আমার ওপর। যাকে তাকে নোকরি দিয়েছি বলে আমাকে মুখ-খিস্তি করে গালাগাল করলে। আমার ফুপা মনসুর আলি সাহেব পর্যন্ত আমাকে খামোখা যা-তা বললে। তোর জন্যে আমার পর্যন্ত বদনাম হয়ে গেল। আমি এত তকলিফ করে জাফর আলি সাহেবের চিঠি বেহাত করে নিয়ে এলুম, তবু সাবাস পেলুম না কারো কাছ থেকে। তুই আমার কী সব্বোনাশ করলি বলতো!

তবু কান্ত কিছু বুঝতে পারলে না কী তার অপরাধ।

বশির বললে—এখন তোর জন্যে আমাকে আবার হাতিয়াগড় যেতে হচ্ছে—

—হাতিয়াগড়? কেন?

—আরে রেজা আলি যে ধরে ফেলেছে সব।

—কী রকম?

—আরে হাতিয়াগড়ের জমিদার সাহেব বিলকুল সব ঠকিয়ে দিয়েছে মেহেদী নেসার সাহেবকে। রানীবিবি বলে যাকে চেহেল-সুতুনে পাঠিয়েছে, ও তা আসলি রানীবিবি নয়! আসলি রানীবিবিকে তো নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে। আর নিজের একটা নফর ছিল তার লেড়কিকে রানীবিবি বলে চালিয়ে দিয়েছে। রেজা আলির চর সব খোঁজ-খবর নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে নিজামতে। শালা মেহেদী নেসার সাহেব আমার ফুপাকে তলব দিয়েছিল, আমাকে তলব দিয়েছিল। দুজনকেই আচ্ছা করে গালাগালি দিলে, আমাকে জিজ্ঞেস করলে কে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, আমি বললুম তোর নাম—

—আমার নাম বলে দিলি?

বশির মিয়া বললে—হাঁ, বলে দিলুম। শুনে তোকেও খুব আচ্ছা করে গালাগালি দিলে। এখন আমি যাচ্ছি হাতিয়াগড়ে দেখি কী হয়—

বলে আর দাঁড়ালো না। হন হন করে সোজা বাইরে বেরিয়ে গেল বশির মিয়া। আর ফিরেও একবার তাকাল না, দাঁড়িয়েও থামলো না। (ক্রমশ

ওয়াটারপ্রুফ অক্সফোর্ড ৬.৭৫
বর্ষার
পথে
ভরসা
দিলবাহার ৭.৭৫
ওয়াটারপ্রুফ নিউকাট ৫.৭৫
বৃষ্টি ধোয়া পথে সমস্যা শুকনো
পায়ে চলা। এই সমস্যার সমাধান
বাটার ওয়াটারপ্রুফ জুতো। এই ধরনের
জুতোর প্রয়োজন উৎকৃষ্ট রবার,
বাটার জুতোয় তা পাবেন।
আরামের জন্য জালি কাপড়ের
লাইনিং। সোল আর হিল্-এ
এমন নকশার কৌশল যা পারতপক্ষে
হড়কাবে না। তাছাড়া, রকমারি রঙ...
জলে ভিজুক, কাদা লাগুক,
একবার ধুলেই কেনার প্রথম
দিনের মতো আনকোরা, ছিমছাম।
Bata

শিশুরংমহলের বিদেশ পরিক্রমা

সমর চট্টোপাধ্যায়

ছেলেবেলা এক আশ্চর্য সময়। ছেলেবেলাকার রঙিন মন মূলধন করে ছাব্বিশজন ছেলেমেয়েকে নিয়ে গত ৮ই মে শিশু-রংমহলের বিদেশ যাত্রা। ভারত পরিক্রমা এই শিশুর দল অনেকবারই করেছে। কিন্তু ইয়োরোপ? এ এক অপরিসীম বিস্ময়।

হাওড়া থেকে বহু স্বজন ও অপরিচিত শুভানুধ্যায়ীদের আশীর্বাদ নিয়ে পৌঁছলাম দিল্লি। স্টেশনে সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারের ভিড়। অনেক প্রশ্ন—কম উত্তর। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে সি এল টি। পারবে তো দেশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আন্তর্জাতিক শিশুরংমহল সভার আসরে? যদি পারে তবে ফিরে এসে কলরব করা যাবে; যদি না পারে অনেক লজ্জা মাথায় নিয়ে নিঃশব্দেই থাকতে হবে।

১০ তারিখে সি এল টির সভাপতি যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের বাড়িতে পার্টি। হঠাৎ খবর এল পণ্ডিত জওহরলালের সিকিউরিটি অফিসার দেখা করতে চান। ১১ তারিখের "সঙ অফ ইণ্ডিয়া" দেখতে প্রধানমন্ত্রী আসবেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হল সবাই। প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান শারীরিক অসুস্থতায় একান্ত অপ্রত্যাশিত সংবাদ।

১১ তারিখে এ-আই-এফ-এ-সি-এস হল মুখরিত। প্রধানমন্ত্রী, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং আরো অনেক ক্যাবিনেট মন্ত্রী সমাগত। সি এল টির সভাপতি শ্রীঅশোক সেনের বক্তৃতার পর স্বপ্নের মতই "সঙ অফ ইণ্ডিয়া" শুরু ও শেষ হল। উচ্ছ্বসিত চাচা নেহরু আশীর্বাদ করলেন। শুধু বললেন "যাও ইয়োরোপে এ ছন্দ দেখাও, গান শোনাও। কে জানতো সি এল টির "সঙ অফ ইণ্ডিয়ার" সঙ্গেই পণ্ডিতজীর শেষ সাক্ষাৎ। পরেরদিন দিল্লি পত্রিকায় অকুণ্ঠ প্রশংসা। বিশেষ শো-টিতে মন্ত্রিসভার সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সহযোগিতা ও উৎসাহ পাথেয় করে ১৩ই মে সন্ধ্যায় শিশুরংমহল পালাম বিমান বন্দর ত্যাগ করল। এয়ার ইণ্ডিয়ার বোয়িং ৭০৭এ। বম্বেতে কাস্টমস-এর গণ্ডি পার হবার আগে শিশুরংমহলের সুহৃদ শ্রীঅতুল্য ঘোষ বাচ্চাদের আশীর্বাদ করলেন। এয়ার ইণ্ডিয়ার "নাঙ্গা পর্বত" চলল লণ্ডনের পথে।

পরের দিন ১৪ই মে বেলা ১১-৩০ মিঃ লণ্ডন এয়ারপোর্ট। ওপরতলার হাত নাড়ার ধুম। নামতেই এগিয়ে এলেন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের ডাঃ তারাপদ বসু ও যুগান্তরের শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী। ছবি তোলার পর কাস্টমস-এর গণ্ডি পার হয়ে আমরা ডাঃ অমিয় বিশ্বাসের সুযোগ্য সহকারী শ্রীমান বিধান বসুর হাতে পড়লাম।

সেখান থেকে কোচে করে "টি সেন্টারে"। চেনাজানা লোকের মিছিল। বাচ্চারা নানা বাড়িতে থাকবে—আত্মীয়ের সঙ্গে। এত বাঙালী আছে লণ্ডনে? কোচে করেই বাচ্চাদের বিভিন্ন বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হল। ঘড়িতে ৭টা। কিন্তু তখনও প্রচুর আলো। বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতে পার্টি। অনেক সাংবাদিক অনেক অভ্যাগত। আলোচনা হল লণ্ডনের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে। ইণ্ডিয়া হাউসে শ্রীনির্মল সেনগুপ্তর সঙ্গেও পরামর্শ হল। প্রোগ্রাম অত্যন্ত জটিল। ছয় দিন অবস্থান, পাঁচটি অনুষ্ঠান। তাও বিভিন্ন স্থানে। তার ওপর আন্তর্জাতিক সভায় যোগদান? সুখের বিষয় সি এল টি পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতী সুর লণ্ডনে। তাঁর দ্বারা কিছু ভার লাঘব হবে হয়তো।

প্রথম অসুবিধে হল পরস্পরের সাথে যোগাযোগ। ছাব্বিশজন শিশু ও আটজন কর্মকর্তারা একেবারে বৃহত্তর লণ্ডনের চারিদিকে ছড়ানো।

ঠিক হল বড়রা প্রত্যহ বেলা ৯টায় প্রেক্ষাগৃহে মিলবেন এবং রাত ১১টায় অনুষ্ঠানের পর গৃহে ফিরবেন। ছোটরা বেলা তিনটেয় আসবে এবং অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর ঘরে ফিরবে।

লণ্ডনের কটিদিন শিশুরংমহলের এক বিস্ময়কর অবস্থান। চারিদিক থেকে বাচ্চারা এসে মিলছে বেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে। তারপর করতালিধ্বনি না থামতেই সবাই অদৃশ্য; শুধু কটি কর্মকর্তা ছাড়া। মহিলারা সাজসজ্জা গুছিয়ে তুলছেন। পরদিন দশ মাইল দূরে আবার নতুন করে দৃশ্যপট সাজাতে হবে। লণ্ডন দেখা? হয়নি। আসা যাওয়া করতে লোকের মিছিল ও ঘরবাড়ি দেখা—ব্যস্ এইটুকুই। এ ছদিনের কথা

কিউ উদ্যানে শিশুরংমহলের সঙ্গে লণ্ডনের বন্ধুরা

ফ্লের সমারোহ—শিশু ও শান্তি। হ্যাম্পটন কোর্ট। ইংলণ্ড।

লিখতে একটি ছোট্ট মহাভারত হবে তাই সে চেষ্টা করবো না। কিন্তু যে কটি বাঙ্গালী ছেলে এই কদিন বাচ্চাদের দেখাশুনো করেছে এবং তাদের নিয়ে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছোটাছুটি করেছে তারা নমস্য!

১৫ই মে "সেণ্টপ্যানক্রাস হলে" সঙ অফ ইণ্ডিয়া। প্রেক্ষাগৃহে তিল ধরবার স্থান নেই। ডাঃ জীবরাজ মেটা উদ্বোধন করলেন। সঙ অফ ইণ্ডিয়া শুরু হল—শেষও হল। ভারতবর্ষে করতালিধ্বনি স্তিমিত থাকে। আজও ঠিক বোঝা যায় না করতালি দেওয়া উচিত কি উচিত নয়। কিন্তু লণ্ডনে? থামতেই চায় না। একটি ছোট্ট "স্টার" এসে বলল—"সমবনা, বোধ হয় পছন্দ হয়নি বলেই অত জোর করতালি, নয়?" ঠিক মিথ্যে নয়। করতালি দিয়ে শিল্পীকে তুলে দেওয়া ওরা দেখেছে। সুতরাং!

"সেণ্টপ্যানক্রাস" এই সি এল টির প্রতিষ্ঠা। ডাঃ মেটা বললেন, "আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এমন করে বিদেশে কেউ ভারতবর্ষকে তুলে ধরেনি। আমার দুঃখ যে, ডিপ্লোম্যাটিক অভ্যাগতদের এ অনুষ্ঠান দেখাতে পারলাম না!"

গ্রীনরুমে লোকারণ্য। অগণিত ক্যামেরা সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে ঝলসে উঠছে। কথা বলবার সুযোগ কোথায়? এখুনি আবার ঘরে ফিরতে হবে—সে কত দূরে! স্টেটসম্যানের জেমস কাউলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমি নির্বাক থাকতেই চাই—তবুও শুধু বলব এ মরে যাবার আগে দেখার মত।" যাদের নিয়ে এত কাণ্ড তারা তখন "টিউবে" বাসে অদৃশ্য।

পরের দিনের অবস্থা আরও ভয়াবহ। বেলা ২টোতে বি বি সি স্টুডিওতে টেলিভিশন এবং ৬-৩০ মিঃ কমনওয়েলথ ইনস্টিট্যুটে পৃথিবীর ৪০টি দেশের ডেলিগেটের উপস্থিতিতে "মিঠুয়া" ও "অবনপটুয়া"। কর্মকর্তা সাকুল্যে দুটি মহিলা ও দুটি পুরুষ। মাত্র ১৫ মিনিটের রিহার্সেলে এক অপূর্ব টেলিভিশনের ছবি। স্টুডিও ম্যানেজার অবাক। সাধারণত দুই থেকে তিন ঘণ্টা লাগে পাঁচ মিনিটের শটে। পাঁচটায় কেনসিংটনে ফিরে ৬-৩০ মিঃ মিঠুয়া শুরু হল। সি এল টির স্টেজ-ম্যানেজার সেটটি অবধি তুলেছেন "লণ্ডন ইস্কুল অফ ড্রামার" ছেলেদের সহায়তায়।

কমনওয়েলথ ইন্সটিট্যুটে কনফারেন্সের ডেলিগেটরা এসেছিলেন খানিকটা ছেলে-মানুষি অভিনয় দেখবেন বলে। এদের সবাই প্রফেশনাল স্টেজের সঙ্গে জড়িত। ছোটদের জন্য বড়দের অভিনয় কি ভাবে উন্নত করা যেতে পারে সেইটাই এদের মুখ্য আলোচনার বিষয় ছিল। ১৬ মে অপরাহ্ণে কনফারেন্স হলে সি এল টির "অর্গানাইজেসন ও মেথড" নিয়ে আমার ভাষণ সমস্ত শ্রোতারা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। চল্লিশ মিনিট বক্তৃতার পর প্রায় পঁচিশ মিনিট শুধু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ছোটদের রংমহল যে বড়দের চেয়ে কোন অংশে কম শ্রদ্ধার যোগ্য নয় তা বুঝিয়ে বলা হল। এখানেই প্রথমত জানা গেল যে, ইয়োরোপে শিশুরংমহল কোথাও নেই। লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিল ১২ বছরের কম ছেলেমেয়েদের অভিনয় নিষিদ্ধ করেছে। একমাত্র জাপান, ভারতবর্ষ ও আমেরিকাতেই শিশুরংমহলের পাট।

বেলা ছটা পনেরো মিনিটে কমনওয়েলথ রংমঞ্চে ডেলিগেটরা এলেন শিশু শিল্পী-দের অভিনয় উৎকর্ষ দেখতে। ফরাসী, রাশিয়ান ও ইংরেজী ভাষায় গল্প বলে দেওয়া হল মিঠুয়ার। অভিনয় সমাপ্তির পর বিশ মিনিট বিরতি কিন্তু কেউ বাইরে গেলেন না। প্রশ্নবাণ চলল। ফরাসী দেশের ডেলিগেট স্পষ্টই বললেন, "এরা প্রফেশনাল নয় এ আমি বিশ্বাস করি না।" এত পরিচ্ছন্ন অভিনয়, ভাব ও মিমিং অ্যামেচার শিশু-দলের পক্ষে সম্ভব নয়। সি এল টির পক্ষে এটাই সবচেয়ে উঁচু প্রশংসা। বিরতির পর "অবনপটুয়া" তাঁদের বিহ্বল করল। "কার্টেন কল"-এ আমাদের শিল্পীর দল পটু নয়। করতালির ঢেউ থামতে চায় না। বার-বার পরদা উঠছে নামছে। বাচ্চারা কিন্তু পোশাক বদল করেই ছুট। ডেলিগেটরা বিভ্রান্ত। একজন আমেরিকান বললেন, মিঃ চ্যাটার্জি এ অভিনয় দেখলে আমাদের কেউ আর ডাকবে না। আমি দেশে গিয়েই শিশু-রংমহলের পত্তন করবো। জাপানের প্রতি-নিধি শুধু মাথা নাড়ছেন আর আমার হাত ধরে নিজের ভাষায় কি বলে চলেছেন।

পরদিন ১৭ই ভারতের হাইকমিশনার ডাঃ

SONG OF INDIA *set*-এর নীচে শিল্পীদের একাংশ। আলস্টার্স মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার। পেছনে স্টেজ ম্যানেজার শ্রীঅমর কর

জীবরাজ মেহতার বাড়িতে পার্টি এবং সেখান থেকে মহাত্মা গান্ধী হলে বেঙ্গলী ইনস্টিট্যুটের ব্যবস্থাপনায় গুরুদেবের "আনন্দ"। পার্টিতে সি এল টির পুরাতন বন্ধু প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত চ্যবনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হল—আমেরিকার পথে চলেছেন। মহাত্মা গান্ধী হল ভর্তি। স্টেজ বলতে কিছু নেই; মাত্র একটি প্ল্যাটফর্ম ২০×১২। সিন বা সেট লাগানো অসম্ভব। এরই মধ্যে আনন্দর খানিকটা ঘরোয়া ভাবে উপস্থিত করা হল। উদ্যোক্তাদের নানারকম অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়েছিল। সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করে এই দিনটি বাচ্চাদের ছুটি দিলেই হয়তো ভাল হত।

১৮ই তারিখে "সাইট সিইং"। শ্রীমান বিধানের চেষ্টায় বিরাট কোচ প্রাতে ৯টায় চলল কিউ গার্ডেনের দিকে। হুইটসান ছুটির দিন। সবাই পাগলের মত লণ্ডনের বাইরে ছুটেছে। গাড়ির ভিড়, লোকের ভিড়। কিউ গার্ডেন, টাওয়ার অফ লণ্ডন হ্যাম্পটন কোর্ট সারতেই বেলা আড়াইটে উইণ্ডসর কাসেলে যাওয়া হল না কারণ ড তারাপদ বসুর উদ্যোগে লণ্ডনের প্রান্তে সাউথলে আমাদের একটি "শো" দিতে হবে সেই সঙ্গে খানিকটা ইংলণ্ডের গ্রামজীবন দেখা হবে। "সাউথল" একটি শিল্প পল্লী গ্রামবাসীরা অধিকাংশই ভারতীয় পাঞ্জাবী অনুষ্ঠান গৃহে মনে হল দিল্লিতে কোথা আমরা "সঙ অফ ইণ্ডিয়া" দেখাচ্ছি সাউথল -এর মেয়র ও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

১৯শে মে লণ্ডন মজলিসের উদ্যোগে "সঙ অফ ইণ্ডিয়া" ইসলিংটন টাউন হলে শেষ অনুষ্ঠান। এখানেও সেণ্ট প্যানক্রাসের পুনরাবৃত্তি। এখানকার শ্রোতা ও দর্শকদের অধিকাংশই লণ্ডনের বুদ্ধিজীবী এখানেও পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক লোক। সঙ অফ ইণ্ডিয়াও ক্রমশই আ

ক্লান্তি? কোথায়? হোটেল এডোলেসে একটু গড়িয়ে নেওয়া। আমস্টার্ডাম

ভাঙো হচ্ছে। ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের প্রোগ্রাম বদলে দেওয়ার অনুরোধ এসেছে। কেন না কনফারেন্সে এসব দেশের ডেলিগেটরা ট্রাঙ্ককলের ব্যবস্থা করেছেন যাতে "সঙ্ অফ ইণ্ডিয়া" দেখানো হয়। অনুষ্ঠান শেষে রাত এগারোটার পর যখন ক্লান্ত হয়ে বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতে ফিরেছি তখন রাত সাড়ে বারোটা। পরের দিন বেলা এগারোটায় আমরা লণ্ডন এয়ার-পোর্ট ছেড়ে কোপেনহেগেনের দিকে রওনা হব। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করা এবং বাচ্চাদের পরিষ্কার ভাবে সব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারা সব বাড়ির কাছে "টিউব স্টেশনে" থাকবে এবং আমরা তাদের তুলে নেব।

ভোর সাড়ে আটটায় লণ্ডনের নতুন পাওয়া বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে কোচ চলল। কল্যাণীয়া মঞ্জু, মিসেস দত্ত, মিসেস বসু, ডাঃ বিশ্বাস এবং শ্রীমান বিধান প্রমুখ ছেলেরা আমাদের সঙ্গে এলেন। শ্রীমতী রবীন সরকার তার যা কিছু সম্পদ মায় "টেপ রেকর্ডার"টি সুদ্ধ ছেলেমেয়েদের ও সি এল টিকে দিয়ে দিল। উজ্জ্বল গুহ, ম্যাং, আশীষ, দিলীপ সরকার প্রমুখ ভিড় করে এল বিদায়ের সময়। সাত দিনের আলাপে বিদায় এত মধুর ও বেদনাদায়ক হতে পারে।

(২)

বেলা দুটোতে কোপেনহেগেন। ওপর থেকে নর্থ সমুদ্র দেখছি—নীচে ছককাটা ডেনমার্ক। জাহাজ চলেছে মোচার খোলার মত—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এয়ার-পোর্টে সি এল টির বন্ধু অজয় মহলানবীশ ও ইউনেস্কো কমিশনের প্রতিনিধি। হ্যান্স ক্রীশ্চান অ্যান্ডার্সনের দেশ। ঝকমক করছে আলোকিত। কোথাও নোংরা নেই, ভিখারী নেই। অজয় বলল স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং নাকি ইউরোপের সব চেয়ে উঁচু এখানেই।

হ্যান্স ক্রীশ্চান বুলেভার্ডের ধারে একটি ইয়ুথ হোস্টেলেই আমরা উঠলাম। মেয়েরা একদিকে তেতলায়—আর সবাই একতলায়। সারি সারি দোতলা খাট। কম্বল আর চাদর এল। সন্ধ্যাতে আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রীপিলাই-এর বাড়িতে পার্টি। মহা আনন্দ। ততক্ষণ "ফগ" বাসা বেঁধেছে। বেশ শীত। মিঃ পিলাই বাচ্চাদের নিয়ে মশগুল। ছাড়তে চাইছেন না। বহু মান্য অতিথি এসেছেন, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে কথা বলার চেষ্টা হচ্ছে। লণ্ডনের অসাধারণ সাফল্যের কথা কোপেনহেগেনে পৌঁছেছে। সবাই উৎসুক। এক ভদ্রমহিলা ছেলেমেয়েদের এক চোখে দেখে নিয়ে বললেন—"কি সুন্দর চোখ, কি চমৎকার চুল।" মিঃ পিলাই বললেন, "এতগুলি সুশ্রী ছেলেমেয়ে যোগাড় করলে কোথেকে?" ভারতীয় দূতাবাস থেকে ফেরবার পথে ছোটরা টিভোলী উদ্যানে চলে গেল। সেখানে তাদের টেলিভাইস করা হবে। আমরা এলাম ফোক থিয়েটার-এ। ১০৭ বছরের পুরোনো থিয়েটার। আজও দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আমাদের দলের কর সাহেব, সাধন, কণিষ্ক, অসিত "স্টেজ হ্যাণ্ড"দের সঙ্গে মিশে গেল। এমনি উদ্দীপনা লণ্ডনে দেখিনি। ওখানকার স্টেজ-হ্যাণ্ডদের ইমাজিনেশনের বালাই নেই। ওরা বন্ধু হতে পারে না। কমনওয়েলথ ইনস্টিটিউট-এ স্টেজ-হ্যাণ্ডরা শো শেষ হতেই বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। আমরা জিনিস গুছিয়ে নিচ্ছি আর ওরা বলছে তাড়াতাড়ি কর, ৯টার মধ্যে না বিদেয় হলে ৩০ পাউণ্ড অতিরিক্ত দিতে হবে। আর এখানে? থিয়েটারই যেন আমাদের যৌথ সম্পত্তি। হাসছে, কথা কইছে, কাজ করছে—বাড়ি? "সেণ্ট্রাল হিটিং" আছে। নয়তো এখানেই রাত কাটাবো।

সন্ধ্যায় স্থানীয় রেস্তোরাঁতে ভাত আর মুরগীর ঝোল। সন্ধ্যা, কিন্তু তখন রাত সাড়ে নয়টা। পরদিন ভোরে আমরা কোপেনহেগেন হোস্টেলে উঠে যাব। দুটো শো বিকেলে ও সন্ধ্যায়। স্টেজ সেট ঠিক
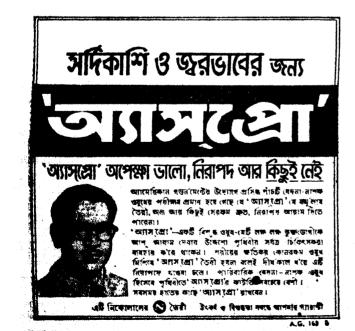
হয়েছে। বেলা ১২টায় পোশাক গোছাতে গিয়েই চক্ষুস্থির। মিসেস সেনগুপ্ত বললেন, "মিঠুয়ার পোশাকের ট্রাঙ্ক আসেনি। চারদিকে "এস ও এস" দিয়ে জানা গেল যে একটি ট্রাঙ্ক কোচে রয়ে গেছে। তিনটের আগে পৌঁছুবে না। মুখ কালো করে ইম্প্রভাইস করা হল। কি ভাগ্যি, মাস্ক ও অন্যান্য পোশাক ছিল। বেলা তিনটেতে আরম্ভ হল মিঠুয়া। শেষ হল। শেষের দিকে অরিজিন্যাল পোশাক পরানো হয়েছিল মুষড়ে পড়া মনটা চাঙ্গা হল করতালি ধ্বনিতে।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সঙ অব ইণ্ডিয়া। আরো ভালো, আরো সুন্দর করেছে এরা। সবাই ইনস্পায়ার্ড। এবারও গ্রীনরুম লোকারণ্য। স্টকহলম, অসলো এবং কোপেনহেগেন-এ আসবার নিমন্ত্রণ। অজয় আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশের সম্মান তার সম্মান। এত দূরে একটি বাঙালী ছেলের একক চেণ্টাতেই শিশুরংমহলের ডেনমার্ক ভ্রমণ। অজয় বলল, সমরদা, তোমাদের আসতেই হবে তিন সপ্তাহের মধ্যে। তোমরা বুঝতে পারবে না আজ ভারতবর্ষকে ওরা কি চোখে দেখেছে। তোমাদের আসতেই হবে।

ছেলেমেয়েদের ক্লান্তি নেই। সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় দলবেঁধে অজয়কে নিয়ে ওরা চলল "টিভোলী"তে। এটা ডেনমার্কের ডিসনেল্যাণ্ড, এখানেই ডিনার। আজকের টিভোলীর আকর্ষণ কিন্তু অন্য জিনিস। মেলা নয়, ট্রেন নয় বা ব্যালে নয়। আজ শুধুই ইণ্ডিয়ান চিলড্রেন! এখানকার ডিরেকটার নিজে এদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমার শরীর শ্রান্ত; ট্যাক্সি করে হোটেলে ফিরলাম রাত দশটায়। শুনলাম ওরা ফিরেছে রাত আড়াইটায়।

২২ তারিখে কোচে করে চললাম হেলসিনবর্গ ক্যাসেলে। রাস্তা, ঘাট, পোর্ট সবই দেখবার মত। হ্যান্স এণ্ডারসনের সেই মারমেইড যেখানে বসেছিল তার করুণ দুটি চোখ মেলে, সেই জায়গাটিতে গাড়ি দাঁড়াল। শুনলাম মারমেইডের নতুন মূর্তিটি শীঘ্রই তার পুরোনো পাথরের ওপরে এসে বসবে। কয়েকদিন আগে এক পাগল এই পৃথিবীর সেরা মূর্তিটিকে জখম করেছিল।

হেলসিনবুর্গ হ্যামলেটের মিথিক্যাল ক্যাসেল। ঝকমকে প্রভাতে ওপারে সুইডেন দেখা যাচ্ছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা আনন্দে ছুটোছুটি করছে। এদেশের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে আর বলছে, "হাউ বিউটিফুল! হাউ লাভলী চিলড্রেন।" যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই ক্যামেরার ভিড়। সেখানেই পেন ফ্রেণ্ড। আইসক্রীম আর চকলেট অজস্র আসছে। বিকেল সাড়ে চারটায় বিদায় কোপেনহ্যাগেন! এয়ারপোর্ট-এ অজয় বলছে "অ রিভয়্যার"। বলতে ভুলে গেছি কোপেনহেগেনের খবরের কাগজের রিভ্যু। সব কাগজেই এক কথা। "বিস্ময়কর ভারতীয় শিশুরংমহল", চোখ জুড়োনো, মন জুড়োনো অভিনয়, মিউজিক আর পোশাক। ডানিস শিশুরংমহল গড়তেই হবে। সি এল টি আবার এসো। আগের রাত্তিরে টেলিভিসনে প্রতি ঘরেই আমাদের পরিচয় হয়েছে। সুতরাং সারা ডেনমার্ক সি এল টিকে চিনে নিয়েছে।

সাড়ে ছটায় এস এ এস প্লেন আমাদের নিয়ে ছুটল আমস্টার্ডামের দিকে।
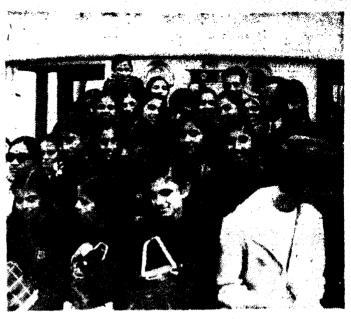
বেল টেলিফোন কোম্পানীর সৌজন্যে নদী বক্ষে সি এল টি। অ্যাণ্টওয়ার্প। বাচ্চাদের হাতে ১০ শিলিং-এর ক্যামেরা। তিন পাউণ্ডের ঘড়ি।

(৩)

আমস্টার্ডাম এয়ারপোর্টে মাদাম স্নুকে, ডাক্তার বকুমা ও ডাচ টেলিভিশন ডিরেক্টর উপস্থিত। এদের মধ্যে মাদাম স্নুক ও ডাঃ বকুমা লণ্ডন কনফারেন্সে ছিলেন। রাত্রির নটায় আমাদের টেলিভিশন। দুটি গাড়ি পাঁচটি মেয়ে, মিসেস সেনগুপ্ত ও আমাকে নিয়ে চলল বাইশ মাইল দূরে হিলভারসাম স্টুডিওতে। গাড়ির মাইলোমিটার ১২০। ১৪০ দেখাচ্ছে। আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি। "টিভি" শেষ হল রাত সাড়ে নয়টায়। আবার সেই গতিতে এলাম আমস্টার্ডাম হোটেল অ্যাডোলেসে। আমাদের উদ্যোক্তা "স্ক্যাপিনো ব্যালে গ্রুপ।" এরা নামকরা প্রতিষ্ঠান। অনুষ্ঠান হবে আমস্টার্ডামের প্রসিদ্ধ মিউনিসিপাল থিয়েটারে এবং ২৪ তারিখে রটারডামের নতুন থিয়েটারে।

সি এল টি টেকনিসিয়ানদের পক্ষে প্রতিটি থিয়েটারই নতুন আবিষ্কার। সব থিয়েটারেই শ্রীমান সাধন ও মিঃ কর মনোযোগ দিয়ে দেখছেন; কনিষ্ক আলোর ব্যবস্থা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে নোট করে নিচ্ছে।

মিউনিসিপাল থিয়েটারের "সঙ অব ইণ্ডিয়া" করার প্রতিধ্বনি পেলাম সবকটি

কাগজে। ডাঃ ব্রাইয়েন পত্রিকাগুলি তর্জমা করে বললেন, "তোমাদের সৌভাগ্য দেখে হিংসে হচ্ছে—এখানকার বিশ্বনিন্দুক সমালোচনাটিও তোমাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন"। একটি পত্রিকা বলেছেন,—"অ্যাপলজ উড নট স্টপ"। আর একটি জিজ্ঞাসা করেছেন "এও কি সম্ভব?" রটার্ডামের অনুষ্ঠানে ছিল "ক্যাপিনো ব্যালের পিয়েদিও" এবং তারপর "সঙ অব ইণ্ডিয়া"। মুগ্ধ হয়ে আমরা ওদের ব্যালে দেখে নিলাম। ক্যাপিনোর প্রতিটি ছেলেমেয়ের বয়স ১৫ থেকে ২০র মধ্যে, কিন্তু কোন ফাঁকে যে আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওদের বন্ধুত্ব হয়েছে তা আমরা টের পাইনি। রটার্ডেমে "শো" হবার পর দুটি দল মিলে "দি হেগ"এ আমাদের রাষ্ট্রদূতের বাড়ি এলাম সান্ধ্য পার্টিতে। সেখানে দু ঘণ্টা কাটিয়ে হোটেলে যখন ফিরেছি তখন রাত নটা। পরের দিন কাটল হল্যাণ্ডের নানা জায়গা ঘুরে বিশেষ করে হেগের বিখ্যাত Maturdam দেখে। প্রতি দেশেই শিশুর মনোরঞ্জনের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা দেখে চমকে যেতে হয়। হল্যাণ্ডের সমস্ত দ্রষ্টব্য বাড়ি, ঘর,

মিউজিয়মের চমৎকার মডেল টাউন। ট্রেন, স্টীমার, মোটর বোট, মোটর চলছে। এরোপ্লেন আকাশে উড়ছে। সমস্ত শহরটি ৩ থেকে ৪ একর জমির মধ্যে। ছুটির দিনে হাজার হাজার ছেলেবুড়ো দেশ-বিদেশ থেকে এই Maturdam দেখতে আসেন। ডক্টর ডরিস্ ও মাদাম স্নুক আমাদের যে যত্ন করেছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। ইংরেজদের দেখেছি এবং কন্টিনেণ্টের মানুষদেরও দেখলাম। কি অদ্ভুত পার্থক্য। এ'দের সৌজন্য ও সৌহার্দ্য শিশু রংমহলের প্রতিটি ছোটবড় মানুষকে অবাক করেছে। মনে হয়নি একটা অপরিচিত পরিবেশে রয়েছি।

২৫ তারিখ প্রাতে কে-এল-এম ফ্লাইটে ব্রাসেলস। ডাচ সরকারের প্রতিনিধি ও মাদাম স্নুক এয়ারপোর্টে রুমাল উড়িয়ে বললেন "আবার এসো।" আমাদের ছেলেমেয়েরা বলল "এবার আসবে তোমরা—সর্বাপেক্ষা নিমন্ত্রণ পাঠাচ্ছি—আমাদের গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে।"

অবিস্মরণীয় তিনটি দিন।

(৪)

ব্রাসেলসের এয়ারপোর্ট দেখে চমকে গেলাম। এ কোন ময়দানবের তৈরী!

এর স্থাপত্য এক পরম বিস্ময়। টি ডেলিগেশন-এর সুযোগ্য প্রতিনিধি মিঃ জীবন মুখার্জি, তাঁর সহকারিণী লিলিয়ান এবং Palaise Des Beaux Art-এর প্রতিনিধি মিঃ বালাস আমাদের নিতে এসেছেন। শহরের প্রান্তে হোটেল নামে বেলিনাতে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু ব্রাসেলসই আমাদের ভাল লাগল।

এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের স্টেজের জিনিসপত্র থিয়েটারে চলে গিয়েছে। Underground theatre। ইম্প্রেসারিও Palaise Des Beaux Arts পৃথিবী-খ্যাত। সারা বছর এরা পৃথিবীর খ্যাতনামা থিয়েটার ও ব্যালে দলদের নিয়ে আসেন। জীবন মুখার্জির অক্লান্ত চেষ্টায় ২৭ মে তারিখে এরা আমাদের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে রাজী হয়েছেন। ইয়োরোপের অন্যান্য শহর থেকে আমাদের খ্যাতি ব্রাসেলসে পৌঁছেছে। সমস্ত টিকেট বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

২৭ তারিখ প্রাতে ৮৷৷ ব্রেকফাস্ট সেরে সকলে থিয়েটার হলে পৌঁছেছি। ঠিক রাত্রে এখানে গুরুদেবের "আনন্দ" হবে। রিহার্সেলের প্রয়োজন আছে। স্টেজের সুবন্দোবস্তে দুই ঘণ্টাতে Three Tier stage set করা হয়ে গেল। রিহার্সেল শুরু হল। দেখতে এসেছেন উদ্যোক্তাদের অনেকেই। মেয়েরা পোশাক গোছাচ্ছেন। নেপথ্য ভাষণ চলছে।

"Autumun leaves are falling"

প্রাগে নদীর ধারে, ছুটির দিনে, পেছনে বঙ্কু। বাচ্চারা নাম দিয়েছিল 'রাঙাদা'

হঠাৎ লিলিয়ান মুখ কালো করে এসে বলল, 'মিঃ চ্যাটার্জি অত্যন্ত দুঃসংবাদ; তোমাদের প্রাইম মিনিস্টার মিঃ নেহেরু আর নেই।' সব থেমে গেল। একটি সুন্দর পদ্ম ঝরে পড়েছে।

ছেলেমেয়েরা কাঁদছে কোমল চাচা নেহরুর কাছে এই সেদিনও ওরা "সঙ্গ অব ইন্ডিয়া" শুনিয়ে এসেছে। মিহির, ভিক্টো, আনন্দ, সাহে কই চম্পা চাচা নেহেরু দেখেছেন। যখনই সি-এল-টি দিল্লী গিয়েছে, সামনের আসনে সেই সদা প্রফুল্ল মুখটি উঁকিঝুঁকি মেরেছে।

শো হল না। আমাদের দূতাবাসের নিষেধ। Palaise Des Beaux Art-এর ডিরেক্টাররা আমাদের অবস্থা বুঝে রেডিওতে লোকেদের জানিয়ে দিলেন 'অনুষ্ঠান হবে না।' হোটেলে ফিরে এল একটি শোকগ্রস্ত পার্টি। ২৯ তারিখ সারা দিনটাই নিঃশব্দে কাটল। টেলিফোনে প্রাগের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা হল। সেখানেও অনুষ্ঠান হবে না রাষ্ট্রীয় শোকের মধ্যে। আমাদের যাতায়াতের ভারপ্রাপ্ত সহকর্মী অসিত ছোটাছুটি করতে লাগল দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করতে। ৩৪ জনের প্লেনে ফেরবার ব্যবস্থা সহজ নয়; বিশেষ করে যেখানে আগে থাকতে সমস্ত ব্যবস্থা দিন ধরে, ঘড়ি ধরে করা হয়ে গিয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়ার ব্রাসেলস-এর প্রতিনিধি বললেন, "প্রাগে তোমাদের যেতেই হবে—সেখান থেকে ২৯ তারিখে হয়তো বোম্বের ফ্লাইট পাওয়া যেতে পারে।"

২৮ তারিখ সারাদিন কাটল আন্তর্জাতিক বেল টেলিফোন কোম্পানির অতিথি হয়ে। ২৯ তারিখ প্রাতে শিশু রংমহলের ভ্রাম্যমাণ দল চলল প্রাগে। সেখানে এক ঘণ্টা থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেন ধরে বম্বে। এয়ারপোর্টে জীবনবাবু, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা এবং মিঃ বালাস দেখা করতে এলেন। "আবার আসতেই হবে বেলজিয়মে—" বললেন মিঃ বালাস।

একটি ছোট্ট বিমান, আমরা ৩৫ জনই যাত্রী। প্রাগে পৌঁছলাম বেলা সাড়ে বারোটায়। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ছাড়বে ১২-৩০ মিনিটে। সুন্দরী প্রাগকে ওপর থেকেই দেখলাম। থাকা আর হবে না হয়তো।

কিন্তু আমরা যা ভেবেছিলাম তা হল না। প্রাগে আমাদের থাকতে হল আট দিন। সে আরেক কাহিনী।

শিশু রংমহলের ইয়োরোপ পরিক্রমা এখানেই ইতি। সর্বত্র ভারতীয় দলে আমরা যে যে অভিনন্দন ও সম্মানের অধিকারী হয়েছি তার দুঃখজনক শেষ পেয়েছিল ব্রাসেলস-এ। সমস্ত দলটি যেভাবে পরিচালিত হয়েছিল, যে হাসি-খুশীর আবরণটি সর্বত্র ওদের ঘিরে ছিল তা যে কোন ডেলিগেশনের পক্ষে আদর্শ হতে পারে। ঝগড়া নেই; মন কষাকষি নেই; কারো বিরক্তি নেই—ছিল একটা প্রফুল্ল পরিবেশ যা চারিদিকের আবহাওয়াকে অদ্ভুতভাবে প্রতিফলিত করেছিল। বিদেশী এই শিশু দলটিকে দেখে তাই সবাই বলত "কি সুন্দর চোখ, কি সুন্দর হাসি—What poise and what beauty!"

(৫)

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে শুনলুম ভোলাবাবু টেলিফোন করে জানিয়েছেন যে, পাহাড়ে আমাদের কুটির তৈরি আছে। ক্রকনশের মত জায়গায় আজকালকার দিনে হঠাৎ দরকার হলে কোনো কুটিরেই জায়গা পাওয়া ভারি মুশকিল। আগেকার চেয়ে অনেক বেশী লোক আজকাল বেড়াতে আরম্ভ করেছে, তাতেই ছুটি কাটাবার জায়গা পড়েছে কম। তাই হঠাৎ যখন খবর পেলুম আমাদের ভাগ্যে কুটির জুটেছে, ঠিক করলুম, পরদিন সকালেই যাবো পর্বতারোহণে।

ট্রেনে করে ঘণ্টা দেড়েক, তারপর বাসে করে আধ ঘণ্টা। যেখানে এসে পৌঁছলুম সেটা পাহাড়ের অর্ধেক পথ। এইখান থেকে হেঁটে আমাদের এইবার যেতে হবে। ছোট্ট একখানি পাহাড়ী গ্রাম। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত একে বলা হত 'জার্মান' গ্রাম। জার্মানির প্রান্তদেশে এমনি শত শত গ্রাম চেকোস্লোভেকিয়ায় ছিল। সমস্ত স্থানটাকে বলা হত 'সুডেটেন' ভূমি। এখানে সুডেটেন জার্মানরা বাস করে এসেছে আজ কয়েক শ' বছর। চেকোস্লোভেকিয়ার গণতন্ত্রের জন্মের পর থেকে এমনি ত্রিশ লক্ষ সুডেটেন জার্মান চেকোস্লোভেকিয়ার প্রজা হয়েই নির্বিবাদে বাস করছিল। তারপর হঠাৎ এল হিটলারের আমল। চেকোস্লোভেকিয়ার সংখ্যালঘিষ্ঠ জার্মানরা ঠিক করল হিটলারের সাহায্য নিয়ে তারাই দেশটাকে গ্রাস করবে। চেকদের বাঁধবে দাসত্বের শৃঙ্খলে। হিটলারও এই সুযোগ নিয়ে চেকোস্লোভেকিয়া দখল করে নিয়েছিল। তারপর এল সুদীর্ঘ বিশ্বযুদ্ধ। হিটলার নিঃশেষ হয়ে গেল। চেকোস্লোভেকিয়া আবার স্বাধীন হল। তখন প্রশ্ন উঠল, সুডেটেন জার্মানদের কি হবে? তারা যে দেশদ্রোহীতা করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জার্মানীকে পিতৃভূমি বলে ঘোষণা করেছিল। চেকোস্লোভেকিয়াকে করতে চেয়েছিল জার্মানীর উপনিবেশ। কাজেই এদের নিয়ে কি করা যায়? ত্রিশ লক্ষ মানুষ তো বড় কম নয়। চেকোস্লোভেকিয়ার সমগ্র জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ। কেউ কেউ বললেন—থাকুক, আগে যেমন ছিল। স্বাধীন যখন আবার হয়েছি, বিষদাঁত ওদের যখন ভেঙেই গেছে, জার্মানী যখন পরাজিত তখন আর ভয় কি? কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তি সবাই মিলে বললেন—না, বিপদ এখন নেই বটে, কিন্তু পরে হবে না, তারই বা ঠিক কি? জার্মানীর উপর আস্থা হারিয়েছিল চেকোস্লোভেকিয়া। তারা বললে—বিপদ যদি ওদিক থেকে আসে তাহলে প্রাণপণ করে লড়ব সবাই, কিন্তু ঘরের শত্রু জিইয়ে রাখলে না লড়েই মরতে হবে। একবার শিক্ষা হয়ে গেছে। আর না। ঐ ত্রিশ লক্ষ জার্মানকে দেশের বাইরে জার্মানীতে পাঠিয়ে দেওয়াই স্থির হল। মিত্রশক্তিও এ সংকল্পে মত দিলেন। কাজ বড় সহজ নয়। অত মানুষের ব্যবস্থা করা তো চাট্টিখানি কথা নয়। তার উপর এরা দেশ থেকে চলে গেলে ঐসব শূন্যস্থানের কি হবে? ওখানে চাষ হত, বাস হত, কতরকমের শিল্প ছিল। বিখ্যাত কাচের শিল্প ঐ অঞ্চলে, কত কাপড়ের কল ওখানে আছে—মানুষ চলে গেলে তাদের চালাবে কে? সমস্যা গুরুত্বের হলেও চেক সরকার এগিয়ে গেলেন ঐ নীতির পথে। কয়েক মাসের মধ্যে সমস্ত সুডেটেন ভূমি খালি করে ট্রেনে ট্রাকে চড়িয়ে যত জার্মান ছিল সবাইকে পাঠিয়ে দিল জার্মান দেশে। অতবড় একটা ব্যাপার, বেশ সহজভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল। হইচই হট্টগোল কিছুই হল না।

সেই থেকে এইসব খালি অঞ্চলগুলির গ্রাম শহর ধীরে ধীরে চেক অধিবাসী দিয়ে ভর্তি করা চলেছে। কল-কারখানা চলতে আরম্ভ করেছে। ক্ষেত-খামারে চাষবাস শুরু হয়েছে, কল-কারখানার উৎপাদন বাড়াচ্ছে আধুনিক যন্ত্র এনে ফেলে, যাতে মজুর কম লাগে। ক্ষেতের উৎপাদন বাড়াচ্ছে ট্রাক্টর আর রাসায়নিক সার এনে ফেলে যাতে চাষী কম লাগে। যাই হোক, গ্রাম শহরগুলিকে ভরে ফেলবার মত অত লোক এনে ফেলতে পারে নি বলেই কিছু কিছু বাড়ি এখনও খালি পড়ে।

আমরা যে গ্রামে এসে নামলুম তার কোনো কোনো বাড়িতে লোক এসেছে। তাদের

জানলার কাঁচগুলি ঝকঝকে। জানলার ধারে ফুলের টবে রঙিন ফুল। পিছন দিকে রান্না-ঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। রান্নাঘরের পিছনে ছোট্ট সব্জি-বাগান। সেখানে লোহার তারে ক্লিপ দিয়ে টাঙানো বাচ্চাদের জামা আর হাত-মোছা তোয়ালে। এ ছাড়া আর যে-সব বাড়ি সেগুলি খাঁখাঁ করছে। জন-মনিষ্যির চিহ্ন নেই। সেই যে তার আদি অধিবাসীরা ফেলে দিয়ে চলে গেছে তার পর থেকে কেউ আর সে বাড়িতে ঢোকেনি। ঘরের ভিতরগুলি আসবাব-শূন্য। ধুলোর ভরা মেঝে। জানলার কাচ ময়লা। দরজায় রঙ পড়ে নি কতদিন—এখানে ওখানে চটা ওঠা।

এমনি একটি বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় ভোলাবাবু তাঁর মোটর-বাইকে করে ভট্‌ভট্‌ করতে করতে লামিকে নিয়ে এসে হাজির হলেন। এবারে লামি নামল মোটর-বাইক থেকে আর মিতু উঠল। ঠিক হল, আমরা হাঁটব পাহাড়ী পাকদণ্ডি দিয়ে আর ওরা মোটর-বাইকে করে পাহাড়টাকে বেষ্টন করে ওপারে গিয়ে মিলবে আমাদের সঙ্গে।

রুকস্যাক পিঠে তুলে হাঁটতে শুরু করে দিলুম। খোলা পাহাড়ের খাড়াই রাস্তা, খাবার জিনিস আর কাপড়ে-ভরা পিঠের বোঝা। বহুদিন হাঁটা অভ্যেস নেই, দেশে বেতের চেয়ারে পাখার তলায় বসে কাটাচ্ছিলুম এতদিন। হঠাৎ হাঁটার ভাগিদ এসে পড়ায় পা যেন আর চলতেই চায় না। পিঠ নুয়ে পড়ে। কোমরে ব্যথা ধরে যায়। দেশে থাকতে রোদ থেকে মাথা বাঁচানো এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে, মাথায় রোদ পড়তেই মনে হতে থাকে, এই বুঝি মাথার চাঁদি ফেটে গেল। অথচ বাইরে থেকে রোদের রঙ যেমনই হোক এখানকার রোদ তো মিঠে। রাস্তার স্থানে স্থানে আঁকা নীল রঙের চিহ্ন ধরে চলেছি। খানিক চলতেই পর্বত-শোভা সব-কিছু কষ্ট সবকিছু অস্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়ে দিল। মশগুল হয়ে উঠতে থাকলুম উচ্চ থেকে উচ্চতর স্থানে। তারপর হঠাৎ এক মোড়ের মাথায় এসে নীল চিহ্ন শেষ হয়ে গেল। দুদিকে দুটো রাস্তা গিয়েছে, তবে কোনোটাতেই নীল বা লাল বা হলদে কোনো চিহ্নই নেই। আমরা জল্পনা করছি, কোন্ দিকে যাওয়া যায় এমন সময় লামি চেঁচিয়ে ডাকল—এই দেখ, মাটির উপর আঁচড় দিয়ে কি লেখা। আমরা ছুটে এসে দেখলুম, মাটির উপর গভীর আঁচড় দিয়ে কে লিখে রেখেছে—'গাঙ্গুলি' এবং তার পাশে স্পষ্ট চিহ্নিত করা একখানি তীর। আমরা অবাক হয়ে তীরের ফলা ধরে কিছুদূর এগোতেই একটা বাঁক ঘুরে একখানা দোতলা কাঠের কুটিরের সামনে এসে হাজির হলুম। তার দরজার চৌকাঠের উপর মিতু বসে। মিতু বেশ কিছুক্ষণ আগে এসে পৌঁছেছে ভোলাবাবুর সঙ্গে। আমাদের জন্যে তীর চিহ্ন এঁকে বসে আছে অপেক্ষায়। এইটেই আমাদের কুটির এইখানেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারি নির্জন জায়গাটি। চারিদিকে বন কুটিরের পাশেই ঝিরঝিরে ঝরনা। মিতু বললে—ভোলাবাবু বলে গেছেন, এখান থেকে আধঘণ্টার পথ, পাহাড়ের উপর একটি আবাস আছে, সেইখানে তৈরি খাবার মিলবে।

আমাদের খিদে পেয়ে গিয়েছিল। কুটিরে রুকস্যাক রেখে ঝরনার জলে হাতমুখ ধুয়ে আমরা বনের পথ ধরে উঠলুম গিয়ে সেই আবাসে। ছবির মত জায়গাটি। দুপাশে ঢেউ-খেলানো সবুজ মখমলের ঢাল, ছবি দেখলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। পায়ের নীচে গভীর বন। বনের ওপারে আবার পাহাড়। পাহাড়ের ওপারে বহুদূরে সমতল ভূমি। মাথার উপরে পাইন বনের শ্রেণী চলে গেছে — চেকোস্লোভেকিয়ার সীমান্ত
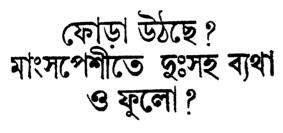
আবাসটি শুনেলুম পররাষ্ট্র দপ্তরের চাকুরেদের ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা স্থাপিত। সেখানে শুধু পররাষ্ট্র দপ্তরে যাঁরা কাজ করেন তাঁরাই ছুটি কাটাতে আসবার সুযোগ পান। হোটেল খরচ বেশ সস্তা। এই পাহাড়ে এবং এই ধরনের আকর্ষণীয় স্থানে এইরকম সুন্দর সুন্দর বহু আবাস ছড়ানো আছে। সেগুলি সবই কোনো না কোনো দপ্তর বা কারখানার ট্রেড ইউনিয়নের সম্পত্তি। সত্যি কথা বলতে কি, আজকাল-কার দিনে ট্রেড ইউনিয়নের আবাসগুলি চেকোস্লোভেকিয়ার সবচেয়ে সস্তা এবং লোভনীয় হোটেল। এদের খাবার ঘরে অনেক সময় বাইরের লোকেরাও খেতে পায়। তবে রাত কাটাবার অধিকার শুধু সভ্যদের।

আমরা খাবার ঘরে বসে চারজনের খাবারের অর্ডার দিতেই গৃহিণী রান্নাঘরের দরজা ফাঁক করে রান্নাঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। আমরা মনে করলুম, হয় তো নতুন ধরনের কোনো খাবারের সন্ধানে গেছেন। কিন্তু বেরিয়ে যখন এলেন, বললেন—সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

আমরা বললুম—কী ব্যবস্থা?

—এখানে থাকার ব্যবস্থা। আমরা এই হোটেলেই থাকব।

—সে কি? এটা না 'এর-ও-হা'র (ট্রেড ইউনিয়ন) হোটেল?

—তাতে কি? ওরাই তো জানতে চাইলে আমরা কোথা থেকে আসছি। আমি রান্না-ঘরে ঢুকেছিলুম ওদের রান্না কেমন হবে দেখতে। ফল হল অন্যরকম। ওরাই বললে—ভারতবর্ষ থেকে এ-হেন অতিথিরা এসেছে। কোথায় বনের মধ্যে একা থাকবে? এখানে চলে আসবে। সুবিধে অনেক বেশী। সস্তাও হবে।

আমরা বললুম—তা ছাড়া জায়গাটা অতুলনীয়।

গৃহিণী বললেন—অনির্বচনীয়!

খেয়ে-দেয়ে আমরা তাই ছুটলুম নীচের গাড়ীর থেকে আমাদের রুকস্যাকগুলো নিয়ে আসতে।

আমাদের ঘরটা বোধ করি আবাসের সেরা ঘর। দোতলার উপর, আলো ভরা। চারি-দিকে কাঁচের জানলা। জানলা খুলে দিতেই নীচেকার বিস্তৃত পাইন বন আর তার ওপারের সমতল ভূমি চোখে পড়ল। রঙিন সন্ধ্যা। মাথার উপরে বনের ওপারে পোল্যাণ্ডের সীমান্ত-রেখা। একটু হাঁটলেই সেদেশে পৌঁছে যাওয়া যায়। আগে ওখানটা জার্মানী ছিল। গত যুদ্ধের পর যখন জমি-জমা ভাগ-বাটোয়ারা হয় তখন চেকোস্লো-ভেকিয়ার উত্তরের এই অংশটা পোল্যাণ্ডে ছেড়ে দেওয়া হয়। জার্মানী যাতে ভবিষ্যতে আবার পূব-দিকে এগিয়ে এসে রাশিয়াকে আক্রমণ করতে না পারে, বোধ করি এই জন্যে ঐ ব্যবস্থা। চেকোস্লোভেকিয়ারও উত্তর-সীমান্তটা এইভাবে রক্ষিত হয়েছে।

ফিরে গেলুম আমরা পাহাড়ী কুটিরে। ক'দিনের ছুটি কাটাবার অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হয়ে গেল। পাইন বনের মাঝে মাঝে 'মার্লোনি'র ঢেউ লেগে গেছে। ঝরুকোক খেলে মুখ নীল হয়ে যায় কালোজাম খাওয়ার মতো—কিন্তু কী মিষ্টি রস! লাল টুকটুকে মার্লোনিগুলিও তেমনি রসে ভরা। তাদের গন্ধে প্রাণ মেতে ওঠে। আর পেলুম 'য়াহোডি'—এমন রসে ভরপুর যে মুখে দিলেই মিলিয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে একবার পোল্যান্ডের সীমান্তের কাছে এসে পড়েছিলুম। বনের ধারে একখানি গ্রাম সুন্দর একটি উপত্যকার উপর। ঢেউ-খেলানো মাঠের দৃশ্য ছবির মতো। গ্রামের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তা সীমান্তের কাছে এসে একটা কাঠের বেড়ার কাছে শেষ হয়েছে। তার ওপারে পোলান্ড—সীমান্তের প্রহরীরা দাঁড়িয়ে। ঠিক এইখান থেকে পাকা রাস্তার সঙ্গে লম্বাভাবে দুই দেশের প্রান্তরেখা চলে গিয়েছে ঘন বনের মধ্য দিয়ে—মাঝে মাঝে কংক্রিটের পিলপে দ্বারা তা চিহ্নিত। আমরা
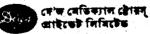
যেদিক থেকে এসেছিলাম সেদিক দিয়ে না ফিরে ঠিক করলুম সীমান্ত-রেখা ধরে আমাদের হোটেলের মাথা পর্যন্ত গিয়ে টুপ করে নীচের দিকে নেমে পড়ব—ভারি চমৎকার হবে সমস্ত ভ্রমণটা। এই পরিকল্পনার মধ্যে একটু খুঁত ছিল। সীমানা দিয়ে যে সুঁড়ি পথটা গেছে তাতে পৌঁছতে গেলে বেড়া পার হয়ে ওপারে যেতে হয়। . মিতু বললে—মা, তোমার তো পোল্যাণ্ডের ভিসা নেই, তুমি ওখানে যাবে কি করে?

মিতুর মা চটে গেলেন। বললেন—সীমান্তের উপর দিয়ে যে রাস্তা গেছে তাতে দু' দেশেরই সমান অধিকার। কে ধরবে আমায়?

মিতু বললে—তা তো বুঝলুম। কিন্তু ওখানে পৌঁছবে কি করে? এখানেই তো প্রহরী।

—দেখবি? বলে মিতুর হাত ধরে গৃহিণী রাস্তা ছেড়ে গভীর বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। আমরাও পিছু পিছু। তারপর বনবাদাড় ভেঙে প্রহরীর নজর এড়িয়ে কিছু দূরে একখানি সীমান্তের পিলপের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন।

—দেখলে মিতু? এইবার আসুক না আমাদের ধরতে! চেকোস্লোভেকিয়া দিয়ে আমরা হাঁটছি—ওদের কি? এই বলে হঠাৎ পিলপে পার হয়ে ওপারে গিয়ে ডাকলেন—মিতু, এদের বরফকিগুলো অনেক বড় বড় রে, আর বেশ মিষ্টি। আয় এইগুলোই তুলি। কে কি বলবে?

প্রান্তরেখা ধরে পোল্যাণ্ডের বড় বড় বরফকি কুড়োতে কুড়োতে সেদিন আমরা পরম তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছিলুম। একদিন একটি টিলা আবিষ্কার করলুম বুসিংকির ঝোপে একেবারে ভরা। এগুলি মূল্যবান ভারি দুষ্প্রাপ্য বেরি। অনেক খুঁজলে হয়তো দু-এক মুঠো পাওয়া যায়, এমন এক-পাহাড় বুসিংকি সহজে মেলে না। যে-কোন কারণেই হোক, এখানকার যাত্রীরা এ পাহাড়টার সন্ধান পায় নি। কাজেই আমরা সকলে মিলে একদিন সারা দুপুর ধরে খাটে খুটে সের-দুই বুসিংকি তুলে ফেললুম। বুসিংকি কাঁচা খাওয়া যায় না। উপরে লাল নীচে একটুখানি সাদা এই গোল গোল ছোট্ট বেরিগুলিকে চিনির রসে ফুটিয়ে নিলে টকটকে লাল চাটনিতে পরিণত হয়। সারা বছরেও খারাপ হয় না। আমাদের প্রায় এক বছরের মতো বুসিংকির চাটনির ব্যবস্থা তো হলই, বন্ধু-বান্ধবদের দেবার মতোও কিছু রইল।

প্লাস্টিকের থলি-ভরা বুসিংকি নিয়ে যখন আমাদের আবাসের একতলায় প্রবেশ করলুম, এক কোণ থেকে একটা শব্দ উঠল—হু উ উ উ উ উ! কোণে উপবিষ্ট এক ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রীর মুখ থেকে যুগপৎ উচ্চারিত ঐ বিস্ময়সূচক ধ্বনি।

—আসুন, আসুন, দেখান আপনাদের ফসল। আমরা তো এর সিকির সিকিও পাই নি।

আমরা গিয়ে বসলুম।

—আপনারা দেখছি আমাদেরই মতো বেরির ভক্ত। আপনাদের দেশে এইরকম বেরি হয়?

—শুনিনি কখনও। দেখিও নি। খুব সম্ভব হয় না।

এই বলে গল্প শুরু হয়ে গেল। স্বামী কাজ করেন পররাষ্ট্র দপ্তরে। স্ত্রী খেলনার কারখানায়। কাজের জাতিভেদ চেকোস্লোভেকিয়া থেকে উঠে গেছে। দুজনেরই মোটামুটি সমান রোজগার। কলম ধরলেই যে সে উঁচু জাতের কর্মী আর হাতুড়ি ধরলেই সে নীচু জাতের এ ধারণা কারুর মনের মধ্যে আর নেই। স্বামীর রোজগারেই সংসার চলে কিন্তু সংগে সংগে স্ত্রী রোজগার করতে আরম্ভ করলে আরো অনেক কিছু করা যায়। টেলিভিশান সেট কেনা যায়, মোটর-গাড়ি কেনা যায়, মফস্বলে ছুটি কাটাবার জন্যে কুটির তৈরি করা যায়। কাজ করবার ইচ্ছে প্রায় সব মেয়েরই আছে। সুযোগ পেলেই তারা কাজ করতে চায়, রোজগার করতে চায়। সে সুযোগের কোনো অভাব আজকে চেকোস্লোভেকিয়ায় নেই। বাচ্চারা খানিকটা বড় হয়ে গেলেই মায়েরা অনেকেই কাজে লেগে পড়েন। খুব সকালে বাপ-মা কাজে বেরিয়ে পড়েন, ছেলেমেয়েরা স্কুলে। আমাদের দেশে যেমন ছেলেপিলেকে স্কুলে পাঠাবার পরও ছেলেকে বাড়িতে পড়িয়ে দেবার অনেকখানি দায়িত্ব বাপ-মায়ের থেকে যায়, এখানে ঠিক তার উল্টো। লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেকে তৈরি করার সমস্ত দায়িত্ব স্কুলের মাস্টারমশায়দের। দুপুরের খাওয়ার পর সবার ছুটি। তখন বাড়িতে এসে বাপ-মা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলিত হন। বরফ-ঝরা শীতের দিনে গরম ঘরে বসে গল্প করেন। রোদে-ভরা গ্রীষ্ম হলে বেড়াতে বের হন সবাই মিলে। এই দম্পতীর একটি ছেলে একটি মেয়ে। ছেলেটি বড়, মেয়েটি ছোট। দুজনেই একই স্কুলে পড়ে। বাড়ির কাছেই স্কুল। হেঁটেই যাওয়া-আসা করে। স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেছে হ্রদের ধারে এক ক্যাম্পে। সেখানে খুব হইচই করছে তারা। বাপ-মাও এই ফাঁকে ক'টা দিন ছুটি কাটাতে চলে এসেছেন পাহাড়ে।

আমাদের ছুটি শেষ হল পয়লা সেপ্টেম্বরের ঠিক আগে। প্রতি বছর পয়লা সেপ্টেম্বর চেকোস্লোভেকিয়ার এক মস্ত দিন। ঐদিন সমস্ত রিপাবলিকের প্রত্যেকটি স্কুল লম্বা গ্রীষ্মের ছুটির পর খোলে। ছুটি শেষ। সারা রিপাবলিকে এই রব। খবরের কাগজে কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হয়—স্কুল খুলছে পয়লা সেপ্টেম্বর! দোকানে দোকানে নোটিস—স্কুল খুলছে! দোকানের কাঁচের জানলার পিছনে দেখা যায় থরে থরে সাজানো নতুন খাতা-পেন্সিল। ছবিসহ খবর বের হয় কেমন করে ছেলেমেয়েরা, বাপ-মায়েরা ছুটির ক্যাম্প ভেঙে বাড়ির দিকে ফিরছেন। ট্রামে ট্রেনে বড় বড় নোটিস—স্কুল খুলছে!

কেউ যেন ভুলে না যায়! হইচই লেগে যায় সারা দেশ জুড়ে!

মিতুকে স্কুলে ভর্তি করে দেবার জন্যে আমাদেরও ফিরতে হল। স্টেশনে এসে একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন সামনে পেয়ে গেলুম—যাচ্ছে প্রাহা। ঘণ্টা-তিনেক অপেক্ষা করলে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন পাওয়া যেত, কিন্তু কে আর অতক্ষণ বসে থাকে স্টেশনে? উঠে পড়লুম। আঁকা বাঁকা পাহাড়ে পথ ধরে প্রতি স্টেশনে থামতে থামতে এগিয়ে চলল ট্রেন। প্রায় সন্ধ্যে যখন হয়ে এসেছে, তখন প্রাহার কাছাকাছি এসে পৌঁছলুম আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি স্টেশন থেকে দলে দলে লোক উঠতে লাগল। স্কুলের ছুটি ফুরিয়ে এল—প্রাহার বাইরে যারা গিয়েছিল, তাদের ফেরবার পালা। প্রাহায় যাঁরা স্থায়ীভাবে থাকেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই শহরের বাইরে ষাট-সত্তর কিলোমিটারের মধ্যে মনোরম জায়গা বেছে ছোট ছোট কুটির তৈরি করেছেন। নিজেদের এই সব ডেরায় তাঁরা ছুটি কাটিয়ে যান। চেকরা বলে, 'খাটা'। ছুটি শেষ হল বলে খাটা বন্ধ করে সব শহরে ফিরছেন। দু-তিনটি স্টেশন পেরতেই মত বসবার জায়গা ছিল, সব ভরে গেল। তারপর মাঝ-খানের ফাঁকটুকুতেও গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে রইল যাত্রীরা। সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ সরু গলায় চিৎকার—আহোই, মিতু!

মিতু কাউকে দেখতে না পেয়েও জবাব দিলে—আহোই!

ভিড়ের মধ্য দিয়ে লোকের হাতের পায়ের ফাঁক গলে একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো মিতুর পাশে। সাশা!

—কোথায় চললে সাশা?

—প্রাহায়। স্কুল খুলেছে। তুমিও তো তাই?

—হ্যাঁ, আমিও!

হাজার হাজার ছেলের মতো সাশাও ফিরছে তার মায়ের সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটি শেষ করে। গ্রীষ্মের প্রথম দিকে একদল ছেলেদের সঙ্গে মিতু দু-হপ্তা ক্যাম্পিং করেছিল, তখনই সাশার সঙ্গে আলাপ। একই তাঁবুতে দুজনে থাকত। চেকো-স্লোভাকিয়ায় পৌঁছেই ক্যাম্পে চেক ছেলেদের সমুদ্রে পড়ে অজানা চেক ভাষার মধ্যে হাবুডুবু খাওয়ার কথা শুনে দু হপ্তার মধ্যে বেশ খানিকটা চেক ভাষা শিখে নিয়েছিল মিতু। দেখলুম তারই জোরে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে সাশার সঙ্গে।

নেমে যাবার আগে সাশা বললে—সামনের

॥ ১ ॥

"The end of British Raj in India"

আধুনিক ভারতবর্ষের তিনটি ব্যক্তির অসাধারণত্ব ইংরেজ জাতিকে অভিভূত করেছিল—রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও নেহেরু। ইংরেজের চোখে এই তিন ব্যক্তির প্রথম দুজন এক শ্রেণীর, তৃতীয় জন অন্য শ্রেণীর।

রবীন্দ্রনাথের যে-মূর্তি ইংরেজ জাতির মনে আঁকা আছে সে-মূর্তি বাইবেলের পাতা থেকে বেরিয়ে এসেছে—সাদা, লম্বা চুল-দাড়ি, গায়ে লম্বা জোব্বা, মাথায় টুপি। এই লোকটি যে কোন কালে চেস্টারফিল্ড পরে ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়তে যেত, লণ্ডনের অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের নাচের মজলিসেও যে এঁকে দেখা যেত—সে-কথাটি কেউ মনে রাখে নি। ইংরেজের চোখে রবীন্দ্রনাথ অতিন্দ্রীয় লোকের অধিবাসী, তাঁর রচনায় Oriental mysticism,

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যলোকের mystic, গান্ধী রাজনীতিলোকের mystic। লেংটি-পরা অর্ধ-উলঙ্গ এই লোকটির যে ইস্পাতের মত মনের জোর তার মূলে আছে প্রাচ্য যাদুবিদ্যা। এই যাদুবিদ্যার বলে লোকটা পাথরকে সোনা করতে পারে, জলকে লোহা করতে পারে। এই যাদুবিদ্যার রহস্য ইংরেজের অজ্ঞাত।

রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী Oriental mysticism-এর মত ইংরেজের কাছে রহস্যাবৃত রয়ে গেছেন। এঁদের অসাধারণত্বে ইংরেজ অভিভূত হয়েছে, কিন্তু অসাধারণত্বের উৎস খুঁজে পায় নি। তাই এই দুইজনই 'Saint',

তৃতীয় ব্যক্তিটি নেহেরু, অসাধারণ হয়েও সাধারণ। এঁর কথা বোঝা যায়, চিন্তার সূত্র ধরা যায়। এ-লোকটি 'Saint' নয়, মানুষ, ইংরেজের চেনা মানুষ। এবং ইংরেজ-জাতিরই খণ্ডাংশ।

নেহেরু-গান্ধীর পার্থক্যটি এট্লির কথায় স্পষ্টতর হয়েছে—

"..Gandhi.. though a very good man, could be very tricky. Gandhi was a saint, but he was a bit like

Gladstone, who, as everybody knows, is said to have produced the ace of trumps from his sleeve and remind you who put it there. Stafford Cripps's mission to India would have succeeded if Gandhi had not been so difficult. Not only was he stubborn : he was unpredictable. Nehru was altogether easier to deal with, practical, rational and flexible, and with singular personal charm." (Lord Attle, A great but tragic leader. Observer, May 31, 1964)

গান্ধী 'Saint', 'stubborn', 'unpredictable', নেহেরু 'practical', rational and flexible', তার কারণ একজন 'Oriental' আর একজন 'European'—এট্লি এ-কথাটা স্পষ্ট করে না বললেও ইংরেজ সাংবাদিকদের কলমে এ-কথাটা স্পষ্টতর হয়েছে।

নেহেরুর মৃত্যুর পর ইংরেজ সাংবাদিকদের কলমের জোরে ইংল্যাণ্ডের লোকে জানতে পারল নেহেরু কতখানি ইংরেজ এবং কতখানি অ-ভারতীয়। নেহেরু-সম্পর্কে এ-পর্যন্ত ইংরেজী সংবাদপত্রে আমি দেখেছি তাদের সকলেরই ধ্রুবপদ এক—নেহেরু বৃটিশ-সংস্কৃতি-বৃক্ষের ফল, অকস্মাৎ খসে পড়েছেন ভারতবর্ষের মাটিতে। শৈশব ভারতবর্ষে কাটলেও ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীর সংগে নেহেরুর কিছুমাত্র যোগ ছিল না। এলাহাবাদে মতিলাল নেহেরুর বাড়িতে ইংল্যাণ্ডের হাওয়া বইত। তাই এদেশে যখন এলেন তখন নেহেরুর মন স্লেটের মত, ভারতবর্ষের আঁচড়টিও পড়ে নি। সাত বছর হ্যারো-কেম্ব্রিজে কাটিয়ে একেবারে পাকা ফলটি হয়ে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে গেলেন। নেহেরু ইংল্যাণ্ডেরই খণ্ডাংশ। তাই তাঁর মৃত্যুসংবাদে ইংরেজ জাতির মুখ থেকে সর্বপ্রথম যে বার্তাটি বেরিয়ে এসেছিল তা শোক-বার্তা নয়, হতাশা আর আক্ষেপের বাণী "The end of British Raj in India"

নেহেরুর ইংরেজত্ব প্রমাণ করতে ইংরেজ সাংবাদিকরা যুক্তি-প্রমাণও অনেক জড় করেছেন। নেহেরুর নিজের কথা যেটা তাদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে তা সকলেই উদ্ধার করেছেন, যেমন—

"I have become a queer mixture of East and West. I am out of place everywhere and at home nowhere."

(এই উক্তি আটখানি সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হয়েছে)

টাইমস-পত্রিকার জী ব নী-লে খ ক ও নেহেরুর নিজের উক্তি উদ্ধার করেছেন,

"In his likes and dislikes he later said, 'perhaps more an Englishman than Indian.'

কেউ কেউ প্রসংগটিকে নির্লজ্জভাবে একটু বেশীদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। Daily Express-এর প্রবন্ধ লেখক George Gale বলেছেন,

"He was very English, chosing that tongue in which to think and, whenever he could avoid Hindi, in which to speak."
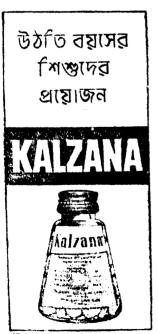
কারো মনে এমন ধারণাও আছে যে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে নেহেরু ভারতবাসীর সঙ্গে কখনও নিজেকে একাত্ম করে নিতে পারেন নি। অন্তত, একজন প্রবন্ধ-লেখকের যুক্তি দেখে মনে হয়, নেহেরু যেন মাউন্টব্যাটেনের উত্তরাধিকার অর্থাৎ দেশীয় Viceroy.

"Nehru never loved the (Indian) people, and indeed, appeared at times actively to hate them."

পরবর্তীকালে নেহেরু যা করেছেন এবং যা করেন নি তা বিচার করবার আগে ইংরেজ সাংবাদিকদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল "he had the education of an English Prime Minister (Harrow and Trinity College, Cambridge)"

এই ধ্রুবপদটি নেহরু সম্পর্কে যাবতীয় সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ এবং সংবাদের অবলম্বন।

॥ ২ ॥

নেহেরুর মৃত্যুসংবাদ এ-দেশের সংবাদপত্রে কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং কোন্ কাগজে নেহেরু-জীবনের কোন্ অংশ প্রাধান্য পেয়েছে তার একটা আভাস পাওয়া যাবে ২৮শে মে'র বিভিন্ন কাগজের সংবাদ, প্রবন্ধ এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনামা থেকে। তবে এখানে বলে রাখি সব কাগজেই ধ্রুবপদ এক। নেহেরুর অসুস্থতার সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ২৭শে মে বেলা ১টার সময় 'Evening News' এবং 'Evening Standard'-এ।

তারপর মৃত্যুসংবাদ Evening News-এ বেরয় তখন বেলা পাঁচটার সময়।

Evening News : প্রথম খবর "Nehru is Dead"; প্রবন্ধ "Nehru... with all his faults a great man." সন্ধ্যা ছটার সময় Evening News-এর Late Extra edition-এ নেহেরুর মৃত্যু-সংবাদ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, প্রথম এবং প্রধান সংবাদ "The Queen for Bonn".

The Times : টাইমস-এর প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন এবং কাহিনী ভর্তি থাকলেও টাইমস-এর সংবাদের শ্রেণীবিভাগে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে না। তাই যথাস্থানে সংবাদ পাওয়া গেল :

"The queen sends her sympathy to people of India."

সম্পাদকীয় :

"World Citizen"

শোক-সংবাদ :

"Mr. Jawharlal Nehru: his life and work Nationalist leader and international statesman."

The Gurdian

সংবাদ :

"Indians' anxious look at the era after Nehru"

সম্পাদকীয় :

"Death of a hero and Creator"

শোক-সংবাদ :

"Jawharlal Nehru. The Commonwealth's elder statesman"

Daily Telegraph

সংবাদ :

"India mourning death of Nehru Sir Alec flies out for funeral Temporary Premier sworn in"

প্রবন্ধ :

"Nehru : a nation without an heir" লেখক Martin Moore

সম্পাদকীয় :

"Death of an Epoch"

Daily Mirror : এই কাগজটি ইংল্যাণ্ডের সর্বাধিক প্রচারিত। এটি প্রধানত কুৎসা ও লাম্পট্য কাহিনীর প্রচারক। বহত্তর জগতের খবর এ-কাগজে গৌণ হয়ে দেখা দেয়। তাই নেহেরুর মৃত্যু-সংবাদও প্রধান সংবাদরূপে ছাপা হয় নি, প্রথম পাতার ডান পাশে ছোট অক্ষরে ছাপা হয়েছে।

সংবাদ :

"Nehru is mourned by weeping thousands"

প্রবন্ধ :

"The man who breathed life into a nation — Gordon Jaffary

Daily Herald : এই কাগজের সংবাদটি সবচেয়ে বৃহৎ অক্ষরে এবং সবচেয়ে বেশী জায়গা জুড়ে (আট কলমে) ছাপা হয়েছে। সংবাদ পরিবেশনের মধ্যেও আবেগ লক্ষ করা যায়।

সংবাদ :

"The giant lies in state on his door-step"

তারপর বৃহৎ অক্ষরে "Farewell to Nehru"

এই কাগজের প্রথম পাতার ডান দিকের কোণে প্রতিদিন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনার চুম্বকটি দেওয়া থাকে। ২৮শে মে Daily Herald-এর "The world this morning" শীর্ষক কোণটিতে ছাপা হয়েছে—

"The world says farewell to Nehru. It is the end of a chapter of history

প্রবন্ধ :

"The Nehru I knew before his heart was broken"—James Cameron. সংক্ষিপ্ত জীবনীর শিরোনাম—"Britain jailed him nine times

সম্পাদকীয় :

"How to help India now"

সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত। সবটা উদ্ধার করে দিচ্ছি। এই প্রসঙ্গে নেহেরুর কার্যাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ নেই। প্রবন্ধ লেখকের বক্তব্য একটিমাত্র—

"Whoever leads India after Nehru leads a nation of 438 million people. Many of them exist on £2 a month. Whoever leads India leads a land where millions of men, women and children still go hungry all their lives. A land where every effort to

raise living standards is baffled by the growing number of mouths to feed.

A land under threat from Communism across the frontier, and religious bigotry at home.

A land where nevertheless, despite these staggering odds, some form of democracy and freedom survive.

That survival is Nehru's monument. And if the world mourning for Nehru today is sincere, then the world must help India on a far more massive scale than at present."

অনেক কাগজে নেহেরুর জীবনী বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাঁর মহত্ত্ব এবং অসাধারণত্ব কোথায় তা আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোন লেখকই Daily Herald-এর সম্পাদকীয় লেখকের মত আন্তরিক সুরে কথা বলতে পারেন নি। সকলেই নিরপেক্ষভাবে ঘটনা বিশ্লেষণ এবং বিচার করেছেন। কিন্তু এই প্রবন্ধের লেখক নিরপেক্ষভাবে নয়, ভারতবর্ষের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি নিয়ে একটি ছোট কথা বলেছেন সহজ সুরে। এই ছোট কথাটি বিশ্ববাসী এবং ভারতবাসী সকলেরই বর্ণগোচর হওয়া উচিত।

Daily Mail

সংবাদ ঃ

"Three miles of tears"

সম্পাদকীয় ঃ

"The star of India"

প্রবন্ধ—১

"Nehru this was a man who suffered but was not bitter." Earl Attle

২

"Nehru this was a man divided against himself" : F. G. Prince-White

৩

"Death by democracy : What more fitting epitaph" : Derek Ingram.

Ingram-এর ছোট্ট প্রবন্ধটিতে আন্তরিকতার স্পর্শ আছে। তাঁর একটি মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ।

"If ever a man refused a dictator's crown it was Nehru. He could so easily have cashed in on the hero-worship."

প্রায় অধিকাংশ ইংরেজ সাংবাদিকের মতের সঙ্গে Ingram-এর মতের মিল হবে না। এমনকি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Dr. Hugh Tinker-এর সঙ্গেও মিল হবে না। তাঁর মতে—

In Nehru's India there was only one King—Nehru."

Daily Sketch : ২৮শে মে সকালে প্রকাশিত এই একটিমাত্র কাগজের প্রথম পাতায় বড় অক্ষরে নেহেরুর মৃত্যু-সংবাদ ছাপা হয় নি। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সংবাদটি ছাপা হয়েছে এইভাবে—

"Nehru train is stoned Police use tear gas to break up 6000 crowd."

বলা বাহুল্য সংবাদটি মাদ্রাজ-দিল্লি এক্সপ্রেস ট্রেনের।

প্রবন্ধ ঃ

"The battle for Nehru's Crown" : Dr. Hugh Tinker.

Daily Express

সংবাদ ঃ

The last homage

প্রবন্ধ—১

who follows ?

২

Nehru—Politician first or a poet?

সম্পাদকীয় ঃ

Man of India.

॥ ৩ ॥

বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি পড়ে এই ধারণা হয় যে, নেহেরু সম্পর্কে ইংরেজের ধারণা মিশ্র। কেউ তাঁকে সাধারণ মানুষ বলেছেন, কেউ বলেছেন অসাধারণ। তবে প্রায় সকলেই একমত যে, জাগতিক ব্যাপারে তাঁর আদর্শ ছিল দুটি—একটি আদর্শ তিনি প্রয়োগ করেছেন ভারত-ব্যাপারে, দ্বিতীয়টি প্রয়োগ করেছেন বিশ্ব-ব্যাপারে। গোয়া-কাশ্মীর ব্যাপারে তাঁর চরিত্রের দীনতা প্রকাশ পেয়েছে। চীনের ভারতবর্ষ আক্রমণে নেহেরুর আজন্মলালিত আদর্শকে নিজের চোখের সামনে ধূলিসাৎ হতে দেখেছেন। এইটিই নেহেরুর মৃত্যুর কারণ।

ঘটনা-বিশ্লেষণ ও সমালোচনার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু নেহেরুর মৃত্যু-সংবাদ যে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে সেই কাগজেই নেহেরুর সম্পর্কে রূঢ় মন্তব্য, কঠোর সমালোচনা করে ইংরেজ সাংবাদিকেরা সাধারণ সৌজন্যটুকুও প্রকাশ করতে পারেন নি। কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি—

Daily Sketch-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য—

He (Pandit Nehru) appeared as a man of peace, yet he invaded Hyderabad, Goa and Kashmir, and dealt ruthlessly with the Nagas.

Abroad he paraded his neutralism and tended to lecture countries which had to use force, however legitimate.

In the process he gave the impression of being "holier than you." So when the Chinese shattered his neutralism and surged over the Himalays, people were tempted to say "serve him right".

History will show that his greatness lay not in world affairs, but in keeping India a United Nation.

Daily Express কাগজে George Gale-এর প্রবন্ধে—

"Nehru was the Rupert Brooke of politics: a minor man cast in a major role .... He was incapable of delegating authority. The most minute trivia of Government would pass through his hands .... In Kashmire and in Goa India used

its might to usurp local rights. That policy of non-aggression which Nehru preached to the world he neglected to follow at home.... His greatest success was that he held together that part of Indian Empire which he inherited."

Daily Sketch-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সুর আর George Gale-এর সুর এক। Harold Walton-এর কাছ থেকেও প্রায় একই কথা শোনা গেছে।

"H's almost personal rule which began with such high hopes when the British left India in 1947 ended in an atmosphere of apathy and disillusion. . . . His record was one of much attempted, little done. And to make things worse, there was in his subtle character an element of "holier than thou" and pompons hypocrisy that lost him in the west the sympathy of many people who could have helped him most."

তবে ভরসার কথা এই—Daily Sketch-এর সম্পাদকীয়-লেখক, George Gale এবং Harold Walton-এর মত লোক সংখ্যায় বেশী নয়। এবং এদের বক্তব্য যাদের কাছে পৌঁছয় তাদের সারাজীবন কাটে মাটির নীচে কয়লার খনিতে, বা ফ্যাক্টরীর কারাগারে। তাদের দিন শুরু হয় ভোর ছ'টায়, সন্ধ্যায় 'লোকাল' হয়ে বিছানা। এদের বিশ্ব ফ্যাক্টরী-লোকাল-বাড়ি—এই গণ্ডির মধ্যে। আর ইংল্যাণ্ডের শতকরা ৯০ জনের গণ্ডি তো ঐ। বাকী যে শতকরা দশজন তাঁরা শ্রদ্ধেয়। তাঁদের মনে নেহেরুর স্পষ্ট চিত্রই আঁকা আছে, দোষ-গুণ সুদ্ধ। কিন্তু এই শতকরা দশজন নেহেরুকে ইংরেজ-সংস্কৃতির দান প্রতিপন্ন করতে তৎপর।

আসলে ইংরেজ জাতটা দাম্ভিক। এদের কাছ থেকে নিরপেক্ষ বিচার আশা করা যায় না। নেহেরুর কীর্তিকে বড় করে দেখে স্বজাতির ছায়াটা বড় করে দেখবার জন্য, এ-দৃষ্টি নিরাসক্তের দৃষ্টি নয়। নেহেরুর কীর্তিকে যে ছোট করে দেখে তাও স্বজাতিকে বড় করে দেখবার জন্য। এটাও নিরাসক্ত দৃষ্টি নয়। ইংরেজ জাতির দোষ এবং গুণ যদি কোন একটি লোকের দেখতে পাওয়া যায়—সে-লোকটি চার্চিল। নেহেরু সম্পর্কে চার্চিল মৌন। এতেই প্রমাণ হয় নেহেরুর মৃত্যুতে ইংরেজ জাতি মৌন। এ মৌনতা যে শোকের গভীরতায় তা মনে করবার কারণ নেই। গান্ধী-নেহেরু সম্পর্কে চার্চিলের মনোভাবটি এটলী সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন—

".... I was responsible for introducing him (Nehru) to Winston Churchill. They were both at Buckingham Palace one night. I said to the King, "Here's a bit of fun. There are two old Harrovians here who've never met each other." I made the introductions.

Churchill, who could also charm your boots off when he wanted to, greeted Nehru with, "May I say that I very much admired the way you handled the rioting in Bihar, you showed great courage in using force there." Nehru said "I have read your memoirs with great interest." They sat and talked for half an hour, and got on very well. However, Winston always regarded Nehru as quite impossible, though better than Gandhi. Winston thought Gandhi absolutely hopeless."

নেহেরু সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচার যদি এ-দেশের কোন কাগজে হয়ে থাকে তা হলে তা হয়েছে 'Observer' কাগজে। ভারতবর্ষে তাঁর নীতির সুফল-কুফল স্বতন্ত্র বিচার। কিন্তু বিশ্ব-ব্যাপারের একটি বিষয়ে নেহেরুর কৃতিত্ব যে ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে সে-সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। সে-বিষয়টি হচ্ছে 'তৃতীয় বিশ্বসৃষ্টি'। এ-সম্পর্কে Observer-এর মন্তব্য—

"It was his prime achievement in the international sphere that he created a special kind of neutralism. He prevented the anti-imperialist movement—with all its fierce emotional force—from becoming inevitably linked with the Russian-Chinese camp. It would have been very easy for India—and much of Africa—to slide from an anti-imperialist position to an anti-western position. He invented, virtually by himself, the concept of the Third World; and however much this has been damaged by China, it remains an idea which dominates two continents."

'কী আবার শুনব। তোমরা যা শোনাও তাই তো শুনি।'

'আর কেউ কিছু বলেনি?'

'না।'

'কেউ কোন খবর দেয়নি। ফোনে টোনেও কেউ কিছু বলেনি?'

অমলা একটু বিস্মিত হলেন যেন।

শশাঙ্ক নিরাসক্তভাবে বলল, 'না।'

অমলা ছোট জায়ের দিকে তাকালেন, 'মণীষা তুই-ই বল। তুই-ই তো সব আগে শুনেছিস। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ তো তোরই বেশি।'

মণীষা বললেন, 'তুমিই বল না দিদি। সব খারাপ খারাপ খবর বুঝি আমাকে দিয়ে বলানো চাই তোমার।'

শশাঙ্ক বউদিদের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা একটু আন্দাজ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঠিক ধরতে পারল না।

তারপর ফের একটু হেসে বলল, 'বলো বলে ফেল। আমার আর ভালোমন্দ কী আছে। সমুদ্রে যার শয়ন তার আর শিশিরে কী ভয়। তোমাদের কণিষ্ঠা জা কি দ্বিতীয়বার পাণি পরিগ্রহ করেছেন?'

মণীষা একটু হেসে বললেন, 'তাই করাই উচিত ছিল। তাহলেই তোমার সমুচিত শিক্ষা হত। কিন্তু বোকা বউটা সব ছেড়ে দিয়ে মনের দুঃখে গেরুয়া পরে কোন আশ্রমে না কোথায় গিয়ে উঠেছে। সত্যি, তার কথা ভাবলে দুঃখে বুক ফেটে যায়।'

শেষে আর হাসলেন না মণীষা। তাঁর গলা ভারি হয়ে উঠল।

শশাঙ্ক একটুকাল চুপ করে রইল। তারপর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল। অল্প বয়স থেকেই বউদিদের সামনে সে সিগারেট খায়। নতুন করে আর অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই।

মণীষা বললেন, 'এক কাজ করো ঠাকুরপো। চল আমরা তিনজনে মিলে সেই আশ্রমে গিয়ে চড়াও করি। ছোট বউকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আনি।'

শশাঙ্ক সিগারেটের ছাই মেঝেয় ঝাড়তে যাচ্ছিল হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল। চীনে মাটির সুদৃশ্য অ্যাসট্রেটা নিয়ে এল পেড়ে। সুজাতা মেঝেয় ছাই ছিটানো পছন্দ করত না।

অমলা বললেন, 'মণি মন্দ কথা বলেনি। চলনা ঠাকুরপো তুমি যদি যাও, আমি সঙ্গে যেতে পারি।'

শশাঙ্ক এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর মুখ তুলে হেসে বলল, 'বল কি ছোট বউদি? তাকে উদ্ধার করবে তোমরা? সেই তো আমাদের চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করবার জন্যে সন্ন্যাসিনী হয়েছে। শুনেছি বংশে কোন পুরুষ ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয় তার পুণ্যে সাতপুরুষ উদ্ধার পেয়ে যায়। মেয়েদের মহিমা তো আরো বেশি। তাছাড়া তারা দ্বিকুল-বর্তী। তাদের কেউ সন্ন্যাস নিলে পিতৃকুলের সাত-পুরুষ আর পতিকুলের সাত-পুরুষ দুইয়ে-মিলে চোদ্দ-পুরুষ—নাকি চোদ্দ আর চোদ্দয় আঠাশ পুরুষ ঠিক জানিনে—সেই সুকৃতির ফলে হাতে হাতে স্বর্গ পায়।'

অমলা হেসে বললেন, 'শাস্ত্রটাস্ত্র সব দেখি জানো। তবু কেন এত অনাচার কর বলতো।'

মণীষা বললেন, 'সত্যি, বেশ হত কিন্তু। দিদির এই ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে যদি সুজাতাকে আমরা নিয়ে আসতে পারতাম তাহলে দুই বাড়ি মিলিয়ে একটা মহোৎসব করা যেত।'

শশাঙ্ক বলল, 'তোমাকেও কি বাদ যেতে দিতাম? তোমারও একটা বিবাহ ষান্মাসিকী কি সাপ্তাহিকী বানিয়ে নিয়ে—'

'বেশ তো বানিয়ো। আমাকে নিয়ে তুমি যা খুশি করো কোন আপত্তি নেই আমার।'

শশাঙ্ক হেসে বলল, 'বউদি, এসব কথা কি ভালো হচ্ছে? ছোড়দা শুনতে পেলে তোমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু আমি দাগী আসামী, আমাকে ফাঁসি দিয়ে ছাড়বে।'

মণীষা একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'তামাশা রাখো। সত্যি তোমার সেখানে যেতে আপত্তিটা কি?'

'ওরে বাবা, সেই মহিলা আশ্রমে? সেখানে পুরুষরা ঢুকতে পায় নাকি?'

অমলা হেসে বললেন, 'জানো দেখি সব। তোমার তো সব জায়গায় গতিবিধি। যাও না একবার ওখানে। দেখি কী রকম বীরপুরুষ।'

শশাঙ্ক হেসে উঠল, 'ওরে বাবা,

বন্ধু বলেন আমি অ্যাডোলেসেন্সের সীমানা পার হইনি। অনেকেই হয় না। শুধু তারা স্বীকার করে না, আমি করি।'

অমলা বললেন, 'আজ যাই ঠাকুরপো।'

'একটু দাঁড়াও। তোমাকে একটা জিনিস দিই।'

শশাঙ্ক পা বাড়িয়ে পূব দিকের লাইব্রেরী ঘরে ঢুকল। লাইব্রেরী তো নয় লাম্বাররুম হয়ে পড়ে আছে ঘরখানা। এলোমেলো ভাঙা-চোরা জিনিস পত্রে ঠাসা। গোটা পাঁচেক আলমারি ভরা বই, এক কোণে মাকড়সার জালে জড়ানো ছবি আঁকার ক্যানভাস, এক ধারে সেই যে ছ' মাস আগে মন্দিরার বিয়েতে বইগুলি পাঠিয়েছিল ঠিক একই ভাবে প্যাক করা পড়ে আছে। ওর মধ্যে আছে কালিদাসের শোভন সংস্করণ, বৈষ্ণব পদাবলী, প্রথম যৌবন আর মধ্য যৌবনের রবীন্দ্রনাথ, গীত বিতানের রবীন্দ্রনাথ, শেলি কীটস, ব্রাউনিং আর সুইনবার্ন। হ্যাঁ, সুইনবার্নও। কাব্য রুচিতে শশাঙ্ক কিছুতেই কৈশোর অতিক্রম করতে পারল না। এ যেন মন্দিরাকে নয়, নিজেকেই উপহার দিয়েছিল শশাঙ্ক। সেই উপহার নিজের কাছেই ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে নীল ঢাকনিতে ঢাকা সেতারটাও। এক সময় শশাঙ্কের সংগীত চর্চার একটু সখ হয়েছিল। মন্দিরাকে সাধাসাধি করেছিল শিখবার জন্যে। তারই নিদর্শন। সব ফিরে এসেছে। কে জানে কে ফেরৎ দিয়েছে? মন্দিরা না তার বাবা? হয়তো দুজনেই। এই প্রত্যাখ্যান কারো কাছ থেকেই অপ্রত্যাশিত নয়। আর তার ভাইপো বড়দার মেজো ছেলে বলাইর ব্যবহারও সেদিন সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ছিল। সে এসে ঘাড় ফুলিয়ে চোখ মুখ লাল করে শশাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। যেন অপমানের পুরো প্রতিশোধটা সে তার কাকার ওপর দিয়েই তুলবে।

'ছোট কাকা, তুমি কেন ওদের ওখানে আমাকে পাঠালে। তুমি কি জানো না, ওরা ছোটলোক? ওরা ইতর? ভয়ংকর ইতর?'

শশাঙ্ক হেসে ভাইপোকে শান্ত করতে গিয়েছিল, 'আরে বলরাম তুমি যে সত্যি সত্যিই একেবারে হলধর হয়ে উঠলে। হয়েছে কী বল না?'

বলাই শান্ত হয়নি। সে আরো চড়া গলায় বলেছিল, 'ছোট কাকা, তোমার ওই অ্যালিটারেশন রাখো। অ্যালিটারেশনে সব ঢাকা যায় না। নিতান্তই তোমার বন্ধু। নইলে এক ঘুষি দিয়ে আমি ওই বুড়ো ডাক্তারের নাক ভেঙে দিয়ে আসতাম। ইতর কোথাকার।'

অপমানিত উদ্ধত রোষ দীপ্ত সেই যৌবনের মূর্তি শশাঙ্ক মুগ্ধ চোখে দেখে নিয়েছিল। হ্যাঁ, এই হল যৌবনের আসল রূপ। এ যৌবন দ্বিজ নয়, একদেহে একবারের বেশি আসে না। এক দেহ থেকে আর এক

দেহে, এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে আশ্রয় নেয়। সেও যেন এক বহুচারী ব্যভিচারী পুরুষ।

তারপর বলাই নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল। ওঁকি সব জানে, নাকি জানে না? ওঁকি জানে যত্রতত্র অনুপ্রাস ছিটানোই ছোট কাকার একমাত্র দোষ নয়? ওঁকি সব ক্ষমা করে, নাকি করে না? ওঁকি জেনে গেল যে ঘুষি যোগরঞ্জনের নাকে বলাই বসাতে পারেনি, সেই ঘুষিতেই সে তার ছোট কাকার চোখা নাকটা থেঁতলে দিয়ে চলে গেছে? না, যোগরঞ্জনের মত পৌরুষ নেই শশাঙ্কের, নেই বলাইয়ের মত অমন বজ্রমুষ্টির জোর। কারণ শশাঙ্ক নিরপেক্ষ; সে এখনো ঠিক করতে পারেনি ঘুষিটা কার নাকের ওপর বসিয়ে দিতে হবে, যোগরঞ্জনের না শশাঙ্ক ঘোষালের।

'এই ঠাকুরপো, হল তোমার?'

'এই হয়েছে বউদি আসছি।'

একটা আলমারির তাকে কিছু মূর্তির সংগ্রহ আছে শশাঙ্কের। সোপস্টোন চীনে মাটির, কালো পাথরের, শ্বেত পাথরের। শিবের, বুদ্ধের, নটরাজের, কৃষ্ণরাধার মহাশিল্পীর গড়া [illegible] চাষীর হাতুড়ী হল মজুরের সেই সঙ্গে লক্ষ্মীর আর গণেশের। তাও বিচার করেনি শশাঙ্ক, শ্রেণী বিচার করেনি, ধর্ম বিচার করেনি। চোখে যা ভালো লেগেছে তাই নিয়ে এসেছে। শুধু ফর্ম, শুধু রূপের উপাসনা। 'চেয়ে দেখ মন, কত যে ত্রিভঙ্গ নয়ন!' বলেছে আর দেখেছে। বিল্বমঙ্গলের মত নিজের হাতে তবু দু চোখ অন্ধ করতে পারেনি।

বউদিকে কী দেওয়া যায়? একটু ভাবতে হল, একটু খুঁজতে হল। তারপর সেই প্রাচীন মূর্তিটি হাতে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল শশাঙ্ক।

'এই নাও বউদি তোমাদের বিবাহ-বার্ষিকীর উপহার। [illegible] আমি ঠিক [illegible] পারি। তাই এইটেই নিয়ে এলাম। নাও।'

বড় বউদি হাত বাড়িয়ে শ্বেত পাথরের মূর্তিটি তুলে নিলেন। যুগল মূর্তি।

হেসে বললেন, 'এ যে [illegible]!'

শশাঙ্ক একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি? আমি তো নাস্তিক মানুষ। দেবদেবীর মূর্তি চিনিনে। আমি তো তোমাদের দুজনের মূর্তি ভেবে কিনে এনেছি।'

কথাটা সত্যি নয় তা অমলাও জানেন। তবু ওঁর চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। বললেন, 'ঠাকুরপো তুমি তো সবই দেখ কী ভালো, কী মন্দ সবই জান তবু কেন অমন কর বল তো!'

শশাঙ্ক বলল, 'সেইটেই তো বুঝতে পারিনে বউদি। সেই তো এক হেঁয়ালি।'

মনিঅর্ডারের ফর্ম পূরণ করা খানিকক্ষণের জন্যে পিছিয়ে গেল। চাকরকে শেভ করার জিনিসগুলি এনে দিতে বলল শশাঙ্ক। একটু বাদে আয়নায় দুগালে সাবান মাখা প্রতিচ্ছায়াকে সম্বোধন করে সে নিজের মনে বিড় বিড় করতে লাগল।

'তুমি তাহলে স্বীকার কর শশাঙ্ক, সত্যিই যাত্রার দলের অধিকারী একজন আছে। তুমি তাঁর হুকুমে কখনো গালে রঙ মাখো কখনো চূণকালি মাখো। এতদিন কিন্তু তা স্বীকার করতে না। এতকাল তুমি অন্য কথা বলে এসেছ। কিছুক্ষণের জন্যে কি কিছু দিনের জন্যে এক একটি নারীর ওপর তুমি তোমার অধিকার খাটিয়েছ আর ভেবেছ তুমি সর্বেশ্বর, তুমি সর্বাধিকারী। তোমার নিজের ওপর সেই একই রকমের অধিকার তোমার আছে। নিজের চরিত্র তোমার নখ-দর্পণে। তুমি আর কাউকে চালাতে পার আর না পার আর কিছু চালাতে পার আর না পার নিজের মনোরথ তোমার আয়ত্বের মধ্যে। এখন তুমি স্বীকার করছ তা নয়। এখন তুমি অধিকারীর দোহাই পাড়ছ, এখন তুমি হেঁয়ালির কথা তুলছ। কিন্তু এও নিজের মনকে আঁখিঠারা। কে সেই অধিকারী? নিশ্চয়ই ঈশ্বর নয়। ঈশ্বরকে তুমি ওই ধরণে ওই ধারণায় বাঁধতে পার না। সেখানে তুমি বসিয়েছ বিজ্ঞানকে। জীব-বিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞানকে। হেরিডিটি আর এনভিরনমেন্টের মধ্যে তুমি তোমার চরিত্রের, তোমার প্রবৃত্তি প্রবণতার মূল খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছ। কিন্তু বেশি দূর এগোতে পারনি। কারণ তোমার মন বৈজ্ঞানিকের মন নয়। বিজ্ঞানের অ আ ক খ না শিখেও তুমি বৈজ্ঞানিক। তুমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির গর্ব কর—সেও এক অশিক্ষিত পটুত্বের অহংকার। যে অজ্ঞানতা যে মূঢ়তা নিয়ে মানুষ ভগবানকে মানে সেই মূঢ়তা নিয়ে তুমি বিজ্ঞানকে মানছ। তোমাদের দুজনের মধ্যে আর কোন তফাৎ নেই। শুধু শব্দের তফাৎ। ভগবানকে মানা এক যুগের ফ্যাশান ছিল, বিজ্ঞানকে মানা এ যুগের ফ্যাশান। এই পর্যন্ত। তুমি জ্ঞানের সাধনা করনি, বিজ্ঞানের সাধনা করনি, দর্শনের সাধনা করনি। দর্শন মানে তোমার কাছে শুধু দু চোখ দিয়ে দেখা। বুদ্ধি দিয়ে দেখা নয়, যুক্তি দিয়ে দেখা নয়, হয়তো অনুভূতি দিয়েও দেখা নয়। শুধু ইন্দ্রিয় আর আবেগ দিয়ে দেখা। জ্ঞানের জায়গায় তুমি রূপকে বসিয়েছ। রূপকে? যা তোমার দেখতে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে তার বাইরে তোমার আর কিছু ভালো লাগে না। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এই যে তোমার রুচি এ তোমাকে কতটুকু দিতে পারে, কত দূর নিয়ে যেতে পারে? সেই রূপ বোধকেও তুমি শুধু নারী-রূপের সঙ্গে বেঁধে রেখেছ। আশ্চর্য তোমার সংকীর্ণতা, রক্ষণশীলতা। অথচ নারীর রূপ রূপই নয়, পুরুষের তুলনায় তা অনেক নিকৃষ্ট। শুধু নারী বিদ্বেষী দার্শনিক নয়, অনেক রূপ তাত্ত্বিক জীব-তাত্ত্বিকেরও সেই মত। নারী রূপের ওপর পুরুষের এই যে পক্ষপাত এ শুধু যৌন-প্রেরণার জন্যে, প্রজননের জন্যে। তুমি অবশ্য তা মান না। তোমার কাছে নারী পরম রূপের আধার। এ বিচার যদি পক্ষপাত দুষ্ট হয় তাতেই বা ক্ষতি কি। আমাদের কোন্ বিচারই বা নিরপেক্ষ? কোন বিচারই বা আপেক্ষিক নয়?

তব, শুধু একটি মাত্র রূপকেই বিশ্বরূপের সঙ্গে একাত্ম করে দেখার কোন মানে হয় না। এ তোমার রূপতৃষ্ণা নয় — এ তোমার বিকৃত তৃষ্ণা। তাইতো তৃষ্ণার ওপর মাঝে মাঝে তোমার এমন বিতৃষ্ণা আসে।"

"শশাঙ্ক তুমি বীর নও; ওই যে সেদিনের ছোকরা বলাই তোমার ভাইপো—ওর যে পৌরুষটুকু আছে তোমার তা নেই। ওর ভিতরে যে শক্তিটুকু আছে, অন্যায় অবিচার দেখলে ওর চোখে যে আগুনটুকু জ্বলে তোমার তা জ্বলে না। কিন্তু ইচ্ছামত তুমি তোমার নিজের সিগারেটটাও জ্বালাতে পারবে না। এ অক্ষমতাকে তুমি ক্ষমা করবে কী করে? সুজাতাকে ধর্মীয় মঠ দখল করেছে করুক — নন্দিতাকে তার স্বামী দখল করেছে করুক, স্থায়ী দখলীস্বত্বে তোমার বিশ্বাস নেই; কিন্তু নিজে তুমি নিজের বেদখলে চলে যাবে একি রকম কথা শশাঙ্ক? নিজের চরিত্র তুমি কিছু কিছু হয়তো বুঝতে পেরেছ। তুমি যা তার জন্যে তুমি কিছুটা হেরিডিটিকে দায়ী করতে পার কিছুটা বা

পরিবেশকে। কিন্তু তাতেই কি তুমি নিষ্কৃতি পাও? শুধু দাবী করাটাই কি সব? দায়িত্ব নেওয়াটা কি তার চেয়েও বড় কথা নয়? তোমার স্বোপার্জিত ধন কি কিছুই নেই। শুধু তুমি কী হয়েছ, কেন হয়েছ তা জানাটাই কি সব? তুমি যা হতে চাও তাই হয়ে উঠতে পারাই কি বড় কথা নয়!"

"তুমি যে কী চাও তা জানো না শশাঙ্ক। নিজের ইচ্ছাকে তুমি দেখতে পাও না। তার জন্যে যে ইন্টিগ্রিটি থাকা দরকার তা তোমার নেই। ফলে নিজের ইচ্ছার জোর হারিয়ে তুমি সেই ইচ্ছাময় কি ইচ্ছাময়ীর অধীন হয়ে পড়েছ। দুদিন বাদে তুমি তাই তুলে বলবে শশাঙ্ক—ইচ্ছাময়ী তারা তুমি যা করাও তাই করি। তুমি তো করাও তাই করি।' তুমিও বলবে ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' তুমি কী হতে চাও তা জানো না। তুমি যদি শুধু একটি মেয়ের হৃদয়েশ্বর হয়ে থাকতে চাইতে তা হওয়া তোমার পক্ষে কঠিন ছিল না। কিন্তু তুমি কি শুধু বহু বল্লভ হতে চাও, শুধু বহু বল্লভ? অল্পাধিকতর তা হয়েও তো দেখেছ। কিন্তু তৃপ্তি নেই কেন? কেন তুমি বলতে পার না এই চাওয়াই পরম চাওয়া, এই হওয়াই পরম হওয়া, এই মূল্যেই পরম মূল্য? তুমি রক্ষণশীল নও, তুমি নীতি-বাগীশ নও তবু এ কথা তুমি বলতে পার না।"

"যেহেতু তোমার এক ইচ্ছা আর এক ইচ্ছাকে গ্রাস করে তাই তুমি নিজেকে সিপলট পার্সনালিটি বলে ভাবতে ভালো বাসো। শুধু স্পিলিট নয় তুমি স্প্লিন্টারসে ভরা। তুমি শুধু দ্বিখণ্ডিত নও, বহুখণ্ডিত নও, তুমি চূর্ণিত বিচূর্ণিত। এ কথাও তুমি ভাবতে ভালো বাসো, বন্ধুমহলে বলতে ভালোবাসো। তোমার মধ্যে সঙ্গতি নেই, সামঞ্জস্য নেই। এই নাস্তিত্ব আর নাস্তিকতা কিন্তু এক নয়। সত্যিকারের যে জড়বাদ তা তরল নয়, বায়বীয় নয় তা সীসার মত লোহার মতই কঠিন। তোমার চরিত্রের মধ্যে কোথায় সেই লোহ কাঠিন্য শশাঙ্ক? কোথাও নেই। তোমার বিশ্বাসে নেই, বোধে নেই, রুচিতে নেই, আদর্শে নেই। তুমি নিজেকে চূর্ণ-বিচূর্ণ বলে ভাবতে ভালো বাসো। কিন্তু এই জ্ঞান এই বিশ্বাস এই বিলাস তোমাকে কোথায় পৌঁছে দেয়? কোথাও না? বরং চেয়ে দেখ, গর্ব করার মত মানুষ যা কিছু গড়েছে তা তার অখণ্ড সত্তার সৃষ্টি। তার শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন তার অটুট সঙ্কল্পের, প্রবল মনোবলের সৃষ্টি। শশাঙ্ক, সেখানে আর মানুষ জড়বাদী নয়, স্থূল অর্থে নয়, সেখানে সে অধ্যাত্মবাদী। তোমার যে সত্তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে আছে তা তোমাকে ফের একটি একটি করে কুড়িয়ে নিতে হবে। সেই সহস্র চূর্ণকে গাঁথিয়ে নিয়ে ফের একটি অখণ্ড পাত্র করে তুলতে হবে। সেই জীবন পাত্র কাঁচেরই হোক, সোনারই হোক কিছু যায় আসে না। কিন্তু একটি পাত্র হওয়া চাই। তবেই তা হবে আধার। তবেই তুমি কিছু তাতে ধরে রাখতে পারবে তবেই তুমি কিছু ধরে দিতে পারবে।'

নিজের প্রতিবিম্বকে এই দীর্ঘ উপদেশ দিয়ে শশাঙ্ক বেশ একটু পরিতৃপ্ত হল। তার প্রতিবিম্ব পরম ধৈর্যে অটুট সহিষ্ণুতার সব কথা শুনেছে। একটুও প্রতিবাদ করেনি। শশাঙ্ক ভাবল এই বিনীত ছাত্রটি তার শ্রদ্ধেয় অভিজ্ঞ অধ্যাপকের কথা নিশ্চয়ই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবে।

শশাঙ্ক নিশ্চিন্ত মনে রেজরে নতুন ব্লেড পরিয়ে দাড়ি কামাতে বসল।

আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রীং ক্রীং ক্রীং।

টেলিফোন বেজে উঠেছে।

রামেশ্বর ধারে কাছে কোথাও নেই।

শশাঙ্ককেই উঠে গিয়ে ফোন ধরতে হল।

'হ্যালো কে?'

ফোনের ওপারে নিঃশব্দতা।

'কে? আমি শশাঙ্ক কথা বলছি। শশাঙ্ক সেন।'

'তুমি! আপনি! না, না, আমি তো চাইনি, আমি তো এ নাম্বার চাইনি। রং নাম্বার রং নাম্বার।'

একটি বিব্রত আর্ত, কিন্তু বড় মধুর আর পরিচিত নারীকণ্ঠ শশাঙ্কের কানে ধ্বনিত হতে না হতেই থেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে ফোনটি রেখে দেওয়ার শব্দও হল।

বিমূঢ় বিমুগ্ধ শশাঙ্কের প্রশ্ন তখনও থামে না, মন্দিরা? তুমি কি মন্দিরা? মন্দিরা তুমি?'

ফোন ছেড়ে দিয়ে শশাঙ্ক ফের তার আসনে এসে বসল।

সব ঠিক তেমনই আছে। সেই আয়না। আয়নার সেই আধখানা কামানো সাবানমাখা গাল। যেন শশাঙ্ক নয়, শশাঙ্কের একটি কার্টুন।

আর আয়নার উল্টোদিকে যেন শশাঙ্ক নয় শশাঙ্কের এক স্তব্ধ প্রতিমূর্তি। কিন্তু প্রবল এক ভূমিকম্পে ভিতরে ভিতরে চূর্ণ-বিচূর্ণ। একটু টোকা লাগলেই চারদিকে সব ছড়িয়ে পড়বে।

(ক্রমশ)

বিশ্ববিচিত্রা

নূতন ধরনের জ্বালানী

বাসনপত্র ও রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন রেখে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে রান্নার কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে জ্বালানীর সুব্যবস্থা একান্তই প্রয়োজন হয়। কয়লার উনুনে ঝামেলা অনেক—বিশেষ করে বর্ষাকালে বা স্যাঁত-সেঁতে আবহাওয়ায় উনান বাড়ির গৃহিনীর চোখে জল এনে দেয়। বিকল্প নানা ব্যবস্থার উদ্ভাবন আজ হয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বার্মা শেল উদ্ভাবিত পেট্রোল থেকে রূপান্তরিত এক প্রকার গ্যাস—যার নাম দেওয়া হয়েছে বারশেন। এই গ্যাসের সাহায্যে প্রজ্বলিত স্টোভ থেকে যে নীল শিখা বের হয় তাতে ধোঁয়া থাকে না এবং বাসনপত্রে ভুসো পড়ার বা রান্নাঘরে ঝুল পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এই গ্যাস বিষাক্ত নয় এবং বিস্ফোরণেরও সম্ভাবনা রহিত।

বারশেন গ্যাস থাকে একটি বিশেষ ধরনের ইস্পাতের সিলেণ্ডারে। সিলেণ্ডারে লাগানো রবারের একটা ছোট নল যুক্ত থাকে স্টোভে। সিলেণ্ডারে গ্যাস কমানো বাড়ানোর একটি রেগুলেটার এবং স্টোভেও গ্যাস প্রবাহিত করার ও বন্ধ করার সুইচ আছে। এক সিলেণ্ডারে ১৪½ কিলোগ্রাম গ্যাস ধরে। ৫।৬জন লোকের সংসারে মাসে এক সিলেণ্ডারই যথেষ্ট। তবে রান্নার পদ বেশী হলে দেড় সিলেণ্ডার গ্যাসও লাগতে পারে।

বর্তমানে এই বারশেন গ্যাস কেবল মাত্র কলকাতার পৌর এলাকার মধ্যেই বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। তার কারণ এই গ্যাস উৎপাদিত হয় বোম্বাইয়ে এবং সেজন্য বর্তমানে এখানে প্রচুর স্টক করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সিলেণ্ডারটি তৈরিতে যে বিশেষ ইস্পাত লাগে তা আনাতে হয় বিদেশ থেকে, আর তাই ইচ্ছামতো সিলেণ্ডারও তৈরি সম্ভব নয়। তবে বার্মা শেল আশা করেন যে ক্রমে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁরা সরবরাহ বৃদ্ধি করে যেতে পারবেন। বোম্বাই, দিল্লী ও মাদ্রাজে গৃহিনীদের কাছে এই নতুন জ্বালানী ইতিমধ্যেই বেশ প্রিয় হয়ে উঠেছে।

চাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহ সিলেণ্ডারের বন্ধন জমার পঞ্চাশ টাকা সিলেণ্ডার ফিরত দিলে প্রত্যর্পণ করা হয়। এক সিলেণ্ডার গ্যাসের দাম ২৩·১০ পয়সা এবং হটপ্লেটের দাম পড়ে এক বার্নার যুক্ত ৪৪·৭০ পয়সা থেকে ৫০·৫০ পয়সা এবং দু' বার্নার যুক্ত ৮৫·৭৫ থেকে ১২৯·৫০ পয়সা।

বারশেন—টেবিলের উপরে বসানো দুই বার্নারযুক্ত হট-প্লেট এবং ডানদিকে হট-প্লেটের সঙ্গে রবার টিউবযুক্ত বারশেন গ্যাস ভর্তি সিলেণ্ডার

দীর্ঘায়ু হবার উপায়

চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্রমেই জটিলতর হয়ে ওঠায় এই যুগে চিকিৎসকদের সরল ও প্রাচীন মতের অনুরক্ত হওয়াটা হয়ত একটু আশ্চর্যের বিষয় হতে পারে।

রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশটি দেশের এক বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মার্জিত অভ্যাস এবং প্রচুর ব্যায়ামের যে নির্দেশটা চিরকাল লোকে বিশ্বাস করে এসেছে, দীর্ঘ জীবন লাভের সেইটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

'অকালে বার্ধক্য এসে পড়া থেকে রক্ষা পেতে লোকে কী নীতি অবলম্বন করবে' সে বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশেই এই বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন হয়। বার্ধক্য-প্রপীড়িত ব্যক্তিদের জন্য তাঁদের মুখ্য সুপারিশের মধ্যে আছে শ্বাসপ্রশ্বাসে সহায়ক এমন প্রচুর ব্যায়াম এবং পূর্বাপেক্ষা কম কষ্টসাধ্য কাজ নিয়মিত করে যাওয়া। তাঁদের আরো উপদেশ হচ্ছে যে, কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বেই সময় কাটাবার জন্য কোন একটা শখের পেশায় ('হবি'র) অনুরক্ত হওয়া দরকার।

খাদ্য, পানীয় এবং ধূমপান সম্পর্কে এই বিশেষজ্ঞদল কতকগুলি বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। ধূমপান ফুসফুসের পীড়ার কারণ হতে পারে বলে তাঁরা সতর্ক করেছেন এবং স্নায়ু-প্রণালীকে বুড়ো করে দেয় বলে অতিরিক্ত সুরাপানেরও তাঁরা বিরোধী।

খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতার সঙ্গে খাদ্য নির্বাচন করলেও এমন যেন হয় যাতে ছোটদের মতো বেশ তৃপ্তি সহকারে খাওয়া সম্ভব হয়। তাঁরা বলছেন যে "সেরা খাদ্য দিলেও বহু ব্যক্তিকে অপুষ্টির রোগ অথবা পরিপাক শক্তির অভাব, অথবা তাঁদের দেখাশোনা করার কেউ থাকে না, একা কাটাতে হয় বলেও অকাল বার্ধক্য ভোগ করতে হয়।

ইতিমধ্যে চিকিৎসকদের এক সম্মেলন শারীরিক অবসাদের প্রকৃতি বিচার করে তার নিরাকরণে চিরাচরিত উপায়েতেই ফিরে যেতে চান। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে ক্লান্তির শ্রেষ্ঠ ঔষধ হচ্ছে সাধারণ, স্বাস্থ্য-

থিক নিদ্রা। কোন ওষুধ নয়, মাদক দ্রব্য নয়, আধুনিক জীবনের দুরন্ত গতিই, পরিপূরকও কিছু নয়—স্রেফ ভাল করে চক্ষু মুদে' ঘুমে দেওয়া।

কিন্তু দীর্ঘায়ু লাভের গোপন তত্ত্ব কী? বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সম্মানিত ও সাহায্য করার জন্য গঠিত স্বেচ্ছাসেবক সম্মান সমিতি মনে করে যে, আবহমানকালের এই প্রশ্নের উত্তর পৃথিবীর দীর্ঘায়ু ব্যক্তিরাই দিতে পারেন। কিন্তু সমিতি যে মতামত আহরণ করেছেন তার মধ্যে মিল বিশেষ পাওয়া যায় না।

যেমন জাপানের সর্বাধিক বয়স্ক জীবিতা মহিলা, একশত আঠারো বছরের শ্রীমতী কোবাআসি ইয়াসুর মতে নিরামিষ আহারই দীর্ঘায়ু লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। তিনি বলেন: "আমি নিরামিষ খাই এবং বেশ ভাল ঘুম হয়। আমি কখনও তামাক বা সুরা স্পর্শ করি না এবং কোন ওষুধও আমার দরকার হয় না।"

আমেরিকার বয়স্কতম ব্যক্তি, একশত বাইশ বছরের, মিঃ চার্লি স্মিথের কাছে দীর্ঘ জীবনের উপায় হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং 'দশ বিধান মেনে চলা। তাঁর মতে বাইবেলের 'দশ বিধান' মানুষকে এমন একটা আধ্যাত্মিক নীতি সরবরাহ করে যা তাকে শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব জীবনযাপনের পক্ষে যথেষ্ট পরিতৃপ্তি ও মানসিক স্থৈর্য দান করে। তিনি বলেন: "আমি ততটা নিখুঁত ব্যক্তি নই, কিন্তু সর্বদাই আমি ওই ঐশ্বরিক অনুশাসন অনুযায়ী আমার জীবনটা ছকে নিতে চেষ্টা করি।"

সিংগাপুরের একশত তেত্রিশ বৎসর বয়স্কা শ্রীমতী নোরিয়া বিনতে মুরায়েনও দীর্ঘায়ু লাভে ঐশ্বরিক লোকহিতবৃত্তিই সহায়ক বলে বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন: "ইসলাধর্মী মহিলা হিসেবে আমি দিনে পাঁচবার নমাজ পড়ি। খাদ্য ব্যাপারে আমার কোন বাছাবিচার নেই। বাড়ির সবাই যা খায় আমিও তাই খাই।"

দীর্ঘায়ু সম্পর্কে সামান্য একটু ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন একশত আটাশ বছরের মিঃ মুসলিমোভ শিরালি ফারজালি—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বয়স্কতম ব্যক্তি। অতি প্রত্যুষে তিনি ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নেন। সারা বছর তিনি ঠাণ্ডা জল পান করেন। প্রতিদিন তিনি নিয়মিত একটা বাঁধাধরা কর্মসূচী অনুসরণ করেন এবং কোনদিন দিনের বেলা নিদ্রা যান না। প্রচুর দুধ পান করেন, ধূম ও সুরা পানে বিরত থাকেন এবং খোলা জায়গায় নিদ্রা যান।

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক বলে পরিগণিত ইরানের একশত একান্নবই বছরের মিঃ সৈয়দ আব্দু তালেব মোহাম্মদ একটি নিজস্ব সর্বরোগহর দাওয়াই আছে: "সুখী গৃহ জীবন এবং কঠিন শ্রম।"

চিত্রপ্রদর্শনী

নূতন প্রতিভার স্বাক্ষর

সম্প্রতি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ শিল্পী রঞ্জিত দে-র চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। রঞ্জিত দে রুরকী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্য বিভাগের একজন অধ্যাপক। তিনি কলকাতার গভর্নমেণ্ট কলেজ অফ আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফট্‌স থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাঁর ছবি, কার্টুন ও পোস্টার পুরস্কার লাভ করেছে। তাঁর একটি মডেল ডিজাইন কিছুকাল আগে বেতার ও তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর একটি স্বর্ণ পদকের জন্য (শ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্রের জন্য পুরস্কার)।

কিন্তু এহ বাহ্য। শ্রীযুক্ত দে একজন জাত শিল্পী। সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর প্রদর্শনী দেখতে যাবার আগে আমাদের ধারণা ছিল না কি বিস্ময় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য। একজন প্রায় অখ্যাত তরুণ শিল্পীর কাছ থেকে এতখানি উঁচুদরের কাজ আমার মত অনেকেই নিশ্চয় আশা করেন নি। বাংলা দেশের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে প্রতিভার যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়নি সে সম্বন্ধে আর একবার নিঃসন্দেহ হলাম এই প্রদর্শনী দেখে।

শ্রীযুক্ত দে ২২টি ছবি (সবই তেলরঙে) এবং ১৩টি ভাস্কর্য (পোড়ামাটি, সিমেণ্ট, প্লাস্টার ও অ্যালুমিনিয়াম) নিয়ে এই প্রদর্শনীটি করেছিলেন। ছবিগুলির প্রধান গুণ প্রাচ্য ভাব ও প্রতীচ্য টেকনিকের সুসমঞ্জস সংমিশ্রণ। আগেই বলেছি ছবিগুলি তেলরঙে আঁকা, এ ছাড়া তাঁর ছবিতে আলোছায়ার খেলা প্রচুর আছে। কিন্তু আলোছায়াকে তিনি শুধু স্বভাবের অনুকরণের জন্যই কাজে লাগাননি, অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর ছবিতে আলোছায়ার খেলা রোমাণ্টিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর "স্টেজ" ছবিখানি দেখে গগনেন্দ্রনাথের "উদয় সাগর তীরে পদ্মিনী"র কথা মনে পড়ে গেল। তীব্র আলোয় নৃত্যরত মনুষ্য মূর্তিগুলি প্রায় হারিয়ে গেছে, সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর "সকালে বাজারের পথে" (২নং) পুরোপুরি ভারতীয়। গাছগুলির আকৃতি রাজপুত শিল্পীদের আঁকা বৃক্ষরাজিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ছবিখানি আলঙ্কারিক ও কাব্যিক গুণে সমৃদ্ধ। তুলির ওপর শিল্পীর যে অসাধারণ দখল

সকালে বাজারের পথে —রঞ্জিত দে

তার প্রমাণ রয়েছে একাধিক ছবিতে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাউল (১১) ছবিখানি। এরকম বলিষ্ঠ ছন্দময় রূপ কদাচিৎ চোখে পড়ে। তাঁর "তালের সারি" (৩) ছবিখানিতে শিল্পী কম্পোজিশানে এবং পরিবেশ সৃষ্টিতে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর "বৃক্ষতলে" (৫) ছবিখানি ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত আর একটি উৎকৃষ্ট ছবি। তাঁর অনেক ছবিতেই শিল্প ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং কখনও কখনও অ্যাবস্ট্রাক্টের ধার ঘেঁষে গিয়েছেন (৯, ২১) কিন্তু কোথাও দৃষ্টি গ্রাহ্য রূপকে একেবারে বিসর্জন দেন নি এবং দেন নি বলেই তাঁর ছবি আবেগ (emotion) সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। শিল্পীর কাছে আমাদের অনুরোধ তিনি যে সীমায় এসে পৌঁচেছেন (কোন কোন ছবিতে) সেই সীমা যেন লঙ্ঘন না করেন। তাঁর মত শিল্পী যদি আধুনিকতার মোহে বিভ্রান্ত হন তাহলে আমাদের আক্ষেপের অন্ত থাকবে না।

বর্তমান প্রদর্শনীতে তাঁর অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ছবি ছিল। আগে যেগুলি উল্লেখ করেছি সেগুলি ছাড়া অন্যান্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছবি হল আনিজার গ্রাম (১৫), "খোসগল্প", (১৪) "আলেয়া" (১৯) এবং "লজ্জাবতী" (২২)। তাঁর "শোকসন্তপ্ত" (১০) ছবিখানিতে ফর্ম নিয়ে পরীক্ষার বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বলে মনে হল। তানপুরা হাতে মেয়ে (১৩) ছবিখানিতে মেয়েটি কিছুটা আড়ষ্ট হয়েছে। তাঁর ৬নং ছবিখানি আমাদের চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকেছে। ঐ একই বিষয় নিয়ে পাহাড়ী শিল্পীরা যেমন সজীব ছবি এঁকেছিলেন তার পরিবেশ উপভোগ্য অন্য।

শিল্পীর ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি আমাদের ততটা উৎসাহিত করেনি। এখানে বস্তুর অতি সরলীকৃত রূপ চোখে পড়ল। এ জাতীয় সরলীকরণ রস সৃষ্টির অন্তরায় বলেই আমাদের বিশ্বাস। তবে, ওরই মধ্যে যে কটি উৎকৃষ্ট কাজ চোখে পড়ল সেগুলি হচ্ছে "কুমারী" (১), "সহযোগিতা" (৭) ও "চিন্তান্বিত" (৬)। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রথম রচনাটি।

শিল্পীর কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক।

বাউল শিল্পী: রঞ্জিত দে

নূতন আর্ট গ্যালারি

সবিনয় নিবেদন,

গত ১৩ই আষাঢ়ের 'দেশ' পত্রিকার চিত্র প্রদর্শনী বিভাগে তরুণ শিল্পীদের নিয়ে কোলকাতায় একটি নতুন আর্ট গ্যালারীর উদ্বোধনের সংবাদ পেলাম। প্রসঙ্গক্রমে কলা সমালোচক বিভিন্ন জায়গায় লিখেছেন, "প্রথমবারের প্রদর্শনীতে যে সমস্ত ছবি টাঙানো হয়েছে, দেখলাম তার বেশীর ভাগই আধুনিক। সাধারণ দর্শক এ সমস্ত ছবি দেখে ফিরে যাবেন। দু'একজন আর্ট-প্রেমিক ছাড়া এসব ছবি কেউ কিনবেন বলেও মনে হয় না। কাজেই এ জাতীয় প্রদর্শনী থেকে শিল্প, শিল্পী ও দর্শক কারোরই কোন উপকার হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।...এই কোলকাতায় গত কয়েক বছরে বেশ কটি আর্ট গ্যালারীর জন্ম ও মৃত্যু হয়েছে। কোনটিই দীর্ঘায়ু হতে পারেনি। তার কারণ কর্তৃপক্ষ সাধারণ (অথচ শিক্ষিত) দর্শকের রুচিকে আমল দেননি।"

সমালোচকের এ উক্তির প্রশংসা না করে পারলাম না।

গত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের তরুণ চিত্রকরদের মধ্যে একটি পরিবর্তন লক্ষ্যনীয় যে তাঁরা 'যেন তেন প্রকারেণ' ছবিকে দুর্বোধ্য করার পক্ষপাতী, যেটাকে তাঁরা বিমূর্তন বা abstraction বলে দাবী করেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ড্রয়িংকে ভাঙতে গিয়ে তাঁরা ছবির বক্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্যানভাসের ওপর রং নিয়ে ছেলেমানুষী করে বসেন। অথচ ছবিকে কেবলমাত্র visual art বলে যতই চিৎকার করি না কেন, এটুকু অবশ্যই স্বীকার্য যে বিমূর্ত শিল্পচর্চায় স্বাভাবিকভাবেই শিল্পীর বক্তব্যের প্রসঙ্গ ছবিতে এসে পড়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আসে সেই বক্তব্যের maturity-র কথা। বিমূর্ত শিল্প অপরিণত মস্তিষ্কের ইচ্ছাকৃত গায়ের জোরের ফসল নয়।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিকতম তরুণ শিল্পীদের ছবিতে এই পরিণত চেতনার অভাব সর্বৈব সত্য। এমনকি যাঁরা drawing limit-এর কথা বলেন, আমার মতে, তাঁরাও চিন্তার অভাবের কথা না ভেবেই বলেন। এবং সর্বোপরি এইসব দুর্বোধ্য ও অর্থহীন ছবির দাম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কয়েক শো'র নীচে নয়, যা বাংলাদেশের শিল্পক্রেতাদের কাছে অকল্পনীয়। এ ধরনের অপরিকল্পিত প্রচেষ্টা, জনসাধারণকে শিল্প সচেতন করে তোলা তো দূরের কথা, চিত্রকলার অগ্রগতির পথে পরোক্ষ অন্তরায় বলেই আমার ধারণা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, কিছুকাল আগে "মহেঞ্জোদারো" নামক সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত একটি একক প্রদর্শনীতে ছবির দাম রাখা হয়েছিল মাত্র পনেরো থেকে পঁচাত্তর টাকা এবং বেশীর ভাগ ছবিই ছিল বস্তুবোধধর্মী এবং দৃশ্যমান জগত ও জীবনকে কেন্দ্র করে, যা দর্শকের অকারণ বিভ্রান্তির কারণ ঘটায়নি। বাংলাদেশে শিল্প নিয়ে কোন রকম আন্দোলন যদি একান্তই করতে হয় তাহলে সূত্রপাত এইভাবে করাই বোধহয় আশাপ্রদ। নমস্কারান্তে :

সমীর রায়

কুমারী —রঞ্জিত দে

প্রিণ্ট চিত্রপ্রদর্শনী

মহাশয়,

২০শে জুনের 'দেশ' পত্রিকায় রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সংগৃহীত (প্রিণ্ট) চিত্রপ্রদর্শনীর আলোচনায় একটি ভুল চোখে পড়ল। সমালোচক লিখেছেন : "নন্দলালের বিখ্যাত ছবি পার্থসারথির রঙীন লিথোগ্রাফ প্রতিলিপি দেখানো হয়েছিল। প্রতিলিপি কে করেছিলেন উল্লেখ নেই, তবে আমার নিজের বিশ্বাস রমেন্দ্রনাথ নিজেই করেছিলেন।" কিন্তু আপনার এ বিশ্বাস ঠিক নয়। কেননা, এখন থেকে বছর-দশেক আগে আমার অগ্রজ শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় যখন আর্ট কলেজে ভারতীয় চিত্র-বিভাগের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র তখন তিনি তদানীন্তন অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথের নির্দেশে নন্দলালের পার্থসারথির ঐ চার বর্ণের লিথোটি করেন এবং রমেন্দ্রনাথকে তার এক কপি দেন। তাছাড়া, তখন আর্ট কলেজের দু-একটি প্রদর্শনীতে এর অনেক কপি বিক্রয় হয়েছে এবং শিল্পী ব্যক্তিগতভাবে অনেক কপি দানও করেছেন। ইতি

তরুণ মুখোপাধ্যায়

ভ্রম সংশোধন

গত ২৭ জুনের সংখ্যায় "চিত্র প্রদর্শনী"তে অশোক দাশগুপ্তের আঁকা 'একটি গাছের' ছবির নীচে ভুলক্রমে 'রাজহাঁস' মুদ্রিত হয়েছে।

শ্রীমতী

পশ্চিমী পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সুন্দর একটি সংবাদের টুকরো চোখে পড়ল। মোরি আর উইলিয়ম দারুণ পূর্ব-রাগের পালার পর বিয়ে করলেন। প্রথম কয়েকটা বছর স্বপ্নময় মধুর অনুরাগে কেটে গেল। একজন আর একজনকে ছেড়ে এক মিনিটও থাকতে পারে না। তারপর এল 'বেন', তাদের একমাত্র সন্তান। মা বাপের আনন্দ আর ধরে না। বেন-এর বয়স যখন চার বছর তখন কোন অজানা পথে ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত। সামান্য ব্যাপার, অভিমানের দারুণ আঘাত সবই তাদের অসহ্য হয়ে উঠল। পরস্পরকে অসহ্য মনে হল। শিশু বেন অবাক হয়ে মা বাপের কলহ দেখত, তার অনুভূতি তখন কি ছিল কে জানে! অনেক বাদানুবাদের পর ঠিক হল মোরি আর উইলিয়ম আলাদা থাকবেন। মোরির কল্পনায় আদর্শ স্বামীর যা হওয়া উচিত উইলিয়ম তা হতে পারেনি। বয়স তখনও অল্প, কাজেই সব মানুষের ভুল ত্রুটিকে সমানভাবে স্বীকার করার ধৈর্য ছিল না।

আট বছর পৃথক বাস করার পর তাঁরা বিবাহ বিচ্ছেদই স্থির করলেন। বেন একটু বড় হয়েছে। মা ও বাবা দুজনকেই সে সমান ভালবাসে। উইলিয়ম মাঝে মাঝে বেনকে দেখতে আসেন। তার এই সামান্য সান্নিধ্যের জন্য বেন আকুল আগ্রহে দিন কাটায়। মায়ের স্নেহ তার দৈনন্দিন প্রাপ্য কিন্তু এই প্রায় অচেনা আপনজনটির সঙ্গ তার বড্ড ভাল লাগে। উইলিয়ম মোটরকার রেস করেন। বেন তার শোবার ঘরের দেওয়ালে মোটর রেসের পোশাকে উইলিয়মের মস্ত বড় ছবি টাঙিয়ে রেখেছে। মাথায় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচবার হেলমেট, চোখে কালো মোটা চশমা, বিছানায় শুয়ে শুয়ে বেন দেখে আর গর্বে তার বুক ভরে ওঠে। মোটর রেসের দর্শকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে বাপের কৃতিত্ব দেখে। যেদিন উইলিয়ম জয়ী হল সেদিন তার ছোট্ট হাতের তালি সব জয়ধ্বনিকে ছাড়িয়ে ওঠে।

ক্রমে বেন তার বাবাকে অনুরোধ করল সেও মোটরকার রেসিংএ হাতেখড়ি নেবে। উইলিয়ম রাজী। পিতাপুত্র একই শখের খেয়ালে আরও আপন হয়ে উঠল। বেন মাঝে মাঝে তার মাকে তার রেস দেখাবার জন্য নিয়ে যেতো। মা হয়তো পৌঁছে দেখতেন উইলিয়ম অপেক্ষা করছেন। এমনি করে উইলিয়মের উপস্থিতি মেনে নিতে হল। বেন অবশ্য সুযোগ পেলেই বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে আবার নতুন করে পারিবারিক জীবন শুরু করতে। মোরি লজ্জা পান, "ধেৎ, তাও কি আবার হয়। বিচ্ছেদের পর আবার সেই স্বামীকে বিবাহ!" বেন বোধ হয় ঐ ধরনের প্রস্তাব উইলিয়মের কানেও তুলতো। বেন-এর এই একান্ত ইচ্ছার ছায়ায় আবার তাঁরা যেন কেমন করে নিজেদের হারিয়ে ফেললেন। মনের কোন গোপন কোণায় সঞ্চিত প্রেম আবার তাদের সব সংকল্প ভেঙে একাকার করে দিল। বিচ্ছেদের পঁচিশ বছর পরে কে প্রথম অনুরাগ প্রকাশ করার সাহস সঞ্চয় করেছিলেন তা আমরা জানি না কিন্তু মোরি আর উইলিয়ম আবার বিয়ে করলেন!

বিয়েতে ধুমধাম কিছু হল না। দু-একটি খুব নিকট বন্ধু এলেন। বিয়ের কেক কাটা হলে তাঁরা নবদম্পতিকে শুভকামনা জানালেন। কিন্তু এই উৎসব আয়োজনের কর্মকর্তা বেন, সতেরো বছরের বেন! আবার তাঁরা ফিরে গেলেন তাঁদের ফেলে আসা পুরোনো ঘরে। প্রবীণা মোরি আর তার প্রবীণ স্বামী দুজনে এখন আরও গভীরভাবে পরস্পরকে ভালবাসেন কারণ বেন যে তাঁদের দুজনেরই, তাঁদের নতুন মিলনের আর পুরোনো প্রেমের সেতু!

পাড়া প্রতিবেশীরা নাকি অনেক সময় সাজানো সংসার দেখে প্রশ্ন করে মোরিকে, "পঁচিশ বছরে কি আর অন্য পুরুষের সন্ধান মেলেনি?"

উইলিয়মের দিকে তাকিয়ে মোরি উত্তর দেন, "না এমনটি আর পেলাম কোথায়?"

বিবাহবিচ্ছেদ ব্যাপারটি আমাদের সমাজে নতুন। ভাল করে ভেবে দেখে, অন্যায় অবিচার বা অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যে ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য তা যে কত সময় ব্যর্থ হয়, অকারণে বা সামান্য কারণে সুখের সংসার নষ্ট হয়ে যায় তার হিসেব নেই। বেন তার অভিনব উপায়ে বাপ মাকে আবার একত্র ফিরে পেয়েছিল কিন্তু আমাদের সমাজে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যেখানে ছেলে-মেয়ের মনে নির্মম আঘাত সত্ত্বেও বাপ-মা তাঁদের সামান্য সংশোধন করতে বা সহ্য করতে প্রস্তুত হন না। যেসব দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপক আর সহজ সে দেশে বিচ্ছেদের বোঝা ছেলেমেয়েরা বহন করে সবচেয়ে বেশী। যে বিশ্বাস, ভালবাসা আর দৃঢ় ভিত্তির উপর শৈশব কাটিয়ে সুস্থ জীবন গড়ে ওঠে তার অভাব করে তোলে তাদের ছন্নছাড়া।

অনেকক্ষেত্রে বিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহ হয়তো মাও করলেন বাবাও করলেন। ছেলেমেয়েরা আর সেভাবে দুজনের একজনকেও পেল না। তাদের কি দুর্ভাগ্য বলুন তো! পিতৃমাতৃহীন শিশুর চেয়েও কখনও কখনও তাদের সংকটাপন্ন অবস্থা মনের গভীরে দারুণ সংঘর্ষ যন্ত্রণা। বিচ্ছেদের সংখ্যা অল্প বলেই বিবাহবিচ্ছেদকে সমাজের সমস্যা হিসাবে আমরা আজও গভীরভাবে চিন্তা করি না কিন্তু ভেবে দেখুন আমাদের চিরাচরিত সংস্কার আর যেদিন পথরোধ করতে পারবে না, আমাদের সমাজেও সামান্য কারণে তুচ্ছ কলহে সংসার ভেঙে যেতে পারে। তুচ্ছকে মনে হবে বিরাট, ছাড়াছাড়িকে মনে হবে অনিবার্য।

আমাদের প্রতিবেশী দম্পতির একমাত্র সন্তান রাজীব। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের পর এসেছিল বলে তার আদরের সীমা ছিল না। বড় সোহাগে যখন সে ভরপুর তখনই কোথা থেকে তার বাবা মার মধ্যে এল মনের অমিল, মতের অনৈক্য। কখনও বা রাজীবেরই লালনপালনের ধারা নিয়ে, কখনও বা বাজারের হিসেব খরচা নিয়ে তুমুল তর্ক গড়িয়ে চলতে দিনের পর দিন। শিশু রাজীব অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে কখনও বা অধীর হয়ে যেত কখনও বা ভয়ে অন্য আশ্রয় খুঁজতো! যদি বাবা মার মধ্যে কলহে উপস্থিত শিশুর অবস্থা কখনও দেখে থাকেন তবে আর রাজীবের সে দৃষ্টি বুঝতে কষ্ট হবে না। আধুনিক আইনে বিচ্ছেদ সম্ভব। দুজনেই বিচ্ছেদের পথ খুঁজতে লাগলেন। কারণ চাই তো! যথাযোগ্য কারণ, কানুন বাঁচিয়ে ব্যবস্থা শিক্ষিত সংসারে পেতে অনেক অসুবিধা হয় না। মুশকিল শুধু মাত্র রাজীবকে নিয়ে। আদালত তারও একটা বিধান দিলেন। আধাআধি ব্যবস্থা। রাজীবের অবস্থা ভেবে দেখুন। মা ছাড়া ঘরে, স্কুলের বোর্ডিং-এ আর মায়ের কাছে ত্রিকোণ ব্যবস্থায় তার কাঁচা মনের পরীক্ষা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগলো। পরিস্থিতির সঙ্গে আপোস হলো না বটে কিন্তু নিখুঁত অভিনয়ে তা বোঝা সহজ ছিল না। বাপের কাছে তার মন বুঝে চলা, সহপাঠী সাথীর কাছে আপন দৈন্য গোপন করার সদা সচেতনতা আর মায়ের কাছে অভিমান গোপন করার চেষ্টা সব মিলে যে জটিলতার সৃষ্টি হলো তাতে তার উত্তরকালে কি হবে তাই ভাবতাম।

বেন-এর বুদ্ধি বা সুবিধা সুযোগ

পাতলা কাঠের তৈরী টেবিলের পায়া
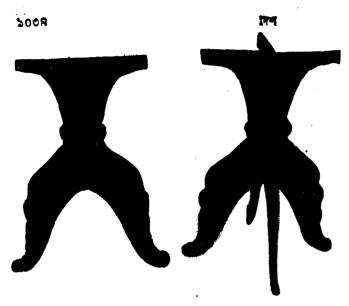
বুঝবার বয়স হয়েছিল, কিন্তু সে রকম সুবিধা ভাঙ্গা ঘরের ছেলেমেয়েদের আসে কদাচিৎ। রাজীবের মা নূতন সংসার করলেন। রাজীবের বাবা কাজকর্ম আর বন্ধুবান্ধবে হারানো সংসারের গভীর ক্ষত ঢাকবার চেষ্টা করে চললেন। রাজীবকে কাছে পেলে আবদার প্রশ্রয় দিয়ে তাকে তার অভাব ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। চোখের উপর দেখছি পরস্পরাবিরোধী অনুভূতিতে রাজীব হয়ে উঠেছে নিষ্ঠুর, অদ্ভুত। যে মমতা সে পায়নি তা সে ফিরিয়ে দেবে কি করে? বেন-এর মত সে মা-বাবাকে একত্র করার উপায় খোঁজেনি কারণ শৈশবে অসহায় দুটি বড় মেয়েকে দুজনকে বোঝাবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। বড় বড় চোখের কাতর মিনতি দিয়ে বলেছে আমি যে দুজনকেই তাই আর চাই নির্বিঘ্ন নিশ্চয়তার পরিবেশ। পরিবর্তে এসেছে অনিশ্চয়তার দারুণ সংশয়। তাই ভাবছিলাম সামান্য কারণে সংসার ভেঙে গেলে দুঃখের সীমা থাকে না কিন্তু সে দুঃখ চরমে পৌঁছোয় যদি সে সংসারের সন্তান সুস্থ মানসিক পরিবেশের সন্ধান না পায়।

আলপনার নক্সা আঁকা টেবিল-টপ্

আলপনার নূতন রূপে

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন "ব্রত হলো মনোস্কামনার স্বরূপটি' আলপনায় তার প্রতিচ্ছবি।" আলপনা বাংলাদেশের একান্ত আপন; পল্লীগ্রামের নারীসমাজের শিল্প। মানুষের মনে কোথায় একটা সৃষ্টির গোপন উৎস আছে, সেই উৎসপথে ব্রতর উপলক্ষ্য করে নূতন নূতন সৃষ্টির মত আলপনাও বেরিয়ে আসে।

আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আর পাঁচটা পল্লী শিল্পের মত আলপনাও অনেক আঘাত সহ্য করেছে। ব্রতর আর আগের মত হয় কোথায়? দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঘরের মেয়েরাও নাজেহাল কাজেই যাদের ইচ্ছা আছে তাদেরও অবকাশ বা অবসর নেই। কিছুদিন আগে কাঁথা দিয়ে তৈরি বটুয়া বা ব্যাগের কথা আমরা আলোচনা করেছিলাম। ঠিক ঐ ভাবে দেখলাম আলপনারও নূতন রূপ। আলপনা দেওয়া বিয়ের পিঁড়ি দেওয়ালে ছবির মত টাঙালে সুন্দর দেখায়। কুলো বা ডালায় আলপনা দিয়েও ঠিক ঐ ভাবে দেওয়ালে টাঙানো যায়। পাতলা কাঠ বা ঐ জাতীয় কোন জিনিসে আলপনা দিয়ে নানারকম সুন্দর জিনিস ঘরে বসে তৈরি করা যায়। টেবিলে দাগ না লাগে এজন্য জলের গ্লাস বা চায়ের পেয়ালা ইত্যাদি রাখার জন্য নানা জিনিসের চাকতি ব্যবহার হয়। এ চাকতি সাধারণ কাঠের টুকরো আলপনা দিয়ে করে দেখবেন খুব সুন্দর দেখায়। অবশ্য এখানে আলপনার রং স্থায়ী রং ব্যবহার করা দরকার। নমুনা হবে আলপনার। ছোট্ট টেবিলও চমৎকার দেখায়। টেবিলের পা দুটি পাতলা কাঠ কেটে খাঁজ এমনভাবে রাখবেন যাতে একটির মধ্যে আর একটি সহজে ঢুকে যায় এবং দরকার হলে খুলেও ফেলা যায়। উপরের ঢাকনি সুন্দর আলপনার নক্শা দিয়ে তৈরি করুন। নক্শার রং ভাল ও পাকা করার জন্য বার্নিশ ব্যবহার করতে পারেন। ঢাকনির তলায় পায়ের সঙ্গে ভালভাবে লাগে এজন্য পাতলা কাঠের টুকরো ছোট্ট ছোট্ট পেরেক দিয়ে লাগিয়ে দেবেন। পা দুটি জুড়ে, আলপনা দেওয়া মাথাটি বসিয়ে দেবেন, চমৎকার টেবিল হবে আবার খুলে ফেলে প্রত্যেকটি টুকরো আলাদা করে সরিয়ে রাখা যায়। আলপনা নক্শার ঢাকনাটা কিছুকাল ব্যবহারের পর পুরনো মনে হলে নতুন নক্শার আরেকটি ঢাকনা পা-দুটির উপর বসিয়ে দেওয়া যায়।

সাহিত্য সংবাদ

বিদুর

হাস্য-বোধ

হাস্যরসের প্রতি আসক্তি এক কথা, হাস্য-বোধ অন্য কথা। আমাদের, বিশেষ করে আজকালকার বাঙালী সমাজের চেহারাটা এমন সৃষ্টিছাড়া হয়ে গেছে যে, শত দুশ্চিন্তার মধ্যে যদি বা কখনও হাসির কথা কানে আসে মন খুলে হাসতে পারি না। অথচ এমন নয় যে আমরা হাসতে চাই না; বরং দু দণ্ড হাসতে পারলে বাঁচতুম, কিন্তু সে অবস্থা কই! হাসিটা ইদানীং কায়ক্লেশে বেঁচে আছে আমাদের চরিত্রে, অনেকটা যেন ভেজাল হয়ে। যাকে পরিশুদ্ধ হাস্যবোধ বলে তার মেজাজও আমাদের নেই আর। সিনেমা থিয়েটারে, খেলার মাঠে, আড্ডায় যে হাসাহাসি চলে তার কিছুটা ছেলেমানুষির, কিছুটা উপায়হীনের; কখনো বা হাসিটা শুধু গলায়, মনের তলায় কিছুমাত্র দাগ পড়ে না।

আপাতত একটা হাসির গল্প বলা যাক। এক ভদ্রলোক, বয়স হয়েছে বছর পঞ্চান্ন, পাকা একটি বছর হৃদরোগে ভুগে সবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসেছেন। ডাক্তারে বলে দিয়েছে, চেঁচামেচি আদপেই না করতে, রাগ বিরক্তিকে বিশ হাত দূরে সরিয়ে রাখতে, ওষুধপত্র না ছুঁতে। পাক্কা পনেরোটি বছর পরমায়ু পাবার জন্যে আরও এক উপদেশ দিয়ে দিয়েছে ডাক্তারে—বলেছে, রোজই খানিকটা করে হাসবেন, পারলে অট্টহাসি।

হাসি জিনিসটা সচরাচর সুলভ হলেও বেশ মন-ভরানো হাসি দুর্লভ। ভদ্রলোক বাড়িতে গল্পগুজবের মধ্যে প্রায়শই চেষ্টা করতে লাগলেন হাসবার, কিন্তু সেটা তেমন জমত না। শেষে হাসির ছবি দেখা শুরু করলেন—মানে কার্টুন ছবি যাকে বলে—তাও জমল না। হাসির গল্প পড়তে শুরু করলেন, কয়েকটা দিন মন্দ কাটল না: কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তাতেও মন ভরত না। তখন কি করেন কি করেন ভাবতে বসে একদিন কি মতি হল নিজেই হাসির গল্প লিখতে বসে গেলেন। ভদ্রলোক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের সংসারের এমন অনেক কিছু দেখতেন একটু ঝালমসলা যোগ করলে যাকে হাসির উপাদান করা যায়। রীতিমত কাগজপত্র সামনে করে ভদ্রলোকের প্রত্যহ হাসির গল্প লেখা চলতে লাগল। একটি দুটি করে ক্রমে তিনটি গল্প লেখা হল। কি করবেন কি করবেন ভেবে তিনটি গল্প তিন কাগজের তিনটি সম্পাদককে পাঠিয়ে দিলেন। লেখা ছাপা হোক এ-রকম একটা বাসনা ছিল বটে তবে তাঁর সন্দেহ ছিল—তিনটি লেখাই হয়ত ফেরত আসবে।...কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর যেন মাথার হাত রেখেছিলেন গল্প লেখার সময়, তিনটে লেখাই ছাপা হয়ে গেল। যাকে বলে 'সাড়া জাগানো'—তেমনি সাড়া পড়ে গেল। কেউ বললে, 'হাসির বেলুন ছেড়েছে বাজারে অমুক কাগজ'; কেউ বললে, 'হাসির রাজা এসে গেছেন সিংহাসন ছেড়ে দাও'; কোনো কাগজে লিখল, 'লেখককে আমরা সেলাম দিলাম, আমাদের স্ত্রীলোকেরা কিঞ্চিৎ শিক্ষা পাবে।'

এত হইচই পড়ে গেল শহরে যে ভদ্রলোককে ক্রমাগত নানা রকম মানুষ এসে বিরক্ত করতে লাগল, কাগজের সম্পাদক, পাবলিশারের দালাল, সিনেমার লোক, রিপোর্টার, মায় এক সার্কাস পার্টির ম্যানেজার এসে ধরে পড়ল, আমার ক্লাউনদের জন্যে একটা খেলা তৈরি করে দিন।

ভদ্রলোক তিতবিরক্ত। আচ্ছা ফ্যাসাদ বাধল তো, এখন দেখি এরা আমায় কাঁদিয়ে ছাড়ছে।

শেষে এক জবরদস্ত রিপোর্টার ভদ্রলোককে কাবু করে ফেলল। 'আপনি কি করে এ-সব লেখা লিখলেন, স্যার?'

'কাগজের ওপর কালির আঁচড় টেনে।' ভদ্রলোকের জবাব।

'না, না; সে কথা বলছি না; মাথায় এল কি করে?'

'মাথা জানে, আমি জানি না।'

'...বা, বেশ বলেছেন, স্যার! খাসা জবাব। কিন্তু আমি বলছি কি, এইসব মজার মজার হাস্যকর ব্যাপার আপনি পেলেন কি করে?'

'দেখেছি।'

'তাই নাকি! ওই জন্যেই এ-রকম টাটকা হয়েছে।...তা আপনার শাশুড়ী বুঝি সেই মিসেস অমুক...'

'আজ্ঞে না, আমার স্ত্রী।'

'সে কি, তবে মিসেস অমুকের চরিত্রটা—?'

'আমার মেয়ের।'

রিপোর্টার ঢোঁক গিলল দুবার। মাথা নেড়ে বলল, 'স্যার, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'দেখো ছোকরা, তোমার বয়স অল্প কিন্তু তুমি ভীষণ ডেঁপো। এবং গবেট।...জগতে যাকে যেটিতে মানায়, তাকে সেখানে বেমানান করাই হচ্ছে আসত হাসি। স্ত্রীকে স্ত্রী করলে হাসার কিছু থাকে না, তাকে শাশুড়ী কর, দেখবে হাসবার কত কি উপকরণ পেয়ে গেছ। বাঁদরের লেজ আছে, তাতে কি তোমার হাসি পায়? কিন্তু ঈশ্বরের দয়ায় তোমার যদি একটা ওই জিনিস থাকত, আমরা খুবই উপভোগ করতাম।'

রিপোর্টার নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে পড়ল। ভদ্রলোক বললেন, 'হাসি জিনিসটা খুবই বিপজ্জনক। বেদনাদায়কও। আমার স্ত্রী এবং মেয়ে আমায় ছেড়ে চলে গেছে। আমি নাকি তাদের ব্যঙ্গ করেছি। শাশুড়ী অবশ্য বেজায় খুশী, কেননা তাঁকে নিয়ে রঙ্গটা তাঁর মনোমতন হয়েছে।...কিন্তু বাপু, তোমরা যা করছ তা রঙ্গও নয়, ব্যঙ্গও নয়। এবার বিদায় নিতে হবে।"

একেবারে নিছক গল্প নয়, এক নাম করা মার্কিন হাস্যরসিকের জীবনের কাহিনী। অবশ্য তিনি বলেছেন, তোমরা বিশ্বাস করো না গল্পটা। ওপরের গল্প থেকে একটা কথা বোঝা যায়, বাংলায় যা হাস্যরস ইংরেজীতে 'হিউমার'—তার গোড়ার অর্থটা আজও মিথ্যে হয়ে যায় নি। কোথায় যেন পড়েছিলাম, তরল পদার্থ কিংবা আর্দ্রতাকে একদা ল্যাটিন ভাষায় 'হিউমার' বলা হত। পুরোনো দিনকালে বিশ্বাস করা হত মানুষের মেজাজ ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে এক ধরনের রস অন্তঃক্ষরণের ওপর। সম্ভবত 'হিউমার'—নামক রসটি শরীরের মধ্যে ক্ষরিত হলে মেজাজ খুশী থাকত। অবশ্য এসব ধারণা ১৭ শতাব্দীরও আগে। কিন্তু হালের ধারণাও স্বীকার করে হাস্যরস মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—দু জাতির হাসি রয়েছে, একটা দন্ত্য, অন্যটা মূর্ধন্য। মূর্ধন্য হাসিটা হল wit।

আমাদের সাহিত্যে 'উইট্' শুকিয়ে গেছে, হাসি উবে এসেছে। যাঁরা বড় করে উপন্যাস লেখেন, তাঁদের লেখাতেও কদাচিৎ 'উইট' বা হাসি থাকে। থাকলে খুবই উপভোগ্য হয়।

"কাহারো হাসি ছুরির মত কাটে
কাহারো হাসি আঁখিজলের মত।"

আমাদের লেখায় না ছুরি, না বা আঁখিজল।

ইংরেজী শব্দের বাংলা উচ্চারণ

মাননীয় বিদুর মহাশয়,

গত ১৩ই জুন এবং ২৭শে জুনের 'দেশ' পত্রিকার 'সাহিত্য সংবাদ' বিভাগে প্রকাশিত **'ইংরেজী শব্দের বাঙলা উচ্চারণ'** শিরোনামাঙ্কিত চিঠি দুখানা পড়ে বর্তমান লেখকের মনে যে দু-একটা বক্তব্য জেগেছে, এখানে তাই নিবেদন করছি।

একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে কোন-একটি বিশেষ ভাষা বিশ্বের সমস্ত রকমের সম্ভাব্য ধ্বনিকেই নিজের সীমাবদ্ধ ভাণ্ডারে ধারণ করতে পারে না। যেহেতু বাঙ্ময় ধ্বনিগুলোর দৃষ্টিগ্রাহ্য একটা রূপ দেবার প্রয়োজনেই লিপির উদ্ভব, সেই কারণে একটি নির্দিষ্ট ভাষার বাঙ্ময় ধ্বনিসমষ্টির প্রতীক হিসেবে যে-কটি লিপির প্রয়োজন, সেই কটি লিপিই সেই ভাষায় গৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু রূপে

দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করে বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে যখন ভাব এবং ভাষার আদান-প্রদান শুরু হল, তখনই দেখা দিল একটি বিশেষ ভাষার লিপিতে অন্য-একটি ভাষার ধ্বনিকে প্রকাশ করবার প্রয়োজন। কিন্তু লিপির সীমাবদ্ধ ক্ষমতা যেখানে অন্য-ভাষার ধ্বনির যথাযথ রূপ দিতে পারল না, সেখানে ভাষা তার আপন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সেই ভাষান্তরের ধ্বনিগুলোকে স্বীকৃত (Assimilate) করে নিল। এই রীতিতেই, বাঙালীর ধ্বনিতে আর লিপিতে, যেমন ইংরেজী টেবিল (Table) বেঞ্চি (Bench) আপিস (Office) প্রভৃতি শব্দের আমদানি হল, তেমনি করে সাগর-পারের দেশে রপ্তানি হল Calcutta (কলকাতা) Dacca (ঢাকা) Chittagong (চট্টগ্রাম)।

এ-প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি বাঙলা গদ্যভাষা-চর্চার আদি-যুগে পর্তুগীজ উচ্চারণ-রীতির অনুকূলে রোমান-লিপিতে বাঙলা শব্দের বানান-কৌশল : Pita' amardiguer Poromxorgue' asss' (পিতা আমারদিগের পরমস্বর্গে আছ) ইত্যাদি। ইংলন্ড-বাসীর কণ্ঠে 'মুখোপাধ্যায়' 'বন্দ্যোপাধ্যায়' "দত্ত" "মিত্র" যখন মুখার্জি ব্যানার্জি ডাট্ আর মিটারে-র রূপ নিয়ে উচ্চারিত হল, তখন বাঙালী সেখানে বিলিতী মাধুর্যের এক অজানা আস্বাদে পুলকিত হয়ে সানন্দে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে নিজের কণ্ঠে ধারণ করল। ক্যালকাটা চিটাগাঙ্ আর বার্ডোয়ানের আড়ালে এদের মৌলিক পরিচয়টি অনেককাল আগেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে বাঙালীর কাছে।

বাঙলা শব্দগুলোর ওপর ইংরেজীর এই যে অগণিত আঘাত, ইংরেজ-দেবতার নৈবেদ্য মনে করে আমরা যদি সেগুলোকে এই স্বাধীন ভারতে বাস করেও পরিপাক করে থাকি, তবে দুটো-একটা ইংরেজী শব্দের ওপর বাঙালী-কণ্ঠের স্বাভাবিক দাবিকে স্বীকার করে নেবার পথে কোন দ্বিধা থাকবার কারণ নেই।

উনিশ শতকের বাঙালী মনীষীরা যাকে 'কালেজ' বলতেন, আজকের দিনে সেখানে শ্রুতি-বৈকল্যের লক্ষণ পাওয়া গেলেও "কলেজ" আর "কালেজে"-র মধ্যে কোন্‌টি যে যথাযথ ইংরেজী উচ্চারণের নৈকট্য দাবি করবে, তা বলা সহজ নয়। Europe-এর উচ্চারণেও "য়ুরোপ" এবং "ইউরোপ"—কার দাবি বেশী গ্রাহ্য, তার কোন সমাধান নেই। এর কারণ, ইংরেজ আমাদের ভাষা দিয়ে গেছে, কিন্তু কণ্ঠ দিতে পারে নি। সুতরাং, বাঙালীর উচ্চারণে এবং লেখায় যদি ইংরেজী শব্দের খানিকটা বিকৃতি ঘটে থাকে, আর তারই প্রতিফলন যদি লক্ষ করি আমাদের সাহিত্যে, তবে তা দুঃখের নয়, কেননা সেই-টেই স্বাভাবিক।

মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। ইংরেজী শব্দের মধ্যে 'ai' পাশাপাশি থাকলেই যে a উচ্চারণ হয়, শ্রীমতী বোসের এ ধারণার সমর্থন নিশ্চয়ই "Chair" "Fair" বা 'Hair' শব্দে নেই। আর, a উচ্চারণের বঙ্গীয় দুর্দশা যদি তাঁকে আহত করে থাকে, তবে তা শুধু Rail, Train এর ক্ষেত্রেই নয়, Blade, Plate, brave প্রভৃতি শব্দেও (e-অন্তক শব্দের উপান্ত ব্যঞ্জনের ঠিক আগে যেখানে a আছে) একই উচ্চারণ-রীতির অনুবর্তন লক্ষ্য করা যাবে বাঙালীর কণ্ঠে।

আসল কথা, main (mān) এবং men (mĕn)-এর মধ্যে যে উচ্চারণ-গত পার্থক্য-টুকু রয়েছে, বাঙলা লিপি দিয়ে তাকে সুস্পষ্ট করতে গেলে "মেইন্" এবং "মেন্" লিখতে আমরা বাধ্য। 'Paint'-এর ইংরেজী উচ্চারণেও 'ই'-ধ্বনির সূক্ষ্ম অস্তিত্বকে অস্বীকার করা চলে না। Oxford Dictionary-নির্দিষ্ট ā এবং ĕ এর ব্যবধানটুকুর স্বীকৃতির জন্যে a-য় (main, Plate প্রভৃতি) ক্ষেত্রে বাঙলায় একটি "ই"-ধ্বনির যোগ এবং তার খানিকটা শিথিল উচ্চারণ অপরিহার্য না হতে পারে, কিন্তু অসংগত নয় মোটেই। বরং, এই ধরনের শব্দগুলোর প্রতিটি ক্ষেত্রে (এমন কি, Cake Rate প্রভৃতিতেও) "এই" ধ্বনিটিকে যৌগিক স্বরধ্বনির মর্যাদায় গ্রহণ করাই যুক্তিসংগত বলে আমার ধারণা (অর্থাৎ, Pain=পেইন্, "পে-ই-ন্" নয়; mail=মেইল্, "মে-ই-ল্" নয়)।

সুতরাং, কোন লেখক যদি Cake বা Rate বোঝাতে গিয়ে "কেইক্" বা "রেইট্" ব্যবহার করে থাকেন, তবে তা 'অমার্জনীয় অপরাধ নয়।'

শ্রীসুধীন্দ্র দেবনাথ,
অধ্যাপক, বারাসত রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়,

পুস্তক পরিচয়

একটি সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক উপন্যাস

অনল-আয়তি। সুশীল রায়। এস সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১সি কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য পনেরো টাকা।

শ্রীযুক্ত সুশীল রায় বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। গল্প, উপন্যাস, কবিতা—সাহিত্য রচনার সকল শাখাতেই তাঁর অবাধ যাতায়াত। তিনি আধুনিক কিন্তু প্রাচীনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে উদার। আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে শ্রী রায় যেমন সচেতন তেমনি প্রাচীন সাহিত্যপাঠেও তাঁর আগ্রহ প্রবল। তাঁর সদ্য-প্রকাশিত উপন্যাস অনল-আয়তি সেই আগ্রহ প্রীতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

এককালে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুকরণে ও অনুসরণে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় উৎসাহ ও উদ্যম দেখা দিয়েছিল। কোনো কোনো লেখক সাফল্যও পেয়েছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পর বেশ কিছুকাল সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টি হয়নি। মনে হয়েছিল সাহিত্যের এই শাখাটি বুঝি পুনরুজ্জীবিত হবার আর সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যুগজীবন আবার ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রতি লেখক-পাঠক উভয়কেই কৌতূহলী করে তুলেছে। ফলে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। সুশীলবাবু অনল-আয়তি রচনা করে যুগজীবনের সে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছেন।

উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে যাঁরা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন তাঁরা প্রধানত অবলম্বন করেছিলেন পাঠান ও মোগল আমলের ইতিহাস। তাঁদের রচনায় রাজরাজড়ার প্রসঙ্গই মুখ্য হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঔপন্যাসিকেরা বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। বলা বাহুল্য ইতিহাসের তথ্যপ্রাচুর্যও এর একটা কারণ। উনিশ শতকের বাংলা দেশ সম্বন্ধে গবেষণার অভাব নেই। জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা উনিশ শতকের জাগরণের ইতিহাসে মনঃসংযোগ করেছেন। সুশীলবাবু সেই শতাব্দের সামাজিক আলোড়নের একটা বিশিষ্ট দিককে অবলম্বন করে একাধারে ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও সাহিত্য প্রীতির নিদর্শন রাখলেন। অনল-আয়তি মূলত সতীদাহ প্রসঙ্গ নিয়ে পরিকল্পিত। কিন্তু উনিশ শতকের জাগরণে যে আনুকূল্য ও প্রতিকূলতা দেখা দিয়েছিল সেই টানা-পোড়েনের ইতিহাসও সুশীলবাবু সততার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। আন্টুনি ফিরিঙ্গী প্রসঙ্গ, বিভিন্ন কবিয়ালদের লড়াই, সঙ নৃত্য, রথযাত্রা এগুলির প্রাসঙ্গিক নির্বাচনে গ্রন্থটি উনিশ শতকের সামাজিক দলিল হিসেবেও বিবেচ্য। অন্যদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতমুন্সীদের অক্লান্ত পরিশ্রম, রামমোহনের প্রগতিশীল চিন্তাধারা, ইয়ং বেঙ্গল দলের নাস্তিক্যবাদ, শিক্ষার দ্রুত অগ্রগতি—এই সব বিষয়ও লেখকের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। কুলীনকুলসর্বস্বতা সমাজ-মানসে যে বিপর্যয় এনেছিল তার কৌতূহল উদ্দীপক কাহিনী পাই বিমলাকান্তের জীবনীতে। এর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে গঙ্গার কূলে কূলে বাণিজ্যবিস্তারের বিস্ময়কর চিত্র। এই আলোড়নের বর্ণনা সুশীলবাবু রূপনারায়ণ ও রাধার দাম্পত্যজীবনের করুণ-মধুর কাহিনী অবলম্বন করে দিয়েছেন। জমিদার রূপনারায়ণের জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও বিলাসকলাকুতূহলের স্রোতে জোয়ার-ভাটা খেলে। অন্তরের দৈন্য, পিপাসা রূপনারায়ণকে কখনো ক্লান্ত করে তোলে। কিন্তু মোহ, নেশা থেকে সে মুক্তি পায় নি। রাধাকে পেয়েও সে সতীত্বের মর্যাদা বোঝে না। বিভিন্ন বাঈজী আনিয়ে, চাটুকার

পরিবেষ্টিত হয়ে জীবনের অপর দিকের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে আছে সে। একদিন তার অজ্ঞাতসারেই পরমলগ্ন আসে, যখন সে নির্মল বিশুদ্ধ জীবনের আস্বাদ পায়। কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে সে অক্ষম। রাধাও অভিমান নিয়ে, জ্বালা নিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্যই সেই বিলাসের স্রোতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু এটাই তার আসল পরিচয় নয়। আজন্ম সংস্কারকে সে বিসর্জন দিতে পারে নি। সহমরণে যেতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় আরোহণ করে। সুশীলবাবু আশ্চর্য দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে এ দুটি চরিত্র অঙ্কন করেছেন। লেখক এখানে দক্ষ শিল্পী।

সংবাদপত্রে সেকালের কথা। বিভিন্ন কবি-সংগীতের সংকলন গ্রন্থ, সাহিত্যসাধকচরিত-মালা পর্যায়ের গ্রন্থরাশি এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিকের আকরগ্রন্থের সাহায্যে এই বিপুলায়তন উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। সুশীলবাবু অপ্রামাণিক কোনো বস্তুকে স্থান দেন নি। আবার তথ্যবিকৃতিও কোথাও ঘটান নি। কল্পনা অবশ্য করেছেন। কিন্তু সে কল্পনা তথ্যভিত্তিক। নিধুবাবুর টপ্পার গানে কিংবা সেকালের কোনো ছড়া অথবা গানের কলির মধ্যে যে সব কাহিনী প্রচ্ছন্ন রয়েছে সেগুলির সুন্দর সমাবেশ ঘটেছে এই উপন্যাসে। রামমোহনের আত্মীয়সভার সভ্যদের রসোজ্জ্বল চিত্র সুশীলবাবু কল্পনা-বলে ফুটিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ক্ষণিক কিন্তু এই চকিত আবির্ভাবেই পাঠকের হৃদয় মন কেড়ে নেন তিনি।

গ্রন্থকার যে বস্তুটিকে গ্রন্থে প্রাধান্য দিয়েছেন তার প্রতি সুবিচার করেছেন। আজকাল দেখা যায় প্রাচীন প্রথা অথবা সংস্কারের প্রতি একটা ঘৃণামিশ্রিত অবজ্ঞা। যা অচল, যা ঘৃণার তাকে আঁকড়ে থাকার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রশংসার কিছু নেই। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, ঐতিহাসিকের দায়িত্ব গুরুতর। তিনি একটা মনগড়া সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিহাসের তথ্য বিশ্লেষণ করবেন না। তাঁকে মোহমুক্ত হতে হবে। সুশীলবাবু সতীদাহ প্রথার ভালোমন্দ বিচার করেন নি। এর মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা, বীভৎসতা আছে তা তিনি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কখনো এই প্রথা সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেন নি। ঐতিহাসিকের মত উপন্যাসিকও মোহ-মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে সতীদাহ প্রথার উৎসসন্ধান করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথাটি যে প্রথাই নয় এর সঙ্গে যে মানবজীবনের করুণ মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সে অন্তঃ-শীলা কাহিনী উদ্ঘাটন করেছেন শ্রীযুক্ত রায়। গ্রন্থটির বিশেষত্ব এইখানে। এই কারণে অনন্য আয়তি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী মূল্য পাবার অধিকারী।

২৫৫৮/৬৪

ভ্রমণ

শিবঠাকুরের আপনদেশে। রাণু সান্যাল। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। মূল্য : ৪·০০ টাকা।

শ্রীমতী রাণু সান্যাল সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগতা। "শিবঠাকুরের আপনদেশে"—তাঁর প্রথম রচনা—কোনো মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি নয়, —নিতান্তই একটি সাধারণ ভ্রমণকাহিনী অথবা স্মৃতিকথা। কিন্তু, এই লঘু রচনাটির মধ্যেও লেখিকার যে প্রকৃত সাহিত্যিক গুণ ও মেজাজ লক্ষ করেছি তাতে আনন্দিত হচ্ছি এই ভেবে যে, এতদিনে হয়তো আরও একজন সুলেখিকা বাংলা-সাহিত্যের আসরে পদার্পণ করলেন।

সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের এক মেয়ে ও বধূ, হঠাৎই গিয়ে পড়েছিলেন এমন এক অজানা, অচেনা দেশে যেখানকার কোনো কিছুর সঙ্গেই আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণা মেলে না। অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকার সে এক পশ্চাদপদ দেশ, যেখানে সবে সকালের আলো ফুটছে, এবং সে আলোও কিঞ্চিৎ কুয়াশাচ্ছন্ন। সে এমন এক দেশ যেখানকার মানুষ, ভাষা, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি, জীবনচর্যা, ইতিহাস, রাজনীতি দর্শন-শিল্প, সেখানকার ভৌগোলিক সংস্থান, জলবায়ু, প্রকৃতি—সবই আমাদের জানার বাইরে। ইয়োরোপে না গেলেও এবং বাস না করেও, তার প্রায় সব কিছুই আমাদের জানার ভিতরে। কিন্তু, আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের আবিসিনিয়া?

রাণু সান্যাল পর্যটক হিসেবে ইথিওপিয়ায় যাননি, দেখাই যে পর্যটকের একমাত্র কাজ। সাংবাদিক হিসেবেও যাননি সেখানকার রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির উপরে সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে। গবেষক হিসেবেও যাননি সে দেশের ইতিহাস অথবা সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় নিতে। কূটনৈতিক (অথবা কূটনৈতিকের স্ত্রী) হিসেবেও যাননি তাঁর দেশের সঙ্গে ও-দেশের সখ্যভাব স্থাপনা করতে। মিস মেয়ো হিসেবেও যাননি সে দেশের ছিদ্র অন্বেষণ করতে এবং তার নোংরা ঘাঁটতে। কর্মরত স্বামীর সঙ্গে সে দেশে গিয়েছেন তাঁর নিজের সংসার করতে। আর এই সংসার করার ফাঁকে ফাঁকে দুটি চোখ দিয়ে দেখেছেন সে দেশ, তার লোকজন, আচার-ব্যবহার, পাহাড় বন; আর দেখেছেন এক সর্বভারতীয় সমাজকে, দেশে যা দেখা সম্ভব হয় না এবং ঐ সুদূর প্রবাসেও যার চরিত্র সামান্য পরিবর্তিত হয়নি, বরং অপরিচিত পরিবেশে যা সমগ্র সত্তায় প্রকট। বস্তুত, এ বইয়ের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে ঐ প্রবাসী-ভারতীয় সমাজের কাহিনী। সে সমাজের অতি সত্য চিত্রটি লেখিকার কলমে নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে।

কিন্তু, একমাত্র ইথিওপিয়ায় ভারতীয় সমাজের চিত্র তুলে ধরার জন্যে নিশ্চয়ই লেখিকা এই গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হননি। তাঁর আরো অনেক বলবার কথা আছে। পশ্চাদপদ দেশের আগুয়ান হবার প্রচেষ্টা, এবং সেখানকার রাষ্ট্রনেতাদের ধ্যানধারণা, কর্ম-প্রণালীরও কিছু কিছু পরিচয় এ বইতে বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। আর উপলব্ধি করা যায় সেখানকার কিছু সাধারণ মানুষ ও নিসর্গকে।

এ বইয়ের বৃহত্তম আকর্ষণ শ্রীমতী রাণুর রচনাশৈলী। বাস্তবিক, এত পাকাহাতের লেখা আমি অন্তত আগে পাইনি কোনো দেশী লেখিকার কাছ থেকে। ভেবে অবাক হচ্ছি যে, এইটেই তাঁর প্রথম লেখা। পরিমিতিবোধ, কৌতুকস্পৃহা এবং অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির রাজস্পর্শযোগে এ রচনা বিদগ্ধজনোচিত।

অবশ্য আক্ষেপের বিষয়ও আছে। যে নামেই অভিহিত করি না, "শিবঠাকুরের আপনদেশে" আসলে ভ্রমণকাহিনীই। এই ভ্রমণকাহিনীতে ইথিওপিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতির আরো একটু পরিচয় থাকা উচিত ছিল। ইথিওপীয়দের উৎসব ও ব্যসনের আরেকটু বিস্তৃত বিবরণ থাকলে খুশী হতাম, খুশী হতাম লেখিকার কোনো নামহারা সখীর মনের কথা শুনতে পেলে। আর খুশী হতাম লেখায় উত্তমপুরুষের ব্যবহার কথঞ্চিৎ কম হলে। লেখা যতো অবজেকটিভ, ততো ভালো—তা সে ভ্রমণ-কাহিনীই হোক, অথবা স্মৃতিকথা।

(১৩৫/৬৪)

শিশু-সাহিত্য

দুই পাহাড়ের মাঝের দেশ। স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংযোগ, ২৪ ক্রীক্ রো, কলিকাতা-১৪। দুই টাকা।

মাতঙ্গিনী আর হীরা পাহাড়ের মাঝখানে

বরফ ঢাকা মোতিহীরা রাজ্য। হীরা পাহাড় যাদুর দেশ, তার আকর্ষণে কয়েকটি কিশোর কিশোরী একদিন সেখানে এসে পড়ে। কিন্তু সেখানে দেখবার জিনিস প্রথমে কিছু চোখে পড়ে না। কেবল এক ডাইনী বুড়ীর অত্যাচারে জর্জরিত হয়। কিন্তু তবু তারা বিশ্বাস হারায় না। আশা রাখে একদিন হীরা পাহাড়ের দৃশ্য যাবে বদলে, দেখা মিলবে রানীর। তারপর অনেক বিদ্রোহ, অনেক অভিজ্ঞতা, অন্য দেশ ঘুরে আবার সেই কিশোর কিশোরী যখন দেবদূতের নির্দেশে মোতিহীরা রাজ্যে ফিরে এল তখন সেখানে আকাশ আলোয় আনন্দে ভরে ওঠেছে। শীত গিয়ে এসেছে বসন্ত।

বইটি কিশোরপাঠ্য রূপকথা। অতি-প্রাকৃত সৌন্দর্য ও রোমাঞ্চের আভাস নিয়ে গল্প। সেকেলে রূপকথার চেয়ে নতুনত্ব ও সুরুচি মিশ্রণে। কিন্তু লেখার ঢং-টি তেমন রমণীয় নয়। এক নিশ্বাসে পড়বার আগ্রহ ভাষা ভঙ্গির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠেনি। পরবর্তী সংস্করণে লেখক এ বিষয়ে সচেতন হলে খুশী হব। ১৭৩।৬৩

পত্রিকা

শ্রীমতী। সম্পাদিকা শ্রীমতী বাণী ঘোষ। ১২৭এ, রাসবিহারী অ্যাভিনু, কলিকাতা-২৯। মূল্য প্রতি সংখ্যা ১·০০ টাকা।

বৈশাখের পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত রচনা প্রকাশের যে প্রথাটি স্থায়িত্ব লাভ করেছে তারই অনুসরণে আলোচ্য সংখ্যাখানি পরিকল্পিত। গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস এবং অন্যান্য নিয়মিত বিভাগীয় রচনার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ রবীন্দ্র নাট্যে নৃত্যগীতাভিনয়। অন্যান্য রচনাবলীর মধ্যে আছে রঞ্জিত সিংহের 'রবীন্দ্র-চিন্তা', সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু' এবং চিত্রা গুহ রচিত প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র নাট্যে নৃত্যগীতাভিনয় ও মঞ্চশিল্প।' এ ছাড়া আছে সুশীল রায়, দিনেশ দাস, শান্তি চট্টোপাধ্যায় ও শান্তনু দাসের কবিতা। পত্রিকাখানির অঙ্গসজ্জা সুষ্ঠু এবং পরিচ্ছন্ন।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

রবীন্দ্র-সম্ভাষিত—খিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ সংকলিত।

দিনলিপি—চিত্ত সিংহ।

রামায়ণী প্রেমকথা—সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।

উত্তরণ—রামশঙ্কর চৌধুরী।

স্বরবিদ্ধ—শোভন সোম।

পিঞ্জর—দেমুখৎ।

দময়ন্তীর শাড়ি—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

হনিমুন—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বসুন্ধরা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ইরানের ইতিকথা (পূর্ব কাণ্ড)—শচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্তবক—মৈত্রেয়ী দেবী।

ঝাউ বাংলোর রহস্য—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কিশোর সঞ্চয়ন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কিশোর সঞ্চয়ন—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

শিবরাম চক্রবর্তীর কিশোর সঞ্চয়ন—শিবরাম চক্রবর্তী।

হেমেন্দ্রকুমারের কিশোর সঞ্চয়ন।

জীবন কথা—জসীম উদ্দীন।

আলোর সন্ধানে—কুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

ইতিবৃত্ত—মণ্টু গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারত কোন পথে?—দেবেন দাশ।

প্রেরির বিভীষিকা—জেমস ফেনিমোর কুপার—অনুবাদক কালীপ্রসাদ বসু।

উড়ানি পাতার নাও—সীতেশ রায়।

হারানো প্রেম (১ম খণ্ড)—সমর সোম।

হারানো নূপুর—চিত্রিতা দেবী।

চোর কুঠুরির আলো—গোরা।

শ্যামলী বনানী—ননীগোপাল আইচ।

ওরা কাজ করে—জগমোহন মজুমদার।

ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা—সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ।

মনীষী আশুতোষ—অমরনাথ রায়।

রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ (বাংলা) শকাব্দ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৪-৬৫, ঐ (হিন্দী)

বেদনার কুকুর ও অমল—দীপক মজুমদার।

শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মণি বাগচি।

কাগুর বুকে কত মায়া—নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলমান জীবন (২য় পর্ব)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

অরুণ বরুণ কিরণ মালা—শৈলেন ঘোষ।

ফুটবলের আইন কানুন—মুকুল দত্ত।

ধরনী যখন তরুণী ছিল—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্ণ সজ্জা—মনোজ বসু।

রাজার রাজা (২য় খণ্ড)—বিমল ঘোষ।

রঙ্গজগৎ

আশু কর্তব্য

মহারাষ্ট্র সরকার চলচ্চিত্রশিল্পকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা চলচ্চিত্র-সেবীদের মনে আশার সঞ্চার করবে সন্দেহ নেই। কোন ভাষাভিত্তিক শর্তে এই সরকারী আনুকূল্যের নীতি গৃহীত হয় নি বলে বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্রব্যবসায়ীরা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

মহারাষ্ট্র সরকারের এই নবঘোষিত পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। চলচ্চিত্রশিল্পের প্রতি সরকারী সহযোগিতার এই নজির বিদেশেও লভ্য। পশ্চিম জার্মেনীতে চলচ্চিত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। চিত্রব্যবসায়ের আয় নিম্নগামী। প্রতি মাসে প্রায় বিশটি সিনেমা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। চলচ্চিত্রশিল্পের এই দুর্গতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে পশ্চিম জার্মান সরকার "মার্টিন প্ল্যান"-এর প্রবর্তন করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী দুর্গত চিত্রপ্রযোজক ও চিত্রব্যবসায়ীরা সরকারের কাছ থেকে বার্ষিক আর্থিক সাহায্য পাবেন। আমেরিকাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। স্বাধীন চিত্রপ্রযোজকদের সংকট দূর করার কোন পন্থা আবিষ্কার করা যায় কিনা সেই ব্যাপারে আমেরিকার ইউনাইটেড আর্টিস্টস এবং টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের সভাপতিরা অ্যাটর্নি জেনারেল রবার্ট কেনেডির সঙ্গে আলোচনা করেন। আলোচনার ফলে লোনান পিকচার প্রোডাকশন ব্যাংক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

জু পালাস্ট চিত্রগৃহে আয়োজিত বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'মহানগর' চিত্রের প্রদর্শনীর পর মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকবৃন্দের অভিনন্দনের উত্তরে অভিবাদন জানাচ্ছেন নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজক আর ডি বনসাল ও সত্যজিৎ রায়

ফটো—মনো মিত্র

সিনতার স্টার প্রোডাকশন্স-এর "অশান্ত ঘূর্ণী" (পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়) ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

চিত্রদীপ-এর "একটুকু বাসা" ছবির সেটে রবি ঘোষ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন প্রযোজক-পরিচালক তরুণ মজুমদার

ফটো : দেশ

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের নিদারুণ সমস্যার কথা আরও বিশেষ করে মনে জাগে। চলচ্চিত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মহারাষ্ট্র সরকার যে সক্রিয় নীতি গ্রহণ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারও অনুরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন না কি?

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রশিল্পের ভূমিকা কত ব্যাপক সে সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সমস্যার কথা রাজ্য সরকারের দরবারে বহুবারই পেশ করা হয়েছে। সরকার চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটিও স্থাপন করেছেন। উক্ত কমিটির রিপোর্টও সরকারের হস্তগত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চলচ্চিত্রের সংকটমোচনের কাজে রাজ্য সরকার কোন উল্লেখ্য সক্রিয় ভূমিকা আজও গ্রহণ করেন নি। আশা করব, রাজ্য সরকারের এই ঔদাসীন্য অচিরেই দূর হবে। এবং মহারাষ্ট্র সরকারের মত কোন কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করে রাজ্য সরকার চলচ্চিত্র-শিল্পমহলের ধন্যবাদার্হ হবেন।

বিদেশী সাংবাদিকের চোখে 'মহানগর'

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের ছবি, সত্যজিৎ রায়-কৃত "মহানগর" সর্বোচ্চ পুরস্কারে ভূষিত হবে বলে লণ্ডনের "ডেইলি টেলিগ্রাফ"-এর বার্লিন সংবাদদাতা এরিক শর্টার মনে করেন। ছবিটি দেখে এরিক শর্টার লিখেছেন, "সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুখোমুখি পরিচয় দেখা যায়। জীবনের সত্য ও দরদী রূপটি তাঁর ছবিতে প্রকাশমান। শিল্পীর মূল্যবোধ তাঁর ছবিতে লক্ষণীয়। সুতরাং এবার কোন ছবি যদি বার্লিন উৎসবকে ডামাডোল থেকে রক্ষা করতে পারে, তবে সে ছবি "মহানগর"। সকলেই তাকিয়ে আছেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টেণ্টের দিকে—সংসার চালানো যার পক্ষে কঠিন। সত্যজিৎ রায়ের অন্য ছবির মতই এ ছবি শান্ত, বেদনা-বিধুর ও সংবেদনশীল।" আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, উৎসবের সর্বোচ্চ পুরস্কারের (গোল্ডেন বেয়ার) ব্যাপারে তিনটি বিদেশী ছবির সঙ্গে "মহানগর"এর প্রতিযোগিতা হবে। সেই তিনটি চিত্র হল : আমেরিকার "দি পনব্রোকার" (পরিচালক—সিডনে লুমেট); জাপানের "শী অ্যাণ্ড হি" (পরিচালক—সুসুমু হানি) এবং বৃটেনের "নাইট মাস্ট ফল" (পরিচালক—কারেল রেইজ)।

এ সপ্তাহে যে বাংলা ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে তার নাম অগ্নিনাগ্ন (সন্ধানী প্রোডাকশন্স)। সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন সন্ধানী-গোষ্ঠী। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও নবাগতা সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় এন বিশ্বনাথন, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, ছায়া দেবী, শ্যামল ঘোষাল প্রভৃতি অভিনয় করেছেন। সলিল চৌধুরী সুরকার।

চিত্র-সমালোচনা

শমনের সাথে যারা সংগ্রামের তরে

ব্যাধি আর মৃত্যু—এই দুই বিভীষিকার বিরুদ্ধে এ যুগের ধন্বন্তরীদের সংগ্রামের শেষ নেই। বিজ্ঞান তাদের অস্ত্র। কখনো তারা হার মানে, কখনো জয়ী হয়। মৃত্যুর দেবতার সঙ্গে চিকিৎসকদের এই মরণপণ সংগ্রামের একটি অতি বাস্তবানুগ মর্মস্পর্শী চিত্রকল্প রূপ নিয়েছে "প্রভাতের রঙ" (এস এম পিকচার্স) ছবিতে।

একটি হাসপাতাল এই ছবির আখ্যানবস্তুর (মূল কাহিনী: ডাঃ বিশ্বনাথ রায়) পটভূমি। সেখানে রোগী আছে, আর আছে মানুষকে রোগ-শোকের জ্বালা থেকে বাঁচাবার সংকল্পে অবিচল কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন চিকিৎসক এবং সেবিকার দল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একটি হাসপাতালের পরিবেশ, এবং বিশেষ রোগ নিরাময়ের প্রণালী। এক মানসিক রোগাক্রান্ত মেয়েকে সারিয়ে তোলা যে-ভাবে বিন্যস্ত। ও অতি দুরূহ অস্ত্রোপচার ছবিতে এমন বিশদভাবে দেখানো হয়েছে, যা সত্যিই বিস্ময়কর। আধুনিক অস্ত্র-চিকিৎসার একটি প্রামাণিক পরিচয় এ ছবিতে প্রকাশ পেয়েছে বলা চলে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা অন্যায় হবে না, চিত্রনাট্যের এই পটভূমি উপস্থাপনে এবং ছবিটিকে আঙ্গিক সৌষ্ঠবে কৌশলপূর্ণ করে তোলার কাজে পরিচালক অজয় কর যে প্রযুক্তি-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য।
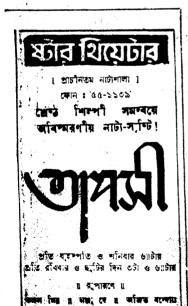
অঞ্জলি পিকচার্স-এর (মাদ্রাজ) "ফুলোঁ কি সেজ" (পরিচালনা ঃ ইন্দ্ররাজ আনন্দ) ছবিতে বৈজয়ন্তীমালা

চিত্রকাহিনীর প্রধান চরিত্র অশোক। এক তরুণ চিকিৎসক। অশোক এবং তাঁর তিন বন্ধুর ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন ও ছাত্র-জীবনের নানা রঙের দিনগুলির আভাস এবং তাঁদের নিবিড় বন্ধুত্বের কথা ছবিতে উল্লিখিত। অপ্রতিরোধ্য ঘটনার স্রোতে অশোকের তিন বন্ধুর জীবন ভিন্ন ভিন্ন ঘাটে গিয়ে ঠেকে। অশোক থেকে যায় হাসপাতালে। সেখানে প্রাত্যহিক কর্মের ভিতর দিয়ে সে খুঁজে পায় জননীর মত এক স্নেহশীলা মহিলাকে। তিনি ডাঃ বেলা বসু। হাসপাতালের প্রবীণ শিক্ষক ও চিকিৎসক ডাঃ সদাশিবের স্ত্রী; ওই হাসপাতালেই তাঁকে ভর্তি করা হয়। নায়ককে তিনি পুত্রস্নেহে কাছে টেনে নেন। তাঁর মনে মহৎ কর্মের প্রেরণা জাগিয়ে তোলেন। মৃত্যু এসে একদিন তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কেউ তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। নায়কের জীবনে এর পরে আসে কল্যাণী। সে হাসপাতালেরই নার্স। কল্যাণীর ছোট ভাই কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে সে আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। তার ভাল হয়ে ওঠার মূলে দেখা যায় অশোকের অমানুষিক অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাস। নায়ক-নায়িকার এই আনন্দের দিন যেন আরও মধুময় হয়ে ওঠে ওদের আশু মিলনের সুখস্বপ্নে।

অশোক ও ডাঃ বেলা বসু এবং অশোক-কল্যাণীর দুটি উপাখ্যান বিন্যাসে পরি-চালক প্রশংসনীয় রুচিবোধ ও পরিমিতি-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম উপকাহিনীতে মহৎ আবেগের স্পর্শ আছে—যা মনকে অভিভূত করে। দ্বিতীয়টিও হাল্কা ও মামুলী প্রণয়োপাখ্যানে পর্যবসিত হয়নি। এবং কোন উপাখ্যানই চিত্রকাহিনীর মূল বক্তব্য থেকে, অর্থাৎ চিকিৎসকের স্বপ্ন ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে এবং ছবির পটভূমি হাসপাতালের বিচিত্র কর্মকাণ্ড থেকে সরে গিয়ে পরিবেশ-নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র নাট্যকাহিনীতে পরিণত হয়নি। এখানেই চিত্র-পরিচালকের কাহিনী বিন্যাসের প্রধান গুণ। এবং ছবির অনিবার্য আকর্ষণও এইখানে। চিত্রনাট্যের (হীরেন নাগ কৃত) এই অধ্যায়টিও প্রশংসনীয়।

ছবির নানাবিধ গুণরাশির পাশে ত্রুটিও কিছু আছে। ছবির প্রারম্ভে চার বন্ধুর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া এবং হোস্টেলে তাদের এক ঘরে সীট পাওয়া নিয়ে অনাবশ্যক ও অবিশ্বাস্য (যেমন দুটি ছাত্রের ফী না দিয়ে দেড় বছর হোস্টেলে কাটিয়ে দেওয়া) ঘটনার বিস্তার রয়েছে। চিত্রনাট্য এই অংশে বাহুল্য-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। নায়কের পূর্ব-পরিচিতা এবং তার প্রেমাভিলাষিণী তরুণীর (সে-ও হাসপাতালের নার্স) যে উপকাহিনী ছবিতে রয়েছে, তা ছবির মূল অন্তর্লীন রসধারায় যেন ছন্দোপতন ঘটিয়েছে। নায়ক-নায়িকার মাঝখানে ওই তরুণীর মন্থরা-সুলভ খলতা খুবই মামুলী। এবং তা বিশেষ কোন নাট্য-প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে বলা চলে না। ছবির নতুন ধরনের রসোপকরণ ও পরিবেশের মাঝখানে এই গতানুগতিক ত্রিভুজ উপাখ্যান বেমানান লেগেছে। এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে "প্রভাতের রঙ" একটি ভিন্নধর্মী, পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী ছবি হিসাবে আদরণীয় হবে।

ছবির দুটি প্রধান চরিত্র অশোক ও কল্যাণীর ভূমিকায় মর্মগ্রাহী ও সংযত অভিনয় করেছেন যথাক্রমে বিশ্বজিৎ ও শর্মিলা ঠাকুর। বিশ্বজিৎ এত ভাল অভিনয় বোধ হয় এর আগে কোন বাংলা ছবিতে করেননি। শ্রীমতী ঠাকুর কল্যাণীর শান্ত, শিক্ষিত ও দরদী মন চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যে দুই শিল্পীর অভিনয় দর্শকমনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তাঁরা হলেন বিকাশ রায় ও মঞ্জু দে। বাইরে কঠোর ও অন্তরে কোমল একটি চরিত্রের বিশ্লেষণে বিকাশ রায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়ে-ছেন। তাঁর রুগ্না স্ত্রীর ভূমিকায় মঞ্জু দে আশ্চর্য সুন্দর অভিনয় করেছেন। সর্বক্ষণ বিছানায় শুয়ে থেকে তিনি শুধু সংলাপ উচ্চারণ ও মুখের অভিব্যক্তি দিয়ে দর্শকদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে গেছেন এবং অবলীলায় এক স্নেহ-শীলা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না রমণীর চরিত্র গড়ে তুলেছেন। তাঁর এই অভিনয় স্মরণীয়।

নায়কের প্রণয়প্রার্থিনী এক নার্সের চরিত্রে লিলি চক্রবর্তী প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। নায়কের তিন বন্ধুর মধ্যে রবি ঘোষের চরিত্রচিত্রণ দর্শককে সব চাইতে বেশী আনন্দ দেবে। তাঁর কৌতুকাভিনয় খুবই উপভোগ্য। অপর এক বন্ধুর চরিত্রে

এস ফিল্মস-এর "কে তুমি?" (পরিচালনাঃ শ্যাম চক্রবর্তী) ছবিতে বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় ও তরুণকুমার ফটো—দেশ

অভিনয় করেছেন নবাগত তাপস গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর বাচনভঙ্গি মার্জিত। অভিনয়ও স্বচ্ছন্দ। নবাগত অনিন্দ্য ঘোষের অভিনয় অনাড়ষ্ট। তাঁর ভাবপ্রকাশ সাবলীল। শিল্পীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে মনে হয়।

মানসিক রোগাক্রান্ত একটি চরিত্রে স্মিতা মজুমদার অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। নিজের চলনশক্তি সম্পর্কে মনের ভয় ও ভ্রম

অর্নিবাণ ফিল্মস-এর "পতিত সংশোধনী সমিতি" (পরিচালনা : বিশু দাশগুপ্ত) ছবির একটি বিশিষ্ট চরিত্রে করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি চমৎকার ফুটিয়েছেন। দর্শকেরও মনে হয়েছে ওই চরিত্র বুঝি সত্যিই হাঁটার ক্ষমতা হারিয়েছে।

অন্যান্য ভূমিকায় যথোচিত অভিনয় করেছেন পদ্মা দেবী, অমর বিশ্বাস, মিণ্টু দাশগুপ্ত, বীরেশ্বর সেন এবং শিশুশিল্পী গৌতম।

ছবির সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আবহসংগীত পরিবেশানুগ। হাসপাতালে যেখানে মনোবিকারগ্রস্ত মেয়েটি হাঁটতে পারছে ওই মুহূর্তের আবহ-সুর ভাবমধুর। দুটি গানের সুর সুন্দর (যদিও গান দুটির বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল মনে হয় না) এবং সংগীত (সুরকারের কণ্ঠে)। "আজি রাতে" গানটি জনপ্রিয় হবে বলে মনে হয়।

কলাকৌশলের সব বিভাগের কাজই উচ্চদরের। বিশেষত আলোকচিত্রগ্রহণ (বিশু চক্রবর্তী কৃত)। সম্পাদনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়। শিল্পনির্দেশ (কার্তিক বসু) বাস্তবোচিত।

উদ্ভট রঙ্গ!

ইস্টম্যান কালারে (বর্ণসুষমার পরিবর্তে নয়নপীড়াকর বিবর্ণতাই যেখানে লক্ষণীয়) রঞ্জিত "কাশ্মীর কি কলি" (শক্তি ফিল্মস) নামক যে হিন্দী চিত্রটি প্রযোজক-পরিচালক শক্তি সামন্ত সম্প্রতি উপহার দিলেন, তার উদ্ভট কর্মকাণ্ডের পুরোভাগে রয়েছে এক ক্রোড়পতির পালিত পুত্র। অবশ্য তার আসল পরিচয়, অর্থাৎ সে যে বিত্তবানের সন্তান

১০ই জুলাই থেকে রাধা পূর্ণ আলোছায়া

নয় এই তত্ত্বটি ছবিতে ক্রমশ প্রকাশ্য। নায়কের গৃহত্যাগের মূলে যে ঘটনাটি বিদ্যমান, তা হল পুত্রের জন্য তার জননীর (যিনি নায়কের গর্ভধারিণী নন) পাত্রী নির্বাচন। সংবাদ পেয়ে নায়কের বাড়িতে কয়েকজন অভিভাবক তাদের কন্যাকে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে এবং নায়কের জননী একের পর এক পাত্রী পরীক্ষা করে চলেছেন (এই অদ্ভুত ব্যাপারও এযুগে ঘটে!)। দোকানে শাড়ি পছন্দ করার মত শেষ পর্যন্ত একটি মেয়ে রানীমার (এই নামেই তিনি ছবিতে

গুপ্তশ্রী প্রোডাকশন্স-এর "নিশাচর" (পরিচালনা : ভূপেন রায়) ছবিতে দিলীপ রায় ও সুমিতা সান্যাল

উল্লিখিতা) পছন্দ হয়ে যায়। এমনি সময়ে খোঁড়া সেজে নায়কের আবির্ভাব। মনুষ্যেতর জীবের চিৎকার তার কণ্ঠে ধ্বনিত। উন্মাদবৎ তার আচরণ। বলা বাহুল্য, অভিভাবকরা তাদের যার যার কন্যাকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সরে পড়ে। নায়কও এই ঘটনার পর বিবাহ-বর্জনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করে এবং পলাতকে মত্ত হস্তীর মত কাশ্মীরে এসে উপস্থিত হয়।

সেখানে নায়িকার (এক ফুলওয়ালী) সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। সরাইখানা জাতীয় এক গৃহে রাত্রিবাসকালে নায়িকা আকস্মিক কারণে সকলেই এক রাত্রির জন্য সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। উপর থেকে আসল ব্যাপার না বুঝে এক বালতি ঠান্ডা জল নায়কের মাথার উপর ঢেলে দেয়। আশা হয়েছিল, এর পর বুঝি নায়কের মাথা ঠান্ডা হবে। ঠান্ডা হওয়া তো দূরের কথা। আরও যেন গরম হয়ে উঠল। একদিকে তার প্রচণ্ড অস্থিরতা, অন্যদিকে প্রেম। এই দুয়ের যোগসাজসে কত কাণ্ড যে ঘটে যায় তার ইয়ত্তা নেই। প্রসংগত উল্লেখ্য নায়কের কাশ্মীরের বাড়ি দেখাশোনা করে যে কর্মচারী (যে "কাম সেপ্টেম্বর" ছবির উপাখ্যানের অনুকরণে নায়কের বিলাস-ভবন হোটেলে পরিণত করেছে এবং যেখানে তিন আধুনিকা ও অপর এক মহিলা ঘরভাড়া নিয়েছে) সে "হোটেল-বাসিন্দাদের" কাছে মনিবের প্রকৃত পরিচয় গোপন করার উদ্দেশ্যে তাকে পাগল বলে চালিয়েছে। অবশ্য এর জন্য পাগলামির কোন অতিরিক্ত অভিনয় করতে হয়নি নায়ককে। গোড়া থেকেই এই চরিত্রের হাব-ভাব, চলা-ফেরা ও বাচনভঙ্গি দেখে তার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে মনে সন্দেহ জাগে। যাক এসব কথা। এদিকে কাশ্মীর কি কলির সঙ্গে অর্থাৎ ফুলওয়ালীর সঙ্গে নায়কের প্রেম কলায় কলায় বেড়ে চলেছে। অপর দিকে হিন্দী ছবির চিরা-চরিত ছক অনুযায়ী নায়িকার পাণিপ্রার্থী এক শঠের ঈর্ষা ও ক্রোধের অনলও বর্ধিত হয়ে চলেছে। খলনায়ক জানতে পেরেছে, ফুলওয়ালীই আসলে পরলোকগত ক্রোড়-পতি শেঠের একমাত্র সন্তান। রাণীমার কোল থেকে তার পালক-পিতা তাকে চুরি করে এনেছিল। দুর্বৃত্ত এটা জানতে পারেনি যে, নায়ক প্রকৃতপক্ষে ফুলওয়ালীর অন্ধ-পালক-পিতার পুত্র। নায়ক উভয় তত্ত্বই যথাসময়ে জানতে পেরেছে। নায়িকাকে বিয়ে করে খলনায়ক বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক হতে চায়। কিন্তু অপরাজেয় নায়ক খলচরিত্রের সব চেষ্টাই ব্যর্থ করে।

ছবির গোঁজামিল-সর্বস্ব কাহিনীর বিন্যাসে পরিচালক অক্ষমতা ও অসংগতি-পূর্ণ ঘটনার যথাবিহিত সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কোন বিচারশীল দর্শককে এই ছবি সন্তুষ্ট করতে পারে না।
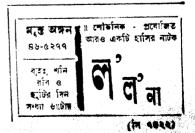
কে এম বি প্রোডাকশনস-এর 'নিশিযাপন' (পরিচালনা : প্রফুল্ল চক্রবর্তী) ছবির একটি দৃশ্যে তরুণকুমার ও সুস্মিতা সান্যাল

দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাম্মী কাপুর ও শর্মিলা ঠাকুর। "জংলী" ছবিতে শাম্মী কাপুর যে অভিনয়-রীতি দেখিয়েছিলেন এবং যা রুচিবান দর্শকের বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছিল, এ-ছবিতেও তাই দর্শনীয়। ফুলওয়ালী নায়িকার রূপসজ্জায় নিরুচ্চার অভিব্যক্তির সময় শর্মিলা ঠাকুরকে ভালই লেগেছে। তকে ওই বেশে মানিয়েছে সুন্দর। কিন্তু হিন্দী ছবির নায়িকার দায়িত্ব পালনে অর্থাৎ নাচ-গান, চটুলতা ও অতি অভিনয় পরিবেশনে তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় চিত্র-নাট্যের দাবি মিটিয়েছেন প্রাণ, পদ্মা দেবী, নাজির হোসেন, ধুমল, অনুপকুমার, মদন পুরী প্রভৃতি।

ছবির আবহ-সুর মনোরম। গানের সুরও সুশ্রাব্য। সংগীত পরিচালনা করেছেন ও পি নায়ার।

একটুকু বাসা

গত সপ্তাহে চিত্রদীপ-এর "একটুকু বাসা" ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। তরুণ মজুমদার ছবিটির প্রযোজক-পরিচালক। মনোজ বসুর কাহিনী অবলম্বনে নির্মীয়মাণ এ-ছবির প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, পদ্মা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, অনুভা গুপ্ত, [illegible], ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সোমনাথ মণ্ডল প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকার।

রাজকন্যা

প্রযোজক-সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্রর পরবর্তী ছবির নাম "রাজকন্যা"। রূপছায়া চিত্রর এই ছবির কাহিনী রচনা করেছেন ঋত্বিক ঘটক। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করবেন। মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার ও নবাগতা রিনা। প্রযোজক শ্রীমিত্র নিজেই সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

বাংলা চলচ্চিত্রের উৎসব

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি এবার এক অভিনব চলচ্চিত্র উৎসবের কথা ভাবছেন। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের জন্মলগ্ন থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত যে বিশিষ্ট নির্বাক ও সবাক চিত্রগুলি তৈরী হয়েছে তারই কয়েকটি দেখাবার আয়োজন করছেন ফিল্ম সোসায়েটি। বাঙলা চলচ্চিত্রের ক্রমবিবর্তনের সম্পূর্ণ পরিচয়টি তুলে ধরা এই উৎসবের লক্ষ্য। বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের প্রথম যুগের ছায়াচিত্র এবং তার স্থিরচিত্র সংগ্রহের ব্যাপারে সোসায়েটি বর্তমানে ব্যস্ত আছেন।

"ওয়ারো" ফিল্ম

পূর্ব জার্মেনীর "অগাফা" ফিল্ম-এর নতুন নাম হয়েছে "ওয়ারো"। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে এই "ওয়ারো" ফিল্মের এজেন্সি নিয়েছেন মাদ্রাজের এ-ভি-এম সংস্থার স্বত্বাধিকারী শ্রী এ ভি মায়াপ্পান।

'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য

বহু-অভিনীত নাট্য অথবা নৃত্যনাট্যকে নতুন করে চিত্তগ্রাহী করে তোলা সহজ কাজ নয়। গত রবিবার সকালে এ বি ডি সংস্থা রঙ্গি প্রেক্ষাগৃহে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য পরিবেশনকালে একটি কঠিন পরীক্ষারই মুখোমুখি হয়েছিলেন। সুখের বিষয়, এই নূতন শিল্পিসংস্থা সেই পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। পুরাতনকে তাঁরা নতুন করে রসোত্তীর্ণ করতে পেরেছেন।

সংগীত ও নৃত্যের সুন্দর সমন্বয়ে নৃত্য-নাট্যের ভাববস্তু পরিস্ফুট হয়েছে। চিত্রাঙ্গদার সামান্য বেদনার মহৎ বেদনায় রূপান্তরিত হওয়ার এবং পরিশেষে সত্যোপলব্ধির মধ্য দিয়ে তার পরম প্রাপ্তির কাহিনী শিল্পীরা গানের কথায় তার সুরে, নৃত্যের ছন্দে আর ভঙ্গিমায় মূর্ত করেছেন।

কুরূপা ও সুরূপা চিত্রাঙ্গদার গানগুলি দরদ দিয়ে গেয়েছেন যথাক্রমে সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের একাধিক গান সেদিনের দর্শক-শ্রোতারা দীর্ঘকাল মনে রাখবেন। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় অর্জুনের এবং চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় মদনের গান নাটকীয় ভাব সহ পরিবেশন করেছেন।

আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুরূপা চিত্রাঙ্গদা নৃত্যাভিনয় বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। সুরূপা চিত্রাঙ্গদা হয়েছিলেন অনুরাধা গুহ। অর্জুন ও মদনের ভূমিকায় অনাদিপ্রসাদ ও সাধন গুহর অভিনয় মনোজ্ঞ। মঞ্চব্যবস্থা ও সাজসজ্জা রুচিসম্মত। তাপস সেনের আলোকসম্পাত সুষ্ঠু।

নৃত্য-পরিচালনার কৃতিত্ব অনাদিপ্রসাদের; সংগীত-পরিচালনা করেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বোম্বাই সমাচার

বোম্বাইয়ের তরুণ চিত্রসম্পাদক অমিত বসু একটি পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বাংলা ছবি প্রযোজনার ব্যবস্থা করছেন। ছবিটি তিনিই পরিচালনা করবেন। কাহিনী তাঁরই রচনা। এর দুটি প্রধান চরিত্র অপ্রকাশিত। ওই দুই চরিত্রে অভিনয় করবেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল। অন্য সব চরিত্রে নতুন শিল্পীদের দেখা যাবে। ছবিতে গান থাকবে না। আবহসুর রচনা করবেন সলিল চৌধুরী।

প্রযোজক-পরিচালক-কাহিনীকার রামানন্দ সাগর তাঁর "মঞ্জিল এক মুসাফির দো" ছবির নাম পরিবর্তন করেছেন। ছবির নতুন নাম হল : আরজু। রাজেন্দ্রকুমার ও সাধনা ছবির দুই প্রধান শিল্পী। শংকর-জয়কিষণ সুরকার।

মুকুল

ফুটবলের আইনকানুনের সংক্ষিপ্তসারে এ সপ্তাহে লিখছি—'গোল হলেও কখন গোল দেওয়া হয় না।'

কথাটায় একটু ত্রুটি রয়ে গেল। গোল হলে আবার গোল দেওয়া যাবে না কেন? গোল হলে নিশ্চয়ই গোলের নির্দেশ দিতে হবে। সুতরাং যেখানে গোলের নির্দেশ দেওয়া যাবে না, সেখানে নিশ্চয়ই আইনসম্মত গোল হয়নি বলে ধরতে হবে। অথচ অনেক ক্ষেত্রে বল গোলের মধ্যে প্রবেশ করলে গোল বলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে গোলের মধ্যে বল ঢুকলেও গোল দেওয়া যায় না। আগে সেই সূত্র ক'টি দেখা যাক।

গোল (?) হলেও কখন গোল দেওয়া যায় না

(১) যখন গোল-কিক, কিক-অফ, ইনডিরেক্ট ফ্রি-কিক এবং থ্রো-ইন আর কারো স্পর্শ ব্যতিরেকে সরাসরি বিপক্ষের গোলে ঢোকে; (আইন—১৬, ৮, ১২ ও ১৫)।

(২) যখন গোল-কিক, ডিরেক্ট ফ্রি-কিক, ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক ও থ্রো-ইন আর কারো স্পর্শ ব্যতিরেকে নিজেদের গোলে ঢোকে; (আইন—১৬, ১২ ও ১৫)।

(৩) কোন দর্শক, কোন প্রাণী বা বাইরের কোন কিছুতে লেগে যখন বল গোলে ঢোকে; (আইন—১০)।

গোল-কিক, কিক-অফ, ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক এবং থ্রো-ইন সরাসরি গোলে ঢুকলে যে গোল হয় না, এ কথা ফুটবল সম্বন্ধে একটু যাঁদের জ্ঞান আছে, তাঁরা সবাই জানেন। কিন্তু ডিরেক্ট ফ্রি-কিক থেকে সরাসরি নিজেদের গোলে গোল করলেও যে গোল হয় না, এ কথা আইনবিশারদ ছাড়া অনেকেরই জানা নেই।

উপরে লেখা সূত্রগুলির সঙ্গে আর কিছু সূত্র যোগ করা যেতে পারে। যেমন রেফারীর ড্রপের পর কারো স্পর্শ ব্যতিরেকে বল গোলে ঢুকলেও গোল দেওয়া যায় না। কিংবা কোন কারণে বল ফেটে যাবার পর বা বেআইনী হয়ে পড়বার পর গোলে ঢুকলেও গোল দেওয়া যায় না। এ-সব ক্ষেত্রে আইনের নির্দেশ সুস্পষ্ট বলে সূত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

[চিঠিপত্র]

[illegible] জাং, সম্পাদক, ত্রিপুরা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন, 'রানামহল', আগরতলা, ত্রিপুরা।

প্রশ্ন—(১) এখানকার লীগ খেলায় গর্হিত আচরণ বা মারাত্মক ধরনের ফাউলের অপরাধে রেফারী খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিয়ে দুই মিনিট বা পাঁচ মিনিট পরে সেই বহিষ্কৃত খেলোয়াড়কে পুনরায় খেলার অনুমতি দেন। আমার জিজ্ঞাসা, রেফারী অপরাধী খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বহিষ্কৃত করে পুনরায় সেই খেলায় অংশ গ্রহণের অনুমতি দিতে পারেন কি?

উত্তর—(১): না, পারেন না। হকি খেলার মত ফুটবল খেলায় অপরাধী খেলোয়াড়কে 'টেম্পোরারী সাসপেন্ড', অর্থাৎ খেলা থেকে সাময়িক বরখাস্ত করার আইন নেই। ফুটবল খেলায় গর্হিত আচরণ বা মারাত্মক ধরনের ফাউলের অপরাধে অপরাধী খেলোয়াড়কে রেফারী মাঠ থেকে বের করে দিলে তাঁর আর খেলায় অংশ গ্রহণের অধিকার থাকে না, রেফারীও তাঁকে খেলার অনুমতি দিতে পারেন না। এমনকি, ঐ অপরাধী খেলোয়াড় কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তাঁকে খেলার অনুমতি দেওয়া যায় না। তবে রেফারী তাঁর ক্ষমা প্রার্থনার ঘটনা রিপোর্টে উল্লেখ করতে পারেন এবং খেলোয়াড়ের অনুশোচনার জন্য অ্যাসোসিয়েশনও অপরাধী খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে লঘু শাস্তি গ্রহণ করতে পারেন।

প্রশ্ন (২)—লাল ও নীল দলের খেলায় বল লাল দলের গোলের মুখে রয়েছে। সহসা দেখা গেল, নীল দলের ব্যাক তাঁদের পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে লাল দলের সেন্টার ফরোয়ার্ডের মুখে চড় বা গায়ে লাথি মারলেন। এই ক্ষেত্রে রেফারী নীল দলের ব্যাকের বিরুদ্ধে পেনাল্টি-কিকের নির্দেশ দেবেন কি?

উত্তর (২)—নিশ্চয়ই।

খেলাটি যদি চালু থাকে, অর্থাৎ বল যদি খেলার মধ্যে থাকে, তবে বলের অবস্থান মাঠের যেখানেই থাক, রক্ষণকারী দলের খেলোয়াড় নিজেদের পেনাল্টিএরিয়ার মধ্যে পেনাল্টিযোগ্য অপরাধ করলে তার জন্য পেনাল্টির নির্দেশ দিতে হবে। অর্থাৎ অপরাধ যেখানে, শাস্তি সেখানে।

শ্রীবিজয়কুমার মজুমদার, পোঃ ও গ্রাম—আমতা, হাওড়া:

উত্তর—পেনাল্টি-কিকই হোক কিংবা অন্য কোন কিকই হোক, কিকের বা শটের পর বল গোল-পোস্ট বা ক্রসবারে লেগে ফেটে গিয়ে গোলে প্রবেশ করলে সে সলে যে গোল হয় না, এ কথা বহুবার লিখেছি।

আপনি কারণ জানতে চেয়েছেন, কারণ খুবই স্পষ্ট। আইনে আছে, বল গোলের মধ্যে প্রবেশ করলে গোল হবে। ফেটে গিয়ে যে জিনিসটি গোলে প্রবেশ করল, সেটা কি বল? না, বলের খোলস? আইনে বলের সংজ্ঞাও দেওয়া আছে। বল ফেটে গেলে সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী বল আইনমাফিক থাকে না। সুতরাং বেআইনী বলে আইনমাফিক গোল হতে পারে না।

শ্রীনরেশচন্দ্র [illegible], ১, গৌরমোহন মুখার্জি লেন, কলিকাতা-[illegible]:

প্রশ্ন—'প্লেয়ার্স-লিস্ট', অর্থাৎ দলের খেলোয়াড়দের নাম রেফারীর কাছে কখন পেশ করতে হয়? এর কোন বাঁধাধরা নিয়ম আছে কি?

উত্তর—না, ফুটবল খেলার আইনের মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নেই। প্রতিযোগিতার নিয়মমত প্লেয়ার্স-লিস্ট রেফারীর কাছে পেশ করতে হয়। প্রতিযোগিতা কমিটি নিজেদের বিচার-বিবেচনামত নিয়ম করতে পারেন। প্রতিযোগিতার নিয়ম মেনে চলা রেফারীর কর্তব্য।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, রাজ-গাংপুর, জেলা সুন্দরগড়, ওড়িষ্যা:

প্রশ্ন—ক্রস-বারে লেগে গোল-লাইনের উপর বল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোলকিপার বলটি নিজের আয়ত্তে আনেন। কিন্তু বল গোল-লাইন অতিক্রম করেছে বলে গোলের বাঁশী বাজান। পরে লাইন্সম্যানের পরামর্শে রেফারী গোলটি নাকচ করে গোল-লাইনের কাছে বল ড্রপ দেন এবং ড্রপের সঙ্গে সঙ্গে গোল হয়ে যায়। রেফারীর ভুলের জন্য বিনা দোষে একটি টীমকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

এভাবে 'ড্রপ' দেওয়া কি আইনসম্মত? আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে গোল-কিকের নির্দেশই ন্যায়সঙ্গত? আপনার মতামত জানাবেন।

উত্তর—আপনি লিখেছেন, রেফারীর ড্রপের সঙ্গে সঙ্গে গোল হয়ে যায়। রেফারীর ড্রপ থেকে তো কোন গোল হতে পারে না। রেফারীর ড্রপের পর কোন খেলোয়াড়ের দ্বারা গোল হওয়া চাই।

যাই হোক, এ বিষয়ে মতামতের তো প্রশ্ন আসে না। আইনের প্রশ্ন। আইন অনুযায়ী ঐ ক্ষেত্রে রেফারীর ড্রপ দিয়ে খেলা আরম্ভ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি কোন মতেই গোল-কিকের নির্দেশ দিতে পারেন না। গত বছরই কলকাতার প্রথম ডিভিসন লীগের খেলায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল এবং রেফারীর ড্রপের পর আক্রমণকারী পক্ষ গোলও করেছিল।

রেফারীর ভুলের ফলেই যে গোল হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু উপায় কি? আইনের বিধান মানতেই হয়েছে। এ-সব ক্ষেত্রে যাতে ভুল না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকাই রেফারীর কর্তব্য। বলের সম্পূর্ণ অংশ গোল-লাইন অতিক্রম করেছে, এ বিষয়ে নিজে নিঃসন্দেহ হলে অথবা লাইন্সম্যানের সঠিক নির্দেশ পেলে রেফারীর গোলের বাঁশী বাজান উচিত।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৯শে জুন—অদ্য রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ ভবনে স্যার আশুতোষ মুখার্জী জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

গতকাল বিকালে জলপাইগুড়ি জেলার পাক সীমান্ত এলাকা হইতে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর লোকেরা ৭ জন পুলিস কর্মী-সহ ৯ জন ভারতীয়কে বলপূর্বক পাকিস্তানে ধরিয়া লইয়া যায়। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত অপহৃত ভারতীয়দের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

৩০শে জুন—আজ অপরাহ্ণে চণ্ডীগড় বিধান-সভা ভবনে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস বিধানসভা দলের এক বিশেষ সভায় সর্দার স্বর্ণ সিং পাঞ্জাবের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শ্রীরামকিষণের নাম ঘোষণা করেন। সমবেত সকলের তুমুল হর্ষধ্বনি নামটিকে স্বাগত জানায়।

রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। অদ্য রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ-বিষয়ে দীর্ঘকাল আলোচনা চলে। আগামী ফসলের মরসুম হইতে এই ব্যবস্থা চালু হইবে।

১লা জুলাই—প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর পরিবর্তে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান-মন্ত্রী সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রীর পদের জন্য মনোনীত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী শ্রী শাস্ত্রীর লণ্ডন যাত্রা বাতিল করিতে হয়।

যে সমস্ত ভারতীয় পারিপার্শ্বিক কারণে ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন, তাঁহাদের সম্পত্তি সম্পর্কে ব্রহ্ম সরকার শেষ পর্যন্ত কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া ভারত সরকার বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

২রা জুলাই—জেলা ও মফস্বলের শহরাঞ্চলের লোকেরাও যাহাতে পারিবারিক রেশন কার্ডের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল কিনিবার সুযোগ পান, সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেন গতকাল ৬ হাজার টন চাউল সরবরাহ করিতে খাদ্য দপ্তরকে নির্দেশ দিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশের আইনমন্ত্রী শ্রীগুলশের আহমেদ ইন্দোরে বলেন যে, দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে চারজন সিভিল-জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে চাকুরি হইতে অপসারণ করা হইয়াছে এবং তিনজন জেলা-জজকে ৫৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

৩রা জুলাই—কলিকাতার ভূগর্ভস্থ পয়ঃ-প্রণালী, গুরুত্বপূর্ণ ভবনাদি ও এলাকাসমূহের অবস্থান সম্বলিত মানচিত্র, বিশদ নকশা ও অন্যান্য তথ্যাবলী পৌরসভার কর্মচারী একজন পাক নাগরিক পাকিস্তানে পাচার করিয়াছে। ইহার সহিত দপ্তরের অন্য কর্মচারীরও যোগসাজশ আছে। এই সম্পর্কিত কিছু কাগজপত্রও নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে।

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড আজ উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্রকে দলের আইনজীবী সংস্থার নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে দ্রুত উত্তর দিতে বলেন।

৪ঠা জুলাই—আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ নেহরু স্মৃতি তহবিলে ৫১০০০ টাকা দান ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের অগণিত পাঠক ও দেশবাসী সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য অর্থ সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছেন।

ভারতরক্ষা আইনে কলিকাতার ছয়জন চাউলের পাইকারকে ধরার পর পুলিসের অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, উড়িষ্যার নানা চাল-কলে ও গুদামে একমাত্র ঐ ছয়জনেরই চার লক্ষ মণের মত চাল মজুত আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন সেই চাল আনার চেষ্টা করিতেছেন।

৫ই জুলাই—মুখ্যমন্ত্রীসহ ছয়জন মন্ত্রী ও একজন উপমন্ত্রী লইয়া পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। আজ সকালে পাঞ্জাবের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামকিষণ কংগ্রেস সভাপতির নিকট মন্ত্রি-সভার সদস্যদের নামের তালিকা পেশ করেন। শ্রীকামরাজও ঐ তালিকা অনুমোদন করেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ পুলিস সংস্থা হাওড়া, শিয়ালদহ, শালিমার ও খড়্গপুর রেল স্টেশনের মাল ও পার্শেল বুকিং অফিসে হানা দিয়া ১৯ জন কর্মচারীর নিকট হইতে প্রায় এক হাজার টাকা উদ্ধার করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে জুন—আধা-সরকারী সংবাদপত্র 'আল-আহরামে' প্রকাশ, মিশরীয় কারখানাগুলিতে এমন এক ধরনের জেট বিমানের নির্মিত হইয়াছে, যাহা ব্যবহার করিলে জেট বিমানগুলি শব্দ অপেক্ষা আড়াই গুণ বেশী গতি সহকারে উড়িতে পারিবে।

'পাকিস্তান টাইমসে' প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে দীর্ঘ-মেয়াদী সামরিক সাহায্য দিবার সিদ্ধান্ত করায় পাকিস্তান মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইবে।

৩০শে জুন—ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনার শ্রী পি আর এস মণিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার জন্য আজ সন্ধ্যায় কলম্বোতে আহূত ভোজসভায় যোগদান না করার জন্য সিংহলের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী-দের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ বেন বেলা ভারতবর্ষ পরিদর্শনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কখন ভারতে যাইতে পারিবেন, তাহা সঙ্গে সঙ্গে জানাইতে পারেন নাই। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হোসেন তাঁহাকে এই আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন।

১লা জুলাই—পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ আজ বিদেশ যাত্রা করিয়াছেন। কাবুল, তেহারান ও আংকারা হইয়া তিনি লণ্ডনে পৌঁছিবেন। ইতিমধ্যে তিনি সকলকে, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গকে এ-কথাটি সমঝাইয়া দিতে চাহেন যে, ভারতকে সামরিক সাহায্য দানের মধ্যে বড় রকমের বিপদ নিহিত রহিয়াছে।

চিলির কম্যুনিস্ট দৈনিক পত্রিকা 'এল সিগলো'-র সাহিত্য সমালোচক শ্রীযারকো মোরেটিক—নিজেও কম্যুনিস্ট—চীনের সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শ বিকৃতির এক বিবরণ দিয়াছেন।

২রা জুলাই—সিংহলের গবর্নর জেনারেল আজ পার্লামেন্টের নূতন অধিবেশনে কতকগুলি 'সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা' অবলম্বন এবং 'সমাজ-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে উন্নয়ন সম্পর্কে সুপরি-কল্পিত কর্মসূচী' দ্রুত কার্যে পরিণত করা সম্পর্কে কোয়ালিশন সরকারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে আজ ঐতিহাসিক নাগরিক অধিকার বিলটি গৃহীত হয়। প্রেসি-ডেণ্ট জনসন আজ রাত্রেই বিলটি স্বাক্ষর করিয়া উহাকে আইনে পরিণত করিবেন। স্বাক্ষর অনু-ষ্ঠানের দৃশ্য টেলিভিশনযোগে সারা দেশে প্রচারিত হইবে।

৩রা জুলাই—লাওসের প্রধানমন্ত্রী সুবন্ন ফুমা কম্যুনিস্টপন্থী প্যাথেট লাওয়ের নেতা প্রিন্স সুফানোভং-এর নিকট এক টেলিগ্রাম করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন যে, নয়াদিল্লিতে লাওসের তিনটি দলের মধ্যে শীর্ষ বৈঠক করা যাইতে পারে।

১৯৪৮ সালে ভারতীয় লোকসভায় যে হিন্দু কোড আইন গৃহীত হয়, পাকিস্তান সরকার তাহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া প্রদেশের হিন্দু আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৪ঠা জুলাই—ব্রিটিশ সংবাদদাতার এক সংবাদে প্রকাশ, জরুরী সামরিক সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত আড়াই লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের ব্রিটিশ ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম মাসের পর মাস আগ্রার ডিপোতে অব্যাহত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। "ডেইলী টেলীগ্রাফ" পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

নেপালের রাজা মহেন্দ্র অন্যতম উপদেষ্টা কমিটি, রাজ্যসভার সভাপতি ও সদস্যপদ হইতে শ্রীহৃষীকেশ শাকে অব্যাহতি দিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে কি কারণে অব্যাহতি দেওয়া হইল, তাহা বলা হয় নাই।

৫ই জুলাই—আলজিরিয়ার ভূতপূর্ব প্রধান-মন্ত্রী শ্রীফারহাত আব্বাসকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু আলজিয়ার্সের রাজনৈতিক মহল এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

পাকিস্তান হইতে এক লক্ষ টন চাল কেনা সম্পর্কে কথাবার্তার জন্য এক ভারতীয় প্রতি-নিধি দল রাওয়ালপিণ্ডিতে আসিয়া পৌঁছিয়া-ছেন। চালের বদলে পাকিস্তান ভারত হইতে এমন সব জিনিসপত্র পাইতে চায়, যাহা সাধারণত ঐ দেশে রপ্তানি করা হয় না।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা — ৪০ পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক —২০, টাকা, ষাণ্মাসিক—১০, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, টাকা, ষাণ্মাসিক— ১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক — ৫ টাকা ৫০ পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা-১।
টেলিফোন : ২৩-২২৮০ ও ২৩-৮৫৪১ স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ শ্রীপ্রণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

দেশ

DESH 40 Paise
Saturday, 1st August, 1964

৩১ বর্ষ ॥ ৩৯ সংখ্যা ॥ ৪০ পয়সা
শনিবার, ১৬ শ্রাবণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

শিক্ষা ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গের দিনকাল এখন বড়ই মন্দ চলেছে। কথায় বলে কপাল যখন ভাঙতে শুরু করে তখন চারদিক দিয়েই যেন ভাঙে। দেখা যাচ্ছে, এই রাজ্যের সর্বত্রই সেই ভাঙনের চেহারা স্পষ্ট; সবখানেই ঘাটতি আর পড়তি, অকুলান আর অব্যবস্থা। গতবারে আমরা পশ্চিমবঙ্গে কৃষির শোচনীয় অবনতির কথা বলেছিলাম, তখন জানা ছিল না পড়তি শুধু কৃষিতেই নয় আরও এক পড়তির চেহারা অচিরেই দেখতে হবে। দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ব্যাপারেও পড়তি চলেছে।

সম্প্রতি এখানে স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ পেয়েছে। হিসেবমতে গতবার যেখানে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশের হার ছিল শতকরা ৩২·০৫ এবং উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা ৫৯·৮—সেখানে এ বছরে উক্ত দুটি পরীক্ষায় পাশের হার যথাক্রমে ২৫·৮ (স্কুল ফাইন্যাল) এবং ৫৭·২ (উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা)। অঙ্কশাস্ত্রের মতে এই হিসাব, অবনতির। অবশ্য বলা যেতে পারে যে, শিক্ষার উন্নতি অবনতি অঙ্কের হিসাব দিয়ে বিচার করা যায় না; সেদিক থেকে বরং এই যে স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাসের হার কমছে তাতে শিক্ষার উন্নতি সূচিত হচ্ছে বলে কেউ কেউ মনে করতে পারেন। এঁদের যুক্তি স্বীকার করতে পারলে আমরা অনেকেই হয়ত সান্ত্বনা পেতে পারতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়—এ-কথা প্রায় সকলেই নিঃসন্দেহে মেনে নেবেন, পাশের হার কম করিয়ে যাদের উন্নত ছাত্র বলে চালানো হচ্ছে তাদের অধিকাংশই না হীরের টুকরো না বা প্রতিভাবান ছাত্র। শিক্ষার মান বিচার করলে দেখা যাবে, পূর্বের তুলনায় এখন ছাত্রদের পিঠে যে পরিমাণ বইয়ের ভার তার অনুপাতে তাদের শিক্ষালাভ আগেকার কম-বই-পড়া ছাত্রদের সমতুল্যও নয়, বরং কম। শিক্ষার উন্নতি যে কী পরিমাণ ঘটেছে তার একটা হিসাব নিকাশ পরবর্তী কয়েকটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষায় যাচাই করা যায় কিছুটা। কিন্তু ইদানীং সেখানে (সর্ব-ভারতীয় ও অন্যান্য উচ্চ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষায়) বাঙালী ছাত্রদের সাফল্য নৈরাশ্যজনক। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, কয়েক মাস আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং শিক্ষার মানের অবনতির কথা বলেছিলেন।

শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের অনেকগুলি অভিযোগ ইতিপূর্বে আমরা জানিয়েছি। যে গলদ শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্রমাগত দুর্বল ও অর্থহীন খেয়াল-খুশির মত করে তুলছে তার জের আরও অধিক দিন চললে কি অবস্থায় পৌঁছতে হবে তাও চিন্তা করা যায় না। যাই হোক, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে পড়েছে, এবং জাতীয় শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় সংস্কার কল্পেও তিনি তৎপর হয়েছেন। আমরা আশা করব, কোঠারী-কমিশন এদেশীয় শিক্ষার গলদ খুঁজে বের করে একটি সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা পেশ করতে পারবেন।

ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে, আপাতত যা ঘটছে তার কথাই বলা যাক। পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নামে যে প্রতিষ্ঠানটির হাতে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া আছে, সেই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে রাশীকৃত অভিযোগ, এই অভিযোগের একটি হল, শিক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে এঁদের অপটুত্ব। বলা বাহুল্য, তার নজির কিছু কম নেই। দ্বিতীয় বড় অভিযোগ হল, পরীক্ষার ব্যাপারটি নিয়ে তাঁদের ছিনিমিনি খেলা।

সংবাদপত্রের সঙ্গে যাঁদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক, তাঁরা গত কয়েকদিনের মধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, যার দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে নিতান্ত দায়িত্বহীন ও অকর্মণ্য বলে প্রতিপন্ন করেছে। খুবই আশ্চর্যের কথা, যেখানে শিক্ষার এই দুরবস্থা, একটি দুটি ছেলে-মেয়েকে সাধারণ মাধ্যমিক-শিক্ষা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে অভিভাবক গলদঘর্ম, যেখানে পাসের হার ক্রমাগত নিম্নাভিমুখী—সেখানে পর্ষদ ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নেওয়া এবং তার ফলাফল জানানোকে সমুচিত গুরুত্ব দিয়ে দেখেন না। পাস করা ছেলে অনায়াসে ফেলের নম্বর পায়; কৃতকার্য হয়েও পুনরায় কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষায় বসার নির্দেশ শোনে, এবং এমনও বিচিত্র নয় এই ডামাডোলে হয়ত ফেল করা ছেলেও পাস হয়ে যায়। এ-সব কেন হয় তার জবাবদিহি করার দায়িত্ব কার? নিশ্চয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ, এ-বিষয়ে তাঁর নজর পড়েছে। জনসাধারণকে যদি কিছুমাত্র গ্রাহ্য করার থাকে তবে অবিলম্বে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পক্ষ থেকে এই অন্যায়, দায়িত্বহীন কাজের একটি যুক্তিগ্রাহ্য কৈফিয়ৎ দেখানো দরকার। আমরা দেখে বিস্মিত হই, পর পর কেলেঙ্কারীর সংবাদ প্রকাশের পরও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নীরব। যেন তাঁদের হাতে যখন পরীক্ষার পাশ ফেল এবং খাতা তখন যা খুশি তাঁরা করবেন, কারও কোনো অধিকার নেই কিছু জানার। কর্তৃপক্ষ কি জানেন না, এবারের পরীক্ষার এ[illegible] কেলেঙ্কারী অভিভাবক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে কি ভাবে আশঙ্কাকুল করে তুলেছে অভিভাবকগণ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নামে ক[illegible] পরিমাণ আতঙ্কিত? ব্যক্তিগতভাবে আম[illegible] এমন একটি মার্কশীট দেখেছি জনৈক ছাত্রী[illegible] যেখানে সাধারণ টোটাল ভুল হওয়ায় মেয়ে[illegible] ফেল পড়ে যাচ্ছে। যে-প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদে[illegible] পরীক্ষা নেবার দায়িত্ব নিয়েছে সে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যদি যোগে ভুল খাতা থেকে নম্বর ওঠানোয় ভুল, এবং আর[illegible] পাঁচ রকম ভুল ভ্রান্তি লক্ষ করা যায় তা[illegible] সন্দেহ হয়, এক অন্ধ অন্য অন্ধকে প[illegible] দেখাবার দায়িত্ব বহন করছে। কে জোর ক[illegible] বলতে পারে, যাঁরা পরীক্ষার উত্তরপ[illegible] দেখেছেন, নম্বর দিয়েছেন, টোটাল করেছে[illegible] তাঁদের যোগ্যতা সন্দেহাতীত?

মন্দ লোকে বলে, ভাড়াটে মাস্টার, অধ[illegible] শিক্ষিত বেকার দিয়ে নাকি মধ্যশিক[illegible] পর্ষদের কেরানীগিরির কিছু কাজ গোপ[illegible] করানো হয়ে থাকে, যেমন মার্কশী[illegible] নম্বর তোলানো। এদের দায়িত্বব[illegible] হবার কোনো সঙ্গত কারণ নে[illegible] দু'দিনের কাজ, টাকা পাওয়াটাই আস[illegible] কাজেই অসংখ্য ভুল ভ্রান্তি। মন্দ লোকে[illegible] কথা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত ন[illegible] কুলোকে কুকথা বলেই। কিন্তু এত ভু[illegible] ভ্রান্তির রহস্য কোথায় তাও জানা দরকার কি! পরীক্ষার খাতা হারানো, অনুপ[illegible] পরীক্ষককে দিয়ে খাতা দেখানো— ধরনের ভুলভ্রান্তির অন্যতম কারণ কি তারও অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

আমরা অবশ্য শিক্ষার অবনতির [illegible] কোনো একটি বিশেষ ত্রুটিকেই দায়ী ক[illegible] না। সরকারী শিক্ষা পদ্ধতি, স্কুলের প[illegible] শোনা করানোর রীতিনীতি, ছাত্রদের অ[illegible] যোগ্যতা এবং নানাপ্রকার বিশৃংখলতা, দ[illegible] মেয়াদী ছুটি, ব্যবসায়িক কোচিংক্ল[illegible] ইত্যাদি শিক্ষার অবনতির কারণ বই কিন্তু এর ওপর যদি মধ্যশিক্ষা প[illegible] গাফিলতি ও স্বেচ্ছাচার যুক্ত হয় তবে হবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

কাশ্মীরে রাষ্ট্রসংঘের পর্যবেক্ষকরা
যুদ্ধবিরতি রেখা লংঘন করার জন্যে
পাকিস্তানকে দোষারোপ করছেন।

রাষ্ট্রসংঘের কে
পরোয়া করে।

পর্যবেক্ষক

সুব্রহ্মণ্যম খাদ্য সমস্যা
নিয়ে যা খুশি তাই বকে
যাচ্ছেন।

শুধুই প্যাঁক প্যাঁক,
ডিম নেই।

বৈদেশিকী

সর্দার শরণ সিং ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে জওহরলালজীর মৃত্যু পর্যন্ত এই দায়িত্ব জওহরলালজীই বহন করে গেছেন। অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শ্রীগুলজারীলাল নন্দ যে কদিন কাজ করেছিলেন, সে কদিন ঐ দপ্তরের ভার তাঁর উপর ছিল। শ্রীলাল-বাহাদুর যখন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন, তখন জওহরলালজীর মতো তিনিও প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান-এর পদ এবং অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন ও বৈদেশিক দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮ই জুলাই মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে দপ্তরের কিছু কিছু পুনর্বণ্টন হয়, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল বৈদেশিক দপ্তরের হস্তান্তর।

আজকাল প্রায় সর্বত্র প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার দিকে ঝোঁক দেখা যায়, তা ঐ পদ যে নামেই অভিহিত হোক না কেন। আগেকার দিনে কোনো রাষ্ট্রে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীরও বৈশিষ্ট্য দেখাবার, স্বতন্ত্রভাবে খ্যাতিলাভ করার অনেক সময়ে সুযোগ মিলত। কিন্তু এখন সে সুযোগ বড়ো একটা নেই। এটা এখন "শীর্ষ সম্মেলনের" যুগ—সাধারণত বৈদেশিক মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর প্রণীত পলিসির পরিচালক মাত্র বলে মনে করা হয়। অবশ্য লোকের যোগ্যতার উপর অবস্থা কিছুটা নির্ভর করে। বৈদেশিক মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা, দূরদৃষ্টি যদি উচ্চস্তরের হয়, তবে কেবল পলিসি পরিচালনায় নয়, পলিসি প্রণয়নের উপরও তাঁর একটা নিজস্ব ছাপ পড়বেই। প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যে বৈদেশিক ব্যাপারের ভালো বোদ্ধা সব সময়ে হবেন, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সে অবস্থায় বৈদেশিক মন্ত্রী যদি উচ্চস্তরের লোক হন এবং যদি নিজের শক্তি বিকাশের স্বাধীনতা এবং সুযোগ তিনি পান, তা হলে নীতি প্রণয়নকারী হিসাবেও তাঁর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

তবে কোনো বৈদেশিক নীতিই রাষ্ট্রের আভ্যন্তর অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি না রেখে চলতে পারে না, চলতে চেষ্টা করলে সফল হয় না, উলটা অনর্থের সৃষ্টি করে। সুতরাং এক দিক দিয়ে দেখলে রাষ্ট্রের সকল দপ্তরই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, যদিও বলা বাহুল্য, সকল মন্ত্রী সকল দপ্তরে দায়িত্ব নেওয়ার উপযুক্ত নন, হতে পারেন না।

সমগ্রভাবে গভর্নমেণ্টের উপর দৃষ্টি রাখা, বিভিন্ন দিকের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা, সরকারী নীতির মূল সূত্র ধরে থাকা—এইগুলো যদি প্রধানমন্ত্রীর অপরিহার্য দায়িত্ব হয়, তা হলে কোনো বিশেষ বিভাগ বা দপ্তরের মন্ত্রিত্বের ভার তাঁর না নিলেও চলে, না নেওয়াই উচিত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু কোনো প্রধানমন্ত্রী যদি কোনো একটা বিষয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পক্ষে নিজেকে বিশেষভাবে উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে তিনি সে দায়িত্ব নিতে পারেন। বৈদেশিক ব্যাপারে চিরকাল জওহরলালজীর আগ্রহ ছিল। দেশ যখন স্বাধীন হয়নি, তখন থেকেই জওহরলালজী কংগ্রেসের বৈদেশিক মন্ত্রী হয়েছিলেন। (অবশ্য এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, কার্যকালে গান্ধীজী নিজেই "বৈদেশিক মন্ত্রী"র দায়িত্ব নিতে দ্বিধা করেন নি। ১৯৪০ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত অথবা ১৯৪২ সালের সংগ্রামের সিদ্ধান্ত কোনোটার সঙ্গেই জওহরলালজীর তৎকালিক আন্তর্জাতিক দৃষ্টির পুরো মিল ছিল না।) স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে ভারতের বৈদেশিক নীতির একটা বিশেষ ধারা সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষা জওহরলালজীর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। অন্য কাউকে সে সময়ে বৈদেশিক মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করার কথা কারো মনে আসাও সম্ভব ছিল না। সেই সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জওহর-লালজী এই দায়িত্ব বহন করেছেন। পায়ের চামড়ার সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ, বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে জওহরলালজীর সম্বন্ধ প্রায় সেই রকম হয়ে গিয়েছিল। দু-চার বছর এই দায়িত্ব বহন করার পরে হস্তান্তর করতে পারতেন, কিন্তু তা করেন নি। ফলে ভারতের বৈদেশিক নীতি এবং জওহরলাল নেহরুকে মিশিয়ে দেশে-বিদেশে লোকের মনে এমন একটা চিত্র ক্রমশ তৈরী হয়ে উঠেছিল যে, একাকে অপর থেকে আলাদা করে ভাববার চেষ্টা করাও যেন একটা বেখাপ্পা অভদ্র ব্যাপার বলে অনেকের কাছে ঠেকত। শেষাশেষি হয়ত জওহরলালজী নিজেও ভাবতেন—বোঝাটা একটু হাল্কা করতে পারলে হত! কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না, দেহমুক্ত ত্যাগ না করে বোঝা নামাবার আর পথ পাওয়া গেল না।

জওহরলালজী ছাড়া বৈদেশিক মন্ত্রী হিসাবে আর কারো কাজ দেখার সুযোগ ভারতের হয়নি। ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের সময়ে জওহরলালজী অসুস্থ হয়ে পড়ার পর থেকে বৈদেশিক দপ্তরের কাজের সঙ্গে লালবাহাদুরজীর পরিচয় শুরু হয় এবং পণ্ডিতজীর হয়ে ঐ দপ্তরের কিছু কিছু কাজ তিনি করতে আরম্ভ করেন।

পণ্ডিতজীর মৃত্যুর পরে প্রধানমন্ত্রী হবার সঙ্গে সঙ্গে লালবাহাদুরজী বৈদেশিক মন্ত্রীও হলেন। কিন্তু তার অল্প কদিনের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুতরাং বৈদেশিক মন্ত্রী হিসাবে তাঁর কাজের বিশেষ কোনো পরীক্ষা হয়নি। লাল-বাহাদুরজী অনেক রকম দপ্তর চালিয়েছেন, সুতরাং দপ্তর চালক হিসাবে বৈদেশিক দপ্তরও তিনি ভালোভাবেই চালাতে পারতেন মনে হয়। কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনান্তে ঘোষিত ইস্তাহারে ভারত-পাকিস্তান বিবাদের উল্লেখ উপলক্ষ্য করে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণমাচারীর সমালোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ নাকি এই ব্যাপারে নিউদিল্লিকেও, অর্থাৎ খোদ প্রধান-মন্ত্রীকেও দোষী করতে চান। কিন্তু এ ব্যাপারটা এমন কিছু নয়, যেটাকে বিচারের মাপকাঠি হিসাবে ধরা যেতে পারে। তা ছাড়া ঐ সময়ে লালবাহাদুরজী অসুস্থ ছিলেন। মোটের উপর লালবাহাদুরজী বৈদেশিক মন্ত্রী হিসাবে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারতেন কি পারতেন না, তার পরীক্ষা হয়নি।

সাধারণভাবে সর্দার শরণ সিংকেও যোগ্য লোক বলা যায়, কিন্তু বৈদেশিক মন্ত্রী হিসাবে তিনি কতটা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন, সেটা ভবিষ্যৎ বলতে পারে, যদিও কয়েকটা বৈদেশিক ব্যাপারে তিনি ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন এবং সে কাজ মন্দ করেন নি। প্রধানমন্ত্রী থেকে বৈদেশিক দপ্তরের দায়িত্ব বহন করা এবং কেবল বৈদেশিক মন্ত্রী হিসাবে কাজ করার মধ্যে অবশ্য পার্থক্য আছে। প্রধানমন্ত্রী স্বীয় পদের গুরুত্ব কাজে লাগাতে পারেন। অসুস্থ জওহরলালজীর হয়ে দেখা-শোনা বলা-কওয়া করার কয়েক মাসের কথা বা[...] দিলে বৈদেশিক মন্ত্রীর পদে লাল[...] বাহাদুরজী যেমন নতুন ছিলেন, সর্দা[র] শরণ সিংও তেমনি নতুন।

কিন্তু আসল সমস্যা মন্ত্রী নতু[ন] পুরাতনের সমস্যা নয়, আসল সমস্যা হবে আমাদের বৈদেশিক নীতি কী ছিল, ক[ী] হয়েছে, কী হবে, তাই নিয়ে। জওহরলাল[জী] আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, ডাইনে বাঁয়ে না সরে সেই পথ ধরে সোজা চ[লে] যাওয়াই আমাদের কাজ—এটা শ্রদ্ধাবাস[র] বক্তৃতা, কাজের কথা নয়। কাজের [...] দেখা যাবে, কোনো কোনো পথ এই পথ[ে] এসে থেমে গেছে, এখন এগুতে হলে ন[তুন] পথ করে নিতে হবে। জওহরলালজী নি[জে] কোনো কোনো ক্ষেত্রে বোধ করে[...] ছিলেন পথ হারিয়ে গেছে অথবা [...] গলিতে ঢুকে বেরুতে পারা যাচ্ছে

অনেক পলিসির নামের খোলসটা মাত্র আছে, আসলে অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেছে।

এতে আশ্চর্য বা হতাশ হবার কিছু নেই, এরূপ হয়েই থাকে। যেটা আমাদের দুর্ভাগ্য, সেটা হচ্ছে এই যে, কোনো একটা পলিসি যে অকেজো হয়ে গেছে, সেটা আরো আগে স্পষ্ট হয়নি, যখন জওহরলালজীর শরীর ও মনের শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, যখন ধাক্কা খেলে সেটা সামলে নিয়ে জওহরলালজীর নতুন পলিসি প্রণয়ন করার মতো শক্তি ও উদ্যম ছিল। যেখানে কোনো সরকারী পলিসির চরম ব্যর্থতার সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও গভর্নমেণ্ট বা নেতা পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই, সেখানে ব্যর্থতার আঘাতটা যদি অন্ততপক্ষে নেতার দেহমনের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকতে থাকতে আসে, তবে সেটাকে মন্দের ভালো বলতে পারা যায়—যেমন বলা যায়, ভারত সরকারের চীন-নীতির ব্যর্থতা যদি দু বছর আগে বুঝতে পারা যেত, তা হলে হয়ত পণ্ডিতজী যাবার আগে ঘরটা এর চেয়ে আর একটু গুছিয়ে রেখে যেতে পারতেন।

যাই হোক, এখন যিনিই বৈদেশিক মন্ত্রী হন, আগের মতো ব্যক্তি এবং নীতিকে এক করে এখন কোনো চিত্র তৈরী হবে না এবং কোনো ক্ষেত্রেই নীতি কেবল একজন ব্যক্তির সৃষ্টি হবে না, সেরকম কেউ ভাববেও না। অন্য ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বৈদেশিক নীতিও কোনো একজনের দ্বারা প্রণীত হবে না, এক ধরনের "কনসেনশাস"-এর ভিত্তিতে হবে। তবে জওহরলালজীর হাতেও যখন পলিসি সৃষ্টির কাজ ছিল, তখনও যে তাতে আর কারো হাতের ছোঁয়া লাগত না, তা নয়। তবে সেটা ছিল অন্য রকমের ছোঁয়া। জওহরলালজী "কনসেনশাস"-এর ধার ধারতেন না, কিন্তু তিনি যাঁকে বিশ্বাস করতেন, তাঁর হাতে পলিসিকে সাজানো-গোছানোর ভার দিতেন না, এমন নয় এবং অনেক সময়ে তার ফলে প্রায় রূপান্তর ঘটে যেত। এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মেননের কথা অনেকেরই মনে পড়বে। লালবাহাদুরজীর বা সর্দার শরণ সিংহের কোনো পলিসির সেরকম কারো হাতে গিয়ে পড়বার সম্ভাবনা নেই—কারণ, পণ্ডিতজীর মতো 'এটা আমার পলিসি, আমি যাকে খুশি, তাকে দিয়ে এর পরিচালনা করাতে পারি', এরকম কথা কখনো এঁরা বলতে পারবেন না।

২৫-৭-৬৪

বাঙালীর স্বর্গ

আমাকে ডেকেছেন কেন?'

'কয়েকটা কথা জানবার জন্যে। অনুগ্রহ করে কয়েক মিনিট সময় দিন আমাদের।'

'তাই হবে। কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে পারব না। যা বলবার চটপট বলুন, আমার জরুরী কাজ আছে।'

'আচ্ছা। এবার বলুন তো, ওখানে গিয়ে কেমন আছেন?'

স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

'খুব ভালো। একেবারে এ ওয়ান।'

'শুনে খুব খুশী হলুম। এখানে ভারী কষ্টে ছিলেন, সে আমরা জানি। তা কী করছেন ওখানে?'

'কী আর করব? সেই কেরানীগিরি। তবে মাইনে আপাতত আট শো টাকা পাচ্ছি, দু হাজার পর্যন্ত গ্রেড।'

'বটে—বটে! কেরানীগিরিতে এত মাইনে?'

(হাসির শব্দ পাওয়া গেল।)

'বাসা পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, ফ্রী কোয়ার্টার। তেতলায় চারঘরের ফ্ল্যাট। পুবে লেক, দক্ষিণে পার্ক। চব্বিশ ঘণ্টা রানিং ওয়াটার।'

'ওঃ, ভাবাই যায় না! তা জলে সাপ-ব্যাঙ, কেঁচো-টেঁচো বেরোয়?'

'খেপেছেন? এখানকার জল মশাই ডিস্টিল্‌ড্‌ ওয়াটারের চাইতেও পিয়োর। যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি টেস্টফুল। ফ্রিজিডিয়ারেরও দরকার হয় না। শীতকালে হট্‌ ওয়াটারের ব্যবস্থাও আছে।'

'অ। আর বাজারের অবস্থা?'

'কী জানতে চান বলুন।'

'সর্ষের তেল-টেল পাচ্ছেন?'

'কেন পাব না? খাঁটি ঘানির তেল, বাছাই সর্ষে। এক মন দেড় মন যত খুশি কিনতে চান—বারো আনা করে কিলো। সে তেল নাকে দিতে-না-দিতেই নাক ডাকতে শুরু করে, সনোরিল্‌ ট্যাবলেটও দরকার হয় না।'

'ওফ!' (তিনজনের দীর্ঘশ্বাস এবং অপরজনের হাসির শব্দ।)

'মাছের কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

'আলবত্‌। কেন পারেন না?'

'মাছ পান? নাকি এক ঘণ্টা লাইন দিয়ে আড়াই শো গ্রাম পচা মৃগেল কিনতে হয়?'

'কী যে বলেন! এই তো আজ সকালে বাজারে গিছলাম। পাকা রুই, গঙ্গার ইলিশ, বাগদা আর গল্‌দা চিংড়ি, ডিমওলা

তপ্‌সে, অমলেট মাছ, সোনালী রঙের ভেটকি, সাত সেরী চেতলের পেটি—ঢালাও বিক্রি হচ্ছে সব। বাঁধা দর—পাঁচ সিকে কিলো। থলে ফেলে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারেন, ওরাই ওজন করে থলেয় ভরে রেখে দেবে, এক গ্রামও ঠকাবে না আপনাকে।'

(তিনজন পর পর গোটা কয়েক খাবি খেলেন, চতুর্থ জন আবার খিক্ করে হাসলেন।)

'ওহো-হো!'

'কী হল? আর জিজ্ঞেস করবেন না?'

'সাহসে কুলোচ্ছে না মশাই। আচ্ছা, ঘি পান তো?'

'গাওয়া ঘি। সেণ্ট পার্সেণ্ট গব্য। এখানে ভেজিটেবল অয়েল, অ্যানিম্যাল ফ্যাট, ঘি সেণ্ট—এ-সবের নামই কেউ শোনেনি

কোনোদিন। মোষের ঘি নেই, মোষই নেই—ওরা আবার মহিষাসুরের বংশধর কিনা!'

'দর কত?'

'আড়াই টাকা করে কিলো।'

(তিনজনের একজন অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।)

'ওঁর আবার কী হল?'

'আজ্ঞে, অতটা সইতে পারলেন না, ফলে জ্ঞান হারিয়েছেন। একটু বাদেই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন আবার। আমাদের অবস্থাও সুখের নয় মশাই, আপনার কথা শুনে দম আটকে আসছে।'

'তা হলে বরং আমি আজ চলি। আপনাদের আর—'

'না-না, প্লীজ, আর একটু বসুন। শুনতে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু লোভও সামলাতে পারছি না। আচ্ছা, চালের খবর কী?'

'এখানে চাল নিয়ে কোনো চালিয়াতি নেই। দশ টাকা মন দরে এন্তার চাল। সব মিহি, সব নামজাদা। গোবিন্দভোগ, গোলাপখাস, কালোজিরে, বাসমতী, কাটারিভোগ—যা চান, যত চান।'

'আর ফল-টল?'

'মর্তমান কলা ছ পয়সা ডজন, সিঙ্গাপুরী তিন পয়সা, মালদার ফজলী টাকায় আঠারোটা।'

'উঃ, মারা যাব—মারা যাব।'

'তবে যাওয়াই যাক। এখন চারটে পাঁচ। সাড়ে চারটের মোহনবাগান-ইস্ট বেঙ্গলের খেলা আছে। দেখতে হবে।'

'ওখানেও মোহনবাগান-ইস্ট বেঙ্গল? তা টিকেট পেলেন কী করে? রাত্তিরেই বুঝি লাইন দিয়েছিলেন?'

'লাইন? কেন? পাঁচ লাখ লোক বসতে পারে, এমনি স্টেডিয়াম। গেলেই যে-কোনো গেমের টিকেট পাব। আচ্ছা, আসি তবে।'

'কিসে যাবেন খেলার মাঠে?'

'ডি-লাক্স ট্রামে-বাসে প্রচুর ফাঁকা জায়গা। তারও দরকার নেই। অফিস থেকে নিজের কার পেয়েছি, তাতেই যাব। আচ্ছা, নমস্কার। পরে কথা হবে আবার।'

(বাকী দু'জনও অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। চতুর্থ জনও অর্ধমূর্ছিত, তিনি এখন আর 'তিনি' নন।)

ভাবছেন গাঁজাখুরি, বানিয়ে গল্প বলছি? না, মশাই—না। আমাদের পাড়ার এক শো কুড়ি টাকার কেরানী হারাধনবাবু ক'দিন আগে তেলের লাইনে দাঁড়িয়ে হার্টফেল করেছিলেন। তাঁরই আত্মাকে 'সি'য়াসে' ডাকা হয়েছিল। তিনি সেখানকার বর্ণনা দিয়েছেন, এ সেই স্বর্গের কাহিনী।

'পাঞ্চ' পত্রিকায় 'ইংরেজের স্বর্গে'র একটা কার্টুন দেখেছিলুম। হলঘর ভর্তি লোক, পাশাপাশি বসে, অথচ কেউ একটিও কথা কয়ে অন্যকে বিরক্ত করছে না; এই হল

এমন দিন কি হবে মা তারা

তাদের স্বর্গের আইডিয়াল। বাঙালীর স্বর্গ-এর চাইতে বেটার কী হতে পারে, তা আপনারাই সাজেস্ট করুন।

জীবনে একবারমাত্র

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!'—যেন বুকের ভিতরে
ভীষণ সোরগোল ওঠে। শুনতে পাই
'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!'—যেন
তটভূমি ধসে পড়ছে, ছলোচ্ছল ছলোচ্ছল
ঢেউ লাগছে নিরুপায় নৌকায়। রক্তের
পাতালবাহিনী নদী হঠাৎ ভীষণভাবে
ফুলে ফেঁপে ওঠে।—
আমি বালকবয়সে
ট্রেনের কামরায় কোনো বৃদ্ধ ফিরিঅলাকে একবার
দুর্দান্ত মলম হাতে দারুণ বাঘের মত চেঁচাতে শুনেছি
'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!'—আমি
ঘাটশিলার হাটে এক লালাকে একবার
'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!' বলে অসম্ভব পুরনো পেঁয়াজ
বিক্রি করে হাসতে দেখেছি।—আমি
মফস্বল-শহরে একবার
ঘণ্টা হাতে সার্কাসের তাঁবুর বাইরে কাকে গম্ভীর গলায়
অন্ধকারে বলতে শুনেছি
'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!'—আমি গঙ্গার জেটিতে
সন্ধ্যায় লঞ্চের দড়ি তুলে নিতে-নিতে এক প্রবীণ মাল্লাকে
যেন জীবনে একবার
ভয়ঙ্কর আত্মমগ্ন বলতে শুনেছি
'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!'—
কিন্তু বুকের ভিতরে
এই যে প্রলয় রোল শুনতে পাওয়া গেল,—কোনো
বৃদ্ধ ক্যানভাসার,
ধূর্ত লালা, সার্কাসের দালাল অথবা
মাল্লার গলার সঙ্গে এর কোনো তুলনা হয় না।

জীবনে একবারমাত্র। রক্তের ভিতরে
জীবনে একবারমাত্র 'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!'
এই বন্য মহারোল
শুনতে পাওয়া যায়, আমি শুনতে পাচ্ছি
'লাস্ট টাইম! লাস্ট টাইম!'—যেন
নিরুপায় নৌকার শরীরে
ছলোচ্ছল ছলোচ্ছল ঢেউ লাগছে। যেন
রক্তের পাতালগঙ্গা, দাঁড়ি-মাঝি-বৈঠা-হাল ইত্যাদি সমেত,
ভীষণ পাক খেতে-খেতে, ভীষণ পাক খেতে-খেতে
জলস্তম্ভ হয়ে গিয়ে ফুলে-ফেঁপে হঠাৎ স্বর্গের দিকে
দৌড়ে উঠে যায়।

মধ্যবেলায়

সুনীলকুমার নন্দী

একটি তরুর মূলে জল ঢেলে, জল ঢেলে ফোটাও যে ফুল
দেখো, দেখো তারি হাতে অরণ্য নির্মূল।

আঘাতে অরণ্যকান্তি ধুলোয় লুটায়,
শুকায় অমল স্বপ্ন লুটানো-শাখায়।

সেদিনের অনুরাগ বুকের প্রেমিক
আজ যেন মৃত, চোখে আর এক নাবিক......

পথ হারায়......ঘুরে ঘুরে বেলা হলো ঢের—
না, তাকে বিশ্বাস নেই, সারা জীবনের

ভালোবাসা? কোথা যাও বৃথা, চোরাবালি......
জলে জলে খরস্রোত, আথালি-পাথালি।

ফিরে যাও, ফিরে যাও সরল কিশোর—
খুঁজে খুঁজে দিন শেষ, রাত হবে ভোর।

জানো না মনের ভুল, কোনদিকে যাই—
কুসুম জ্বলো জ্বলো শাখা পুড়ে পুড়ে ছাই।

হায় রে সে-তরুশাখা, বুক জ্বলে যায়—
এসো না কিশোর তুমি মধ্যবেলায়।

হৃদয় থেকে হৃদয়ে

করুণাসিন্ধু দে

বাঁধতে পারে আলিঙ্গনে এমন বাহু দেখি না
ঘনিষ্ঠ প্রচ্ছায়া
তবুও মিছে ঘুরে ঘুরে দুয়ার থেকে দুয়ারে
নিতান্ত বেহায়া
অধরা সেই মরমীয়া ফুলের ঘ্রাণে পাগল
যাকেই দেখে তাকে
কাতর বলে, সত্যি কি না যাচাই করে দেখ্‌না
বুকের অসুখটাকে।

চতুর যারা অবিশ্বাসী হেসে উঠলো, হঠাৎ
এ কী কাঙালপনা,
ঢের শুনেছি ইনিয়ে বলা বিনিয়ে বলা শোকের
আটপ্রহর গঞ্জনা।
যেন সবাই আপন কক্ষে আড়াল রচে অন্ধ
স্বভাবে সংশয়ে,
মুখ দেখে না রূপ দেখে না বাজে না গানে শব্দে,
ধ্বনির বরাভয়ে।

কেবল শুধু অভিজ্ঞানে প্রতিশ্রুতি, হিসাবী,
ঘুমায় অনামিকা:
স্মরণ যখন জেগে ওঠে বুকের হাহা-হুতাশে—
পুড়েছে ললাটিকা।
তবুও খুঁজে ঘুরে ঘুরে হৃদয় থেকে হৃদয়ে
ঘনিষ্ঠ প্রচ্ছায়া,
ছেঁড়া কাঁথার ফোকরগুলো মেলায় খাওয়া সাজাতে,
নিতান্ত বেহায়া!

পুনর্বিবেচনা

রবীন্দ্র গুহ

মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই পথে বেরুল সুধারানী। গগনবিহারীবাবু যে ঠিকানা এবং মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই অনুযায়ী অনেক ঘুরে ঘুরে বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত বাড়িটা খুঁজে বার করল। একতলার সিঁড়ির কাছে মস্ত একটা কাঠের বোর্ডের উপর অনেকগুলি নামের এক পাশে অরবিন্দ পালিতের নামের প্রতি নজর পড়তেই খুশীতে উজ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল সুধারানী। মার সেই হাসির মধ্যে লোভ, স্বার্থপরতা আর শঠতার আভাস খুঁজল অতসী।

অতবড় বাড়ি হলে হবে কী কোনো লিফ্‌ট ছিল না। ওরা পাশাপাশি হেঁটে সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করছিল। সুধারানী মেয়েকে বোঝাচ্ছিল—'আসলে দেখতে গেলে কোনো কাজেই সম্মান নেই আজকাল। লেখাপড়া শিখে যারা আফিসে কাজ করে, তারা যদিও বেশি টাকা রোজগার করে। কিন্তু ঝক্কি কত! একগাদা পুরুষ মানুষের মধ্যে বসে থাকতে হবে, সাত-সতেরো কথা শুনতে হবে। গতর দিয়ে না হোক, বুদ্ধি দিয়ে খুশী করতে হবে। সে বুদ্ধি আছে ক'জনার?'

দোতলার সিঁড়ির বাঁকে ময়লা ফেলার পাত্রের সামনে একটুসময় দাঁড়াল সুধারানী, চোয়াল দাবিয়ে মুখের মধ্যের লালা জিভ দিয়ে একত্র করে সেই পাত্রের মধ্যে থুতু ফেলল। অতসীও দাঁড়াল মায়ের পাশে। লালা সংগ্রহ করার সময় তার মুখের সেই বিকৃত ভাব আর থুতু ফেলার ভঙ্গি দেখে অতসীর শরীরটা ঘিন ঘিন করে উঠল।

সুধারানী বলল—'আর আমাদের মত ঘরের মেয়েরা, যাদের পেটে এতটুকুন বিদ্যে, দোকানটোকানে অবশ্য চাকরি পায়। হোটেল-রেস্তোরায় আজকাল অনেক নতুন নতুন নিয়ম হয়েছে। কিন্তু তাতেই কি সম্মান আছে? গগনবিহারীবাবু ত সেই রকম একটা চাকরিই জুটিয়ে দিয়েছিলেন ভাগ্নিটাকে। কী হল তার শেষ পর্যন্ত? টাকাটাই সব নয়, ইজ্জত বলে কথা আছে ত একটা।'—

সুধারানী তাকাল মেয়ের দিকে। ভালো করে লক্ষ করল অতসী শুনছে কিনা। ম্লান বিষণ্ণ মুখে অতসী সিঁড়ি ভাঙছিল। সেই একই রকম অপরিবর্তনীয় হাবভাব। কোনো কিছুতে তেমন উৎসাহ নেই, নিরুৎসাহও নেই।

সুধারানী অবাক হল। মেয়ের উপর মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে। বড় ঢঙি ত! কিন্তু সে যাই হোক, মুখে কোনোরূপ বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে না। রাজী যখন হয়েছে, ভালোয় ভালোয় কাজটা এবার জুটে গেলে হয়। আরে বাপু, চাকরির নামে অত ভয়ের কি আছে? এ ত ঘরের মত। ঘরের কাজ করো না তুমি? নিজের ঘরেও ত রান্নাবান্নার কাজ করতে হয়, ঘর মুছতে হয়, বাসনকোসন ধুতে হয়। কি, ধুতে হয় না? তাহলে ত তাও একটা চাকরি হল। আর মান সম্মানের জন্য যদি অত চিন্তা, কার মানসম্মান আছে এদুনিয়ায়?

সুধারানী-ত ভাবতেই পারে নি এমন সুন্দর একটা বাড়ির ভাড়াটে হয়ে থাকবার ক্ষমতা রাখে অরবিন্দ পালিত। গগনবিহারীবাবু যা যা বলেছিলেন তাতে এসব উল্লেখ ছিল না। তিনি বলেছিলেন—'ছেলেমানুষ, চাকরি-বাকরি তেমন কিছু করে না। লেখা-টেখা বিক্রি করে, বিশ পঞ্চাশটাকা যা উপার্জন। আর সকাল বিকাল ছাত্র পড়ায়'—

'তবে ত নিজেরই জোটে না বলুন, তার উপর আবার ঝি রাখবার শখ কেনো—?' বলেছিল সুধারানী।

'না, ঠিক তা নয়। দেশের অবস্থা মন্দ নয়, সেখান থেকেও টাকা আসে। তাছাড়া ও কি আর রাজী হচ্ছিল। উড়ুনচণ্ডি মানুষ। পয়সা রইল ত দিনে তিনবেলাই খেয়ে উড়িয়ে দিল। রইল না ত চা খেয়েই দিন কাবার। প্রেসে আসে, এক একদিন দেখে বড় কষ্ট হয়। চল্লিশ বছর চাকরি করছি প্রেসে, ওই রকম সব লোকদের নিয়েই ত কারবার আমাদের। অথচ দ্যাখো, আজ নিঃস্ব, নির্বান্ধব, সবার অচেনা, দশ বছর বাদে সেই লোকই মৃত্যুর পর ছবিতে মালা পরে লক্ষ মানুষের পুজো গ্রহণ করছেন'—

বলতে বলতে গগনবিহারীবাবুর দু'-চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তিনি মুহূর্তের জন্য অন্য মানুষ হয়ে যান। সুধারানী সেই দিকে তাকিয়ে সহায় খোঁজে। খোঁজে মৃত অতীতের সহানুভূতি। তার চোখে জল আসে না। হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ধুয়ে মুছে শুকিয়ে গেছে। সুধারানী কি কাঁদতে জানে না?

'সব কিছু দেখে শুনে, আমি বললাম—দ্যাখো বাপু,, যা কিছু মর্জি তাই করতে পারো। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঠুকেঠাকে যেমন খুশী গড়ে তোলো। কিন্তু সবার আগে যা করা দরকার তা হচ্ছে তোমার প্রাণটাকে

বাঁচিয়ে রাখা। আর সে জন্য একটু তদবির তদারক দরকার। নিজে না পারো একজন লোক রেখো, দু'বেলা দু'মুঠো তুমিও খাবে, সেও খাবে। আমি পাঠাব কাল একজনকে, ছেলেদের দস্তুর মত পড়ানোর কাজ, নিও'—

সুধারানী মন দিয়ে শুনল গগনবিহারী-বাবুর কথা। শুনতে শুনতেই মনে মনে সে খুশি হল। গগনবিহারীবাবু বলেছিলেন— 'কাজটা তুমি নিয়ে নাও, সুধা। তোমার ছেলের মত বয়স, শাসন তর্জন করেই চাকরি করতে পারবে। তাছাড়া এজাতের লোকের বাড়িতে এর আগেও তো চাকরি করেছো তুমি। সুরেশবাবুও লেখক ছিলেন। এখনও মনে আছে আমার ভদ্রলোকের কথা। আহা, গুণিমানুষ'—

সুধারানী এতক্ষণে বিরত বোধ করতে লাগল। তার চোখে মুখে শাবদু বিব্রতার ভাব উজ্জ্বল হল। দৃষ্টি আর্দ্র হয়ে উঠল। গগনবিহারীবাবু সে ভাবান্তর লক্ষ করলেন না। সুধারানী তথাপি ভয় পেয়েছিল। সসঙ্কোচে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল অন্য দিকে।

বাড়ি ফিরে এসে কথাটা অনেকক্ষণ ধরে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করল। আমার নতুন

[illegible] দিন, সুদে করা যায় কিনা ভাবল। [illegible] স্মৃতির সূত্র ধরে টেলিফোন করল।

তারপর মনে পড়ল অতসীর কথা।

তাই ভাবো, তার জীবনের মুক্ত দিনগুলি [illegible] থাক স্মৃতির মধ্যে। নতুনের স্বাদ [illegible] লাগলে তিক্ত হয়ে উঠবে পুরোনো বাসনা। নতুনের জন্য অতসী আছে। অতসী চিনুক ওর ভবিষ্যতকে।

সুধারানী ক্লান্ত পা ফেলে-ফেলে আরও কয়েকধাপ সিঁড়ি ভাঙল। মাঝে মাঝে সংগোপনে তাকাল মেয়ের দিকে। অতসীর মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই। কোনো দিকে খুব উৎসাহভরে তাকাচ্ছে না, হাসছেও না বা বিতৃষ্ণাও নেই ভাবভঙ্গিতে।

গগনবিহারীবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে সুধারানী বলেছিল—'আমি ত এই ভেবেছি, তোর কী মত?'

জানালার গরাদ ধরে সরু গলির দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে ছিল অতসী। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মনে হল কিছু যেন ভাবছে। সত্যিই কি কিছু ভাবছে অতসী? কি ভাবছে? সুধারানী যা যা ভাবছে, তাই ভাবতে চেষ্টা করছে নাকি অতসী? কি ভাবছে সুধারানী?

ঘরে কোনো আলো ছিল না। অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছিল। সেই অন্ধকারে স্পষ্ট করে কারুর মুখ দেখা যাচ্ছিল না।

বার বার জিজ্ঞাসা করল সুধারানী—'কিছু বলবি ত? এমন করে ঘরে বসে থাকলে চলবে নাকি চিরদিন?'

সেই চিরদিনের কথাটাই বুঝি ভাবছিল অতসী। চিরদিন কারুর বাড়ি ঝিগিরি করেই চলবে নাকি?

অনেকক্ষণ নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে রইল অতসী। ভাঙা গরাদ ধরে তাকিয়ে রইল গলিটার দিকে।

সুধারানী তার পরিকল্পনার কথা বলতে লাগল। সুন্দর সরল জীবনের কথা। অতসী একটু চতুর হলে তাদের এই দারিদ্র্য থাকবে না আর বেশি দিন। এতে লজ্জার কি আছে, সুখের জন্য, স্বার্থের জন্য কত লোকই ত আজকাল করছে এসব।

গরাদ থেকে হাত সরিয়ে নিল অতসী। মনে হল ওর মুখের চামড়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরক্ত হয়ে উঠেছে গণ্ডদ্বয়। অতসী যেন কিছু বলতে চাইছে।

অতসী বলতে চাইলেও সুধারানী কিন্তু কিছুই বলতে দিল না। বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সে নিজেই বলতে লাগল—এই রকম একগুঁয়েমির জন্যেই সেও জীবনে কোনো ঐশ্বর্য পেলো না, স্বাভাবিক সাধারণ আনন্দ পেলো না সংসার ধর্মের নিঃসঙ্গতার মধ্যে। অথচ বাস্তব তাকে সবই দিতে চেয়েছিল; রূপ ছিল, সৌন্দর্য ছিল, বুদ্ধি ছিল, জগৎকে বশীভূত করার সকল ক্ষমতা ছিল সুধারানীর। ছিল সবই—কিন্তু—সুধারানী বলল—সে সমুদ্র ঐশ্বর্যের জোয়ারের [illegible] এক বড় প্রতারকের মত সামনে এসে দাঁড়াল তুই—'

অতসী ঘুরে দাঁড়াল। এতক্ষণে সে সোজাসুজি স্পষ্ট করে তাকাল মায়ের দিকে। কিন্তু সুধারানীকে অমন অস্থির মনে হচ্ছে কেন? আর্দ্র গলার স্বর, সিক্ত নয়ন। উদাস বিভ্রান্ত পাখির মত সুধারানীর চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত, বড়ই ক্লান্ত।

নিজের সঙ্গে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল সুধারানী। দুদুবার ঠোঁট [illegible] দিয়ে [illegible] মেয়েদের দিকেও [illegible] জমেছে সেই দিকে তাকিয়ে [illegible] আরও অধিক উত্তেজনা বোধ [illegible] পুনরায় মাটির দিকে চোখ নামিয়ে [illegible] দিয়ে মুখ ঢাকল—'হ্যাঁ, তোর জন্যই আমার গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেই দরিদ্র, অসহায়, মূঢ়, পঙ্গু লোকটাকে—।'

হঠাৎ বিকট চিৎকার করে দৌড়ে এসে মায়ের মুখের উপর হাত চাপা দিল অতসী।

এমনি সব অবস্থায় রোজ যে ভয়ংকর কথাটা মা বলে, আজও বলতে উদ্যত, অতসী তা বলতে দিতে চায় না। অতসী সে-কথা শুনবার আগেই অস্থির হয়ে ওঠে। সে-কথা শোনার পর অতসী নিজেকে মৃতবৎ মনে করে।

সুধারানী সংগোপনে কাঁদছিল, এতক্ষণ এবার শব্দ জাগল। আহত দুই সভ্যমানুষের বন্য কান্নার শব্দ।

তিন তলার সিঁড়ির মোড়ে এসে থামল ওরা।

সুধারানী এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজল কোথাও বেল লাগানো আছে কিনা। অবশেষে কড়া নেড়ে তিন তিনবার আওয়াজ করল। কোনো প্রত্যুত্তর নেই। আবার আওয়াজ দিল সুধারানী। এবার একটু জোরে এবং দ্রুত।

ভেতর থেকে শব্দ হল—'কে?'

কি উত্তর দেবে এবার সুধারানী? অতসীর বুকের ভিতর অকারণ ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

আবার প্রশ্ন এলো—'কে?'

আর চুপ করে থাকা যায় না। সুধারানী বলল—'দরজা খুলুন। আমরা—।'

তবুও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল অরবিন্দ —'কাকে চাই?'

'অরবিন্দবাবুকে।'

'আমি অরবিন্দ।'

সুধারানী বলল—'গগনবিহারীবাবু পাঠিয়েছেন আমাদের'—

একবার অতসীর দিকে আর-একবার সুধারানীর দিকে তাকাল অরবিন্দ। স্তম্ভিত ভাবটা কাটাতে কিছু সময় লাগল।

'তিনি একটা কাজের কথা বলেছিলেন—'

সুধারানী ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল।

'হ্যাঁ—না—মানে—' অরবিন্দ কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

'বিব্রত হওয়ার কিছু নেই, ইচ্ছা হয় রাখবে, না হয় আমরা চলে যাবো'—বলল সুধারানী। তাছাড়া অরবিন্দকে 'তুমি' জড়িমাহীন। এত সহজ সরলভাবে কথাটা বলে ফেলা যাবে তা ভাবতে পারেনি সুধারানী। খুব সাধাসিধে কণ্ঠস্বর। সম্বোধন করতে পেরেও মন বড় হাল্কা লাগল। এ যেন নিজের ঘর, ভাবখানা এমন —যেন খুব নিকট কোনো আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছে সুধারানী।

অরবিন্দ বলল—'আপনারা বসুন'—

অতসী বসল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অস্বস্তি বোধ করছিল। বসতে পেরে বেশ আরাম-বোধ করল। সুধারানী কিন্তু বসল না। একটু এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিয়ে তাকাল রান্নাঘরটার মধ্যে। অন্ধকার ঘুপসির মধ্যে কিছুই নজরে এলো না। ঢুকেই প্রথম ঘরটা শোবার ঘর। একটা টেবিলের উপর স্তূপীকৃত বইখাতা। ভাঙ্গা কৌটোর মধ্যে সিগ্রেটের ছাই। পুরনো দেশলাই, সিগ্রেটের টুকরো। টেবিলের নিচেও বই।

খাটের উপর ময়লা একটা চাদর, গোটা তিনেক বালিশ। ওয়াড়গুলো তেল চিটচিটে। সুধারানী অবাক হয়ে দেখল, মেঝের উপর কয়েক জায়গায় গোল কালো দাগের উপর, মাছি ঘুরেছে ভন ভন করে।

ঘরের ঠিক মাধ্যখানে একটা কুঁজো। কুঁজোটা ঠিক মাধ্যখানে কেনো রাখা হয়েছে তা ভেবে পেলো না সুধারানী। একখানা পুরনো দৈনিক পত্রিকা দিয়ে তার মুখটা ঢাকা।

'কি কি করতে হবে, কত টাকা দিতে পারবে তুমি?'

কথাবার্তা পাকা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল, সুধারানী।

অরবিন্দ বলল—'গগনবিহারীবাবু যখন পাঠিয়েছেন'—

মুখের কথা লুফে নিয়ে রুখে উঠল সুধারানী—'হ্যাঁ, গগনবিহারীবাবু পাঠিয়েছেন বলেই ত এসেছি। তিনিই বললেন তোমার দুরবস্থার কথা। দুটো অন্ন তুলে মুখে দেবার ক্ষমতা নেই, অসুখ-বিসুখ হলে একফোঁটা পথ্য দেবার মানুষ নেই। তোমাদের অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়, ঘেন্নাও হয়'—

একি, এসব কি বলছে সুধারানী? কাকে কি বলছে তার ঠিক নেই। একজন অপরিচিত মানুষ যার কাছে মেয়ের চাকরির জন্য এসেছে তাকেই কিনা যা তা সব কথা শোনাচ্ছে!

আর ঘেন্না কেন হয় তাই ভাবছিল অরবিন্দ।

'হবে না!' সুধারানী অবাক হলো 'মানুষ তো মানুষ, এই নোংরা বাদাড়ের মধ্যে জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত বাস করতে চায় না। আর বলিহারি তোমাদের'—

অধিক ঘেন্নায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠল সুধারানীর।

'কদিন আগে বমি করেছো? শুকিয়ে কালসিটে মেরে গিয়েছে, একঘটি জলও ত ঢালতে পারতে বাপু, না কি তাও কষ্ট হয়?'

অরবিন্দ কোনো উত্তর দিল না। লজ্জায় মাথা নত করল। এ যেন মা-মাসি-পিসি স্থানীয় কেউ সামনে বসে কটু কথা শোনাচ্ছে।

'যা হোক বাবা, এই আমার মেয়ে। এর নাম অতসী, লেখাপড়া জানে না, বুদ্ধি-সুদ্ধি যা আছে তা দিয়ে মধ্যবিত্ত ঘরের সংসার ও চালাতে পারবে। সবচেয়ে বড় গুণ যতই গালমন্দ করো, উত্তর দেবে না, মুখ বুজে তোমার হুকুম মানবে। জল তুলবে, ঘর পরিষ্কার করবে, আর রান্না করবে। এবার বলো কত দিতে পারবে তুমি?'

একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলে সুধারানী সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে তাকাল অরবিন্দের দিকে। খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে লক্ষ করতে চাইল তার এই দীর্ঘ বয়ান কি পরিমাণ ভাবান্তর সৃষ্টি করেছে।

অরবিন্দ অনেকক্ষণ কাচুমাচু করল। কি উত্তর দেওয়া যায় তাই ভাবতে লাগল। সুধারানী স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে।

'আমি আর কি বলব, গগনবিহারী-বাবু যা বলবেন'—

দাবড়ি দিয়ে উঠল সুধারানী—'কাজ দেবে তুমি, টাকা দেবে তুমি, বার বার গগনবিহারীবাবুর নাম নিচ্ছো কেন?'

শেষে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল—'মোটমাট চল্লিশ টাকা, দিতে হবে বাপু, আর খাওয়া পরা'—

অরবিন্দ কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রায় চিৎকার করে উঠল সুধারানী 'দ্যাখো বাপু, ভদ্রঘরের মেয়ে আমরা। দরাদরি জানি না, পছন্দও করি না। তোমার রোজগারপাতি কম থাকে আর একটু খাটাখাটুনি বাড়াও, সকাল-বিকেল টুশোনি করো, ভালো কোনো চাকরির চেষ্টা করো। ঘরের জন্যে চিন্তা কী, ঘরে তো তোমার রইলই একজন'—

এরপর আর কোনো কথা চলে না। কথা চলে না কিন্তু তথাপি অনেক কথাই বলবার ছিল অরবিন্দের। আর যতবারই সে সে-সকল কথা বলবার চেষ্টা করেছে ততবারই ভীষণ রুক্ষভাবে প্রতিবাদ করেছে সুধারানী। সারাক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন অস্বস্তিবোধ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না অরবিন্দের।

এই সময়ের সমস্ত ঘটনাটুকুর মধ্যে শুধু 'হ্যাঁ-না' শব্দ করা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা ছিল না তার। যাবার আগে সুধারানী বলল—'তাহলে ওই কথা রইল, কাল থেকেই পাঠিয়ে দেবো ওকে'—

অরবিন্দ পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত এসে বিদায় দিয়ে গেল।

পরদিন সকাল সকাল এসে অতসী কাজে লেগেছিল।

অরবিন্দ তাকে এটা-ওটা সাহায্য করতে করতে বলল—'তোমার মার স্বভাবটা কিন্তু বড় তিরিক্ষি মেজাজের'—

অতসী বলল—'যাকে পছন্দ করেন, তার কাছে কিছু গোপন করেন না মা।'

অরবিন্দ বলল—'তেমন ত মনে হল না। টাকার প্রতি লোভটা বড় বেশি।'

অতসী কিছু বলবে বলবে করে আর বলা হল না।

সন্ধ্যাকালে বাড়ি ফিরতেই সুধারানী বলল—'কেমন মনে হল অরবিন্দকে?'

এ আবার কেমনতরো প্রশ্ন! অরবিন্দকে ভালোলাগা না লাগার প্রশ্ন আসে কিসে? কাজটাই আসল কথা। কেমন ধরনের কাজ, কি কি কাজ করতে হল সারা দিন—তা কেন জিজ্ঞাসা করে না সুধারানী?

মুখে ছোট্ট করে জবাব দিল অতসী—'ভালোই।'

'কিছু বলছিল তোকে?'

'হ্যাঁ'—শাড়ি বদলাতে বদলাতে বলল অতসী।

সুধারানী জিজ্ঞাসা করল—'কী?'

'টাকার কথা।' অতসী উত্তর দিল।

ভয়ংকর জোরে চিৎকার করে উঠল সুধারানী—'আমি জানতুম। আকিসার হন্দ। শোন অতসী, তোকে খুব শক্ত হতে হবে, ওরা এই রকমই নেই নেই বলবে আর মদ-টদ খেয়ে পয়সা ওড়াবে। বাড়ি ফিরবে না, রাস্তায়, পার্কে শুয়ে রাত কাটাবে। তারপর শক্ত রোগ বাধিয়ে ঘরে ফিরবে। তখন কেউ দেখবে না, একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে না। তখন বাড়ির ঝিই ঘরের বউ, তখন তোর অনেক টাকার দরকার'—

বলতে বলতে সুধারানীর আর্দ্র কণ্ঠে উত্তেজনা জাগল। মুখের ভাব পরিবর্তিত হল, করুণ বেদনাহত মনে হল চোখের দৃষ্টি।

'সুরেশবাবুও ওইরকম ছিলেন। সুরেশবাবুকেও কেউ দেখবার ছিল না। একটা পয়সা ছিল না মৃত্যুকালে—'

শোকে মুহ্যমান দেখাতে লাগল সুধারানীকে, নিরুপায় অসহায়, আশাহত। মেয়ের সামনে বসে থাকা আর শোভন মনে হল না, সুধারানী সেখান থেকে উঠে দ্রুত অন্য ঘরে চলে গেল।

ভারতের অর্থনীতি

মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থা : একটি সাম্প্রতিক চিত্র

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা, জাতীয় নমুনা সংগ্রহ ও ভারতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থার একটি বিবরণ প্রকাশ করেছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের আয়, ব্যয় ও কাজকর্মের অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা পাওয়া যায় এই বৃত্তান্ত থেকে। প্রকাশিত তথ্যের সাহায্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয়সূচক তৈরি করার কাজও সহজ হবে।

ভারতের ৪৫টি নির্বাচিত শহরের ৩৬,০০০ পরিবারের কাছ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার ভিত্তিতে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রার প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেটা হল আমাদের দেশের বেশীর ভাগ শহরের মধ্যবিত্ত পরিবার তার আয়ের শতকরা ৪৪ ভাগ খাদ্যসামগ্রী, পানীয়, তামাক বা নেশার জিনিসের উপর, শতকরা ২৬ ভাগ বিবিধ দ্রব্য (যেমন যানবাহন, শিক্ষা), শতকরা ১৪ ভাগ বাসগৃহ ও গৃহের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, শতকরা ১২ ভাগ কাপড়চোপড়, বিছানাপত্র, জুতো ও পাগড়ি এবং শতকরা ৪ ভাগ জ্বালানি ও আলোর উপর খরচ করে থাকে।

আর্থিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভিন্ন অঞ্চলসমূহের যাতে প্রতিনিধিস্থানীয় হয় এবং শহরগুলির শাসনতান্ত্রিক গুরুত্বের দিকে নজর রেখে ৩৬,০০০ পরিবার নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতি রাজ্য থেকে কম করে দুটি এবং সবচেয়ে বেশী হলে পাঁচটি করে সারা দেশ থেকে ৪৫টি কেন্দ্র নেওয়া হয়েছে—প্রত্যেক রাজ্যের কেন্দ্রসংখ্যা আবার সেই রাজ্যের শহরের জনসংখ্যার (১৯৫১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী) আনুপাতিক। কেন্দ্রগুলি বাছবার সময় প্রথমে সারা দেশ ও বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীগুলির উপর এবং পরে রাজধানী নয় এরকম যেসব শহরে ৫ লক্ষের বেশী লোক বাস করে সেগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

যেসব পরিবার কৃষি-বহির্ভূত অঞ্চলে কায়িক পরিশ্রম লাগে না এরকম কাজ করে বেতন পেয়ে থাকে তাদের মধ্যবিত্ত পরিবার বলে ধরা হয়েছে। বিবরণে বলা হয়েছে যে, শারীরিক শ্রম না করে কৃষি ছাড়া অন্য

শহরের এমন মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যা হল প্রায় ২৫ লক্ষ (এইসব পরিবাররা শহর অঞ্চলের সমস্ত পরিবারদের প্রায় একের সাত ভাগ হবে)। যে ৪৫টি শহরের মধ্যবিত্ত পরিবারদের ঐ বিবরণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তারা পূর্বোক্ত যোগফলের (২৫ লক্ষ) হবে প্রায় একের তিন ভাগ।

পরিবারের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ৪ থেকে ৫-এর মধ্যে। দেখা যাচ্ছে, পরিবারের আকার তার আয়ের সঙ্গে বেড়ে যায় : সবচেয়ে বেশী আয়ের পরিবাররা সবচেয়ে কম আয়ের পরিবারদের চাইতে আকারে দুগুণ বড়ো। সাধারণত, ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলের পরিবারগুলি পূর্ব উত্তর অঞ্চলের পরিবারের চেয়ে বড়ো। দেখা গেছে, ছোট শহরের তুলনায় বড়ো শহরের পরিবারগুলি ছোট।

অধিকাংশ শহরে মধ্যবিত্ত পরিবারের শতকরা ৮৫ ভাগের মাসিক আয় ৭৫ ও ৫০০ টাকার ভেতর। বাকি পরিবারদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৬ ভাগের আয় ৫০০ থেকে ১,০০০ টাকার ভেতর; শতকরা প্রায় ৫ থেকে ৬ ভাগ পরিবার ৭৫ টাকারও কম উপার্জন করে থাকে; শতকরা মাত্র এক ভাগ মাসিক ১,০০০ টাকার বেশী আয় করে। অধিকাংশ পরিবারের আয় অবশ্য ১০০ ও ১৫০ টাকার ভেতর।

বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজের মত প্রধান নগরে শতকরা প্রায় ২ ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারের আয় ১,০০০ টাকার বেশী; শতকরা প্রায় ১৬ থেকে ১৭ ভাগ প্রতি মাসে ৫০০ টাকার উপর উপার্জন করে। অধিকাংশ কেন্দ্রে মধ্যবিত্ত পরিবারের গড় আয় হচ্ছে মাসে ২০০ ও ২৫০ টাকার ভেতর। বোম্বাই, কলকাতা, দিল্লীর মত বৃহৎ নগর ও শৈলাবাস প্রভৃতি ব্যয়শীল স্থানে পরিবারের আয় বেশী হয় এবং মাসে ৩৫০ টাকার উপরে ওঠে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত (নীচের শতকরা ৫০ ভাগ) শ্রেণীর পরিবাররা অধিকাংশ কেন্দ্রে গড়ে ১০০ থেকে ১২৫ টাকা আয় করে; প্রধান নগরগুলিতে তারা ১৭৫ থেকে ২০০ টাকার ভেতর উপার্জন করে। বোম্বাই ও দিল্লীর তুলনায় কলকাতা ও মাদ্রাজে আয়ের অসাম্য বেশী দেখা যায়। ছোট নগরের মধ্যে হায়দ্রাবাদ ও বাঙ্গালোরে আয়ের অসমতা পুনা, নাগপুর, আমেদাবাদ, কানপুর ও লক্ষ্ণৌর চাইতে বেশী প্রকট।

উপরের স্তরের (যাদের মাসে প্রায় ৭৫০ টাকা আয়) পরিবারদের বাদ দিলে মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যয় সাধারণত আয়কে ছাড়িয়ে যায়। মাসিক গড় খরচ জম্মুতে ১৪৮ টাকা থেকে আরম্ভ করে দিল্লীতে ৩৮৮ টাকা পর্যন্ত দেখা যায়। তথ্য সংগ্রহ করবার সময় অবশ্য ব্যয় খানিকটা বাড়িয়ে এবং আয় কিছুটা কমিয়ে বলার ঝোঁক লক্ষ করা গেছে।

উপরের শতকরা ২৫ ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারের খরচ নীচের শতকরা ২৫ ভাগের ব্যয়ের তিন থেকে চার গুণ হবে; উপরের শতকরা ১০ ভাগ খরচ করে ৪ থেকে ৬ গুণ এবং উপরের শতকরা ৫ ভাগ ব্যয় করে থাকে ৫ থেকে ৮ গুণ। প্রধান নগরগুলিতে মধ্যবিত্ত পরিবাররা অপেক্ষাকৃত বেশী খরচ করে বাসগৃহ, গৃহের আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র ও বিবিধ দ্রব্যের উপর—সেই তুলনায় খাদ্য, পানীয়, জ্বালানি ও আলোর উপর তারা কম খরচ করে। দেশের পূর্বাঞ্চলে জ্বালানি ও আলোর দরুন খরচ অপেক্ষাকৃত অল্প, বাসগৃহ প্রভৃতির উপর ব্যয় বেশী; পশ্চিম অঞ্চলে কাপড়-চোপড় ও বিবিধ দ্রব্যের উপর খরচ বেশী, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদির জন্য ব্যয় সেই অনুপাতে কম।

খরচের দিক থেকে, খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে দরকারী হচ্ছে চাল, গম ইত্যাদি প্রধান খাদ্যশস্য এবং তারপর দুধ ও দুধ থেকে তৈরী খাদ্য। আসাম, পশ্চিম বাংলা ও উড়িষ্যা রাজ্যে এবং বোম্বাই, বাঙ্গালোর, শ্রীনগরের মত আরো কয়েকটি জায়গার মধ্যবিত্ত পরিবারদের খাদ্যতালিকায় মাংস, মাছ ও ডিম বিশেষ স্থান পায়।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রত্যেক পরিবারের গড়ে ১·০১ থেকে ১·৩২ জন কর্মে নিযুক্ত, অর্থাৎ চারজনের ভেতর প্রায় একজন কর্ম করে উপার্জন করে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সবচেয়ে বেশী লোক নানা রকম সরকারী কাজ করে, বাকি কর্মীদের অধিকাংশ শিক্ষকতা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কেরানীদের সংখ্যা সবচাইতে বেশী। তারপরে সংখ্যাগুরু হচ্ছে শিক্ষকরা। প্রায় সব ক্ষেত্রে এইসব কর্মীরা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে সবসুদ্ধ গড়ে ৮ থেকে ১৬ বছর কাজ করে থাকে। মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্মীরা একবার বৃত্তি নির্বাচন করা হয়ে গেলে স্থায়ীভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্ম করে। তারা প্রতিদিন গড়ে ৬ থেকে ৭ ঘণ্টা—শিক্ষকরা অবশ্য এর চাইতে কম সময় কাজ করে। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত চাকুরেরা দিনের কাজের ভেতর কোনো বিশ্রামের সময় পায় না; যারা পায় তাদের বেশীর ভাগ আধ ঘণ্টার মত রিসেস পেয়ে থাকে।

অধিকাংশ কর্মীরা খুচরো ছুটি কিংবা উপার্জিত ছুটি অথবা দুটোই পায় কিন্তু অসুস্থতার কারণে ছুটি নেওয়ার সুবিধা থেকে তাদের বেশীর ভাগ বঞ্চিত। বেসরকারী ব্যবসায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাইতে কম সুবিধা বা অধিকার দেওয়া হয়।

দেখা গেছে যে, কর্মীদের শতকরা প্রায় ৩ ভাগকে আগের বছর কোনো না কোনো সময় বেকার থাকতে হয়েছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ অবশ্য কর্মক্ষেত্রে নবাগত। অন্যদের বেলা বেকার থাকার কারণ হচ্ছে বরখাস্ত বা চুক্তি শেষ হওয়া ও ছাঁটাই। বেকারদের ভেতর প্রত্যেকে গড়ে ২১ সপ্তাহ কাজের অভাবে বসে থাকে।

মধ্যবিত্ত পরিবারদের গড় আয়-ব্যয়ের সঙ্গে একই শহরের শ্রমিক শ্রেণীর আয়-ব্যয়ের তুলনা করলে দেখা যায় যে, মধ্যবিত্তদের গড় আয়-ব্যয় শ্রমিকদের আয়-ব্যয়ের ২ থেকে ৩ গুণ বেশী। নিম্ন মধ্যবিত্তদের আয় ও ব্যয়—যা সমগ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়-ব্যয়ের মোটামুটি অর্ধেক হবে—শ্রমিক শ্রেণীর চাইতে সামান্য বেশী ধরা যেতে পারে।

একই আয় হওয়া সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ব্যয়ের গঠনে শ্রমিকদের তুলনায় বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নীচের শতকরা ২৫ ভাগের (যাদের আয় শ্রমিকদের আয়ের সঙ্গে তুলনীয়) অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ খাদ্য, ৩০ ভাগ জ্বালানি, বাসগৃহ ও জামাকাপড় এবং ২০ ভাগ শিক্ষা প্রভৃতি বিবিধ খাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে। শ্রমিক শ্রেণীর পরিবাররা অপেক্ষাকৃত বেশী খরচ করে খাদ্য এবং অল্প ব্যয় করে অন্যান্য দ্রব্যের উপর। অন্য দিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবাররা খরচ করার ব্যাপারে এখনো ভালো বাসগৃহ, কাপড়-চোপড়, শিক্ষা ও চিকিৎসার উপর চিরাচরিত মূল্য বা গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই পক্ষপাতিত্বের আলোকে তাদের শ্রমিক শ্রেণীর লোকদের থেকে আলাদা করে চেনা যায়।

শান্তিকুমার ঘোষ

চাঁদডুবি হ্রদ

নীরোদ রায়

চাঁদডুবি। নামটি বেশ কাব্যিক। নাম শুনেই প্রেমে পড়া গোছের অবস্থা হয়েছিল আমার। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকবার নামটি শোনার পর স্থানটি দেখবার বাসনা মনের ভেতর প্রবল হয়ে উঠেছিল। দর্শনীয় স্থানের নানা বর্ণনায় মনের ভেতর যে চিত্র-রূপ ফুটে উঠেছিল, তাতে আমি দেখেছিলাম—মনোরম পরিবেশে বিস্তৃত এক জলাশয়। তার পশ্চিম আকাশের বুকে ভেসে আছে ভরা শুক্লপক্ষের চাঁদ। জলাশয়ের বুক জুড়ে ছোট-ছোট ঢেউগুলো খেলা করছে। তা দেখে চাঁদও নেমে এল জলে। কিন্তু দুরন্ত ঢেউদের আবদারে চাঁদ নিমেষেই ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে তলিয়ে গেল জলে। ক্লান্তমনে সেই চাঁদ আবার ফিরে গেল পশ্চিম আকাশে। তারপর ধীরে ধীরে ডুবে গেল অপর দিগন্তে।

চাঁদডুবির বিবরণ শুনেছিলাম অনেকের কাছেই। সবাই অনেকখানি প্রশংসা করে বলেছিল, বেড়াবার আর পিকনিকের জন্য চাঁদডুবি হচ্ছে আইডিয়াল স্থান। বহু সৌন্দর্যের সমাবেশে এমন এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি নাকি করে রেখেছে, যার তুলনা সহজে মেলা ভার। অবশ্য এই পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রকৃতিরই ষোল-আনা কৃতিত্ব।

আসামের গৌহাটি শহর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় মাইল চল্লিশ গিয়ে চাঁদডুবিতে পৌঁছনো যায়। যেতে হবে প্রথমে জাতীয় সড়ক ধরে কিছুটা পথ, তারপর গ্রাম্য পরিবেশের ভেতর দিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সেই পথ প্রবেশ করবে এক অরণ্য এলাকায়। এই বিস্তৃত অরণ্য এলাকার নাম রাজাপাড়া। সরকারী বন-বিভাগের সংরক্ষিত এই এলাকার ভেতর দিয়ে কিছু দূর অতিক্রম করলেই উপস্থিত হতে হবে এক জলাধারের প্রান্তে। পথটি এইখানেই শেষ। এখানেই অরণ্য এক বিশেষ সৌন্দর্যশোভায় জলাধারের প্রান্তে আকর্ষণীয় রূপ ধারণ করে আছে। ভ্রমণবিলাসীরা তাই আনন্দ-চিত্তে এখানেই ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম ভোগ করেন, আর অনুভব করেন একটি স্নিগ্ধ মধুর আবহাওয়ার আমেজ। এমন একটি লোভনীয় পরিবেশের সঙ্গে মন-মেজাজের সুর মেলাতে রসিকজন আনন্দের নানা উপকরণ সঙ্গে নিতে ভোলেন না। তাঁদের আনন্দ এই আলো-ছায়া ঘেরা অরণ্য পরিবেশে নিঃসন্দেহে মধুরতর হয়ে ওঠে সম্মুখের এই পর্বতবেষ্টিত জলাধারের উপস্থিতিতে। দিনের তৃতীয় প্রহরে সেই স্থানে দাঁড়িয়ে কল্পনা করতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে, চাঁদ সত্যিই এই হ্রদে তার রূপসৌন্দর্য নিয়ে ডুবে যেতে আনন্দ পায়। অনুভব করলাম, নামটি সার্থক।

বন্ধুকে মনের ভাব জানালাম—নামকরণ সত্যিই সার্থক।

এককালে গভীর অরণ্যময় চাঁদডুবির এলাকা, আজ এক বিস্তৃত জলাশয়ে বিরাজ করছে।

আপত্তি জানাল বন্ধু—না, না। যা ভেবেছো তা নয়।

—কেন? নামটি তো অর্থপূর্ণ?

—নাম হলে কি হবে, অর্থ তার অন্য।

বন্ধুর এইটুকু উক্তিই আমার কল্পনাকে ধাক্কা দেবার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হল। মনের ভেতর সব যেন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছিল। তবুও দৃষ্টি আমার নিবদ্ধ ছিল সম্মুখের ঐ জলাশয়ের দিকে। বন্ধুর মুখ থেকে যে ইতিবৃত্ত শুনেছিলাম তার ভেতরও যেন রূপ-কথার কাহিনী ছড়ান। একদা এই বিস্তৃত জলাধারের স্থানে ছিল গভীর অরণ্যপূর্ণ পাঁচটি বিরাট পাহাড়। খাসী-জয়ন্তিয়া এলাকাভুক্ত ঐ সব পাহাড় অতীতের এক সর্বনাশা ভূমিকম্পের কবলে পড়ে পাতাল গহ্বরে বিলীন হয়ে যায়। ধরিত্রীর বুকে

অরণ্য পরিবেষ্টিত চাঁদডুবির জলাধারের অপর একটি দৃশ্য।

রাজাপাড়া ও রানী অঞ্চলের মেয়েরা অরণ্য পথে অবাধে চলাফেরা করে থাকে

প্রহরীর মত দাঁড়ানো পাঁচটি পাহাড়কে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে এই জলভরা হ্রদ গড়ে তুলতে প্রকৃতির পক্ষে বেশি সময় লাগেনি। সেই ঘটনারই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানটির নাম-করণ হয়েছিল। খাসী ভাষায় "চান্-ডুবি" অর্থে পাঁচটি পাহাড় ডুবে যাওয়া। আজ আমাদের কাছে "চাঁদডুবি" হয়ে অন্য অর্থ দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

চাঁদডুবির বৃহত্তর এলাকা হচ্ছে রাজা-পাড়া, যেখানে খাসী জয়ন্তিয়া এবং গারো পাহাড়ের এলাকা এসে কামরূপ জেলার সঙ্গে মিলেছে। ঐ সব পর্বত-দেশীয় রাজা-রাজড়াদের বসবাস রাজাপাড়ায় ছিল বলেই অনুমান করা যায়, বিশেষ করে যখন "রানী" নামক একটি স্থান অতি নিকটেই অবস্থিত। এখনো পর্যন্ত পথে-ঘাটে, এবং হাট-বাজারে, খাসী, গারো, রাভা-কাছারীদের দেখতে পাওয়া যায়। শোনা যায়, প্রাচীন কামরূপে এই সব অঞ্চল ছিল তৎকালীন মহারাজ নরনারায়ণের অধীনে। আরও শোনা যায়, শহীদ মণিরাম দেওয়ান রানী এলাকা থেকেই এককালে চেরাপুঞ্জী পর্যন্ত এক সড়ক নির্মাণ করছিলেন। এইসূত্রেই রাজা-পাড়ার এই অঞ্চলকে অতীতের বহু স্মৃতি-বিজড়িত স্থান বলা চলে।

এক অপরাহ্ন বেলায়, চাঁদডুবি হ্রদের পারে দাঁড়িয়ে অতীতের ইতিহাসকে টেনে আনতে মন আমার রাজী ছিল না। তখন শুধুই মনে হচ্ছিল, প্রকৃতির রূপ পালটাতে পাঁচটি পাহাড়ের পরিবর্তে এই সুন্দর হ্রদকে গ্রহণ করতে। কোন আপত্তি নেই "পাহাড়ডুবি" আমাদের কাছে চাঁদডুবি হতে।

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পত্র

সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়

ইদানীংকালে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রগুলির মূল্য বিচারের সময় আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের উপযুক্ত গবেষণা এবং তথ্যানুসন্ধানের দ্বারা অনেক অনাবিষ্কৃত ইতিহাস ও খণ্ড কথা প্রকাশিত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পত্রকে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব করিয়া অনেকে দেশ ও জাতিকে বঞ্চিত করিতেছেন। শুধু পত্রগুলিকে ছাপিয়া দিলেই দায়িত্ব বোধ শেষ হয় না, তাহার খুঁটিনাটি, ইতিবৃত্তটুকু সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা কোথায়? এমনই একটি অপ্রকাশিত চিঠি যখন আমার হস্তগত হইল, তখন ইহার ভূমিকাটুকু সংগ্রহ করিতে গিয়া, এমন অনেক তথ্য, আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার প্রয়োজনীয়তা আজ প্রকাশের অপেক্ষা রাখে। সম্পূর্ণ না হইলেও কিয়দংশ প্রকাশ করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রবীন্দ্রনাথ এই পত্রটি স্বর্গীয় বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয়কে লেখেন ১৩১৩ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বোলপুর থেকে। বলাইচাঁদ গোস্বামী ছিলেন আমার দাদু ভক্তপ্রাণ শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামীর পিতা এবং শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশসম্ভূত। শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামীর সৌজন্যে এবং আমার আত্মীয় বন্ধু শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বলাইচাঁদ গোস্বামীর গ্রন্থাগার হইতে অকস্মাৎ এই পত্রটি আবিষ্কৃত হয় এবং শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে বলেন। ইহার পর তথ্যানুসন্ধানের দায়িত্ব আমি নিজে গ্রহণ করি। অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয় এ ব্যাপারে আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। রবীন্দ্রনাথের হুবহু পত্রটির নকল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওঁ

বোলপুর

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন—

যোগেন্দ্রবাবুর ঠিকানা জানি না—চিঠিখানি লেফাফায় বন্ধ করিয়া ঠিকানা লিখিয়া আপনি যথাস্থানে পাঠাইবেন।

কমা সেমিকোলন সম্বন্ধে যে টিপ্পনিটুকু দিয়াছি তাহা প্রবন্ধ লেখকের ইচ্ছাজ্ঞাপক মাত্র আমার নিজের মত নহে। আপনি যদি অসঙ্গত বোধ করেন তবে জানিবার প্রয়োজন নাই। আপনার অধিকারে আপনার আসন আমি অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই—কমা সেমিকোলন ড্যাস হাইফেন এবং বানান ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমি কখনো আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই—প্রুফ রাজ্যে নিজের ক্ষমতা বলে আপনি যে সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন সেখানে আপনার প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হউক, আপনার রাজদণ্ড অমোঘ হউক এই আমার কামনা।

বইগুলি আসিয়া পৌঁছিলে দাম যাহাতে পান সেরূপ আদেশ দিয়া আসিয়াছি। আমাদের কর্মচারী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বিশ্বাসকে এ-সম্বন্ধে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছি।

বিদ্যালয়ের কাজে বিশেষ ব্যস্ত আছি। আষাঢ়ের বঙ্গ দর্শনের কিরূপ গতি হইতেছে? যথাসময়ে বাহির করিতে পারিবেন ত?

ইতি ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পত্রটির মাধ্যমে জানা যায় যে বলাইচাঁদ গোস্বামী রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। বিদ্বদ্‌জন, গুণী, পণ্ডিতদের সমাদর রবীন্দ্রনাথ চিরদিন উদার চিত্তে করিয়া গিয়াছেন এবং সেই সমাদরের চূড়ান্ত স্বীকৃতি এই পত্রটি।

বলাইচাঁদ গোস্বামী সম্পর্কে আজ হয়ত অনেকেই অবহিত নন। তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি কথা এই পত্রটির প্রসঙ্গে স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। জ্ঞানভিক্ষু, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত প্রবর বলাইচাঁদ গোস্বামী, শ্রীলঘুভাগবতামৃত, শ্রীশ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়, অধ্যাত্মরামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক, অনুবাদক ও ব্যাখ্যা লেখক ছিলেন। ইহা ছাড়া শ্রীলালদাস বাবাজী কর্তৃক রচিত ভক্তমাল গ্রন্থটি তিনি সম্পাদনা করেন। সম্পাদিত ভক্তমাল ১৩০৫ সালে শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক ১৭নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে বলাইচাঁদের শিক্ষাগুরু ছিলেন শান্তিপুরের মদনগোপাল গোস্বামী। (অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধর) ইনি বলাইচাঁদের আশ্রম গুরুও ছিলেন। তাঁর আশ্রমিক শিক্ষার প্রথম দন্ডীঘর ছিল এই শান্তিপুরের আশ্রম। বলাইচাঁদের পিতা ছিলেন দীননাথ গোস্বামী। পোস্তাবাজার রাজবাড়িতে বলাইচাঁদ গোস্বামী ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মত বলাইচাঁদ গোস্বামীও বৈষ্ণব শাস্ত্র ও রস আলোচনার উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। চিন্তাশীল, মনস্বী লেখক ও ভাষ্যকার বলাইচাঁদ গোস্বামী ভক্তমাল গ্রন্থের একস্থলে।

পাদ্মে—

"ক লৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীমাধবী-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবকাঃ" ॥

ইতি।

শ্লোকটির অনুবাদ করিতে গিয়া বলিতেছেন—

কলিকালে নিশ্চয় শ্রী, মাধবী, রুদ্র ও সনক, এই চারিটি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের আবির্ভাব হইবে। এই চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় পৃথিবীতে পবিত্রতা বিধায়ক।

প্রচার বিমুখ, একনিষ্ঠ, নিভৃতচারী ভক্ত-প্রেমিক বলাইচাঁদ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথও আলাপ-আলোচনার জন্য বলাইচাঁদ গোস্বামীর সঙ্গলাভেচ্ছু ছিলেন।

অনেকে বলেন রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির সমগ্র প্রুফ সংশোধন বলাইচাঁদ গোস্বামী করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের অনেক বিষয়ে ভাব বিনিময় হয়েছিল। এবং বলাইচাঁদ যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, এই পত্রটি তাহার প্রমাণ। কিন্তু বলাইচাঁদ গোস্বামী ১৩১৩ সালের বঙ্গদর্শনে কিংবা হয়ত কোন সংখ্যাতেই তিনি তাঁহার নিজের রচনা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু সহযোগিতা ও কার্যত পত্রিক

সম্পাদনে অনেক কাজ করিতেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধের বিরোধিতা করিয়া বলাইচাঁদ গোস্বামী একটি রচনা প্রকাশ করেন। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিতেছি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ্য যে রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয়ের একটি পত্র বলাইচাঁদ গোস্বামীর গ্রন্থাগার হইতে পাওয়া গিয়াছে। অতএব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বলাইচাঁদ গোস্বামীকে কেন্দ্র করিয়া একটি রক্ষণশীল হিন্দু পণ্ডিত সমাজ সৃষ্টি হইয়াছিল। এই পণ্ডিত ও গোঁড়া হিন্দু সমাজে, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (রবীন্দ্রনাথের পত্রে প্রথমেই যাঁহার নাম উল্লিখিত আছে, ইনিই যে সেই বঙ্গবাসীর সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু তাহা আমরা প্রমাণ করিব) চন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, বীরেশ্বর পাঁড়ে, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি পণ্ডিত ও মনস্বী গণের মধ্যে কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও মননের সহিত তীব্রভাবে বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এঁরা অনেকেই ছিলেন নব্যহিন্দু, এবং কেহ কেহ প্রাচীন হিন্দু মতাবলম্বী। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও চেতনার সহিত ইঁহাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাঁধিল। ব্রাহ্মধর্মানুরাগীর ব্যঙ্গ চিত্রাঙ্কনের জন্য ইঁহারা অনেকেই মসিকে অসি করিয়া তুলিলেন। আক্রমণের স্থল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। বঙ্গবাসী ছিল সনাতনীদের কাগজ। অনেকে মনে করেন এই পত্রিকা বাংলার হিন্দু গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিল। কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম মুখপত্র নেতার সঞ্জীবনী, "বঙ্গবাসীর" প্রতিপক্ষ হইয়া উঠিল। পরোক্ষভাবে ব্রাহ্ম ধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন।

বলাইচাঁদ গোস্বামীর সহিত যোগেন্দ্রবাবুর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার বঙ্গবাসী পত্রিকায় বলাইচাঁদ রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে বিরোধিতা করিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করেন। আমরা পরে তাহার আলোচনা করিতেছি। অথচ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গদর্শনে লিখিতেন না, তিনি রবীন্দ্রবিরোধী প্রশ্ন ছাপিতে কিন্তু কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাই মনে হয়, বলাইচাঁদ গোস্বামীর পক্ষে যোগেন্দ্রবাবুর ঠিকানা জানা খুবই স্বাভাবিক। এবং এই যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ব্রাহ্ম ধর্মচার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার "মডেল ভগিনী" ইহার প্রমাণ (১৮৮৬-৮৮)। চন্দ্রনাথ বসুরে ব্রাহ্মধর্মের প্রগতি পরিপন্থী রচনা হিন্দু কিন্তু বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও চন্দ্রনাথ বসুকে লইয়া চূড়ান্ত ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেন।

......"আহাদামু—আহাচামু
লিখছে দোঁহে হিন্দুশাস্ত্র এডিটোরিয়াল
দামু বলছে মিথ্যে কথা, চামু দিচ্ছে গাল..."

বলা বাহুল্য, এই দামু ও চামু যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের চোখে যোগেন্দ্রচন্দ্র ও চন্দ্রনাথ বসু। 'কড়ি ও কোমলে'র প্রথম সংস্করণে এই কবিতাটি স্থান পায়। রবীন্দ্রনাথ এই গোঁড়া হিন্দু সমাজের আর্যামিকে লইয়া বিভিন্ন রচনায় ব্যঙ্গ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। অথচ বলাইচাঁদ গোস্বামীর পত্রের প্রারম্ভে যোগেন্দ্রবাবুকে (রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ) একখানি চিঠি লিখিয়া বলাইচাঁদ গোস্বামীকে তিনি অনুরোধ করিয়াছেন, চিঠিটি উপযুক্ত স্থানে পাঠাইয়া দিতে। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত খামে দুখানি চিঠি ডাকে আসে বলাইচাঁদ গোস্বামীর নামে। বলাইচাঁদ গোস্বামী রবীন্দ্রনাথের সে অনুরোধ নিশ্চয়ই পালন করেন, আর বাকি চিঠিটি আজ আমাদের আলোচ্য।

'স্বদেশী সমাজ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ ৭ই শ্রাবণ ১৩১১ সালে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে পাঠ করেন। সেই সভায় আশা করা যায়, বলাইচাঁদ গোস্বামীর দল উপস্থিত ছিলেন। ১৩১১ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। বলাইচাঁদ গোস্বামী ইহার পরে স্বদেশী সমাজের কার্য পদ্ধতির কি কি অন্তরায় সৃষ্টি হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই উত্থাপিত প্রশ্নগুলি 'বঙ্গবাসী'তে প্রকাশিত হয় আশ্চর্যের বিষয় যে যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর বঙ্গবাসী কাগজে (সাপ্তাহিক) "স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট" নামে রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছাপা হয়। পরে বলাইচাঁদ গোস্বামীর প্রশ্নের সমগ্র উত্তরমূলক প্রবন্ধটি ১৩১১ সালের আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "স্বদেশী সমাজ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ আমি প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্জন রঙ্গমঞ্চে পাঠ করি, তৎসম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এ প্রশ্নগুলি তিনি আমার কাছে পাঠান নাই, হিন্দু সমাজনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেরই যে যে স্থানে লেশমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, সেই সেই স্থানে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।......" বলাইচাঁদের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ আরও এক জায়গায় লিখিতেছেন। "...আমি যে ভাষার ছটায় মুগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দু সমাজকে একাকার করিয়া দিবার মতলব মনে মনে আঁটিয়াছি, বঙ্গবাসীর কোন কোন লেখক এরূপ আশঙ্কা অনুভব করিয়াছেন। আমার বুদ্ধিশক্তির প্রতি তাঁহার যতদূর গভীর অনাস্থা, আশা করি অন্য দশজনের ততদূর না থাকিতে পারে। আমার এই ক্ষীণ হস্তে কি ভৈরবের সেই পিনাক আছে? প্রবন্ধ লিখিয়া আমি ভারতবর্ষ একাকার করিব? যদি এমন মতলবই আমার থাকিবে, তবে আমার কথার প্রতিবাদেরই বা চেষ্টা কেন? কোনো কোনো বালক যদি নৃত্য করে, তবে তাহার মনে মনে ভূমিকম্প সৃষ্টির মতলব আছে, শঙ্কা করিয়া কেহ কি গৃহস্থদিগকে সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করে?..."

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধে রাজনীতির পঙ্কিলতা পরিহার করিয়া গ্রাম-উন্নয়নের প্রস্তাব হয়ত সে যুগের হিন্দু নেতাদের চিত্তে বিষবৎক্রিয়া করিয়াছিল। উত্তরদাতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বলাইচাঁদের এখানে চিন্তাশীলতার সংঘর্ষ। সমাজচিন্তা ও দর্শনের প্রত্যক্ষ বিরোধাভাস। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ বলাইচাঁদ গোস্বামীর পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের সমুদ্র যাত্রাকেও এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজ আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে বলেন, "...একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, সমুদ্র যাত্রার আমি সমর্থন করি কিনা, যদি করি, তবে হিন্দু ধর্মানুগত আচার পালনের বিধি রাখিতে কিনা? এ সম্বন্ধে কথা এই, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম বলি না।..."

"...গোস্বামী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি যেখানে নূতন নূতন যাত্রা কথকতা প্রভৃতি রচনার প্রস্তাব করিয়াছি, সে স্থলে "নূতন" কথাটার তাৎপর্য কি? পুরাতনই যথেষ্ট নহে কেন? আমাদের যাত্রা কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, সে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নূতন করিয়া আরো একটি কর্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে।..."

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "বহুৎ আচ্ছা" নাটিকার 'আনন্দ বিদায়' (প্যারডি) প্রথমে সংক্ষিপ্তরূপে বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়—একাধারে কবি, অধিকারী, ঋষি কিবা ত্যাগ কিবা দান

"পরিষৎ" জল ছিটায়ে দিলেই (কবিবর) স্বর্গে উঠিয়া যান।"

সেকালের দক্ষ ব্যঙ্গ লেখকেরা সকলেই বঙ্গবাসীর লেখক ও যোগেশচন্দ্রের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তবু এই যোগেন্দ্রবাবুকে রবীন্দ্রনাথ পত্র দিয়াছেন। আমরা জানি না সে পত্র প্রকাশিত হইয়াছে কিনা?

বানান-ব্যাকরণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

বলাইচাঁদ গোস্বামীকে যে কথা লেখেন, তাহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিতে গিয়া জানা যায় যে, ১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণের ভারতীতে "নূতন বাংলা ব্যাকরণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের ইতিপূর্বে প্রকাশিত ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। সাহিত্য পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ "বাংলা ব্যাকরণ" প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহার উত্তর দেন। সেদিন সেই সভায় শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী বলাইচাঁদ গোস্বামী, প্রমথ চৌধুরী, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, বীরেশ্বর পাঁড়ে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শব্দতত্ত্ব" গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ "ভাষার ইঙ্গিত" প্রবন্ধটি ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ সালে পাঠ করেন পরিষদের প্রথম অধিবেশনে। আমাদের আলোচ্য পত্রটির তারিখ ১৩১১ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ। মাত্র ৯ দিনের ব্যবধান। এই প্রবন্ধটির প্রসঙ্গে আলোচ্য পত্রে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের রচনা 'শোনা' এবং 'পড়ার' ব্যাপারে বলাইচাঁদ গোস্বামী উৎসাহী ছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর বিভিন্ন রচনার প্রুফ সংশোধন ও অন্যান্য ব্যাপারে বলাইচাঁদের সহযোগিতা কামনা করিতেন। শুধু সহযোগিতা করিয়াই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত থাকেন নাই। বঙ্গদর্শনের যাবতীয় কার্যাদির তদারক করা এবং প্রুফ দেখার ব্যাপারে বলাইচাঁদকে বঙ্গদর্শনের কাজে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন। বাদ-প্রতিবাদ, মতদ্বৈততা থাকিতে পারে, কিন্তু গুণীর সম্মান রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি দিতেন, এই পত্রটি তার উপযুক্ত স্বাক্ষর। "ভাষার ইঙ্গিত" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া ব্যাকরণ সম্পর্কীয় কিছু কিছু প্রশ্ন বলাইচাঁদ গোস্বামী রবীন্দ্রনাথকে করিয়াছিলেন, তাহার আভাস ও ইঙ্গিত আলোচ্য পত্রে আছে।

পরিশেষে পত্রটি যে সময়ে লিখিত তাহার কথা বলিয়া আমাদের আলোচনা শেষ করিব। ১৩১১ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বিদ্যালয় খুলিয়াছে। কবি জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ার দিকে মজঃফরপুর, কাশী ঘুরিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ৮৭তম জন্মদিন উপলক্ষে প্রত্যাবর্তন করেন কলিকাতায়। এদিকে বঙ্গবিভাগের আন্দোলন সুরু হইয়াছে। এই সময়ে কবির শারীরিক অবস্থাও ভাল নহে। বিদ্যালয়ের নানাবিধ কার্যে রবীন্দ্রনাথ জড়িত। ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৩১১) সালে মহর্ষি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ভাষার ইঙ্গিত প্রবন্ধ রচনা এবং ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বলাইচাঁদ গোস্বামীর নিকট এই পত্র দান।

কমনওয়েলথ মন্ত্রী সম্মেলন হইতে শ্রী টি টি কে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন (উল্টোরথের দিন)। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রী টি টি কে নাকি বলিয়াছেন যে, এই সম্মেলন হইল ক্লাবের মত, যেখানে ব্রিজ খেলায় টাকা হারিতেই

বুঝি অনেকে যান।—"কিন্তু কথাটা ঠিক হল না, অর্থমন্ত্রী মশাইর ব্রিজটা হয়ত আসে না। লাক্ যদি ইন্ থাকে আর সেই সঙ্গে পার্টনার যদি তুখোড় হয়, তাহলে হারবার মারে কে? রকমসকম দেখে মনে হয়, সম্মেলন ব্রিজে লাক্ আমাদের নেই, পার্টনারও তেমন নেই"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

উক্ত প্রসঙ্গের জের টানিয়া অনেকেই বলাবলি করিতেছেন—কমনওয়েলথ টাই-এর প্রয়োজন আমাদের নাই। শ্যামলাল বলিল—"তা বলতে পারিনে। তবে এটা জানি যে প্রিন্সেস কোটের সঙ্গে 'টাই' অচল!!"

এক সংবাদে প্রকাশ বিদেশে নাকি ভারতীয় বিড়ি খুব লোক-প্রিয় হইয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"গাঁজা হলে আরো ভালো হতো। শুনেছি, গাঁজা চালান দিয়ে পাকিস্তান নাকি যুগপৎ লোকপ্রিয়তা এবং বৈদেশিক মুদ্রা প্রচুর উপার্জন করছে!!"

আনন্দবাজার পত্রিকার একটি প্রবন্ধের শিরোনামা—"মৎস্য মারিব খাইব সুখে।"—"বহু পুরনো কথা, মৎস্যেরা যখন লুকোচুরি খেলায় পাকা হয়নি তখন মৎস্য মারা যেতো। এখন সে প্রশ্ন অবান্তর। তা ছাড়া মারা যদি বা যায়, সুখে খাওয়া নৈব নৈব চ; প্রবন্ধকার হয়ত ছিপ দেখেই ভুলেছেন, তেলের কথাটা মনে থাকলে আর 'খাইব সুখে' লিখতে পারতেন না।"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী, হাতে তাঁর তেলের খালি জায়গা।

পৃথিবীতে নাকি বছরে ছয়শ' কোটি লোক জন্ম গ্রহণ করে।—"কিন্তু তাতে আশঙ্কার কোন কারণ নেই, নাম্পে সুখশান্তি তো আছেই তাছাড়া চন্দ্রলোকে জমি পত্তনের ব্যবস্থা নাকি শুরু হয়ে গেছে"—বলেন বিশুখুড়ো।
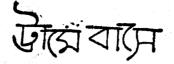
সংবাদে শুনিলাম বিহার বিধানমণ্ডলীর কমিউনিস্ট সদস্যগণ নাকি দেশের খাদ্যাবস্থার প্রতিবাদে তিন দিনের জন্য অনশন করিবেন। শ্যামলাল বলিল—"কিস্তি মাৎ করতে হলে এই ধরনের সস্তার সূত্রই খুঁজে নিতে হয়!!"

সংবাদে প্রকাশ ভারত সেবক সমাজ ও সাধু সমাজের সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ছয় মাস সময়কালের মধ্যে দেশের দুর্নীতি উচ্ছেদ করিবেন।—"বড়ই কঠিন পণ নন্দজী, বড়ই কঠিন

পণ। শেষকালে না গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ঝাড়ু হাতে ফিরতে হয় আর গাইতে হয়—হরদম লাগাতা ঝাড়ু তব্‌ভি এইস্যা হাল, ছিঃ ছিঃ এস্তা জঞ্জাল"— প্রায় সুর করিয়াই মন্তব্য করে শ্যামলাল।

গুজরাট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সেখানে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সহস্রাধিক গৃহকর্ত্রী বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।—"না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত বুঝি জাগে না জাগে না"—বহুদিন বিস্মৃত গানটি শুনাইলেন জনৈক সহযাত্রী।

হরিণঘাটায় নাকি দশ হাজার গরু মহিষ রাখিবার মত গোয়াল শূন্য পড়িয়া আছে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী সংক্ষেপে বলিলেন—"কার বা গোয়াল, কে বা দেয় ধোঁয়া।"

মাদ্রাজ বিধানসভায় এক প্রশ্নোত্তরে জানা গেল, সেখানে কতিপয় মহিলা পুরুষে, এবং কতিপয় পুরুষ মহিলাতে রূপান্তরিত হইয়াছেন।—"এটা নিতান্তই দৈহিক দিক থেকে; কিন্তু মনের দিক থেকে কত স্থানে কত পুরুষ যে মহিলা এবং কত মহিলা যে পুরুষ বনে গেছেন তার কোন পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়নি"—বলেন খুড়ো।

নিউ ইয়র্কে বিড়ালের জন্য প্রসূতি সদন খোলা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। প্রত্যেকটি বিড়ালের জন্য

পৃথক পৃথক ঘর এবং পৃথক পৃথক বেডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।—"আমরা প্রসূতি সদন করিনি বটে কিন্তু সেই বেড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করেছি; সেদিক থেকে আমাদের রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেন নি।"—বলে শ্যামলাল।

সংবাদে প্রকাশ, বৃক্ষবেষ্টনীর অভাব নিবন্ধন এবার কলিকাতা কর্পোরেশন বনমহোৎসব উপলক্ষে কোন বৃক্ষ রোপণ করেন নাই।—"কিন্তু আমরা যতদূর জানি কর্পোরেশনের স্বহস্তে বিববৃক্ষ রোপণ বরাবরের মতোই চলছে!!"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

গির অরণ্যের সিংহেরা শুনিলাম মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হইয়া অরণ্য ত্যাগ করিয়া লোকালয়ে চলিয়া আসিয়াছে।—"ভুয়া রাজতন্ত্র আর কদিন টিকবে। সবাই জানেন, মুরগীর ডাক শুনে সিংহ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, অথচ তিনি পশুরাজ! আর আমরাও ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি—ষাঁড় চলেছে পুকুর পাড়ে, সিংহ রাগে কেশর নাড়ে। কিন্তু এখন দেখছি এ শুধু কেশর নাড়ানো রাগ, আসলে তিনি একটি গবেট"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন সম্বলিত হইয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—স্টেডিয়ামের জন্য প্রস্তাবিত মাঠ কি পাওয়া যাবে না?—"কিন্তু এতে প্রশ্নের টান নেই। আমরা জানি, পাওয়া যাবে না, শুধু যাঁরা মাঝে মাঝে স্টেডিয়ামের আশ্বাস যেন তাঁরা জেনে রাখুন"—বলেন খুড়ো।

আলোচনা

প্যারিসের চিঠি

মাননীয়েষু,

১৮ই জুলাই তারিখের "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅজিতকুমার দামের "প্যারিসের চিঠি"তে সামান্য একটা ত্রুটি চোখে পড়লো। যে ফরাসী লেখককে এখানে সাঁজুপেরী ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর পুরো নাম Antoine De Saint-Exupery, বাংলা উচ্চারণে হওয়া উচিত সাঁতেকজুপেরী।

শ্রীযুক্ত দাম প্রসঙ্গক্রমে সাঁতেকজুপেরী-কৃত রচনাবলীর মধ্যে "সিতাদেল্"-এর নাম করেছেন, আমি ওই সঙ্গে "Le Petit Prince"-এর (ছোট্ট রাজকুমার) নামটিও যোগ করে দিতে চাই। রূপকের অর্থগৌরবে ও ভাষার সারল্যে এর সঙ্গে "ডাকঘরে"র একটা প্রচ্ছন্ন আত্মীয়তা আছে। অবশ্য বাংলা দেশের পাঠকবর্গের কাছে সাঁতেকজুপেরীর মহত্তর আবেদন রয়েছে। মূল ফরাসী থেকে এই গ্রন্থটি বাংলায় অনূদিত হ'লে (এমন আশা কি অসঙ্গত?) বোঝা যাবে যে, বিংশ শতকের নিষ্ঠুরতায় ব্যথিত মানবপ্রেম কিভাবে সহজ নিরলংকার শিশুর বেশ ধ'রে আনন্দলোকে মুক্তির অভিলাষ করেছে। নমস্কারান্তে।

অমিয় বসু
কলকাতা

অটোয়ার চিঠি

মহাশয়,

গত ২৭শে জুন ৩৪ সংখ্যা "দেশ" পত্রিকায় "অটোয়ার চিঠি"তে শ্রীসমীরকুমার বসু লিখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা ভাষার কথা ক্যানাডার ছেলেমেয়েরা এমন কি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় কেউই শোনেন নি। শুধু কি ক্যানাডায়? আমাদের তো মনে হয় অন্যান্য অনেক দেশেই এই একই অবস্থা। আমরা হল্যাণ্ডের বহু ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মিশেছি, কিন্তু তারা অনেকেই রবীন্দ্রনাথের নাম শোনে নি এবং বাংলা সাহিত্য যে বর্তমান ভারতের অন্যান্য সাহিত্য থেকে অনেক এগিয়ে একথাও তাদের জানা নেই। বাংলা ভাষা এবং রবীন্দ্রনাথের নাম শুনে এদেশীয় আমাদের এক বন্ধু একখানি বই সংগ্রহ করে। বইখানি হল্যাণ্ডের ভাষায় লিখিত একখানি বিশ্ব ইতিহাস ধরনের। (হল্যাণ্ডের ভাষা না জানার দরুন বইটি আমাদের পড়া সম্ভব হয়নি) ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসেরও একটি অংশ আছে। ভাষা সম্বন্ধে আলোচনায় এই বইটিতে ভারতবর্ষের দুটি লিখিত লিপি ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি হলো "দেবনাগরী" অপরটি "তেলেগু"। বাংলা ভাষার কোন লিপি দেওয়া হয়নি।

গোয়ার ব্যাপারেও বিদেশে আমাদের দূতাবাসগুলির দুর্বল প্রচার স্মরণ করিয়ে দেয়। এ দেশের লোকদের ধারণা, গোয়া একটি ভিন্ন দেশ। সে দেশের অধিবাসীরা স্বাধীন হয় নি। তারা শুধু এক শক্তি থেকে আর এক শক্তির হাতে পড়েছে।

রক্তকরবী দত্ত
হল্যান্ড

এক যে ছিল রাজা

মহাশয়,

৩১ বর্ষ ৩৫ সংখ্যাতে প্রকাশিত মেদিনী চৌধুরীর—"এক যে ছিল রাজা" প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখক জনসাধারণকে জানাবার জন্য রণচণ্ডী ও রাজা গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন। জানি না, লেখক বড়খোলা রণচণ্ডী বাড়ি যাওয়া সত্ত্বেও রাজা গোবিন্দচন্দ্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টির নাম প্রকাশ করে নাই কেন, বড়খোলার জনসাধারণ রাজার নাম স্মরণীয় করিয়া রাখার জন্য ঐ স্কুলটি রণচণ্ডী বাড়ির নিকটে জাটীঙ্গা নদীর অপর তীরে স্থাপিত করেন। ঐ রণচণ্ডী বাড়িতে এখনও প্রত্যেক রবিবার পুজো-অর্চনা হয়।

অবশ্য মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে একটি কাঁচা দেবালয় স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া জানি। ইতি

শ্রীরমাকান্ত দাস
জয়পুর, আসাম

শেক্‌সপীয়র সাম্রাজ্য

মহাশয়,

শ্রীতারকজ্যোতি দত্ত লিখিত "শেক্‌স্‌-পীয়ার সাম্রাজ্য" সম্বন্ধে আমার কয়েকটি মন্তব্য আছে:

১। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে যেটুকু ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা কাজ চালানো ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য।

এতে ভবিষ্যত সাহিত্য-পাঠকের ক্ষতি হবে এ নিশ্চিত সত্য। ভারতে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রবেশপথ প্রধানত একটি—সেটা ইংরেজী। কাজ চালানো ইংরেজী জ্ঞান নিয়ে ইংরেজী সাহিত্য এবং ইংরেজী অনুবাদ উপভোগ করা যায় না—এবং যাবে না।

২। কোন ভারতীয় ভাষায় যেমন বাংলায় মহৎ পাশ্চাত্ত্য কাব্য-সাহিত্যের সার্থক অনুবাদ সম্ভব নয়। কারণ আধুনিক ভারতীয় ভাষার সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষার অনতিক্রম্য ব্যবধান। শেকস্‌পীয়ারকে জার্মান্ ভাষায় অনুবাদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ কারণ উভয়েরই পিতামহ টিউটনিক। ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয় ইত্যাদির জনক লাতিনের সঙ্গে টিউটনিকের ব্যবধানও খুব বেশী নয়। সুতরাং ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি একান্ত স্বাভাবিক জানালা ইংরেজী।

৩। শেকস্‌পীয়ারকে বাংলায় অনুবাদ করতে হলে যে প্রতিভার প্রয়োজন, তা' দুর্লভ। 'ইংরেজী-হটাও' ওয়ালারা প্রায়ই জাপানের উল্লেখ করেন। জাপানী ভাষায় ইংরেজী মহৎ-সাহিত্যের সার্থক অনুবাদ হয়েছে বলে শুনিনি। আমার বিনীত নিবেদন—জাপানের শিক্ষিত পাঠক যদি ইংরেজীতে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্য (অনুবাদসহ) পাঠ না করে থাকেন, তবে সেটা ঈর্ষার বস্তু নয়।

৪। বৃটিশ চরিত্রের অধঃপতন সম্বন্ধে যা' বলা হয়েছে—তা' hasty generalisation. শেকস্‌পীয়ারকে যদি পৃথিবী ভুলে যায় তবে ইংরেজদের চাইতে পৃথিবীর ক্ষতি যে বেশী এবং শেকস্‌পীয়ারকে "বাঁচিয়ে" রাখবার দায় যে শুধু একা ইংরেজ জাতির নয়—এ কথা যদি পৃথিবী ভুলে যায় তবে সেটা দুঃখের হবে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি—আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের কেউই টোল বা মাদ্রাসা থেকে আসেন নি—সবাই ইংরেজী স্কুলের ছাত্র।

নন্দগোপাল মজুমদার
ঝালদা, পুরুলিয়া

পিউরিটানের প্রতি নিবেদন

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গত ১৮ই জুলাই তারিখের 'দেশ'-এ 'পিউরিটানের প্রতি নিবেদন'-এ সুনন্দ একটি সময়োচিত সুন্দর আলোচনা করেছেন। সুনন্দ ঠিকই বলেছেন—"অর্ধজাগ্রত মনের পুত্রকন্যার সামনেই যেসব বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রী আলাপ-আলোচনা করেন, সেগুলি সবই কি তাদের শোনবার যোগ্য?... ঘরের খোড়ো চালে মশালটি ছুঁইয়ে দিয়ে আগুনের জন্য হাহাকার করছেন। করুন, কিন্তু ওটা আগুন নেবাবার রাস্তা নয়।"

আজকের বিপথগামী তরুণদের জন্য আমরা অভিভাবকরা কতখানি দায়ী তা যদি আজ আমরা ভেবে দেখি এবং সেই অনুযায়ী আমাদের চলন ঠিক করি তাহলে দেখা যাবে তরুণদের মধ্যে এই উচ্ছৃঙ্খলতা ধীরে ধীরে কমে আসছে। আমরা অভিভাবকরা তরুণদের সামনে এমন কোনও উচ্চ আদর্শ তুলে ধরতে পারছি না যার ফলে তাদের চিন্তাধারা সুষ্ঠুখাতে বইতে পারে।

আমরা জানি ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি। প্রত্যেকটি পরিবারের সম্মুখে যদি একজন আদর্শ থাকেন এবং প্রত্যেকটি অভিভাবক যদি তাঁর নিজের পরিবারকে সংগঠিত করতে পারেন তবে সমাজ ও রাষ্ট্রও যে সংগঠিত হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
দেওঘর

বেগম মেরী বিশ্বাস

বিমল মিত্র

॥ ৩৩ ॥

সংসারে এক-একটা মানুষ জন্মায় যারা ঠিক ইতিহাসের মত। এক-একটা শতাব্দী পার হয়ে যায়, হঠাৎ এমনি এক-একটা মানুষের সাক্ষাত মেলে। ইতিহাসের মতই তারা কাউকে পরোয়া করতে জানেনা। সংসার তাদের অবহেলা করে, সমাজ তাদের তাচ্ছিল্য করে, আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব তাদের নিরুৎসাহ করে, তবু সেই প্রতিকূল ভাগ্যকে অস্বীকার করে তারা অমোঘ ভবিতব্যের দিকে এগিয়ে চলে।

এমনি একজন মানুষ এই লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল ক্লাইভ।

নিজের দেশে তাকে কেউ সম্মান দিলে না। নিজের দলের লোকও কেউ তাকে শ্রদ্ধা করলে না। অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসনের সঙ্গে রোজই খিটিমিটি বাধতে লাগলো। তবু রবার্টের গোঁ, বাঙলার সুবাদার-নবাবের অত্যাচার সে বন্ধ করবেই।

যারা দিশি সেপাই তারা নৌকো করে অনেক দূরে চলে যায়। গিয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলে, মেলামেশা করে। তাদের মনের কথাগুলো জানবার চেষ্টা করে। তারা কি ফিরিঙ্গিদের চায়, না নবাবকে চায়! গাঁয়ের লোকের বাড়িতে গিয়ে হুঁকো নিয়ে তামাক খেতে খেতে গল্প করে।

গাঁয়ের লোকেরা বলে—আমরা হলুম উলুখড় গো, সেপাই মশাই, আমাদের কাছে ফিরিঙ্গিরাও যা, ও নবাবও তাই—

সেপাইরা বলে—তা এই যে তোমরা উপোস করছো, নবাব তোমাদের খেতে দিচ্ছে, নবাব তোমাদের কথা ভাবছে? নবাব তো মতিঝিলের ভেতর বসে বসে ফূর্তি করছে বেগমদের নিয়ে—

—তা ফিরিঙ্গিরাও পয়সা হলেই ফূর্তি করবে। পয়সা হবার পর কে আর গরীব-গুর্বোদের কথা ভাবে বলো? আমরা বড়-লোক হলে আমরাই কি আর তা ভাববো?

সেপাইরা তবু বোঝায়।

বলে—এই আমাদেরই দেখ না, ফিরিঙ্গিদের পল্টনে নাম লেখাবার আগে আমরাও তোমাদের মত ভাবতুম, তারপর এখন দলে ঢুকে দেখছি অন্য-রকম—

—কী রকম দেখছো শুনি?

—আরে, এ তোমাদের নবাবের পল্টনের মতন নয়। এখানে এরা ভাল খেতে-পরতে দেয়, ভাল করে কথা বলে, ভাল মাইনে দেয়। দেখছো না, খেয়ে-দেয়ে কী রকম খোশ খাশী হয়েছি—

এই রকম করে ঘুরে ঘুরে দেখে এসে সবাই রিপোর্ট দেয় রবার্ট ক্লাইভকে। ক্লাইভ সব মন দিয়ে শোনে।

জিজ্ঞেস করে—সবাই অ্যাণ্টি-নবাব, সবাই নবাবের বিরুদ্ধে?

—হ্যাঁ হুজুর, সবাই চায় ফিরিঙ্গিরা ফিরে আসুক। সবাই সেপাইএর দলে নাম লেখাতে চায়!

—কেন চায়?

—চায় এই জন্যে যে এখানে নাম লেখালে তাদের ভাল হবে। তারা পেট ভরে খেতে পাবে!

—এখন খেতে পায় না?

—এখন খেতে পাবে কী করে হুজুর, নবাব মারে জমিদারদের, জমিদার মারে প্রজাদের। কারোর ঘরে ফসল উঠতে দেখলে ডিহিদারের নজর পড়ে, তারপর হুজুর মুসলমান প্রজা হলে সাত খুন মাফ, আর হিন্দুর হলে তার আর রক্ষে নেই।

অ্যাডমিরাল ওয়াটসন আর রবার্ট ক্লাইভ দুজনেই মন দিয়ে সব কথা শোনে। ওয়াটসন যুদ্ধ করতে এসেছে, এত কথা

শ্লুনে কী লাভ বুঝতে পারে না। জিজ্ঞেস করে—এ-সব কথা নিয়ে আমাদের কী দরকার, নবাবের ফৌজ কোথায় সেই সব খবর জানলেই তো যথেষ্ট!

কিন্তু কর্নেল ক্লাইভ বলে—না—

সত্যিই, ছেলেটা সেই যুগেই বুঝে নিয়েছিল যে লড়াই করতে গেলে শুধু ফৌজ-এর খবর নিলেই চলবে না। সেখানকার মানুষের মতিগতির খবরও রাখতে হবে। সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের খবরও নিতে হবে।

কর্নেল ক্লাইভ জাহাজের ওপরে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে দেশটাকে দেখে। শীতকালের দিনের বেলায় বেশ আরাম দেয় রোদটা। বরফের দেশের লোক গায়ের জামা খুলে রোদ পোয়ায়। রাত্রে আবার কন্-কনে শীতের ঠান্ডা। জাহাজ থেকে নেমে হেঁটে গিয়ে গাঁয়ের মধ্যে চলে যায়। ফিরিঙ্গি দেখে ছেলে-বুড়ো সবাই পালায়। তবু সাহেব হতাশ হয় না। লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে। অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন্ সাবধান করে দিয়েছিল—খুব কেয়ারফুল রবার্ট, ওরা সাউথ-ইন্ডিয়ান নয়, ওরা বেঙ্গলী, ওরা ভেরি ডেঞ্জারাস—

—ভেরি ডেঞ্জারাস মানে?

—মানে, ওরা ভেরি [illegible]! ওরা লায়ার, আন্‌ফেথফুল—

ক্লাইভ বললে—কিন্তু ডেঞ্জারাস হোক্ আর আন্‌ফেথফুলই হোক, ওদের নিয়েই আমাকে চলতে হবে, ওদেরই তো কান্ট্রি এটা, আমরা তো ফরেনার—।

তারপর বললে—না অ্যাড্‌মিরাল, আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে, আই লাইক দেম্—

—কী রকম, তুমি কি ওদের সঙ্গে মেশো নাকি? ওরা যে ভয়ানক পাজি!

ক্লাইভ বলে—তা আমাদের কান্ট্রির লোকেরাই কি কম পাজি! আমাদের কান্ট্রির লোকরাই কি আমার সঙ্গে কম ডিজ-অনেস্টি করেছে? আমাকে কি তারা কম হেট্ করেছে? তা না হলে সাধ করে কি আমি আবার পালিয়ে এসেছি ইন্ডিয়াতে?

কথা বলতে বলতে কর্নেল ক্লাইভ নিজেকে আবার হঠাৎ সামলে নেয়। বেশি বললে আবার ওরা অন্য রকম ভাববে। ইন্ডিয়ায় সার্ভিস করতে এসে নিজের অফিসারকে আর চটাবে না আগেকার মত! সবাই সেল্‌ফিস্! সবাই ডেঞ্জারাস। এক সঙ্গে এক জাহাজে যাদের সঙ্গে খায়-দায় ঘুমোয় তাদেরও যেন হেট্ করতে ইচ্ছে করে ক্লাইভের। [illegible] ক্লাইভ এত [illegible] করলো তারা তার কী [illegible]! আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে [illegible] তন্দ্রা আসে, আর চোখ দুটো বুজে আসে। স্বপ্ন দেখে ইংলন্ডের লোকেরা তার গলায় ফুলের গারল্যান্ড্ পরিয়ে দিয়েছে, তাকে পার্লামেন্টের মেম্বর করে নিয়েছে। স্বপ্ন দেখে ইংলন্ডের লোকেরা বলছে—হিয়ার ইজ এ হিরো, হিয়ার ইজ্ এ কম্যান্ডার—

কিন্তু স্বপ্নটা ভেঙে গেলেই আবার যে-কে-সেই। নিজের কান্ট্রির ওপর আবার ঘেন্না হয়। তার চেয়ে এরা অনেক ভালো। এই ইন্ডিয়ানরা। এরা ভয়ে ভালো করে কথা বলে না বটে, কিন্তু ইংলন্ডের লোকদের মত নয়। বড় সরল, বড় বোকা। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বললেও, মনের কথা চেপে রাখতে পারে না ওরা। সব বলে দেয়। বলে —আপনারা হুজুর বড় ভালো লোক—আপনারা হুজুর আমাদের সঙ্গে বেশ ভালো করে কথা বলেন—

ক্লাইভ জিজ্ঞেস করে—কেন, নবাবের লোকরা ভালো করে কথা বলে না?

—না হুজুর, তবে আর আমাদের দুঃখটা কীসের? তারা আমাদের কাফের বলে। আমাদের কল্‌মা পড়িয়ে মুসলমান

করতে চায়। আপনারা যদ্দিন কলকাতায় ছিলেন তদ্দিন লোকে কত সুখ্যাত্ করেছে আপনাদের! আপনারা চলে যাবার পর আবার সেখানে যে-কে-সেই!

—তোমরা কি চাও আমরা আবার আসি?

লোকরা বলে—নবাবের সঙ্গে আপনারা পারবেন কী করে? আপনাদের কী আর অত ফৌজ আছে?

—সে তোমাদের ভাবতে হবে না, বেশি ফৌজ থাকলেই লড়াইতে জেতা যায় না, তোমরা যদি আমাদের দিকে থাকো তাহলেই আমরা জিতবো—

লোকগুলো বেশ ঘরোয়া হয়ে গিয়েছিল ক'দিনেই। ক্লাইভকে খেজুর-রস খাওয়াতো, আশ্‌কে পিঠেপুলি খাওয়াতো। ক'দিনেই বেশ জমিয়ে নিয়েছিল গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে। শেষকালে ঠিক যাবার আগের দিনই ওই কাণ্ডটা ঘটলো। বেশ মুশকিলে পড়লো ক্লাইভ সাহেব। দুজন লেডী। তাদের নিয়ে কী করবে!

—তা এদের এখোনে ধরে নিয়ে এলি কী জন্যে? হোয়াই?

সেপাইদেরও দোষ নেই। এ-রকম তারা করে থাকে বরাবর। নবাবের ফৌজি-সেপাইরা মেয়েছেলে পেলে ধরে নিয়ে এসে মীর-বক্সীকে উপহার দেয়। এইসব দিয়েই তো চাকরিতে উন্নতি হয়। এই-ই তো রেওয়াজ!

অ্যাড্‌মিরাল ওয়াটসন বললে—এই নিগার মেয়েদের নিয়ে এখন কী করবে তুমি?

ক্লাইভ বললে—কিন্তু এদের কার কাছে ছেড়ে দেব?

ওয়াটসন বললে—সেই কথা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবে নাকি তুমি?

—কিন্তু এদের কে দেখবে? চেহারা দেখে মনে হয় খুব রেসপেক্টবল্‌-ফ্যামিলির ওয়াইফ। আর ওটা তার মেড্‌-সারভেণ্ট। দেখি, আমি ওদের কী করতে পারি—

বলে সেই রাত্রেই ক্লাইভ লেডী-দুজনের কাছে গেল। লেডী দুজন তখন শীতে কাঁপছে। সঙ্গে সেই সেপাইটাও রয়েছে। সে বাঙলা কথা বুঝিয়ে দিতে পারবে।

সেই যে-রাত্রে ধরে এনেছে, তখন থেকে ছোট-বউরানী দুর্গার কোল ঘেঁষে বসে আছে। একে গঙ্গায় ঠাণ্ডা হাওয়া তার ওপর ফিরিঙ্গিদের জাহাজ। ম্লেচ্ছ। জীবনে কখনও দুর্গা এমন কাণ্ডর মধ্যে পড়েনি। ছোট বউরানীও না। সেপাই হরিচরণ বার বার বুঝিয়েছে—তোমাদের কিছু ভয় নেই গো, আমাদের কর্ণেল সাহেব খুব ভালো লোক—

দুর্গা বলেছে—তুমি তো বলছো বাছা, কিন্তু ওরা তো ম্লেচ্ছ, গরু খায়, ওরা কী করে ভাল লোক হবে?

হরিচরণ বলেছে—গরু খেলেই কি আর

অরূপ লোক হয়, দেখবে তোমাদের কোনও ক্ষেতি হবে না—

দুর্গা বলেছে—দেখো বাপু, তোমাদের সাহেব আমাদের যেন ছুঁয়ে দেয় না, তাহলে আমাদের জাত যাবে—

কিন্তু সাহেব এল তখন দুর্গা একগলা ঘোমটা দিয়ে দিলে। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে যতটা দেখা যায় চেয়ে দেখলে সাহেবের মুখের দিকে। লাল টকটকে মুখখানা। মুখময় যেন ঘামাচি ভর্তি। দেখে দুর্গা যে দুর্গা তারও বুকটা ঢিপ্-ঢিপ্ করে উঠলো।

সাহেব বললে—আমার সেপাইরা তোমাদের ভুল করে ধরে এনেছে, ভেবেছে ফ্রেণ্ড-বোট—তা তোমরা কোথায় যাবে বলো, আমি তোমাদের সেখানেই পাঠিয়ে দিচ্ছি—বলো কোথায় যাবে?

দুর্গা বললে—আমরা কাশীধামে যাচ্ছিলাম, সেখানেই যাবো—

—কাশী? কাশীধাম? সে কোথায়?

হরিচরণ বললে—সে উত্তরে, সে অনেক দূরে হুজুর, ছ'মাসের পথ—

সাহেব বললে—কিন্তু অত দূরে তোমরা দু'জন লেডী যাবেই বা কী করে? তোমাদের সঙ্গে কেউ নেই?

দুর্গা বললে—আমাদের সঙ্গে তো আমাদের বিশ্বাসী পাহারাদার ছিল, তার কাছে বন্দুক ছিল—সে তো গুলী খেয়ে মরে গেছে, আর মাঝিরা কোথায় গেছে জানি না—

সাহেব বললে—মাঝিদের আমরা ধরে রেখেছি, পাছে তারা ভয় পেয়ে তোমাদের ছেড়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু সঙ্গে তোমাদের নিজেদের কোনও পুরুষ নেই? এই লেডীর হ্যাজব্যান্ড্ কোথায়?

হরিচরণ সব বুঝিয়ে দিলে সাহেবকে। দুর্গার কাছে সবই শুনে নিয়েছিল সে। মহিলাটির হ্যাজ্ব্যান্ড্ হুজুর পাগলাটে মানুষ। বিয়ে হবার পর থেকেই সে নিরুদ্দেশ। সে হলো পোয়েট। বাঙলা দেশে তো জাত-কুল মিলিয়ে বিয়ে দিতে হয়, তাই ওই রকম পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল এঁর। ইনি বড় দুঃখী সাহেব, এরা বাবা বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় নেবার জন্যে যাচ্ছিল, হঠাৎ পথের মধ্যে এই বিপদ!

হরিচরণ দুর্গার দিকে ফিরে বললে—তা তোমরা কোথায় যাবে ঠিক করো আগে, সেই রকম ব্যবস্থা করে দেবে—তবে সাহেব কাশীধামে পৌঁছিয়ে তো দিতে পারবে না। যদি নিজের দেশে ফিরে যেতে চাও তো বলো—

সাহেবও বললে—আমাদের নিজেদেরই তো এখানে দাঁড়াবার জায়গা নেই, আগে ছিল, এখন নবাবের সঙ্গে ওয়ার চলছে—এ-অবস্থায় আমরাই বা তোমাদের কতটুকু সাহায্য করতে পারি—

তা বটে! দুর্গাই বা কী বলবে! সব কথা কি খুলে বলা যায় সবাইকে!

সাহেব বললে—তাহলে তোমরা এখন ভাবো—ভেবে বলো—

বলে সাহেব চলে গেল। হরিচরণকে ওদের দেখা-শোনা-খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললে। অ্যাড্মিরাল ওয়াটসন পাশের জাহাজে ছিল। সেখানে যেতেই অ্যাড্মিরাল জিজ্ঞেস করলে—তুমি কী ঠিক করলে রবার্ট?

ক্লাইভ বললে—ওদের বলে এসেছি ভাবতে, ভেবে যা ঠিক করে তাই হবে—

অ্যাড্মিরাল রেগে গেল—আমি ওদের কথা বলছি না, লেট দেম গো টু হেল—

এখন এগিয়ে যাবে, না এখানেই ক্যাম্প থেকে ওয়াচ করবে—

ক্লাইভ বললে—জাহাজ নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ভাল—লেট্ আস্ গো নিয়ারার—

ওয়াটসন বললে—না, জাহাজ নয়, হাঁটা-পথে গিয়ে ওদের অ্যাটাক্ করা ভালো—

খানিক তর্ক হলো। কিন্তু অ্যাডমিরাল ওয়াটসন চাকরিতে বড়, সুতরাং তার কথায় সায় দিতে হলো। হাঁটা-পথেই যাবে ইংরেজ-ফৌজ। দশ মাইল রাস্তা। সেপাইরা পথের নিশানা জানে। তারাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। শীতকাল, রাস্তায় কাদা নেই, যেতে কষ্টও হবে না কারো।

ছোট বউরানী ভোরবেলা ডাকলে—দুগ্যা—

—কী বউরানী?

—তুই বললি না কেন আমরা কেষ্টনগরে যাবো, তাহলে এখানে আর এমন করে পড়ে থাকতে হতো না—

দুগ্যা বললে—হাঁ কেষ্টনগরের কথা বলি আর সব জানাজানি হয়ে যাক, তখন?

কিন্তু আমার যে বড় ভয় করছে!

—ভয় কীসের সাহেবকে? দূর, সাহেব এমনিতেই জব্দ হয়ে গেছে।

—কীসে জব্দ হলো?

—তোমাকে দেখে!

—তোর মরণ। ফের যদি ও-কথা বলবি তো আমি এই গঙ্গায় ঝাঁপ দেব বলে রাখছি!

সাহেব কিন্তু সত্যিই ভালো। মাঝে-মাঝে হরিচরণকে দিয়ে খবর নেয়। নিজেও আসে। কোনও কষ্ট হচ্ছে কি না, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে কি না এই সব। পল্টনের দল হেঁটে হেঁটে চলেছে, আর জাহাজগুলো চলেছে গঙ্গার ওপর দিয়ে।

কিন্তু সেদিন সাহেবও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জাহাজ দাঁড়িয়ে ছিল গঙ্গায় নোঙর বেঁধে, হঠাৎ খবর এল মানিকচাঁদ দু'হাজার ফুট-সোলজার আর দেড়-হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে আগেই কখন বজ্-বজে এসে হাজির হয়েছে টের পায়নি কেউ। হঠাৎ দুম-দাম শব্দ পেয়েই দুর্গার ঘুম ভেঙে গেছে। ছোটবউরানীও উঠে বসেছে। উঠে বসে জিজ্ঞেস করলে—ও কীসের শব্দ রে দুগ্যা?

বাইরে ডাঙায় তখন হট্টগোল। সেদিকে উঁকি মেরে দেখে দুর্গা বললে—হরিচরণকে ডাকি—

হরিচরণকে আর ডাকতে হলো না। তার আগেই সাহেব এসে হাজির। একেবারে হাঁফাচ্ছেন। পেছনে-পেছনে হরিচরণ।

এসেই বললে—লেডীজ্, আমাদের বড় বিপদ হয়েছে, জানি না আমাদের কপালে কী আছে, তোমরা যদি কোথাও যেতে চাও, এই হরিচরণ তোমাদের বোটে করে নিয়ে যাবে। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। উইশ্ ইউ গুড বাই—

তখন আর ভাববারও সময় নেই ক্লাইভ সাহেবের। মাত্র এই ক'টা সোলজার নিয়ে মানিকচাঁদের সঙ্গে লড়াই করা মানেই তো মারা যাওয়া।

ওদিক থেকে ওয়াটসন চিৎকার করছে—রবার্ট, রবার্ট—

আর দাঁড়াতে পারলে না সাহেব। দুর্গা হঠাৎ উঠলো। উঠে সাহেবের কাছ থেকে এক হাত দূরে হঠাৎ মাথাটা মেঝের ওপর ঠেকিয়ে গড় করলে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—তোমার ভাল হবে সাহেব, তোমার কথা আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে—

নৌকো ছেড়ে [illegible]। হরিচরণও উঠলো। মাঝিরা তৈরি ছিল। [illegible]দিকে অত দেখবার সময় নেই ক্লাইভের। [illegible] কিলপ্যাট্রিক, অ্যাডমিরাল ওয়াটসন, [illegible] আর এক লড়াইএর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

দূরে থেকে তখনও কামানের শব্দ আসছে। ছোটবউরানী বললে—কিরিঙ্গিটা ভালো লোক, না দুগ্যা, আমাদের তো কিছু করলে না—

দুর্গা বললে—করবে কী করে, আমি যে তার আগেই উচাটন করে দিয়েছিলাম, দেখলে না আমি সামনে গড় হয়ে পেন্নাম করলাম, তার মানেটা কী?

শ্রীনাথ তখন প্রাণপণে বৈঠা বয়ে চলেছে।

হরিচরণ ফিরিঙ্গি কোম্পানীর সেপাই। সেপাই হলেও ক্লাইভ সাহেব তাকে এই কাজের ভার দিয়েছে। যে-কোনও নিরাপদ জায়গায় এদের পৌঁছে দিয়ে আবার যেমন করে হোক ফৌজের দলে ফিরে যেতে হবে।

কিন্তু তখনও হরিচরণ জানে না দুর্গাই জানে যে তাদের জন্যে আরো এক নতুন বিপদ অপেক্ষা করে আছে।

বজবজের ওপারে আলিগড়, আর ওদিকে মকওয়া। দুটো জায়গাতেই দুটো মাটির কেল্লা রয়েছে। নবাবের বজবজের কেল্লার ভেতর থেকে রাজা মানিকচাঁদের সেপাইরা গোলা ছুঁড়ছে। বড় বড় কামানের গোলা এসে পড়তে লাগলো গোরা পল্টনদের সামনে।

কর্নেল ক্লাইভের মাথায় তখন বজ্রাঘাত। আর পেছুনো চলে না। অর্ডার দিলে—ফরওয়ার্ড মার্চ—

শ্রীনাথ তখন প্রাণপণে বৈঠা বেয়ে চলেছে। হরিচরণ বললে—আরো জোরে চালাও ছিরনাথ—ফিরিঙ্গিদের আর ভরসা নেই, রাজা মানিকচাঁদ এবার আর ছেড়ে কথা বলবে না, এবার পালাবে এ তল্লাট ছেড়ে—

লোকেটা যেন ভীমের মত সোঁ সোঁ করে এগিয়ে চললো।

সারাফাত আলি যথারীতি দোকানে বসে মৌতাতে ঝিমোচ্ছিল। এই ঝিমুনিটাই তার বড় আরামের জিনিস। এই আরামটার জন্যেই সে আগরবাতি জ্বালায়, গড়গড়ায় তামাকের ধোঁয়া টানে। এই আরামের মধ্যেই মনে মনে সে অনেক মতলোব আঁটে। তার মনে হয় একদিন চেহেল-সুতুন গুঁড়ো হয়ে মাটিতে মিশিয়ে ধুলো হয়ে যাবে। হাজী আহম্মদের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এ মসনদ চিরকাল এমনি চলবে না। ভাইতে ভাইতে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এবার শওকত জঙ্ আসছে নবাব হয়ে। শওকত জঙকেও আবার যেতে হবে। তারপর ফিরিঙ্গিরা আসবে, ফিরিঙ্গিরাও যাবে। এমনি করেই দুনিয়াদারি চলবে ইন্তেকাল পর্যন্ত। এই-ই দুনিয়া। কিন্তু তবু সারাফত আলির মনে হয় চোখের সামনে সব ঘটনাটা না দেখতে পারলে যেন তৃপ্তি নেই।

হঠাৎ সামনে একটা তাঞ্জাম এসে দাঁড়াতেই যেন সারাফাত আলির নেশাটা জমে উঠলো।

—কৌন্?

না, খদ্দের নয়, খোজা। বরকত আলি।

—হুজুর কান্তবাবু এই খুলিতে থাকে।

—থাকে। কেন?

—ওমরাহ্ সফিউল্লা খাঁ সাহেব একবার মুলাকাৎ করতে চান।

কান্তবাবু কি আবার আমীর-ওমরাহ্-দের সঙ্গে দোস্তালি লাগিয়েছে।

—কী জরুরৎ?

—তা জানিনা মিয়াসায়েব, খাঁ সাহেব তাঞ্জামের অন্দরে বসে আছেন, কান্তবাবুর সঙ্গে বাত্-চিত্ আছে—

এই সফিউল্লা, ইয়ারজান, মেহেদী নেসার একদিন এই চক্-বাজারের রাস্তায়-রাস্তায় বেত্‌মিজি করে বেড়িয়েছে। জেনানাদের বোরখা উঠিয়ে মুখ দেখেছে, গঙ্গায় চান করতে করতে আওরতদের দেখে শিষ দিয়ে খোয়ার করেছে। আর এখন আবার তাঞ্জাম না হলে এক পা নড়তে পারে না। ইজ্জৎদার আদমি হয়ে গেছে। তাজ্জব দুনিয়া।

সারাফাত আলি সেইখানে বসেই চেঁচিয়ে উঠলো—কী, সফিউল্লা সাহাব, মিয়া-সাহেবকে আর যে পছন্দতে পারেন না দেখছি! আমি খুশবু তেলওয়ালা সারাফাত আলি। বহুত বহুত বন্দেগী জনাব—

বরকত আলি একটু ভড়কে গেল।

সারাফাত আলি তখনও বলে চলেছে—তাঞ্জামটা সামনে নিয়ে আসুন না সফিউল্লা সাহেব, আমাকে অত ডর কেন?

বরকত আলি তাঞ্জামের কাছে গেল। মুখ নিচু করে বললে—মিয়াসায়েব বাত্ করছে আপনার সঙ্গে—

মরালী বললে—জিজ্ঞেস করো, কান্তবাবু কুঠিতে আছে কি না—

সারাফাত আলি সাহেব তখনও চেঁচাচ্ছে। বহুদিন পরে সফিউল্লার সঙ্গে দেখা, এমন সুযোগ ছাড়া যায় না যাদের এককালে কুকুর-বেড়ালের মত মনে করেছে সারাফাত আলি, তারাই আজ মুর্শিদাবাদের মসনদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। তারাই এখন আট বেহারার তাঞ্জামে চড়ে চক্-বাজারের রাস্তা দিয়ে বুক ফুলিয়ে চলছে।

—সে-সব দিনের কথা বেবাক ভুলে গেলে খাঁ-সাহেব! আজকে মীর্জা মহম্মদের পা চেটে চেটে বুড়ো মিয়াসাহেবকেও ইয়াদ রাখলে না। নিমক-হারামের বাচ্চা যত...

নেশার ঝোঁকে মিয়াসাহেব যা-নয়-তাই বলে সফিউল্লা খাঁ সাহেবকে নাগাড়ে গালা-গালি দিয়ে যেতে লাগলো। চক্-বাজারের রাস্তার কিছু লোক জড়ো হয়ে গেল খুশবু-তেলের দোকানের সামনে। বাদ্‌শাও এসে দাঁড়াল ভেতরে। বরকত আলি দেখলে এ এক মহাবিপদ সুরু হয়ে গেল।

মিয়াসাহেব বললে—কোথায় যাচ্ছিস তুই? দাঁড়া এখানে। তুই তো নবাবের নোকরি করিস, সফিউল্লা সাহেব তোর কোন? তুই সফিউল্লা খাঁর পা চাটিস কেন? সফিউল্লা তোকে তলব দেয়?

বুড়ো যেন হঠাৎ অনেক দিন পরে একেবারে হাজি আহম্মদকে সামনে পেয়েছে হাতের কাছে। হাতের কাছে পেয়ে তার বিবি চুরির বদলা নিচ্ছে।

মরালী তাঞ্জামের মধ্যে তখন থর-থর করে কাঁপছিল। কী করতে গিয়ে কী হয়ে গেল। চক্-বাজার থেকে পালাতে পারলেই যেন বাঁচে সে। চেহেল-সুতুনের ভেতরেই যেন তার নিশ্চিন্ত আশ্রয়। অথচ বরকত আলি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে আর গালা-গালিগুলো শুনছে।

ততক্ষণে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে। চক্-বাজার সুদ্ধু সব লোক এসে ভেঙে পড়েছে দোকানের সামনে। বুড়োকে সবাই

নিরীহ মানুষ, নেশাখোর মানুষ বলে জানে, সে হঠাৎ কেন চিল্লাচিল্লি করছে তা বুঝতে পারলে না।

কিন্তু ওদিকে আর এক কান্ড হলো। ওদিক থেকে আর একটা আট-বেহারার তাঞ্জাম আসছিল। সেটা এই ভিড়ের সামনে এসেই হঠাৎ থেমে গেল।

—কৌন্ ?

তাঞ্জামের দরজার পাল্লা দুটো খোলাই ছিল। তার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বেরিয়ে এল নবাব মীর্জা মহম্মদের ইয়ার ওমরাহ সফিউল্লা খাঁ।

সবাই তাজ্জব হয়ে গেছে। এ কোন সফিউল্লা সাহেব!

—আরে মিয়াসাহেব, এত গালাগাল দিচ্ছ কোন্ বেল্লিককে ?

—আরে তুম, সফিউল্লা সাহেব ?

বুড়ো সারাফাত আলিও যেন এতক্ষণে চমকে উঠেছে। তাহলে এতক্ষণ কোন্ সফিউল্লাকে গালাগাল দিচ্ছিল সে ? তারপর বরকত আলিকে দেখে বললে—এই, তোর তাঞ্জামের মধ্যে কোন্ সফিউল্লা ? অ্যাঁ ?

সফিউল্লা সাহেব তখন নিজেই মরালীর তাঞ্জামের দরজাটা হাট করে খুলে দিয়েছে।

—আরে, তুম কোন্ হো ?

মরালীর সমস্ত শরীরই কাঁপছিল। এবার কান দুটোও ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো! কেন যে বরকত আলি সফিউল্লা খাঁ সাহেবের নাম করতে গিয়েছিল, আর কে যে সফিউল্লা সাহেব, তাও সে জানে না। মাথার ওপর যেন বাজ ভেঙে পড়লো তার।

ততক্ষণে মরালীর হাত ধরে টান দিয়েছে সফিউল্লা সাহেব। একেবারে নরম তুল-তুলে হাত। কী যেন সন্দেহ হতেই সফিউল্লা সাহেব মুখ নিচু করে তাঞ্জামের ভেতরে উঁকি দিয়েছে। আশে-পাশের ভিড়ের মধ্যে থেকেও অনেকে উঁকি মেরে দেখলে। ভারি কাচা মুখখানা।

বরকত আলি হাঁ হাঁ করে বাধা দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওমরাহ্ সফিউল্লাকে বাধা দেবার সাহস নেই খোজা বরকত আলির। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে মরালী চীৎকার করে উঠেছে--ছাড়ো হাত ছাড়ো—

প্রথমটায় সফিউল্লা একটু থত মত খেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মুর্শিদাবাদের ফুর্তির স্বাদ একবার পেয়ে যার হাড় পেকে গেছে সে অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়।

জিজ্ঞেস করলে—কে, এ কৌন, বরকত আলি ? কোন্ সফিউল্লা?

বরকত আলি তখন বোবা! পাথরের মত সে ঠায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার নোকরি তো এবার যাবেই কিন্তু কোতল্ থেকে রেহাই পাবে কি না তাই-ই তখন সে ভাবছে।
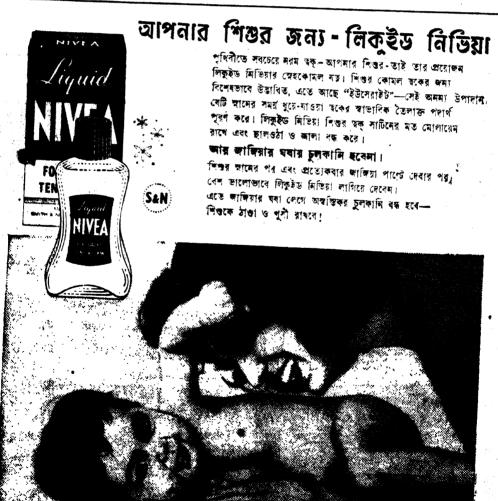
সফিউল্লা সাহেব আবার হাত ধরতে যেতেই মরালী এক চড় মেরেছে সফিউল্লা সাহেবের গালে।

আর যাবে কোথায়। সফিউল্লা সাহেব চিৎকার করে উঠেছে—কোতোয়াল!

মরালীর মনে আছে সে-সব দিনের কথা। সমস্ত মুর্শিদাবাদ যেন একেবারে আন্‌চান্‌ করে উঠেছিল। এত বড় দুঃসাহসের কথা তখন কেউ ভাবতেই পারেনি। কল্পনা করতেও ভয় পেয়েছিল। নানীবেগম পাগলের মত ছুটে এসেছিল মতিঝিলে। বলেছিল—এ কী করলি মা তুই, এমন করে নিজের সর্বনাশ কেন করতে গেলি?

কিন্তু মরালীই কি জানতো এমন হবে!

সফিউল্লা সাহেব গালে চড় খেয়ে চুপ করে থাকবার মানুষ নয়। একেবারে হিড়-হিড় করে টেনে বার করলে মরালীকে। আর টানাটানিতে তার মাথার ঘোমটা খসে পড়ে গেল। আর সবাই দেখলে একজন জেনানা, একেবারে খাস বেগম-মহলের জেনানা।

সফিউল্লা খাঁ সাহেব আর দেরি করেনি।

একবার শুধু বরকত আলিকে জিজ্ঞেস করেছিল—এ কে? এ কোন্‌ বেগম?

কিন্তু বরকত আলিরও তো গর্দানের ভয় আছে! বরকত আলিরও তো জানের ভয় আছে! সে বোবার মত দাঁড়িয়ে থেকে তারপর কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, আর দেখতে পাওয়া যায়নি তাকে। তারপর সারাফত আলির চোখের সামনে দিয়ে, চক্‌-বাজারের হাজার হাজার মানুষের সামনে দিয়ে সফিউল্লা সাহেব একেবারে মরালীকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল মতিঝিলে। মতিঝিলের ফটক বন্ধ করে দিয়েছিল পাহারাদার। তারপর মতিঝিলের একটা ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে সফিউল্লা সাহেব চিৎকার করে উঠেছিল—তুমি কে? তুম্‌ কোন্‌?

সে-ঘটনার কথাও মনে আছে মরালীর। মরালী তখনও হাঁসফাস করছে।

বললে—আমাকে ছেড়ে দাও—

সরাবখানার ভেতরে বসে ইব্রাহিম খাঁ সব দেখেছিল। মরালীকে দেখেই চম্‌কে উঠেছে আবার। আবার মুখপুড়ী এখানে এসেছে সফিউল্লা খাঁ সাহেবের সঙ্গে। মুখপুড়ী চরিত্রটা একেবারে খারাপ করে ফেলেছে গো! ছি ছি ছি!

ইতিহাসের আর একটা শিক্ষা এই যে যে-জাত একবার ক্ষয় হবার মত হয়, তখন তার সব দিক দিয়ে সর্বাঙ্গে ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আলীবর্দী খাঁর মসনদ ছিল ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের মসনদ। মানুষের মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করার মসনদ। শুধু তো জয় দিয়ে ইতিহাসের বিচার হয় না, তার পরাজয়ও ইতিহাসের মানদণ্ডে বিচার করে দেখতে হয়। মসনদ যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখনও তার পরীক্ষা, যখন পতন হয়, তখনও তাই। তাই শান্তির সময়ের হালচাল দেখে পতনের সময়ে চম্‌কে উঠতে নেই। পতনের বীজ লুকিয়ে থাকে শান্তির মধ্যে। সে-পতনের বীজ পুঁতে গিয়েছিলেন আলীবর্দী খাঁ নিজেই। নবাব মীর্জা মহম্মদ সিরাজ-উ-দ্দৌলা শুধু তার অসহায় উত্তরাধিকারী।

সেদিন মতিঝিলের মধ্যে নবাব সুজা-উদ্দীনের আত্মাও বোধহয় চম্‌কে উঠেছিল তাঁর নিজের মূর্তি দেখে। সফিউল্লা যেন তাঁরই প্রতিচ্ছায়া, তাঁরই মানস-শয়তান। শুধু সুজাউদ্দিনই নয়। সরফরাজ আলী-বর্দী সবাই যেন নিজেদের প্রতিমূর্তি দেখে একসঙ্গে তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। আর শুধুই কি সরফরাজ, আলীবর্দী খাঁ? হোসেনকুলী খাঁ, করিম খাঁ, ভাস্কর পণ্ডিত যারা এতদিন ঘুমিয়ে ছিল বিস্মৃতির অন্তরালে, তারাও হঠাৎ জেগে উঠে বলে উঠলো—সাবাস—সাবাস—

মতিঝিলের খেদ্‌মদগাররাও জানতে পারেনি ইতিহাসের প্রতিশোধ তখনও বোঝা-কড়া পূর্ণ হতে কতখানি বাকি আছে। মরালীও জানতে পারেনি সেদিন তার অতখানি দুঃসাহস কে অমন করে যুগিয়ে দিয়েছিল! কারা! কারাই বা তারা। সেদিন সে তার অতীত ভাবেনি, বর্তমান ভাবেনি, ভবিষ্যৎও ভাবেনি। ভাবেনি কী তার প্রতি-ফল, কতখানি তার শাস্তি, কেমন তার প্রতিক্রিয়া। সাধারণ গ্রামের একটা মেয়ে সে। নিয়তির অমোঘ চক্রে সে এসে পড়েছিল বাঙলার ইতিহাসের এক বিষণ্ণ সন্ধিক্ষণে। সে জানতে পারেনি, তাকে উপলক্ষ্য করেই ইতিহাসের গতি একদিন নতুন করে মোড় ঘুরবে।

সফিউল্লা সাহেব তখন মতিঝিলের একটা ঘরের মেঝের ওপর অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। শ্বেতপাথরের ঠাণ্ডার ওপরেও সফিউল্লা সাহেবের গরম রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে উঠতে জানে না। শীতকালের ঠাণ্ডাতেও টগ-বগ্‌ করে ফুটছে সে-রক্ত। সফিউল্লা সাহেবের ঠাণ্ডা দেহটার পাশে টগ-বগে গরম রক্ত গড় গড় করে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে নর্দমার দিকে।

আমাকে অপমান? আমার ইজ্জৎ কি তোমার মা-বোনের ইজ্জতের চেয়ে কোনও অংশে ছোট? আমি কি তোমার রক্তের হকদার? মানুষের সম্মানের দাম কি রাস্তার ধুলো? যদি রাস্তার ধুলোই হয় তো সেই রাস্তার ধুলোতেই তোমার ঠাঁই হোক!

সঙ্গে সঙ্গে মতিঝিলের খেদ্‌মদগাররাও বোধ হয় গন্ধ পেয়েছিল। বাইরে থেকে নেয়ামত দরজা ঠেলছে। কেওয়াড়ী খোল, কেওয়াড়ী খোল, কেওয়াড়ী খোল—

কেওয়াড়ীর তলার ফাঁক দিয়ে সফিউল্লা সাহেবের গরম রক্ত বাইরের বারান্দায় এসে তখন এদিকে-ওদিকে মাথা কুটতে লেগেছে!

তবে কি আরো অনেকের মত মরিয়ম বেগমও খুন হয়ে গেল!

আবার সেই এক চিৎকার এল—কেওয়াড়ী খোল, কেওয়াড়ী খোল, কেওয়াড়ী খোল—

মরালী তখন পাথর হয়ে গেছে। মতি-ঝিলের শ্বেত-পাথরের থামগুলোর মতই নিথর-নিশ্চল নিষ্প্রাণ পাথর।

চেহেল্‌-সতুনের ভেতরের বাগানে তখনও সেই গানটা ভাসছে—যো হোনেকা থী, উও তো হো গয়ী, আব্‌ উসকী ক্যা পরোয়া—

মতিঝিলে যাওয়া হয়নি কান্তর। ইব্রাহিম খাঁর কাছে গিয়েই বা কী লাভ। বশির মিয়া হাতিয়াগড়ে গিয়েছিল। সেখানে কী করছে কে জানে! হয়ত এবার সব জানাজানি হয়ে যাবে। তার আগে যদি মরালী বেরিয়ে আসে তো বেঁচে যাবে!

মহিমপুরের দিক থেকেই ফিরে আসছিল
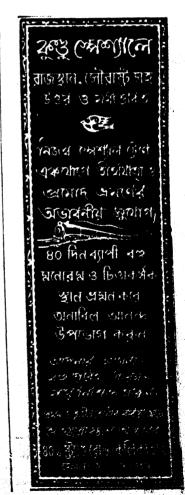
আবার। সব যেন গোলমাল হয়ে গেছে কান্তর। যেভাবে কান্ত জীবন আরম্ভ করেছিল, সে যেন আজ কল্পনা। হয়ত এ-চাকরিও তার থাকবে না বেশিদিন। মেহেদী নেসার সাহেব তার ওপর চটে গেছে, মনসুর আলি মেহের সাহেবও চটে গেছে। এর পর কে তাকে রাখবে! সারাফত আলি সাহেব? কিন্তু সারাফত আলি সাহেবের যে চাকরি সে-চাকরিও কি তার পোষাবে!

—নজর মহম্মদ না?

নজর মহম্মদও দেখতে পেয়েছে তাকে।

—আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম কান্তবাবু! আজকে চেহেল-সুতুনে যাবেন না? নবাব তো ফৌজ নিয়ে পূর্ণিয়ায় লড়াই করতে গেছে।

—মেহেদী নেশার সাহেব?

—মেহেদী নেশার সাহেব ভি গেছে। চলিয়ে।

—আমার কাছে তো এখন মোহর নেই নজর মহম্মদ, চলো সারাফত আলি সাহেবের খুশবু-তেলের দোকানে চলো।

নজর মহম্মদ বললে—সে আমি পরে মোহর নিয়ে নেব, আপনি সে-জন্যে ভাববেন না। আমি মিয়াসাহেবের পুরোন খদ্দের—

অনেক আশা নিয়েই সেদিন কান্ত চেহেল-সুতুনে গিয়েছিল। কিন্তু তখন কি জানতো সেখানে গিয়ে সে আর এক অদৃশ্য-পূর্ব নাটকের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে।

মরালী তার একটু আগেই চলে গেছে। পেশমন বেগম তখন সবে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে। পেশমন বেগম একদিন নাচতে এসেছিল, গান গাইতে এসেছিল। একদিন অনেক আশা নিয়ে দিল্লীর বাদশার দরবারে মা'র সঙ্গে যাতায়াত সুরু করেছিল। সে অনেক দিন আগের কথা। পেশমনের মা বলেছিল—আখের চিনে জিন্দ্‌গীর পথে চলবি মা, নইলে দুনিয়া থেকে একেবারে বরবাদ হয়ে যাবি—

সেই বরবাদই শেষ পর্যন্ত হয়ে গেছে পেশমন বেগম। আজ আর তার ডাক পড়ে না। আজ মতিঝিলের দরবারে গুলসনের ডাক আসে। অথচ একদিন পেশমন না হলে মহ্‌ফিলের আসরই বসতে পারতো না। সে-সব দিন আর নেই। সে-সব দিন আর আসবেও না।

বাইরে থেকে গুলসনের গান ভেসে আসছিল তখনও। গুলসন আজ নিজের ঘরে বসেই সন্ধ্যে থেকে গানের তালিম নিচ্ছে। যো হোনেকা থী, উও তো হো গয়ী, আব্‌ উস্‌কী ক্যা পরোয়া। যা হবার ছিল তা তো হয়েই গেছে, এখন আর তা নিয়ে ভেবে কী লাভ! সমস্ত চেহেল-সুতুনটাই যেন ওই কথা বলে চলেছে। গুলসন্‌ যেন সকলের হয়েই সকলের মনের কথাটা বলে চলেছে। কী হবে এই জীবন রেখে! কী হবে রোজ রাত্তিরে এই সেজে-গুজে, কী হবে এই রূপ-যৌবন-মোহর-প্রশংসা নিয়ে। সবই তো নিরর্থক, সবই তো মিথ্যে! তাই শুধু ফুর্তি করে যাও। যা হবার তা হবেই।

একদিন ছিল যখন নবাব মীর্জা মহম্মদ পেশমনের পায়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দিতে পারলে ধন্য হয়ে যেত। একদিন ছিল যখন মেহেদী নেশার, ইয়ারজান, সফিউল্লা সাহেব পেশমনকে খোসামোদ করে করে গান শুনতে চাইত। একদিন ছিল যখন এই চেহেল-সুতুন পেশমনের সেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকতো। আজ তাকে নিজের ঘরে একলা কাটাতে হচ্ছে। পেশমন বেগমের হাসি পেল সেদিনের কথা ভেবে।

এতক্ষণ বোধ হয় মরিয়ম বেগম চক্‌-বাজারে পৌঁছে গেছে। চুস্ত-পায়জামা, সেরোয়ানী আর তাজ মাথায় দিয়ে নিজের বালমের সঙ্গে দেখা করছে।

একদিন পেশমন বেগমও খোজাদের সঙ্গে নিয়ে তাঞ্জামে করে চক্‌-বাজারে গিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে রাত কাটিয়ে এসেছে। তারপর আজ আর তার কোথাও ডাক পড়ে না। এখন গুলসনের পালা। কিন্তু একদিন গুলসনেরও দিন চলে যাবে। তখন মরিয়ম বেগমের পালা সুরু হবে। এমনি করেই অনাদি অনন্তকাল ধরে চেহেল-সুতুন চলবে, ইতিহাস গড়িয়ে গড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। আর তারপর একদিন পেশমনের মত মরিয়ম বেগমও মুছে যাবে চেহেল-সুতুন থেকে। তখন আবার আসবে নতুন একজন। সেই নতুনকে নিয়েই আবার কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে তখন!

—কে?

হঠাৎ মনে হলো যেন ঘরের বাইরে কার ছায়া নড়ে উঠলো।

—আমি বেগম-সাহেবা, আমি নজর মহম্মদ!

নজর মহম্মদকে দেখেই পেশমন উঠে বসলো। এমন তো হয় না কখনও। নজর মহম্মদ তো এমন সন্ধ্যেবেলা কখনও আসে না তার ঘরে।

—একজন জওয়ান এসেছে বেগম-সাহেবা। খুব খুবসুরত জওয়ান, আপনার ঘরে আনবো?

এমন ঘটনাও যেন অনেকদিন তার জীবনে ঘটেনি। একটু অবাক হয়ে গেল পেশমন।

—আমার ঘরে?

—হ্যাঁ বেগম সাহেবা, সারাফত আলির খুশবু-তেলওয়ালার আদমি। বহুৎ খুব-সুরত!

পেশমন তবু বললে—আমার ঘরে? ঠিক জানিস তুই? অন্য দুসরী কোন বেগম নয়, আমি?

নজর মহম্মদ তাড়াতাড়ি গিয়ে কান্তকে ঘরে ডেকে নিয়ে এসেছে। কান্তও কম অবাক হয়নি। এ কার ঘরে আজ নজর মহম্মদ তাকে নিয়ে এল। এ তো রানীবিবি নয়। এ তো মরিয়ম বেগম নয়। এ তো মরালী নয়। ... (ক্রমশ)

পুনর্দর্শনায় চ
(চেক দেশে এক বছর)

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ৯ ॥

দুপুরের দিকে গৃহিণীকে নিয়ে গিয়েছিলুম য়ালটা হোটেলে খবর নিতে খান্না সায়েব আছেন না গেছেন। গিয়ে শুনলুম তিনি আর নেই, চলে গেছেন ভেনিস্তায়। য়ালটা হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে সে সময় নামছিলেন শাড়ি-পরিহিতা এক নারী। আমাদের দেখতে পেয়ে কেমনভাবে তাকালেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আলাপ করে ফেললুম। বাঙালিনী। তনিমা দেবী। ইয়োরোপের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন বক্তৃতা দিয়েছেন। প্যারিসে যখন ভারতের নারী সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন এদেশের বিজ্ঞান আকাদেমির একজন পাণ্ডা তাঁর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করেন এবং তাঁকে চেকস্লোভাকিয়ায় আসতে নিমন্ত্রণ জানান। তাঁকে একদিন ভারত-ললনা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হবে, এই উদ্দেশ্যে প্রাহায় আসা।

আমরা বললুম—প্রাহা কেমন লাগছে?

—আর বল কেন ভাই? এদের তো দারুণ উৎসাহ আমায় সব কিছু দেখাবে। গাড়ি-টাড়ি সব নিয়ে এসেছিল। আমার এদিকে শরীরের যা অবস্থা! বক্তৃতা দিয়ে আর ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এদের মত কি আর দৌড়-ঝাঁপ করতে পারব আমি? গাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছি। কিছুই দেখিনি। এই হোটেলেই আছি। হোটেলটা বেশ লাগছে।

প্রথম আলাপেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করায় আমাদের সম্পর্কটা সহজ হয়ে গেল। ভরসা পেয়ে বললুম—শরীর খারাপ তো একবার ডাক্তার দেখালেই তো পারতেন।

তনিমা দেবী বললেন—ও বাবাঃ, এসব দেশে ডাক্তারের যা খরচ! লণ্ডনে এক হার্লে স্ট্রীটই তো আমায় ফতুর করে দিয়েছে আমার হাত এখন একেবারে খালি। ডাক্তা দেখাবো একেবারে দেশে গিয়ে।

আমরা বললুম—কিন্তু এ দেশে তো শুনেছি ডাক্তারের ওষুধের কোনো খরচ লাগে না। একবার খোঁজ করে দেখব না কি?

তনিমা দেবী বললেন—তা দেখতে পারো আমি শুধু একবার রক্তের চাপটা দেখিয়ে নিতুম। বেড়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে।

আমরা খোঁজ নিলুম। পলিক্লিনিকে গিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিলুম। যা জানলুম তা হচ্ছে এই। চেক্ দেশের অধিবাসী অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করেন রাষ্ট্র। ডাক্তারের ফী লাগে না ওষুধের দাম লাগে না, ক্লিনিক এবং হাসপাতালের বা অস্ত্র চিকিৎসারও খরচ লাগে না। বিদেশী কেউ এসে যদি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তাঁর চিকিৎসার সমস্ত দায় চেক রাষ্ট্রের। বিদেশী রোগী যদি স্বইচ্ছায় তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে চান তাহলে ডাক্তারের কোনো ফী তাঁর লাগবে না, কিন্তু ক্লিনিকাল পরীক্ষার খরচ এবং ওষুধের দাম দেওয়া না-দেওয়া রোগীর ইচ্ছাকৃত। রোগী যদি পারগ হন দেবেন, অপারগ হলে দেবেন না। মানুষের স্বাস্থ্যের দিকে এদের রাষ্ট্রের কড়া নজর। এই জন্যেই চিকিৎসা করাতে এখানে পয়সা লাগে না।

আমাদের দেশে আবার ঠিক উল্টো। রোগে ভুগে ভুগে মরবার ঠিক আগে লোকে ডাক্তার ডাকে। তারপর মরে গেলে ভাগ্যের দোষ দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাক্তারে দোষ দেয়। একবার যেমন হাতীবাগা হয়েছিল। বুড়ো বাপ অনেকদিন ধ ভুগছে: ছেলেরা কিন্তু ডাক্তার দেখাবে না চার ছেলে, মেলা পয়সা, কিন্তু ডাক্তা মানেই হল ঠগ। অসুখের অজুহাতে ঠকিয়ে পয়সা নিয়ে যাবে, এ চার ছেলের এ ছেলেরও বরদাস্ত করবার কথা নয়। আর ত ছাড়া বুড়ো মানুষ অসুখে তো ভুগবেই- বৃদ্ধ বয়সে শরীরং ব্যাধিমন্দিরং। তা ডাক্তার দেখানো হয়নি। শেষে যখন বুড়ো শ্বাস উঠল, তখন বড় ছেলে দৌড়ে গিয়ে পাড়ার একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল ডাক্তার গলায় স্টেথোস্কোপ দুলিয়ে বড় ছেলের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে গেলেন যেখানে রোগী শুয়ে, আর মেজ, সেজ, ছোট ছেলে বাড়ির দরজা আগলে বসে রইল—ডাক্তারকে বেরতে দেবে না যতক্ষণ না বাপকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে ডাক্তার হাঁপাতে হাঁপাতে তেতলায় উঠে দেখলেন রোগীর নাভিশ্বাস উঠেছে, মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হচ্ছে। তাঁর আর কিছু করবার ছিল না। নাড়ি ধরে বসে রইলেন যতক্ষণ না রোগী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বেশীক্ষণ বসতে হল না। ডাক্তার রোগীকে ছেড়ে উঠে

দাঁড়াতেই ঘরের বাইরে যে-সব মহিলারা উঁকি দিচ্ছিলেন তাঁরা সবাই এক-সঙ্গে মড়াকান্না কেঁদে উঠলেন। আর সেই কান্না শুনে তিন ছেলে যারা দরজা আগলে বসে ছিল তারা লাঠি হাতে মার মার করতে করতে উঠে এল। তারপর বাপ পড়ে রইল, সে কী মার ডাক্তারকে। ফী আদায় করা দূরের কথা, কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে ডাক্তার। ডাক্তারের পরিত্রাহি চীৎকার মেয়েদের মড়াকান্নাকে ছাপিয়ে উঠল। সেই চীৎকারের চোটে পাড়া-পড়শীর ঘুম ভেঙে গেল। তাঁরা ছুটে এসে সেই গুণ্ডাবাড়ির ছেলেদের হাত থেকে ডাক্তারকে বাঁচান, তাই রক্ষে। নইলে সেদিন হাতীবাগানের ঐ বাড়ি থেকে একটা মড়া নয়, দুটো মড়া বার হত। ঘটনাটা সত্য—হাতীবাগানের অনেকেই জানেন।

এই হল আমাদের দেশের ডাক্তার দেখানো। এ দেশে আবার ঠিক উল্টো। যে হেতু ডাক্তার দেখাতে, হাসপাতালে যেতে, ওষুধ কিনতে পয়সা লাগে না, মানুষ তাই দুবার হাঁচলেই পলিক্লিনিকে ছোটে চিকিৎসা করাতে। বিনি-পয়সায় কাটিয়েই এল হয়তো দু-পাঁচ দিন হাসপাতালে।

ব্যবস্থা ভালই। আমরা গিয়ে বললুম তনিমা দেবীকে।

তিনি বললেন— তা হলে ভাই তোমরা

নদী তীরে প্রাহা

আমার রক্তের চাপটা দেখাবার একটু বন্দোবস্ত করে দাও।

বন্দোবস্ত করেই আমরা এসেছিল্ম। বলল্ম—যাবেন আজকের খাবার পর?

তনিমা দেবী বললেন—সংগে কেউ না গেলে তো আমি যেতে পারব না। এদের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে আমার লজ্জা করবে। তোমরা এসো না?

আমরা বলল্ম—নিশ্চয়। আমরাই তো নিয়ে যাব। সেই ব্যবস্থাই করে এসেছি। বিজ্ঞান আকাদেমি দুটোর সময় গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। তৈরি থাকবেন।

দুটোর সময় তনিমা দেবীর হোটেলে পেণছে দেখি তিনি তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছেন। আমার গৃহিণীকে হাতের ইশারায় এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—দেখ তো ভাই পা-টা কেমন ফুলো মনে হচ্ছে না? ওটাও দেখাবো নাকি ডাক্তারকে?

গৃহিণী বললেন—পা যদি ফুলে থাকে দেখাবেন না? নিশ্চয় দেখাবেন। তিনি তনিমা দেবীর পা-টা একবার দেখলেন দু আঙুল দিয়ে টিপে। কিন্তু কিছুই অনুমান করতে পারলেন না। তনিমা দেবীর পা এমনিতেই ফুলো। আগে বেশী ছিল কি কম ছিল বোঝা শক্ত।

—ঠিকই আছে বোধ হয়।

—বেশ চলো তাহলে।

—ডাক্তারকে বলব আপনার পা ফোলার কথা?

—বলোই বরং। ডাক্তারের সব কিছু জানা দরকার।

পলিক্লিনিকে পেণছে তনিমা দেবী আমার গৃহিণীকে নিয়ে ডাক্তারের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর ডাক্তারকে শুধু যে তাঁর রক্তের চাপাধিক্য আর পা ফোলার কথাই বললেন তা নয়, সারা জীবনে যত কিছু অসুখ করেছিল তার সমস্ত ফিরিস্তি কয়েক ভাঁজ কাগজ খুলে ডাক্তারের সামনে মেলে ধরলেন। বললেন এই সব অসুখের জন্যে তাঁকে বার বার ইয়োরোপে আসতে হয়। কবে কোন অসুখ করেছিল, তার তারিখ, ডাক্তারের নাম, কদিন ভুগেছিলেন, কি ওষুধ খেয়েছিলেন, শরীরের উত্তাপ, নাড়ির গতি, রক্তের চাপ, হৃৎপিণ্ডের ফুসফুসের অবস্থা সব কিছুর রেকর্ড আছে। অদ্ভুত গোছালো মেয়ে এই তনিমা দেবী। ডাক্তার স্বীকার করলেন, এমন আশ্চর্য রোগিণী তিনি এর আগে কখনও দেখেন নি। যাই হোক, ব্যাধির তালিকা দেখে ডাক্তারের চোখ কপালে উঠল। যত রকম সাংঘাতিক সাংঘাতিক রোগ দুনিয়ায় থাকতে পারে সব তনিমা দেবীর হয়েছে। দেহের কত জায়গায় যে অস্ত্রোপচার হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কেমন করে যে রোগিণী বেঁচে আছেন সেইটেই বিস্ময়ের বস্তু।

ডাক্তার চশমা খুলে বললেন—আপনাকে তাহলে ভালো করেই একবার দেখতে হবে।

প্রথমেই দরকার ক্লিনিক্যাল পরীক্ষাগুলি সেরে ফেলা। বলে ঘস্‌ঘস্‌ করে একটার পর একটা স্লিপ লিখে চললেন। সবগুলো লেখা হয়ে গেলে আমার স্ত্রীকে বললেন--এই নিন। এইটা সমেত রোগীকে নিয়ে অমুক নম্বর ঘরে যাবেন. সেখানে হার্ট পরীক্ষা হবে বিজলী-যন্ত্রে। অমুক নম্বর ঘরে ফুসফুসের এক্স-রে। অমুক ঘরে মূত্র পরীক্ষা। অমুক ঘরে রক্ত পরীক্ষা। অমুক ঘরে মল পরীক্ষা। এই সব রিপোর্ট আসুক তারপর আবার রোগী নিয়ে আসবেন।

তনিমা দেবী অথই জলে পড়লেন। শুধু রক্তের চাপ দেখাতে এসেছিলেন তার জায়গায় এত সব হাঙ্গামা? কি দরকার ছিল এ সবের? বললেন— শুধু রক্তের চাপ দেখে শেষ করলে হয় না?

ডাক্তার বললেন— সে কি? এই বললেন, পা ফুলেছে। পা-ফোলা কি সহজ কথা হলো? তার উপর অত সব রোগের ইতিহাস দেখালেন। না, না, ভাল করে আপনাকে পরীক্ষা করা দরকার।

গৃহিণী তনিমা দেবীকে ডাক্তারের ঘর থেকে বার করে এনে বললেন—দেখুন তনিমা দেবী, আপনি নেহাত কেউ কেটা নন। তার উপর এ দেশের মাননীয়া অতিথি। কিছু না দেখে আপনাকে ছেড়ে দেয় এমন সাহস নেই চেক ডাক্তারের। তা ছাড়া ওদের একটা দায়িত্বও তো আছে।

তনিমা দেবী একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—শরীরের কোথায় কি রোগ লুকিয়ে থাকে সব সময় আমরাই কি আর জানতে পারি? সত্যি।

তনিমা দেবীকে সন্দেহ দোলায় ফেলে আমরা বাড়ি গেলুম। তনিমা দেবীর বক্তৃতা কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রইল।

ক-দিন ধরে খুব ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা চলল। এক ঘর থেকে আর এক ঘরে দৌড়োদৌড়ি। শেষে যেদিন সব পরীক্ষার ফল পাওয়া গেল তনিমা দেবী আবার গেলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার মুখ গম্ভীর করে বললেন—সবই নর্মাল দেখছি, শুধু এক জায়গায় দোষ। খাড়াইয়ের তুলনায় আপনার দেহের ওজন বেশ খানিকটা বেশী। ওটা কমাতে হবে। অন্তত আধ মণ কমানো দরকার। এই নিন, সারাদিন এর বেশী খাবেন না। বলে এক টুকরো কাগজে খাদ্যের তালিকা লিখে দিলেন। সারাদিনে একখানি ডিম, দুখানি টোস্ট। চা। সামান্য ভাত, কিছু ফল। এক ছিলে সিদ্ধ মাছ বা মাংস। চিনি বাদ, মাখন বাদ, ঘী বাদ, সব রকম সুস্বাদু খাবার বাদ।

তনিমা দেবী মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। খেতে ভালোবাসেন, জীবনের ঐ একটি মাত্র বাসন, তা-ও গেল? তার উপর আধ মণ ওজন কমাতে হবে? দেশে ফিরে গেলে লোকে বলবে কি? বিলেতে আসে লোকে মোটা হতে—তিনি কি রোগা হয়ে ফিরবেন?

যাই হোক ক-দিন বিশ্রাম করে তনিমা দেবীর উপকার হল।

তনিমা দেবী শেষ অবধি ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলেছিলেন কি না আমাদের জানা নেই। তবে দেহ পরীক্ষার পর খুশী মনে বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন এবং সে বক্তৃতাও আমরা শুনেছিলুম। সেই বক্তৃতায় তিনি এত সুন্দরভাবে নানা জায়গায় ভারতীয় নারী-দের রন্ধন কৌশলের প্রশংসা করেছিলেন যে শুনে পরে অনেকে আমাদের বলেছেন যে তাঁদের ভারতবর্ষে যাবার লোভ অনেক বেড়ে গেছে ভারতীয় গৃহলক্ষ্মীদের হাতের

রান্না খাবার যদি সুযোগ ঘটে যায় এই ভেবে। আমার অবশ্য মনে হয় ওটা ছিল তনিমা দেবীর চেক্ ডাক্তারদের নির্দেশিত নিষ্ঠুর খাদ্যতালিকার বিরুদ্ধে এক শেষ চরম আবেদন। যাই হোক দেশে ফিরে গিয়ে তনিমা দেবী যে চেক ডাক্তারদের খুবই প্রশংসা করেছেন এ কথা শুনেছি।

প্রাহার অর্থনীতি সংস্থা বিজ্ঞান আকাদেমীর তাবে। ঐখানে আমার প্রধান কর্মস্থল। শেবইনার সায়েব সংস্থার একজন বিজ্ঞান-কর্মী। যে বিভাগে তিনি কাজ করেন তার নাম পুঁজিবাদী দেশের অর্থ-নীতি। এঁর সঙ্গে আমার ভারতবর্ষেই আলাপ হয়েছিল। শেবইনার সে সময় পুঁজিবাদীদের মধ্যেকার অনুন্নত দেশগুলি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। অনুন্নত দেশের মধ্যে ভারতবর্ষও পড়ে কারণ যন্ত্রশিল্প এবং অর্থনৈতিক মানে পশ্চিম দেশগুলোর কত পিছনেই তো আমরা পড়ে আছি। শেবইনার সায়েব এক বছর ভারতে ছিলেন। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ভারত পরিসংখ্যান সংস্থা প্রভৃতিতে কাজ করে গেছেন। সেই কাজের ফসলকে থিসিস্ রূপে ফুটিয়ে তুলে অবশেষে তিনি তা দাখিল করেছেন বিজ্ঞান আকাদেমির কাছে ডক্টর উপাধি লাভের অভিলাষে। এদেশে আজকাল ডক্টর শব্দটা ব্যবহার করে না, বলে কাণ্ডিডাট।

শেবইনারই আমায় খবরটা দিলেন। বললেন—দেখবেন নাকি আমাদের দেশের ডক্টরেটের পরীক্ষা কেমন? কাজেই গেলুম দেখতে। আমরা যাকে বলি মৌখিক পরীক্ষা এরা বলে 'অভায়োবা' অর্থাৎ আত্মরক্ষা। পরীক্ষকেরা চতুর্দিক থেকে পরীক্ষার্থীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবেন আর পরীক্ষার্থী নিজেকে রক্ষা করে চলবেন সমুচিত উত্তর দানে। এই হল অভায়োবা। এই খণ্ডযুদ্ধ থেকে রক্ষা পেলেন তো ডিগ্রি মিলল, নইলে যান আবার চেষ্টা করুন গে।

পৌঁছতে আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। অর্থনীতি সংস্থারই দোতলার হল-এ পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে দেখলুম। মস্ত ঘর। তার মাঝখানে সরু লম্বা একখানা টেবিল। টেবিলের দুই মাথার এক মাথায় বসেছেন অর্থনীতি সংস্থার প্রধান অধ্যক্ষ ডাঃ কাইগেল আর অপর মাথায় শেবইনার। টেবিলের দু-পাশে চারজন চারজন করে আটজন পরীক্ষক. তার মধ্যে দু-জন প্রধান—ডাঃ রানাচেক এবং ডাঃ হস্কী। টেবিল ছাড়িয়ে দেয়াল ঘেঁষে এক সারি চেয়ার। সেখানে অন্যান্য দর্শক-শ্রোতৃবৃন্দ। তার মধ্যে আমিও। অর্থনীতি সংস্থার প্রধান অধ্যক্ষ ডাঃ কাইগেলই শেবইনারের থিসিস্ পাঠিয়ে দিয়েছেন প্রধান পরীক্ষক-যুগলের কাছে। অন্যান্য পরীক্ষকদেরও তিনিই নিযুক্ত করেছেন। এ ছাড়া বন্ধু, পরিচিত,

প্রাহার দৃশ্য

সহকর্মী এবং জনসাধারণের যে-কেউ এসে এই পরীক্ষা-সভায় যোগ দিতে পারেন এবং পরীক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে পারেন।

আমি যখন পৌঁছলুম তখন প্রথম পরীক্ষক ডাঃ রানাচেক তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন। রানাচেক একখানি লিখিত রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন শেবইনারের থিসিস্ সম্বন্ধে। তার নকল শেবইনারকে দেওয়া হয়েছিল আগেই। সেটাই বুঝিয়ে বলছিলেন। রিপোর্টে শেবইনারের কাজের প্রচুর প্রশংসা ছিল। শুধু এক জায়গায় ছিল একটু বিরুদ্ধ বক্তব্য। শেবইনার তাঁর লেখার মধ্যে যে-সব ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ব্যবহার করেছেন সেগুলি সব সময় খুব নির্ভরশীল নয়। শেবইনারের নিশ্চয়ই সে কথা জানা আছে। তৎসত্ত্বেও তিনি পাঠকদের সে কথা পরিষ্কার করে বলেন নি কেন? শেবইনারের থিসিস্ ছিল ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে। ভারতবর্ষে

তিনি যখন এসেছিলেন তখন এই সব পরি-সংখ্যান সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের যে-সব পরিসংখ্যান বিভাগ আছে তাদের কাজ কর্ম এবং তার ফলাফল যে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয় তা সুবিদিত। এই বলে থিসিসের নানা জায়গা থেকে ছক প্রভৃতি উদ্ধৃত করে দেখাতে শুরু করলেন। এবং শেষে বললেন—অথচ এর চেয়ে

নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান কোথায় পাওয়া যায় তা-ও আমি জানি না। রিপোর্টে যাই লিখে থাকুন, য়ানাচেকের বক্তৃতা শুনে মনে হল, তিনি যেন থিসিসটা যথেষ্ট উপযুক্ত বলে বিচার করছেন না। য়ানাচেকের বক্তব্য শেষ হল।

কফি খাবার সময় হল। সংস্থার গবেষণা সহকারিণীরা সবাইকে কফির পেয়ালা দিয়ে গেলেন। ঝি-চাকর তো নেই, এ-সব কাজ সংস্থার কর্মিণীদেরই করতে হয়। তারপর বক্তব্য শুরু হল দ্বিতীয় পরীক্ষক হস্কী সায়েবের। ইনি যে লিখিত রিপোর্ট দিয়ে ছিলেন তাতে প্রচুর বিরুদ্ধ সমালোচনা ছিল। প্রশংসা ছিল কমই। কিন্তু মজা এই যে তিনি যখন বলতে শুরু করলেন তখন বিরূপ দিকটা মোটেই উল্লেখ করলেন না। থিসিসের যে অংশটা ভালো লেগেছে শুধু সেটার কথা বলে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে বললেন। শ্রোতাদের মনে হল হস্কী সায়েবের থিসিসটা খুব পছন্দ হয়েছে। তাঁরও বক্তৃতা শেষ হল।

সভাপতি কাইগেল তখন অন্য পরীক্ষকদের একে একে বললেন—আপনারা এবার প্রশ্ন করুন। য়ানাচেক সায়েবের বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে অনেকের মনেই অনেক কথা জেগেছিল। সকলে শুরু করলেন প্রশ্নবাণ।

শেবইনার টুকে নিলেন প্রশ্নের মূল কথাগুলি। সভাপতি অন্যান্য শ্রোতাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। জানতে চাইলেন, তাঁদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না? আমাকেও জিজ্ঞেস করলেন। ভারতের কৃষি-মজুর সম্বন্ধে আমার একটা প্রশ্ন ছিল বটে কিন্তু যখন বুঝলুম সবার সুবিধার জন্য প্রশ্ন করা উচিত চেক ভাষায়, তখন আর বৃথা ও পথে গেলুম না।

শেবইনার জবাব দিতে শুরু করলেন। বেশ অনেকক্ষণ ধরে একের পর এক সকলের প্রশ্নের যতদূর সম্ভব উত্তর দিলেন। পরে আমি শেবইনারকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তাঁর ঐ অভায়োবা অর্থাৎ আত্মরক্ষার অভিনয় কেমন লেগেছিল? তিনি বলেছিলেন—প্রধান বিচারক য়ানাচেকের কাছ থেকে হঠাৎ ঐ রকম আক্রমণ পেয়ে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। বিশেষত লিখে যিনি থিসিসটার প্রশংসাই করেছেন তিনি একটা ক্ষীণ দুর্বলতাকে নিয়ে এত টেনে টেনে বলছেনই বা কেন? দ্বিতীয় বিচারক অবশ্য অনেকটা আমার পক্ষ নিয়েই বলেছিলেন। কিন্তু আমার পরম সুবিধা হয়ে গেল, যখন অন্য পরীক্ষকেরা নানা দিক থেকে আমায় নানারকম প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। ক্যান্ডিডাটের পরীক্ষায় সাধারণত এত লোকে এত রকম প্রশ্ন করে না। নানা-রকম প্রশ্ন থাকায় নানা জিনিস সম্বন্ধে অনেক কিছু বলবার আমি প্রচুর সুযোগ পেলুম। থিসিসের মধ্যে যে-সব কথা ভালো করে বুঝিয়ে বলিনি, যথেষ্ট বলিনি, হয়তো বলিই নি, সেগুলি বিচারকদের সামনে গুছিয়ে গাছিয়ে উপস্থাপিত করলুম যথাসাধ্য। মোটামুটি শেবইনার ভালই বলেছিলেন।

জবাব দেওয়া হয়ে গেলে শেবইনারকে এবং শ্রোতৃবৃন্দ আমাদেরকে ঘরের বাইরে বারান্দায় যেতে বলা হল। কাঁচে ঢাকা বারান্দার দেয়ালের গায়ে যেখান দিয়ে গরম জলের পাইপটা গিয়েছে, সেইখানে ঠেস দিয়ে আমি আরামে উষ্ণতা উপভোগ করতে লাগলুম। বারোজন পরীক্ষক রইলেন ঘরের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে ভোট নেওয়া হতে লাগল—হ্যাঁ কি না? ডিগ্রি দেওয়া হবে কি হবে না? একজন বাদে আর সকলেই ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়ার স্বপক্ষে ভোট দিলেন। আমাদের ঘরে ঢোকবার আমন্ত্রণ জানানো হল। সভাপতি ঘোষণা করলেন, পরীক্ষকদের সর্বসম্মতিক্রমে শ্রী শেবইনারকে ক্যান্ডিডাট উপাধিতে ভূষিত করা হবে। হাততালি দিলুম আমরা সবাই। শেবইনার আমায় একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—আমার বিশেষ বন্ধুদের আজ "অয়রোপা" রেস্তোরাঁয় খেতে আসতে বলতে যাচ্ছি। আপনিও এলে খুশী হব।

আমাদের বন্ধু শেবইনার, ক্যান্ডিডাট শেবইনার হয়ে গেলেন। (ক্রমশ)

ছোট নবাব

চিত্তপ্রিয় মিত্র

আমরা কথায় বলি নবাব পুত্তুর। নবাব পুত্তুর হওয়া কিন্তু সুখের নয়, তাদের জীবন ভয়াবহ ও বিপদ-সংকুল। যে নবাব পুত্তুরের জীবন-কথা আমাদের বিষয়বস্তু তিনি সিরাজের মা আমিনা বেগমের পিসতুতো ভাই মীরন। সেই সূত্রে সিরাজ মীরনের ভাগিনেয়। আলীবর্দী বিহারের নায়েব নবাব নিযুক্ত হইবার সময় সিরাজের জন্ম হয়। সমসাময়িককালে আলীবর্দীর বৈমাত্রেয় ভগ্নী সাখান্নামের সহিত মীর্জাফরের বিবাহ হয়। আমিনা বেগমের জীবন দুঃখে ভারাক্রান্ত। পাঠান সর্দারেরা তরবারির আঘাতে তাহার স্বামী বিহারের নায়েব নবাব জৈনুদ্দিন আহম্মদের শিরচ্ছেদ করে। আমিনাকে শিশুপুত্রসহ বন্দী করিয়া অপমানজনকভাবে, খোলা গাড়িতে বাজারের রাস্তা দিয়া লইয়া যায়। শ্বশুর হাজী আহম্মদকে নানাভাবে উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়া মারিয়া ফেলে। কিছুদিন পর দ্বিতীয় পুত্র সিরাজের অনুজ এক্রামউদ্দৌল্লার বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠা ভগিনী ঘসেটি বেগমের স্বামী নোজেস মহম্মদ, কনিষ্ঠা ভগিনী ময়মনা বিবির স্বামী সৈয়দ আহম্মদ এবং পিতা আলীবর্দী, পরিবারের অভিভাবকস্বরূপ একে একে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্র নবাব সিরাজদ্দৌল্লা নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার পর কনিষ্ঠ পুত্র মীর্জা মেহেদীও রক্ষা পাইল না। নির্বাসিত জীবনযাপনের জন্য আমিনাকে ঢাকাতে প্রেরণ করা হয়। অবশেষে তাহাকে মুর্শিদাবাদে ফিরাইয়া আনার ছলে নদীপথে জলে ডুবাইয়া মারিবার জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা বজরার নীচের একখণ্ড কাঠ খুলিয়া ফেলে। আসন্ন মৃত্যুতে আমিনা বেগম শংকিত হইলেন না, ঘসেটিকে বিচলিত দেখিয়া আমিনা তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "আমাদের অত্যাচারে কাহারো জীবন নষ্ট হইতেছে না। বরং আমরা অন্যের দ্বারা নির্যাতীত হইয়া মৃত্যুবরণ করিতেছি। আমরা শহীদের মৃত্যু বরণ করিতেছি। মৃত্যু আমাদের সকল দুঃখের অবসান ঘটাইবে। মীরনের ঘোরতর পাপ হইবে।' ভগবানকে স্মরণ করিয়া বদদোয়া বা অভিসম্পাত দিলেন "বিজলী গিরে ভেরে পর অর্থাৎ মীরনের উপর বজ্রপাত হউক।

এ দেশের জনসাধারণ প্রায় সকলেই অভিসম্পাতে বিশ্বাসী। অনেকের ধারণা অভিসম্পাতের ফলে মীরন সেই রাত্রেই বজ্রাঘাতে মারা যায়। প্রকৃতপক্ষে আমিনা ও ঘসেটির সলিল সমাধির একমাস পরে মীরনের জীবনাবসান হইয়াছিল। বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হইয়াছিল তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। তবে তাহার যে অপমৃত্যু হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মুসলমান শাস্ত্রীয় মতে পুত্রের জীবদ্দশায় পিতার মৃত্যু হইলে পিতামহের উত্তরাধিকারী স্বত্ব হইতে পৌত্র বঞ্চিত হয়। হিন্দুদের মত মুসলমানদের দত্তকপুত্র গ্রহণের প্রচলন নাই। মীরন নবাব আলীবর্দী ও হাজী আহম্মদ উভয়েরই ভাগিনেয়। সেই সূত্রে আলীবর্দীর উত্তরাধিকারী স্বরূপ মীরনের আদৌ দাবি ছিল না এরূপ ধারনার কোন সংগত কারণ নাই। মীরনের পিতামহ আহম্মদ নাজফি আরব দেশে নাজফ নামক স্থানে মহাত্মা আলীর সমাধির অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন। সৈয়দ বংশজাত মীরনের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। অধিকন্তু পিতা মীর্জাফর ছিলেন বাংলার সিপাহীসালার বা প্রধান সেনাপতি। দিল্লির সম্রাট সিরাজকে কোন সময়েই বাংলার নবাবপদে স্বীকৃতি দেন নাই। সিরাজের মাসতুতো ভাই পূর্ণিয়ার নবাব সোকতজঙ্গ দিল্লির সম্রাট কর্তৃক বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার নবাবপদে নিযুক্ত হইলেন। মোহনলালের আক্রমণে সোকতজঙ্গ নিহত হইলে তাহার পুত্র কৃষ্ণদাসকে পূর্ণিয়ার নবাব নিযুক্ত করা হয়। সিরাজের নব নিযুক্ত মন্ত্রী মোহনলালকে মোবারকবাদ বা অভিনন্দন জানাইতে মীর্জাফরের আত্মসম্মানে বাধিল। মীরমদন মীরজাফরকে হত্যা করার জন্য সিরাজকে পরামর্শ দেন। এই পরিস্থিতিতে মীর্জাফর নবাব দরবারে যাওয়া বন্ধ রাখিলেন। জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের দেউড়ীতে কামান বসাইয়া ও প্রাচীরের চারিদিকে সিপাহী মোতায়েন করিয়া মীর্জাফর ভয়ে, অপমানে ও ক্রোধে যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত রহিলেন। মীরন মনে মনে বাংলার মসনদে সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। এই সুযোগে কাশিমবাজারের ইংরেজকুঠীর অধ্যক্ষ মিঃ ওয়াট্‌স পর্দানসীন স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে একটি পাল্কিতে চড়িয়া মীর্জাফরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মীরন তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইয়া মহালসরা বা অন্দরমহলে একটি নিভৃত কক্ষে লইয়া যান। মীর্জাফর পবিত্র কোরান স্পর্শ করিয়া মীরনের মস্তকে হাত রাখিয়া ও মিঃ ওয়াট্‌স

[illegible] ছোট নবাব—মীরন

বাইবেল হাতে শপথ করিয়া পরস্পরের সহায়তায় সিরাজকে উচ্ছেদ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। ইতিহাসের পাতায় আমরা মীরনকে এই দৃশ্যে সর্বপ্রথম দেখিতে পাই।

সিরাজ পলাশী হইতে প্রস্থান করিলে পলায়নপর নবাবসৈন্যের পশ্চাতে আক্রমণ করিয়া ক্লাইভ রাত্রি আটটায় ছয় মাইল উত্তরে দাউদপুর নামক স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে মীর্জাফর ও মীরন দাউদপুরে ক্লাইভের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সিরাজের পরিত্যক্ত নর্তকী ও গায়িকাদের ক্লাইভ উপঢৌকনস্বরূপ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় অন্ধকূপহত্যার অলীক কাহিনীতে যে কয়জন ইংরেজ বন্দী জীবিত ছিল তাহাদের মধ্যে একমাত্র মহিলা মিসেস ক্যারীর নাম পাওয়া যায়। নবাব-অন্তঃপুরে তিনিও উপঢৌকন সামগ্রী হিসাবে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। মোগল আমলে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ক্লাইভ দাউদপুর

সতেরো বৎসরের তরুণ মীরন (সংগৃহীত নসীপুর রাজবাটি)

হইতে বহরমপুরের নিকটবর্তী মাদাপুর ও সেস্থান হইতে কাশিমবাজারে উপস্থিত হন। কাশিমবাজারে ইংরেজদের কুঠী পূর্বেই সিরাজ কর্তৃক ধূলিসাৎ হইয়াছিল। তাই তাহাকে ফরাসডাঙ্গায় পরিত্যক্ত ফরাসী কুঠিতে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সেখানে রনজিত রায় নামে একজন গুপ্তচর প্রধান ক্লাইভের সহিত দেখা করে। মীরন ও রাজবল্লভ ক্লাইভকে হত্যা করিবার জন্য গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, জগৎ শেঠ গুপ্তচর মারফত এই সংবাদ দিয়া ক্লাইভকে সাবধানে চলাফেরা করিবার পরামর্শ দেন। ক্লাইভ অতঃপর মুর্শিদাবাদে মহিমাপুরে জগৎশেঠের বাড়ির বিপরীতদিকে ভাগিরথীর পশ্চিমতীরে মুরাদাবাদ নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যসহ লালকুঠিতে আস্তানা লন। মীরন ক্লাইভকে অভ্যর্থনা জানান। সিরাজ বন্দী হইলে রাজমহল হইতে মুর্শিদাবাদে আনিবার দায়িত্ব মীরনের উপর ন্যস্ত হয়। ২রা জুলাই গভীর রাত্রিতে সিরাজকে লালকুঠি সংলগ্ন মনসুরগঞ্জ নবাব-প্রাসাদে মীর্জাফরের মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত করা হয়। সিরাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মীর্জাফর কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করিতে না পারিয়া তাহাকে মীরনের তত্ত্বাবধানে রাখিবার আদেশ দেন। ম্যাকফার্লং সাহেবের মতে মীর্জাফর সিরাজকে প্রাণে না মারিয়া কোন বিকল্প ব্যবস্থার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় থাকেন। কিন্তু মীর্জাফরের অগোচরেই সেই রাত্রিতে সিরাজকে হত্যা করা হয়। পরদিন প্রাতে মীর্জাফর ক্লাইভের সহিত দেখা করেন। সিরাজের উপস্থিতিতে মুর্শিদাবাদে সৈন্যসামন্তদের মধ্যে উত্তেজনা ও বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা দেয়, সে কারণে সিরাজকে অনতিবিলম্বে হত্যা করা হয়। সিক্রেট কমিটির নিকট লিখিত ক্লাইভের আত্মপক্ষ সমর্থন পত্রে এই উক্তি পাওয়া যায়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, সিরাজ হত্যার দিন ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ শহরেই উপস্থিত ছিলেন। 'ব্যারন অব পলাশীর' পরামর্শ বা অনুমতিভিন্ন সিরাজকে হত্যা করা হইয়াছে —ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। "তারিখ-ই-বাংলা" পুস্তকে ইংরেজ সর্দার ও জগৎশেঠের প্রভাবেই সিরাজকে হত্যা করা হইয়াছে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়। রবার্ট ওর্মের অভিমত, সিরাজকে মনসুরগঞ্জ নবাবপ্রাসাদে হত্যা করা হয়। তিনি ক্লাইভের সমসাময়িক মাদ্রাজে ইংরেজ কোম্পানীতে নিযুক্ত ছিলেন। 'মোতাক্ষরিন' গ্রন্থের লেখক গোলাম হোসেনের বর্ণনায় সিরাজকে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদে একটি কক্ষে হত্যা করা হইয়াছে উল্লেখ আছে। মীরন নিজ তত্ত্বাবধানে বন্দী অবস্থায় হত্যা করিয়াছেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। মীরনের বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে সিরাজের যথাসাধ্য ...

প্রাসাদের আঙিনায় একটি নির্দিষ্ট কোণ দর্শকদের দেখাইয়া দেন। সম্ভবত বৃটিশ গভর্নমেন্টের সুনজরে থাকিয়া বাৎসরিক ৬০ লক্ষ টাকা ভাতা পাইবার ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য তাহাদের এই প্রয়াস। সিরাজকে জাফরাগঞ্জ প্রাসাদে হত্যা করা হইয়াছে—তৎকালীন ইংরেজ লেখকদের লেখনীতে এইরূপ উল্লেখ নাই। মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে হত্যা করিয়া সম্ভবত সিরাজের মৃতদেহ আত্মীয়বর্গকে দেখাইবার জন্য গঙ্গার পূর্বতীরে জাফরাগঞ্জে আনা হয় এবং হস্তীপৃষ্ঠে শহর পরিক্রমার পর পুনরায় গঙ্গার পশ্চিমতীরে খোসবাগে পিতামহ আলীবর্দীর সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়। জয়নাল আবেদীন নামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিরাজের সমাধির সুব্যবস্থা করেন। সিরাজের মাতা ও পরিবারবর্গ মুর্শিদাবাদে গঙ্গার পূর্বপারে আলীবর্দীর মহালসরায় থাকিতেন। সিরাজের মা অন্দর-মহল হইতে সদর রাস্তায় ছুটিয়া আসিলেন এবং মৃতদেহ চুম্বন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সাধারণত নবাব পরিবারের বেগমরা পর্দার বাহিরে জনসাধারণের সম্মুখে আসিতে অভ্যস্ত নহেন। সদর রাস্তায় আমিনা ও আলীবর্দী-বেগম জসরৎন্নেসা খান্নাম শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলে খাদিম হোসেন নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, নবাব পরিবারের সম্ভ্রম রাখিবার জন্য তাহাদিগকে অন্দরমহলে ফিরাইয়া আনিলেন। সিরাজের খণ্ড-বিখণ্ডিত মৃতদেহ হস্তীপৃষ্ঠে মুর্শিদাবাদ শহর প্রদক্ষিণ করাইয়া প্রতিশোধ মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল এইরূপ ধারণা জন্মে। কিন্তু আলীবর্দীর পাশে সমাহিত দেখিলে মনে হয় কোনও এক প্রচ্ছন্ন শক্তির সুপরিকল্পিত ও সূক্ষ্ম পরিচালনায় তাহার জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। নবাবী আমলে বিজিতের মৃতদেহের এইরূপ সদগতির নিদর্শন বড় একটা দেখা যায় না

সিরাজের মৃতদেহ দেখিবার জন্য মুর্শিদাবাদের রাজপথে নিশ্চয়ই প্রচুর জন-সমাগম হইয়াছিল। সেই সময়ে ভাগীরথীর জলে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদের রাজভাণ্ডারের অর্থ ভাগবাটোয়ারার পর বায়োটি সিন্ধুক বোঝাই করিয়া সিপাহী পাহারায় দুই শত বজরায় বিজয় উল্লাসে ইংরেজেরা 'হুররে, হুররে' ধ্বনিতে যুদ্ধবাদ্য ও বিউগল্ বাজাইয়া কোম্পানীর নিশান উড়াইয়া কলি-কাতার দিকে রওনা হয়। মুর্শিদাবাদের জনসাধারণ নিশ্চয়ই এ দৃশ্যে মর্মাহত হইয়াছিল। রাষ্ট্র বিপ্লবে জনসাধারণ উদাসীন, রাজনৈতিক বিষয়ে তাহারা মাথা ঘামাইতে অভ্যস্ত নহে। তাহাদের স্বত্ব-দখলীয় জমিজমার উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারিলে যে-কোন লোককেই তাহারা খাজনা দিতে আপত্তি করিত না। জনসাধারণের স্বার্থান্বেষী প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক পরি-বর্তনের ভাগ-বাটোয়ারার সামান্য কিছু অংশ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিত।

মীর্জাফর ইংরেজদের ভাড়াটিয়া সেনা-রূপে কাজে লাগাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রভাবমুক্ত হইতে সক্ষম হন নাই। মীরনের নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাব দরবারে একটি শক্তিশালী দলের উদ্ভব হইয়াছে, ইংরেজদের গোপন বিভাগ এই খবর সংগ্রহ করে, তাহারা এই বিরুদ্ধ শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। এ-দেশের জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার বৈষম্যের ছিদ্রপথে ইংরেজরা তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিল। যুদ্ধ জয় করিয়া তাহারা এ দেশে অনুপ্রবেশ করিতে পারে নাই। স্বার্থপ্রণোদিত ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ সমর্থনের সুযোগে ও কূটনৈতিক দক্ষতায় তাহারা এ দেশে রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে। তাহারা জানিত হিন্দুরা বিজিত ও মুসলমানেরা এ দেশের বিজয়ী হিসাবে আসিয়াছিল। এই পরি-প্রেক্ষিতে ইংরেজদের গোপন বিভাগ ফার্সি-ভাষায় অধিকতর পারদর্শী মুসলমানদের বিশ্বাস না করিয়া হিন্দুদেরই কিছুটা বিশ্বাস করিত। নন্দকুমার, নবকৃষ্ণ, কান্ত-মুদী, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি ফার্সি-ভাষায় পারদর্শী হিন্দুরা ইংরেজদের প্রধান সহায় হইলেন। বিহারের ডেপুটি নবাব রাজা রামনারায়ণ, যিনি শেষ পর্যন্ত নবাব সিরাজদ্দৌল্লার আস্থাভাজন ছিলেন, তাঁহাকে ইংরেজেরা মীরন ও মীর্জাফরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্বপদে বহাল রাখিল। মীর্জাফরের ভাই রাজমহলের ফৌজদার কাসেম খাঁ ও মঙ্গলপুরের ফৌজদার মীর দাউদ খাঁ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও বিহারের ডেপুটি নবাব হইতে পারে নাই। সিরাজের বিশ্বস্ত গুপ্তচর রামরাম সিং, যাহার মাধ্যমে সিরাজ ফরাসী সেনাপতি বুসির সঙ্গে যোগাযোগ করিতেন, তাহাকেও ইংরেজরা মীর্জাফরের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেদিনীপুরের রাজার পদে বহাল করিল। রায় দুর্লভকে মীর্জাফর ইংরেজদের প্রভাবে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। রাজা রাজ-বল্লভ মীরনের দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। এই সকল ব্যবস্থা করিয়া ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর মুর্শিদাবাদ হইতে কলি-কাতায় ফিরিলেন। মুর্শিদাবাদে গুজব রটিয়া গেল, রাজা রায় দুর্লভ সিরাজের ছোটভাই মীর্জামেহেদীকে বাংলার মসনদে বসাইবার জন্য দিল্লীর সম্রাটের সহিত যোগাযোগ করিতেছেন। এই অভিসন্ধির মূলোৎপাটন করিবার জন্য ১০ই নভেম্বর মুর্শিদাবাদে আলীবর্দীর প্রাসাদ আগুনে জ্বালাইয়া ধ্বংস করা হয়। মীর্জামেহেদীকে দুইখণ্ড মসৃণ তক্তার মধ্যে পিষিয়া হত্যা করা হয়। ঐ সকল মসৃণ তক্তা নবাব প্রাসাদে কাশ্মীরী শাল সযত্নে রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। দুষ্কৃতকারীরা কুশ-

পুত্তলিকা পোড়াইয়া আলীবর্দী পরিবারের সকলেই অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে প্রচার করে। প্রকৃতপক্ষে রাত্রির অন্ধকারে বিনা প্রস্তুতিতে আলীবর্দী পরিবারের স্ত্রীপুরুষ, দাসদাসীসহ প্রায় সত্তরজন লোককে একটি সাধারণ বজরাতে চাপাইয়া ঢাকায় নির্বাসিত করা হয়। নির্বাসিত পরিজনের মধ্যে আলীবর্দী বেগম জমরতউন্নেসা খানম, আমিনা ও ঘসেটি দুই ভগ্নী, সিরাজের অন্যতমা স্ত্রী সুরফিন্নেসা বেগম ও তাহার শিশুকন্যার কথা মিঃ লংয়ের বিবরণীতে উল্লেখ আছে। রায় দুর্লভ বিপদ দেখিয়া নিরাপত্তার জন্য অসুস্থতার ভান করিয়া নবাব দরবারে যাওয়া বন্ধ করিলেন। মীরন তাহার বাড়ি চড়াও করিলে তিনি স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পলায়ন করিলেন। মুর্শিদাবাদে ইংরেজ রেসিডেণ্ট হেস্টিংসের আদেশে স্ক্যাফ্‌টন সাহেব ইংরেজ সৈন্য সাহায্যে রায়বল্লভের পরিবারকে মীরনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। এই সকল কার্যে মীরন ইংরেজদের ঘৃণ্য দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। মীরনের শারীরিকগঠন, মনোবল ও কর্ম দক্ষতা ইংরেজদের আশংকার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বংশগৌরব ও আভিজাত্যে মীরন নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া ইংরেজদের 'লালমুখো' বলিয়া উপহাস করিতেন। ১৭৫৯ সালের ৭ই জানুয়ারী ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিটের নিকট সেক্রেটারী ওয়ালস্ ক্লাইভের লিখিত একখানা পত্র পেশ করেন। পত্রের মর্ম ছিল এইরূপ ঃ "মীর্জাফরের বয়স হইয়াছে। তাহার পুত্র খুবই নিষ্ঠুর ও নিষ্কর্মা এবং তিনি ইংরেজদের নিশ্চিত শত্রু। তাহাকে নবাবের উত্তরাধিকার সূত্রে বিশ্বাস করা বিপজ্জনক। দুই সহস্র ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে কোম্পানী এ-দেশের শাসন ব্যবস্থা ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। মীরন উত্তরাধিকারসূত্রে নবাব হইলে ভবিষ্যতে কোম্পানীর ভরসা নাই।" পত্রে মীরনকে অবাঞ্ছিত বলিয়া ব্যক্ত করা হইলেও পরোক্ষে উল্লিখিত উক্তি মীরনের যোগ্যতারই প্রমাণ দেয়। ক্লাইভ নিজের ও কোম্পানীর স্বার্থের পাকাপাকি ব্যবস্থা করিবার জন্য দেশে ফিরিতে মনস্থ করেন। মীর্জাফর তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়াছেন এমন সময় সংবাদ আসিল সুদূর ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিজ হইতে ছয় সাতখানা যুদ্ধ জাহাজ বঙ্গোপসাগরের মোহনা দিয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ করিতেছে। পলাশীতে ডাচরা ফরাসীদের ভাগ্যবিপর্যয় দেখিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবদের সহিত এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। ১৭৫৯ সালের অক্টোবর মাসে নবাগত ডাচ সৈন্যরা ফলতার নিকটে পৌঁছিল। সাতশত সিপাহী ও চারিশত নৌসেনা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবতরণ করিয়া স্থলপথে ডাচ

উপনিবেশ চুঁচুড়ার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। মীরন ছয় সাত হাজার বাছাই সৈন্য সহ চুঁচুড়ার উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিলেন। মীর্জাফর পলাশী যুদ্ধক্ষেত্রে যে নিষ্ক্রিয়তার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন মীরন এখানে তাহারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। মীর্জাফর ডাচদের বাধা দিবার ভান করিয়া কলিকাতা হইতে চুঁচুড়ায় গেলেন। ক্লাইভকে খবর দিলেন—ডাচরা বঙ্গোপসাগরে প্রচণ্ড ঝড়ের আশংকায় তাহাদের রণতরী সহ গঙ্গার মোহনায় প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছে, আবহাওয়া ভাল হইলেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে। এই যুক্তি ইংরেজরা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। কর্নেল ফোর্ড চুঁচুড়ার দক্ষিণে বহিরাগত ডাচদের অনুপ্রবেশে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ক্লাইভের নির্দেশের জন্য দূত পাঠাইলেন। ক্লাইভ তখন তাসখেলায় মত্ত। যুদ্ধ তাহার নিকট খেলার সামিল ছিল। হাতের কাছে এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল লইয়া দুই কথায় ডাচদের আক্রমণ করিতে নির্দেশ দিলেন। ২৫শে ডিসেম্বর, ১৭৫৯ সাল। ডাচ সৈন্য কর্নেল ফোর্ডের হাতে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইল। অবস্থা দেখিয়া মীরন কাল বিলম্ব না করিয়া সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। খাজা ওয়াজিদ্ নামে একজন কাশ্মীরী ধনী ব্যবসায়ী ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ডাচদের প্ররোচনা দিলেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্বে সালফেট ব্যবসা ডাচদের একাধিপত্য ছিল। সালফেট গোলাবারুদ তৈয়ারীর প্রধান উপকরণ বলিয়া ক্লাইভ মীর্জাফরের নিকট হইতে সালফেট-এর একচেটিয়া ব্যবসার সনদ আদায় করিয়া লন। ডাচদের প্রধান ব্যবসা এমন কি এ দেশে তাহাদের অস্তিত্বের বিপদ আশংকায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। মীরনের আশা ছিল ডাচ ও ইংরেজ এই দুই বিদেশী শক্তি যুদ্ধ করিয়া পরস্পর দুর্বল হইয়া পড়িবে। যে দল বিজয়ী হইবে সেই পক্ষে যোগ দিবার জন্য তিনি সসৈন্যে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আলীবর্দী যেমন ১৭৫২ সাল হইতেই সিরাজকে মসনদের পাশে বসাইয়া নবাবী শাসনকার্যের উপযোগী করিয়া তুলিতেছিলেন, মীর্জাফরও বৃদ্ধাবস্থায় ভাবী নবাবের দায়িত্বপূর্ণ কার্যে মীরনের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন। দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীরের নিকট হইতে মীরন ইতিমধ্যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদে সনদ গ্রহণ করেন।

মীরনের প্রকৃত নাম ছিল সৈয়দ মীর মহম্মদ সাদেক আলী খান বাহাদুর আসাদ জঙ্গ। মীর্জাফর তাহাকে ছোট নবাব বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মীর্জাফর ও মীরন উভয়ের মস্তকেই শীর্পা বা রাজমুকুট লক্ষণীয়। মুর্শিদাবাদে গুজব প্রচারিত হইল, ক্লাইভ মীরনকে গুপ্তহত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। পেট্রুস নামে একজন আর্মেনীয়ান ব্যবসায়ী এই গুজব রটানর মূলে ছিল। সে মীরনকে এই গোপন সংবাদ জানাইয়া দেয়। সিক্রেট কমিটির নিকট মিঃ ওয়াট্স-এর পত্রে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। সন্দেহক্রমে ইংরেজ সরকার পেট্রুসকে ইংরেজ দরবারে ভকিল পদ হইতে বরখাস্ত করিয়া কলিকাতার ইংরেজ বসতি হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিল। ক্লাইভ কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ সুলেভানকে এ দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে এক বিস্তৃত বিবরণ দেন। তাহার মতে "এ দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন শক্তি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া বিশ্বাসঘাতকতার উপর অধিকতর নির্ভরশীল।" শাসক গোষ্ঠীর উপর ক্লাইভের বিরূপ মনোভাব নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশে পরিস্ফুট হইয়াছে :

মীরনের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ—হিজরী ১১৭১ (জাফ্রা নবাবের সৌজন্যে)

To Sulivan—

"You Sir—are well acquiented with the nature and disposition of these mussalmans. Gratitude they have none, base men of very narrow conception and have adopted a system of politics more peculiar in this country than any other, to attempt everything by treachery than force. Black troops much better paid and treated by us than by the country power, very reliably enter our service."

To Pitt—

"The natives have no securities for their life and prosperities. They will rejoice in so happy and exchange as that of a mild for a despotic government."

"ইংরেজরা কিন্তু এ দেশে তাহাদের দাবি দাওয়া আদায় করিতে লিখিত চুক্তি বা সন্ধিপত্রের উপর অধিকতর আস্থা রাখে।" ক্লাইভের এই উক্তির সহিত তাহার কার্যের অনেক সময় সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না। পলাশীর পূর্বে মীর্জাফরের সহিত চুক্তি পত্রে উমিচাঁদকে প্রতারিত করিবার জন্য তিনি একটি জাল দলিল তৈয়ারি করিয়াছিলেন। অ্যাডমিরাল ওয়াটস কিন্তু ঐ দলিলে স্বাক্ষর করিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। ওয়াট্সের নাম ক্লাইভের আদেশে লসিংটন দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। অ্যাডমিরাল ওয়াট্স ছিলেন ভারতে ইংল্যান্ডের রাজকীয় নৌ-সেনাবিভাগে প্রধান সেনাপতি। তিনি যুদ্ধে জয় পরাজয়ের উপর পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি জঙ্গী মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "দেশে এমন আগুন প্রজ্বলিত করিব, সমস্ত গঙ্গার জল দিয়াও তাহা নির্বাপিত করা যাইবে না।" ইংরেজ

চরিত্রে এইরূপ বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ বিরল নহে। ক্লাইভ হলওয়েল সাহেবের উপর সামরিক শাসনভার ন্যস্ত করিয়া ইংল্যাণ্ড রওনা হইলেন। অল্প দিনের মধ্যে শাহ আলম পুনরায় বিহার আক্রমণ করিলেন। কর্নেল কলিয়ট ৩০০ ইংরেজ, ১০০০ ভারতীয় সিপাহী ও মীরন ১৫০০ শত দেশীয় সৈন্যসহ বিহারের ডেপুটি নবাব রামনারায়ণকে সাহায্যের জন্য রওনা হইলেন।

পূর্ণিয়ার ফৌজদার খাদিম হোসেন ষোল হাজার সৈন্যসহ বাদশাহের সাহায্যে রওনা হইলেন। কর্নেল নক্স্ তড়িৎ গতিতে মাত্র তেরদিনে বর্ধমান হইতে পাটনার নিকট গঙ্গা নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া খাদিম হোসেনের সৈন্যদের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করিলেন। নবাব ও ইংরেজ সৈন্য মিলিত হইয়া পাটনাতে পেঁাছিলে শাহ আলম পাটনার দশ মাইল দূরে পশ্চাদপসরণ করেন। কলিয়ট শাহজাদার পলায়ন পর সৈন্যদের অনুসরণ করেন। মীরন দিল্লীর সম্রাট হইতে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর সনদ

ইংরেজ অধীনে বন্দুকধারী সিপাহী

পাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পলায়ন পর শাহ আলমকে নিজ সীমানার বাহিরে আক্রমণ করা অনুচিত মনে করিলেন। স্বধর্মীয় সম্রাটের সহিত যুদ্ধে ক্ষান্তি দিয়া তিনি রাজনীতিজ্ঞের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংরেজরা তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারিল। শুভদিনক্ষণ না দেখিয়া তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া সমীচীন মনে করিলেন না। ইহা রাজনৈতিক চাতুরীও হইতে পারে। সিয়া মুসলমানেরা অনেকে হিন্দুদের মত দিনপঞ্জী ব্যবহার করেন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশ্বাসী। গোঁড়া সুন্নী মুসলমানেরা এই জন্য সিয়া মুসলমানদের সুনজরে দেখেন না।

১৭৬০ সালের ২রা জুলাই সিরাজের মৃত্যুর ঠিক চারি বৎসর পরে দারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিল। ভীষণ ঝড়বৃষ্টির প্রকোপে মীরন তাহার বড় তাঁবু হইতে একটি ছোট তাঁবুতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। ছোট তাঁবুটির নাম 'দিলীর খানি পাল।' বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছোট তাঁবু 'দিলীর খানি পাল' বলিয়া পরিচিত ছিল। মীরনের চিত্তবিনোদনের জন্য দুই-তিনজন সহচরী সঙ্গে থাকিত। ঝড়ের জন্য সহচরীদের বিদায় দেওয়া হয়। এমনও হইতে পারে যে ষড়যন্ত্রকারীদের নারী হত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল না। ঘুম পাড়াইতে ও গা হাত পা মালিশ করিতে আরো দুইজন লোক নিযুক্ত থাকিত। সাধারণত নবাবের শরীর-রক্ষীরা পাহারায় থাকিত। কিন্তু সেদিন পাহারারত কোন রক্ষীর উল্লেখ পাওয়া যায় না, ইহা লক্ষণীয়। পরবর্তী রক্ষী আসিয়া দেখিল তাঁবুতে মীরন সহ আর দুই ব্যক্তি মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। মীরনের মস্তকে পাঁচ-ছয়টি ক্ষতচিহ্ন। শরীর ও পৃষ্ঠদেশে ছয়-সাতটি লম্বমান আঁচড়ের দাগ। মাথার দিকে তক্তপোশ সম্পূর্ণ পুড়িয়া গিয়াছে। তরবারিতে দুতিনটি ছিদ্র রহিয়াছে। বন্দুকের ব্যবহার তখন প্রচলিত ছিল। কাজেই মস্তকে ও তরবারির ছিদ্রগুলি গুলি-বিদ্ধ হওয়ার চিহ্ন—ইহা মনে করা কি একেবারেই যুক্তিহীন? যাহাই হউক, অপমৃত্যু সাধারণের নিকট গোপন রাখা হইল। পাটনায় ইংরেজ অধ্যক্ষ ওমিয়েট সাহেব সংবাদ পাইয়া তাহার দোভাষী ও গোপন বিভাগের কর্মচারী মিঃ লসিংটন সাহেবকে মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিতে নির্দেশ দিলেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মিঃ ওমিয়েট কলিকাতার ইংরেজ প্রধান ভেন্সিটার্টের বিরুদ্ধ পক্ষ ছিলেন। মিঃ লসিংটনকে মীরনের মৃতদেহ পরিদর্শন করিতে দেওয়া হয় নাই। এই সংবাদে কর্নেল কলিয়ট শাহজাদার অনুসরণ না করিয়া ত্বরায় পাটনা শিবিরে ফিরিলেন। মীরনের মৃতদেহ হস্তীপৃষ্ঠে হাওদার উপর শোওয়াইয়া রওনা করান হইল। মীরন ভয়ানক অসুস্থ—সাধারণের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করিবার জন্য তাহার পায়ের ও মাথার দিক অনাবৃত রাখা হইল। শাস্ত্রানুযায়ী মুসলমানদের মৃতদেহ বহন করিবার সময় নূতন কাপড় দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত রাখিতে হয়। একদিনে বিশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হাতী গঙ্গার তীরে পেঁাছিলে হস্তীপৃষ্ঠে

হইতে মৃতদেহ একটি কাফনে রাখিয়া বজরায় নদীপথে পাঁচ দিন পর রাজমহলে আনা হইল। মুসলমান শাস্ত্রানুযায়ী শবদেহ রাজমহলে শরীফা বাজার নামক স্থানে কবর দেওয়া হয়। মীরনের মৃত্যু সংবাদে সৈন্যরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে এই আশংকায় গোপনীয়তার কারণ দর্শানো হইয়াছে। কোন্ শক্তির ইচ্ছায় এই ঘটনা গোপন রাখা হইয়াছিল, সৈন্যরা কাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইবে—তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। রাজা রাজবল্লভ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মীরনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি মীরনের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে মৃতদেহ রাজমহলে আনা হয়। তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। ঘটনা পরম্পরায় মনে হয় মীরনের স্বাধীনচেতা মনোভাবই তাহার মৃত্যুর কারণ এবং এই ঘটনা যে ইংরেজদের প্ররোচনায় ঘটিয়াছিল তাহা 'মোতাক্ষরিন' অনুবাদক গোলাম মোস্তাফা সন্দেহ করিতে কার্পণ্য করেন নাই। 'মোতাক্ষরিন' লেখক গোলাম হোসেন নবাব সরকারে কোন কার্য সংস্থান করিতে না পারায় মীর্জাফরের উপর বিরূপ ছিলেন। ঘটনার সময় তিনি পাটনায় উপস্থিত থাকিলেও মীরনের মৃত্যু সম্বন্ধে নির্ভরশীল কোন তদন্ত না করিয়া লোকমুখে শোনা কথার উপর বিবরণী লিখিয়াছেন। মীরনের সহোদরা ভগিনী ময়না বিবির স্বামী মীরকাশেম ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র। ইংরেজরা সাধারণত ব্যবসায়ীদের সহিত যোগাযোগ রাখিত। মীরকাশেমকে ইংরেজদের সহিত গোপন সংযোগরক্ষা ও পরামর্শে লিপ্ত দেখা যায়। সিরাজ বন্দী হইলে মীরন লুৎফুন্নেসার নিকট হইতে বহু মূল্যবান হীরা, জহরত, মণি, মুক্তা ও ধনরত্নাদি আত্মসাৎ করেন। মীরনের সৈন্যদের প্রচুর অর্থে বশীভূত করিয়া মীরকাশেম বাংলার মসনদে বসিতে উৎগ্রীব হয়। "চুক্তিপত্রে বিশ্বাসী" ইংরেজরা সমস্ত চুক্তি লংঘন করিয়া গোপনে মীর্জাফরকে তাহার প্রাসাদে গভীর রাত্রিতে অতর্কিতে অবরোধ করিলেন। পুত্রশোকে জর্জরিত মীরজাফর ইংরেজদের প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে মীরকাশেমের পতাকাতলে লাল পোশাক পরিহিত ইংরেজ সৈন্য সমবেত দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমরা স্বেচ্ছাদর্পণে চুক্তি ভুলিয়া গিয়াছ, তাহাতে আমার কিছুই করিবার নাই। আমার এইরূপ অভিসন্ধি থাকিলে অনায়াসে বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তোমাদের উচ্ছেদ করিতে পারিতাম। আমার পুত্র জেষ্ঠ নবাব পূর্বেই আমাকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়াছিল।"
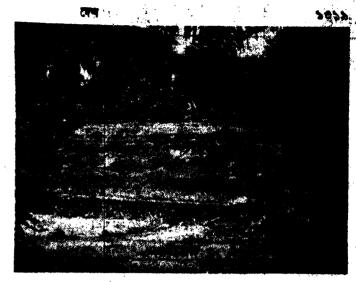
মীরজাফর নিরুপায় হইয়া নিজ জামাতার হাতে জীবন আশংকায় নিরাপত্তার জন্য কলিকাতায় ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্ত্রী সাখামাম তাহাকে অনুগমন না করিয়া কন্যা ময়না বেগম ও জামাতা মীরকাশেমের সহিত মুর্শিদবাদে রহিয়া গেলেন। মীরকাশেম মীরজাফরকে এই পৃথিবী হইতে অপসারণ করিবার নিমিত্ত মীরনের মৃত্যু হইতেও অধিকতর কোন বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করিবার জন্য হলওয়েল সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রাজমহলে শরীফ বা জারে মীরনের সমাধি

এই সকল ঘটনা হইতে সন্দেহ হয় মীরনের মৃত্যুতে মীরকাশেমের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা ছিল। ফরাসী লেখক মঁসিয়ে জাঁ লারিস্তাঁ মীরনের মৃত্যুকে গুপ্তহত্যা বলিয়া অভিমত দিয়াছেন। তাহার মতে প্রকৃত ঘটনাকে ঢাকিবার জন্য মীরনের তাঁবুতে আগুন ধরাইয়া সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদি নষ্ট করা হইয়াছে।

মীরনের মৃত্যুর পর তাহার একটি দিনলিপি পাওয়া যায়। শোনা যায় ঐ দিন-

লিপিতে প্রায় তিনশত লোকের নাম লেখা ছিল। তিনি ঐ সকল লোককে একে একে হত্যা করিবেন, কেহ কেহ এরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছে। দেশী ও বিদেশী লেখক-দের কলমে মীরন নিষ্ঠুর প্রকৃতির উদ্ধত, বিবেচনাহীন ও অস্থিরচিত্ত যুবক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। দুষ্কৃত কার্যে তিনি সিরাজকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহার অপমৃত্যু সমর্থন ও বজ্রাঘাতের ঘটনা সম্বন্ধে সরলভাবে সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কেবলমাত্র ইংরেজ আশ্রিত লেখকদের মতবাদই গ্রহণযোগ্য নহে। পাটনা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন কালে একজন আর্মেনীয়ান বিধবা মহিলা ও তাহার কুমারী ভগ্নীকে মীরন পথিমধ্যে অপহরণ করে। রংপুরের ফৌজদার আলীবর্দী মহিষীর মৃত ভ্রাতা কাশিম আলী খাঁর দুই কুমারী কন্যা মীরনের হাতে লাঞ্ছিত হয়। তিনি সিরাজের স্ত্রী লুৎফন্নেসাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন —করম আলীর মোজাফর নামায় উল্লেখ আছে। শাহজাদা আলী গহরের সহিত যুদ্ধে তীর বিদ্ধ হইয়া মীরনের দুটি দাঁত ভাঙিয়া যায়। তাহার স্কন্ধেও একটি তীর বিদ্ধ হয়। তথাপি তিনি বীরের মত যুদ্ধ করিয়া যান। মীরনের বংশের বর্তমান বয়োজ্যেষ্ঠ নবাব সৈয়দ সেকেন্দার ঝাঁ সাহেব মীরনের শেষ ব্যবহৃত একখানা রক্তাক্ত বালিশের তুলা সংরক্ষণের কথা প্রকাশ করেন। তাহাদের বিশ্বাস মীরন গুলি বিদ্ধ হইয়া মারা যায়। মীর্জাফরের মৃত্যুকালে মীরনের ছয় বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্র জীবিত ছিল। তাহার নাম সৈয়ফ মর্তজা। নাবালকের সহিত কোন চুক্তি করিয়া তাহাকে মসনদে বসাইলে ভবিষ্যতে নানা জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে এই ভয়ে ইংরেজরা মনি বেগমের পনর বৎসরের পুত্র নাজিমদ্দৌল্লাকে বাংলার মসনদে বসাইলেন। মীরন হুগলীর ফৌজদার খান জাহানের পুত্র আলীফ খানের কন্যা ফজিলুন্নেসাকে বিবাহ করেন এবং তাহার কন্যা মেহেদী বেগমের সহিত পারশের যুবরাজ সুলেমান মীর্জা দাউদের বিবাহ হয়। ইহাতে মীরনের বংশকৌলিন্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।
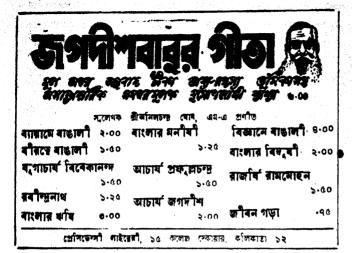
তৎকালীন ডাচ ও ফরাসী লেখকদের লেখনী অনুসন্ধান করিলে বাংলার ইতিহাসে নূতন পটভূমিকার সৃষ্টি হইতে পারে। পারস্পরিক ঘটনা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিশ্বাসঘাতকতাই বাংলা দেশে নবাবী আমলের পতনের মুখ্য কারণ। নতুবা মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্য কিছুতেই এ দেশে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিত না। দিল্লির সম্রাটের প্রতিকূল আচরণও বাংলার নবাবীশাসন অবসানের অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

ঘুঘু কাহিনী

তারাপদ রায়

হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তার মোড়ে চলে এলেন সদাব্রতবাবু। অবশ্য 'মানসিক সদন' থেকে এই নাগেরবাজারের মোড় খুব কাছে নয়, কিন্তু কিই বা করা যাবে। আজ আড়াই বছর এই রকম চলছে। কোনো উন্নতিই হচ্ছে না। সেই রিটায়ার করে যখন প্রথম সরকারী কোয়ার্টার ছেড়ে সি, আই টি'র নতুন ফ্ল্যাট বাড়িটাতে এলেন সদাব্রত, তখনই ব্যাপারটার শুরু।

বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকলেই, কারণে-অকারণে, দিনেদুপুরে এমনকি রাত্রিতে ঘুমের মধ্যে পর্যন্ত মাথার মধ্যে, নাকি ঘরের মধ্যে, ঘুঘুর ডাক শুনতে পান সদাব্রতবাবু। কলকাতা শহরের ফ্ল্যাট বাড়িতে ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে ঘুঘুর ডাক, মাথা খারাপ হলো নাকি আমার?' আজ প্রৌঢ় বয়সে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় সদাব্রত রায়ের। "আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? এওতো আর বলা যায় না কাউকে, যাদের বলা যেতো—" একটা চাপা নিঃশ্বাস অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ়ের বুকের মধ্য থেকে নাক পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে।

নিজের থেকেই বন্দোবস্ত করেছেন, প্রত্যেক শনিবার আসতে হয় এখানে, এই মানসিক সদনে, ডাক্তার সান্যালের কাছে চিকিৎসা করান। মাসে একদিন ইলেকট্রিক শক নিচ্ছেন আজ এক বৎসরের বেশী হয়ে গেলো। সামনের শনিবার আবার শকের জন্য, ভাবতে গিয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে সদাব্রতর, না আর পারা যায় না।

কিন্তু এই মুহূর্তে একটা ট্যাক্সি চাই। এখন অফিসের সময়। দশটা বাজে, বাসে ওঠা অসম্ভব। কিন্তু ট্যাক্সি তার চেয়েও অসম্ভব। শরীর অস্থির করতে থাকে তাঁর, মাথার মধ্যে সব উল্টোপাল্টা ভাবনা ভিড় করে। যদি একদম ক্ষেপে যেতেই হয়, খুন করে ক্ষেপে যাবো, আর তখন ট্যাক্সি চালাবো, দেখি কে ধরতে পারে? 'এই ট্যাক্সি, এই ট্যাক্সি'....ছুটবার দৌড়িয়ে ব্যর্থ হলেন সদাব্রতবাবু।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ব্যথা হয়ে গেলো। ঠিক এই সময় প্রায় একটা দুর্ঘটনা। একটা বাস স্টপে একটুও না থেমে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছিলো, একটা হিন্দুস্থানী মুটে-মজুর গোছের লোক হবে সেই বাস থেকে উল্টোদিকে মুখ করে ঝাঁপিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে, জীবনপণ করে রাস্তায় ছিটকে পড়লো। বাসের ভেতর থেকে এবং রাস্তার চারপাশ

চরকিবাজী কিন্তু থামল না

থেকে, দোকানঘরগুলো থেকে লোকজন খুব চেঁচিয়ে চীৎকার করে উঠলো, 'এই রোককে, রোককে,...গেলো, গেলো,...।'

বাসটা কিন্তু একটুও থামলো না, ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেলো। পতিত হতভম্ব লোকটা একটা ডিগবাজি খেয়ে প্রথমেই সদাব্রতবাবুর গায়ের ওপর, তার-পর হুমড়ি, হুমড়ির পর হুমড়ি খেয়ে পড়লো রাস্তায়, চরকিবাজি কিন্তু থামলো না, আবার উঠে দাঁড়াতেই রাস্তার উপর পড়ে গেলো। চলন্ত বাস থেকে উল্টোদিকে মুখ করে নামলে এই রকমই হয়, লোকটা রাস্তার উপর বেশ কয়েকটা গড়াগড়ি খেলো। তাগিসে বিশেষ কোনো জোর আঘাত লাগেনি, কোনোদিক থেকে একটা গাড়ি এসেও চাপা দিতে পারতো। সদাব্রতবাবু এতক্ষণ ঠিক লক্ষ করেননি, একটি কালোমতন রোগা লম্বা চেহারার যুবক তাঁর পাশেই বোধ হয় এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। সে-ই ছুটে গিয়ে লোকটাকে ধরে সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলো; লোকটা তখন হাঁফাচ্ছে, ঘটনার আকস্মিকতায় সে একটু হতভম্ব হয়ে গেছে। হঠাৎ সেই যুবকটি হিন্দুস্থানীটির ঘাড়ে একটা ঝাঁকি দিয়ে প্রশ্ন করলো,

'কি রাস্তাটা ভাঙতে পারলে না?'

আশেপাশের সমস্ত লোকগুলো হোহো করে হেসে উঠলো, সদাব্রতবাবুও হাসলেন। লোকটা আরো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো।

যুবকটির এই আচরণ এবং কথাবার্তা সবই সদাব্রতবাবুর কেমন যেন চেনাচেনা মনে হলো। সদাব্রত একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

'আচ্ছা, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

যুবকটি একটু ঘাড় চুলকে বললো;

'আপনি বোধ হয় আমার বড়দাকে দেখেছেন, আপনি কি কখনো ধানবাদে গিয়েছেন?'

সদারতবাবুর এইবার মনে পড়লো এই ছেলেটিকেই মাসখানেক আগে গোলদীঘির কাছে দেখেছিলেন। সেদিনও এই রকম একটা ছোটোখাটো দুর্ঘটনা।

কলেজ স্ট্রীট দিয়ে আসছেন, হঠাৎ দেখলেন সমস্ত লোক ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়োচ্ছে, যে যে-রকম পারে ছুটছে, তিনি কিছু বুঝতে না পেরে সকলের সঙ্গেই দৌড়ে গোলদীঘির মধ্যে ঢুকলেন। এর মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে এই ছেলেটিও ঢুকলো. সার্টের হাতা ছিঁড়ে গিয়েছে, ফুলপ্যান্টের হাঁটুতে কাদা লেগে রয়েছে, হুমড়ি খেয়ে পড়ার চিহ্ন বেশ বোঝা যাচ্ছে, এই মাত্র ধস্তাধস্তি গোছের কিছু হয়েছে। ছেলেটি এসে সদারতবাবুকে সামনে পেয়ে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলো,

'আপনারা সব এ রকম ছুটে পালালেন কেন, আমি কিছু বুঝতে পারলাম না,

আপনি বোধহয় আমার বড়দাকে দেখেছেন

আমি দেখতে এগুচ্ছিলাম, আমাকে একটা ক্যাপামতন ষাঁড় তেড়ে এসে গুঁতো দিয়ে ফেলে দিলো।'

কেন পালিয়েছিলেন ব্যাপারটা এতক্ষণে সদারতবাবুর বোধগম্য হলো। খুব বাঁচা গেছে এই বুড়ো বয়সে ষাঁড়ের গুঁতো, বাবা কিন্তু ছেলেটির প্রশ্ন তাঁকে একটু ভাবিয়ে তুললো। পাশে কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তারা ফিক করে হেসে ফেললো বোধ হয় প্রশ্নটি শুনেই। তিনি একবার মেয়েদের দিকে তারপর একবার বিধ্বস্ত ছেলেটির দিকে তাকালেন। তখনই তাঁর কেমন চেনা মনে হলো, বেশ চেনা চেনা মনে হলো ছেলেটিকে, জিজ্ঞাসা করলেন,

'আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

যুবকটি বললো,

'আপনি বোধ হয় আমার বড়দাকে দেখেছেন, আপনি কখনো ধানবাদ গিয়েছেন?'

সদারত ঘাড় নেড়ে না জানিয়েছিলেন।

'তাহলে ভাগলপুর, মুঙ্গের? আমার বড়দা বিহারে স্টেশনমাস্টার, তাঁকেই দেখেছেন।' ছেলেটি পরম বিশ্বাসের সঙ্গে বললো।

কিন্তু সদারতবাবু দেওঘর ছাড়া বিহারে আর কোথাও কোনোদিনই যাননি। তাঁর এও স্পষ্ট ধারণা এই যে, এই ছেলেটিকেই তিনি বহুবার কোথাও দেখেছেন, মাথাটা ঠিক নেই না হলে ঠিক মনে করা যেত।

ছেলেটি যখন জানতে পারলো সদারতবাবু তার বড়দাকে কোথাও দেখেনি বরং তাকেই কোথাও দেখেছে বলে মনে করছেন, বললো;

'তা হলে আপনি আমার ছোড়দাকে খুব সম্ভব দেখেছেন। অবশ্য ছোড়দাকে দেখলে আমার ভাই বলে চেনা কঠিন। তার রঙ খুব ফর্সা, স্বাস্থ্য ভালো তার ওপরে বেঁটে, খুবই বেঁটে। আমার সঙ্গে তার চেহারার কোনো মিলই নেই।'

যুবকটির এই ধরনের অর্থহীন, অসংলগ্ন আত্মপরিচয়ে সদারত সেদিন খুবই বিরক্ত বোধ করেছিলেন। যথেষ্ট অবাকও হয়েছিলেন, আজো তাই হলো। এর কথার কোনো মাথামুণ্ডু ধরা যায় না। এর ছোড়দার সঙ্গে যদি এর চেহারার একেবারে কোনো মিলই না থাকে তবে একে দেখে এর ছোড়দার কথা মনে পড়তে পারে কি করে?

এর মধ্যে ছেলেটি দুই হাত উঁচিয়ে রাস্তার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে একটা দিকে-ডাউন-ট্যাক্সি ফাঁকা যাচ্ছিলো দেখে সেটা আটকালো, তারপর ড্রাইভারের সঙ্গে এক-চোট বচসা এবং জোর করেই একরকম ট্যাক্সির মধ্যে উঠে বসলো। উঠে সদারতকে ডাকলো,

'আসুন আপনি তো ঐ দিকেই

যাবেন। আপনাকে শ্যামবাজারে নামিয়ে দিয়ে যাবো?'

সদাব্রত খুব খুশীই হলেন, ছেলেটা ভালোই বলতে হবে। একবার শ্যামবাজার পেঁছালে সেখান থেকে যা হোক গাড়ি-টাড়ি একটা ধরা যাবে।

ট্যাক্সিতে বসে ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কতদূরে যাবেন?'

'এই ইণ্টালির কাছে। আপনি?'

'আমিও তো ইণ্টালির দিকেই যাবো। ঠিক আছে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।' সদাব্রত বিশেষ আশ্বস্ত কণ্ঠে বললেন।

ইণ্টালিতে সি আই টি'র মোড়ে এসে সদাব্রত বললেন, 'আমার এখানে নামলে হবে।'

ছেলেটি বললো, 'ঠিক আছে আপনি নামুন, আমিও এখানেই নামতাম। তবে পার্কসার্কাসে একটা কাজ আছে, সেটা সেরে আসি।'

ছেলেটি চলে গেলো। ট্যাক্সির ভাড়াটা দিতে চাইলেন সদাব্রত কিন্তু ছেলেটি কিছুতেই নিলো না। সদাব্রত ঘরে ফিরতে ফিরতে ভাবতে লাগলেন, ছেলেটিকে কোথায় দেখেছি?

এর পরেও সদাব্রত ছেলেটিকে একাধিকবার এদিকে ওদিকে এই পাড়াতেই দেখতে পেলেন। সেই সব অসংলগ্ন উত্তরমালার কথা ভেবে বিশেষ ভরসা পেলেন না আলাপ করবার। একটু এড়িয়েই চললেন। কিন্তু ছেলেটির ব্যাপার-স্যাপার কি রকম যেন। এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যার দিকে সদাব্রত রাস্তায় একটু পায়চারি করছেন, পার্কের পাশের রাস্তা, পার্কের ধারে রাস্তা ঘেঁষে একটা বড় রাধাচূড়া ফুলের গাছ, সেইখানে ফুটপাথের ওপরে একটা হাঁটু গেড়ে ছেলেটা উবু হয়ে বসে ডান হাতের কব্জি গোলমতন করে কি যেন দেখাচ্ছে। পাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, মেয়েটি মৃদু মৃদু হাসছে। এই সময় সদাব্রত মুখোমুখি পড়ে গেলেন, এড়ানো গেল না; তার উপরে একটু কৌতূহলও ছিল। ছেলেটি সদাব্রতকে দেখে একটু অপ্রস্তুত অবস্থাতেই যেন উঠে দাঁড়ালো। সদাব্রত জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার?'

'আজ্ঞে, ও মানে মান্তু বলছিলো,' ছেলেটি মেয়েটার দিকে তাকালো, মান্তু নামে মেয়েটি তখন মুখ পার্কের দিকে ফিরিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ চাপা দিয়েছে, ছেলেটি বলে চললো, 'ও বলছিলো এটা নাগকেশরের ফুল।'

সদাব্রতকে ছেলেটি আঙুল দিয়ে দেখালো, রাধাচূড়া গাছের ডালে একটা পরগাছা, তাতে সাদা ধবধবে একগুচ্ছ ফুল ফুটেছে। সদাব্রত নাগকেশর ফুল চেনেন না, বললেন, 'এটা নাগকেশর নয়?'

'আরে না, না।' ছেলেটি আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। ফুটপাথে হাঁটু গেড়ে বসে ডান হাতের কব্জি বেঁকিয়ে দেখাতে লাগলো নাগকেশর ফুল আসলে কি রকম। মান্তু মেয়েটি তখন পার্কের রেলিঙের উপর লুটিয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীর হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। মিনিট কয়েক আগের ব্যাপারটা সদাব্রত কিছুটা অনুধাবন করতে পারলেন। কিন্তু ছেলেটির কি মাথা খারাপ, একে কি কোনো পাগলা গারদে দেখেছি, নাগের বাজারে মানসিকসদনে। না, তাও তো ঠিক মনে হয় না। এই সব ভাবতে ভাবতে সদাব্রত ফিরলেন, তখনো ছেলেটি ফুটপাথে উবু হয় বসে রয়েছে।

পরের দিন আবার শনিবার। শনিবার ইলেকট্রিক শক নিতে হয়েছে। ভীষণ যন্ত্রণা, সমস্ত শরীরে ব্যথা, মাথা দপ দপ করছে। যে সব দিনে শক নেন, সদাব্রত সারাদিন মানসিক সদনেই থাকেন, সন্ধ্যার দিকে এই ফ্ল্যাটে ফিরে আসেন। মানসিক সদনে যতক্ষণ ছিলেন বেশ ভালোই ছিলেন। কিন্তু ফ্ল্যাটে এসেই অনুভব করলেন সেই পুরোনো গোলমালটা, সেই মাথার মধ্যে, না ঘরের মধ্যে, না কোথাও কাছাকাছি—ও অসহ্য, অসহ্য বোধ হতে লাগলো। দুটো বালিশ দিয়ে মাথা চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

রাত দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ ভয়ংকর হইচই চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙলো তাঁর।

যখন ঘুম ভাঙলো, চমকে উঠলেন, সমস্ত ঘর ভর্তি আলো। তাড়াতাড়ি উঠে জানলার কাছে দাঁড়াতেই ভীষণ হল্কা লাগলো গায়ে।

ফ্ল্যাটের লাগোয়া একটা রঙের ফ্যাক্টরী, সেটা দাউদাউ করে জ্বলছে। বাতাসের ঝাপটায় আগুন ফুঁসে ফুঁসে এই ফ্ল্যাট বাড়িটার গায়ে একটা করে ঝাপটা দিচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে দুমদাম সবাই ছুটে নামছে। সদাব্রত মিনিটখানেক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর দৌড়ে গিয়ে দরজা খুললেন, সামনেই সিঁড়ি—এত বড় ফ্ল্যাট বাড়িটার সমস্ত লোক এক সঙ্গে নামার চেষ্টা করছে। তাও খালি হাতে নয়। যে যার মূল্যবান জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে নিয়েছে। কারো হাতে পুঁটলি, কারো মাথায় ট্রাংক। সদাব্রতবাবু একবার ভাবলেন; তারপর আর ঘরের দিকে ফিরলেন না, যা হয় হবে, আগুনে যদি সব

দুহাতে দুটি খাঁচা

পুড়েই যায় কিছু বাঁচানার চেষ্টা না করাই ভালো। সকলের সঙ্গে তিনিও সিঁড়ি ধরে নামতে লাগলেন।

নিরাপদ ব্যবধানে সবাই উল্টোদিকের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়ালো। এরই মধ্যে কেউ কেউ ভয়ঙ্কর কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। অবশ্য খোঁজ নিয়ে জানা গেলো বাড়ির মধ্যে ঠিক কেউ আটকে যায়নি আর আগুনও এখন পর্যন্ত বাড়িটাতে ধরেনি। রঙের ফ্যাক্টরীটাই জ্বলছে, খুবই দাউদাউ করে জ্বলছে, বহুদূরে পর্যন্ত আলো ছড়িয়ে গেছে, চতুর্দিক থেকে ক্রমাগত লোক দৌড়ে এইদিকে আসছে, আশেপাশে বাড়িগুলির জানলায়, বারান্দায় ছাদে ভিড় জমে গেছে। এই সময় ঘণ্টা দিয়ে দমকল এসে পৌঁছালো। ভীষণ ভিড়ের মধ্যে দমকলের গাড়ি ঢুকতে পারছে না। এমন সময় সেই ছেলেটি হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলো, এসে ভিড় সরিয়ে দমকলের গাড়ির জায়গা করে দিলো। তারপর সদাব্রতর খুব কাছাকাছি এসে কাকে যেন খুঁজতে লাগলো,

'মানু, এই মানু।'

সদাব্রত বুঝলেন, সেদিনের সেই মেয়েটিকে ডাকছে। পেছন দিক থেকে চাপা গলা শোনা গেলো।

'কি চেঁচামেচি করছো, এই যে আমি এখানে।'

'আমার খাঁচা এনেছো, আমার খাঁচা?' ছেলেটি ভীষণ ব্যস্ত।

মেয়েটি একটু এগিয়ে এলো, 'গয়নার বাক্স নিয়েই বেরোতে পারি না। আবার খাঁচা!' গলার স্বরে একটু তিক্ততা।

'আমার খাঁচা। আমার খাঁচা।' ছেলেটি পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে ছুট দিলো।

'এই শোনো, শোনো।' মেয়েটি ভীষণ ভয় পেয়ে ওকে ডাকতে লাগলো। দু-এক-জন লোক চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে মশায় পাগল নাকি?'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ঊর্ধ্বশ্বাস ছেলেটির পায়ের দুমদাম শব্দ সিঁড়িতে শোনা গেলো, উঠলো, নামলো। তারপর আবার এক ছুটে রাস্তার এই পাশে, একেবারে সদাব্রতর পাশে। দুহাতে দুটি খাঁচা, রাত্রিবেলা বলে বোধ হয় পর্দা দিয়ে ঢাকা।

এতক্ষণ সদাব্রত সব লক্ষ করছিলেন। এইবার ছেলেটি খাঁচা দুটি সদাব্রতর পায়ের পাশে মাটিতে রেখে হাঁফাতে লাগলো। এর মধ্যে মানু নামে মেয়েটিও এগিয়ে ওদের পাশের দিকে চলে এসেছে।

খাঁচার ভিতরে পাখির পাখার ঝটপটানি শোনা গেলো। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো কি একটা কথা সদাব্রতর মনের মধ্যে খেলে গেল। তাঁর হাত-পা থরথর করে কাঁপছে, তিনি একবার ছেলেটির দিকে একবার খাঁচা দুটির দিকে গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর হঠাৎই খপ করে ছেলেটির হাত চেপে ধরলেন

"এই যে আপনি..."

ঘটনার আকস্মিকতায় ছেলেটি যেন একটু হতভম্বই হয়ে গেছে। সে কি একটা কথা বলার জন্যে হাঁ করলো, শুধু "আ-আ-আজ্ঞে" এইটুকু বলার আগেই সদাব্রত তার হাত ধরে একটা জোরে ঝাঁকুনি দিলেন। এই মুখভঙ্গি, তাঁর ভয়ঙ্কর পরিচিত এবং এর থেকে যে উত্তর বেরিয়ে আসবে তা তাঁর প্রায় মুখস্থ। তিনি প্রায় চীৎকার করেই উঠলেন।

"না। আপনার দাদাকে আমি কোথাও কখনো দেখিনি। আমি ধানবাদ যাইনি। ভাগলপুরে যাইনি। মুঙ্গের যাইনি। জীবনে স্টেশনমাস্টার দেখিনি।' উত্তেজনায় সদাব্রতর সারা শরীর কাঁপছে।

—ছেলেটি হতচকিত অবস্থায় আবার কি যেন বলার জন্যে হাঁ করলো, কিন্তু এবারেও সদাব্রত সুযোগ দিলেন না।

"আপনার ছোড়দা, যার রঙ খুব ফর্সা, স্বাস্থ্য খুব ভালো, তার উপরে বেঁটে, খুবই বেঁটে, যার সঙ্গে আপনার চেহারার একেবারেই মিল নেই, আপনার ভাই বলে মনে হয় না, না তাকে কোথাও দেখিনি। আপনাকেই দেখছি। আপনি এই, এই ফ্ল্যাট বাড়িতেই থাকেন?"

বিমূঢ় ছেলেটিকে উদ্ধার করতেই মেয়েটি এবার কথা বললো, "হ্যাঁ, কিন্তু তাই কি হলো?"

"আপনারা দোতলায় পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন?" উকিলের মত জেরা সদাব্রতর।

"হ্যাঁ" খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো মান্নু। ছেলেটি কোনো কথাই বলছে না।

"হ্যাঁ" প্রায় ভেংচে ওঠেন সদাব্রত, "আমি থাকি ছয় নম্বর ফ্ল্যাটে, আমার পাশের ফ্ল্যাট" বিড়বিড় করতে থাকেন তিনি। তারপরেই আবার বিস্ফোরণ, "আপনাদের ঐ খাঁচায় পাখি আছে,—কি পাখি ওদুটো, ঘুঘু পাখি?"

এই সময় খাঁচার মধ্য থেকে পাখি দুটো ডেকে উঠলো, 'ঘু-উ-উ-উ, ঘু-উ-উ-উ ঘু-উ" এবং সঙ্গে সঙ্গে সদাব্রত অজ্ঞান হয়ে গেলেন, মান্নু পাশেই দাঁড়িয়েছিলো মাটিতে পড়তে দিলো না, দুহাতে দিয়ে জাপটে ধরলো সদাব্রতকে।

যখন জ্ঞান ফিরলো সদাব্রত দেখলেন তিনি নিজের ফ্ল্যাটে বিছানায় শুয়ে আছেন। ফ্ল্যাট বাড়িটাতে আগুন লাগতে পারেনি, তার আগেই রঙের ফ্যাক্টরিটার আগুন দমকলের লোকেরা নিবিয়ে ফেলেছে। তখন ভোর হয়ে আসছে, জানলা দিয়ে ফিকে আলো, একটু হিম হিম বাতাস আসছে। মাথার কাছে একটা চাদর থাকে, সেটা টানতে গিয়ে কার গায়ে হাত লাগলো, তিনি উঠে বসলেন। মাথার বালিশের পাশে খাটে গায়ে হেলান দিয়ে মান্নু বসে রয়েছে, একটু দূরে ছেলেটি। মান্নু বোধ হয় সারারাতিই তাঁর পাশে বসেছিলো, এখন ঘুমে চোখ জড়ানো। ছেলেটি সিগারেট খাচ্ছিলো। তাঁকে উঠতে দেখে সিগারেটটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলো।

মান্নু প্রথম কথা বললো, 'এখন কেমন বোধ হচ্ছে।'

'ভালো।' সদাব্রতর এখন ভালোই লাগছিলো।

'আমরা খুব চিন্তায় পড়েছিলাম।' মান্নু বললো, ছেলেটি চুপ করে আছে।

'আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম বুঝি?' সদাব্রত জিজ্ঞাসা করলেন।

'হ্যাঁ ঘুঘুটা খাঁচায় ডেকে উঠলো আর আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এতবড় আগুন লাগলো, এত দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি তারপর সামান্য ঘুঘুর ডাক শুনে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন?' মান্নু হাসতে হাসতেই প্রশ্ন করলো।

সদাব্রত ম্লান হাসলেন, 'রিটায়ার করার পর থেকে একলা এই ফ্ল্যাটে আছি। যখন-তখন ঘরে বসে ঘুঘুর ডাক শুনি। আমি কি আর ভাবতে পেরেছি আমার পাশের ফ্ল্যাটে কেউ ঘুঘু পোষে। আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে আমি মাথার চিকিৎসা করছি, তিন বছর ইলেকট্রিক শক নিচ্ছি, এই ঘুঘুর ডাক মাথার মধ্যে শুনতে পাই বলে।'

মান্নু অত্যন্ত লজ্জিত মুখে ছেলেটির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তারপর বললো,

দেখুন কি কাণ্ড। ও'র যত সব উদ্ভট শখ। যন্তু পাখি, জানোয়ারের জন্য। আমিও একদিন পাগল হয়ে যাবো।'

সদাব্রত যুবকটির বর্তমান, অসহায়, অপ্রস্তুত অবস্থা অনুমান করে কিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল হওয়ার চেষ্টা করলেন। এক সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক।

মেয়েটির নাম মানু, বেশ নাম, কিন্তু এর নাম কি? ছেলেটিকে বললেন, 'আচ্ছা, আপনাকে...'

কথা শেষ করতে হলো না। তার আগেই ছেলেটি মুখ খুললো। সেই মুখস্থ উত্তরমালার বহু পরিচিত মুখভঙ্গি। আবার সেই ধানবাদ স্টেশনের স্টেশন মাস্টার, সেই একেবারে অমিল চেহারার ছোড়দা।

ভাগ্যিস, এই সময়ে দুটো ঘুঘু ডেকে উঠলো, 'ঘু-উ, ঘু-উ, ঘু-উ-উ, ঘু-উ।' সদাব্রত বেশ জোরে মাথায় একটা ঝাঁকি দিলেন; না, মাথার মধ্যে নয়।
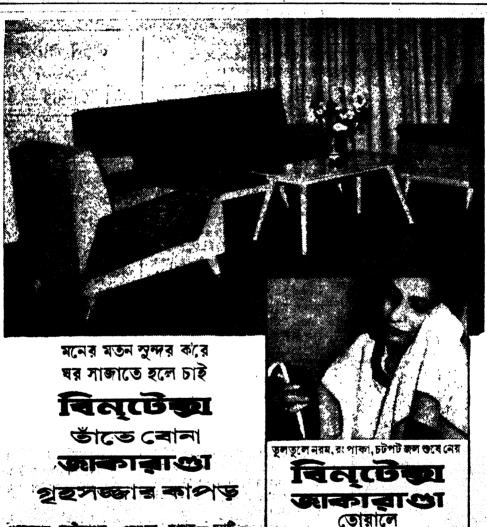
ঘরে বাইরে

শ্রীমতী

গত ১৭ই জুলাই থেকে ১৯শে জুলাই তিনদিন অবৈতনিক পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষাদানব্রতীদের এক সম্মেলন হ'লো নূতন দিল্লিতে। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মেহতা উদ্বোধনী ভাষণে লোকসংখ্যা বিস্ফোরণ বা Population explosionকে আজ ভারতবর্ষের গৃহাভ্যন্তরের শত্রু বা enemy within the gate বলে অভিহিত করেন। চোরের মত জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি, সব পরিকল্পনা কৃতকার্যতা গ্রাস করতে বসেছে। কাজেই পরিবার পরিকল্পনাকে প্রায় এক বিরাট সংগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করে কর্মীদের অগ্রসর হ'তে হবে। আর সব সংগ্রাম যেমন সকলকে সমান সুবিধা দিতে পারে না, এ সংগ্রামেও হয়তো কোথাও ভুল হবে, ত্রুটি হবে কিন্তু সংগ্রামে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে যে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'তে পারে তা ভয়াবহ। পরিকল্পনা কার্যকরী করার লক্ষ্য হবে এক যুগে জন্মসংখ্যা অর্ধেক করা। অবশ্য এখন পরিবার পরিকল্পনা প্রোগ্রাম যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে কিন্তু সমস্যার গুরুত্ব হিসাব করলে এও অতি সামান্য।

পরিবার পরিকল্পনার বহু উপায় আছে কিন্তু কোন্ উপায় সবচেয়ে ভাল একথা জোর করে বলা কঠিন। তবে স্বামী-স্ত্রী যথেষ্ট শিক্ষা পেলে, নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী পথ বেছে নিতে পারেন। কিন্তু যথেষ্ট সচেতনতা সত্ত্বেও জন্মনিরোধকের সম্যক ব্যবহার দেশের সর্বত্র হ'চ্ছে না। জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ডাঃ চন্দ্রশেখরনের মতে বোম্বাই শহরে মহিলাদের অন্তত শতকরা ৭০ জন পরিবারের আকার বৃদ্ধি যে সমাজের, দেশের বা নিজেদের পক্ষে কল্যাণকর নয় তা বোঝেন, কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করে সন্তান সংখ্যা সীমাবদ্ধ করেন মাত্র শতকরা ২০ জন। তাই অশোক মেহতা শিক্ষাদানব্রতীদের (Honarary family planing education leaders) উদ্দেশ্য করে বলেন—"চিত্রকরের রংপাত্রের সমস্ত রং ব্যবহার হোক, তূণের সব কটি তীর প্রয়োগ হোক, তবেই আপনাদের অভিজ্ঞতা পথপ্রদর্শন করবে, কোথায় কি প্রণালী সবচেয়ে কার্যকরী হবে তা বলে দেবে।"

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষাব্রতী সম্মেলনে উদ্বোধন ভাষণ প্রদানরত শ্রীঅশোক মেহতা—পাশে উপবিষ্ট ডাঃ সুশীলা নায়ার

শ্রীমেহতা প্রদেশগুলির সঙ্গে পরামর্শে অনুভব করেছেন—অনেকেই জন্মনিরোধক ব্যবহারের চেয়ে শল্য চিকিৎসায় নারী বা পুরুষকে অনুর্বর (Sterile) করার বিশেষ পক্ষপাতী। পুরুষকে অনুর্বর করার যে সামান্য শল্যচিকিৎসা বা Vasectomy আছে তার বিরুদ্ধে আপত্তির একটি বড় কারণ ছিল যে, এ অনুর্বরতা বরাবরের জন্য হয়তো অনেক ক্ষেত্রে মানসিক অশান্তি বা পারিবারিক অসুবিধার কারণ হ'তে পারে। কিন্তু আধুনিক বিশেষজ্ঞ বলেন, সে ভয় আর থাকার কোন কারণ নেই। [illegible] অতি সহজ, স্বল্পব্যয়সাধ্য [illegible] উপায়ে অনুর্বর করা হয়, তাও আবার প্রয়োজন হ'লে যথাস্থানে পুনর্মিলিত

করে দেওয়া যায়। Sterilization-এর স্বপক্ষে এখন তাই জনমতের অনেক অংশ আছে।

পৃথিবীর বহু দেশে কোন না কোন সময় জন্মনিয়ন্ত্রণকে নানাভাবে প্রচার করে, প্রসার করে অর্থনৈতিক অঘটন থেকে নিজেদের রক্ষা করেছে। এমন কি গর্ভপাত পর্যন্ত আইন ও সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছে। জাপানে, পূর্ব ইউরোপের বহু দেশে, কোন কোন ক্যাথলিক দেশেও গর্ভপাত জনসংখ্যা সীমায়িতকরণে সাহায্য করেছে। ভারতবর্ষে অবশ্য গর্ভপাত স্বীকৃতি পাবে কিনা সন্দেহ কিন্তু Vasectomy যদি প্রসার লাভ করে তবে অনেক উপকার হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা নায়ার তাঁর ভাষণে বলেন, পরিবার পরিকল্পনা

> লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কাছে আর সব বিরাট সমস্যার একটি ছিল। বহু সময় তিনি এ বিষয় আলোচনা করেছেন।
>
> বলেছেন, "ভারতবর্ষের বিরাট জনতা পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে সমাদরে গ্রহণ করবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।"
>
> বলেছেন, "পরিবার পরিকল্পনার প্রশ্ন এক গুরুতর প্রশ্ন। পরিবারের স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে এ এক সামাজিক দায়িত্ব। ভারতবর্ষের অগ্রগতির সংগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।"
>
> বলেছেন, "পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব আজ স্বীকৃতি পেয়েছে। সাধারণের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আজ প্রয়োজন উৎসাহপূর্ণ ও সঙ্ঘবদ্ধ কাজ। আমার আনন্দ হচ্ছে যে দেশের সর্বত্র উৎসাহী কর্মী সংখ্যা কাজ করে চলেছে। আমি তাদের সার্থকতা কামনা করি।"

শিক্ষা শিবির বা orientation camp-গুলি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে। কোথাও বা এই সব ক্যাম্পের সংগে শল্য-চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়। ডাঃ নায়ারের মতে প্রত্যেকটি ক্যাম্পের সংগে শল্য-চিকিৎসার ক্যাম্প থাকা দরকার এবং ক'টি অপারেশন করা হ'লো তাই হবে পরিকল্পনার কৃতকার্যতার মাপকাঠি।

পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের এত বড় বিরাট অধিবেশন আগে আর হয়নি। সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন। কর্মীদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়ই আছেন। আজকাল শিক্ষাদান ব্যবস্থাও নারী ও পুরুষের আলাদা করে করা হয় না। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন শ্রীমতী আরতি দত্ত, শ্রীমতী ভক্তি সেন, শ্রীমতী সুশীলা সিংহি, শ্রীমতী শৈলবালা মুখার্জি, শ্রীমতী অপর্ণা তপাদার, শ্রীমতী কমলা গুহ, ডাক্তার অরুণা সেনগুপ্ত এবং ডাক্তার এ আর মজুমদার। বিভিন্ন প্রদেশের এডুকেশন লিডার ছাড়া নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ছিলেন, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর co-ordinating teacher শ্রীমতী মল্লিকা ঘোষ ছিলেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের থেকে প্রতিনিধি এসেছিলেন, আর এসেছিলেন দিল্লির ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইনস্টিটিউট থেকে কয়েকজন।

স্বাস্থ্য দপ্তরের ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভারতবর্ষে ১৮৯১ সাল থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা বেড়ে হ'য়েছে প্রায় দ্বিগুণ। অবশ্য এর একটি কারণ মৃত্যু হার কম হওয়া। ১৮৯১—১৯০০ পর্যন্ত মৃত্যুহার ছিল হাজারে ৪৪.৪, ১৯৬১ সালে হ'য়েছে ২৩.৮ অথচ জন্মহার প্রায় সমান আছে—হাজারে ৪০। এদিকে এই বিরাট জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপযুক্ত সংস্থান প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাও কঠিন থেকে কঠিনতর হ'য়ে ওঠে। ১৯৫০ সালে প্রথম পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার দিকে নজর দেওয়া হয়। প্রথম প্ল্যানেই ১৫.৮২ লক্ষ টাকা পরিবার পরিকল্পনা খাতে খরচ হয়। ফ্যামিলি প্ল্যানিং এডুকেশন লীডারদের কাজ এখন বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ। শহরে গ্রামে সর্বত্র তাঁরা অন্য সব প্রতিষ্ঠানের সংগে একযোগে এ দায়িত্ব রক্ষা করে দেশের অনেক উপকার করতে পারেন। ১৯৫৯ সালে এই অবৈতনিক কর্মী-সংঘের সৃষ্টি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচুর দায়িত্বপূর্ণ কাজ এই কর্মীদল করেছেন। বহু শ্রমস্বীকার করেছেন কিন্তু সমস্যা এত ব্যাপক যে সহসা ফল পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। আশা করা যায় আরও নূতন উদ্যমে ও নানা সাহায্যে এঁদের কাজ এগিয়ে যাবে। প্রয়োজন, সাধারণের সহযোগীতা ও সচেতনতা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যা সম্ভব হ'য়েছে তা' আমাদেরই বা হবে না কেন? অবশ্য একথা সত্য যে, দারিদ্র্য আমাদের মস্ত বাধা। অজ্ঞানতা আমাদের মস্ত প্রতিবন্ধক, সংস্কার পদে পদে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, কিন্তু তার অনেকটা দূর হয়তো এই কর্মী সংঘের দ্বারা সম্ভব হবে। Asian Population Conference উদ্বোধন করে ১৯৬৩ সালে পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন, "জনসংখ্যা বৃদ্ধি এশিয়ার দেশসমূহে ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে, এ বৃদ্ধির পথ বন্ধ করতে না পারলে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা হবে। এমন কি সচ্ছল দেশেও অর্থনৈতিক অগ্রগতির চেয়ে লোকসংখ্যা বেশী হওয়া উচিত নয়। জাপান জন্মসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা সমাধান করেছে, অন্যান্য এশিয়ার দেশেও তার প্রদর্শিত পথে চলা দরকার"। আমাদের বিরাট জনসংখ্যাকে এই প্রদর্শিত পথের সন্ধান আশা করি এই কর্মীগোষ্ঠী দিতে পারবেন।

সূর্যসাক্ষী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

॥ ২২

প্রস্তাবটা এতই অবিশ্বাস্য যে মন্দিরা প্রথমে কোন জবাব দিতে পারল না। তারপর বলল, 'যাঃ।'

ছন্দা বলল, 'যাঃ কেন। চল না। আমি বাবার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে নেব।'

সভায় যাওয়ার তো খুবই ইচ্ছা করে মন্দিরার। গেলে দূর থেকে একবার দেখে আসতে পারবে আর তাঁর ভাষণও শুনে আসতে পারবে। লুকিয়ে লুকিয়ে টেলিফোনে দু-তিন মিনিট শুধু কথা শোনা নয়, আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা তিনি যতক্ষণ বলেন ততক্ষণ তাঁর কণ্ঠস্বরে কান পেতে থাকা। হয়তো তাঁর একটি কথাও মন্দিরার জন্যে নয়, তাকে উদ্দেশ করে তিনি কিছু হয়তো বলতেও পারবেন না কিন্তু কথাগুলি তো তাঁরই থাকবে। গলার স্বর তা আর অন্য কারো হবে না। দূর থেকে কারো কথা শুনলে তো আর জাত যায় না, কি দূর থেকে কাউকে দেখলেও ধর্ম নষ্ট হয় না। জাত যায় শুধু ছুঁলে।

কাগজটা টেনে নিয়ে সভা-সমিতির নোটিশটা নিজের চোখে একবার দেখল মন্দিরা। সভায় আরো কয়েকজন বক্তা আছেন। সবাই নাম করা লোক। অধ্যাপক, লেখক। কিন্তু মন্দিরার কাছে শুধু একটি মাত্র নাম ছাড়া এই মুহূর্তে কোন নামেরই কোন অর্থগৌরব নেই। সেই নামাবলী শুধু জায়গা ভরে রেখেছে। মন্দিরার চিত্ত ভরতে পারে শুধু একটি নাম।

ছন্দা বাবার কাছে দরবার করতে গেল। গেলে কি হবে বাবা মন্দিরাকে বাইরে বড় একটা যেতে দিতে চান না। বলেন, 'এখান থেকে যাওয়া-যাওয়ির দরকার নেই। যেতে হয় শ্বশুরবাড়ি থেকে যাবে।'

মা প্রতিবাদ করে বলেন, 'ও আবার কী কথা। জানো যে সে বাড়ি থেকেও ও কোন জায়গায় নড়তে পারে না। তারাও কোথাও ওকে নিয়ে যায় না, তুমিও কোথাও ওকে বেরোতে দাও না। ওর সাধ নেই আহ্লাদ নেই। ওকে কি তোমরা জাঁতাকলে চেপে মেরে ফেলতে চাও? ওর বয়সের একটা মেয়ে এভাবে বাক্সবন্দী হয়ে থাকতে পারে?'

মা তার হয়ে খুবই লড়াই করেন। শুধু মুখেই ঝগড়া করেন না মন্দিরা বাপের বাড়ি এলে, তিনি নিজে গরজ করে মেয়েকে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যান, কেনাকাটা করতে বেরোন। দু-একবার সিনেমাতেও নিয়ে গেছেন। মা এমনিতে সিনেমাটিনেমা দেখতে তত ভালোবাসেন না। একটু অবসর পেলে বইটই পড়ে সময় কাটানোই তাঁর অভ্যাস কিন্তু মন্দিরার কথা ভেবে তিনি এসবও শুরু করেছেন। মায়ের ওপর মমতায় মন ভরে ওঠে মন্দিরার।

বাবার যুক্তি অবশ্য অন্য রকম। তাঁর কথায় দূরদর্শীর সহিষ্ণুতা।

তিনি বলেন, 'অমন ছটফট করছ কেন. দুটো দিন থাক, দুটো দিন [illegible]। সময়ে সবই হবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর দাপট আর কদিন থাকে। তাঁদের শেষ পর্যন্ত হটে আসতেই হয়। তোমার নিজের শাশুড়ীর কথা মনে নেই? অমন যে তেজস্বিনী ওজস্বিনী মহিলা তাঁকেও তো শেষে নাকের জলে চোখের জলে—।'

মা বিরক্ত হয়ে বলেন, 'থাক। তোমাকে আর সেই পুরোন কাসুন্দি ঘাঁটতে হবে না।'

খানিক বাদে ছন্দা হাসি মুখে ফিরে এল। এসে বলল, 'দিদি কাজ হাসিল করে এসেছি। কী দিবি তাই বল।'

মন্দিরা বলল, 'বাঃ রে দেব আবার কী। বাবা কি মত দিয়েছেন?'

ছন্দা বলল, 'দিয়েছেন মানে অতিকষ্টে আদায় করেছি। তবে একটা ফ্যাকড়া আবার বেঁধে গেল।'

ক্যাকড়া আবার কিসের?'

'মামাবাবু ছিলেন ওখানে। বাবার সংগে বসে বসে গল্প করছিলেন। বাবা বললেন নিশিদা, আপনিই তাহলে ওদের নিয়ে যান। বক্তৃতার সাবজেক্টটা শুনে, মামাবাবু খুব খুশী। উনি তো রাজনীতি-টাজনীতি সব ছেড়ে দিয়ে এখন ধর্মকর্ম নিয়েই আছেন।'

মন্দিরা বলল, 'মামাবাবু এসেছেন নাকি?'

ছন্দা বলল, 'সেই ভোরেই তো এসেছেন। বাবার সংগে গল্প করছেন বসে বসে। এবার নাকি কন্যাকুমারী পর্যন্ত গিয়েছিলেন সেই গল্প।'

মন্দিরার মন অপ্রসন্ন হল। বেশ তো যত খুশি তিনি বাবার সংগে কন্যাকুমারী কি মীনাক্ষী মন্দিরের গল্প করুন। মন্দিরাদের সংগে আবার আসতে চাইছেন কেন?

ছন্দা দিদির মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করে বলল, 'তুই ভাবিসনে দিদি, আমি মামাবাবুকে ভুলিয়ে টুলিয়ে রাখব। আর তুই সেই ফাঁকে—'

মন্দিরার রাগও হল আবার হাসিও পেল। বোনকে ধমক দিয়ে বলল, 'পাজী। ডেঁপো মেয়ে কোথাকার। সেই ফাঁকে আবার কী রে! আমি কি কারো সংগে দেখা-সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি? আমি যাচ্ছি বক্তৃতা শুনতে। কত গুণী জ্ঞানীরা আসবেন। তাছাড়া আমাদের কলেজও এই ফেস্টিভ্যালে যোগ দিচ্ছে। মীনাক্ষী নিশ্চয়ই আসবে। তার সংগে কতকাল পরে দেখা হবে, আমি সেই জন্যে যাচ্ছি।'

ছন্দা গম্ভীর হবার ভান করে বলল, 'তাই তো! এসব ছাড়া তোর কি আর কোন উদ্দেশ্য আছে? সত্যিই তো।'

মন্দিরা ফের ওকে সহাস্যে ধমক দিল,

'যাঃ পালা এখান থেকে। ফাজিল কোথাকার।'

নিজের এই গোপন প্রণয়ের ব্যাপারে ছন্দাকে সে টানতে চায়নি। বিয়ের আগে মাঝে মাঝে দু-একখানা চিঠিপত্র ওর হাত দিয়ে পোস্ট করেছে। আর কোন সাহায্য চায় নি, আর কোন কথা ওকে জানতেও দেয়নি।

তবু মন্দিরা বুঝতে পারে ছন্দা সবই জেনেছে। ভারি চালাক মেয়ে। মন্দিরার চেয়েও চালাক। ও যদি কোনদিন এসব সমস্যায় পড়ে ঠিক পথ কেটে বেরিয়ে যাবে। মন্দিরার মত ভয় পাবে না, জাঁতা-কলে পিষ্ট হয়ে মরবে না। কোন দুঃখ কষ্টের ধার ধারবে না ও।

মীনাক্ষী যেমন মন্দিরাকে বারবার বাধা দিয়েছে, শশাঙ্কের সংগে যোগাযোগ না রাখবার পরামর্শ দিয়েছে, ছন্দা কিন্তু কোনদিন তা করেনি। ও সব সময় দিদির সাহায্য করেছে। ঠাট্টা-তামাশা করেছে আবার সুযোগ করে দিতেও দ্বিধা করেনি। এই দূতী হওয়ার মধ্যেই যেন ওর আনন্দ। দিদির সংগে শশাঙ্কদাকে মিলিয়ে দিতে পারলেই ও খুশি। ন্যায় অন্যায় বৈধ অবৈধের কথা ও ভাবে না। যাতে মজা পাওয়া যায় ও তাতেই মজে। কিন্তু একি শুধু মজা পাওয়ারই ব্যাপার? ভিতরে ভিতরে ছন্দা নিজেও কি শশাঙ্কদাকে পছন্দ করে না? বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠিও ছন্দাই যে সেবার তাঁকে পাঠিয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত ওর কাছ থেকে বের করেছে মন্দিরা। শুধু কৌতূকের জন্যেই ও কাজটা করে নি। ও চেয়েছিল মন্দিরার সংগে তাঁর দেখা হোক সেই সংগে ছন্দাও দেখুক।

ওঁকে ভারি পছন্দ করে ছন্দা। আর একদিন বলেছিল, 'দিদি, তুই বড় বোকা। কেন আর একজনকে বিয়ে করতে গেলি? তার চেয়ে কেন পালিয়ে গেলি নে? যাকে ভালো বাসিস তাকেই বিয়ে করলিনে কেন?'

মন্দিরা বোনকে ধমক দিয়ে প্রসংগটা পালটে নিয়েছিল। সংসার সম্বন্ধে এখনো তো কোন কাণ্ডজ্ঞান হয়নি ছন্দার। ও এখনো ছেলেমানুষ। তাই জানে না যে যাকে ভালোবাসে সব সময়েই সে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না। সংসারের পথটা অত সোজা নয়।

একটু বাদে নিশিবাবু এসে দাঁড়ালেন মন্দিরাদের দোতলার ঘরে।

ষাট বছরের বৃদ্ধ। গায়ের রঙ কালো, মাথার রঙ সাদা। দেখতে ছোটখাটো মানুষটি। রোদে জলে মজবুত চেহারা।

নিশিবাবু মন্দিরার দিকে চেয়ে হাসলেন, 'এই যে টুকুঠাকরুণ, মাথায় সিঁদুরে একেবারে যে লক্ষ্মী ঠাকরুণ হয়ে রয়েছ ব্যাপার কি?'
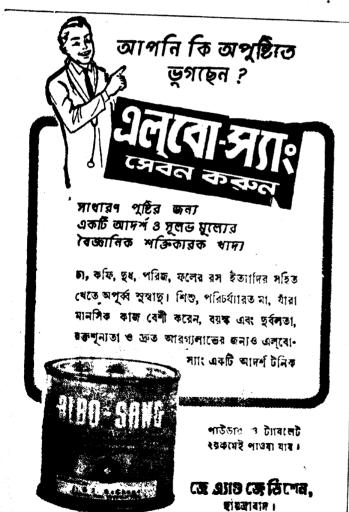
খাট থেকে নেমে মন্দিরা ওঁকে প্রণাম করল। নিশিবাবু জাতে কায়স্থ। তবু পা ছুঁয়েই ওঁকে প্রণাম করে ওরা।

নিশিবাবু বললেন, 'থাক থাক, চিরায়ুষ্মতী হও। পাকা চুলে সিঁদুর পর। বেশ বেশ। আমি তাই যোগরঞ্জনকে বলছিলাম। যেই একটু ঘোরাঘুরি করতে বেরিয়েছি অমনি পট করে মেয়ের বিয়েটি দিয়ে দিলে। মাঝখান থেকে আমার খাওয়াটাই বাদ পড়ল।'

মন্দিরার মা ইন্দ্রাণী পিছন থেকে বললেন, 'আহা, আপনি যেন কত খান।'

নিশিবাবু বললেন, 'পাওনা খাওয়াটা এবার তোর শ্বশুরবাড়ি গিয়েই খাব, কী বলিস টুকু?

ইন্দ্রাণী বললেন, 'মেয়ে তো শ্বশুরবাড়িতেও বেশি দিন আর থাকবে না। সামনের বুধবার জামাই ওকে তার কর্মস্থল কালিয়ারীতে নিয়ে যাচ্ছে।'

'বেশ বেশ। তাহলে সেখানেই যাব। দোকানের মিষ্টি এনে ভদ্রতা রক্ষা করবি? নাকি রান্নাবান্না করে খাওয়াবি? রাঁধতে শিখেছিস তো?'

মন্দিরা বলল, 'খেয়েই দেখবেন।'

নিশিবাবু বললেন, 'ঠিক বলেছিস। বক্ষ তোমার নাম কি। ফলেন পরিচীয়তে। হাত কেমন রাঁধে ভিক্ষু তা যাচাই করে। আমিও রাঁধতে নিতান্ত মন্দ পারিনে। প্রথম প্রথম হাত পুড়ত। আজকাল আর পোড়ে না। অবশ্য এখন আর রেঁধে খেতে হয় না। কোথাও না কোথাও জুটে যায়।'

তারপর মন্দিরার মার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'আজ তোমার এখানে বোধহয় দুটি জুটে গেল। যোগরঞ্জন কিছুতেই ছাড়ল না। আজকের দুপুরের অন্ন যে এখানে মাপা আছে ভোরে উঠে বুঝতেই পারিনি।'

ইন্দ্রাণী বললেন, 'আমি বললে তো আপনি খান না। ভগ্নীপতি বললে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান।'

নিশিবাবু বললেন, 'ভগ্নীপতিটি আবার অন্য কথা বলেন। তাঁর ধারণা এ বাড়িতে আমি ভগ্নীকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না।'

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, 'আসলে আপনার পক্ষপাত ভাগ্নীদের ওপর।'

নিশিবাবু বললেন, 'যা বলেছ। এক ভদ্রলোক সেদিন বলেছিলেন নিশিবাবু আপনার কি কলকাতা শহর ভরেই ভাগ্নী? আমি বললাম শুধু কি কলকাতা? সারা বাংলা দেশে তারা ছড়িয়ে আছে। আগে ছিল বোনেরা। এখন ভাগ্নীরাই বোধহয় দলে ভারি। অথচ প্রথম প্রথম যখন মামা ডাকটা কানে আসত ইন্দ্রাণী, খুব শ্রুতিসুখকর মনে হত না।'

ইন্দ্রাণী হেসে বললেন, 'তাই নাকি?'

নিশিবাবু বললেন, 'ছেলেবেলা থেকে দলে ঢুকে মাথা মুড়িয়েছিলাম। প্রথম প্রথম ছিলাম ছোট ভাই। দাদারা ছিলেন মাথার ওপর। তারপর নিজেও একদিন দাদা হলাম। দিবানিশি নিশি দাদা নিশি দাদা। তারপর যথা নিয়মে মামা ডাক শুরু হয়ে গেল। বোনদের ছেলেমেয়েরা মামা তো বলবেই। আমি বলি তোরা বরং জেঠা বলে ডাক, কাকা বলে ডাক, পিসে বলে ডাক। আমাকে শত শত ভগ্নীপতির শালাবাবু বানাসনে। ধর্ম সম্পর্কে ভাই হওয়া যায়, কিন্তু ধর্মশালা? সে এক তীর্থস্থানেই থাকে।'

নিশিবাবু হাসতে লাগলেন।

উদ্দেশ্যের যত অন্তরায়ই হোন এমন মানুষকে কি বলা যায় 'আপনি সঙ্গে যাবেন না।' মন্দিরা তা বলতে পারে না। বরং ওঁর সঙ্গ নিতেই ইচ্ছা করে মন্দিরার। ওঁকে দেখলে ওঁর কাছে বসে থাকলে যেন মনের বাসনা-কামনার জ্বালা কিছুক্ষণের জন্যে শান্ত হয়ে যায়। সংসারের সুখ দুঃখের কথা মনে থাকে না। গৃহীদের ঘরে ঘরে এই জন্যেই এই আধাসন্ন্যাসীর আদর। বিয়ে থা করেন নি। নিকটের কি দূরের কোন আত্মীয়তার বন্ধন নেই। মানুষের খুব যে তেমন কাজে লাগেন তাও না। তবু খানিকক্ষণের জন্যে অপ্রয়োজনের আনন্দ তিনি দিতে পারেন। সান্নিধ্যের উত্তাপে সব গলিয়ে দিতে পারেন, ভুলিয়ে দিতে পারেন।

বাবা বলেন, 'এ ধরনের মানুষ আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এখনকার সমাজ এঁদের বলবে পরগাছা। কিন্তু আমাদের সব বন্ধনই যে একদিন খসে পড়বে এঁরা সেই কথা মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেন।'

মন্দিরা অত তত্ত্ব কথা বোঝে না, কিন্তু মানুষটিকে বড় শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে।

এক সময় তার এ কথাও মনে হল দরকার নেই আলোচনা সভায় গিয়ে। তার চেয়ে মামাবাবুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করবে, ওঁর দেশ ভ্রমণের গল্প শুনবে। নীরস নীতি-

গভর্ণ বক্তৃতার চেয়ে সে গল্প ভালোই লাগবে শুনেছে।

কিন্তু বেলা চারটে না বাজতেই মন্দিরার মন বেরোবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। গা ধুয়ে নিল, চুল বাঁধল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, কাজলে কুম্কুমে প্রসাধন করল।

ছন্দা ফিস ফিস করে বলল, 'কী দিদি, যাচ্ছিস তো ধর্মসভায়। সাজ-সজ্জার এত ঘটা কিসের রে?'

মন্দিরা বলল, 'যাঃ ফাজিল কোথাকার। সাজ আবার তুই কোথায় দেখলি। তুই আমার যা দেখিস তাতেই তোর চোখ টাটায়।'

ছন্দা বলল, 'বটে। তুই এমনি বাঘিনী? উপকারীকেও খেতে চাইছিস?'

মন্দিরা বোনকে কাছে ডেকে একটু আদর করে হেসে বলল, 'তোর সঙ্গে কথায় পারব না, একজন পারলেও পারতে পারেন।'

যোগরঞ্জন নার্সিংহোমের প্ল্যান করিয়েছেন। কিন্তু প্ল্যানে কোথায় একটু গোল-মাল আছে। তাই একডালিয়া রোডে যাবেন ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর বাড়ি। গাড়িটা মেয়েদের জন্যে তিনি দিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু নিশিবাবু বললেন, 'দরকার নেই, তোমার গাড়ি তুমি নিয়ে যাও। ওরা বড়লোকের মেয়ে কিন্তু ফকিরের ভাগ্নী। আমার সঙ্গে ওরা বাসে-ট্রামে, দরকার হলে পায়ে হেঁটেও যেতে পারে। কি-রে পারিস নে?'

নন্দাও সঙ্গে যাবে বলে বায়না ধরেছিল, কিন্তু ইন্দ্রাণী তাকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে নিরস্ত করলেন, 'এসব তর্কাতর্কির ব্যাপারে তুই কোন রস পাবিনে। তোকে আমি শিগগিরই সার্কাস দেখিয়ে আনব।'

নন্দা বলল, 'যারা মীটিং-এ যাচ্ছে তারা কিন্তু সার্কাস দেখতে পারবে না মা।'

নিশিবাবু আর ইন্দ্রাণী সমস্বরে বললেন, 'নিশ্চয়ই না।'

খানিকটা পথ এগিয়ে নিশিবাবু বললেন, 'পাকা মাথা নিয়ে আমি তোদের যুব সভায় যাচ্ছি। আমাকে ওরা ঢুকতে দেবে তো রে মন্দিরা?'

মন্দিরা বলল, 'নিশ্চয়ই দেবে মামাবাবু। যারা আপনাকে চেনে তারা জানে পাকা চুল আসলে আপনার পরচুলা। আপনি চির যুবক।'

সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরার মনে পড়ল কথাটা কোন এক প্রসঙ্গে সে শশাঙ্কের মুখেই শুনেছিল। এমনি তাঁর কত বাক্য কত বাক্যাংশ যে মন্দিরার ভাষার সঙ্গে মিশে রয়েছে তার ঠিক নেই। মাতৃভাষার মধ্যে সে প্রিয়তমের ভাষাটুকু সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছে।

কিন্তু বাঞ্ছিত মিলনে বহু বিঘ্ন। বাণ্ডেল গেটে এসে বাসের জন্যে অনেক দেরি হয়ে গেল। রুটে কি গোলমাল হয়েছে, বাসও নেই, ট্যাক্সিও নেই।

মন্দিরা অধীর হয়ে বলল, 'চলুন ফিরে যাই মামাবাবু। বেরোতে বেরোতে এমনিই আমাদের দেরি হয়ে গেছে। এখনো কতক্ষণ পথে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। মিটিং শেষ হয়ে গেলে গিয়ে আর লাভ কি হবে।'

নিশিবাবু তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আরে পাগলী শেষ হবে না। শেষ হতে এখনো ঢের বাকি। বাঙালীর সময়। যখন আরম্ভ হবে বলেছে ধরে রাখতে পারিস তার দেড় ঘণ্টা বাদে শুরু হবে।'

ছন্দা বলল, 'রিক্‌শা নিলে কেমন হয় মামাবাবু?'

হিসেবী নিশিবাবু বললেন, 'দুটো রিকশা নিতে হবে তাতে অনেক খরচা, তাছাড়া সময়ও ঢের বেশি লাগবে। তার চেয়ে একটু সবুর কর। বাস এসে যাবে। তোরা দেখি পলকে প্রলয় গণছিস, ব্যাপারটা কি।'

শেষ পর্যন্ত বাস এল। শিয়ালদা নেমে মন্দিরার পীড়াপীড়িতে ট্যাকসিই নিলেন নিশিবাবু।

ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটের সামনে এসে ট্যাক্সি দাঁড়ালো।

গেটে লাল রঙের কাপড়ের টুকরোয় অলংকৃত অক্ষরে লেখা উত্তর কলকাতা যুব উৎসব।

সামনে কয়েকটি ছেলে দাঁড়ানো। নিশিবাবু বললেন, 'সভা কি আপনাদের শেষ হয়ে গেল নাকি?'

একটি ছেলে বলল, 'না শেষ হয়নি। তবে শেষের মুখে। সভাপতির ভাষণ শুধু বাকি।'

মন্দিরা বলল 'বলিনি আপনাকে?'

নিশিবাবু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'দধির অগ্র ঘোলের শেষ। সভার শেষটুকুই-তো ভালোর টুকু?'

ছন্দা জিজ্ঞাসা করল 'শশাঙ্কবাবুর বক্তৃতা কি হয়ে গেছে?'

আর একটি ছেলে বলল, 'তিনিই তো আজ সভাপতি।'

মন্দিরা আশ্বস্ত হল খুশিও হল। পা বাড়াল ভিতরের দিকে। আর দেরি করে লাভ কি।

নিশিবাবু বললেন, 'ডক্টর শ্রীপতি মুখার্জী সভাপতিত্ব করবেন কথা ছিল না?'

ছেলেটি অভিযোগের সুরে বলল, 'কী করব বলুন। কথা যাঁরা দেন তাঁরা তো আর রাখবার জন্যে দেন না। অনেকেই দূর থেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কেউ কেউ অসুস্থতার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শশাঙ্কবাবুরও আসবার ইচ্ছে ছিল না। নানা ওজর আপত্তি আমরা প্রায় ধরে বেঁধে এনে বসিয়ে দিয়েছি।'

মন্দিরা হলের ভিতরে ঢুকে পিছনের দিকে একটি সারিতে আসন নেবার আগেই মাইকে উদাত্ত মধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল,

'youth is still lightly moved
to weeping and to laughter
Still honours soaring thought,
and still delights in dream.'

হল ভরতি তরুণ-তরুণীদের দল। ডায়াসের ওপরে যাঁরা আছেন তাঁদের বেশির ভাগই উত্তীর্ণ যৌবন। দূর থেকে তাঁদের কাউকে তেমন করে চিনতে পারল না মন্দিরা। কিন্তু যাঁকে দেখবার জন্যে এসেছিল তাঁকে ঠিকই চিনে নিল। মাইকের সামনে তিনি দাঁড়িয়েছেন। সেই দীর্ঘ উন্নত চেহারা। সুঠাম সুদর্শন গৌরকান্তি পুরুষ। গায়ে ঘি রঙের সার্জের পাঞ্জাবি, কাঁধে সাদা শাল। কত কাল বাদে মন্দিরা তাঁকে আজ দেখল। পরম সুন্দর পরম মনোহর বেশে দেখে মন্দিরা ভুলে গেল সে আজ শুনতে এসেছে। ভুলে গেল তার দুটি চোখ ছাড়া আরও ইন্দ্রিয় আছে। সভাপতি বলে চললেন—

'হাসি কান্নায় সহজে আন্দোলিত এই যে যৌবন সমুচ্চ চিন্তায় সশ্রদ্ধ দিব্য স্বপ্নে বিভোর এই যে যৌবন এর জন্যে আমরা কে না গর্বিত হই? বিগত যৌবন হয়ে আমরা কে না আক্ষেপ করি, কে না সতৃষ্ণভাবে হাত বাড়াই,

'oh, give me back my youth again'

কিন্তু দ্বিতীয়বার একে ফিরে পাবার উপায় নেই। কেউ ফিরিয়ে দিলেও নেওয়া যায় না, সওয়া যায় না, বহন করা যায় না, রাজা যযাতি সে কথা বুঝেছিলেন। এই দ্বিতীয় যৌবন আমরা পাই আমাদের উত্তরপুরুষের মধ্যে, আমাদের পুত্রদের মধ্যে, পুত্রতুল্য ছাত্রদের মধ্যে। তোমরা আমাদের সেই দ্বিতীয় যৌবন। কিন্তু তোমরা নিজেরা অদ্বিতীয়। আমরা একটু দূরে থেকে তোমাদের বিদ্রোহ দেখি, ঔদ্ধত্য দেখি, অসহিষ্ণুতা, অবিনয়, অস্থিরতা, অধীরতা সবই লক্ষ্য করি। সব সময় যে অবিচল ভাবে দেখি তা নয়, বিচলিত হই, বিক্ষুব্ধও হই। বিক্ষুব্ধ হই যখন তোমরা আত্মদ্রোহকে বিদ্রোহ বলে ভুল করো, যখন তোমরা উৎকেন্দ্রিকতাকে উচ্ছৃঙ্খলতাকে যৌবনের একমাত্র প্রকাশ বলে মনে করো। যখন তোমরা ভুলে যাও,

A heart in growth with gratitude
still teems.

যৌবন শুধু শৌর্যে বৃহৎ নয়, ঔদার্যেও মহৎ। অন্যায় অবিচারকে তীব্র ঘৃণা করবার শক্তি যেমন যৌবনের প্রবল, প্রেমের শক্তিও তারই। প্রশস্ত বক্ষপট যুবকেরই আছে প্রৌঢ়ের নেই, বৃদ্ধেরও নেই। শ্রদ্ধা সৌজন্য বিনয় শব্দগুলি পুরোন, কিন্তু অর্থ নিত্যনবীন। অশ্রদ্ধা অবজ্ঞা অকৃতজ্ঞতা আমাদের কিছুই দেয় না, কিছু নিতেও ভুলিয়ে দেয়।

তোমরা বলতে পারো আমরা শ্রদ্ধা করব কাকে? আমাদের গুরুজনদের মধ্যে কাকে আমরা সেই গৌরবের আসনে বসাতে পারি? কোথায় সেই মহীরুহ বনস্পতি? শিল্পে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, শিক্ষা সংস্কৃতির স্তরে স্তরে জীবনচর্যায় কায়-মনোবাক্যে অভিন্ন কোথায় সেই আদর্শ পুরুষ সিংহ যাকে আমরা শ্রদ্ধায় সমুচ্চ সিংহাসনে বসাতে পারি? হয়তো তিনি

নেই। কিন্তু একান্ত অভাবের মধ্যেও তার ছাব রূপ আছে। অপূর্ণতার বেদনাবোধ আছে। সেই বোধই তো আদর্শ। তার মধ্যেই পূর্ণতার অবস্থান। গুরুজনদের স্খলন পতন ত্রুটি কীর্তনে তোমাদের সমস্ত সামর্থ্য যদি নষ্ট হয়ে যায় সে বড় দুঃখের কারণ হবে। সেই অপচয়ে কারোরই কোন লাভ হবে না। তাছাড়া গুরুজনদের শোধরাবার উপায় তাঁদের ঘাড় ধরে নামিয়ে দেওয়া নয়, হাত ধরে তুলে নেওয়া। তোমাদের সততা ধীরতা ঔদার্য দিয়ে তাঁদের লজ্জিত করা। যিনি প্রণম্য নন, তাঁকেও প্রণাম করে অনেক সময় তাঁদের তুলে দেওয়া যায়। তাঁদের শুভবুদ্ধি কর্মশক্তিকে জাগ্রত করা যায়। ধিক্কারে অপমানে লাঞ্ছনা গঞ্জনায় তাঁদের নামিয়ে আনা অনেক সহজ কাজ কিন্তু মহৎ কাজ নয়। বাপকে তোমরা যদি অযোগ্য বলে মনে করো তোমাদের সামনে পিতামহ প্রপিতামহের আদর্শ আছে। সেই ইতিহাস তো নিষিদ্ধ বই নয়। দেশে তোমরা যদি আদর্শ খুঁজে না পাও অন্য দেশ আছে, এই যুগে তোমরা যদি আদর্শ খুঁজে না পাও অন্য যুগ আছে। কিন্তু তোমরা সব বাদ দিয়ে যুগান্তর সৃষ্টি করতে পারবে না। তোমরা বাবার বাবা হলে আমরা খুশিই হব। কিন্তু পিতৃভক্তিটুকু যেন থাকে।"

বক্তা একটু থামলেন। তাঁকে ক্লান্ত মনে করে একটি ছেলে জলভরতি কাঁচের গ্লাস তাঁর সামনে এগিয়ে দিল। তিনি হেসে তা ফিরিয়ে দিয়ে ফের বলতে লাগলেন, 'এবার নীতির কথা। নীতি যেখানে কুসংস্কার, প্রচলিত অর্থহীন দেশাচার লোকাচার যেখানে শুধু দীর্ঘায়ুতার জোরে নীতি আর ধর্মের আসন দখল করে সেখানে নীতি নিশ্চয়ই দুর্নীতি। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, অর্থহীন বিধি-নিষেধে নারী-নিগ্রহ, নারী পুরুষের সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ককে নানা রকম যুক্তিহীন লোকাচারের কবলে রাখাকেও তো আমরা এক সময়ে নীতিধর্ম বলে জেনে এসেছি। আমি সে নীতির কথা বলছি নে। সে নীতি নিশ্চয়ই আমাদের উন্নতি করে না। অবনতির শেষ ধাপে তা আমাদের নামিয়ে দেয়। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য ধরনের নীতি আছে, যা রাজনীতি না হয়েও নীতির রাজা তার গুরুত্ব মাহাত্ম্য, প্রয়োজনীয়তা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? সেই মূলনীতি আমাদের সমাজবন্ধনে বেঁধে রেখেছে। সততা, সহৃদয়তা, অশাঠ্য অহিংসাকে আমরা যে মূল্য দিই সে মূল্য মানব মূল্য। তা শেয়ার মার্কেটের মত এ বেলা ও-বেলা ওঠা নামা করে না। এই নীতি এক অর্থে সম্প্রদায়গত আনুষ্ঠানিক ধর্মের বহির্ভূত। আবার অন্য দিক থেকে সমস্ত ধর্মের অন্তর্নিহিত মূলভিত্তি। ধর্ম প্রচার না করে, ধর্মশিক্ষাকে শুধু প্রার্থনা সংগীতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার নানা স্তরে এই উদার নীতিবোধে কী করে ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করা যায়, দেশের চিন্তাশীল শিক্ষা-ব্রতীদের তা ভেবে দেখতে হবে। শিক্ষার ব্যবহারিক মূল্যই যে একমাত্র মূল্য নয়, তা বারবার বলা দরকার।

আরো একদিক থেকে আমার কাছে নীতি আর শৃংখলার নিগূঢ় আবেদন আছে। তা আমাদের রূপবোধকে তৃপ্ত করে। নৈতিক শৃংখলার মধ্যে একটি সুষম ফর্ম আছে, যা উচ্ছৃংখলতার মধ্যে নেই। আমাদের রূপসৃষ্টি রূপ সম্ভোগ কোন না কোন ফর্ম মেনে চলে। সেই ফর্ম নিশ্চয়ই রিজিড নয়। বারবার তার রূপান্তর হয়। তার রূপের অন্ত নেই। তবু আমরা তাকে রূপ বলে চিনতে পারি, রূপহীনতা থেকে তাকে আলাদা করে দেখি। একে রক্ষণশীলতা মনে করা ভুল। সৃষ্টির মধ্যে যে সংরক্ষণ বৃত্তি অন্তর্নিহিত আমাদের রূপানুভূতি সৌন্দর্যবোধ সেই নীতি আর নিয়মের হাতে হাত না রেখে চলতে পারে না।'

প্রচুর হাত তালির মধ্যে বক্তা থামলেন। শশাংকর ভাষণের শেষ অংশ মন্দিরার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য মনে হল। কিন্তু এই দুরূহতা তার মুগ্ধতার পথে কোন অন্তরায় হল না। উনি কী বলেন তা তো সে শুনতে আসেনি কেমন করে বলেন তাই দেখতে এসেছে। কিন্তু শুনেছেও। নিশিবাবু পাশে বসে বললেন, 'বেশ তো বলেছেন ভদ্রলোক। নতুন কিছুই বলেন নি কিন্তু বলবার ভঙ্গিটি নতুন, ধরণটি মনোরম। চল যাই আলাপ করে আসি।'

ছন্দা মৃদু হেসে মন্দিরার চোখের দিকে তাকাল।

মন্দিরা বলল, 'আলাপ করে আর কী হবে মামাবাবু চলুন, ফিরে যাই।'

শশাংক কোন দিকে না তাকিয়ে ছাত্রদের জলযোগের আমন্ত্রণ সস্নেহ সৌজন্যে ফিরিয়ে দিয়ে অন্য অতিথিদের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছিল, নিশিবাবু দোরের কাছে তাকে থামালেন। একটু হেসে বললেন, 'নমস্কার। আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে এলাম। আমার নাম নিশিকান্ত গুহ। আপনার বক্তৃতাটি বড় ভালো লাগল। যদিও বলবার কথা আছে। কিন্তু সে কথা যাক। সে আর একদিন হবে।'

শশাংক মৃদুহেসে বলল, 'বেশ তো।'

নিশিবাবু বললেন, 'আমার মনে হয় বক্তার কাছে শ্রোতারও কিছু ঋণ আছে। সেটুকু স্বীকার না করে গেলে অন্যায় হয়। পরিচয় করিয়ে দিই। এরা আমার ভাগ্নী।'

শশাংক এক পলক মন্দিরাদের দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। এক পলক। তারপর নিশিবাবুর দিকে চেয়ে মৃদুহেসে বলল, 'ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।'

নিশিবাবু মন্দিরাকে বললেন, 'আছে নাকি? কই তোরা তো বলিসনি আমাকে। আমার কাছে সব গোপন?'

শশাংক বিদায়-নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আচ্ছা আজ চলি নিশিবাবু। আর একদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হবে।'

নিশিবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমিই যাব আপনার কাছে।'

শশাংক বলল, 'খুব খুশি হব।'

মন্দিরা লক্ষ্য করল, শশাংক রাস্তায় নামতেই কালোমত আঁটোসাটো শক্ত মজবুত চেহারার এক ভদ্রলোক, 'আরে এসো এসো' বলে তাঁকে প্রায় জোর করে গাড়িতে তুলে নিলেন। আর মুহূর্তের মধ্যে সে গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিশিবাবু বললেন, 'চল আমরাও এগোই।' (ক্রমশ)

বিশ্ববিচিত্রা

সাতাশ কোটি বছর আগের প্রাণী

কাজাকস্তানের রাজধানী আলমা-আতার প্রত্নশালা হল পৃথিবীর একমাত্র প্রত্নশালা যেখানে সাতাশ কোটি বছর আগের কতকগুলি প্রাণীর পদচিহ্ন রক্ষিত আছে। এসব প্রাণী "কার্বানফেরাস" ও "পার্মিয়ান" যুগের সন্ধিক্ষণে পৃথিবীতে বসবাস করত।

এই চিহ্নগুলি কয়েক মাস আগে জেজকাজগান অঞ্চলের একটি খনির শ্রমিকরা আকরিক ধাতুপিন্ড সংগ্রহের সময়ে খনির একটি দেয়ালে আবিষ্কার করেন। প্রাণীগুলির চারটি পায়ের ও লেজের শিলীভূত চিহ্ন অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে দেখা যায়। লেজের চিহ্নটি কয়েক মিটার লম্বা।

খনির পরিচালকদের কাছে খবর পেয়ে, খ্যাতনামা কাজাক প্রত্নজীববিজ্ঞানী ভালেরিয়ান বাজানফ ও তাঁর একদল ছাত্রছাত্রী এ বিষয়ে অনুসন্ধান-গবেষণা চালান এবং এগুলিকে আদিম টেট্রাপড-এর পদচিহ্ন বলে সিদ্ধান্ত করেন। জল ছেড়ে প্রথম যে মেরুদন্ডী প্রাণী শুকনো ডাঙ্গায় বসবাসের জন্যে উঠে আসে, তারাই হল টেট্রাপড। অনেকটা আজকের কুমীরের মতো দেখতে এই প্রাণীগুলি নরম ধাতুমিশ্রিত মাটির ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাবার সময়ে এই চিহ্নগুলি এঁকে দেয় এবং কালক্রমে তা কঠিন ও শিলীভূত আকরিক ধাতুপিন্ডে পরিণত হয়।

গন্ধের সাহায্যে প্রতীতি জন্মানো

দেখতে চামড়ার মতো, গন্ধও চামড়ার, কিন্তু বস্তুটি আসলে প্ল্যাস্টিক। আসল বস্তুর মতো অবিকল দেখতে সে-সব জিনিস যারা উৎপাদন করে তারা আসল বস্তুর গন্ধটিও এখন যোগ করতে সক্ষম। প্ল্যাস্টিকের স্যুটকেস এবং হাতব্যাগে এখন এমন রাসায়নিক দ্রব্য স্প্রে করে দেওয়া হয়, যার গন্ধটা ঠিক চামড়ার মতো।

উৎপাদক প্রতিষ্ঠানরা আজ বুঝতে পারছে, গন্ধ ক্রেতাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সৃষ্টি করে এবং তার ফলে বাজারে গন্ধযুক্ত সামগ্রীর অথবা নকল জিনিসে আসলের গন্ধ মাখিয়ে বাজারে ছাড়ার একটা নতুন উদ্যম দেখা দিয়েছে। নিউ জার্সি'র এক সুপার মার্কেট তাজা স্ট্রবেরির গন্ধ ছড়িয়ে দ্বরক্ষে জমানো বেরির বিক্রি বাড়াতে সক্ষম হয়। কমলালেবুর গন্ধ ব্যবহার করতে কমলালেবুর রসের বিক্রি দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

আমেরিকার বিবিধ সামগ্রীর বিপণী লর্ড অ্যান্ড টেলর একটু ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। প্রত্যেক সপ্তাহে তারা তাদের বিপণীর সামনের রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন রকমের সুগন্ধী ছড়িয়ে তাদের প্রসাধন বিভাগের দিকে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে।

প্ল্যাস্টিকের লন্ড্রীব্যাগে পাইন গাছের গন্ধ যোগ করা হয়। কৃত্রিম তন্তুতে তৈরি দড়ি ও জালে শনের গন্ধ ছড়িয়ে তাকে আসল জিনিসের "স্বাভাবিক" গন্ধ যোগ করা হয়।

কতক ক্ষেত্রে দুর্গন্ধ দূর করার জন্যও সুগন্ধীর প্রয়োজন হয়। প্রসেস-করা শীল মাছের চামড়ার বোটকা গন্ধ দূর করার জন্য রাসায়নিকরা একপ্রকার ডেটারজেন্ট ব্যবহার করেন। একটু বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে তাঁরা একপ্রকার নির্যাস তৈরি করেছেন, যা শীলের চামড়ার স্বাভাবিক গন্ধের পরিপূরকের কাজ করে।

কিন্তু এখনও রাসায়নিকরা সবকিছু গন্ধই ইচ্ছামতো তৈরী করতে পারেন না। কতকগুলি মনোরম গন্ধ নকল করা আজো তাদের পক্ষে অসম্ভব। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সেঁকা পাউরুটি। নিউ ইয়র্কে ফ্লাগরেন্স প্রসেস কোম্পানির প্রেসিডেন্ট অ্যালফ্রেড নিউডরল্ড বলেন: "অনুরূপ গন্ধ তৈরীর একটা কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে। তবে এখনও আমরা সেটা বের করতে পারিনি।

মহাশূন্য থেকে ধূলোর পরিমাণ

মার্কিন বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, মহাশূন্য থেকে প্রতি বছর প্রায় দশ লক্ষ টন ধূলো পৃথিবী পৃষ্ঠে জমা হচ্ছে। তবে তাতে পৃথিবীর ধূলো চাপা পড়ার কোন আশঙ্কা নেই। পৃথিবীর ধূলি ও মহাকাশের ধূলির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা নিরূপণের জন্য নানা পন্থা অনুসৃত হচ্ছে।

এই পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানীরা চিরং-

বন্দীদশায় জাত প্রথম শ্বেত-গণ্ডার শাবক—[illegible] চিড়িয়াখানায় বহু বছর আগে [illegible] থেকে গণ্ডারকে [illegible] পর এই প্রথম একটি শাবক জন্মেছে

বরফাচ্ছাদিত সুমেরু অঞ্চল বেছে নিয়েছেন। অধঃক্ষেপন জনিত বরফ বছরের পর বছর সেখানে কেবলই জমা হচ্ছে, কারণ সেখানে তো বরফ গলে না। তাঁরা হিসেব করে দেখেছেন, এক হাজার ফুট উঁচু বরফ জমতে লেগেছে সাড়ে সাতশ বছর। তাঁরা সেই সাড়ে সাতশ বছর আগের বরফ এক হাজার ফুট নীচে থেকে এনে মহাকাশের ধূলিকণা তাতে কতটুকু রয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখেছেন।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই ধূলো সমভাবেই সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং মহাকাশ থেকে পড়বার হারও অপরিবর্তিত। সুমেরু অঞ্চলের ধূলোর পরিমাণ নির্ণয় করেই সমগ্র পৃথিবীতে বছরে মোট যে কি পরিমাণ ধূলো পড়ে তা তাঁরা নিরূপণ করেছেন।

পৃথিবীর বর্তমান শিল্পাঞ্চল ও আগ্নেয়গিরি থেকে প্রাপ্ত ধূলোর গঠনে এবং সুমেরু অঞ্চলে প্রাপ্ত একশো আঠারটি ধূলি কণার গঠন নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, মহাকাশ থেকে প্রাপ্ত ধূলিকণার শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ লোহা ও শতকরা দশ ভাগ নিকেল। লোহা ও নিকেলের এই হার পৃথিবীতে প্রাপ্ত ধূলিকণায় দেখা যায় না।

আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের স্মিথসোনিয়ান অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল অবজারভেটারীতে এ বিষয়ে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এ প্রসংগে বলেছেন যে, মহাকাশে কালো ধাতুময় মহাজাগতিক কণাপুঞ্জের অস্তিত্ব ও তাদের সম্পর্কে তথ্যাবলী ভবিষ্যৎ মহাকাশযাত্রীদের বিশেষ কাজে লাগতে পারে।

বিশ্ব টেলিভিশন স্বপ্ন নয়

ছোট্ট গ্রাম রেজটিংগ। অতীত ও ভবিষ্যৎ এখানে হাতমেলাতে চলেছে। অতীতের রেজটিংগে চাষবাস চলছে আর ভবিষ্যতের রেজটিংগে উঠছে চারটি অট্টালিকা। সারা পৃথিবীর সংগে যোগসূত্র স্থাপন করবে রেজটিংগ। মহাকাশে টেলস্টার জাতীয় যেসব উপগ্রহ বিচরণ করবে, তাদের থেকে খবর ও ছবি সংগ্রহ করে আবার চারদিকে সেসব ছড়িয়ে দেবে রেজটিংগ।

বর্তমানে যে চারটি ভবন নির্মিত হচ্ছে, তাতে যেসব এরিয়াল থাকবে, সেগুলি অন্য ধরণের। প্রত্যেকটি এরিয়ালে থাকবে ৬ মিটার উঁচু একটি কংক্রীটের চাকা ও একটি প্লাস্টিকের বেলুন যার ব্যাস ৬০ মিটার ও উচ্চতা ২৫ মিটার। প্লাস্টিক বেলুনের খোলসটি মাত্র ২ মিলিমিটার পুরু। এই বেলুনের মধ্যে থাকবে একটি বাঁকানো-আয়না এরিয়াল। যাকে বলে শেল এরিয়াল। সেটি চারদিকে দোলানো যায়। মহাকাশে কোন টেলস্টার জাতীয় উপগ্রহ নিকটবর্তী হলেই একটি স্থান-নির্দেশক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এরিয়ালটিকে উপগ্রহের সংগে নিখুঁত সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করবে এবং যতক্ষণ না উপগ্রহটি অদৃশ্য হয়ে যায় ততক্ষণ সেই সংযোগ অব্যাহত থাকবে এবং উপগ্রহ থেকে বার্তা ও ছবি গ্রহণ করতে থাকবে। এইভাবে ভবিষ্যতে যখন একাধিক উপগ্রহ আকাশপথে ভ্রমণ করবে, তখন দুটি এরিয়াল একটি উপগ্রহকে অনুসরণ করবে ও অপর দুটি এরিয়াল পরবর্তী উপগ্রহকে ধরার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এইভাবে উপগ্রহ মারফৎ বার্তা ও ছবি গ্রহণের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

সম্ভবত টোকিও অলিম্পিকের সময় এই যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য সম্বন্ধে প্রথম পরীক্ষা গৃহীত হবে। ঐ সময় টোকিও অলিম্পিকের সমস্ত বার্তা ও দৃশ্য এই যন্ত্রে গৃহীত হবার পর সারা য়ুরোপের টেলিভিশন স্টেশনগুলিতে রীলে করা হবে।

"হাসপাতাল শহর"

আমেরিকার বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন ফাউণ্ডেসনের আর্থিক আনুকূল্যে বার্লিন ফ্রী ইউনিভার্সিটি সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকটিকে শুধু হাসপাতাল যা বলে এক হাসপাতাল শহর বলা যায়। হাসপাতাল নির্মাণে মার্কিন অভিজ্ঞতা ও কারিগরি জ্ঞান তথা পশ্চিম জার্মানীর সর্বাধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সাফল্য এই উভয়ের সমন্বয়ে যে হাসপাতালটি পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠছে, তা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাস্তবিকই এক আশ্চর্য যোজনা।

সর্বাধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র ও কারিগরি জ্ঞান অনুযায়ী এই হাসপাতালে যেসব সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হবে, তা নাকি আমেরিকাতেও নেই। হাসপাতালের দুটি ভবনে স্থায়ী শয্যা সংখ্যা হবে ১৪০০ এবং বছরে ২৫০০০ অস্থায়ী রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও বছরে হাসপাতালের পলিক্লিনিক বিভাগ ও অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্য পাবে ৬০,০০০ অসুস্থ মানুষ। এই হাসপাতালে কাজ করবে সারা পৃথিবীর ৩০০ খ্যাতনামা চিকিৎসক, ২৫০ চিকিৎসাকারিগরি সহযোগী এবং ৮০০ নার্স ও সহকারী এবং অন্যান্য কর্মচারীদের সংখ্যা হবে হাজারের ওপর।

এই হাসপাতালের অপারেটিং থিয়েটারের সংখ্যা হবে বাইশ এবং বিশেষ বিশেষ ক্লিনিক ও গবেষণাগারে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের মধ্যে থাকবে তিনটি কোবাল্ট বা সেসিয়াম বোমা, একটি ইলেকট্রন গান এবং রেডিও ও রঞ্জনরশ্মি দ্বারা রোগ চিকিৎসার জন্য ৩৫টি যন্ত্র। আলোচনা ও বক্তৃতাকক্ষ থাকবে এগারোটি এবং ১৬০০ ছাত্রছাত্রীর জন্য ক্লাশরুম থাকবে। হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট বিশেষ লাইব্রেরীর পুস্তক-সংখ্যা হবে এক লক্ষ খণ্ড। এসব ছাড়া এই হাসপাতাল শহরে স্বয়ংক্রিয় সরবরাহ বিভাগে থাকবে ঔষধপত্র, হিমশীতল রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, প্রশাসন, বীজানিবারক ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতির গুদামঘর, সেসব মেরামতের কারখানা, স্বয়ংক্রিয় ক.পড়কাচা ও বাসনপত্র মাজার বন্দোবস্ত ও কর্মচারীদের বাসস্থান।

হাসপাতালের অতি আধুনিক পরিকল্পনার সংগে সংগতি রেখে এখানকার কাজকর্ম হবে সমান প্রগতিশীল ও যান্ত্রিক। পাঠকক্ষে বসেই ছাত্রছাত্রীরা রঙীন টেলিভিশন মারফৎ অপারেশন প্রত্যক্ষ করতে পারবে। আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থায় নার্সরা রুগীদের সংগে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হবে। প্রত্যেক ডাক্তারের পকেটে থাকবে ছোট্ট একটি রেডিও যাতে হাসপাতালের যে কোন স্থানে তার সংগে যোগাযোগ করা চলে। রান্নাঘর থেকে তালিকা অনুযায়ী খাদ্য এক বিশেষ বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রত্যেক রুগীর কক্ষে পৌঁছবে। যেসব নার্স এই হাসপাতালে কাজ করবে, ইতিমধ্যেই তাদের বিশেষ শিক্ষাদান করা হচ্ছে। দু বছরের মধ্যেই এই হাসপাতাল শহর সম্পূর্ণ কর্মমুখর হয়ে উঠবে।

'ছিপ নিয়ে গেলো কোলাব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেলো চিলে!'

ইস্কুলের দিনগুলোতে পুজোর ছুটির সময় আমরা গাঁয়ে যেতুম কিছুদিনের জন্যে। ভাই-বোন মিলে সে এক অমৃতমাখা স্বাধীনতার উৎসবের মধ্যে কালযাপন! আমাদের দাদামশাই থাকতেন গাঁয়ে, তিনি কদাচিৎ আসতেন আমাদের কলকাতার বাড়ি—যখন আসতেন তখন কতো গল্প করতেন—ফলশাগাছ, মাছরাঙা পাখি, পানকৌড়ি আর রুই-কালবোসে আমাদের অন্তর ভরে থকতো। সুতরাং ছুটি পেলে—বিশেষ করে পুজোর সময় আমরা মিহি-জাম-মধুপুর যাওয়া রদ করে দাদামশাই-এর রাজধানীর পানে দিতাম পাড়ি। গ্রীষ্মের বন্ধে আম-কাঁঠালের ভয়েই বাস্তবিক আমাদের যেতে দেওয়া হতো না। পুজোর সময় আমরা অনেকগুলো অ্যাপ্রেনটিসশিপ নিতুম—গাছে-ওঠা, সাঁতার, মাটি-কোপানো থেকে শুরু করে মাছধরা পর্যন্ত। আমাদের একা একা বার-পুকুরে যেতে দেওয়া হতো না, তবে খিড়কি পুকুরের চারদিকে সদা-সর্বদা ঘুরঘুর করতুম, মনে পড়ে। কারুর হাতে পুঁটুলে ছিপ, কারুর হাতে বা মানী হুইল—আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার পিছনের বাদার কই-খলসের আশায় বড়শি নামিয়ে দিতো। দাদামশায়ের পুকুরে এক সারি ভেমরেল মাছ ছিলো। আমাদের মনে হতো, যেন ব্যঙ্গে ঐ মাছের সারি আমাদের পানে তাকিয়ে-তাকিয়ে পুকুর পর্যটন করে—ওরা মাছের সাম্রাজ্যের প্রহরী, বলতুম কেউ কেউ এবং ওরাই খবর পাঠাতো নিচে, "সেই খোকা মাছ-মারার দল এসেছে" আর মাছ আমরা ধরতেই পারতুম না। দলের মধ্যে আমি বহুদিন দাদামশায়ের কাছে, গাঁয়ের বাড়িতেই থেকে এসেছি, আমি অনেক জিনিসের ঘাঁতঘোঁত বুঝতুম, তাই ওদের নানাদিকে লীড্ করতুম আমি—দাদামশাই আমার উপর কড়া চোখ রেখেছিলেন। একবার পুজোর ছুটিতে ঘাটে বসে চারাপোনা ধরেছিলুম কয়েক গোস—ধরেছি আর লেজ কেটে ছেড়ে দিয়েছি জলে আবার। এক-এক সময় বাদা থেকে ছিপে অথবা ঘুনি-জাটাল পেতে জাওলা মাছ ধরে আবার পুকুরে ছেড়ে দিতুম। দাদু মানা করতো—কেননা জাওলা মাছ নাকি পোনা-মাছ খায়। আমাদের পুকুরে প্রকৃতপক্ষে পোনামাছের চাষ ছিলো। একদিন এই স্বাভাবিক আর স্বাধীন অ্যাপ্রেনটিসশিপ শেষ হলে কলকাতায় ফিরে এলুম, মন ভার। কেউ কেউ অধিকন্তু সাঁতারের লোভে হাটখোলা ক্লাবে ভর্তি হলাম, কেউ ধর্না দিলুম মামাবাবুর কাছে শকাট বা লতু বড়দার কাছে—ও'রা ফি-শনিবার মাছ ধরার জন্যে দূরে-দূরান্তে যেতেন। সেখানে কাইফরমাজ খাটার জন্যে আ[illegible] ভিতর এক-আধজন ভাগ্যবান [illegible]-শরই বাবার অনুকূল্য পেতো। গ্রাম থেকে ঘুরে এসে আমরা অনেকেই তাঁদের ধরে পড়লুম। একের অজ্ঞাতে অপরে তাঁদের পদসেবা সবরবাহ করে খুশি করতে থাকলুম ক্রমাগত। একদিন শনিবার এলে, হঠাৎ দেখলাম বাড়ি আঁধার করে আমাদের মধ্যে কেউ তাঁদের অনুসরণ করেছে। বড়োদের পক্ষপাত বিষয়ে আমরা সেদিন দুপুরে প্রভূত আলোচনা করতুম—আমাদেরই কেউ কেউ তখনো হাতের তালু নাকের কাছে ধরে বসে থাকতো। কেননা, গত রাত্তে বহুক্ষণ পর্যন্ত শিলনোড়া-হামান দিস্তায় সে একাএকী তাম্বুলে আর মেথি-ভাজা গাঁড়ো করেছে। ফিসফিসিয়ে উঠলো সে সময়,

ঘুজোল পড়বে, গেণ্ডোল'! অর্থাৎ অভিশাপ দিচ্ছে সে—তার চোখের কোণে জলের বিন্দু দেখে আমরা দুঃখিত হলাম—এবারে তার কাজের ওজন দেখে আমরা স্থির নিশ্চিত ছিলাম—সে-ই যাবে। এমন সময় আমাদের মামাবাবুর এক বন্ধু এলেন আমাদের বাড়ি—ম্যাথার প্লাট নামে সদাগরী আপিসে কাজ করেন তিনি, ইয়া গোঁফ—ইয়া স্বাস্থ্য। আমাদের মামাবাবু কিংবা বড়দা—এ'রা সব অ্যামেচার মাছ মারিয়ে ছিলেন। যিনি এলেন, তার সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই অনেক কাহিনী শুনেছি। তিনি এসে আমাদের ভিতরের প্রতিযোগিতা একেবারে বন্ধ করে দিলেন—আমরা সুখ-দুঃখ উভয় বোধই অনুভব করলাম তাঁর ঈদৃশ বিচারে। এর পর থেকে আমাদের কাজ হলো তিনি আসমাত্র তাঁকে ঘিরে ধরা। অপরূপ গল্প শোনা সব—মৎস্য-সভার রাজামন্ত্রিকোটাল আমাদের চোখের সামনে ভেসে বেড়াতো তাঁর কথায়। তাঁর কাছেই শুনেছিলুম, তিনি কমসেকম হাজার-দুহাজার পুকুরে গেছেন মাছ ধরতে—সবচেয়ে বড়ো মাছ ধরেছেন তিনি ছত্রিশ সের—আজো, এই বয়েসে তাঁর কাছে দিয়ে-থুয়ে চল্লিশটি ফিসিং-রড্, এক ডজন হুইল আর অ্যাঙ্গালিং সরঞ্জাম আছে প্রভৃত। তাঁর কাছে পোড়াকালী ওরফে যতীন পাল মশায়ের গল্প শুনেছিলুম। আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর আগের কথা সেসব। যতীন পালের নামে মাছের মায়েরা কান্না জুড়ে দিতো। কলকাতার যাঁরাই মাছ ধরতে যেতেন, শেষ হবার আগে একবার পোড়া-কালীর নাম স্মরণ করতেন—হুদো-হুদো মাছ পড়তো ছিপে। এহেন পোড়াকালী একবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পুকুরে মাছ ধরতে বসেছেন—সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কেয়ারটেকার এসে শুধোন, 'কি হলো দশা আজ?' পালমশায় মাথা নাড়েন, সন্ধ্যে পর্যন্ত বসার নিয়ম ছিলো—তিনি আরো ঘণ্টাদুয়েক বেশি সময় চান এবং শুনেছি সেই দুঘণ্টা সময়ের মধ্যে তিনি এতো মাছ ধরেছিলেন যে তাঁকে চৌরঙ্গী পর্যন্ত গিয়ে ফিটন ডেকে আনতে হয়েছিলো। পোড়া-কালীর গল্পে তখনকার কলকাতায় কান পাতা যেতো না। তখনকার কলকাতায় পার্ক স্ট্রীটের মোড়ের পুকুটার নাম ছিলো 'জেনারেল'—এই জেনারেল, বির্জিতলাও, মনোহর দাস তড়াগ আর রেসকোর্সের 'সার্পেন্টাইন'-এ সেকালে বাঙালীবাবুদের সঙ্গে অনেক সায়েবসুবোও মাছ ধরতে বসতেন। এই তলাওগুলোতে বসার পাশ তখন লালবাজার থেকে ইসু করা হতো—মাসে দশ টাকায় দুগাছা ছিপ। মাছও ছিলো বিস্তর। কদিন আগে বিকেলবেলা ঐদিকে গিয়েছিলুম—মাত্র দুতিনটি লোক বসে রয়েছে। শুধোলুম, 'কিছু হলো দাদা?' 'কি আর হবে! মাছ আছে না ছাই!' এঁদের উত্তরে ভারি দুঃখবোধ করলাম। প্রতিদিন পাঁচ টাকা করে পাস, তার উপর ফেরার সময় বাজার থেকে কোন্ না অন্তত চার কেজির একটি মাছ কেনা—মনে পড়লো, আমাদের বাড়িতে মামাবাবু যেদিনই মাছ ধরতে যেতেন সেদিনই মাছ আনতেন এক কাঁড়ি। মামীমা ঠোক্কর দিতেন—'তোমার তো মাছের হাত ভালোই!' মামাবাবু আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন না লক্ষ করেছিলুম, তিনি বৈঠকখানায় বসে মুহুর্মুহু তামাক খেতেন—অনেকক্ষণ কারুর সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলতেন না, আমরা শুধু চারপাশে ঘুরে বেড়াতুম, কেন না চিরদিনই ছেড়ে-যাওয়ার মাছের গল্প আমাদের লাগতো ভালো—আমরা সেই গল্প শুনবো বলে সেদিন অনেক রাতে শুতে যেতুম—তবু তিনি মুখ খুলতেন না—সেদিন তাঁর মাংস আসতো চাচার দোকান থেকে।

এককালে শুনেছি উল্টোডিঙি রেলওয়ে কাটিংসগুলো জমা নিয়েছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা—সেকালে সেখানে তিনি মাছের চাষ করেছিলেন—মাছও ছিলো সব দশাসই চেহারার। পাইকপাড়া-রাজার পুকুরের কতো গল্পই না শুনেছি এক সময়, বেলঘোরিয়া সি সি আর কাটিং-এর গল্প আর দক্ষিণদাঁড়ী বিলের গল্প! আজকাল সে মাছও নেই, সে-মানুষও নেই। আমাদের ম্যাথার প্লাটের মামা একবার একটা চিতল মাছ ধরেছিলেন ছিপে—সে নিয়ে কি হইচই—ছিপ ফেলে চিতল মাছ ধরার প্রিসিডেন্স আমাদের হাতে ছিলো না, ফলে ক্যামেরাম্যান ডাকিয়ে আমরা একটা ছবিও তৈরি করে নিয়েছিলুম সেদিন, মনে পড়ে। একটা গল্প শুনেছিলুম, কোথায় শোনা গেলো কোন্ রাধাকেষ্ট মন্দিরের সরোবরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছ আছে। মাছ-মারিয়ের দল দৌড়ুলো—কত না পচাই, ঘিয়ের গাদ-মাখা চার, উই-মাটি মেশানো ভাতের ডেলা পড়লো পুকুরে তার ইয়াত্তা নাই—কিসের না টোপ গাঁথা হলো—কিন্তু দিন যায় সন্ধ্যা আসে তারপর এভাবে তিনদিন চলে গেলো ছিপের ওপর দিয়ে—মাছের ঘাই, বুজগুড়ি আর পাখনা-নাড়া দেখে-দেখে শিকারীরা ক্লান্ত হলো—মাছ আছে, হয়তো হাত বাড়ালে ধরা যায় কিন্তু ফাৎনা যে-কে-সেই! এক বৃদ্ধ পুরুত যাচ্ছিলেন তলাও-এর পাশ দিয়ে—দু' এক কদম যাচ্ছিলেন আর শিকারীদের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন মুচকি হাসি—তাঁর হাস্যের কারণ অগম্য ছিলো—শেষে বললেন, বাবা তোমরা কলকাতা থেকে এত উদ্যোগ-আয়োজন করে এসেছো, কিন্তু এতো বাবা রাধাকেষ্টর মাছ—তোমরা মালপোর টোপ না দিলে কিছুতেই এ-মাছ ধরতে পারবে না! সেদিন মালপো আনানো গিয়েছিলো কিনা মনে পড়ে না—কেননা এসব গল্পের শেষ নেই—মাছের হ্যাবিট্ সম্পর্কে এরকম কত কাহিনীই না শোনা যায়। শুনেছিলুম, কোন্ এক পুকুরে নাকি চার করার দরকার হতো না—কয়েকটি আধলা ইট ফেললেই মাছের দল হইচই করে আসতো, তখন ধরো-মারো-খাও, যে যতো পারো—শুনেছি নাকি শুধু বঁড়শিতেও যুবকযুবতী মাছ ধরা পড়ে—তাদের ক্ষেত্রে আত্মহত্যাই বড়ো, শিকারীর কলাকৌশল বাহুল্যমাত্র!

সাহিত্য সংবাদ

বিদায়

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক—(রামতনু অধ্যাপক) ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত গত মঙ্গলবার, ২১ জুলাই, কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। ৫৩ বছর বয়সে, দুরারোগ্য কর্কটরোগে তাঁর আয়ুষ্কাল শেষ হল, এ বড় পরিতাপের কথা। বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রবীণ, অভিভাবক স্থানীয় ব্যক্তিরা কিছুকাল যাবৎ একে একে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের কারও কারও দীর্ঘ পরমায়ুর কথা ভেবে মনকে কিছুটা প্রবোধ দিতে পারি, কিন্তু শশিভূষণের পরলোক-গমন এমন বয়সে ঘটেছে যে-বয়সকে যথেষ্ট প্রবীণ বলতেও বাধে। পঞ্চাশোত্তীর্ণ বয়স এমন কিছু বেশী নয়, বিশেষত যখন মানুষ সক্ষম থাকে। অনেকগুলি কাজ হাতে রেখে, আরব্ধ কর্ম শেষ করতে না পেরে যিনি চলে যান, তাঁর জন্যে স্বভাবতই আরও বেদনা বোধ করার কথা। শুনেছি, শশিভূষণের এইরূপ কিছু অসমাপ্ত কাজ ছিল যা তিনি শেষ করতে পারলে বাংলাসাহিত্য উপকৃত হত।

১৯১১ সালে শশিভূষণের জন্ম। বরিশাল জেলার মানুষ তিনি; ছাত্রাবস্থার প্রথম দিকটা বরিশালেই কেটেছে, বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই-এ পাশ করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে সম্মানে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম) হন। এম-এ ক্লাসে তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল বাংলা সাহিত্য। ১৯৩৫ সালে বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষার সেই যুগটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃতিত্ব অনায়াসলভ্য ছিল না। দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ বিদ্বজ্জন তখন জীবিত, বাংলাসাহিত্যের আরও অনেক গবেষক ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত। মেধাবী ছাত্রের জন্য অকৃপণ ছিল তাঁদের সহানুভূতি। শশিভূষণের ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, তিনি বাংলা ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর প্রখ্যাত পণ্ডিত ও দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের অধীনে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবেষণা করছেন। গবেষণাটির বিষয় ছিল—'অবসকিওর রিলিজিয়াস কাল্ট অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড অফ বেঙ্গলী লিটারেচার।' ১৯৪০ সালের মধ্যেই শশিভূষণ পি এইচ ডি পেয়েছেন, পি আর এস-এর সম্মানলাভ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও তখন থেকে। অধ্যাপনার ব্রত নিয়েই কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-ভাষার রামতনু অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ছাত্রজীবনের কৃতিত্ব, অধ্যাপক জীবনের কর্ম ও নিষ্ঠার পরিচয়ই শশিভূষণের একমাত্র পরিচয় নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তিনি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

গবেষণা সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থের জন্য প্রথমত তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন—(তার মধ্যে তাঁর প্রথম গবেষণা গ্রন্থটি ছাড়াও, 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য', 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য); দ্বিতীয়ত তিনি একাধিক প্রবন্ধ, গল্প উপন্যাস এবং শিশুসাহিত্যের গ্রন্থকার হিসাবেও স্মরণযোগ্য।

শশিভূষণের ব্যক্তিগত পরিচয় এই যে, তিনি সদালাপী, মধুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; নিরহঙ্কার তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। সরল, সহাস্য এবং শিষ্টস্বভাব এই মানুষটিকে একদা এক সভায় আমি দেখেছিলাম। তাঁর সাহিত্য-সংস্কৃতি আমি লক্ষ করেছিলাম একটি বক্তৃতায়। শশিভূষণের যাঁরা ছাত্র তাঁদের কাছে শুনেছি, ছাত্রমহলে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল সকলের, এবং স্বভাবের জন্যে সবিশেষ ভক্তি ও ভালবাসা।

মূলত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেই জীবনের একটি কর্তব্য পালন করছিলেন, এবং কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন তাঁর কাছ থেকে ঠিক 'প্রফেসান্যাল' সাহিত্যিকদের গুণাগুণ আশা করা হয়ত উচিত নয়। তবু, শশিভূষণের প্রবন্ধাদি, তাঁর রচিত উপন্যাস বা শিশু-সাহিত্য থেকে বোঝা যায়—মনের একটি জায়গায় আজীবন তিনি স্বাধীন সৃষ্টিকর্মের সজীবতা রক্ষা করতে চেয়েছেন। সাহিত্য আকাদমি তাঁকে পুরস্কৃত করেছে সাহিত্য-সেবার জন্যে এ যেমন তাঁর প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন, তেমনি ওই পুরস্কার না পেলেও শশিভূষণ বাংলা সাহিত্য থেকে হারিয়ে যেতেন না।

আজকের প্রসঙ্গ তাঁর সাহিত্য সমালোচনার জন্য নয়, তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। 'দেশ' পত্রিকার অন্যতম লেখক হিসাবেও শশিভূষণের বিদায় আমাদের বেদনাহত করেছে। সুপণ্ডিত, বিনয়ী, সুলেখক শশিভূষণের বিয়োগে আমরা হিতৈষী বন্ধুর বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করছি।

শশিভূষণ প্রণীত কয়েকটি গ্রন্থ:

গবেষণা: 'অবসকিওর রিলিজিয়াস কাল্ট অ্যান্ড ব্যাক গ্রাউন্ড অফ বেংগলী লিটারেচার', 'ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য',

প্রবন্ধ: বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, সাহিত্যের স্বরূপ, টলস্টয়, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ,

উপন্যাস, গল্প: এপারে, সীতা, নিশা-ঠাকুরের কড়চা,

কবিতা: দিনান্তের আগুন,

শিশুসাহিত্য: শ্যামলাদীঘির ঈশান কোণে

ভিন্ন স্বাদের কয়েকটি উপন্যাস

বসুন্ধরা। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ৩·০০ টাকা।

অনাড়ম্বর স্বাচ্ছন্দ্যে কাহিনী বর্ণনা শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে কষ্টকল্পনা নেই। এরা আমাদের এত পরিচিত যে, প্রায় বিনা ভূমিকায়ই লেখক তাঁদের উপস্থিত করেন এবং পাঠকও তাদের গ্রহণ করে বিনা প্রশ্নে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সহজ এবং সাধারণ মনে হলেও কিছুটা জটিলতা আছে তাঁর অনেক চরিত্রেই।

তেমনি একটি চরিত্র এই উপন্যাসের কাজল-বউ। অনিশ্চিত জীবনের ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়িয়ে বাউন্ডুলে স্বামীর ঘরে এসে যখন উঠল, শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরল মাটি। দারিদ্র্যকে সে ভয় পায়, ভয় পায় অনিশ্চয়তাকে। সন্তানকে ভালবাসলেও আধিক্য চায় না খাওয়াতে পারবে না বলে। তাই কাজ-পালানো অলস স্বামীকে ঘরছাড়া করতেও তার দ্বিধা নেই।

মায়ের এই চরিত্র-গুণ মেয়ে সুবচনীর মধ্যেও সঞ্চারিত। স্বামী-সন্তান-সংসারের বাইরে তার জগৎ নেই। সুবচনীর ছোট বোন বসুন্ধরার চরিত্রে রয়েছে মার সংসারপ্রীতি এবং বাবার উদারতার সংমিশ্রণ।

কয়েকটি মাত্র চরিত্রকে ঘিরে সহজ গতিতে কাহিনী একটি সুখময় সমাপ্তিতে পৌঁছেছে। লেখক অকারণ ভনিতা না করে তাঁর সহজাত ভঙ্গিতে ছোটখাট সুখ-দুঃখের একটি সাধারণ গল্প বলতে চেয়েছেন এবং কাহিনী শেষ করে মনে হবে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। (৩০২/৬৪)

বিপন্ন সময়। শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী। সাহিত্য। ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম সাত টাকা।

পুস্তক পরিচয়

শক্তিমান তরুণ কথাশিল্পী শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম দিয়েছেন 'বিপন্ন সময়।' এই দুঃসাহসী নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। নাম-পত্রে এক জায়গায় তিনি জীবনানন্দ দাশের দুটি পংক্তি "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন......" উদ্ধৃত করেছেন। এই অসুস্থতা কোথায়, কেন এই অসুখ তার অনুসন্ধানের পরিচয় এই গ্রন্থখানি। মানুষের বোধ, বিশ্বাস ও সর্বোপরি প্রেম এবং তার অন্তর্জীবনের বিপর্যয়গুলি, তার বন্ধন ও ভাঙনগুলি লেখকের সচেতন দীর্ঘ অনুসন্ধান ও নিষ্ঠ-চিন্তাধারণার ভিতরে কি রকম প্রতিভাত হয়েছে 'বিপন্ন সময়' তার বিশ্বাসযোগ্য পরিচয় দিয়েছে।

তৃপ্তি অধ্যাপিকা, কল্যাণ সাংবাদিক। এই দম্পতির জীবনে আছে আর্থিক নিরাপত্তা, প্রেম ও সন্তান-সম্ভাবনা। মুখ্য কুশীলব এরাই। এদের স্বচ্ছন্দ সংসার থেকে, উচ্চভূমি থেকে অমিতাচারী অমিতকে দেখা যায়—যোগভ্রষ্ট, যন্ত্রণাময় দুর্বোধ্য জীবন-যাপন করে সে। অমিতের কিছু নেই—না প্রেম, না স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু এ দুইয়ের অভাব মানুষকে আত্মহননকারী ইচ্ছার বশীভূত করে না। তার অভাব আরও মূলে, আরো গভীরে—বিশ্বাসে। মানুষের সঙ্গে তার আর যোগাযোগ নেই। কিছু ইচ্ছার সঙ্গে ও কিছু জৈবীক প্রেরণার সঙ্গে তার পরিচয় আছে—সেইখানেই শারীরিক যোগাযোগ রক্ষিত হয় পতিতালয়ে ও ভাঁটিখানায়। ভালবাসা যা সে পেয়েছিল ও আরো যা পাওয়া যেত সবকিছুর প্রতিই সে উদাসীন। তবুও সে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু—তার প্রতি তৃপ্তির লোকেনের ও বন্ধুদের ভালবাসা অকৃত্রিম ও স্বার্থহীন। অমিত ক্রমশ গড়িয়ে যাচ্ছে, ক্রমশ সে একটা সীমারেখা অতিক্রম করে যায় যার পরে আর কিছুই নেই—পাপ ও পুণ্যের ধর্ম ও অধর্মের যেখানে যুগপৎ বিসর্জন। অন্য-দিকে তৃপ্তি ও কল্যাণ (তাদের নামকরণও ইঙ্গিতময়) তাদের নিভৃত সংসারে সন্তানের আগমনক্ষেত্র প্রস্তুত করে। নূতন প্রেম জন্ম নেয়—স্বস্তি আর শান্তা। 'বিপন্ন সময়ে'র এই কাহিনী কাব্যধর্মী নয়, কিন্তু তার চিত্রল গতিবেগ ও মৃদু বিষাদের সুর সার্থক কাব্যের আস্বাদে পাঠককে তৃপ্ত করতে পেরেছে।

বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই গ্রন্থ পরীক্ষা-মূলক নয়। গঠনের ধর্মে উপন্যাসটি ধারা-বাহিকতা মেনে চলেছে। আঙ্গিক অতি সরলীকরণও কোথাও লক্ষিত হয় না। ধীর গম্ভীর পরিবেশ রচনায় ও পারিপার্শ্বিক

সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লেখক বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনো কখনো ঘটনার তীব্র আবেগ নাটকীয়তার সৃষ্টি করেছে মূল রস, লক্ষ্য ও আদর্শকে অক্ষুণ্ন রেখে।

গ্রন্থটির গঠনপারিপাট্য প্রশংসনীয়।

১৬৩।৬৪

রঙ্গ-বল্লরী। শক্তিপদ রাজগুরু। গ্রন্থ-প্রকাশ। ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-৯। মূল্য—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

গহিন গাঙ গহন বন—শক্তিপদ রাজ-

গহিন গাঙ গহন বন। শক্তিপদ রাজ-স্ট্রীট. কলিকাতা-৬। মূল্য—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শাল পিয়ালের বন। শক্তিপদ রাজগুরু। আর এন চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং। ২৩, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—চার টাকা।

বিষয়বস্তু এবং পটভূমি পৃথক হলেও শক্তিপদ রাজগুরুর এই তিনটি উপন্যাসের একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পাঠকদের তাৎক্ষণিক আনন্দদানের উদ্দেশ্যেই উপন্যাস তিনটি রচিত। এবং লক্ষ্যভেদে যে লেখক সক্ষম হয়েছেন তাও নিঃসংশয়ে বলা চলে। পড়া হয়ে যাওয়ার পর এই তিনটি গ্রন্থই পাঠকের মনে কিছু অবশিষ্ট রেখে যায় না।

"রঙ্গ-বল্লরী"তে লেখক এক অপমানিতা নারীর কাহিনী শুনিয়েছেন। সমাজ ও স্বামীর কাছ থেকে সে অবিচার পেয়েছে। তবে অনেক সময় যে নিরপরাধ শিশু জন্ম নেবে তাকে বাঁচানোর জন্য নিজেকেও বেঁচে থাকতে হয়, এবং সমাজের বিধি-নিষেধকেও উপেক্ষা করতে হয়। কাহিনীর নায়িকা কাঞ্চন তাই করেছে। পাঠকের সহানুভূতি সে পাবে।

"গহিন গাঙ গহন বন" উপন্যাসে সুন্দরবন অঞ্চলের কয়েকটি বিচিত্র জীবনের উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন লেখক। এতে আছে প্রমীলা, বউ-পাগল বুড়ো জলিল, এবং হতভাগ্য জেলের দলের কথা। কাহিনীতে আর আছে সুন্দরবনের রোমাঞ্চ-কর পরিবেশের পরিচয়। এক ভ্রাম্যমাণের দেখা-শোনা-জানার ভিতর দিয়ে পুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপিত।

"শাল পিয়ালের বন" সাঁওতাল-কাহিনী অর্থাৎ সাঁওতাল-জীবনের প্রচণ্ড প্রাণবন্যার পটভূমিতে এ আর এক উপকাহিনী। সোরী, চাঁদ, ফুলী, আবদুলাখান, ফকন, সুন্দর—এদের জীবনের পাপ ও পুণ্য, প্রেম ও ক্রোধ এবং বিশ্বাস ও বিদ্রোহের স্বাভাবিক উদ্দামতাকে কেন্দ্র করে লেখক তাঁর গল্প রচনা করেছেন। রুদ্ধশ্বাসে বইটি পড়ে যেতে হয়।

(১৮৯।৬৩, ৪৮৪।৬২, ২৫২।৬২)

ভ্রমণ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড। কলিকাতা-৭। মূল্য ৫·৭৫ নঃ পঃ।

ভ্রমণকাহিনীর বৈচিত্র্যে বর্তমান বাংলা সাহিত্য লক্ষণীয়ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে বলা যায়। উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, নাটকের চেয়েও অতিনাটকীয় এবং কবিতার চেয়ে অধিকতর কাব্যসঞ্চারী ভ্রমণকাহিনী আজকাল বাঙালী পাঠকের হৃদয় জয় করছে। বাস্তবিক, অধিকাংশ ভ্রমণকাহিনীর মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে মনোরঞ্জন। তাই ভ্রমণকাহিনীতে প্রেম, আদিরস, গোয়েন্দা-গল্প ও কোটেশনের প্রবল সংমিশ্রণের ফলে ভ্রমণকাহিনীর ভ্রমণের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ এই কারণে যে, তাঁর গ্রন্থখানি বাস্তবিক ভ্রমণকাহিনী।

আজকালকার নতুন প্রক্রিয়ার ভ্রমণ-কাহিনী যখন প্রবলভাবে সমাদৃত হচ্ছে, তখন হঠাৎ এই পুরানো আমলের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত জনপ্রিয় হবে কিনা, সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করে এই বিশ্বাস হয় যে, জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী ও সন্ধানী যে-কোনো পাঠককে তৃপ্তি দেওয়ার দুর্লভ গুণ এই ভ্রমণকাহিনীতে বিদ্যমান।

মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ বর্তমানে রাজনৈতিক কারণেও আমাদের আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে। এইসব দেশের শিল্প, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় থাকলে এই ঘনিষ্ঠতা আরো বাধামুক্ত হতে পারে। ভ্রমণকাহিনীর অন্যতম উদ্দেশ্যও তাই—এক স্থানের জন-সাধারণের সঙ্গে অন্য স্থানের শিল্প, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের যোগাযোগ স্থাপন করা। ফলে অচেনা মানুষ, অচেনা দেশ ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বাধা অপসারিত হয় এবং মানুষে মানুষে পরিচয় ও সহানুভূতি জন্মলাভ করে। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এইসব দিক থেকে অত্যন্ত সার্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাঁর পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান ও রসবোধ পারস্য ও ইরাকের মানুষ ও তাদের ইতিহাসকে আমাদের নিকটবর্তী করে তুলেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো প্রবল ব্যক্তিত্বশালী লোকের সঙ্গে ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু কোথাও রবীন্দ্রনাথের অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা দেননি। বরং তাঁর দৃষ্টি ছিল পারি-পার্শ্বিকের উপরে, তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন কোনো কিছুকেই উপেক্ষা করেনি।

এই গ্রন্থখানি জনসাধারণের লাভ করলে আমরা আন্তরিক আনন্দ লাভ করব।

রঙ্গজগৎ

বাংলা চলচ্চিত্র উৎসব

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সম্যক ও সামগ্রিক পরিচয়বাহী এক চলচ্চিত্র উৎসবের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই উৎসবে বিগত যুগের নির্বাক ও সবাক ছায়াছবির স্থিরচিত্র এবং বিজ্ঞাপনের একটি প্রদর্শনী আয়োজনেরও চেষ্টা চলছে। বাংলা ছবির জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্র প্রয়াসের ক্রমবিবর্তনের পরিচয় যাতে পাওয়া যায় সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই উৎসবসূচী গঠন করা হচ্ছে। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটির এই পরিকল্পনা খুবই প্রশংসনীয়। বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পেরও যে একটা ঐতিহ্য আছে, বিদেশী চিত্রের বিশেষ প্রদর্শনীর সমারোহে তা বুঝি আমরা ভুলে যেতেই বসেছিলাম। আমাদের নিজের দেশের চলচ্চিত্রশিল্পের অতীতকে জানা এবং বর্তমানকে বিশ্ব চলচ্চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন যে সর্বাধিক, ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি তা চিত্ররসিকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন বলে আমরা তাঁদের আন্তরিক সাধুবাদ জানাই।

এই গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র উৎসবকে সার্থক করে তুলতে হলে চলচ্চিত্রশিল্প-মহলের সহযোগিতা অপরিহার্য। বিশেষ করে অতীত যুগের চলচ্চিত্রের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং যাঁদের কাছে সেকালের ছায়াছবির স্থিরচিত্র এবং প্রচার সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ক তথ্যাদি রয়েছে, এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে এগিয়ে আসার জন্য তাঁদের অনুরোধ জানাই। কারণ, এই উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার কাজে চলচ্চিত্রসেবীদেরও একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাঁরা এই কর্তব্য বিস্মৃত হবেন না বলেই আমরা আশা রাখি। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটির এই অভিনন্দনীয় পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবে রূপায়িত হোক—এই আমাদের কামনা।

প্রযোজক অসীম পালের "আরোহী" চিত্রে নবাগতা দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত—(ডাইনে) ছবির দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে চিন্তা মগ্ন. চিত্রপরিচালক তপন সিংহ

জি এস পি নিবেদিত "কাঁটা-তার" (পরিচালনা : বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়) ছবিতে অজিতকুমার ও মঞ্জুলা সরকার

সিনেমা ও সমাজ

আগামী জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উৎসবের অন্যতম কর্মসূচী আলোচনা-চক্র। সাধারণ আলোচ্য বিষয় থাকবে—"সিনেমা ও সমাজ।" তা-ছাড়া আলোচনা-চক্রের দুটি অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় হল : (১) জাতীয় জীবন ও

[illegible] ফিল্মস্‌-এর "দুই পর্ব" (পরিচালনা : বিনু বর্মন) ছবিতে অপর্ণা দেবী, জহর গাঙ্গুলী ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

সংস্কৃতির প্রতিবিম্ব হিসাবে চলচ্চিত্র (২) প্রচার ও শিক্ষার জন্য অল্প দৈর্ঘ্যের ছবির ব্যবহার (৩) বিদেশে ভারতীয় ছবি এবং ভারতে বিদেশী ছবি (৪) বক্স-অফিস ও চলচ্চিত্র (৫) ছবির সাফল্যের মূলে অভিনয়ের দান, এবং ষ্টার সিস্টেম (৬) চিত্রপরিচালক ও কলাকুশলীর ভূমিকা (৭) চলচ্চিত্রে কাহিনীর গুরুত্ব (৮) শিশু চিত্র। ফিল্ম সোসাইটি এবং ওই জাতীয় সংস্থার প্রতিনিধিদের আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। আলোচনা-চক্রের সাব-কমিটিতে রয়েছেন : শ্রীঅজিত বসু, শ্রী পি সি ভগৎ, শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়, শ্রী বি আর চোপরা, শ্রীমতী নার্গিস দত্ত, শ্রীআর রঞ্জন, শ্রীসুনীল দত্ত ও শ্রীমতী অমিতা মালিক।

ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইণ্ডিয়া ভারত সরকারের নিকট একটি স্মারক-পত্র পেশ করেছেন। বিশ্ব চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা বেশী এমন ব্যক্তিদের উৎসবের বিভিন্ন কমিটিতে রাখার একটি প্রস্তাব ওই স্মারক-পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে উৎসব যদি শুধু প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়, অথবা যদি গত বছরে তৈরি ছবির ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ থাকে তবে এই আন্তর্জাতিক উৎসবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না এবং তার উচ্চমান রক্ষা করাও সম্ভব হবে না। ফেডারেশনের স্মারক-পত্রে এমন কতগুলি বিদেশী ছবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি বিশেষ আমন্ত্রণে উৎসবে দেখানো যেতে পারে। তা-ছাড়া বিচারক-মণ্ডলীতে স্থান থাকা উচিত এমন কয়েকজন ব্যক্তি এবং বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে এমন কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রসমালোচকের নাম ফেডারেশন তাঁদের স্মারক-পত্রে উল্লেখ করেছেন।

জি আর প্রোডাকশন্স-এর "আলোর পিপাসা" (পরিচালনা : তরুণ মজুমদার) ছবিতে [illegible]

* ছবির পর ছবি *

জি-এম-সি প্রোডাকশন্স-এর প্রথম ছবি "কাঁটাতার" অবিলম্বে মুক্তি পাচ্ছে। বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, জহর রায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, গীতা দে, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী, মঞ্জুলা সরকার ও অসীমকুমার। নচিকেতা ঘোষ সংগীত পরিচালক।

কাঁটাতার

সরকার প্রোডাকশন্স-এর নতুন ছবি "একটুকু ছোঁয়া লাগে।" সম্প্রতি বোম্বাইয়ে কমল মজুমদারের পরিচালনায় ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিনয় চট্টোপাধ্যায় ছবির কাহিনীকার-চিত্রনাট্যকার। ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন বিশ্বজিৎ, কিশোরকুমার, অসিত সেন, মণি-চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভাদুড়ি, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা পাল ও নবাগতা সুপর্ণা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকার।

একটুকু ছোঁয়া লাগে

মহালক্ষ্মী প্রতিষ্ঠানের নতুন ছবি "লেভেল ক্রসিং"-এর শুভমহরৎ-মুহূর্ত অনুষ্ঠান সম্প্রতি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন বীরেশ্বর বসু।

লেভেল ক্রসিং

গুণী সংবর্ধনা

শ্রীসত্যজিৎ রায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বি-এফ-জে-এ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন (বাঁয়ে) সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীঅশোককুমার সরকার (উপবিষ্ট) সংস্থার সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ (ডাইনে) বি-এফ-জে-এ প্রদত্ত পুষ্পস্তবক হাতে শ্রীরায় ফটো—দেশ

বি-এফ-জে-এ কর্তৃক

সত্যজিৎ রায় সংবর্ধিত

চতুর্দশ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার অর্জনের জন্য শ্রীসত্যজিৎ রায়কে গত শুক্রবার বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

সংস্থার সভাপতি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ পরিচালক শ্রীরায়কে বি-এফ-জে-এ নামাঙ্কিত পুষ্পস্তবক দেন। শ্রীরায়কে মাল্যভূষিত করেন সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীঅশোককুমার সরকার।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন, দেশেবিদেশে অভিনন্দিত "পথের পাঁচালী" ছবির মাধ্যমেই চিত্রপরিচালক হিসাবে শ্রীরায়ের আবির্ভাব। এবং তিনি এ যাবৎ বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। শ্রীঘোষ চলচ্চিত্রকার শ্রীরায়ের বিশিষ্ট শিল্পকীর্তির কথা উল্লেখ করে পরিশেষে বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যে রায়-পরিবারের বিশেষ দানের কথা উল্লেখ করেন এবং প্রসঙ্গত শ্রীরায়ের পিতা স্বর্গত শ্রীসুকুমার রায় ও পিতামহ শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়ের কথা বলেন।

বি-এফ-জে-এ'এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীঅশোককুমার সরকার বলেন, সত্যজিৎ রায় বাঙালীর গৌরব। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা, বাঙালীরা, শ্রীরায়ের মধ্যে এমন একজন শিল্পীকে পেয়েছি, যাঁকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। শ্রীরায়ের নতুন আন্তর্জাতিক সম্মানলাভ প্রসঙ্গে শ্রীসরকার বলেন, সরকারের অ্যাওয়ার্ড কমিটি যে সব সময় সত্যিকারের শিল্পোৎকৃষ্ট ছবিকে পুরস্কৃত করেন না তার প্রমাণ আবার পাওয়া গেল। "মহানগর" এ বছরে যথোচিত রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়নি। কিন্তু বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কারের ভিতর দিয়ে ছবির শিল্প-কৌলিন্য স্বীকৃত হল। শ্রীরায়ের "অপরাজিত" ছবিকেও ভারত সরকার পুরস্কারযোগ্য মনে করেননি। পরিশেষে শ্রীসরকার এই আশা ব্যক্ত করেন যে, ভবিষ্যতে শ্রীরায় আরও বহুবার আন্তর্জাতিক পুরস্কারে সম্মানিত হবেন।

পশ্চিম জার্মানীর দূতাবাসের প্রতিনিধি ডঃ শুম্যান বলেন, শ্রীরায়ের কৃতিত্বের জন্য আমার দেশের অসংখ্য গুণিজন তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে শ্রীরায়কে অভিনন্দিত করি। এবং এই আশা পোষণ করি, আগামী বছর "চারুলতা" ছবির জন্যও তিনি এমনিভাবেই সম্মানিত হবেন।

"মহানগর" ছবির প্রযোজক শ্রী আর ডি বনসল বলেন, ভিন্নধর্মী ছবি তৈরির প্রচেষ্টাতেই আমি নিয়োজিত আছি, এবং থাকব।

সংবর্ধনার উত্তরে শ্রীসত্যজিৎ রায় বলেন, "সমালোচকদের সঙ্গে আমি প্রীতির সম্পর্কে যে মিলতে পেরেছি সেটা আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য। বিদেশে এমন প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে চলচ্চিত্রকাররা সমালোচকদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পান না।

"চিত্রপরিচালক হিসাবে আমি চলচ্চিত্র-কারদের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলি। সমালোচকরা আমার ছবির নিরপেক্ষ সমালোচনা করুন সেটাই আমি চাই। বলা বাহুল্য, খুবই আনন্দ পাই যখন আমার সাফল্যের সঙ্গে তাঁদের একাত্ম দেখি। এই আনন্দময় মুহূর্ত আজ উপস্থিত।"

বি-এফ-জে-এ'এর অন্যতম সহ-সভাপতি

চিত্র অভিনয়-শিল্পী: রড স্টাইগার ("দি পনব্রোকার" ছবিতে অভিনয়ের জন্য যিনি এবার বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন) অনিল চট্টোপাধ্যায় ও [illegible] পইটিয়ার—সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবি তোলা হয়

শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ পরিশেষে তাঁর ভাষণে শ্রীরায়ের বক্তব্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীরায়ের কৃতিত্ব উপলক্ষে সংস্থার সদস্য শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

• চিত্র-সমালোচনা •

অপ্রতিরোধ্য [illegible]

"অশান্ত ঘূর্ণি" (পিপলভার স্ক্রীন [illegible]) ছবিতে একাধিক রসের উপাদান সমান্তর ধারায় বিন্যস্ত। একদিকে প্রেম, বিচ্ছেদ ও পারিবারিক মেলোড্রামা, অপরদিকে পাপ ও রহস্য।

[illegible] দুঃস্থ যে [illegible] মানুষকে [illegible] এবং [illegible] সুখের জন্য [illegible] তার [illegible] খুঁজে পায়, এই [illegible] সঙ্গে চলচ্চিত্রের [illegible] হবার নয়। [illegible] গড়ে উঠেছে এক [illegible] কেন্দ্র করে। [illegible] নাম অজয়। তার প্রেমাস্পদা [illegible] [illegible] [illegible]

দীপার ছোট্ট সংসারে আর আছে তাদের মেয়ে বুবু। সুখে আর স্বপ্নে কেটে যায় তাদের দিনগুলি। এমনি সময়ে ঘটে অঘটন। পুলিস গ্রেপ্তার করে রবীনকে। ডাকাতি ও রাহাজানির দায়ে। বিপদে পড়ে শেষ পর্যন্ত দীপাকে অজয়ের শরণ নিতে হয়। অজয়ের সামনে এসে যখন দীপা দাঁড়ায়, সেই মুহূর্তে অতীতের তীর হতে ভেসে আসা একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস যেন হঠাৎ করে অজয়ের মনকে উতলা করে তোলে। দর্শকের মনকেও তা স্পর্শ করে। অপূর্ণ প্রেম ও অস্ফুট বেদনার এই রসক্রিয়া চিত্রনাট্যে গৌণ অংশ অধিকার করে রয়েছে। তবু তা আছে বলে ছবিটি ক্ষণে ক্ষণে দর্শকের মনে সুখানুভূতি এনে দেয়। এই রসোপাখ্যান অনভিনব হলেও ছবিতে পরিমিত বিন্যাসের গুণে তা [illegible] হয়ে উঠেছে। এর জন্য [illegible] পিনাকী মুখোপাধ্যায় সাধুবাদ পাবেন।

একটি বিদেশী চিত্রের ছায়াবলম্বনে গঠিত "অশান্ত ঘূর্ণি"র কাহিনীর প্রধান উপাদান হল রহস্য। এ ক্ষেত্রে চিত্রনাট্যের (হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত) [illegible] কথা প্রথমেই উল্লেখ্য। একটি [illegible] সম্পর্কে [illegible] [illegible] কে অপরাধী কি

নিরপরাধ তা নিয়ে [illegible] জানা খুব স্বাভাবিক [illegible] সনাক্তকরণের উপর [illegible] এবং [illegible] ইতিহাস ও বর্তমান [illegible] সম্পর্কে ব্যাপক তদন্ত [illegible] যা মনে হয়) [illegible] রবীনকে যে-ভাবে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে, দর্শকের মন তা অস্বাভাবিক বলে মেনে নিতে চায় না এই কারণে যে, তার [illegible] সম্পর্কে দর্শক সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। তবু এমন একজন ব্যক্তিকে অপরাধী বলে কেন সংশ্লিষ্ট সবাই সনাক্ত করল, তা নিয়ে অবশ্য দর্শকের মনে কৌতূহল জাগতে পারে। তবে কোন অভিজ্ঞ দর্শক যদি কারণ আগে থেকেই অনুমান করে নিতে সক্ষম হন— যা পুলিস বা ব্যারিস্টারের মনেও জাগেনি —তার পক্ষে সাসপেন্স-এর আমোদ উপভোগ করা কঠিন। রহস্যের যে ভিত্তিটি এ ছবিতে গ্রহণ করা হয়েছে, তা নতুন নয়। তবে যে-ভাবে শেষে রহস্যের উদ্ঘাটন ঘটেছে, তা চমকপ্রদ। এবং এই অংশটি— বিশেষ করে প্রকৃত দুর্বৃত্তের ধরা পড়ার ঘটনাটি—রোমাঞ্চকর করে তোলার ব্যাপারে পরিচালক শ্রী মুখোপাধ্যায় প্রশংসনীয় প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তবে নায়ককে নিয়ে ছবিতে গোড়া থেকেই যদি রহস্যের জট পাকানো হত, তবে ছবিটি সামগ্রিকভাবে সুখভোগ্য হতে পারত।

ছবিতে মেলোড্রামার উপাদান অনাবশ্যক মনে হয়েছে। এবং তা রহস্যচিত্রকে কেন্দ্রচ্যুত করে তার আকর্ষণ কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে। বিপদে প্রথম থেকে শক্ত থেকে পরে স্বামীর সাত বছর জেল হওয়ার আশঙ্কায় দীপার হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যাওয়া এবং পরে অতি সহজেই তার সুস্থ হয়ে ওঠার ঘটনা দুটি অবিশ্বাস্য। তা ছাড়া, পিতার কলঙ্কের জন্য স্কুলে বন্ধুদের কাছে তার সন্তানের অপদস্থ হওয়ার ব্যাপারটি এত মামুলী যে, বার বার তা দেখতে বিরক্তি লাগে। পরিচালক এ ধরনের গতানুগতিক পরিস্থিতি বর্জন করতে পারতেন। ছবিটিকে আমুদে করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন পরিচালক। দুটি গান (একটি ইংরেজী সুরে) এবং হোটেলের বিলিতী নাচের দৃশ্য ছবিতে সংযুক্ত। এগুলির সংস্থানের [illegible] হয়ত নায়ককে সুরশিল্পী করতে হয়েছে। সে যাই হোক, অতি-ব্যবহৃত উপকরণের সমাবেশ সত্ত্বেও ছবিটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখে। [illegible] এই ছবিতে আমোদের প্রতিশ্রুতি আছে।

ছবির নায়ক রবীনের চরিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় [illegible]। পুলিসের কাছে অপরাধী সাব্যস্ত

স্টার থিয়েটারের "তাপসী" নাটকের তিনশত তম অভিনয়-রজনী-পূর্তির স্মারক উৎসবে পুরস্কৃত হবার পর আনন্দের মুহূর্তে জোৎস্না বিশ্বাস, মঞ্জু দে ও বাসবী নন্দী
ফটো—দেশ

হওয়ার পর চরিত্রের বিমূঢ়তা এবং পরে অসহায়তা ও গভীর চিত্তদাহ শ্রী মুখোপাধ্যায় নিপুণ নিরুচ্চার অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করেছেন। ছবির একটি মুহূর্তে ভিন্নতর বেশে তাঁর নির্বাক ক্রুর ভাবভঙ্গি দেখবার মত।

ব্যারিস্টার অজয়ের ভূমিকায় ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। ব্যর্থ প্রেমিকের মনের অস্ফুট ব্যথা তিনি আশ্চর্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রশংসনীয় চরিত্রচিত্রণ দর্শকের মনে সমবেদনা জাগায়।

নায়িকার রূপসজ্জায় নবাগতা জ্যোৎস্না বিশ্বাসের অভিনয় শান্ত সংযত; কোন কোন মুহূর্তে আবেগপূর্ণ। মানসিক বৈকল্যের কালে তাঁর অভিনয় কৃত্রিম। একটি দুরূহ চরিত্র রূপায়ণের শক্তি তাঁর এখনও অনর্জিত। তিনটি বিশেষ চরিত্রে মনোগ্রাহী অভিনয় করেছেন প্রশান্তকুমার, জীবেন বসু ও রেণুকা রায়। পুলিস কর্মচারীর বেশে দীপক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় চরিত্রানুগ। পার্শ্বচরিত্রে সুঅভিনয় করেছেন জহর রায়, সুখেন দাস, মণি শ্রীমানী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

সংগীত পরিচালক রাজেন সরকার ছবির আবহ সুর রচনায় স্থানে স্থানে রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া একটি আধুনিক গানের সুর সুন্দর। গানটি সুগীত: জনপ্রিয় হতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য সুরের গানটি রসিকজনকে কতখানি আনন্দ দেবে বলা কঠিন। তা-ছাড়া, এ-গান সুপ্রযুক্ত হয় বলে মনে রেখাপাত করে না।

অজয় মিত্র চিত্রগ্রহণ খুবই প্রশংসনীয়। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগে কৃতকার্যতার পরিচয় দিয়েছেন রবীন দাস (সম্পাদনা)। শব্দগ্রহণ আরও সুষ্ঠু হতে পারত।

"তাপসী"র তিন শত অভিনয়-রজনী পূর্তির স্মারক উৎসব

গত ২৫শে জুলাই সন্ধ্যায় স্টার রঙ্গমঞ্চে "তাপসী" নাটকের ৩০০ অভিনয়-রজনী অতিক্রমের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নাটকের সাফল্য উপলক্ষে স্টার কর্তৃপক্ষ শিল্পী, নাট্যকার, কাহিনীকার, কলাকুশলী ও কর্মীদের পুরস্কৃত করেন। কাহিনীকার ডাঃ নীহাররঞ্জন ও সুরকার অনাদি দস্তিদার ব্যতীত অপর সকলকে নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় (মোট ছয় হাজার আশি টাকা)। কাহিনীকার ও সংগীতপরিচালককে যথাক্রমে কলম ও সোনার বোতাম পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি মন্মথ রায় স্টার থিয়েটারের ঐতিহ্য ও নাটকের সাফল্যের কারণ বর্ণনা করে সময়োপযোগী ভাষণ দেন।

মুক্ত-অঙ্গনে সুন্দরম্-এর নিয়মিত অভিনয়

কলকাতার সুখ্যাত নাট্যসংস্থা 'সুন্দরম' মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে আগামী তেসরা আগস্ট থেকে প্রতি সোমবার সন্ধ্যায় তাঁদের জনপ্রিয় নাটক "চার দেওয়ালের গল্প" অভিনয় করবেন। ইতিপূর্বে 'মৃত্যুর চোখে জল' এবং রহস্য নাটক 'ফিঙ্গারপ্রিণ্ট' অভিনয় করে এঁরা নাট্যরসিক এবং সুধীজনের যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছেন। চিত্র-পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী সংস্থার নতুন নাটকের রচয়িতা, নির্দেশক এবং সংগীত পরিচালক। মঞ্চ পরিকল্পনায় আছেন সুরেন চক্রবর্তী, আলোকসম্পাতে বিমল দাস এবং রূপশিল্পে অনন্ত দাস অভিনয় করবেন চণ্ডী চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, নীরেন ঘোষ, অলোক রায়চৌধুরী, অমিয় মুখোপাধ্যায়, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রথীন সাহা, অনিল গুহ রবি মিত্র, চিত্রা মণ্ডল, মৌব ভুঁইয়া প্রভৃতি

বিদেশে হেমন্তকুমার প্রশংসিত

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে হেমন্তকুমার নয়জন সহশিল্পীকে নিয়ে বিশ্বপর্যটনে রওয়ানা হন। প্রথমে লণ্ডনে তিনি তিনটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। হেমন্তকুমার ও তাঁর সহশিল্পিবৃন্দ বিদেশে যে সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশন করছেন তার প্রধান আকর্ষণ হল রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক বাংলা গান ও বাংলা লোক-সংগীত। হেমন্তকুমারের সহশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী বেলা মুখোপাধ্যায়, এবং তাঁদের পুত্র-কন্যা জয়ন্ত ও রাণু, খোকন মুখার্জি, নারায়ণস্বামী ও পণ্ডিত সুদর্শন অধিকারী।

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে হেমন্তকুমার ও তাঁর সম্প্রদায় বিশ্বমেলায় ভারতের মণ্ডপে সংগীত পরিবেশন করেন। তা ছাড়া ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে হেমন্তকুমার গান করেন।

এর পর শিল্পিদল ত্রিনিদাদে যান। জ্যামেইকা ও ত্রিনিদাদের দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে তাঁদের সংগীতানুষ্ঠানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। "গ্ডেইলি মিরার অব ত্রিনিদাদ" বলেন তাঁর রবীন্দ্রসংগীত ছিল সন্ধ্যা অনুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ অংশ। সেখানকার সমালোচকরা হেমন্তকুমারকে "ভারতের ক্র্যাংক সিনাট্রা" বলে অভিহিত করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে শিল্পিদল জাপান, হংকং, ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে সংগীত পরিবেশন করবেন।

বিদেশে ভারতীয় ছবি

বিদেশে, বিশেষ করে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি ও জার্মেনীতে, ভারতীয় ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা কতখানি সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন ও বিশদ অনুসন্ধানের জন্য ইণ্ডিয়ান মোশন পিকচার এক্সপোর্ট করপোরেশন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঐসব দেশে পাঠাচ্ছেন। কী ধরনের ছবি ইউরোপের দর্শকদের জনপ্রিয় হতে পারে তাও তাঁরা অনুসন্ধান করে দেখবেন। বিদেশ পর্যটনকারী দলের নেতৃত্ব করবেন করপোরেশনের সভাপতি শ্রী এ এস নায়েক। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্রনির্মাতাও এই দলে থাকবেন।

যুবমানস-এর 'প্রথম প্রেম' (পরিচালনা : অজয় বিশ্বাস) ছবিতে নন্দিতা সিংহ ও বিশ্বজিৎ।

—ফটো : দেশ

চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যাভিনয়

রবিতীর্থের অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগামী ৯ই আগস্ট সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করা হবে। নৃত্যনাট্যটি পুনরায় অভিনীত হবে ১৫ই আগস্ট সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে। সংগীত পরিচালনা করবেন সুচিত্রা মিত্র ও শিপ্রা চৌধুরী। নৃত্য পরিকল্পনায় রয়েছেন রাম-গোপাল ভট্টাচার্য।

বনফুল সংবর্ধিত

গত ২০শে জুলাই পাটনায় প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা বিহার আর্ট থিয়েটার জনপ্রিয় সাহিত্যিক বনফুলকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ এস এম ঘোষাল।

বনফুলের বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা প্রসঙ্গে বিহার আর্ট থিয়েটারের সভাপতি অনিলকুমার বলেন, বনফুল নামের সবচেয়ে বড় সার্থকতা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে—যার অজ্ঞাত, অখ্যাত, যাদের লোকে মনে রাখে না দেখেও দেখে না, মুখ ফিরিয়ে নেয়। বনফুলের অবিস্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি বিদ্যা সাগর ও শ্রীমধুসূদন-এর উল্লেখ ক তিনি বলেন, শুধু এই দুইটি নাটক লিখে যে-কোনও সাহিত্যিক অমর হতে পারেন

সংবর্ধনার উত্তরে বনফুল বলেন, এ দেশে সাহিত্যকারের ভাল নাটকের অভাবের কার ভাল স্টেজের একান্ত অভাব। আজকি কারখানার মত নাটক স্টেজ করবার ম স্টেজ একমাত্র বিহার আর্ট থিয়েটার দ্বার সম্ভব হয়েছে। মঞ্চ-মনোরমা বা প্যাচ

জালান প্রোডাকশন্স-এর 'দীপ নেভে নাই' (পরিচালনা: কনক মুখোপাধ্যায়) ছবিতে নবাগত দেবাজিৎ

রসিক স্টেজ প্রত্যেক বড় সহরে বিশেষ করে কলিকাতার মত শহরে অন্তত একটি করেও হওয়া দরকার এবং বিহার আর্ট থিয়েটার যেসব নতুন ধরনের নাটক প্রযোজনা করছেন সেসব নাটকের সর্বসাধারণ্যে প্রচার হওয়া দরকার। মঞ্চকে সিনেমা-টেলিভিশনের অপপ্রভাব থেকে মুক্ত করতে হলে মঞ্চ-মনোরমার মত আধুনিক স্টেজের প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়।

ভিভিয়েনের নতুন ছবি

১৯৫১ সনে ভিভিয়েন লেই 'এ স্ট্রীটকার নেমড ডিজায়ার' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। এ অভিনয় তাঁকে 'অস্কার' এনে দিয়েছিল। এটি দ্বিতীয় 'অস্কার'; প্রথমটি পেয়েছিলেন 'গন উইথ দি উইণ্ড'-এ অভিনয়ের জন্য। ১৯৩৯ সনে।

১৯৫২ সনে সেই যে দ্বিতীয় 'অস্কার'টি নিয়ে ভিভিয়েন লন্ডন গেছেন, তার পর আর তাঁকে হলিউডের স্টুডিওতে দেখা যায়নি। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর এতদিনে হলিউডের প্রতি আবার তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। আবার সেই হলিউড স্টুডিওর প্রখর আলো, ক্যামেরার সেই সন্ধানী দৃষ্টির সামনে তিনি আত্মপ্রকাশ করছেন। যে-ছবিতে এবার তিনি অভিনয় করবেন তার নাম 'শিপ অব ফুলস্'। স্ট্যানলি ক্রেমার ছবিটির প্রযোজক-পরিচালক।

'শিপ অব ফুলস'-এ তিনি ৪৬ বছর বয়স্ক মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করবেন। তাঁর সহশিল্পীদের মধ্যে আছেন সিমোন সিয়োরে, জোস ফেরার, এলিজাবেথ অ্যাশলি, অস্কার ওয়ার্নার প্রভৃতি।

ভিভিয়েন লেইকে দেখলে অথবা তাঁর বিষয়ে আলোচনা হলে আজও প্রথমেই 'গন উইথ দি উইণ্ড'-এর স্কারলেট ওহারার কথা সকলের মনে আসে। তাঁর সামনে ওই নামটি উচ্চারিত হলে কিন্তু ভিভিয়েন খুব খুশী হন না। বরং অস্বস্তি, কখনও বা বিরক্তি বোধ করেন।

"দেখুন, ওই ছবিটা আজও পৃথিবীর দেশে দেশে চার বছর অন্তর অন্তর দেখতে পাওয়া যায়, জানি; ঈষৎ অপ্রসন্ন সুরে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "এ-ও জানি, ছবিটা টাকার খনি। কিন্তু আমি নিজে স্কারলেটকে মন থেকে মুছে ফেলেছি। স্কারলেট ছাড়াও বোধ হয় আমি আরও কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেছি। করিনি কি? এবং সম্ভবত আরও কিছু করব। অন্তত সেইটুকু আশা মনে রেখে দিয়েছি।"

ভিভিয়েন ভুলতে চান, কিন্তু তাঁর অনুরাগীরা কিছুতেই তাকে ভুলতে পারেন না। কে জানে, হয়ত স্ট্যানলি ক্রেমারের এই ছবি শেষ হয়ে যাবার পর তাঁরা স্কারলেটের স্মৃতি নিয়েই মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকের চরিত্ররূপটি দেখতে যাবেন।

বোম্বাই সমাচার

বোম্বাইয়ের প্রকাশ স্টুডিওর প্রাঙ্গণে পরিচালক ফণী মজুমদার সম্প্রতি তাঁর "আকাশদীপ" ছবির বহির্দৃশ্যের শুটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় সেখানে একটি সবুজ রঙের নতুন ফিয়াট গাড়িতে চড়ে এলেন অভিনেতা মেহমুদ। ফণীবাবুর হাতে শিল্পী নতুন গাড়ীর চাবি তুলে দিলেন। ফণীবাবুই মেহমুদকে প্রথম ছবিতে অভিনয় করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। ছবির নাম ছিল "বাদবান"। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই গাড়ীটি তাই শিল্পী পরিচালক শ্রীমজুমদারকে উপহার দিলেন।

ইনের উপর দাঁড়াবার অধিকার আছে। হলে উপায় ?

আইন সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল কজন রেফারীর অভিমত : বলের পরিধির টুকু দূরত্ব গোল-লাইন থেকে ততটুকু রে বল বসিয়ে কিক করার নির্দেশ দিতে । আর একজন রেফারী বলেন : আইনে ন কোন ফাঁক নেই যাতে ঘটনাস্থল কে দূরে সরিয়ে বল বসান যেতে পারে। াল-লাইনের উপর থেকে কিক সামনের কেই করতে হবে এমন তো কোন কথা ই। যেখানে সামনের দিকে কিক করলে ক সম্পূর্ণ হবে না সেখানে পেছনের কেও কিক করা যেতে পারে। বল রিয়ে বসাতে হবে কেন ?

যাই হোক, আমি ফুটবল আইনের বহু ই ঘেঁটেও এর সদুত্তর পাইনি। আন্ত- র্জাতিক সংঘের কাছে চিঠি লিখেছি। দের অভিমত জানলে যথাসময়ে পনাদেরও জানান যাবে।

শ্রীতপন ঘোষ, রাজীবপুর, ২৪ পরগনা।

প্রশ্ন—আমাদের স্কুলের ক্লাস লীগের লায় স্কুল একটির বেশী বল দেয় না। ল ও নীল দলের খেলাটি শেষ হবার মিনিট আগে বলটি ফেটে যায়। ঐ সময় ল দল ১—০ গোলে এগিয়ে ছিল। বল টে যাওয়ায় শেষ ৫ মিনিট খেলা হয়নি। ন কি করা যায় ? লাল দলকে কি য়ী ঘোষণা করা যায় ? 'দেশ' পত্রিকার পনার মতামত না জানা পর্যন্ত খেলা থাকবে।

উত্তর—খেলা যখনই বন্ধ হয় তখনকার াফল বহাল থাকবে, যদি আপনাদের গ এমন নিয়ম না থেকে থাকে, তবে ন অনুযায়ী অসমাপ্ত খেলা আবার া সময় খেলাতে হবে। ১—০ গোলে , ৭—০ গোলে কোন দল এগিয়ে কও অসমাপ্ত খেলায় তাদের বিজয়ী ণা করা যায় না। তবে প্রতিযোগিতার ীগে আগে থাকতে এমন নিয়ম ঘোষণা থাকলে পৃথক কথা।

জ্ঞানেশ্বর মাইতি, দেপাল, মেদিনী- ।

প্রশ্ন (১)—এখানকার স্থানীয় একটি য় দেখা গেল রেফারী ছাড়া ও ম্যানের হাতেও বাঁশী আছে, এ ইচ্ছামত বাঁশী বাজিয়ে, রেফারী ম করে ফাউল, হ্যান্ডবল ইত্যাদি শ দিচ্ছেন। এর যথার্থতা সম্বন্ধে র অভিমত জানাবেন।

উত্তর—লাইন্সম্যানের বাঁশী বাজাবার থেকে কোন আইন লঙ্ঘনের নির্দেশ অধিকার নেই। তাঁর সংকেত বা দৃষ্টি ণ শুধু রেফারীর জন্য। রেফারী সে গ্রহণ করতেও পারেন, নাও পারেন। ই খেলায় একমাত্র বিচারক।

প্রশ্ন (২)—খেলায় লাল বা সাদা বল নেওয়ায় বাধা আছে কি ?

উত্তর (২)—সাধারণত ব্রাউন, অরেঞ্জ ও সাদা রং-এর বলেই খেলা হয়। সাদা বলের অবশ্য ইউরোপেই প্রচলন বেশী, বিশেষ করে রাত্রিকালীন ফুটবল খেলায়। লাল বলের প্রচলন খুবই কম। তবে আইনে কিছু বাধা নেই।

অফ-সাইড সম্বন্ধে আপনি যে ডায়গ্রাম দিয়েছেন, আশা করি আপনার কাছে তার কপি আছে। কর্নার কিকের পর কে বল খেলেছেন, ঐ ডায়গ্রামে তা দেখানো হয়নি। যদি 'এ' বল খেলে বা হেড করে তবে অফ-সাইড হবে না, 'এ'-র পেছনে থেকে আক্রমণ দলের যদি অন্য কেউ বল খেলে এবং সামনে শুধু গোল-কিপার থাকে তবে অফ-সাইড হবে।

শ্রীকল্লোল দেব, বাবুপাড়া, দিনহাটা, কোচবিহার।

প্রশ্ন (১)—পেনাল্টি-কিক করার পূর্ব- মুহূর্ত পর্যন্ত গোল-কিপার নড়াচড়া করতে পারে কিনা ?

উত্তর (১)—পেনাল্টি-কিক করার আগে গোল-কিপারের হাত বা দেহ নড়াচড়া করার কোন বাধা নেই, কিক না হওয়া পর্যন্ত শুধু পায়ের পাতা গোল-লাইনের উপর নিশ্চল অবস্থায় রাখতে হবে।

প্রশ্ন (২)—কিক হবার পর গোল-কিপার ডাইনে বাঁয়ে কিংবা সামনের দিকে কত গজ পর্যন্ত এগুতে পারে ?

উত্তর (২)—যত গজ এগোনো তাঁর পক্ষে সম্ভব। কিক হবার পর তো পায়ের পাতা তুলে ছুটতে হবে! সুতরাং পেনাল্টি স্পট থেকে গোলে বল পৌঁছবার সময়টুকুর মধ্যে গোল-কিপারের যতটা এগোনো সম্ভব ততটুকুই এগোতে পারেন।